ইতিহাসের ছিন্নপত্রে

(প্রথম খণ্ড)

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আজাদী আন্দোলন



কায় কাউস

অতীত ও আগামীর অন্তর্বর্তী যোগসূত্র ইতিহাস। কিন্তু সেই যোগসূত্রটুকু কখনোই নিরবচ্ছিন্ন থাকে না। যেটুকু থাকে, তাও বিস্মৃতি, বিকৃতি, পক্ষপাত আর কালের অমোঘ ঘটনা প্রবাহে হয় নিয়ত পরিবর্তিত। ইতিহাসের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা দিতেই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় ইতিহাস বিনির্মাণের। তাই ইতিহাস কেবল প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয় নয়; বরং এটি আমাদের জাতিগত পরিচয়, অস্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে অত্যাবশ্যকীয় অন্বেষণও।

মূলানুগ ইতিহাসের সেই সত্যসন্ধানী প্রচেষ্টার সহায়ক অংশ হিসেবে এই বইটির প্রকাশ। চরিত্রে এটি সংকলনধর্মী হলেও একটি মূল সূত্রে তা গ্রথিত। আর তা হচ্ছে–ইতিহাসের যে বিষয়গুলো আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুসলিম জাতীয়তাবাদী চরিত্রের বিস্মরণে প্রভাবক ও অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, আমাদের আত্মপরিচয়ের অহংকে পরাজিত মানসিকতায় করেছে ন্যুব্জ, আমাদের জাতিগত স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে করেছে সংকটাপন্ন এবং পরিণতিতে আমাদের পরিচালিত করে চলেছে অধীনতার কবুলিয়াতের পথে, তার সহস্র বিচ্ছিন্ন বিন্দুকে জুড়ে জুড়ে স্থান-কাল-পাত্রের আলোকে একটি আবছায়া পটভূমিকা ফুটিয়ে তোলা। এটি কখনো একক কোনো প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন সম্ভবপর নয়। এ এক দীর্ঘ শ্রম ও সময়সাধ্য যূথযাত্রা। ইতিহাস বিনির্মাণের সেই ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রায় এই বইটি একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

কায় কাউস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় আছেন বিভিন্ন মানবাধিকার, ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতি, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছেন ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে, পাশাপাশি সক্রিয় আছেন গণ-গ্রন্থাগার ও পরিবেশ আন্দোলনেও। ভালোবাসেন পড়তে, পড়াতে এবং গ্রন্থকীট হিসেবে পরিচয় দিতে। ইতিহাসচর্চার বাইরে বিভিন্ন সাময়িকীতে লিখেন কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা। পড়ার বাইরে একমাত্র শখ ভ্রমণ। ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে চান ইতিহাসের আলোকে। স্বপ্ন দেখেন ইতিহাসের গভীর অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিনির্মাণের কারিগর হওয়ার।

উৎসর্গ

অয়ি অতন্দ্রিলা,
কালের কপোলতলে কালির আখরে
এ ক্ষুদ্র স্মারক আমার—
রেখে গেলাম তব করকমলে,
চির মৈত্রীর অঙ্গীকারে ॥

ইতিহাসের ছিন্নপত্র

কায় কাউস

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ৩০ আগস্ট, ২০২০

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : 'Future of Bengal', Hindustan Standard, May 17, 1947 অবলম্বনে
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন,
মতিঝিল, ঢাকা।

Fixed Price: 550

ISBN: 978-984-8254-79-0

Itihasher Chinnopotro by Kai Kaus, Published by Guardian Publications, Price TK. 550.

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস।

শব্দটা হামেশাই উচ্চারিত হয় মুখে মুখে। ইতিহাস আদতে কী? অতীত ঘটনা ও কার্যাবলির অধ্যয়ন— তাই তো? সেই সংজ্ঞামতে ইতিহাসের পাঠগুলোও এক-একটা ইতিহাস।

অতীতে একটা ঘটনা বারবার ঘটেছে—ইতিহাসের চোখে একটা কাঠের চশমা পরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। আমরা তো জানি, ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গন্ডগোলটা বেধেছে ঠিক এখানেই। স্ব-স্ব চিন্তা-কাঠামোর ইতিহাসবিদরা নিজেদের রঙে রাঙিয়েছেন ইতিহাসকে। যার যত দক্ষতা, ক্ষমতা ও মাধ্যম ছিল, সে তত বেশি ইতিহাসকে দখল করেছে। প্রচলিত একটা নিষ্ঠুর বয়ান আছে—ইতিহাস নাকি বিজয়ীর চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখায়।

দুনিয়ার সবাই স্রোতের দিকে ছুটতে স্বস্তি পায়। কিছু মানুষ থাকে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হিম্মত দেখায়। ইতিহাসের ধারাবাহিক স্রোতে অনেক সময় সত্যকে লুকিয়ে ফেলার একটা আয়োজন করা হয়, কিন্তু কিছু মানুষ মাটি ফুঁড়ে সে ইতিহাস দুনিয়াবাসীর সামনে হাজির করার কোশেশ করে। কায় কাউস ঠিক তেমনই একজন ইতিহাসবেত্তা।

'ইতিহাসের ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি অতীত ইতিহাসেরই পুনর্পাঠ; নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিকর্ম নয়। এখানে গ্রন্থকার নিজ থেকে বয়ান তুলে ধরেনি; স্রেফ ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া মণিমুক্তোগুলোকে সংগ্রহ করেছেন পরম যত্নের সঙ্গে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের পরিশ্রম খুঁজে পাবেন।

'ইতিহাসের ছিন্নপত্র' তিন খণ্ডের গ্রন্থ। আপনাদের হাতে প্রথম খণ্ড তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। সত্যের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের এই বোঝাপড়া আপনাদের ভাবনার জগৎকে নতুন করে সাজাবে। ইতিহাসের চোখে পরানো কাঠের চশমাটা খুলে সেখানে 'বাস্তব লেন্স' লাগিয়ে দেওয়ার আয়োজনে আপনাকে স্বাগত। ছিন্নভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ পাঠকদের ঠিকানায় পোস্ট করা হলো 'ইতিহাসের ছিন্নপত্র' গ্রন্থিত চিঠির মাধ্যমে।

সম্মানিত লেখক এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থের কোথাও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

ভালো থাকুন সকলে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

৩০ আগস্ট, ২০২০

মুখবন্ধ

"ইতিহাসের ছিন্নপত্র" — সাধারণভাবে অবিভক্ত ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত কিংবা আপাত দুর্লভ ইতিহাসের পুনর্পাঠ। স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারাবাহিক কিংবা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নয়। এ ইতিহাসের সুবিশাল মহীরুহ হতে ঝরে পড়া, ইতস্তত ছড়ানো, কুড়িয়ে পাওয়া কিছু শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি মাত্র।

ইতিহাস বহুমাত্রিক, বহুপাক্ষিক। বিজয়ী আর বিজিত উভয়পক্ষেরই থাকে ঘটনার স্ব স্ব বয়ান। বিজয়ীর ইতিহাস হয়তো ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা পায় আর বিজিতের ইতিহাস মিশে থাকে কালের ধুলোয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কালের ধুলো থেকে ইতিহাসের সেই স্বর্ণরেণু তুলে আনেন ইতিহাসকার। এভাবেই এককালে যা সর্বসম্মত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের নিরলস অনুসন্ধানে তা ভিত্তিহীন গল্প বলেই প্রতিভাত হয়। আমাদের উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা আরও বেশি প্রযোজ্য।

আমি ইতিহাসকার নই। ইতিহাসের একনিষ্ঠ, মুগ্ধ পাঠক মাত্র। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, উপাখ্যান, কাহিনি, তথ্য-উপাত্ত কিংবা বর্ণনার মধ্যে থাকে ইতিহাস রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মনোভাবের প্রতিফলন। এভাবে বহু আপাতবিরোধ, অসংগতি, উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি কিংবা স্মৃতিভ্রংশতার সমূহ সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পাঠকেরও নিজস্ব এক উপলব্ধির জগৎ তৈরি হয়। তৈরি হয় তার সত্যানুসন্ধিৎসা আর ব্যাপক পরিসরে জানার আগ্রহ। আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে তেমনই কিছু বিপরীত কিংবা বিস্মৃত বয়ান তুলে এনে সেই অনুসন্ধিৎসাকেই জাগানোর প্রয়াস পেয়েছি। ইতিহাসের যে বিষয়গুলি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্বল্পালোচিত বা পাদপ্রদীপের অন্ধকারে লুকোনো মনে হয়েছে তাতেই আমি অধিক মনোনিবেশ করেছি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি ভিন্ন-মত সম্পর্কে যত বেশি জানা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা খণ্ডিত ইতিহাসই, পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। আমার প্রচেষ্টাও সে পথেই পরিচালিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের কোথাও আমি নিজস্ব মতামত কিংবা মন্তব্য সংযুক্ত করিনি। যা কিছু উল্লেখ করেছি আদ্যোপান্ত তা সরাসরি তথ্যসূত্রসমেত মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি, তথ্য কিংবা বর্ণনার সন্নিবেশ। একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছি, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ কোনো মত প্রকাশের চেষ্টা ব্যতিরেকেই। আশাকরি আগ্রহী পাঠকগণকে তা আরও গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রতিটি লিখিত বইয়ের আড়ালে থাকে কিছু জীবন্ত বই। একটি বই তৈরি হওয়ার পেছনে যারা নীরবে, নিভৃতে, কাছে কিংবা দূর থেকে ছায়ার মতো উপস্থিত থাকেন, অনুপ্রেরণা জোগান, ত্যাগ স্বীকার করেন, পরম মমতা আর ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখেন — তারা। আমার এই সুদীর্ঘ যাত্রায় তাদের সবার অপরিশোধ্য ঋণ গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। বইটি প্রকাশের দুর্বহ দায়িত্ব নেওয়ায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই অন্তর্জালের সকল বন্ধু, সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ীদের যারা সব সময় পাশে থেকেছেন, সমর্থন আর উৎসাহ জুগিয়েছেন। পরিশেষে বিনীতভাবে দায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই সংকলনে উদ্ধৃত সকল বইয়ের লেখক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধীকারীদের প্রতি।

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সম্পূর্ণ সংকলনকে কিছু কালপর্বে বিভক্ত করে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; যার প্রতিটি খণ্ডই হবে স্বতন্ত্র। আশাকরি এতে করে মূল পাঠের রসাস্বাদনে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটবে না। যদি অসাবধানতাবশত কোনো মুদ্রণ প্রমাদ, তথ্যের অসম্পূর্ণতা কিংবা অসংগতি থেকে থাকে তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের আশা রাখি।

কায় কাউস
১৬ জুন, ২০২০

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ঔপনিবেশিক শাসনকাল

প্রথম পর্ব
আজাদী আন্দোলন এবং ইংরেজ বর্বরতা ১৩

দ্বিতীয় পর্ব
ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম শিক্ষা ২৪

তৃতীয় পর্ব
কলকাতার বাবুদের ইংরেজি শিক্ষা ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
পাকিস্তান আন্দোলন : পটভূমি ও প্রেক্ষিত

প্রথম পর্ব
অবিভক্ত ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা ৪৯

দ্বিতীয় পর্ব
আজাদীর স্বপ্ন ২৬৫

তৃতীয় পর্ব
আজাদী আন্দোলনের দলিলপত্র ২৮৭

চতুর্থ পর্ব
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাব ৩৩৬

পঞ্চম পর্ব
স্মৃতিতে সিলেট গণভোট : পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির লড়াই ৩৫৪

ষষ্ঠ পর্ব
র‍্যাডক্লিফের ছুরি : বাউন্ডারি কমিশন ৩৮০

সপ্তম পর্ব
আজাদ ভারত-আজাদ পাকিস্তান ৩৯৪

অষ্টম পর্ব
কায়দে আজম, দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান ৩৯৮

নবম পর্ব
বেহাত আজাদী — ভিন্ন বয়ান ৪৪০

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক শাসনকাল

প্রথম পর্ব

আজাদী আন্দোলন এবং ইংরেজ বর্বরতা

এক

"...জনশূন্যপ্রায় শহরে ইংরেজ সৈন্যরা প্রাণভরে লুটপাট করে ফিরতে থাকে। পথিমধ্যে যাকে তারা পেয়েছে সবাইকে তারা হত্যা করেছে। বাদশাহ ও তার পরিবারের সকলকে বন্দি করে শহরের পথে হডসন নামক জনৈক সেনানায়ক বাদশাহর পুত্রগণকে হত্যা করে। বিচারে বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। তথায় তিনি ১৮৬২ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ সৈন্যরা দিল্লী বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। শহর দখল করার পর সৈন্যরা শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়নি- সামনে যাকে পেয়েছে - সকলকেই হত্যা করেছে। দিল্লীর কমিশনারের স্ত্রী লিখেছেন–'...For several days after the assault every native that could be found was killed by the soldiers, women and children were spared.' কমিশনার সাহেব নিজেই লিখেছেন–'...The troops were completely disorganised and demoralised by the immense amount of plunder which fell into their hands and the quantity of liquar which they managed to discover in the shops of the European merchants of Delhi.'

লর্ড রবার্টস লিখেছেন–'...দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যারা বাস করছিল, তারা সকলেই এখন ইংরেজ পক্ষের শত্রু; সুতরাং তারা বধ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।' মার্টিন সাহেব লিখেছেন–'...সমস্ত বিদ্রোহীই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা ছাড়া অতি অল্প লোককেই নগরে দেখা যেত। যখন আমাদের সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করে তখন যেসব লোককে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সকলকেই সঙ্গীনের ঘায়ে বধ করা হয়েছিল। কোন কোন ঘরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। এতেই আপনি বুঝতে পারেন নিহত লোকের সংখ্যা কত বেশি। এরা বিদ্রোহী নয়, নগরের অধিবাসী। এদের মনে মনে আশা ছিল যে, এদের ক্ষমা করা হবে। আমি নিঃসন্দেহে জানাচ্ছি যে এদের এ বিষয়ে হতাশ হতে হয়েছিল।'

জনাব ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেন–'...রক্ত পিপাসু ইংরেজ সেনা লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং নানা অকল্পনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে সমগ্র দেশে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে।'

১৮৫৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিন্দু অধিবাসীদের শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আরও কয়েকমাস পরে মুসলমানরাও শহরে প্রবেশ করার অনুমতি পায়।

...বেনারসের সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল নীল নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের নিয়ে শান্তিবাহিনী গঠন করলেন। এ শান্তিবাহিনীগুলি শান্তি রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে ফিরত আর যাকে দেখতে পেত তাকে হয় গুলি করতো বা ফাঁসির ব্যবস্থা করতো। কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা এসব এলাকায় যেসব নারকীয় ঘটনার অবতারণা করে, ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান মিউটিনি' পুস্তকে কে এন্ড ম্যালেসন লিখেছেন-

'...এ একঘেয়েমিকে কাটবার জন্য তারা সোজাসুজি না ঝুলিয়ে দেহগুলিকে ভেঙে চুরে বিকৃত করে, কোনটাকে ইংরেজী অঙ্ক চার-এর মত, কোনটাকে বা সাত-এর মত করে নিয়ে তারপর ঝোলাত।'

শুধু ফাঁসিই নয়, গ্রামে গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দিত। গ্রামের লোক পুড়ে মরত। এ খবর তারা বসিয়ে বসিয়ে বন্ধু বান্ধবদের কাছে লিখে জানাত। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মৌলভী, স্কুলের ছাত্র, অন্ধ, খোঁড়া সবাই এ অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মরত। চলৎশক্তিহীন স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আগুন দেখেও এক পা সরতে পারত না, জ্বলন্ত বিছানায় ছটফট করে মরত। কোন লোক যদি অগ্নিবেষ্টনী ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতো তবে তাকে গুলি করে মারা হত। জনৈক ইংরেজ অফিসার এ সম্পর্কে তার ইংরেজ বন্ধুকে লিখেছেন–'...আমরা জনপূর্ণ বড়ো একটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে চারিদিক ঘেরাও করে রইলাম। আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেকেই ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম।'

বিদ্রোহীদের দ্রুত শাস্তি বিধানের জন্য সামরিক আদালত বসান হয়েছিল। বিচারকরা ছোট, বড়ো সমস্ত অপরাধীকেই ফাঁসির হুকুম চালাতেন।

...জনৈক ব্রিটিশ অফিসার তাদের এলাহাবাদের সাফল্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হল :
'...আমাদের এবারকার যাত্রা অদ্ভুত রকম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা নদীপথে স্টিমারে চলেছি, আর শিখ ও ফুসিলিয়ার বাহিনীর সৈন্যরা হেঁটে শহরের দিকে চলেছে। আমাদের সাথে একটা কামান রয়েছে। ডানে বাঁয়ে দুদিকে কামান দাগাতে দাগাতে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর স্টিমার আর চললো না। আমরা নেমে হেঁটে চললাম। আমার সাথে ছিল আমার পুরান দোনালা বন্দুকটা। তাই দিয়ে বেশ কয়েকটা নিগারকে ধরাশায়ী করলাম। প্রতিহিংসায় আমি তখন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি।

আমরা যে পথ দিয়ে যাই দুদিকে আগুন লাগিয়ে যাই। অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করে আর বাতাসের বেগে হু হু করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিনে বিশ্বাস ঘাতক শয়তানগুলোর প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে। আমরা প্রতিদিন এ অভিযানে বের হই, বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেই। আমরা আমাদের প্রতিহিংসা পূরণ করে চলেছি। নেটিভদের বিচারের জন্য যে কমিশন বসান হয়েছে, আমাকে তার নেতা হিসাবে মনোনীত করেছে। এদের সবার আয়ু আমাদের হাতেই ঝুলছে। একথা তুমি স্থিরভাবে জেনে নিও, আমরা কাউকে রেহাই দিই না। পথের দুধারে গ্রাম গুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও জন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যে গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে চলেছি, তার চেয়ে শুন্যতার ছবি আর কল্পনা করা যায় না। পথের দুধারে পচা জলাভূমি, পুড়ে যাওয়া কুড়েগুলির কালো কালো ধ্বংসাবশেষ, তার উপর ছাতা পড়েছে। মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক এতটুকু শব্দও শোনা যায় না। শব্দের মধ্যে শুধু ব্যাঙের ডাক, শেয়ালের তীক্ষ্ণ চীৎকার আর অদৃশ্য সহস্র সহস্র পতঙ্গের একটানা মৃদু গুঞ্জন। নিম ফুলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালে গলিত মৃত দেহগুলি ঝুলছে, শুয়োরগুলো তাই নিয়ে মহোৎসবে মেতে উঠেছে, তারই উৎকট দুর্গন্ধ বাতাসের সাথে ভেসে আসছে। এ সমস্ত মিলে আমাদের মধ্যে যে শুন্যতা, কালিমা ও বেদনার ছবি রচনা করে তুলেছে, আমার মনে হয়, যারা সেদিন সেখানে ছিল জীবনে কোনদিন তারা তা ভুলতে পারবে না।'

...ঝাঁসি দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা এক সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি লুণ্ঠন করে বেড়ায়। মাত্র ৭৫ জন ইংরেজ প্রাণহানীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ঝাঁসীর পাঁচ হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরিব্রাজক বিষ্ণু ভট্ট গোডসে এ সময় ঝাঁসীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লিখেছেন–'...সমস্ত শহর প্রেতভূমি ও মহাশ্মশান বলে বোধ হল। জ্বলন্ত বাড়িগুলি থেকে লেলিহান অগ্নি শিখা উর্ধে উঠে রাত্রির আকাশকে ভয়াল করে তুলল। আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে আর্ত নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রিয়জনের মৃতদেহের পাশে বসে রমণী কাঁদছেন আর তার সামনে বেয়নেট ঠুকে গোরা সিপাই অলংকার খুলে দিতে বলছে। ধনী দরিদ্র সবার শিশু সন্তানই এক সাথে এক মুষ্ঠি অন্ন চেয়ে কাতর কন্ঠে কেঁদে ফিরছে।

কোথাও বালকপুত্রের মৃতদেহ নিয়ে মা শোকে বিহ্বল। কোথাও পিতার দেহের পাশে বসে শিশু সন্তান ছোটো ছোটো হাতে পিতাকে আঘাত করে ডাকছে। তালোয়াইপুরার জ্বলন্ত অট্টালিকার কাঠের বরগাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে ছাই আর গলিত শবদেহের তীব্র দুর্গন্ধ।'

প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো লিখেছেন—'...মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্কাগতিতে। একটি মানুষকেও রেহাই দেওয়া হল না। রাস্তাগুলিতে রক্ত স্রোত বইতে শুরু করলো।'

হিউরোজ নিজেই লিখেছেন—'...প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এই একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নগরীর আশে পাশের বন, বাগান, রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হল। বিদ্রোহী সৈন্যরা সাধারণত: জাতিতে পাঠান ও আফগান।'

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য লিখেছেন—'...ঝাঁসী শহরের রাণীর সমস্ত সৈন্য এবং বহুলাংশে নাগরিকরা নিহত হল। সমস্ত নগরীর পথে কর্দমাক্ত রক্ত জমে রইল। শকুনী উড়তে লাগল সমৃদ্ধ নগরীর আকাশে। হিউরোজের কঠিন নিষেধ ছিল ভারতীয়েরা যেন কোনমতেই যেন তাদের শবদেহের সৎকার করতে না পারে। সাতই এপ্রিলের পর সমস্ত নগরী যখন পুঁতিগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, গলিত শবদেহের লোভে শৃগাল ও শকুনী বিচরণ করতে লাগল তখন হিউরোজ আদেশ দিলেন, এবার শবদেহের সৎকার করা যেতে পারে।'

...৫১ নং বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রি থেকে বারজন সিপাই দলত্যাগ করে পালিয়েছিল। তাদের ধরে এনে প্যারেডের ময়দানে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়। ৫৫ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে এক 'শ পঞ্চাশজন নিকলসন বন্দি করে নিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ৪০ জনকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১০ই জুন তাদেরকে কামানের সামনে বেঁধে রেখে ফায়ার করা হয়।

পলাতক চার 'শ জন সিপাই সোয়াতে কিছুদিন অবস্থান করার পর কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করে। কাশ্মীরের রাজা গোলাপ সিং ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহীদেরকে ধরিয়ে দেয়। সবাই ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়তে লাগল। মিলিটারী আদালতের বিচারে তারা সবাই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হল। মেজর বেচার উল্লসিত হয়ে লিখেছেন—'...এভাবে ৫৫ নং রেজিমেন্টের শেষ লোকটি পর্যন্ত বন্য পশুর মত আমাদের জালে ধরা পড়ল। এরই মধ্যে দিয়ে আমরা বিদ্রোহী রেজিমেন্টগুলোর কাছে হিতকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। তাদের কাছে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি কি সুদূর প্রসারী আমাদের শক্তি। সীমান্তের ওপারে গিয়েও অব্যাহতি নেই, সেখানে গেলেও আশ্রয় মিলবে না।'

...সিপাইরা প্রাণভয়ে ইরাবতী নদীর দিকে ছুটে চলেছে। পেছনে তাড়া করছেন অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার। তার সাথে সত্তর আশি জন সওয়ার। বিদ্রোহী সিপাইরা নদী তীরে এসেই বড়ই মুসকিলে পড়ল। নদীতে নৌকা নেই। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে উজনালা থেকে তহশিলদার সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করল। এই আক্রমণে কমপক্ষে দেড়শ সিপাই শহীদ হলো। অসহায় সিপাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল ইরাবতীর তীর। সংগে সংগে কুপারও নদী তীরে এসে উপস্থিত হলেন। এর পরের ঘটনা ফ্রেডারিক কুপার তার লিখিত 'ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব' পুস্তকে যা লিখেছেন তা হলো :

'...সিপাইদের মধ্যে অনেকেই নদীতে ডুবে যায়। নদীর মাঝামাঝি ছোটো একটা দ্বীপ ছিল। অনেকে কাঠের টুকরোর উপর ভর করে ভেসে সেই দ্বীপের দিকে যেতে থাকে। এরা সবাই অনাহারে অবসন্ন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত। তার উপর হঠাৎ আমরা যখন আক্রমণ করলাম তখন সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। বুনো পাখীগুলি যেমন নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে, এরাও সে রকম চেষ্টা করতে লাগল। ওদের ধরে আনবার জন্য দুখানা নৌকা পাঠালাম। বিশ মিনিটের মধ্যে নৌকা দুখানা সে দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। ভয়ে আর নিরাশায় কোন পথ খুঁজে না পেয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সিপাই আবার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাদের ধরবার জন্য যে সব সৈন্য গিয়েছিল তারা ওদের মাথার দিকে তাক করে গুলি করতে উদ্যত হলো। আমি যখন তাদের গুলি করতে নিষেধ করলাম, তখন পলাতক সিপাইরা ভাবল ডেপুটি কমিশনার বোধ করি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবেন। এ কথা মনে করে তারা সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। হাত বাঁধার সময় তারা বাধা দিল না। তারা মনে করেছিল সামরিক আদালতে তাদের যথারীতি বিচার হবে এবং বিচারের আগে অন্তত একবার তাদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হবে।

রাত দুপুরের সময় দুশো বিরাশিজন বন্দি সিপাইকে উজনালার থানায় নিয়ে আসা হলো। পরদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে এদের মেরে ফেলার কাজটা স্থগিত রাখতে হয়।

১লা আগস্ট দিন ধার্য হলো। আমি সিপাইদের বাঁধার জন্য বেশি করে দড়ি সংগ্রহ করে আনতে বলে দিয়েছিলাম। শিখ সৈন্যরা দড়ি নিয়ে এল। প্রতিবারে দশ জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গুলি করে মারাই স্থির হলো।

প্রতিবারে দশ জন করে দড়ি দিয়ে বাঁধা সিপাইকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হতে লাগল। শিখ সৈন্যরা গুলি করার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট থানায় বসে সবকিছু তদারক করছিলেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাইরা এদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও শিখ সৈন্যদের গালি দিতে লাগল। প্রতিবারে দশজন করে সিপাই প্রাণ দিতে লাগল।

দুশো সাইত্রিশ জন সিপাইকে এভাবে মারা হলে একজন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে এসে জানাল যে, অবশিষ্ট সিপাইরা প্রাচীরের ভিতরকার ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই সেখানে গেলাম। ঘরের দুয়ার যখন খোলা হলো তখন দেখা গেল ভয়ে, শ্রান্তিতে, অবসন্নতায়, অতিরিক্ত গরমে এবং আংশিকভাবে শ্বাসরোধের ফলে ঐ ঘরের পয়তাল্লিশ জন সিপাই প্রাণ ত্যাগ করেছে। স্থানীয় মুর্দাফরাসদের নিয়ে লাশ গুলি বের করা হল। থানার কাছে একটা গভীর কুয়া ছিল। নিহত সিপাইদের লাশগুলি উক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়া হল।'

চীফ কমিশনার কুপারের কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল তাকে প্রশংসা জানালেন। প্রধান বিচারপতি রবার্ট মন্টোগোমারী সাহেব প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিলেন। অপর পক্ষে মার্টিন সাহেব প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এদের ধ্বংস সাধন করা হল কোন আইনে?'

...ঢাকার লালবাগের খণ্ডযুদ্ধে যে সব সিপাই বন্দি হয়েছিল, সে সব পলাতক ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে লাগল। বন্দিদের সবাইকে আন্টাঘরের ময়দানে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দিনের পর দিন মৃত দেহগুলি ঝুলতে লাগল। পচে গলে পড়তে লাগল। শকুনেরা মহোৎসবে মেতে গেল।

হৃদয়নাথ মজুমদার 'দি রেমিনিস্গে অব ঢাকা' পুস্তকে লিখেছেন–'...তাদের সব কয়জনকে ফাঁসিতে ঝোলান হল। আন্টাঘরের ময়দানে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে ঢাকার লোক এই জায়গাটাকে ভয়ের চোখে দেখতো। বাংলা বাজার, শাঁখারী বাজার, কলতা বাজার এবং চারিদিককার অন্যান্য মহল্লার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে নানারকম গল্প প্রচলিত ছিল। রাত্রিবেলা নিহত লোকদের প্রেতাত্মারা নাকি ময়দানে ঘুরে বেড়াত এবং সেখান থেকে নাকি আর্তনাদ ও নানারকম বিকট শব্দ শোনা যেত। বুড়োবুড়িদের কাছে আমরা এই সকল গল্প শুনতাম। সন্ধ্যার পর ভয়ে ওদিকে মাড়াতাম না।"[১]

---

১. আবু জাফর/স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। [লেখক - সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। পৃ. ১৯১-২১৫]

দুই

"...ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসের একটা যথার্থ দাবী অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সাধিত হয় গোলযোগের আকারে। এ সম্পর্কে মিঃ লেকীর উক্তি :

"বিশ্বের কোন বিদ্রোহকে যদি সত্যাশ্রয়ী বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে তা ছিল হিন্দুস্থানের হিন্দু মুসলমানদের বিদ্রোহ।"

লর্ড রবার্টস ভারতে ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এর নামে মিঃ এনসেব-এর পত্রের শেষ একটি বাক্যের উল্লেখ করেছেন : 'আমার মতে এসব কার্তুজ ব্যবহার করে সিপাহীদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অসহনীয় পন্থায় প্রত্যাখান করা হয়েছে।'

কিন্তু এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, সভ্যতা-ভদ্রতার দাবীদাররা এ বিদ্রোহের সাথে কেমন আচরণ করেছে, কিভাবে তা দমন করেছে, ধর্মীয় উন্মাদের পরিভাষার জন্য সেসব বিচক্ষণ জ্ঞানীদের কর্মপন্থা কি ছিল, যারা জনসেবার নামে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইউরোপ থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিল।

'যখন শুনবে বুকে পাটা বাঁধবে, খোদা না শুনাক কারো শোক গাঁথা।' (মূল উর্দু থেকে অনূদিত)

কার্তুজের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যে মানবতা বিধ্বংসী দণ্ড দেওয়া হয়েছিল জনৈক ইংরেজ তার চিত্র এঁকেছেন এভাবে :

'...বন্দুক এবং সংগীনের পাহারায় ৮৫ জন জওয়ানকে সামরিক পোশাকে সিপাহীর বেশে সামরিক আদালতের সামনে হাযির করা হয়। উচ্চস্বরে তাদেরকে দণ্ড শোনানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সিপাহীদেরকে জঘণ্য অপরাধীদের ফিরিস্তিতে শামিল করা। তাদের কাছ থেকে সামরিক প্রতীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পেছন থেকে টেনে তাদের উর্দি ছিঁড়ে ফেলা হয়। তারপর লৌহকার কড়া আর শিকল নিয়ে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে সে ৮৫ জন জওয়ানকে তাদের সংগী সাথীদের বিশাল সমাবেশে নিতান্ত অপমানের সকল বাহ্য নিদর্শনসহ অর্থাৎ হাতে হাতকড়া আর পায়ে শিকল পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়।

এটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং লজ্জাস্কর দৃশ্য। এতে সিপাহীরা যারপরনাই দুঃখিত হয়। বিশেষ করে তারা যখন তাদের হতভাগ্য সঙ্গীদেরকে এহেন অসহনীয় এবং হতাশ অবস্থায় দেখে, তখন তাদের দুঃখের কোন সীমা ছিল না। অথচ তাদের অনেকেই ছিল নিজ নিজ পল্টনে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বহুবার তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বৃটিশ সরকারের প্রতি প্রভু ভক্তির প্রমাণ পেশ করেছে। কয়েদীরা হাত তুলে অনুনয় বিনয় করে উচ্চস্বরে জেনারেলের নিকট করুণা ভিক্ষা করে এবং এ কঠিন বিপদ ধ্বংস থেকে মুক্তি চায়। এভাবে আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না জেনে তারা সঙ্গিদের প্রতি লক্ষ্য করে নীরবে এই জিল্লতি স্বীকার করে নেয়ার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করে এবং তাদের মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে। তখন সেখানে এমন একজন সিপাহীও বর্তমান ছিল না যে এ দৃশ্য অবলোকন করে অন্তরে ব্যাথা অনুভব করেনি। কিন্তু তোপ-বন্দুক এবং সওয়ারদের চক চক করা খঞ্জনের মুখে হামলা করার কথা কেউ ভাবতে পারেনি। অবশেষে বন্দিদেরকে তাদের স্ব স্ব কুঠরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের পাহারায় নিয়োজিত করা হয়েছিল তাদেরই বন্ধুদেরকে।'

১৮৫৭ সালের গোলযোগের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত জালিমরা তাদের জুলুমের কথা স্বীকারই করেনি। আর মজলুমরাও এতটা ধ্বংস ও বিপন্ন ছিল যে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নীরবতা পালন করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু জালিমদের নিত্য দিনকার নতুন নতুন জুলুম, অন্তরে চাপা পড়া স্ফুলিঙ্গকে চাঙ্গা করে তুলছিল। আর তা কত দিন চাপা থাকতেই বা পারে? তারা ভারতবাসীর অন্তরকে ভেতর থেকে দাহ করে চলছিল। তখন কিছু ইংরেজ অনুভব করে যে, তাদেরকে হিন্দুস্তানীদের বন্ধু সেজে এসব স্ফুলিঙ্গ নির্বাপনের চেষ্টা চালাতে হবে। চাপা পড়া স্ফুলিঙ্গ যাতে বৃটেনের রাজ সিংহাসনের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত না হয়, এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ মতবাদ অনুযায়ী Edward John Thompson

ষাট বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অপরাধ স্বীকার করে আধুনিক কূটনীতির মাধ্যমে এসব স্ফুলিঙ্গ নির্বাপনের চেষ্টা চালান। তিনি The Other Side of the Medal নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেন।

ফাঁসি : ইংরেজদের দৃষ্টিতে ফাঁসির শাস্তির গুরুত্ব নেই। আর এ দণ্ড পাওয়ার জন্য সত্যি সত্যি বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কুপার লিখেন :

'...পাঞ্জাবের লোকজন সাধারণতঃ বৃটিশের অনুগত ছিল। সেখানে মিঃ মন্টেগোমারীর নির্দেশে শিখ পল্টনের একজন সুবেদার, অশ্বারোহী পুলিশের একজন রিসালদার এবং কারাগারের একজন দারোগাকে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো জরুরী বিবেচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যাতে ভালভাবে একথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, পাঞ্জাবের শাসকবর্গ শুরু থেকেই অবিরত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনমনে প্রভাব বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেছে। এই একটি মাত্র উপায়ে এ আধা পশুর দেশে সম্ভ্রম বজায় রাখা যায়। অপর দিকে এই কঠোর নীতির লক্ষ্য এটা প্রকাশ করা যে, সরকার জনগণের কাছে নিঃশর্ত এবং স্বার্থহীন বিশ্বস্ততা দাবী করে, তবে তা প্রজাদের ধৈর্যের উপর ভরসা করে নেয়। কেননা এটা হবে অনেকাংশে সরকারের দৃঢ়তার পরাজয়ের সমার্থক।'

মিঃ কুপার আমাদেরকে বলেন–'...বন্দিদের স্থায়ী মুক্তির পথ ছিল অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ দেখা মাত্রই নিকলসনের ধ্বনী দেওয়া হতো - ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে চলো।'

জনৈক পাদ্রীর একজন বিধবা স্ত্রী বিজয়ীনির ভাষায় লিখেছেন :

...অনেক বিদ্রোহীকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা গীর্জার ফরাশ পরিষ্কার করবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এ ধরণের কাজ করা তারা পসন্দ না করলেও সঙ্গীনের জোরে তাদেরকে এ তুচ্ছ কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই অতি ফূর্তির সাথে এ কাজ করে। তারা করেছিল এ ধারণায় যে, হয়তো এতে করে ফাঁসির দণ্ড থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সফল হয়নি, বরং তাদের সকলকেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে।"

মাজিন্ডী লিখেছেন :

'...আমি মসজিদের উপর পাহারা দিয়ে আরামসে রাত কাটাই। আমাদের বেশিরভাগ সময় কাটতো বন্দিদেরকে গুলি করে হত্যা করা বা ফাঁসিতে ঝুলানোর কাজে। এসব বন্দিদেরকে আমরা ভোরে গ্রেফতার করি। এদের মধ্যে অনেক হতভাগার জীবনতো গ্রেফতারের স্থলেই শেষ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদের চেহারায় বীরত্ব ও সংযমের ছাপ ছিল স্পষ্ট। আর তা ছিল এর চেয়েও বড়ো কোন উদ্দেশ্যের স্পষ্ট নিদর্শন।'

২৬ নং পল্টনের অপরাধ এবং তাদের দণ্ড সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে টাইমস পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় :

'...বিদ্রোহ ঘোষনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাঁচশ লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়। প্রশ্ন জাগে, এদের কী অপরাধ ছিল? অথচ স্বয়ং দায়িত্বশীল শাসক শ্রেণীর রিপোর্ট থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত বিদ্রোহীরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কেবল ঝড়ের ভয়েই তারা পালিয়েছিল। এ ছাড়াও অবরোধকালে ক্ষুধা, পথের দূরত্বের কষ্ট এবং শোকে-দুঃখে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল আধমরা মানুষের মতো।'

যাহোক, এত বিপুল সংখ্যক হিন্দুস্তানীকে ফাঁসি দেওয়া হয় যা বর্ণনার অতীত। (এলাহাবাদ থেকে কানপুরে আসার পথে) রাস্তার পাশে ৪২ জনকে ২ দিনে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর ১২ জনকে কেবল এ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয় যে, সৈন্যরা যখন মার্চ করে তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল।

যেখানে সৈন্যরা ঘাঁটি স্থাপন করে, তার আশপাশের গ্রামসমূহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এসব ছিল কানপুরের জুলুমের ঘটনার জবাব এমন বলা ঠিক নয়, কারণ, কানপুরের শয়তানী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এ ভয়ঙ্কর ঘটনার অনেক পরে।

পার্লামেন্টের সংরক্ষিত রেকর্ড পত্রে অদ্যাবধি ভারত সরকারের কাছে সেসব কাগজপত্র সংরক্ষিত রয়েছে। যা থেকে জানা যায় যে, বিদ্রোহ ছাড়াও সাধারণ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধদেরকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল।

দিল্লীতে রক্তপাত অভ্যস্ত সিপাহীরা তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত করার জন্য ফাঁসি দাতা জল্লাদদেরকে ঘুষ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তারা ফাঁসির কাষ্ঠে অপরাধীদেরকে আরো বেশি সময় ঝুলিয়ে রাখে। যাতে করে লাশের ছটফট করার হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করে (তাদের ভাষায় নর্তক বলা হয়) নিজেদের রক্ত পিপাসু মনকে আরো তৃপ্ত ও তুষ্ট করতে পারে। ঝাঝরের নবাব সাহেবের প্রাণ বের হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি : কানপুরের ঘটনার পূর্বেই বেনারস এবং এলাহাবাদে একটা উপলক্ষ্যে কয়েকজন শিশুকে কেবল এজন্যই ফাঁসি দেওয়া হয় যে, তারা কৌতুক করে বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে বাজারে সমাবেশ করেছিল। মৃত্যুদণ্ড দানকারী আদালতের একজন অফিসার চক্ষুবুজে কমান্ডিং অফিসারের নিকট গমন করে এসব নাবালক শিশুদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের ফাঁসির দণ্ড মওকুফ করার আবেদন জানান। কিন্তু তাদের সে আবেদনে কোন কাজ হয়নি।

এ প্রসঙ্গে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যাবে, যেখানে এ ধরণের লোক দেখানো আদালতেও প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। বরং নিরাপরাধ লোকদেরকে অকাতরে হত্যা করা হয়। ফাঁসি দেয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের দল গঠন করা হয়। এসন স্বেচ্ছাসেবীর দল তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গ্রাম গঞ্জে সফর করে। অথচ তখন তাদের কাছে ফাঁসি দানের সমস্ত উপকরণ ছিল না এবং ফাঁসি কিভাবে দিতে হয় তাও তাদের ভালভাবে জানা ছিল না। তাদের মধ্যে একজন শরীফ লোক তার গৌরবজনক সাফল্য গর্বের সাথে প্রচার করে বলে, 'আমরা ফাঁসি দেয়ার সময় সাধারণত: আম গাছ এবং হাতী ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতির পিঠে বসিয়ে গাছের নিচে যেতাম এবং উপর থেকে রশি টাঙ্গিয়ে হাতীকে তাড়াতাম। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছটফট করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় ইংরেজী ৮ এর মতো রূপ ধারণ করতো।'

লক্ষ্ণৌ অধিকার করার পর হত্যা ও লুটতরাজ চালানো হয়। যে কোন হিন্দুস্তানীকেই নির্বিচারে হত্যা করা হয় - তা সে সিপাই হোক অথবা অযোধ্যার পাড়া গাঁয়ের অধিবাসী হোক। এমনকি তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও বোধ করা হয়নি। কেবল কালো রং হওয়াকেই অপরাধী হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে ধরে নেওয়া হত এবং সে ব্যক্তিকে বধ করার জন্য একটি রশি ও একটি গাছের ডালকেই যথেষ্ট মনে করা হত।

শূল : দিল্লীসহ অন্যান্য স্থানে শহরের উঁচু জায়গায় চতুর্থকোন শূল স্থাপন করা হয়। সেখানে প্রতিদিন পাঁচ ছয়জনকে চড়ানো হতো এবং ইংরেজ অফিসাররা প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট পুড়িয়ে ঐসব লাশের দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হতেন।

জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে দাগানো বা পুড়িয়ে মারা : মি: নিকলসন, মি: এডওয়ার্ডসকে লেখা এক পত্রে বলেন : '.. দিল্লিতে ইংরেজ নারী ও শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এমন আইন পাশ করতে হবে, যে আইন অনুযায়ী আমরা তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে পারি, জীবন্ত অবস্থায় তাদের চামড়া তুলে ফেলতে পারি কিংবা জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে তাদেরকে শেষ করতে পারি। এমন জালিমদেরকে কেবল ফাঁসি দিয়ে ধ্বংস করার ধারণা আমাকে পাগল করে তুলে। আমার আন্তরিক কামনা হচ্ছে এই যে, আমি যদি বিশ্বের এমন কোন অখ্যাত প্রান্তে চলে যেতে পারতাম, যেখানে কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিশোধ গ্রহণ করে মনের ঝাল মেটাবার পূর্ণ অধিকার আমার থাকে।'

নিকলসনকে তার আকাঙ্খা পূরণ করতে গিয়ে খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি। মি: মুয়েরী অমসন কোন কোন বন্দিদের করুণ ইতিহাস স্যার হেনরী কটনকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় :

'...সন্ধ্যায় একজন শিখ আর্দালী আমার তাঁবুতে এসে সালাম জানিয়ে বলে, বন্দিদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে তা দেখতে হয়তো আপনি পছন্দ করবেন। আমি তখনই লাফ দিয়ে কয়েদীদের ক্যাম্পে প্রবেশ করি। সেখানে হতভাগ্য মুসলমানদেরকে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় দেখতে পাই। পিঠে মশক বাঁধা রয়েছে এবং তারা উলঙ্গ মাটির উপর পড়ে আছে। তামা পুড়ে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটাদেহ দাগানো হয়েছে। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে আমার নিজের পিস্তল দ্বারা তাদের জীবনের অবসান ঘটানোকে আমি তাদের জন্য সমীচীন মনে করি।'

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা : হতভাগা কয়েদীর জ্বলন্ত দেহ থেকে পঁচা দুর্গন্ধ বের হয়ে আশে পাশের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য গর্ব করা হতো, তখনই এই ভয়ানক দৃশ্য দেখা যেত যে, মানুষকে পাশবিক পন্থায় জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আর শিখ ও ইউরোপীয়রা অতি শান্ত-শিষ্টভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য অবলোকন করছে, যেন এটা কোন চিত্ত বিনোদনের বিষয়বস্তু আর কি।

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা মিঃ রাসেলও এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'...কিছুদিন পর আমি ঐ ব্যক্তির জ্বলন্ত হাঁড় ময়দানে পড়ে থাকতে দেখেছি।'

এডওয়ার্ড টমসন লিখেন : '...মস্তিষ্কের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পড়ে বিধায় কখনো কখনো মানুষ নবাব মঈনুদ্দীন হাসানের ঐ বর্ণনা, যাতে ভারতীয় হৃদয় বিদারক শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, পড়তে বা শুনতেও প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সরকারি কাগজ পত্রে এখনো এমন সব দলীল দস্তাবেজ সংরক্ষিত রয়েছে, যা দেখে জানা যায় যে, ইংরেজরা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এসব শাস্তি প্রয়োগ করতো। একজন ইংরেজ অফিসারের চিঠি এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। যাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে, ঐ মর্মবিদারী শাস্তি ধারার নিন্দা করে বলা হয়েছে, আর কতকাল মানব জাতিকে এভাবে নির্মম পন্থায় গরম শলাকায় ছটফট করতে ও ভাজি হতে দেখার কষ্ট বরদাস্ত করতে হবে।'

শূকরের খালে সেলাই করে পোড়ানো : টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক মিঃ ডি সেন লিখেছেন :

'...জীবন্ত মুসলমানকে শূকরের খালে জড়িয়ে সেলাই করা, ফাঁসির পূর্বে তাদের দেহে শূকরের চর্বি মাখিয়ে তাদেরকে জীবন্ত আগুনে ফেলা বা তাদেরকে একে অন্যের সাথে কুকর্ম করতে বাধ্য করা - দুনিয়ার কোন সভ্যতাই এমন ঘৃণ্য ও প্রতিশোধমূলক আচরণের অনুমতি দেয় না। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এসব আচরণ খৃস্টানদের নামে এক কলঙ্কময় কাণ্ড। একদিন আমাদেরকেও এগুলোর কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

কামানে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া : লর্ড রবার্টস তার মায়ের কাছে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন :

'...আমি পায়ে হেঁটে পেশোয়ার থেকে ঝিলাম পর্যন্ত সফর করেছি। পথে কিছু কাজও হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের নিকট থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানো। কামানে বেঁধে উড়িয়ে দেয়ার যে পন্থা আমরা অবলম্বন করেছি, লোকদের উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েছে। অর্থাৎ মানুষের মনে আমাদের ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে, যদিও শাস্তির এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।

যুদ্ধ অবসানের পর অনেক বন্দিকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। তারা এ ধরণের মৃত্যুর তেমন কোন পরোয়া করে না একথা জানার পর তাদের চার জনকে সামরিক আদালতের নির্দেশে কামানের সাথে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয়। একদিন একটা তোপের বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠি। এর সঙ্গে একটা অবর্ণনীয় ক্ষীণ ও ভয়ানক চিৎকারের শব্দও শুনা যায়। জিজ্ঞাসা করলে জনৈক অফিসার আমাদের জানান, এটা ছিল অতি মর্মবিদারী দৃশ্য। অর্থাৎ ঘটনা চক্রে একটি কামানে বেশি বারুদ ভরা হয়েছিল।

কামান চালালে হতভাগ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মাংশ টুকরা টুকরা হয়ে আকাশে উড়ে যায় এবং দর্শকদের উপর রক্তের ছিটা এবং গোস্তের টুকরা পতিত হয়। আর তার মাথা জনৈক পথচারীর উপর এমন সজোরে পড়ে যে, সেও তাতে আহত হয়।'

ক্ষুধার্ত রেখে বা গলা টিপে হত্যা করা : মিঃ কুপার লিখেন :

'...প্রথম আগস্ট ছিল বকরে ঈদের দিন। এ কারণে মুসলিম সওয়ারদেরকে সেখান থেকে পৃথক করার জন্য একটা ভালো ওজর পাওয়া যায়। তদানুযায়ী তাদেরকে উৎসব পালন করার জন্য অমৃতসর প্রেরণ করা হয়। কেবল একজন খৃস্টান অফিসার সেখানে একা থেকে যায় নানা রকম কুরবানী করার জন্য বিশ্বস্ত শিখদের সহযোগিতায়। উক্ত অফিসার নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করছিলেন। এখন মুস্কিল দাঁড়িয়েছে এই যে, লাশের দুর্গন্ধ যাতে ছড়াতে না পারে, সেজন্য তা পুঁতে ফেলা দরকার, কিন্তু তা কিভাবে করা হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে নিকটেই একটা বিরান কূপ পাওয়া যায়। দশ জনের এক একটি দলকে গুলি করে মারার পর যখন নিহত সিপাহীর সংখ্যা একশ পঞ্চাশে দাঁড়ায়, তখন হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ঘুরে পড়ে যায়। হত্যাকারীদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে বৃদ্ধ সিপাহী। এ কারনে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাকে সামান্য বিরতি দেওয়া হয়। অতঃপর পুনরায় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। যখন দুশো সাঁইত্রিশে দাঁড়ায় তখন একজন অফিসার জানান যে, অন্যান্য বিদ্রোহীরা বুর্জ থেকে থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করেছে। কয়েক ঘন্টা আগে তাদেরকে সামরিকভাবে এ বুর্জে আটক রাখা হয়। কিন্তু বুর্জের দরজা খুললে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ থেকে হলওয়েল ব্ল্যাক হোলের স্মৃতি ভেসে আসে। অর্থাৎ ৪৫ জনের মৃত দেহ পাওয়া যায় - ভয়, ভীতি, গরম, সফরের কষ্ট এবং দম বন্ধ হয়ে ছটফট করে তাদের মৃত্যু হয়েছে। এসব মৃত বা অর্ধ-মৃত লাশগুলো গ্রামের ডোমদের দ্বারা নিকটস্থ বিরান কূপে ফেলে দেওয়া হয়।'

মজার ব্যাপার এই যে, জেনারেল লরেন্স এবং রবার্ট মন্টেগোমারী এ কাজের জন্য কুপারকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখেন। (তাসভীর কা দুসরা রুখ দ্রঃ)

গণহত্যা ও জনপদে অগ্নি সংযোগ : ৩১শে জানুয়ারী ১৮৫৭ সালে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের এজলাসের পক্ষ থেকে হিন্দুস্তানে এই মর্মে নির্দেশ জারী করা হয় যে, অনির্ধারিতভাবে গ্রামে অগ্নি সংযোগ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে হবে। আর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন নিরস্ত্র লোকদেরকে সেনাবাহিনীর পলাতক সিপাহী মনে করে কখনো শাস্তি না দেন। অনেক সিভিল আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ইখতিয়ার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এসবের অপব্যবহার করা হচ্ছিলো।

মেজর রিনাড যখন কানপুরের আটকে পরা লোকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছিল, তখন জেনারেল নেইল-এর পক্ষ থেকে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় :

'...অপরাধমূলক আচরনের দায়ে সমূলে বিনাশ করার নিমিত্তে কোন কোন গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সব গ্রামের সকল পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করতে হবে। বিদ্রোহী রেজিমেন্টের যেসব সিপাহী নিজেদের চালচলন সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, তাদেরকে অবিলম্বে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে হবে। ফতেহপুর কসবার গোটা জনপদকে ঘেরাও করে হত্যা করতে হবে। বিদ্রোহীদের সকল গোয়েন্দাকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দিতে হবে এবং তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সবচেয়ে বড়ো ইমারতের উপর ঝুলিয়ে রাখতে হবে।'

মিঃ রাসেল তার এক দীর্ঘ বিবরণীতে বলেন :

'...বিদ্রোহীরা আশ্রয় নিয়েছিল কেবল এ অপরাধে গোটা জেলা ধ্বংস করা মানবতা ও ইনসাফের পরিপন্থী।'

পেনের ওয়ালপুল লিখেছেন :

'...দিল্লী বিজয়ের পর দুর্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যরা যে লুটতরাজ চালায়, তা দুর্ধর্ষ নাদির শাহের লুট তরাজকেও হার মানায়। প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসির ঘর বানানো হয় এবং দৈনিক ৫/৬ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

ওয়ালপুলের বর্ণনামতে তিন হাজার লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ২৯ জন ছিল শাহী পরিবারের। কায়সারুত তাওয়ারীখের রচয়িতা লিখেছেন যে, ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। সেখানে একাধারে সাত দিন পর্যন্ত গণহত্যা অব্যাহত ছিল।

...শেষ কয়েক ছত্র ছাড়া যে সমস্ত ঘটনা আপনি পাঠ করলেন, তা গৃহীত হয়েছে '১৮৫৭ সালের বিপ্লব : তাসভীর কা দোসরা রুখ' থেকে অর্থাৎ Edward John Thompson-এর গ্রন্থ The Other Side of the Medal থেকে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক দাবী করেন যে, '...এ গ্রন্থে যেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা একটিও কোন হিন্দুস্তানীর কলম বা মুখ নিঃসৃত নয়। এংলো ইন্ডিয়ান পত্র-পত্রিকা বা তার চেয়েও নিম্নমানের, আমাদের দেশের পত্র পত্রিকার কোন উক্তিই আমি খুব সামান্যই উদ্ধৃত করেছি। উপরন্তু এমন অনেক ঘটনার কথা আমি উদ্ধৃতই করিনি, যা থেকে আরো কঠোরতা পাষাণ হৃদয়তা প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে আপনাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, লর্ড রবার্টসের মতে এ ধরণের সকল পাশবিকতার উদ্দেশ্য ছিল :

'...এ বদমাশ মুসলমানদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহর ইচ্ছায় কেবল ইংরেজরাই হিন্দুস্তান শাসন করবে।'

এ বর্বরতা, নৃশংসতা ও পাশবিকতার পরিণতি ইংরেজদের জন্য অত্যন্ত শুভ হয়েছিল। মুসলমানরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে বিসমিল্লাহর পর এ বাক্যটি লেখা থাকত - রাজনীতির সাথে এ প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক থাকবে না।"[২]

তিন

"...The Emperor surrendered himself on the condition that his life, and those of Zinat Mhal and Jawan Bakht, would be spared. Hodson put him in a bullock-cart and sent him back to the city where he was to remain as a prisoner until his fate was decided. In the case of the Princes' Hodson's treatment was more savage. Bosworth Smith narrates the murder of the Princes in these words :

'...And if a tiger ever felt a pang of pity for the helpless prey beneath its talons, then, perhaps, Hodson would have been willing to restrain his impatience for the blood of his victims fallen from so high an estate, till at least they had gone through the formalities of a drumhead court martial. Then, but only then .....' (Smith Bosworht/Life of Lord Lawrence)

In his negotiations he was careful enough not to have a stipulation in regard to the lives of the Princes. They were deprived of their arms and dispatched in bullock-carts to delhi. When they reached the walls of the city, he stopped the Princes and shot them one after the other. 'It was a stupid, cold-blooded, three-fold murder.' Bahadur Shah was tried for treason and found guilty by a court of British officers: he was sent as prisoner to Rangoon where he died in 1862.

The British took possession of Delhi on 20 September, 1857, when the real agony of the people of that city began. According to Mrs. Saunders, wife of the British Commissioner of Delhi, 'For several days after the assault every native that could be found was killed by the soldiers, women and children spared.' Saunders himself wrote, 'The troops were completely disorganized and demoralized by the immense amount of plunder which fell into their hands and the quantity of liquor which they managed to discover in the shops of the European merchants of Delhi.' The initial massacres which lasted for some days,

২. সূত্র : উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (মূল : উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি/মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ)/অনু : মাওলানা মাযহারুল হক ও মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন - আগস্ট, ২০০৪। পৃ. ৪৭২-৪৮৬

'followed a more systematic reign of terror', which according to Dr. Percival Spear 'lasted for several week,' and really seemed to have continued for some months. The entire population of Delhi which survived these massacres was driven out of the city. Mrs. Saunders writes on 25 October, 'Every house in the city was desolated and many of them injured ...the inhabitants of this huge places seven miles round are dying daily of starvation and want of shelter. The Prize Agents are digging for treasure in the houses. The entire population of Delhi had to spend this winter either in the open or in hastily prepared shelter.' In December a European observer reported that the search and plunder still continued. 'He visited the outlying bands of fugitives from the city and found a very serious share of misery and sickness among the lower orders, the infirm and those with large families.'

During these months the city was subjected to a loot the like of which it had never suffered in its dismal history during the eighteenth century. The massacres of Nadir Shah, the plundering raid of Marathas and Jats had lasted for some hours or at the utmost for some days,. But in 1857, the entire civil population was driven out and in the absence of the owners the houses were broken into, their oors were dug up and their treasures removed or destroyed.

These looters were given the official title, Prize Agents, and the administration was directly responsible for what was happening, though much of the plunder did not find its way to the official godowns. The city was under martial law and trials started which in the circumstances could not be anything except a mockery of justice.

Next to suffer were the city buildings. The principal mosque were occupied by troops, and there was a general discussion in the Anglo-Indian press regarding their fate. There was a proposal to sell the Jami Masjid and then to use it as a barrack for the main guard of European troops., as in the opinion of some officers at Delhi it could 'never be allowed to remain in the hands of the Muslim population.' It was returned to Muslims only after five years. Some parts of the Fathpuri Masjid, the second largest in the city, remained in non-Muslim hands till 1875. The beautiful Zinat-ul-Masajid, built by a daughter of Alamgir I. was not given back to Muslims till Lord Curzon's time.

The fate of the Imperial Palace was much worse. Perhaps an even bigger loss was the destruction and dispersal of the Imperial Library, where rare and illuminated works were being collected since the days of Babar and Humayun,. Its contents were so varied and comprehensive that religious teachers like Shah Abdul Aziz, and Maulana Nazir Hussain Muhaddis are stated to have utilized it for their works. This library was looted and scattered to all corners of the Earth so that we find some leaves of one Imperial Album at Patna, a few in Berlin, some more Bibliotheque Nationale of Paris, though of course, the major portion is in public and private libraries in England.

The Hindu population was allowed to return to the city in January, 1858, and Muslims a few months later, but the destruction of buildings continued for long thereafter. The large area between the Jami Masjid and the Fort, originally had the pricipal residential quarter of the Mughal nobility, and the larg Akbar-abadi Masjid, where Shah Abdul Qadir used to teach. All these buildings were razed to the ground and their sites ploughed up; the area was converted into a parade ground."[৪]

---

[৪]. M. N. Safa/The War of Independence, Source : A History of the Freedom Movement : 1831-1905 (Vol. II/Part I)/Pakistan Histor[illegible]

দ্বিতীয় পর্ব

ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম শিক্ষা

"...১২০৪ সালে (মতান্তরে ১২০১-০২) বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর এদেশের শাসকবৃন্দ রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষার প্রতিও অধিক গুরুত্বারোপ করেন। ফলে মুসলিম শাসিত বাংলার অধিবাসীগণ শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনকে ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের উপায়স্বরূপ বিবেচনা করত। দ্বিতীয়ত জ্ঞান অনুশীলন করাকে ঐ সময়ে সামাজিক মর্যাদার সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হত। একজন বিদ্বান ব্যক্তি সমাজে পরিবারের সম্মান বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। তৃতীয়তঃ শিক্ষা পার্থিব উন্নতির পথকেও উন্মুক্ত করত। ফলে মুসলিম যুবকদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল। চতুর্থত সেকালে বাংলার মুসলিম সমাজ অবস্থাপন্ন ও সচ্ছল থাকায় অভিভাবকগণ তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে পারতেন। পঞ্চমতঃ শাসকবর্গ, অভিজাত ও বিত্তবান ব্যক্তিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রে অতি প্রশংসনীয় কার্য হিসেবে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা স্থাপন করতেন। সুতরাং সে যুগে এমন রাজপুরুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল যারা কোনো না কোনোভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনের সাথে জড়িত ছিলেন না। বাংলার মুসলিম শাসক শ্রেণী কলা, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

...খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত (১৭৫৭) প্রায় ১০২ জন মুসলিম শাসক কিংবা রাজা বাংলা শাসন করেন। এরা কেউ আফগান, কেউবা তুর্কি, মুঘল, পারসিক বা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তারা সকলেই তাদের রাজনৈতিক মতবাদের সাথে এদেশে বহন করেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এ সকল মুসলিম শাসকগণ সর্বউপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তার মধ্যে সুলতানি আমলের (১২০৪-১৫৭৫) প্রথম শাসক বখতিয়ার খলজীসহ আলী মর্দান খলজী, সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ, জালাল-উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ, ইলিয়াস শাহ, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, রুকনদ্দীন বারবক শাহ প্রমুখ সুলতানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলার মুঘল শাসনামল (১৫৭৬-১৭৫৭) ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল যুগ। মুঘল সম্রাটগণ, যুবরাজ ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজকর্মচারীবৃন্দ উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাদের দরবারসমূহ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজদরবারের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের আলোক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোকে আলোকিত করেছিল। এক্ষেত্রে বাংলায় যে সকল সুবাদার, দেওয়ান, বখশি, কাজি, ফৌজদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ আগমন করেন তারা সকলেই শিক্ষা ও সুরুচির ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা এবং পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খান খানান মুনিম খান, খান জাহান, রাজা মানসিংহ, ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহিম খান, ফেতহজঙ্গ, শাহজাদা শুজা, মিরজুমলা, শায়েস্তা খান, যুবরাজ মোহাম্মদ আজ, আজিম উশশান ও অন্যান্য সুবাদারগণ তাদের শিক্ষা

ও সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতের উত্তরাঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, কারিগর ও তাদের ন্যায় অন্যান্যদের অধিক হারে বাংলা আগমনের ফলে এখানের বুদ্ধিদীপ্ত জীবনে এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হয়।

মুঘল সুবাদারগণের আমলে বিকশিত শিক্ষার ঐতিহ্য নবাবদের সময়েও অব্যাহত থাকে। বাংলার নবাবগণ তাদের দরবার ও প্রশাসন বিভাগে বিদ্বান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ সময়ে সম্রাটদের দরবারে ও উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দুর্যোগের কারণে বহু পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতায় বিরক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবদের অধীনে আশ্রয় ও সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, নবাব মুর্শিদকুলি খান ২৫০০ বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। বাংলার প্রত্যেক পরগণার কসবা বা গ্রামে মাদ্রাসা, মসজিদ ও মক্তব নির্মাণ করা হত। সে সময়ের শিক্ষা ছিল মূলত মসজিদকেন্দ্রিক। সমগ্র দেশে এমন কোন মসজিদ ছিল না যাকে কেন্দ্র করে কোন মক্তব বা মাদ্রাসা গড়ে উঠে নি। তাছাড়া, ইমামবাড়া, সুফীদের খানকা, উলেমা ও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। নবাব আলীবর্দী খানও একজন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সমসাময়িক একজন ঐতিহাসিকের মতে, 'তার সময়ের কোন শাসকই বাগ্মিতায় আলীবর্দীর সমকক্ষ ছিলেন না।' তিনি তার দরবারে বিপুল সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেন। এর ফলে মুর্শিদাবাদ সে যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। আলীবর্দীর দরবারে খ্যাতনামা আলেম ও পণ্ডিতদের মধ্যে যায়ির হোসেন খান, তকী কুলি খান, মৌলবি মুহম্মদ নাসিরের পুত্র আলী ইব্রাহিম খান, হাজি মুহম্মদ খান, মীর মুহাম্মদ আলী ফাজিল প্রমুখের নাম ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে আলী ফাজিল তার ইসলামি জ্ঞান, দর্শন, আইন বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন। সিয়ারুল মুতাখখেরীনের অনুবাদক হাজি মুস্তফার মতে, 'মুহাম্মদ আলী ফাজিলের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল এবং এতে প্রায় দু হাজার গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল।'

...শিক্ষার মাধ্যম ছিল সেকালের রাজভাষা ফারসি। তবে উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা সমধিক স্থান দখল করেছিল। ইসলামি বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্তে ফারসি ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের বদলে আরবিতে লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ্যসূচি হিসেবে অনুমোদন লাভ করেছিল। এছাড়া, সতের শতকের দিকে এদেশে উর্দু ভাষার উৎপত্তি ঘটে। উর্দুকে আরবি-ফারসির প্রসূতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অভিজাত মুসলিম এবং শাসক শ্রেণীর মৌখিক ভাষা হিসেবে উর্দু আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ফারসি ছিল প্রিয় মাধ্যম। ফারসির প্রতি মুসলমানদের অনুরক্তির নানা কারণ ছিল। প্রথমত: ফারসি ভাষায় মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত ছিল; দ্বিতীয়ত অফিস-আদালতের তথা সরকারি ভাষা ছিল ফারসি যা মুসলমানেরা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে চর্চা করতেন। এছাড়া, সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের রুচিশীল সাহিত্যের ভাষা ছিল ফারসি এবং তাদের বিশ্বাস ছিল অন্য কোনো ভাষা কিংবা শিক্ষা পদ্ধতি এর পরিপূরক হতে পারে না। এই ভাষায় সহজ দক্ষতা থাকায় তাদের সন্তান-সন্ততিও ফারসির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সূচনা করত।

...মুসলিম আমলের শিক্ষার উচ্চ মানের প্রশংসা করে ইংরেজ পণ্ডিত জেনারেল স্লিম্যান মন্তব্য করেন : '...ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যে রকম অগ্রগতি হয়েছে, পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সে রকম প্রসার হয়েছে। যে ব্যক্তি মাসে বিশ টাকা বেতনের চাকরি করেন, তিনিও তার সন্তানকে প্রধানমন্ত্রীর সন্তানের সমতুল্য শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তারা আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেন, যেভাবে আমাদের কলেজে যুবকেরা গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র শিক্ষা পেয়ে থাকে। সাত বছরকাল অধ্যয়নের পর একজন মুসলমান যুবক মাথায় পাগড়ি পরিধান করে এবং অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা নব্য যুবকের মতই জ্ঞানের সেই সকল সংশ্লিষ্ট শাখায় পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সে সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও ইবনে সিনা সম্বন্ধে অনর্গল আলোচনা করতে পারে।'

সে সময়ের শিক্ষকগণ ছিলেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। উক্ত শিক্ষার পণ্ডিতগণ সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করতেন। মৌলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, এহিয়া মানেরী, শেখ আলাউল হক, নূর কুতুব আলম রাষ্ট্র ও সমাজে যাতে কোরআন সুন্নাহর বিধি-নিষেধগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যতীত দেশের সকল ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ও মক্তবের শিক্ষকগণ ছাত্রদের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সেবা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। কারণ শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রদানকে তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করতেন এবং ছাত্রদেরকে জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যোৎসাহী তাদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তারা প্রায় বিনা বেতনেই ছাত্রদের নিজগৃহে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র-শিক্ষক সমবায়ের সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। তবে শিক্ষকগণ তাদের শিক্ষা সেবার কাজের জন্য সুলতান বা শাসক কিংবা জমিদারগণের পক্ষ থেকে 'মদদ-ই-মাশ' হিসেবে ভূ-সম্পত্তি লাভ করতেন। কিন্তু তারা শিক্ষা বা গবেষণার কাজে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'মদদ-ই-মাশ' তাদের যেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করেছিল, কাজেও তাদের স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়াও শিক্ষকদের অনেকে ছাত্রদের নিকট থেকে নানা উপঢৌকন লাভ করতেন।

ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকই ছিলেন প্রধানতম বিচারক। ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই তিনি ছাত্রকে সার্টিফিকেট প্রদান করতেন। তখন কোনো রাষ্ট্র বা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিক্ষার্থীরা জানত যে, শিক্ষকেরাই তাদের মূল্য যাচাই করার একমাত্র কর্তা। সুতরাং এই শিক্ষায় পরীক্ষা পাশের জন্য বাছাই করে পড়ার বা অন্য কথায় ফাঁকি দেয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। বাংলার মুসলমানদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রশংসা করে এ. এম. ই. সি. বেইলি বলেন: 'They possessed a system of education which, we have abolished, was capable of affording a high degree of intellectual training and polish, was founded on principal not wholly unsound though presented in an antiquated form, which was infinitely superior to any other System of education than existing in India ...a system which secured to them an intellectual as well as a material supremacy.'

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর থেকে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং বাংলায় ফারসির পরিবর্তে ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা ও দেশিয় ভাষার স্থানলাভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলিম বাংলার জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'এই যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন এদেশের গতানুগতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এক রাজার প্রস্থান ও অন্য রাজার আগমনই নির্দেশ করেনি, এতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রায় হাজার বছরের অতীত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতির একটা পরিবর্তন সূচিত হয়।' ইংরেজ প্রধান ক্লাইভ ও তার সহচরগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য একের পর এক বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাতেই এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে এসেছে নানাভাবের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সমগ্র বাংলার মুসলিম মানসে নেমে আসে দারুণ হতাশা, দুঃখ, দুর্দশা। পলাশীর পরাজয় কেড়ে নেয় তাদের প্রাচুর্য। দীর্ঘকালের আধিপত্য হারিয়ে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে পড়েন যা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বাংলার শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকাকালীন সময়ে তারা সামরিক বাহিনীতে, রাজস্ব সংগ্রহের কাজে, বিচার ও শাসন বিভাগের চাকরিতে এবং আইন ব্যবসায় বিপুল প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। বস্তুত এগুলোই ছিল বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের প্রধান অবলম্বন, এবং তাদের সাহায্যের উপরই মুসলিম শিক্ষার উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করে। মুসলিম শাসকদের ক্ষমতার প্রধান উৎস ছিল তাদের সামরিক বাহিনী। কিন্তু কোম্পানীর শাসনের সূচনায় প্রথমেই বাংলার মুসলমানগণ সামরিক বাহিনীতে তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন।

পলাশী যুদ্ধোত্তর নবাব ও ইংরেজ ক্রীড়নক মীরজাফর যে ৮০ হাজার সৈনিক বরখাস্ত করেন তার অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) পর নবাব নাজিমুদ্দৌলা ইংরেজদের নির্দেশে সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে অল্প সংখ্যক সৈন্য ব্যবহারেরই অনুমতি পান। ফলে শত শত মুসলিম চাকরি হারান। সেনা প্রধানের পদগুলো থেকে মুসলমানদেরকে অপসারণ করে ইংরেজদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং নিম্নস্তরের সৈনিকদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই মুসলিম বজায় থাকে।

মুসলিম আমলে প্রজাদের জমির মালিকানা স্বত্ব ছিল। তারা নির্দিষ্ট খাজনা বা কর প্রদানের মাধ্যমে বংশানুক্রমে জমি ভোগদখল করতেন। সরকার ও প্রজার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন মুসলিম শাসকদের রাজস্ব ব্যবস্থার আদর্শ ছিল। প্রজাদের দেয়কৃত ভূমি রাজস্ব ছিল তখন মুসলিম সরকারের অর্থ আয়ের বড় উৎস। এর মাধ্যমে অভিজাত মুসলিমগণ তাদের সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মুসলিম শাসকগণ রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দুদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তবে অর্থ-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ মুসলমানদের হাতে ছিল।

১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর বাণিজ্যের মত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও তাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় টাকা। অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও কোম্পানি সরাসরি গ্রহণ করেনি। বাংলায় মুহাম্মদ রেজা খান এবং বিহারে সেতাব রায়কে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের কার্য তদারক করতে ইংরেজ এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়। কি করে বেশি কর আদায় করা যায় সে লক্ষ্যে কোম্পানি প্রতিবছর আমিন, ইজারাদার, ইত্যাদি নামে অসংখ্য দেশিয় কর্মচারী নিয়োগ করে। ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি ওয়ারেন হেস্টিংসের মতে, 'এদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিজ দেশে পাচার করাই ছিল বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের অন্যতম লক্ষ্য।' ফলে দেশিয় ইজারাদারদের মধ্যে নিয়োগ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রজাদের উপর খাজনার পরিমাণ বার বার বৃদ্ধি করা হয়।

উল্লেখ্য, কোম্পানি নিয়োগকৃত দেশিয় ইজারাদার বা খাজনা আদায়কারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু বেনিয়া ব্যবসায়ীগণ। দেওয়ানি লাভের প্রথম বৎসরেই কোম্পানি বাংলা থেকে ১৬,৮১,৪২৭ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করে। জমির খাজনা ছাড়াও আরও নানা রকম কর প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করা হত। এর ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রায়ত বা প্রজাগণ একই শোষণ, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার হন। কোম্পানির এ নির্মম শোষণের ফলেই ১৭৬৯-৭০ সালে দেশজুড়ে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়েও রাজস্ব আদায়ে কোনো রকম সহানুভূতি দেখানো হয়নি। যারা দুর্ভিক্ষে মারা যায় বা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় তাদের খাজনাও যারা বেঁচে ছিল তাদের নিকট থেকে আদায় করা হয়। দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং এক তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে ও ঘনবসতি এলাকা জঙ্গলে পরিণত হয়। ফলে দেশের ভূমি রাজস্ব তথা অর্থনৈতিক অবস্থায় এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

এ অবস্থায় বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রত্যেক জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করেন এবং সকল মুসলিম কর্মকর্তাদের অপসারণ করেন। তার প্রচলিত ব্যবস্থা 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত ছিল। ১৭৭১ সালে 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' শেষ হলে 'একসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এতেও পুরাতন জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং প্রজাগণ ইংরেজ ঠিকাদারদের দৌরাত্ম্যে অশেষ দুর্দশা ভোগ করেন। অবশেষে, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় একটা স্থায়ী পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বহু পুরাতন মুসলিম জমিদার তাদের জমিদারি হারিয়ে ফেলেন। কারণ এই আইনের বলে নির্দিষ্ট সময়ে জমিদারির খাজনা রাজকোষে জমা দিতে না পারলে সে জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। তখন বিত্তশালীরা জমিদারি নিলামে কিনে নিতেন। পুরানো হিন্দু জমিদারগণও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে সম্প্রদায়গতভাবে তারা জমিদারি হারাননি। কারণ যারা জমিদারি কিনতেন তারা ছিলেন অধিকাংশই কলকাতার নব্য বিত্তবান হিন্দু। তারা ইতিমধ্যে কোম্পানির দেওয়ানি, বেনিয়াগিরি, মুৎসুদ্দীগিরি, দালালি, গোমস্তাগিরি, পোদ্দারি, মহাজনি করে প্রচুর নগদ টাকার মালিক হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। মুসলিম জমিদারি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চি হস্তগত হয়। এছাড়া, কলকাতা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী এসব হিন্দু জমিদার পরে যে সব অ হাতে জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করেন তাদেরও অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু ভদ্রলোক। এসব ' রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা ছাড়াও জমিদারদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য জবরদস্তি নজরানা ও সেলামির মত কিছু অতিরিক্ত কর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতেন, যাদের সংখ্যা অংশ ছিলেন মুসলিম কৃষক। প্রকৃতপক্ষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের প হিন্দুদের ভেতর থেকে একটি নতুন জমিদার বা অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করা। কোম্পানি সরকার সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেন এবং এ ব্যবস্থাকে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিরাপদ করেন। ব্রিটিশ সিভিলিয়ান বি. জেমস ও কেনেলি মন্তব্য করেন, 'যে সকল হিন্দু কর্মচারী পূর্বে ব বিভাগের সামান্য পদে ছিল, এই বন্দোবস্তে তারা জমিদার পদে উন্নীত হয়। তাদেরকে জমির মালিক অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ প্রদান করা হয়, অথচ মুসলিমরা নিজেদের শাসনকালে সুযোগ-সুবিধাগুলো একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে।'

মুসলিম জমিদারদের পতন স্বাভাবিকভাবে দেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। জমিদারদের সাহা অভাবে মুসলমানদের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিচার বিভাগে কিছুকাল মুসলমানদের প্রা ছিল বটে কিন্তু ক্রমে সেখানেও ইংরেজদের হাত পড়ে এবং উচ্চ পদগুলো তারা গ্রাস করেন। প্রথমে স দেওয়ানি আদালত এবং পরে সদর নিজামত আদালত কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়: সদর দেওয় আদালতের সভাপতি হন স্বয়ং গভর্নর। জেলা দেওয়ানি আদালতে বিচারের ভার ইংরেজ জেলা কালেক্টর নিকট হস্তান্তরিত হয়। তবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে কাজি, আমিন, দারোগা, মুফতি, মু প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলিম কর্মচারীর প্রভাব আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই স মুসলিম কর্মচারীর ক্ষমতা ও আর্থিক সুবিধা হ্রাস করেন। অন্যদিকে, লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে রে খানের মৃত্যুর পর মুসলমানদের জন্য 'নায়েবে-নাজিম'-এর পদটিও বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের অধিকারী এক শ্রেণীর ভূমি মালিক ছিলেন। সমাজে উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও গুণী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতে মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, দরগা নির্মাণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন এমনকি নিঃস্ব ভিখারী ও মুসাফিরের জন লাখেরাজ দানস্বত্ব ছিল। মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি এরূপ ২৭ প্রকার ভোগদখলকা নাম বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে সাত প্রকার হিন্দু সম্প্রদায় ও বাকী পনের প্রকার লাখেরাজ সম্পত্তি মুসলমানেরা ভোগ করতেন। তার মধ্যে 'আয়মা' ও 'মদদ-ই-মাশ' নামে লাখেরাজ সম্পত্তির আ মাধ্যমে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যয় নির্বাহ করা হত। এছাড়াও অন্যান্য লাখে ভোগকারী ব্যক্তিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু কোম্পানির শাসনভার গ্রহণের পর থে ইংরেজ কর্মকর্তাদের নিষ্কর জমির প্রতি নজর ধাবিত হয়। নিষ্কর জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল এতে বাংলার রাজস্বের এক চতুর্থাংশ ক্ষতি হত।

১৭৯৩ সালে ইংরেজ সরকার এ সকল লাখেরাজ সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে এগুলোর সঠিক পরীক্ষা-নিরী অজুহাতে সকল নিষ্কর জমির দানপত্রের উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু মুস সমাজের অধিকাংশ এ সকল দানপত্র যথাসময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, শত শত বছরের পুর দলিল অনেকের হারিয়ে যায়, কিংবা অনেক মুসলিম সেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন মনে করেননি। অ অনেকের দানপত্র কীটপতঙ্গের আক্রমণেও বিনষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া, সরকারের এই আদেশ জনগণের ম ভালভাবে প্রচার করা হয়নি। এজন্য অনেক লাখেরাজদার সরকারি নির্দেশ জানতে পারেননি। ফলে ইং সরকার নানা আইন প্রবর্তন, বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে, গুপ্তচর নিযুক্ত কর মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত একের পর এক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তা সরকারের কালেক্টরগণ ও বাংলা-বিহারের জমিদারগণ অনেক নিষ্কর জমি নিজেদের করায়ত্ত করেছিলে

উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় ব্রিটিশ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এসব লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে সুবিচার লাভের আশায় ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত আবেদন করেন, কিন্তু এতে তিনি সফল হননি।

অপরদিকে, বাংলার হিন্দুগণ দানপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে তুলনামূলক সতর্কতা অবলম্বন করেন। তবুও লাখেরাজ আইনে হিন্দুরাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু এক শ্রেণীর হিন্দু ভূমিনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পেশা থেকে বিচ্যুত হলেও আরেক শ্রেণীর হিন্দু এসে সে শূন্যতা পূরণ করেছেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এরা শুধু হারিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে অন্য কোন শ্রেণীও এই শূন্যতা পূরণে সক্ষম হননি। লাখেরাজ আইনের ফলে কোনো কোনো জেলার শতকরা ৮৮ জনের নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ফলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সাম্প্রদায়িকভাবে অধঃপতনের প্রশ্নটি শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর ফলে এ সময় পুরানো অভিজাত মুসলিম পরিবারগুলো ধ্বংস হয় এবং তাদের সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোরও অপমৃত্যু ঘটে। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্দশার কথা জানা যায়। বড় বড় জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে বাংলার অনেক জেলায় বিশেষত মুসলিম উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টারের (১৮৪০-১৯০০) মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- 'Hundreds of ancient families were ruined, and the educational system of the Musalmans, which was almost entirely maintained by rent-free grants, received its death-blow.'

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৪ সাল-এই সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে সরকার শিক্ষার উন্নয়নে নানা কমিটি গঠন, আইন প্রবর্তন ও বিভিন্ন প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশে ফারসি শিক্ষার আধিপত্য ক্ষুন্ন করে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আইনগত ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বিশেষত বাংলার হিন্দু সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ছিল লক্ষণীয় বিষয়। হিন্দুগণ ইংরেজির গুরুত্ব বুঝতে পেরে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইংরেজদের স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজের জন্য উপরোক্ত কাল তথা ১৮৩৫ থেকে পরবর্তী তিন দশক ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়।

মুসলমানেরা রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নানা কারণে আর্থ-সামাজিকভাবেও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের অবনতি শুরু হয়। তবুও ফারসি ভাষার জোরে শিক্ষা ও সামাজিকতার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ধরণের টানাপোড়ন অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। কিন্তু ১৮৩৫ সালে ফারসির পরিবর্তে শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি চালু এবং পরে ১৮৩৭ সালে আইন-আদালতেও ইংরেজির প্রবর্তন এবং সেই সাথে ১৮৪৪ সালে চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করলে বাংলার বহু মুসলমান, শিক্ষক, মৌলবি, মুনশি, কাজি তাদের জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন। সরকার অবশ্য ১৮৬২ সাল পর্যন্ত আইন-আদালতে ইংরেজির বিকল্পরূপে প্রাদেশিক তথা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের এতে তেমন কোনো উপকার হয় নি। কারণ, তখনকার ব্যবহৃত ও প্রচলিত সংস্কৃত ঘেষা বাংলা ছিল মুসলমানদের নিকট অপরিচিত। তদুপরি, এই ভাষার প্রতি তারা ছিলেন বীতশ্রদ্ধ এবং তাদের ভাষা ছিল আরবি-ফারসি মেশানো পুঁথি তথা মুসলমানী বাংলা। অন্যদিকে, ঐ সময়ে অভিজাত মুসলিমদের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে তাদের অধীনে অবশিষ্ট যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলোও অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার কিছু পরিসংখ্যানে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার চরম দুরাবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অ্যাডাম রিপোর্টে বলেন, 'প্রধানত দারিদ্র্যের কারণেই একদা প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্বই নেই।'

...বাংলার মুসলিম সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনগ্রসর থাকা সত্ত্বেও তারা নিজস্ব শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। তারা ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ সরকারি শিক্ষানীতি ঘোষিত হলে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কলকাতার ৮০০০ মুসলমান তখন এক প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর করেন।

ফলে এ সময়ে মুসলিম শিক্ষার পরিস্থিতি খুবই জটিল রূপ ধারণ করে। অথচ শিক্ষাই হচ্ছে জা- জীবন-মরণ চাবিকাঠি। একটি সমাজের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ কর- উপর। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা তারতীয় উন্নতির জন্য তখন অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু মুসলিম সমাজে এ শিক্ষা নিয়ে নানা সংশয়, দ্বন্দ্ব ও মর্যাদা- দেখা দেয়। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার প্রতি দ্বিধা বা সংশয় কিংবা দারিদ্র্যই যে মুসলমানদের শিক্ষ পিছিয়ে পড়ার কারণ ছিল তা নয়, বস্তুত আধুনিক শিক্ষায় বাংলার মুসলমানদের এই পশ্চাৎপদতার ব- বহুবিধ সমস্যা ও কারণ নিহিত ছিল। এসব সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ বিশ শতকেও মুসলিম শিক্ষ অগ্রগতিতে বাধা বিপত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

বাংলার মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে আরবি ভাষা নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল এবং মুসলি- ছাত্রদের শিক্ষাজীবন আরবি এবং কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় সাহিত্যে বিকাশ এবং আরবির সঙ্গে দীর্ঘকালের সংযোগের ফলে তারা ফারসিকে তাদের ধর্মীয় ভাষা বলে ম- করতেন এবং মুসলিম অভিজাতগণ আরবি-ফারসি সাহিত্যকে অন্য সকল সাহিত্যের চেয়ে উন্নত ম- করতেন। তাছাড়া, শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মুসলমানেরা মৌখিক ভাষা হিসেবে উর্দু ব্যবহার করতেন তার প্রধান উৎস ছিল ফারসি। সর্বোপরি ফারসি ছিল শাসকের ভাষা। এ ভাষার সঙ্গে মুসলমানদের ভার- উপমহাদেশ জয় করার ও দীর্ঘকাল শাসন করার গৌরবময় স্মৃতি বিজড়িত ছিল। ফলে ফারসি ভা- যেমন তাদের কাছে প্রিয় ছিল তেমনি উক্ত ভাষা শিক্ষা করাকে তারা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার বলে ম- করতেন এবং নিজেদের ফারসি শিক্ষা ব্যবস্থাই তাদের নিকট শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ছিল। তাছাড়াও ব্রিটি- সরকার প্রথমে যে ইংরেজি বিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা করেন, তা মূলত সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাব- ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। এক চাকরির সুবিধা ছাড়া ইংরেজির প্রতি অভিজাত মুসলিমদের জন্য কোনো আকর্ষণ ছিল না। কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম ৭০-৭৫ বছ- পর্যন্ত ফারসি চালু থাকায় চাকরির কারণে ইংরেজি শিক্ষার ততটা প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং ফার্সি শিক্ষার মোহ ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাগিদের অভাব - এই উভয়বিধ কারণে মুসলমানগণ নিজেদে- পূর্ব পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ ও চিন্তার জগতে মগ্ন ছিলেন। তারা পরিবর্তিত অবস্থা- প্রেক্ষিতে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

...ফারসি ভাষাকে মুসলমানেরা যেমন ধর্মীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতেন তেমনি শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মী- প্রাধান্যকে তারা খুবই গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মবর্জিত। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলমানদের আজীবনের ভাবধারা সযত্নে উপেক্ষা করা হয় এবং তা মুসলমানদের প্রয়োজন উপযোগী হয় নি। ফলে তাদের মধ্যে ধর্মহীন শিক্ষা গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ যথার্থই বলেন যে, 'পৃথিবীর কোন বড়ো দেশেই বোধহয় ধর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন সমস্যা দেখা যায় না।' মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর কোনো কিছুই ধর্মচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। উইলিয়াম হান্টার বলেন যে, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান ছিল না। কিন্তু মুসলমানেরা সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করতেন।' তাই মেকলের প্রস্তাবে কলকাতা মাদ্রাসা তুলে দেয়ার কথা বলা হলে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনশিক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য এইচ. টি. প্রিন্সেপ ঐ ঘটনার ত্রিশ বছর পর (১৮৬৫) তার ডায়েরিতে উল্লেখ করেন যে, 'তিনদিনের মধ্যে মাদরাসার পক্ষে ৩০০০০ লোকের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত জমা পড়েছিল।'

মাদরাসা যে মুসলমানদের নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন সাফল্যের সঙ্গে মিটিয়ে আসছে মুসলমানগণ তাদের স্মারকলিপিতে তা বিস্তারিত উল্লেখ করেন। মেকলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অপর একটি স্মারকলিপিতে মুসলমানগণ বলেন যে, ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতীয় প্রজাদের চোখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুনাম ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তারা দুঃখ প্রকাশ করছেন এজন্য যে, 'আরবি সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ এবং তার সৌন্দর্য ও সুবিধাসমূহের ব্যাপারে

সম্পূর্ণ অন্ধ কিছু ব্যক্তি এখন মাদরাসা ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।' আবেদনকারীগণ আরও উল্লেখ করেন যে, মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রায় দু'শ ব্যক্তি বর্তমানে সরকারের উচ্চপদে আসীন রয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার অর্থ 'অসৎ ও কুশাসন' সূচিত করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। 'মাদরাসা বন্ধ হওয়ার সংবাদ শোনার পর থেকেই গরিব ও ধনী সকল শ্রেণীর মুসলমানের মনে এ ধারনার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামি সাহিত্য ও ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা যাতে এর প্রস্তাবকারী ও সূচনাকারীগন তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারেন এবং রাষ্ট্রের সকল প্রজা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।' সবশেষে উপসংহারে আবেদনকারীগণ এই আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার 'ন্যায়-বিচার, সামাজিক কল্যাণ ও সাধারণ মহানুভবতার বশে এবং নিজেদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার কারনে' মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

...মুসলমানদের ভয় যে অমূলক ছিল না এতে কোনো সন্দেহ নেই। মাদরাসার বিলুপ্তির ঘোষনা, বিচারকার্যের ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষার অবলুপ্তি এবং বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন - পাশ্চাত্যবাদীদের নীতির মধ্যে যা ছিল তার সবই মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে - এটি স্পষ্টত:ই প্রতীয়মান হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির দীর্ঘকাল ধরে এসব সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাদের ক্ষমতা তখনও এত বেশি - ইংরেজ সরকার তাদের স্বার্থে হাত দেয়ার সাহস করবে না। সরকার কর্তৃক মাদরাসা অবলুপ্ত করার প্রত্যাশিত উদ্যোগ বস্তুত এক ধরণের অপরিকল্পিত জাগরনের সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানেরা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখী হয় সে করুণ পরিস্থিতিই আবেদনপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। সরকার মুসলমানদের আবেদন রক্ষা করে মাদরাসা অবলুপ্তি করার কোনো সম্ভাবনা নেই মর্মে ঘোষনা প্রদান করেন। কিন্তু অন্যান্য আধুনিক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে মুসলমানদের নতুন শিক্ষানীতি মন:পুত হয়নি।

...খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপকে মুসলমানেরা যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মিশনারিদের ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং এক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারা একই ছিল। ১৭৯২ সালে চার্লস গ্র্যান্ট পার্লামেন্টে বলেন যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান বিচ্ছুরিত হলে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি ধ্বসে পড়বে; যান্ত্রিক আবিষ্কারের জ্ঞানের আলোকে ভারতীয়গণ উদ্ভাসিত হবে এবং ক্রমশ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের স্থলে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। লর্ড মেকলেও এরূপ মত পোষণ করতেন। তিনি তার পিতাকে এক চিঠিতে লিখেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করি তাহলে ত্রিশ বৎসর পরে বাংলায় কোনো পৌত্তলিক থাকবে না।'

কোম্পানি আমলের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগ খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতেই ন্যস্ত ছিল এবং ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো খ্রিস্টধর্মের প্রচার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। মিশনারিদের প্রচারপত্রে প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালানো হত। কিন্তু মুসলমানেরা মিশনারিদের অভিসন্ধিমুলক উদ্দেশ্য সহজেই বুঝতে পারেন এবং তারা নিজেদেরকে মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। স্যার P. J. Hartog যথার্থই বলেন, '...a real though unfounded fear that it would lead to Christian proselytizing on a large scale.'

অপরদিকে হিন্দু সমাজ ছিল এক্ষেত্রে অনেক উদার। তারা মিশনারিদের শিক্ষা পদ্ধতি সহজেই গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টান মিশনারিগণও নিজেদের ধর্ম প্রচারে হিন্দুদেরকেই বেছে নেন। মিশনারিগণ হিন্দু সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটিযে তাদের ধর্ম প্রচারেও সফলতা লাভ করেন। বিশেষত শিক্ষিত হিন্দু সমাজের কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪), মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-১৮৯০) প্রমুখ প্রকাশ্যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও শিক্ষিত হিন্দুদের একাংশ খ্রিস্টান ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।

সুতরাং মুসলিম স্বার্থের বিরোধী নীতি, মিশনারীদের ইংরেজির মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার, শিক্ষিত হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ, ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজির প্রতি এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকে সর্বোপরি ধর্মনাশের কারণ বলে চিহ্নিত করে এবং অভিভাবকগণ নিজেদের সন্তানদেরকে আধুনিক বিদ্যালয়ে পাঠানো থেকে বিরত রাখেন। সাধারণ মুসলমানদের ইংরেজির প্রতি মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) বলেন, 'আত্মীয় স্বজন গুরুজনদের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজি পড়িলেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। পাক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাটো করিয়া নানাভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খাইতে চায়, নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।'

...উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান ছিল দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। হান্টারের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী 'কোম্পানি আমলের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ছিল, আর পঁচাত্তর বছরব্যাপী ইংরেজ শাসনের পর তাদের মধ্যে স্বচ্ছল পরিবার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।' ফলে মুসলমানদের দরিদ্রতাই শিক্ষার প্রসারে প্রধান বাধা হযে দাঁড়ায়।

মুসলমানদের দরিদ্রতার ফলে একদিকে যেমন তারা শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং অন্যদিকে অশিক্ষা ও মূর্খতার প্রভাবে মুসলিম সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করে। পীর পূজা, কবর পূজা, ধর্মীয় কুসংস্কার ও নানা অনাচারে মুসলমানেরা নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। তাছাড়াও অনেক ধর্মান্তরিত মুসলিম তাদের সনাতনী ধর্ম ত্যাগ করা সত্ত্বেও পূর্বের বিজাতীয় কিছু ধর্মানুষ্ঠান নিজস্ব সমাজে বজায় রেখেছিলেন। এইভাবে ইসলামের অনুশাসন বিরোধী নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৩৬ সালে জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলী (১৮০০-১৮৭৩) বাংলার মুসলমানদের অবস্থা দেখে বলেন যে, ইংরেজ আমলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লেও কোথাও বাংলার মত এত করুণ ও শোচনীয় রূপ ধারণ করেনি।

এই সময়ে কিছু মুসলিম ধর্মীয় নেতা মনে করেন, ইসলামের প্রকৃত অনুশাসন থেকে সরে আসার ফলে মুসলিম সমাজের এই দুর্দশা ও অবনতি। তারা এই অবস্থা পরিত্রাণ পাবার জন্য ইসলামের বিশুদ্ধতায় মুসলমানদের ফিরিয়ে নিতে তৎপর হন। বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১), শরীয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০), দুদু মিয়া (১৮১০-১৮৬২) প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম সমাজে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেগুলো 'ফরায়েজী', 'তরীকাহ-ই-মুহাম্মদীয়া' (ওহাবী), 'তাউনী', ও 'আহলে হাদীস' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। পাশাপাশি এই সময়ে দারিদ্র্যের সূত্রে হিন্দু জমিদার ও মুসলিম প্রজার বিরোধ এবং জমিদার-ইজারাদারদের নানা অত্যাচার, মহাজনী শোষণ, নীলকরদের নির্মমতা ও সর্বোপরি ব্রিটিশদের শোষণ-নির্যাতনের প্রেক্ষিতে এ সকল ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শীঘ্রই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

সমাজে এই সংস্কার আন্দোলনসমূহ প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের সমর্থকরা প্রচার করেন যে, যতদিন দেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকবে ততদিন তা মুসলমানদের জন্য 'দার-উল-হরব' (শত্রু কবলিত দেশ) বলে গণ্য হবে। এই আন্দোলনসমূহ সমাজের উচ্চবিত্তের মাঝে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলের কম শিক্ষিত নেতাগণ এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তবে 'ধর্মীয় ও জাতিভেদের গন্ডি অতিক্রম করে তারা নিম্নস্তরের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করতে সক্ষম হন।' পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) ক্ষেত্র প্রস্তুতে এসব আন্দোলন সহায়ক হয়েছিল।

এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষারও বিরোধিতা করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 'হারাম' বলে ঘোষণা করেন। ফলে মুসলমানদের মনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয় যা মুসলিম সমাজে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ ছিল। অবশ্য এই সময়ে বাংলা তথা ভারতের উলেমাগণের একাংশ জ্ঞান-অর্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষেও ফতোয়া জারি করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাদের অভিমত ইংরেজ-বিরোধীদের মধ্যে তেমন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

...উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার মুসলমানদের চরম অবনতি এবং ব্রিটিশ শাসন ও নতুন পরিস্থিতিকে মানাতে না পারার কারণে তাদের মধ্যে নানা সময়ে যে ক্ষোভ, আন্দোলনের সঞ্চার হয় ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর মধ্যে তার চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ব্যারাকপুরের শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার নিয়ে ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ দেশিয় সিপাহীদের মাধ্যমে এই বিদ্রোহের সূচনা হলেও পূর্ব থেকেই এর পরিকল্পনার যোগসাজশ হয়েছিল এবং ইংরেজদের নানা দুঃশাসন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিতভাবে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। তিতুমীর, শরীয়ত উল্লাহ ও উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর (১৭৮৬-১৮৩১) মৃত্যুর পরেও তাদের অনুসারীগণ সক্রিয়ভাবে এই সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। সিপাহী যুদ্ধে প্রত্যক্ষ মদত যুগিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসননীতি ও কূটনীতির ফলে বঞ্চিত কতিপয় ভারতীয় সামন্তপতি। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরও তার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত এই 'সিপাহী বিদ্রোহের' আগুন সারা ভারতব্যাপী জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ফলে সিপাহী যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

...সিপাহী বিদ্রোহে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভূমিকা থাকলেও ইংরেজ সরকার এইজন্য প্রধানত মুসলমানদের বিক্ষোভকেই দায়ী করেন। তাদের ধারণায় - 'সমগ্র বিদ্রোহটিই ছিল মুসলমানদের ক্ষমতা দখলের শেষ চেষ্টা।' সরকার সারা দেশব্যাপী মুসলিম 'জিহাদী'দেরকে ব্যাপক ধরপাকড়, মামলা, জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে এ আন্দোলনের মূলোৎপাটন করেন। আন্দোলনকারীদের নেতা দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বন্দি অবস্থায় রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ নির্বাপিত হয়। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহে শুধু বাংলার মুসলমানগণই ক্ষতিগ্রস্ত হন নি, সারা ভারতব্যাপী তাদের সর্বশেষ ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এ সকল ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে সমাজের সম্বিৎও ফিরে আসে। এই সিপাহী বিদ্রোহে পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময়ে বাংলার মুসলিম শিক্ষিতদের নেতাদের একটি অংশও অনুভব করেন যে, ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করে তাদের শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করলে মুসলমানরা আরও পশ্চাৎগামী হয়ে পড়বে।

...বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে নবাব আবদুল লতিফের অবদান অসামান্য। তিনিই প্রথম মুসলিম নেতা যিনি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন। সমসাময়িক কালের মুসলিম সমাজে সমস্যা ও পরিস্থিতির উপর নবাব আবদুল লতিফ গভীরভাবে নিরীক্ষা করেন। মুসলিম সমাজের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অহমিকাবোধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে দায়ী করা হয়, এ ব্যাপারে তার দ্বিমত ছিল। তার মতে, ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে অন্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি তুলনামুলকভাবে মুসলিম সমাজের চেয়ে কম ছিল এমন কথা বলা যায় না। আব্দুল লতিফের মতে, মুসলিম সমাজের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং তাদের আদর্শের চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সে অনুযায়ী রূপ দেওয়া হয়নি। এছাড়াও মুসলমানদের স্বাভাবিক জমাটবাঁধা গর্বকে দ্রবীভূত করার চেষ্টাও হয় নি। নিজের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ব্রিটিশ সরকার মুসলমানের এই সংস্কারের সঙ্গে সমঝোতা করার কোনো প্রয়োজনবোধও করেন নি। সাধারণভাবে দারিদ্র্য যে মুসলিম সমাজে বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে সেটিও তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

নবাব লতিফের মতে, মুসলিম সমাজের দুটি শ্রেণী আছে : (১) আলেম সমাজ (Learned Class) (২) বৈষয়িক শ্রেণী (Worldly Class)। আলেম সমাজ আরবি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতি। দরিদ্র হলেও এরা সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত। অপরপক্ষে, বৈষয়িক শ্রেণীর মধ্যে আরবি ভাষা অপেক্ষা ফারসির জনপ্রিয়তা বেশি। প্রয়োজনবোধে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণেও এদের আপত্তি নেই। আব্দুল লতিফের ভাবনা ছিল ইংরেজি ও আরবি-ফারসি একত্রে শিক্ষা দেওয়া হলে কোনো রূপ কুফল হওয়ার আশংকা নেই। মুসলিম ক্লাসিকের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হলে এর ফল বরং ভালো হবে। আরবি-ফরসি না জানলে মুসলমানরা সমাজে স্থান পায় না অর্থাৎ তাকে পণ্ডিত বলে গণ্য করা হয় না। সুতরাং শুধু ইংরেজি জানা যুবক তার এ শিক্ষার সুফল সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করতে সমর্থ হয় না। ইংরেজ রাজত্বের সুফল এবং ব্রিটিশ সরকারের বিশাল ক্ষমতার কথাও সে নিজের সমাজের লোকদের উপলব্ধি করাতে পারে না। কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে আরবি-ফারসিতে দক্ষ হলে সমাজে সে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

অতএব, তিনি মুসলমানদের ইংরেজির সাথে আরবি-ফারসি শিক্ষা দেওয়া সরকারের একান্ত কর্তব্য মনে করেন। তিনি লক্ষ্য করেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দু সমাজ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। তারা সরকারকে স্বার্থ অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করতে প্রভাবিত করছে। এ সময়ে মুসলমানেরা ইউরোপীয়দের প্রতি বিরাগ ছাড়াও হিন্দুদের সাথেও মেলামেশা করতে পরান্মুখ ছিল। আব্দুল লতিফ বহু চেষ্টা-সাধনা করে মুসলমানদের এ মনোভাব পরিবর্তনে সক্ষম হন। আব্দুল লতিফের এ ধরণের সমাজ ভাবনা ও শিক্ষা চিন্তাসমূহ তার কর্মপদ্ধতি নির্ণায়নে বিশেষ সহায়তা করেছে। তার সমগ্র জীবনের কর্মপদ্ধতি প্রধানত তিনটি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। এক. মুসলিম সমাজে ইংরেজি ভাষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। দুই. শাসক পক্ষের সঙ্গে মুসলিম সমাজের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং তিন. বিদ্যাশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বাস্তব প্রতিবন্ধকতাসমূহের অপসারণ।

...আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কলকাতায় ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও অন্যান্য উন্নতি সাধনে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আব্দুল লতিফ লিখেছেন, 'ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করতে এবং সামাজিকতায় তাদেরকে শিক্ষিত ইংরেজ ও হিন্দুদের সমকক্ষ করে তুলতে আমি ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতি বক্তৃতা ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করে মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করছে এবং এটি মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা সংস্থার কাজ করছে।'

আব্দুল লতিফের কলকাতার বাসভবনে এ সমিতির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হত। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, সংবাদপত্রের জন্মকথা, বাণিজ্য, শিল্পকলা, কৃষি, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হত। বছরে একবার কলকাতার টাউন হলে সোসাইটির উদ্যোগে মিলন সভার আয়োজন করা হত। সেখানে বহু দেশি-বিদেশি পণ্ডিত আলোচনায় অংশ নিতেন। উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা সৈয়দ আহমদও এর একটি অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া ফাদার ই লাফাত, ড. কানীলাল দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, তারাপ্রসন্ন রায়, মহেন্দ্রলাল গুপ্ত, জে সি বোস, জে জে মেডি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আলোচনা সভায় অংশ নিতেন। বিজ্ঞ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের পথ সুগম হয়।

...নবাব লতিফের আদর্শিক চিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের কখনও আরবি-ফারসি তথা ধর্মীয় শিক্ষা ত্যাগ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাননি। তিনি ধর্মীয় বিতর্ক থেকে দূরে থাকতেন এবং মুসলমানদের ইসলামি ভাবধারায় গড়ে উঠাকে অধিক পছন্দ করতেন।

তৃতীয় পর্ব

কলকাতার বাবুদের ইংরেজি শিক্ষা

এক

"...ভারত ইতিহাসের দুর্ভাগ্য যে, ভারতীয় জনগণ ১৮৫৭-র ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে প্রাণপণে লড়াই করলেও বাঙালি মধ্যবিত্ত-জমিদারশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজ প্রভুভক্তির পরিচয় রাখেন। মহাবিদ্রোহে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দেশিয় সরকারি কর্মচারীদের প্রভুভক্তি ছিল প্রশ্নাতীত। শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করত যে, ভারতীয় হলেও তারা অপর ভারতবাসী থেকে পৃথক এবং তারা ইংরেজ পক্ষভুক্ত। সুতরাং ভারতীয় সমাজের এই শিক্ষিত সম্প্রদায়টি সংকটকালে ব্রিটিশ শাসকদেরকে মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করেনি। এই জন্য ঐতিহাসিক নর্টন তার 'টপিক্স ফর ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান' গ্রন্থে শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহের সময় শিক্ষিতশ্রেণির এই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকাটি ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশেষভাবে। ১৮৫৮ সালেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লর্ড সভায় গ্রেনভিল বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, 'শিক্ষিত ভারতীয়গণ সিপাই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই, বরং তাহারা উৎসাহের সহিত এই বিদ্রোহের বিরোধিতাই করিয়াছে এবং সেই সংকটকালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে।' (সুপ্রকাশ রায়/ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

...বিনয় ঘোষের ভাষায়, বাংলার ইংরেজি শিক্ষিতশ্রেণি ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় 'দাস সুলভ' আচরণ করেন। মহাবিদ্রোহের সময় কলকাতার সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' 'সংবাদ ভাস্বর' 'সোম প্রকাশ' ইত্যাদি প্রগতিবিরোধী তথা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশ করে। এই সংবাদ পত্রগুলি উচ্চস্বরে জ্ঞাপন করে যে, 'বিদ্রোহটা ...মূলত: ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উদ্ধারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।' তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা কেন 'সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতে মুসলমান রাজ্য পুনরুদ্ধারের একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি, সেটাও চিন্তার বিষয়। ...বিদ্রোহের জাতীয় রূপের বদলে 'সাম্প্রদায়িক রূপই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুদের কাছে' প্রধান হয়ে ওঠে।'

(বিনয় ঘোষ/বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা) তারা মহাবিদ্রোহের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন এবং একে তারা শ্রেণী স্বার্থের জন্যই জাতীয় বিদ্রোহ তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে মেনে নিতে পারেননি।

...এই প্রেক্ষিতে বিশ্বস্ত নাগরিকদের সভা ডাকা হয় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের হলঘরে। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করে ও বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (সংবাদ প্রভাকর - ২৬/০৫/১৮৫৭) এর পূর্বে ১৮৫৭-এর ১৫ই মে রাজা রাধাকান্ত দেব নেটিভ সমাজের একটি সাধারণ সভা ডেকেছিলেন। সভায় উত্থাপিত ইংরেজি প্রস্তাবের বাংলা অনুবাদ করে ছাপানো হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে তা বিলি করা হয়। প্রস্তাবগুলি হল :

১. এই সভা শ্রবণ করত: অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় কয়েকদল পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচারকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহারের জন্য সভার ঘৃণা ও ভয় হয়।

২. এতদ্রাজ্যের প্রজামন্ডলী সিপাহীদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোনরূপ সহায়তা না করাতে অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩. কতিপয় সিপাহী সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছে, যেহেতু এই ভ্রমের কোন কারণ নাই।

৪. এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গভর্নমেন্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অনধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন। (কিশোরী চাঁদ মিত্র/দ্য মিউটিনিজ, দ্য গভর্ণমেন্ট এন্ড দ্য পিপল)

...এই সময় রাধাকান্ত দেব কলকাতার টাউনহলে যে বক্তব্য রাখেন তা উল্লেখযোগ্য : 'এ মন্তব্য করতে আমি আনন্দ বোধ করছি যে, ভারতের এই অংশের হিন্দুরা বরাবরই ইংরেজ রাজের সর্বাপেক্ষা অনুগত প্রজা হয়ে থেকেছে, তার সমৃদ্ধির ব্যাপারে সংশয়াতীত আগ্রহ দেখিয়েছে ও সমৃদ্ধি ঘটাবার চেষ্টা করেছে, এবং ভারতে ইংরেজের প্রাথমিক রাজ্য দখলের ব্যাপারে খুব সহায়ক হয়েছে।'

এছাড়াও উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, কোতরং, কেন্নাগর এবং কাছাকাছি পল্লীর জমিদার, তালুকদারগণ হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে তাদের প্রভুভক্তির স্মারকপত্র প্রেরণ করলেন। এই স্মারকপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি। ১৮৫৭ সালের ১৭ই জুন জয়কৃষ্ণ মুখার্জি সহ ৪৭ জন জমিদার বিদ্রোহী সিপাহীদের 'বদমাইস' আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিদ্রোহ দমনের আহ্বান জানিয়েছিলন। (শ্যামাপ্রসাদ বসু/মহাবিদ্রোহ : বাংলা ও পাঞ্জাব) এরা স্থানীয় অঘোরী, গোয়ালা, বাগদি, ডোমেদের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবার পরামর্শও দিলেন। যাদের কাজ হবে পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহী সিপাহীদের মোকাবিলা করা। সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। জয়কৃষ্ণ একটা লেঠেল বাহিনী তৈরি করেন, সিপাহীরা এলে তাদের আক্রমণ করার জন্য।

...এই সব জমিদার এবং এদের নায়েব-গোমস্তা শুধু যে বিদেশি শক্তিকে সাহায্য করেছে তা নয়, এরা সাম্প্রদায়িকতা, বিশেষ করে মুসলমানদের অস্পৃশ্য ও অশুচি করে রেখেছিল, এ কথা কোনও সংকোচ না করেই বলা যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যতীত অন্য হিন্দুদেরও এরা মুসলমানের মত নিকৃষ্ট জীব মনে করত এবং সেভাবে ব্যবহারও করত তাদের সঙ্গে। অবশ্য উদারপন্থী জমিদার-নায়েব-গোমস্তা যে ছিল না এমন নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

ইংরেজরা দিল্লি পুনর্দখল করলে ১৮৫৭-র ডিসেম্বরে মহারাজা মহাতাবচন্দ্র, রাধাকান্তদেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরও ২৫০০ বঙ্গসন্তান লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে তাদের আরও একটি নিবেদনপত্র পাঠালেন। তাতে লেখা হয় : 'হে প্রভু, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী রাজা, জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী এবং বাংলা মুলুকের অন্যান্য অধিবাসী আপনার সেনাবাহিনী দিল্লী পুনরুদ্ধার করে যে স্মরণীয় সাফল্য লাভ করেছে (যা ব্রিটিশ ভারতে অতুলনীয়) তার প্রতি আমাদের উত্তপ্ত অভিনন্দন পাঠাবার সত্বর সুযোগ গ্রহণ করছি। ...আমাদের গভীর সান্ত্বনা যে, আমাদের এই বাংলায় কোন রকম গোলযোগ হয়নি, এমনকি (ইংরেজের প্রতি) সামান্য আনুগত্যহীনতাও নয়। বরং জনগণ সেই আনুগত্য ও অনুরাগ দেখিয়েছে যা তাদের পূর্বপুরুষরা প্রদর্শন করেছিল। তারা এই উদীয়মান ক্ষমতার প্রতিপত্তিকে সহজ করে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। (Bengalees' Address to the Governor-General of India - December, 1857)

...বাঙালি 'ভদ্রলোকদের' এই চরিত্র দেখলেই বোঝা যায় কেন এই শ্রেণী সেকালে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন করেননি। ইংরেজ প্রভুকে সর্বপ্রথম এঁরাই 'বিধাতার আশীর্বাদ' বলে গ্রহণ করেছে। বাঙালি জমিদার, ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের সিংহভাগই বিদ্রোহী সিপাহীদের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে যে রকমারি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তার সাক্ষ্য মেলে। ১৮৫৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল কীভাবে বাংলার জমিদাররা ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে রসদ ও ও গরুরগাড়ী সরবরাহ করেছিলেন। রাণীগঞ্জে প্রায় সাত হাজার গরুর গাড়ী বিনা ব্যয়ে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

সুপ্রকাশ রায় প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন : 'মহাবিদ্রোহের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত জমিদারশ্রেণি ইংরেজ শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখিয়াছিল। ইংরেজ শাসনের সহিত ইহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ইহাদিগকে বিদেশি ইংরেজ শাসন অব্যাহত রাখিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। কৃষক শোষণকারী, ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী মহাবিদ্রোহে কৃষকের, বিশেষত অযোধ্যা ও বিহারের কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ইংরেজ শাসনের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে যোগদান করিতে না পারিলেও তাহাদেরই অপর অংশ, বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, সর্বপ্রকারে মহাবিদ্রোহে যোগদান করিয়া নিজস্ব উপায়ে ইহাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত করিয়াছিল।

বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, কেবল ইংরেজ শাসনকেই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার, তালুকদার ও মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিণতি স্বরূপ মহাবিদ্রোহ কৃষি-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতেছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণির পক্ষে ইহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হইলে উহা দ্বারা সৃষ্ট জমিদারী-তালুকদারী প্রথাও বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং তাহারা সমগ্র ধনবল ও জনবল একত্র করিয়া ইংরেজ শাসকগণের সহিত সহযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজ ছিলেন বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর মুখপাত্র এবং নেতৃস্থানীয়। তাহার ক্রিয়াকলাপ মহাবিদ্রোহে বঙ্গীয় জমিদার-গোষ্ঠীরই মনোভাবের পরিচায়ক।' (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

এ বিষয়ে 'বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' লিখেছে, '১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজা তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সরকারকে বহু হস্তী ও গো-যান সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং বর্ধমান হইতে কাটোয়া এবং বর্ধমান হইতে বীরভূম পর্যন্ত সমস্ত রাজপথ আমাদের জন্য নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে রাজধানীর (কলিকাতার) সহিত বহরমপুর, বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলগুলির যোগাযোগ এবং এই সকল স্থানের সংবাদ পাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই।'

...১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার জমিদার শ্রেণীর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য ও এই বিপদের সময় জমিদারদের সাহায্য দান সম্বন্ধে 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামক সমসাময়িককালের একটি সাময়িকপত্রে লেখা হয়েছিল, 'সরকার জমিদারদের নিকট আবেদন করিলেন এবং জমিদারগণ রাজভক্ত প্রজার মত সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। জমিদারগণ গাড়ী ও গরুর মালিকদের অর্থ-দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাহাদের পরিবার রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। জমিদারগণই তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ দিলেন এবং তাহারা এরূপ আরও বহু প্রকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন যাহা একমাত্র জমিদারগণই দিতে পারেন। ইহার ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রাণীগঞ্জে ৭০০০ গাড়ী জমায়েত হইল। বাংলার জমিদারগণ তাহাদের প্রত্যেকটি হাতী বিনা ব্যয়ে সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ...সকলেই জানে যে, ঢাকায় যখন সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তখন জমিদারগণ কিভাবে তাহাদের লোকবল লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ...তাহারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাহাদের ক্ষমতানুসারে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।' (ইন্ডিয়ান ফিল্ড - ১১/০২/১৮৫৯)

যাইহোক, ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো আর ইংরেজরা এমনি এমনি করেনি। তাদের লক্ষ্যই ছিল, অনুগত জমিদার সম্প্রদায়, যারা বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ী বন্ধু ও প্রচারক হবে। হয়েও ছিল। স্বপন বসু- র 'গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে তার পরিচয় মেলে। শ্রী বসু লিখেছেন, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আবেদন আসতে থাকে। ঢাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়, ঢাকার খ্রিস্টানরা ভলেন্টিয়র বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করলে দেশিয়রা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অনেক ধনাঢ্য বাঙালী এই সুযোগে রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য উঠে পড়ে লাগল। কলকাতার মল্লিক পরিবারের কয়েকজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য ঠাকুরবাড়িতে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করেন। শ্রী কৃষ্ণ সিংহ বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারকে একটি বিরাট হাতি উপহার দিলেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা কলকাতায় আসছে তাদের সাহায্যের জন্য এক তহবিল খোলা হল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় এই কমিটিতে রইলেন। গোরা সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা মাদ্রাসা প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ শ্রী কৃষ্ণ মল্লিকের প্রশস্ত বাড়িতে উঠে আসে। শ্যামাচরণ মল্লিক বিনা ভাড়ায় সরকারকে এই বাড়িটি কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিয়ে কৃতার্থ হন। সংস্কৃত কলেজকে মিলিটারি হাসপাতালে পরিণত করা হয়। ধনী ব্যক্তিরা বাড়ি পাহারার জন্য গোরা প্রহরী নিযুক্ত করে। পাইক পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ নিজেদের সামনের রাজপথে ৪০/৫০ জন বন্দুকধারী গোরা সমেত প্রায় দুই হাজার লোক মোতায়েন করেন।

...মহাশক্তিধর ইংরেজ মহাবিদ্রোহ দমন করার পর 'গভর্ণর জেনারেল বিজয়োৎসবের জন্য যে ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন তাতে বিদ্যাসাগর ব্যতীত কলকাতার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রায় সবাই যোগ দিয়েছিলেন।' (শ্যামাপ্রসাদ বসু/১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে বাঙালীদের ভূমিকা) অসংখ্য দেশিয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি, উচ্চবিত্তশ্রেণি ইংরেজভক্তরা বিদ্রোহের নায়কদের নিন্দা করেছেন এবং ব্রিটিশের পক্ষাবলম্বন করেছেন। 'এদের মধ্যে দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, যদুনাথ সর্বাধিকারী, 'অশোকা' উপন্যাসের লেখিকা প্রসন্নময়ী দেবী, 'চিত্ত বিনোদিনীর' লেখক গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, 'নানাসাহেব' লেখক উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অভয়চন্দ্র পাঁড়ে, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।' (স্বপন বসু/গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ) মহাবিদ্রোহের প্রতি অবশ্যই সবাই, সব বাঙালি বুদ্ধিজীবীই যে বিরোধী ছিলেন এমন নয়। তবে বিরোধী ভাবধারার প্রাধান্যই ছিল বেশি।

...স্মর্তব্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের কেউই এমনকি পরোক্ষভাবেও বিদ্রোহের পক্ষে কোনও কথাই বলেননি। রাজনারায়ণ বসু এসময় রাতে 'নিদ্রার সময় লাল কোর্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখতেন' এবং বিদ্রোহের 'আশঙ্কায় আশঙ্কিত ছিলেন'। সিমলা থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৫৭-র ১২ অক্টোবর মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "বিদ্রোহীরা যে কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, স্মরণ হইলে শোণিত শুষ্ক হয়।" অর্থাৎ বিদ্রোহীরা যে কত ভয়ানক, নৃশংস - দেবেন্দ্রনাথ সেটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি ওই চিঠিতে আরও লিখেছিলেন, '...(ইউরোপীয়) পরিবারদিগকে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে, উত্তম হইয়াছে। সিমলাচলও বিদ্রোহীদিগের আক্রমণে একবার চঞ্চল হইয়াছিল। ভাগ্যে ভাগ্যে সিমলাচল রক্ষা পাইয়াছে। এখানে যে সৈন্যদল ছিল, তাহারদিগকে নিরস্ত্র হইতে অনুমতি দেওয়াতে তাহারা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সিমলা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বহু আয়াস ও যত্নে তাহারদিগকে সান্তনাবাক্যে শান্ত করিয়া সাহারানপুরে পাঠাইয়া সিমলার রক্ষা হইল। ইহাও প্রায় ছয় মাসের কথা হইল। এইক্ষণে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ উভয়েই ইংরাজদিগের পুনর্বার হস্তগত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে দেশে শান্তি ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে ...।'

কিন্তু 'জিহাদ আন্দোলনের' সমর্থকগণ যখন ব্রিটিশ অধীনে ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হরব' বা 'শত্রু কবলিত দেশ' বলে ঘোষণা দিয়ে বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হন, তখন আব্দুল লতিফের কাজ নস্যাৎ হবার উপক্রম হয়। এ সকল তৎপরতা প্রতিহত করতে আব্দুল লতিফ জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলী এবং অন্যান্য কয়েকজন ধর্মীয় নেতার সমর্থন লাভ করেন। ১৮৭০ সালের ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির এক সভায় কেরামত আলী বক্তৃতা দেন এবং এই মর্মে ঘোষণা করেন যে,

ভারতবর্ষ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশের শাসনাধীন থাকলেও এদেশ 'দার-উল-হরব' নয়, 'দার-উল-ইসলাম' (শান্তি বা মিত্রভূমি)। সুতরাং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেহাদ করার প্রয়োজন নেই। তিনি মুসলিম ধর্ম ও আইনশাস্ত্র থেকে একাধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাছাড়াও তিনি মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ইউরোপীয় ভাষা শেখার আহ্বান জানান। সভায় একই মতের সমর্থন করে মৌলবি ফজলি আলী, আরব থেকে আগত শেখ আহম্মদ ইফেন্দি আনসারি, কাজি আব্দুল বারি, আব্দুল লতিফ, আব্দুল হাকিম, আব্দুর রউফ প্রমুখ বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অনেকটা প্রশমিত হয় এবং তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ জন্মায়।

...নবাব আব্দুল লতিফের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, লর্ড মেয়োর প্রস্তাব, হান্টার ও জেমস লং-এর ন্যায় কতিপয় ইংরেজ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ, ১৮৭২ সালের আদমশুমারির ফলাফল ইত্যাদি ঘটনাসমূহ ব্রিটিশ সরকারকে মুসলিম সমাজের শিক্ষার সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও তার অপসারণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যাপক প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষিতে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই লে. গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে এক রেজুলেশন জারি করেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নবাব আব্দুল লতিফের দীর্ঘদিনের দাবি কার্যকর করা হয়। এর ফলে মহসিন তহবিলের অর্থ হুগলি কলেজ থেকে প্রত্যাহার করে মুসলিম শিক্ষার ব্যয়ে কাজে লাগানো হয়। কলকাতা মাদ্রাসার পরিচালনার মান উন্নত করা হয় এবং হুগলি মাদ্রাসার ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। মহসিন তহবিলের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা ও ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়াও হুগলি কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলার মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে ১৮৭৩ সালের রেজুলেশনকে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করা যায়। সৈয়দ আমির হোসেন সরকার এই সিদ্ধান্তকে প্রাদেশিক মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে Magna Carta বলে অভিহিত করেন।"[৪]

৪. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম/ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা : সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)। [বাংলা একাডেমী - জুন, ২০০৮। পৃ. ৮-৭২]

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতেও রয়েছে মহাবিদ্রোহের সময় তার সিমলাবাসের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনি। বিদ্রোহের সময় তিনি সিমলায় যাবার পর সেখান থেকে কোনও চিঠিপত্র না পৌছানো ঠাকুরবাড়িতে ঘোরতর আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি'-তে সেই আশঙ্কার ছবি রয়েছে, 'একটা গুজব উঠিল সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব - বাড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার প্রার্থনা সভায় ব্রিটিশদের প্রশংসা করে বলেন, 'তারা (ব্রিটিশরা) শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দিয়ে জয় করতে চায়। সে তুলনায় আমাদের মনোভাব কত জঘণ্য।' (একমেবদ্বিতীয়ম - ১৮৬০) তার উদ্যোগে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভা ডেকে ঘোষণা করেছিল - বিদ্রোহীদের প্রতি কোনওরকম সহানুভূতি নয়। (আর সি মজুমদার/সিপয় মিউটিনি) ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে ভীত ও বিরক্ত দেবেন্দ্রনাথ যেমন 'সাঁওতালদের উপদ্রবে বঙ্গভূমি অস্থির' হওয়ার তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি ১৮৫৭-র মহাবিপ্লবের সময়েও তিনি বিদ্রোহীদের তরফে 'ভয়ানক অত্যাচার-এর তথ্য খুঁজে পেয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। (অশোক চট্টোপাধ্যায়/উনিশ শতকের আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ)

...প্রখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল বসু তার 'স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সিপাহীরা পরাস্ত হবার পর প্রতিহিংসাপরায়ণ গোরারা অন্ধ হয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে। তখনও এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে যে সব বাড়ির বাইরের দেয়ালে কয়লা দিয়ে 'ক্যালকাটা বাবুজ' লেখা ছিল, সেসব বাড়ি তাদের চক্ষুতেও পবিত্রবোধে উৎপাত হতে রক্ষা পেয়েছিল।' এরকম এক প্রেক্ষাপটে (অর্থাৎ মহাবিদ্রোহে বাঙালিদের নিরবতার পুরুস্কারস্বরূপ) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দেই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো উপ-মহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

...প্রমোদ সেনগুপ্ত বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, বাংলায় অবশ্যই বিদ্রোহ জঙ্গীরূপ ধারন করতে পারত, কারণ বাংলার গ্রামের কৃষক ও জনসাধারনের মধ্যে অসন্তোষ জমাট বাঁধা ছিল, 'নেতৃত্ব পেলে বাংলাদেশেও বিরাট আকারে গণবিদ্রোহ ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নেতৃত্ব যারা দিতে পারত সেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তাদের কোন ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করতে পারেনি।' কারন, 'যে কৃষক জনসাধারণ অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশেও সংগ্রামী শক্তি ছিল, সেই কৃষক শোষণে এরা ছিলেন ইংরেজদের অংশীদার।'

সুপ্রকাশ রায় এই সংগ্রামী কৃষকশ্রেণির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, 'বাংলাদেশের তিতুমীর প্রভৃতি কৃষকবীরগণ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দেই বা তাহার পূর্বেও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দেও ইংরেজ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ ছিল এই তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণের কল্পনারও অতীত।' (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

...তাছাড়া মহাবিদ্রোহ বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায় করতে পারেনি, তার কারণ কেবল মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র না থাকা নয়, 'ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সংশ্রবের ফলে ভদ্রলোকের মনে 'সেন্স অফ সুপিরিয়রিটি' জাগ্রত হয়েছিল।' (দিলীপ মজুমদার/হরিশ মুখার্জি : জীবন ও ভাবনা) তাই বাঙালি সাধারণভাবে মহাবিদ্রোহের ব্যাপারে নীরব থেকেছিল। সুপ্রকাশ রায়ও মনে করেন, '...ইংরেজ শাসনের ছায়াশ্রয়কেই ইহারা পরম কাম্য বলিয়া মনে করিত। তাই ইহারা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত মহাবিদ্রোহের প্রতি এত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। (ভারতের [illegible] গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

বিপিনচন্দ্র পাল স্বীয় আত্মজীবনী 'নবযুগের বাংলায় লিখেছেন, 'বাঙালীরা মনে করেছিলেন তাদের স্বাধীনতা মুসলমান আক্রমণের সময়েই চলে গেছে। ব্রিটিশ শাসনকে তারা তাই বন্ধুভাবেই নিয়েছেন, শত্রু মনে করেননি। এই শাসনের ফলেই নতুন দর্শন, যুক্তিবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষা সব কিছুর সুযোগ পেয়েছেন সীমিত সংখ্যক বাঙালী। সম্ভবত সেই কারণেই তারা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি।'

...তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলের মন-মানসিকতা লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী নীলচাষীদের সাফল্যজনক বিদ্রোহ, পাবনায় কৃষকদের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান প্রভৃতির কোনও কিছুরই উত্তাপ এদের স্পর্শ করেনি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থে এসবের সমর্থনে কোনও সার্থক রচনা পর্যন্ত এরা করেননি। এটা অনেকটা 'রোম নগরী যখন পুড়িতেছিল, সম্রাট নীরো তখন বাঁশি বাজাইতেছিলেন'-এর মতো।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, সে যুগের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সংবাদ ভাস্বর' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকাগুলো সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। এমনকি পরাশক্তি ইংরেজদের পক্ষে জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করে।

গবেষক ও মনীষীরা প্রায় বলে থাকেন যে, 'নাটক হচ্ছে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং নাটকের সঙ্গে জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান।' কিন্তু আলোচ্য সময়ের নাটকগুলোতে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ১৮৫৮ সালের শেষভাগে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন, তখন বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর বীভৎস অভিযান অব্যাহত রয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হবার সময় সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বেরেলির খান বাহাদুর খানকে গুলি করে হত্যার পর হাজার হাজার সিপাহীকে কামানের তোপের মুখে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধগুলোকে অত্যন্ত নৃশংসতার মধ্য দিয়ে অপসারণ করে এতদিন পর্যন্ত যে বিশাল উপমহাদেশ কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া গোষ্ঠীগত লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল, তা ১৮৫৮ সালের শেষ নাগাদ ইংরেজ রাজশক্তির করায়ত্ত হওয়ায় ব্রিটিশ শোষকশ্রেণির ক্ষেত্রে পরিণত হল।

সেদিন কলকাতাকেন্দ্রিক নবসৃষ্ট এবং পূর্ণতার পথে অগ্রসরমান বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, নীরবে সমর্থন পর্যন্ত করেনি। এরা সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদও কামনা করেনি।"[৫]

দুই

"...১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এর (সচিবালয়) পূর্ব দিকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে এমবেসাডার্স হাউস নামে বাড়িটি ক্রয় করে স্থাপিত হলো 'মেয়র্স কোর্ট'। অবশ্য ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হবার পরই কেবলমাত্র এ ধরণের একটি বিচারালয় স্থাপনে ইংরেজরা সাহসী হয়েছিল।

মেয়ার্স কোর্টের অস্তিত্ব বজায় ছিল মাত্র ৪৫ বছরের মতো। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মেয়র্স কোর্ট যখন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে, তখন এর অবলুপ্তি ঘোষণা করা হলো। এর জায়গায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দেই জন্ম হলো সুপ্রিম কোর্টের।

কোলকাতার 'বাবু সমাজে' কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হলো, তা সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে কোলকাতায় প্রথমে মেয়র্স কোর্ট এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের ঘটনার উল্লেখ করতে হলো। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গবেষক বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন–

'...লক্ষ করা গিয়েছিল যে, এই সময় থেকেই ইংরেজি ভাষা জ্ঞান কাম্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হতে লাগল। আধাশিক্ষিত কয়েকজন ইউরেশীয় (এংলো ইন্ডিয়ান) এবং সুপ্রিম কোর্টের ব্রিটিশ এটর্নি ও উকিলদের কজন বাঙালি-অবাঙালি উদ্যোগী দালাল - এরাই হলো আমাদের দেশের প্রথম 'প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ ইংরেজি বিদ্বান ও শিক্ষক'। এই শিক্ষকদের বেতন ছিল ষোল টাকার একটি পয়সা কম নয়। এদের ইংরেজি বিদ্যার পুঁজি বলতে পকেট নোট বুকে টুকে রাখা কয়েক ডজন শব্দ। দেশের ভুঁইফোড় অভিজাতরা এদের কাছে ইংরেজি শিখতে আসত, তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকত মুখস্থ করা কয়েকটা শব্দে। ইংরেজি ভাষায় যা তারা প্রকাশ করতে অক্ষম হতো তা তারা প্রকাশ করত নানা রকম সংকেত চিহ্নের সাহায্যে। প্রকাশের ব্যর্থতা পূরণের উপায় হিসেবে দেশিয়দের অনেকেই আশ্রয় নিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির। ইউরোপীয় প্রভুদের কাছে এই ভাবেই তাদের বক্তব্য বোধগম্য হতো। ইংরেজি ভাষায় এই সামান্য দখল নিয়েই কিন্তু মুৎসুদ্দিরা যথেষ্ট পরিমাণে ধনার্জন করতে পেরেছিলেন যা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের নবীন নাগরিক অভিজাত শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করল। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মতো ঔপনিবেশিক দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যা প্রায় অপরিহার্য উপাদান বলা চলে এইভাবেই তার শুরু। এর পেছনে প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ব্রিটিশ বণিক এবং শাসকদের সেবা করার এবং আর্থিক লাভের। এই অনুপ্রেরণা ক্রমে বাড়তে থাকল - আরো প্রবল হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনা থেকেই শুরু হলো ইংরেজি শিক্ষার প্রসার।'"[৬]

তিন

"...উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক একান্তভাবে আমাদের দেশের মানুষের আগ্রহে ঘটেছে। রাজা রামমোহন রায় বা রামকমল সেনকে ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি।

...উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার এই জাগরণের বাহন ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

এই শ্রেণীটির উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন–'কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশিয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইওরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।'

...উনবিংশ শতাব্দীতে আস্তে আস্তে এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি সামাজিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকে। 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'সাধারণী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির পাতায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেশোন্নয়নের প্রশ্নটি নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছে।

...ক্রমে ক্রমে এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যতই যোগ্যতা অর্জন করতে থাকল ততই ইংরেজ শাসক দলের লোকেরা তাদের ঈর্ষার চোখে দেখতে আরম্ভ করল - এদের মধ্যে তারা ভবিষ্যৎ বিরোধিতার বীজের সন্ধান পেল। তাই আরম্ভ হল 'বাঙালী বাবুদের' বিরুদ্ধে অভিযান।

...ইংরেজ সম্পাদিত একটি পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলা হয়েছে 'অবিলম্বে' এই 'বাবুডমের' (Babudom) পাল্টা শক্তি হিসাবে একটি দেশিয় অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে তোলা হোক, নতুবা এই বাঙালী এম-এ, বি-এ'রা - যাদের পদবীর মূল্য চীনাবাজারের জিনিসপত্রের বেশি নয় - তারাই সমস্ত বড়ো পদ বাঙলায় ত বটেই, এমন কি উত্তর ভারতেও দখল করে বসবে।

---

৬. এম আর আখতার মুকুল/কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী। [অনন্যা - জুন, ২০১৪। পৃ. ১৩৪-১৩৫]

...১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ - এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণে প্রধান পুরুষ ছিলেন রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃবৃন্দ। এই যুগের প্রধান মুখপত্র 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি। এই পর্বে বাঙলার জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য : যুগধর্মকে আকণ্ঠ পান করার প্রবণতা, আধুনিকতার কালস্রোতে অবগাহন করার এক দুর্দমনীয় আগ্রহ।

ক. বঙ্গদূত : প্রথম প্রকাশ ১০ মে, ১৮২৯। এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাব ও ভাবনার প্রথম উন্মেষের পরিচয় যে পত্রিকাগুলি বহন করে এই পত্রিকা ছিল তাদের অন্যতম। কয়েকজন ইংরেজ এবং ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে 'বেঙ্গল হেরেল্ডের' সহচর 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার।

খ. জ্ঞানান্বেষণ : ১৮ জুন, ১৮৩১ এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় দশ বছর ধরে এই পত্রিকা চলেছিল। এটি ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র। দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অগ্রগামী চিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে। ইওরোপের প্রগতিশীল উন্নত ভাবাদর্শের আলোকচ্ছটায় কুসংস্কারের অন্ধকার অপসারিত করার প্রয়োজনে এই পত্রিকা এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকে স্বাগত জানিয়েছে।

গ. বেঙ্গল স্পেকটেটর : ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী-বাঙলা দ্বিভাষী পত্ররূপে এটি প্রকাশিত হত। এটি ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর আর এক মুখপত্র। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাত্র দেড় বছর এই পত্রিকা চলেছিল। অতি অল্পকাল স্থায়ী হলেও এই পত্রিকা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আধুনিকতা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে এই সময়ে যে নব্যপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এই পত্রিকার পরিচালকেরা ছিলেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

ঘ. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : প্রথম প্রকাশ ১৬ আগস্ট, ১৮৪৩। এই পত্রিকা ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের মুখপত্র। প্রথম বার বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম দিকে এই পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও যোগাযোগ ছিল। বাঙলার নব-জাগরনের স্রোত-ধারাটি যে-সব পত্র-পত্রিকা পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বস্তুতঃ ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা বাঙলার নব-জাগরণের এক অপেক্ষাকৃত পরিণত রূপ তত্ত্ববোধিনীর পাতায় প্রতিফলিত হয়েছিল।

ঙ. হিন্দু পেট্রিয়ট : প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খৃঃ। ১৮৫৫-৬১ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিশ মুখার্জি। এই ক'বছর ছিল হিন্দু পেট্রিয়টের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। দুর্গত নীল্-চাষীদের পক্ষ সমর্থন করে এই পত্রিকা বাঙলার গণতান্ত্রিক জাগরণের উদ্বোধনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকে - উপনিবেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোজাত বৈপরীত্য সত্ত্বেও তারাই এদেশের মানবমুখিন বুর্জোয়া জীবনদর্শন প্রচারের প্রথম মাধ্যম, সচেতন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক এবং হিন্দু পেট্রিয়ট তাদের অন্যতম মুখপত্র।"[৭]

---

৭. তথ্যসূত্র : উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক/সম্পাদনাঃ নরহরি কবিরাজ। [কে পি বাগচী এন্ড কোং (কলকাতা) - ১৯৮৪]

চার

"...কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে ইংরেজি শিক্ষার যে সূত্রপাত হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশের শাসকরূপে দেখা দিলেও, দেশের শিক্ষা সম্পর্কে কোম্পানি ছিল উদাসীন। ইংরেজ কোম্পানি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে সামান্য সাহায্য করলেও, দেশের শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানির কোনো প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে, এ কথা স্বীকার করেনি।

১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে 'সোসাইটি ফর দি ফরমেশন অব ইন্ডিয়ানস' কলকাতায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড বেলমীর প্রচেষ্টায় কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ইন্ডিয়ানস' একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেলমীর স্কুল যে বাঙালি শিশুদের জন্য ছিল না, তা নিশ্চিত বলা যায়। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ পলাশি যুদ্ধের ২৬ বছর পূর্বেই 'সেন্ট অ্যান্ড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ' একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করে। কলকাতার ভবঘুরে ও অনাথ বালকদের ইংরেজি শিক্ষার প্রথম মিশনারি প্রতিষ্ঠান 'ওল্ড চ্যারিটি স্কুল' ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনারি ম্যাপলটফ্ট ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্যে এবং এই শিক্ষার সম্ভাব্য সুফল দেখিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন। মিশনারি কিয়েরনানডার এবং সিলভেস্টার এদেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে কিয়েরনানডার-এর স্কুলে ১৭৫ জন ছাত্র ছিল। এর মধ্যে ৭৮ জন 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ক্রিশ্চিয়ান নলেজ'-র টাকায় শিক্ষা পেত। মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও এ যুগে দু-একটি দেখা যায়। অনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মিসেস হজেস কলকাতায় মেয়েদের জন্যে প্রথম স্কুল খোলেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস 'কলকাতার মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে শিক্ষার প্রসার ছাড়া রাজনৈতিক অভিসন্ধিও ছিল। মুসলিম-তোষণই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয়। তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার যা কিছু হয়েছিল তার কৃতিত্ব বিশেষ করে মিশনারিদেরই প্রাপ্য।"[৮]

পাঁচ

"...উনিশ শতকের বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি আমরা দু-ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। একটি হল স্কুল কলেজে কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটল, অন্যটি স্কুলের বাইরে। বর্তমানে বিদ্যালয়চর্চার বাইরের জগৎটি আমরা খোঁজবার চেষ্টা করছি। আগে বলা হয়েছে, বাজারের প্রয়োজনে দালাল ফড়ে বা মুৎসুদ্দিদের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে বাংলায় কীভাবে পরোক্ষে ইংরেজি ভাষার প্রসার শুরু হয়েছিল। শুধু এখানেই বিষয়টি থেমে ছিল না। ব্রিটিশ কোম্পানি ও নবোদিত ব্রিটিশ পুঁজিবাদীরা পুঁজির মৃগয়ায় তৎপর হচ্ছিলেন। তার একটি ক্ষেত্র ছিল ভারত। বাংলায় ইংরেজ শক্তি বিশেষ তৎপর ছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় ধরে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে পুঁজির চালান ঘটেছিল বাৎসরিক ৩.৬২ মিলিয়ন পাউন্ড। উনিশ শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৬২ মিলিয়ন পাউন্ড। সুতরাং বেশ লাভজনক ছিল ভারতীয় ক্ষেত্রটি। এক্ষেত্রে ইংরেজদের খুব দরকার হয়ে পড়েছিল বাংলার ক্ষেত্রে ইংরেজদের বাংলা ভাষা জানা এবং একই সঙ্গে ইংরেজির প্রসার।

---

৮. আলোককুমার চক্রবর্তী/মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। [কে. মিত্র (কলকাতা) - জানুয়ারি, ১৯৮৯। পৃ. ১১০-১১১]

মিশনারিরা এ ব্যাপারে অগ্রগামীর ভূমিকা নিয়েছিলেন আগেই। সেখানেও প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ অনুসন্ধান। বাংলা-ইংরেজি অভিধান মুদ্রিত হয়েছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ক্রনিকল প্রেস থেকে। যার নাম ইংরেজি বাংলা ভোকেবুলারি। এর আগে পর্তুগিজ বণিক ও মিশনারিদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল পর্তুগিজ-বাংলা অভিধান। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল কতকগুলি প্রেসের ভূমিকা। যেমন হিকির প্রেস, ইন্ডিয়া গেজেট প্রেস, বেঙ্গল হরকরা প্রেস, ওরিয়েন্টাল স্টার প্রেস প্রভৃতি। এখান থেকে অভিধান, আইন ও ইংরেজি গ্রামারের বই ছাপা হত। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই বইগুলি কিনত ইউরোপীয়রা, তবে দেশি ক্রেতা একেবারে ছিল না তা নয়। মনে রাখতে হবে এই সময়কালে বঙ্গে ইংরেজি জানাটা একটা কাজের ব্যাপার ছিল কিন্তু সেটা তখনও মানসম্মানের সঙ্গে জড়িত হয়নি। উনিশ শতক ক্রমশ এগিয়ে চললে, সেই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজি জানার বিষয়টি মানসম্মানের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এ বিষয়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে, 'প্রথমত ইংরেজি জানিলে যে সামাজিক সম্মান পাওয়া যাইতো শুধু বাংলা বা সংস্কৃত জানিলে কখনই তাহা সম্ভব ছিল না।' এই দৃষ্টিকোণ তৈরি হবার পর থেকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ইতিহাস অন্যদিকে বাঁক নিতে থাকে।

তা দ্রুতগামী ও বিচিত্রগামী হয়, এমনকি পঞ্জিকার ভিতরেও ইংরেজি চিঠির মুসাবিদা করা থাকতে শুরু করে। বাঙালি পাঁজির ভিতরে মুদ্রিত নানা ধরণের চিঠি ইংরেজি ভাষায় কীভাবে লিখতে হবে তা শিখতে শুরু করে এবং প্রয়োজনে নকল করতে শুরু করে। মিশনারি প্রচেষ্টা সম্পর্কে এ যাবৎ অনেকে আলোচনা করেছেন। বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি ভাষার প্রসারে মিশনারি অবদান ছিল। পাঠ্যপুস্তক তৈরি, ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে এর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া মিশনারি কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল। উনিশ শতকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের আর একটি দিক ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ার-এর অবদান, এর পাশাপাশি আরও অনেকের অবদান ছিল। স্বয়ং উইলিয়াম কেরি ছাড়া জোশুয়া মার্শম্যান বা হানা মার্শম্যানের ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। শ্রীরামপুরে হানা মার্শম্যান প্রতিষ্ঠিত গার্লস স্কুলটির সুনাম ছিল। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দিনাজপুর, যশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানে ইংরেজি শিক্ষাদান চলত। মূলতঃ শব্দার্থ শেখা ছাড়া বাইবেলের মানে এবং দৈনন্দিন কথোপকথন শেখানো হত ছাত্রছাত্রীদের। বলা বাহুল্য এগুলির অনেকটাই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার থাকে, যেটি হল এই যে - ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহুদিন পর্যন্ত, বিশেষকরে পলাশির যুদ্ধ হয়ে যাবার পরে, মিশনারিদের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। তাদের এই ভয় ছিল যে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ফলে এদেশের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। এইজন্য ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বহু মিশনারিকে (যাদের লাইসেন্স নেই) কোম্পানির রাজত্ব থেকে বের করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিশনারিদের শিক্ষাগত কার্যকলাপের রীতিমতো বিরোধিতা করে আইন জারি করতে থাকে যার একটি হল মিশনারি স্কুলগুলির প্রতি সবরকম সাহায্যদান বন্ধ করা। এর আগে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তারা মিশনারি স্কুলগুলিকে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে উনিশ শতকের বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কিছুটা ব্যাহত হয়। অন্তত তা মিশনারি লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। পাশাপাশি দেশিয় ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া আদি ব্রিটিশ প্রশাসকরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। এইজন্য সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রসারে ধাবিত হয়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস দেশিয় মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত কলেজ। এই একই ধরণের ইংরেজি কলেজ সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত না হলেও কিন্তু মিশনারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮-তে মিশনারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজ ছিল ভারতের প্রথম ইংরেজি শিক্ষার কলেজ। যদিও এখানে প্রাচ্যভাষা শিক্ষাও দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে ১৮১৭-তে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার হিন্দু কলেজ মিশনারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কলেজ কাজ শুরু করে ইংরেজদের বাংলা ও অন্যান্য দেশি ভাষার চর্চাকেন্দ্র হিসাবে। প্রশাসনিক কারণে ইংরেজরা বাংলা শিখতেন কিন্তু এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবে দুটি ভাষার মধ্যে যে ধরণের নৈকট্য জন্মায় তা থেকে বাঙালিদের মধ্যেও ইংরেজি ভাষা চর্চার প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে। এরপর ১৮১৭-তে পাবলিক কলেজ হিসাবে হিন্দু কলেজের উত্থান। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভাষার মাধ্যম যখন ইংরেজি হয় তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে এবার ইংরেজি ভাষার প্রসার ঘটবে কারণ ইংরেজি সত্যিই রাজভাষার পদটি গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে ইংরেজি বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়ায় বাঙালি কিছুটা উপায়হীন ভাবে এবং অনেকটাই নবজাগরণের স্বপ্নে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের বিন্যাস তৈরি হয়।"[১]

---

১. উনিশ শতকের বাংলো/সম্পাদনা : অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী। [পারুল প্রকাশনী (কলকাতা) - [illegible]

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন : পটভূমি ও প্রেক্ষিত

প্রথম পর্ব

অবিভক্ত ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতা : উৎসের সন্ধানে

এক

"...আমাদের আশঙ্কা হয়, পূর্ব পাকিস্তানেও যারা এখনও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিশ্বাসী এবং উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের নামোচ্চারণে ভক্তি গদগদ হন, তাদেরও এ রূঢ় সত্যটি মনপুতঃ হবে না। কিন্তু সত্য সত্যই। বহু বহু শতাব্দী হিন্দু-মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বাস করেছে এবং একই আকাশের তলে, একই মাটির ফলে ও পানিতে এবং পানির জীব মৎস্যে উদরপূর্তি করে জীবনধারণ করেছে, কিন্তু কখনো তাদের মধ্যে হুঁক্কির ও নাড়ির সম্পর্ক জন্মায়নি। অথচ জৈবিক নীতি অনুসারে এ দুটির মাধ্যমেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহজেই স্থাপিত হয়; আর এ দুটিই হলো সমাজবিজ্ঞানীর চোখে সামাজিক একত্ব স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার।

...মুসলমানদের পূর্বে গ্রিক, শক, পহ্লব, কুশান, হুন প্রভৃতি বহু বিদেশি জাতি ভারতের বুকে হানা দিয়ে এদেশে বাস করেছে এবং কালপ্রবাহে বিরাট হিন্দু সমাজদেহে লীন হয়ে গেছে। আজ তাদের একটিরও পৃথক সত্তার চিহ্নমাত্র নেই। তার কারণ এই যে, এসব বহিরাগত জাতির না ছিল বলিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস, না ছিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরাট ঐশ্বর্য। কিন্তু মুসলমানরা যখন এদেশে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, তখন সঙ্গে নিয়ে এলো পৃথক একটি বলিষ্ঠ ও প্রাণ-সঞ্জীবনি ধর্মবিশ্বাস এবং একটি জীবন্ত আত্মচেতনালব্ধ পৃথক সংস্কৃতি ও সমাজের ঐতিহ্য। অতএব হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র নিয়েই পাশাপাশি অবস্থান করেছে - দুটির সংঘাতের ফলে একে অপরকে কিছু দান করেছে, কিছু গ্রহণ করেছে; কিন্তু কখনো দুটিতে সঙ্গম ঘটেনি, সমন্বয় হয় নি - বরাবরই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে স্ব স্ব পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে দুটি সমান্তরাল রেখার মতো।

...প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, যে মারাঠা বর্গীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও দানবীয় লুণ্ঠনকর্মে বাংলাদেশের আপামর বাসিন্দা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, সেই মারাঠা জাতির স্রষ্টা শিবাজীর উদ্দেশ্যে 'শিবাজি-উৎসব' কবিতা লিখে বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি স্মৃতিতর্পণ করেছিলেন :

তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন দাঁড়াইব আজ।

নব্য 'জাতীয়তাবাদের' উগ্রপূজারী কবি সেদিন বিস্মৃত হয়েছিলেন, এই 'শিবাজী মহারাজের' সোনামুক্তারা তার পিতৃপিতামহের সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা ও কলঙ্কের মসিলেপন করে 'খাজনা' আদায় করে নিয়েছিল এবং সে বিভীষিকার স্মৃতি সোয়া দু'শ বছর পরে আজও প্রতিটি বঙ্গমাতা স্মরণ করে আতঙ্কে শিহরিত হ'য়ে শিশুকর্ণে গুঞ্জণ তোলে :

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে।

...হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের তত্ত্বচিন্তায় কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু তত্ত্বচিন্তার আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার যে অশুভ চিন্তার উদ্ভব হয়েছিলো তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা ধর্ম ও মুসলিমদের প্রতি অন্ধ ঘৃণা সৃষ্টি করেছিলেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে বেদনার দিক। উনিশ শতকের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাবিদরা এই জাতীয় ধর্মান্ধতার সৃষ্টি এবং আকাঙ্ক্ষী। উত্তরকাল পর্যন্ত ছিল তার মালিন্যের অনিবার্য প্রভাব। তাদের সঙ্কীর্ণ ধর্ম চেতনার ফলে এই অনমনীয় চিন্তকরা কী পরিমাণে চিন্তাশক্তির অপব্যয় ও অপকর্ম দেখিয়েছেন, 'কবি-জাতীর বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মচিন্তাতেই তা সুপরিস্ফুট:

'...মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।'

এই অদ্ভুত ধারণাটি অত্যন্ত প্রকটিত এবং বঙ্কিম-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্ষুদ্রতম হিন্দুর মানসে সে ধারণাটি একভাবে প্রতিক্রিয়া করেছে। ভারতীয় জাতীয়তার চিন্তায় মুসলমানের স্থান নেই, 'একধর্ম রাজ্যপাশে' শিবাজী থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ভারতকে বেঁধে দেওয়ার স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছে, সে ভারতে ইসলাম নিতান্তই অস্তিত্বহীন, অস্বীকৃত। মুসলমানকে স্বাজাত্য, প্রতিবেশিরূপে চিন্তা করা দূরে থাক; মুসলমানকে বিদেশি আক্রমণকারী জাতির অনাত্মীয় রূপেই গ্রহণ হয় নি হিন্দু মানস। সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি 'হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোনো দ্বেষ নাই' যত দ্বেষ, যত হিংসা, যত শত্রুতা হাজার বছরের প্রতিবেশী এদেশের মাটির জাত, সর্বাংশেই ভারতীয় উপমহাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানের প্রতি। সাম্প্রদায়িকতার এমন উন্মত্ত ও দাম্ভিক প্রকাশ জগতের ইতিহাসে খুবই দুর্লভ।

...সেটি মুসলমান সমাজটাকে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় কী চোখে দেখত এবং সামাজিক স্তরে সম্বন্ধটা কী ছিল রবীন্দ্রনাথের জবানিতেই শোনা যাক:

'...আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটি বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখের মানুষ, তবু প্রতিবেশির সঙ্গে প্রতিবেশির যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না - ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।'

...উপরের উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি পরিষ্কার যে, মুসলমান এদেশে প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু বরাবরই তাকে বিদেশি ও অস্পৃশ্য ভেবেছে, এ উপমহাদেশের বৃহৎ গণজীবনের একাংশ হিসেবে ভাবতে পারেনি এবং কখনও তা স্বীকার করে নি। ইংরেজ এদেশবাসীকে 'নেটিভ' বলে দূরে রাখত, তার 'ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস, নট অ্যালাউড' কথায় ছিল শাসকসুলভ দম্ভ।

'...ইউরোপের বাইরের সমাজকে তার ঘরে বসে 'নেটিভ' বলার মতো ঔদ্ধত্য আর হতে পারে না, তার দ্বারা মানবতারই অসম্মান করা হয়, তাদের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক দুরবস্থাকে কটাক্ষ করে।' [Toynbee]

কিন্তু হিন্দুর ঘৃণাটা আরও মর্মান্তিক, সে মুসলমানদের সান্নিধ্যকে বর্জন করেছে ধর্মের ও আত্মার পবিত্রতা রক্ষার্থে। মানুষকে এর চেয়ে বড়ো অসম্মান আর কিছুতেই দেখান সম্ভব নয়। অথচ মানবাত্মার সবচেয়ে

বড়ো অসম্মান ও অবমাননা করেও হিন্দুরা আশা করেছিল মুসলমান তাদের অনুবর্তী হবে, 'বাবুদের' 'স্বদেশী' ডাকে সাড়া দিবে এবং সেটা হয় নি বলেই রবীন্দ্রনাথও পরিণত বয়সে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সব দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে দোষী করেছিলেন :

'...আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে - তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্ক কষল না করে ভাগেরই অঙ্ক কষল করাচ্ছে। দেশে এরা আছে, অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসেবে এরা না থাকার চেয়েও সাংঘাতিক - তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা-তালিকাই তার অতিবড়ো কলঙ্ক নিয়ে সবচেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।'

বিভেদটাকে ধর্মীয় অনুজ্ঞা হিসেবে শিরোধার্য করে যে হিন্দু মুসলমানকে দূরে নিক্ষেপ করল এবং আচারের বেড়া দিয়ে রইল মুখ ফিরিয়ে, যোগ-বিয়োগের সমস্যাটা যে সেই হিন্দুরই সৃষ্টি, এই রূঢ় সত্যটা মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথেরও সংস্কারে বেধেছিল।

কিন্তু তার চেয়েও প্রাঞ্জল ভাষায় এই বাস্তব অবস্থাটা, বিশদ করে দোষটা ঘাড় পেতে নিতে সংকোচ অনুভব করেন নি, বর্তমানের এক বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেছেন,

'...আজকাল হিন্দু-মুসলমান বিরোধের এই বিষম বিপদটা আমি যখন দেখি, তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হইনে, কারণ আমরাই ছেলেখেলার মতো নিজেদের হাতেই পরিশ্রম করে এই সর্পের বীজ বুনে দিয়েছি। বস্তুত এই বিরোধটা ছিল আমাদের ইতিহাসের অন্তর্গত এবং এড়ানো ছিল অসম্ভব। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন ভারতীয়দের সেই সাধারণ অসাধুতা থেকে, যারা বলেন যে, এ বিরোধ ব্রিটিশেরই সৃষ্টি, যদিও এই বিদেশি শাসকরা এর দ্বারা প্রচুর লাভবান হয়েছিল। বাস্তবিক তারা দেবতা হিসেবে অমরই হতো, রাজনীতিক জীব মানুষ হিসেবে নয়, যদি তারা আমাদেরই বহু সাধনায় নির্মিত ও আমাদের দ্বারাই তাদের হাতে তুলে দেওয়া এ অস্ত্রটির সুযোগ গ্রহণ না করত।

স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদের দিকে তাকাবার পূর্বেই অতি শৈশবে আমাদের মনমানস চারটি প্রত্যক্ষ দিকে ঐতিহ্যগতভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম, আমরা স্বভাবতঃই তাদের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতাম, কারণ তারা একসময় হিন্দুদের ওপর প্রভুত্ব করেছিল। দ্বিতীয়, সমকালীন সমাজের অঙ্গ হিসেবে মুসলমানদের আমরা কখনো চিন্তা করি নি। তৃতীয়, আমাদের বন্ধুত্ব ছিল শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় সমশ্রেণির মুসলমানদের সঙ্গে। চতুর্থ, মুসলমান কৃষক সমাজের ওপর আমাদের দৃষ্টিটা ছিল মিশ্রিত এবং ঘৃণাব্যঞ্জক, কারণ তাদের আমরা শূদ্রশ্রেণির হিন্দুর মতো কিংবা অন্য কথায় গরু-ছাগলের মতো বিবেচনা করতাম। এই চারটির মধ্যে আবার প্রথমটি ছিল প্রত্যক্ষ ও শিক্ষিত মনোবৃত্তিসঞ্জাত, বাকিগুলো স্বভাবগত।

আমরা মুসলমানদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তার বিপরীত কিছু করা ছিল আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা পড়তে শেখার পূর্বেই আমাদের শেখানো হতো - মুসলমানরা একদা আমাদের শাসন করেছে ও অত্যাচার করেছে। তারা ভারতে এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম প্রচার করেছে। মুসলমান শাসকরা আমাদের নারী হরণ করেছে, আমাদের মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ অপবিত্র করেছে। আমরা যখন বড়ো হলাম, তখন পড়েছি রাজপুত মারাঠা ও শিখরা কত বীরবিক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে লড়েছে। শিখেছি আওরঙ্গজেব আমাদের উপর কী ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে। উনিশ শতকী বাংলাসাহিত্যে মুসলমান চিত্রিত হয়েছে শুধু 'যবন' রূপে। বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ও রমেশচন্দ্র দত্ত তাদের উপন্যাসসমূহে মুসলমানের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে গৌরবোজ্জ্বল হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং মুসলমানকে চিত্রিত করেছেন ঘৃণ্যভাবে। চ্যাটার্জি তো ছিলেন প্রত্যক্ষ ও হিংস্রভাবে মুসলিমবিদ্বেষী। আমরা গোগ্রাসে সেসব উপন্যাস গলাধঃকরণ করেছি এবং তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। [স্মরণীয় : 'চলেছি করিতে যবন নিধন যোগাতে যমের খাদ্য' - রবীন্দ্রনাথ : বিচারক এবং 'যবন করপঙ্ক-কুক্কুট মাংস- লোলুপ' - রবীন্দ্রনাথ : অনধিকার প্রবেশ]

আমাদের চারপাশে যেসব মুসলমান দেখেছি তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব প্রভাবিত হয়েছে উনিশ শতকী হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ কিংবা নীরব সমর্থন দ্বারা। তাদের নীতি ছিল ঐতিহাসিক মুসলমানের প্রতি ঘৃণাটা মুসলিম সমাজের ওপর প্রচারিত করা। এর ফল হয়েছে অতীতমুখী।

সমসাময়িক মুসলমানদের আমরা গণনার মধ্যে আনিনি, হয় তাদের ভুলেছি নয় উপেক্ষা করেছি। ব্রিটিশ শাসন ইসলামি কালচারের চর্চা করা কিংবা হিন্দুদের সহানুভূতি মুসলমানের প্রতি আকর্ষণ করার বিরুদ্ধ ছিল আর এই পরিস্থিতিতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আবিষ্কার কর্মটা জোরদার করা হয়েছিল। এই রেনেসাঁর প্রথম ফল হয়েছিল ভারতীয় হিন্দুকে একেবারেই অ-ইসলামিকরণ ও হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন করণ। সারা উনিশ শতকব্যাপী সাধনা চলেছিল ভারতীয় হিন্দু কালচারকে প্রাচীন সংস্কৃতের মৌল ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করা। যে একটি মাত্র অ-হিন্দু প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো ও যার আত্তীকরণ করা হতো, তা হলো ইউরোপীয় মাত্র। আধুনিক ভারতের সব চিন্তানায়ক ও সংস্কারক - রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জীবনব্যাপীসাধনা করেছেন একটি মাত্র সমন্বয় সাধনের - আর সেই সমন্বয়টি হিন্দু ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার। ইসলামি ভাবধারা ও ট্রাডিশন তাদের চেতনাবৃত্তকে কখনো স্পর্শ করেনি।

...সত্য বলতে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই-জাতিত্ব-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, আর এটা শুধু তত্ত্বকথা না, এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানত, এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম।' [Autobiography of An Unknown Indian]

আশ্চর্য এই যে, মুসলমান যদি তার ধর্মীয় জীবন উন্নত করতে চেয়েছে, অনুসরন করতে চেয়েছে, তাকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায়তন থেকে সর্বক্ষেত্রে যখনই সে নিজেকে চিহ্নিত করতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে মুসলমান হিসেবে, তখনই তাকে বিজাতীয়, বিদেশি ও অস্পৃশ্য হিসেবে বর্জন করা হয়েছে। 'ভারতীয় মুসলমান' না হয়ে 'ভারতীয় হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত' হতে যখন মুসলমান আপত্তি জানিয়েছে, তখনই তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে 'যোগ বিয়োগের সমস্যা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর চেয়ে সত্য নিয়ে প্রতারণা ও ছেলেখেলা আর ইতিহাসে দেখা যায়নি।

...মুসলমানদের অপরাধ ছিল, তার মুখের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ছয় শ বছরেরও ব্যবহৃত ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজিকে এককালে বরণ করে নিতে পারে নি, পারে নি নিজের জাতীয় কালচারের পরিবর্তে ইংরেজের প্রসাদপুস্ট মুৎসুদ্দি-দালালদের সংস্কৃতি বা বাবু কালচারকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে। প্রথমটির কারণ ছিল, মুসলমান দেখেছে ইংরেজ তাকে শাসক থেকে শাসিতে পরিণত করে তার মুখের ভাষাও কেড়ে নিয়ে তাকে সব ক্ষেত্র থেকে স্থানচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। আর দ্বিতীয়টির কারন ছিল, বাবু কালচার ও বাংলা সাহিত্য থেকে তাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে বর্জন করা হয়েছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় মুসলমানকে নব্য ভারতীয় কালচার থেকে 'একস্টার্নাল প্রলেটারিয়েটের' মতো দূরে রাখা হয়েছিল। তবু যদি মুসলমান হিন্দুর এ জগতে প্রবেশের স্পর্ধা করত তাহলে তাকে ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে আসতে হতো। তৎকালীন মুসলমান তা পারেনি আত্মমর্যাদা ও আত্মসত্তা বিকিয়ে দিয়ে। অথচ তার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, আজকাল তাকে তারই বংশধরের হাতে ধিকৃত হতে হচ্ছে। পিতামাতামহ আজ ধিকৃত হচ্ছেন সংকর সংস্কৃতি গঠন ও অনুসরণ করার জন্য এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে 'হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পারিয়ার মতো পদলেহনশীল জীবে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য।

এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ সঙ্কের ও অপরিপক্ক চিন্তার প্রবণতা জন্মে দুটি কারণে। প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে প্রত্যয়ী জ্ঞানের অভাব হলে অথবা অন্য স্বার্থবশে হীনমন্যতা জন্মালে ও প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করার

মানসিকতার সৃষ্টি হলে। উভয় কারণই বেদনাদায়ক। সকল শ্রেণীর শুভবুদ্ধির ভিত্তিমূলেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত এবং কল্যাণ নিহিত। সকলেরই এ শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, এ আশাই করব।"[১০]

দুই

"...হিন্দু! লোকে যে পুরাণ কাহিনি মনে করিয়া নিরপেক্ষতা ও উদারতা শিক্ষা করিতে পারে, তাহা অনেক দিন হইল তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। আজ আবার একটু স্মরণ কর, যে দিল্লীর সম্রাটকে একদিন তুমি জগদীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়াছ, যাহাকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনায় একদিন তোমাদের চন্দ্র সূর্য অনল বংশীয় রাজগণও নিজ নিজ ভগ্নী ও কন্যাগণ উপহার দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন; যদি তোমাদের সেই জগদীশ্বরেরা তোমাদিগকে গরু জবে করিতে আদেশ করিতেন, তবে বল তোমরা তৎক্ষণাৎ ছুরি হাতে লইয়া, হাঁটু গাড়িয়া গরুর গলার কাছে বসিয়া যাইতে কি না? সেই আদেশটি যদি আর একটু চড়াইয়াই করিতেন, তবে বল আজ ভারতের গৃহে গৃহে গো-মাংসের সুগন্ধ পাওয়া যাইত কি না? যদি অস্বীকারের মতলব করিতেছ, তবে দেখ, ঐ যে পঞ্চাশ লক্ষ শতযুদ্ধ বিজয়ী, লৌহ-মুকুটধারী দাড়িওয়ালা বীরপুরুষ তরবার নিষ্কোষিত করিয়া, বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহারা এখনই তোমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, সাবধান! অস্বীকার করিও না। এখন দেখ, তাহারা যদি তোমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রতা প্রদর্শন করিতেন, তবে তোমাদিগকে কি মহা বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তাহারা সে চিন্তাও কখনও করেন নাই। কারণ অধীনস্থ দাসদিগের শোচনীয় জীবনের স্বাধীন ইচ্ছাটুকুর উপর হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও পাপ বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। যে মোসলমান এক সময়ে তোমার ঘৃণিত পৌত্তলিক জীবনের প্রতিও এইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আজ তুমি নিজের শক্তি ও অধিকারের পরিমাণ ভুলিয়া তাহারই উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহারই সামাজিক কার্যের উপর হাত বাড়াইয়াছ, তাহাদেরই ধর্মসঙ্গত অধিকার পদদলিত করিবার চেষ্টায় আছ।

তুমি কে? তুমি হিন্দু শিক্ষিত লোক, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বা অন্য কিছু; তুমি দেশের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে একজন মাত্র, তোমার শক্তি ও অধিকার প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক মোসলমান অপেক্ষা তিল প্রমাণও অধিক নহে; তুমি হিন্দু জমিদার, তুমি ইংরেজ রাজার অধীনে একজন কর সংগ্রাহক মাত্র; দিন দিন গবর্নমেন্ট ভূমির উপর জমিদার অপেক্ষা প্রজাদেরই স্বত্ব স্বীকারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আর তোমার পূর্ব পুরুষও কিছু নিজ রক্তের, নিজ মস্তকের বিনিময়ে এ জমিদারী লাভ করেন নাই, তবে বল তুমি মোসলমানের উপর কোন অধিকারে এই অন্যায় অত্যাচার করিতেছ? আর হিন্দু! তোমার কি আর লজ্জার লেশমাত্রও নাই? তুমি কোন লজ্জায় বল, এ হিন্দুর দেশ; এদেশে আর গো-হত্যা হইতে পারিবে না? এ দেশ কি হিন্দুর? যে দেশ বাহু বলে রক্ষা করিতে পার নাই, রণক্ষেত্রে শত্রুর ভীষণতা দেখিয়া, যাহাকে অরক্ষিতভাবে পরিত্যাগ করিয়া, পৈতৃক প্রাণটির আশায়, আঁচলের নিচে লুকাইয়াছিলে, সহস্র বৎসর যে দেশ অন্যে ভোগ দখল করিল, নিজের ইচ্ছামত ভাগ বন্টন দান করিয়া নিজ শক্তির সামর্থ দেখাইল, এতকাল পরে আবার তাহা নিজের দেশ বলিয়া আবদার করিতেছ? ধন্য লজ্জা-হীনতা! ধন্য অজ্ঞানতা!! ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রেমিকতা!!!

বলিবার ত অনেক কথা ছিল, কিন্তু বলিব কাহাকে? ইচ্ছা ছিল, ধীরভাবে এই গুরুতর গোলযোগের মীমাংসা হয়, কিন্তু সে কথা শোনে কে? যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইসব কথা বলিতেছি, যাহাদিগকে উদারতার প্রথম পাঠ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহাদিগের নীতিজ্ঞান আবার অনেক দিন হইল, মরিয়া গিয়াছে। শত লুথারের তেজোবল লইয়া যে মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দেখ, তোমাদের ঘোর অজ্ঞানতার নিকট তাহারা কিরূপ অবমানিত হইতেছেন। তাহাদের বজ্র বিদ্যুতের প্রতাপ সম্পন্ন লেখনী তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিতে পারে নাই, আমার দুর্বল লেখনী কেমন করিয়া তোমাদিগকে তাহা বুঝাইবে? তোমরা কৌলিন্য প্রথার বশীভূত হইয়া শত সংখ্যক অবলার পানিগ্রহণ করিয়া,

[১০]. জাস্টিস আবদুল মওদুদ/মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর। [মাওলা ব্রাদার্স (পুন : মুদ্রণ) - ফেব্রুয়ারি, ২০১১। পৃ. ৩১/৩৭-৩৮/২৫০/৩২৭-৩৩৪]

তাহাদিগকে চির দুঃখিনী করিতে পার, সে দিকে তোমাদের দয়া ভুতানুকম্পা ঘেঁষে না। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের হাতে তিন বৎসরের শিশু-কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় কর, সেখানে তোমাদের সদ্বিবেচনা প্রবেশ করিতে পারে না। আবার তাহার এক বৎসর পরে যখন সেই দুগ্ধপোষ্য কন্যা বিধবা হয়, তখন তাহাকে চির ব্রহ্মচর্যের আদেশ করিয়া, পরলোকে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত কর, তখন তোমার চিন্তাশীলতা থাকে না। আবার যখন বয়োঃদোষে সেই হতভাগিনী অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে গোপনে ভ্রূণ-হত্যার অনুমতি দিয়া, সমাজে লোকলজ্জার উপর পাথর চাপা দাও, তখন তোমার নীতিজ্ঞান, দয়া-বৃত্তি, বিবেক জ্ঞান কোথায় থাকে? এ সমস্তের বিষম ফল তোমরা অহরহ ভোগ করিতেছ, অথচ যখন তোমাদের জ্ঞান বিবেকের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, সদ্বিবেচনা উন্নিত হইতেছে না, বড় বড় ধাক্কা পাইয়াও সারা শব্দ করিতেছ না, একটা পাশও ফিরিতেছে না, তখন তাহারা অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছি। নতুবা বুঝিয়া দেখ, এই নারীহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বংশের ব্যভিচারজাত কলঙ্কই অধিকতর ঘৃণিত, নিরতিশয় অপবিত্র না আমাদের গরু জবে, গো-মাংসে ভক্ষণই তোমার নিকট অধিকতর ঘৃণিত, অপবিত্র বিদ্বেষের আস্পদ?

হিন্দু! তোমার মাথায় কাল চুল, তুমি সব কথা বিবেচনা করিতে পারিবে না। বিশেষ নিকৃষ্টতা তোমার প্রাকৃতিক স্বভাব, ক্ষুদ্রতা তোমার হৃদয়ের রক্ত; বাল্য যৌবন বার্ধক্য, ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কোনকালেই তুমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পার না। তোমার গৃহজীবন, তোমার রাজনৈতিক জীবন এই নিকৃষ্টতাতেই গঠিত। দেখ বাল্য বয়সে স্কুল কলেজে যাইয়া মোসলমান ছেলেদের টুপি লইয়া টানাটানি করা, যৌবনে যবন বিদ্বেষ, পাষন্ড দুর্দান্ত যবনকে ছড়া কাটাইয়া কবিতা লিখিয়া গাল দেওয়া, ভারতমাতার অধীনতা দেখিয়া যবনের মুন্ডপাত লেখা ও দাঁত কড়মড়ি দেওয়া তোমার ধর্ম। বৃদ্ধকালে সর্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া মাথা ঘুরাইতে ফিরাইতে মোসলমানের সামাজিক কার্য লইয়া তাহাদিগকে নির্যাতন করা তোমার একমাত্র উপাসনা। তুমি কি সাহস করিয়া বলিতে পার, কোন মোসলমান কোন বিষয়ে তোমার নিকট স্বল্পমাত্রও ভদ্রতার প্রত্যাশা করিতে পারেন? হিন্দু। তুমি তাহা বলিতে পারিবে না। তোমার সে কথা বলিবার অধিকার নাই। পক্ষান্তরে কোন মোসলমানের নিকট হইতে তুমি নিকৃষ্ট ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছ এমন কথাও বলিতে পার না।

হিন্দু! আর কিছু বলিব না। অত্যাচারীকে ন্যায়ধর্মসঙ্গত উপদেশ দিয়া, তাহার কার্যের অবৈধতা প্রমাণ করা অপেক্ষা গন্ডস্থলে দারুণ চপেটাঘাতে তাহাকে ভুপাতিত করা অধিকতর সঙ্গত। কারণ তাহা হইলে লোকের মুখ খরচ করিতে হয় না, অথচ অলক্ষ্যে আর একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়। তর্কের সাহায্যে বকিয়া ঝকিয়া মাথা ধরাইয়া তুমি তাহাকে যাহা বুঝাইতে পারিতে না, সে নিজেই তখন তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজের দোষ ও চরিত্র সংশোধন করে। কিন্তু হিন্দু। ফকির আবদুল্লা-বিন-এসমাঈল মোসলমানদিগকে সে তৈয়ার চটেপাঘাত শিক্ষা দিবার পূর্বে আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ভাল, তোমরা কি প্রকৃতপক্ষেই মোসলমানদিগের প্রতি এইরূপ অত্যাচার ও শত্রুতা সাধন করিতে নিজেকে উপযুক্ত মনে কর। মোসলমানদিগকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া কি তাহাদিগকে সে অত্যাচারের প্রতিশোধে অক্ষম মনে কর? তোমাদের সেরূপ মনে করা অসম্ভব নহে, তোমরা মানুষের মধ্যে টুনটুনী জাতীয়।

একটা টুনটুনী বীর আসিয়া আহলাদে বলিল,
মা টুন টুন টুন।
আমি যে গাছে বসি, সেই ভারে নড়ে চড়ে
কেঁপে হয় খুন,
মা এসব আমার মহাবলের গুণ। মা বলিল -
বাবা লতার ডগায় নুতন পাতায়
ব'স টুন টুন টুন।
যাও শালের ডালে, অশথ গাছে বুঝ গিয়া গুণ
আমার সোনার টুন টুন।

কিন্তু তোমরা সে-সব বুদ্ধি দূর কর, এতকাল মোসলমানেরা তোমাদের ওসব অন্যায় অত্যাচার অবহেলায় হাসিঠাট্টার বিষয় মনে করিয়া, 'মৃগীর প্রহারে যথা মৃগেন্দ্রের মন' এই ন্যায়ে সহ্য করিতেন। মানবজীবনের যে অবস্থায় কোন সময়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালবাসা, সুকুমার সন্তানের আদরও লোকের বিষতুল্য মনে হয়: আজ মোসলমানও সেই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তোমাদের এ অন্যায় অত্যাচার যথেচ্ছাচারের বিপক্ষে সাবধান ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন।

হিন্দু! তুমি গো-বধ নিবারণের জন্য কার্যক্ষেত্রে যে প্রমত্ততা দেখাইতেছ, মোসলমানদিগের সামাজিক কার্য আয়ত্তাধীন করিবার জন্য যে অধ্যাবসায় দেখাইতেছ, যখন তোমার প্রতিপক্ষ আবার কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন তোমাদের তৎসমুদয় হতপ্রভ হইয়া যাইবে। তুমি আর কার্যে প্রমত্ততা, অধ্যবসায় কি কি শিখিয়াছ? মোসলমান কি বর্ষব্যাপী যুদ্ধ, কি বৈর-নির্যাতন, কি আত্মপক্ষ সমর্থন প্রত্যেক বিষয়েই তোমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। তুমি গরু কোরবানি নিষেধ করিয়াছ, মোসলমান প্রতিমা-পূজা, পাঁঠা বলি প্রতিষেধ করিবেন; তুমি গো-মাংস ভক্ষণ নিবারণের চেষ্টা করিতেছ, মোসলমান তোমার হাঁস, কবুতর ছিঁড়িতে প্রতিবন্ধক হইবেন, তুমি দাড়ির উপর ট্যাক্স বসাইয়াছ, মোসলমান টিকির উপর কর বসাইবেন। বল তাহা হইলে কোন পক্ষ অধিক উৎপীড়িত হইবে? দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ না হয় মোসলমান, তোমরা চারিজন কান্দিবে, আমরা একজন; সুতরাং তোমার দুঃখের পরিমাণ মোসলমানের চারিগুণ হইয়া পড়িতেছে। আবার মোসলমান এখনও আত্মরক্ষার্থে সমর্থ; তুমিও কি সে অহঙ্কার কর? বোধ হয় না।

হিন্দু! তোমাকে আর কি বলিব? বলিলেও তুমি বুঝিবে না। তোমার আচার ব্যবহারে অন্যায় অত্যাচারে মোসলমানের হৃদয়ে যে কষ্ট, যে দুঃখ, যে প্রতিহিংসা প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছ, আমি ধীরভাবে বুঝাইতে গিয়া তাহার শতাংশও প্রকাশ হইতে দিলাম না। হিন্দু! কি বলিব, অহোরাত্রব্যাপী যুদ্ধেও ধৈর্য স্থির অটল, আমার সেই মোসলমানের ধৈর্য, তাহাও তোমার ব্যবহারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তোমাকে তোমার নিজকৃত দুর্ব্যবহারের বিবেচনা, অনুশোচনা ও মোসলমান সমাজকে সতর্ক এবং সভ্য জগৎকে সাক্ষী করিবার জন্য এই অগ্নিকুক্কুট-আগুনের নুড়া প্রস্তুত করিলাম। যদি আবশ্যক হয়, ইহার পর কালানল প্রজ্জলিত করিয়া দিব।

পুনশ্চ, এসলাম অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালানল স্বরূপ। যখনই কেহ ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তখনই এই পবিত্র তেজের জিহ্বা বাহির হইয়া, তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। অগ্নিকুক্কুট আর কিছুই নহে, ইহা সেই পবিত্র ইসলামের তেজ মস্তকে ধারণ করিয়া বাহির হইল।

হিন্দুদিগের প্ররোচনায় দুই একজন আত্মতত্ত্ব বিহীন ধর্ম শাস্ত্রানভিজ্ঞ, অদূরদর্শী মোসলমানও আজকাল গরু কোরবানি ও গো-মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন। আজ আর তাহাদিগকে কিছু বলিব না, কেবল তাহাদের অবগতির জন্য পবিত্র মহা কোরআনের একটি প্রবচন এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম -

> 'ওয়া মাইইউশাক্কিক্বির রাসুলা মিম বা'দি মা তাবাইয়ানা লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি' গাইরা সাবীলিল মু'মিনীনা নুয়াল্লিহী মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহী জাহান্নামা ওয়া সাআত মাসীরা।'
> (সুরা নেসা - ১১৫)

যে সত্য পথ প্রকাশ হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হয়, এবং বিশ্বাসী দিগের বিরুদ্ধ পথ চলে, যে বিষয়ে সে সমুৎসুক, আমি তাহাকে সেই দিকের পরিবর্তনেই উন্নত করিব, আর তাহাকে নরকে আনয়ন করিব, উহা কুস্থান।

মোসলমান সাবধান! গো-মাংস ভক্ষণ আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত, গোরু কোরবানী করা তাহার একরূপ আদেশ, গরু কোরবাণী করা হজরত রসুল সাল্লেল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুষ্ঠান, সর্বদেশের সর্বকালীন সমুদায় মোসলমান এ কার্য এক মতে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, ইহার বিরুদ্ধ পথে চলিয়া

জাহান্নামে যাইয়া পড়িও না, উহা কাফেরদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যাহারা তোমাদিগকে এ সমস্ত ক বুঝাইয়া, তোমাদিগকে নরকের দিকে উন্মুখ করিয়াছে, তাহারা শয়তান। 'লায়না তুল্লাহেল কাযেবি বলিয়া তাহাদের মুখে ও বুদ্ধিতে থুথু দাও।

ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গবর্নমেন্ট! তুমি কি অন্ধ? হিন্দু কর্তৃক মোসলমানের প্রতি এই যে দেশব্যাপী অন্য অন্যায় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে মোসলমানের কিছু বলিবার পূর্বেই কি তোমার উৎপীড়ন চেষ্টার মূলোচ্ছেদ করা উচিৎ নহে? সত্য বটে তোমার আইন আছে, বিচারালয় আছে, দক্ষ বিচার আছে, শান্তি রক্ষক আছে; কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি দেশব্যাপী অত্যাচার আইন ও বিচারক দ্বা নিবারিত হওয়া অপেক্ষা রাজকীয় শক্তি দ্বারা নিবারিত হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। কারণ উৎপীড়িতদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন লোকেই এমন, যাহারা আইন আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ইংরেজ গবর্নমেন্ট! তুমি প্রজাসাধারণের ধর্ম সম্বন্ধেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছ জানি। এখন এরূপ অত্যাচার সম্বন্ধেও সেই নিরপেক্ষতা গ্রহণ করিলে? তোমার কৌশলে না হউক - অন্ততঃ তোমা আলস্য ও উদাসীনতায় ভারতবর্ষীয় মোসলমানেরা রাজকার্য হইতে বঞ্চিত, শক্তি বিরহিত সুতরাং জা সংহতদের দ্বারা উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হইতেছিলেন, কয়েকদিন হইল, তোমার সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এক চক্ষু মার্জন ও দেশের চারিদিকে গূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ, মোসলমানেরা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে যে অ অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে কি না? ঘটনা ও সুযো কখনও মনুষ্যের আয়ত্ত নহে, বরং ঘটনা ও সুযোগই মানবকে অনুকূল কার্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ প্র করিয়া লয়। হিন্দুদিগের এই অন্যায় অত্যাচারে প্রচুর রূপে কর্ষিত দেশের উর্বর ক্ষেত্রে হিন্দুর অনধিক চর্চা ও নির্যাতন যে শত সহস্র তিতুমিরের বিদ্রোহের বীজ বপন করিতেছে এবং অহোরাত্র যত্ন চে সহস্র সহস্র তিতুমির নির্মাণ করিয়া তুলিতেছে, যদি তৎসমস্ত দেখিতে পাও, তবে চক্ষুষ্মান, নতুবা তু অন্ধ। আজ না হয় কাল তোমার সে ঘুম ভাঙ্গিবে, কিন্তু চক্ষু মুছিয়া, হাই তুলিয়াই যখন অপরাধী বিবেচন তোমাকে শত সহস্র মোসলমানের প্রাণ বধ করিতে হইবে, তখন অকিঞ্চন আবদুল্লাহ্-বিন্-এসমাইলে এই শেষ নিবেদনটি একবার স্মরণ করিও, এই প্রার্থনা।"[১১]

তিন

"...এবার ভাষা ও লিপির প্রসঙ্গ। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে সপ্তদশ শতাব্দীতেও হিন্দি নামে কোন ভাষা ছিল না, যেমন দশম শতাব্দীতে হিন্দু ধর্ম নামে কোনও ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। গজনীর মাহমুদে ভারত আক্রমণগুলির পূর্বে ভারতে ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, গাণপত্য ধর্ম প্র বহু ধর্ম। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কি-পাঠান-পারসিকরাই হিমালয়ের ও হিন্দুকুশের দক্ষিণে প্রচলি ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মকে একসঙ্গে যোগ করে হিন্দুধর্ম নামে একটি সুপ্রশস্ত আধারে স্থাপন করেছিল।

একই রকম ব্যাপার ঘটল সাতশ বছর পরে। বর্তমানে যাকে হিন্দি ভাষা বলা হয় তা আসলে মধ্যযুগ প্রধান ছয়টি ভাষার সমাহার। এই ছয়টি ভাষা হল:

১. সুরদাস, ভূষণ, মীরা প্রভৃতি যে-ভাষায় পদ রচনা করেছেন সেই ব্রজ-ভাষা।

২. তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানসের অওধী বা অবধী ভাষা।

৩. মাড়োয়ারি, ডিঙ্গল প্রভৃতি রাজস্থানী ভাষা - এই ভাষায় 'কৃষ্ণ-রুক্মিণী', 'ঢোলা-মারু' প্রভৃতি বিখ্যাত গা কাব্য আছে এবং মীরার ভজনগুলিও প্রথমে এই ভাষায় রচিত হয়ে পরে ব্রজভাষায় রূপান্তরিত হয়।

৪. পাঞ্জাবী ভাষা যাতে শিখ গুরুগণ বাণী রচনা করেন।

---

১১. অগ্নিকুক্টি/আহমদ মাশহাদী (বৈশাখ, ১৩০৯), তথ্যসূত্র : মাশহাদী-রচনাবলী/পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশ অল-কোরেশী অল-হিন্দী (সম্পা: আবদুল কাদির)। [কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড - ডিসেম্বর, ১৯৭০। পৃ. ২৯৬-৩

৫. পাহাড়ি ভাষা।

৬. ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহী প্রভৃতি ভাষা নিয়ে বিহারী ভাষা পরিবার।

এই সঙ্গে মনে রাখা ভাল যে মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সমন্বয়বাদের কবি কবীর ভোজপুরী, অওধী, ব্রজভাষা এই তিনটি ভাষার সংমিশ্রণে এক নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন অর্থাৎ তার ভাষাও তার ভাবনারই প্রকাশ। আবার এগুলির সঙ্গে উর্দু ভাষা মিশে গিয়ে গড়ে উঠেছে আগ্রা-দিল্লি-লখনৌর খাড়ী বোলি হিন্দি।

এই মিশ্রণের প্রক্রিয়া উণবিংশ শতাব্দীর কলকাতাবাসীদের মিশ্রসমাজে একটা বিশেষ রূপ পায়। কলকাতা শহর গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের আর সেই সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির আকর্ষণে গঙ্গা বিধৌত সমস্ত উত্তর ভারতের, উপরন্তু পাঞ্জাব রাজস্থান গুজরাট সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে দলে নানাভাষী মানুষ এসে জড়ো হয় কলকাতায়। এই বহুভাষী মিশ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে নতুন সামান্য ভাষা মুখেমুখে গড়ে ওঠে তা-ই আধুনিক হিন্দি ভাষার প্রথমাবস্থা।

এদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংল্যান্ড থেকে আগত ইংরেজ যুবকদের একটা স্থানীয় ভাষা তালিমের প্রয়োজন হচ্ছিল - সেটা এমন একটা ভাষা হবে যা দিয়ে পাঞ্জাবী রাজস্থানী অওধী ভোজপুরী মৈথিলী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়নরা কথোপকথন করতে পারবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জেমস গিলক্রাইস্ট তেমন একটা ভাষাকে ব্যাকরণবদ্ধ ভাবে গড়ে তোলার কাজে লালুজী লাল, পন্ডিত সদল মিশ্র প্রমুখ অধ্যাপকদের নিয়োগ করলেন। ওদিকে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে বাইবেলের বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য সাহায্য নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সৃষ্ট হিন্দিরই। হিন্দি সাংবাদিকতার ইতিহাস শুরু হল 'উদন্ত মার্তন্ড' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে যা কলকাতা থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপরে বারাণসীনিবাসী একজন বাঙালি প্রকাশ করলেন 'সুধাকর' নামে একটি পত্রিকা। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দির বাল্য ও কৈশোর কাটে।

...একই সঙ্গে শুরু হল উর্দু এবং হিন্দির মধ্যে শক্তিপরীক্ষা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ভারতের সম্ভ্রান্ত সমাজে তিনটি ভাষার সম্যক প্রচলন ছিল। পারসিক, সংস্কৃত ও উর্দু। প্রথম দুটি ছিল বিদ্বান ব্যাক্তিদের বিদ্যা অনুশীলনের ও আলোচনার ভাষা, কিন্তু ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের আলাপের ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার ভাষা ছিল উর্দু।

ইংরেজদের দ্বারা মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহের নির্বাসনের পরে কোন কোন হিন্দু মহল থেকে উর্দুকেও নির্বাসনে পাঠিয়ে তার স্থানে হিন্দির অভিষেক সম্পানের দাবি উঠতে শুরু করে। কিন্তু অনেক অভিজাত বা শিক্ষিত হিন্দুর কাছেও হিন্দির জন্য ওই দাবি নিম্নরুচির পরিচায়ক ছিল। এর মধ্যে দুই প্রজন্মের বিরোধও নিহিত ছিল। লালা লাজপত রাই তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি যখন আর্য সমাজে দীক্ষা নিয়ে হিন্দির প্রচার শুরু করেন তখন তার পিতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন যে উর্দু হল শরিফ বা গণ্যমান্যদের ভাষা আর হিন্দি হল বাজারের বা ক্রেতা বিক্রেতার ভাষা।

বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে সভাপতির একটি ভোটের জোরে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। কিন্তু হিন্দির প্রচারকগন সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে উর্দু বর্জন করে হিন্দি গ্রহণের জন্য প্রচন্ড আন্দোলন শুরু করেন। ফলে অনিবার্য ভাবে ভাষার বিষয়টা সাম্প্রদায়িক চরিত্র, বর্ণ ও রূপ লাভ করে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদে ও বিরোধে ইন্ধন জোগায়। একদিকে হিন্দু ধর্মসভা ও গোরক্ষিণী সভাগুলির উর্দুর বিপক্ষে ও হিন্দির পক্ষে তীব্র তৎপরতা অন্যদিকে মুসলিম মজলিস ও মৌলবী জামায়েতগুলির উর্দুর পুরনো ইজ্জৎ রক্ষার জন্য মরিয়া লড়াই।

স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক কারণে অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য হিন্দির বলবৃদ্ধি অনিবার্য ছিল। আদিতে মুনসি প্রেমচন্দ ছিলেন উর্দু সাহিত্যিক, কিন্তু ক্রমবর্ধমান হিন্দিবাদীদের এবং অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনিও উর্দুকে বর্জন করে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌছবার জন্য হিন্দিকে বরণ করেন। বর্তমানে তিনিই শ্রেষ্ঠ হিন্দি সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভাষা ও লিপির প্রশ্নকে হাতিয়ার করে উত্তর ভারতের উদ্যোগী শহরে হিন্দু সমাজ নিজেদের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক পরিচয় পরিস্ফুট ও প্রতিষ্ঠা করার নামে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলিম সমাজকে ধিকৃত, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন এক নিম্নতর ধাপে নামিয়ে দেয়।

...প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাবের পর থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত মোটামুটি ত্রিশ বছরের ইতিহাস রচনার কালে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি - ব্রিটিশ রাজ, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ এই তিনটি শক্তির মধ্যে রাজনীতিক টানাপোড়েন, দরকষাকষি ও লড়াইয়ের মধ্যে। আমরা ভুলে যাই যে কংগ্রেসের পেছনে তথা ভেতরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শক্তিও ছিল এবং তাছাড়াও হিন্দু মহাসভার একটা পৃথক শক্তি ছিল এবং তাছাড়াও ১৯২৫ সালে নাগপুরে দশেহরা উৎসবের দিনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের একটা উগ্র হিন্দু শক্তি ছিল। আমরা ভুলে যাই যে ১৯২৮ এর ডিসেম্বরে জয়কারের আচরণে জিন্না শুধু অপমানিত হননি বা কলকাতা থেকে সোজা দিল্লীতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম নেতা মহম্মদ শফির সঙ্গে হাত মেলাননি, পরে তিনি জয়কারের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'parting of the ways' বলে চিহ্নিত করেন। আমাদের মনে রাখা ভালো যে গান্ধী বা নেহেরু নন, জয়কারই জিন্নার জীবনের শেষ দুই দশকের চিন্তাধারা ও কর্মসূচীকে নির্ধারণ ও পরিচালন করেন। জয়কার মানে ড. মুকুন্দ রামরাও জয়কার নামক এক ব্যক্তিমাত্র নন, একটা উপসর্গ, একটা লক্ষণ, একটা বিশেষ বক্তব্য, একটা শক্তি। সেই শক্তির তখন বালক কাল, কিন্তু তার উদ্ধতার উৎস ছিল বর্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যখন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন তখন জিন্না ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে সরকারি ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার জন্য ক্ষুব্ধ হন। তিনি কোনও বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য অন্তত ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আন্দোলন করেননি, তিনি চেয়েছিলেন সংখ্যালঘুর স্বার্থ সুরক্ষা। ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমার্থক নয়। ১৯৩৫ সালেও জিন্না বলেন,

"Minorities means combination of things. It may be that minority has a different religion from the other citizens of a country. Their language may be different, their race may be different, their culture may be different, and the combination of all these elements - religion, culture, race, language, art, music, and so forth makes the minority a separate entity in the State, and that separate entity wants safeguards. Surely, therefore, we must face this question as a political problem. We must solve it and not evade it."

একটা সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভিন্নতাকে তিনি বাধা মনে করেননি। সর্বভারতীয়তাকে তিনি ধর্মের আলোকে নয়, রাজনীতিক বিষয় হিসেবে বিচার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সংখ্যালঘু প্রশ্নটা রাজনীতিক আর সম্প্রদায়ের প্রশ্নটা ধর্ম-সংক্রান্ত এবং তাই সংখ্যালঘুর রাজনীতিক বিষয়টাকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললে ভারতীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

জিন্নার চিন্তাধারা দুটি প্রাচীরে বাধা পেয়ে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে একেবারে ভিন্নখাতে ঘুরে যায় - এ দুটি প্রাচীরের একটি হল ড. মুকুন্দ রামরাও জয়কার যে গোষ্ঠীর মুখপাত্র ছিলেন সেই হিন্দু মহাসভা এবং অপরটি হল হিন্দু মহাসভারই ঘণীভূত সংস্থা ড. কেশব বলিরাম হেডেগোওয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ। ১৯২৮ সালে জিন্নাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কোন অধিকারে তিনি ভারতের সংবিধান নিয়ে কথা বলছেন আর ত্রিশের দশক জুড়ে হিন্দু মহাসভার ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের নেতাগণ বারবার প্রশ্ন তোলেন ভারতে মুসলমানদের অধিকার নিয়ে।

চল্লিশের দশকের ঘটনাবলির কারণগুলি লুকিয়ে আছে ত্রিশের দশকে হিন্দুত্ববাদী সভা-সঙ্ঘের কথায় ও লেখায়। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী শক্তির যে কংগ্রেসের বাইরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে একথা জিন্নার অন্তত তখনও মনে হয়নি। কলকাতায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তার সভাপতির ভাষণে হিন্দুসভার 'heightened activity' কে জিন্না চিহ্নিত করেন 'Congress atrocities' শব্দ দুটি দিয়ে।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্ববাদী শক্তি তখনও যৌবন লাভ করেনি, তখনও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে এবং এই গোষ্ঠীর অনেকেই তখনও কংগ্রেসের সদস্য, কিন্তু গান্ধীজিই তখনও ভারতের অবিসংবাদিত নেতা, তখনও গান্ধীজির ইচ্ছাতেই স্থির হয় যে কংগ্রেসের কোন্ নির্বাচিত সভাপতি ('রাষ্ট্রপতি')- কে কাজ করতে দেওয়া হবে বা হবেনা। তাই মুসলিম লীগের নেতা রূপে জিন্নাকে বোঝাপড়া করতে হল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেই এবং প্রধানত গান্ধীজির সঙ্গে। একদা গান্ধীজির প্রতি জিন্না অভিযোগ করেছিলেন যে, গান্ধীজি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দিচ্ছেন। এবারে জিন্নাই সেই রণনীতি গ্রহণ করলেন - ধর্মের নামে রাজনীতি। মাইকেল এডোয়ার্ডস লিখেছেন, 'Tilak had been the first to recognize the power of religious feeling as a weapon against the British; Jinnah learned the lesson and turned it against Congress.'

ঘটনা এই যে টিলক, লাজপত রাই, গান্ধীজি প্রমুখ অনেকেই রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন এবং তখন জিন্নাই তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং জিন্নার ট্র্যাজেডি এই যে তিনি যার বিরোধী ছিলেন নিজেও শেষ পর্যন্ত সেই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

...বলেছি যে ১৯৩৬ পর্যন্ত মুসলিম লীগের রাজনীতি মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ছিলনা। কিন্তু ইকবাল ও রহমত আলী মুসলমানদের জন্য আলাদা একটুখানি জমির কথা যে একেবারেই চিন্তা করেননি তা নয়, তবে তা যে কোনদিন বাস্তবে সম্ভব হতে পারে এমন দুরাশা ১৯৩৭ সালের নির্বাচন কালেও জিন্না বা লিয়াকত আলী তথা লীগ নেতাদের কেউ করেননি। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের নেতাগণই প্রথম থেকে দাবি করেছেন যে - এটা হিন্দুর দেশ, এখানে অহিন্দুদের থাকতে হবে হিন্দুদের দয়ায় অতিথির মতো বাস করতে হবে অধিকারশূণ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো। হিন্দু নেতারাই নির্মলীকরণ তথা নির্মূলীকরণ পূর্বক হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাসে সাধারণত তিনটি চরিত্র বা তিনটি পক্ষকে মঞ্চে স্থাপন করা হয় : ব্রিটিশ পক্ষ, কংগ্রেস পক্ষ, লীগ পক্ষ। আমরা ভুলে যাই যে হিন্দু পক্ষ রূপে চতুর্থ একটা পক্ষ ছিল। অবশ্য জিন্না হিন্দু পক্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বিপজ্জনক হিন্দু পক্ষও কংগ্রেসের গর্ভেই আত্মগোপন করে আছে। তাঁর ধারণা ছিল যে যদি কখনও কংগ্রেস রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেটাও এক প্রকারের হিন্দুরাজ। এই ধারণা থেকেই তিনি দ্বিজাতিতত্ব উদ্ভাবন করেন।

হিন্দু যদি একটা জাতি হয় তাহলে ভারতের মুসলমানরাই বা কেন একটা জাতি হবেনা? আর ভারতীয় মুসলমানরা যদি একটা জাতি হয় তাহলে তাদের একটা নিজস্ব দেশও থাকা চাই। বৃটেন যেমন বেলফোর ঘোষণায় প্যালেস্টাইন থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে ইহুদিদের নিজস্ব দেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তেমনই ভারতের থেকে কিছু জমিকে ভারতীয় মুসলমানদের দেশ বলে চিহ্নিত করে দেবেনা কেন? এতদিন শুধু হিন্দুদের দাবিই শোনা যাচ্ছিল, যেমন লোকমুখে তেমনই নেতাদের রচনায় ও বক্তৃতায়। এবারে মুসলিম লীগের নেতাদের মুখেও মুসলিম সমাজের দাবি শোনা গেল। লীগের প্রধান অভিযোগ ছিল ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেনা ও সরকার গঠন করবেনা ঘোষণা করে নির্বাচনে অংশ নেয়, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রীমন্ডলী ও সরকার গঠনও করে এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংখ্যালঘু নির্যাতনও করে। কংগ্রেস সরকারগুলির সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য পীরপুরের রাজাকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই পীরপুর রিপোর্টে মন্তব্য করা হয় : 'The Muslims think that no tyranny can as great as the tyranny of the majority.' এই রিপোর্ট কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিলনা। অতঃপর ১৯৪০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে জিন্না প্রথম হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও একটি পৃথক জাতি রূপে ঘোষণা করলেন এবং সেই প্রথম মুসলিম জাতির ভাগ্য মুসলিম জাতিই নির্ধারণ করবে বলে দাবি জানালেন। পরের মার্চ মাসেই লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশের দাবি তথা পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হল।

পাকিস্তান প্রস্তাব উপস্থাপনের তিন বছরের মধ্যেই জিন্নার অনুমান ও আশঙ্কা কতখানি সত্য ছিল তা প্রমাণিত হল। স্পষ্ট হল যে গান্ধীজির প্রতি দেশবাসীর আনুগত্য অথবা গান্ধীজির আদর্শ সম্বন্ধে কতখানি আন্তরিকতাবর্জিত ও পল্লবগ্রাহী ছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন পরিণত হল সন্ত্রাসবাদী হিংসাত্মক কার্যকলাপে। তারপরেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেখা গেল জমিদার মহাজনের অর্থগৃধ্নুতার জঘন্য স্বরূপ এবং লক্ষণীয় যে জমিদার মহাজনের অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক হিন্দু আর কৃষকদের অধিকাংশই মুসলমান আর কৃষকপ্রজা পার্টির সমর্থক। ক্রমে ক্রমে গান্ধীজির নেপথ্যে নির্বাসন। যখন কেবিনেট মিশন এল তখন আলাপ আলোচনায় অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেউ গান্ধীজির খোঁজ করেনি। মিশন যখন পরিকল্পনা দিল যে কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বিদেশ মন্ত্রক রেখে বাকি সব বিষয়ে প্রদেশগুলিকে দেওয়া হবে এবং প্রদেশগুলিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ক, খ ও গ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হবে তখন গান্ধীজির মতামতের অপেক্ষা না করেই কংগ্রেস ব্যবস্থাটা মেনে নিল। ব্যবস্থাটা কংগ্রেস বা লীগ কারো মনঃপুত হয়নি তবুও আরও জটিলতা এড়াবার জন্যই মেনে নেওয়া। একবার মেনে নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল দলের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন, কিন্তু সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। কিন্তু যখন ভাইসরয় ওয়াভেলকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য তাগাদা দিলেন তখন ওয়াভেল বললেন যে কংগ্রেস যোগ না দিলে কী করে সেই সরকার গঠন করা যাবে। ইতিমধ্যে জওহরলাল বম্বেতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে তারা কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে কোন পূর্বনির্ধারিত শর্ত মেনে যাচ্ছেন না, সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে যাচ্ছেন এবং অ্যাসেম্বলীর মাধ্যমে নিজেদের মর্জিমতো ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানকে পরিবর্তন বা সংশোধন করে নেবেন।

খবরের কাগজে জওহরলালের মনের কথা পড়ে জিন্না লীগের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এবার ভাইসরয় একা কংগ্রেসকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। এই ব্রিটিশ 'বিশ্বাসঘাতকতায়' স্তম্ভিত জিন্না বললেন,

'I feel we have exhausted all reason. It is no use looking to any other source for help or assistance. There is no other tribunal to which we can go. The only tribunal is the Muslim nation.'

কংগ্রেস যে কাণ্ডটা করল তা সম্ভব হল তার 'brute majority'-র জন্য। এর মধ্যে নীতির প্রশ্ন ছিলনা, ভালমন্দের বিচার ছিলনা। ভালমন্দের প্রশ্নে যেন একা মুসলমানরাই বাঁধা। তাই জিন্না গভীর ক্ষোভে বললেন,

'Are we alone to be guided by reason, justice, honesty and fair play, when on the other hand, there are perfidious dealings by Congress? ...Never have we in the history of the League done anything except by constitutional methods ...But now we are forced into this position. This day we bid goodbye to constitutional methods.'

গান্ধীজি যেমন ১৯৪২-এ ডাক দিয়েছিলেন করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে তেমনই জিন্না ডাইরেক্ট অ্যাকশন এর ডাক দিলেন। ডাইরেক্ট একশন এর উদ্দেশ্য ছিল, 'to achieve Pakistan ...and get rid of the present slavery under the British and the contemplated future of Centre Hindu domination.'

স্পষ্টতই ডাকটা ছিল ভাইসরয়ের প্রতারণা বা পক্ষপাতিত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু হল উল্টা বুঝলি রাম। করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে ডাকের পরবর্তী ঘটনাবলি যেমন গান্ধীজির কল্পনাতীত ছিল তেমনই ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডাকের পরবর্তী ঘটনাবলিও জিন্নার সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করে যায়। ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসে কলকাতায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় তা কতটা মুসলিম লীগ সরকারের পরিকল্পিত ছিল বলা মুশকিল। যদি ধরে নেওয়া হয় যে সুহরাবর্দি একদিকে গুণ্ডাবাহিনী অন্যদিকে পুলিশবাহিনী নামিয়ে দাঙ্গা মাত করবেন ভেবেছিলেন তাহলেও প্রশ্ন থাকে যে বিনা প্রস্তুতিতে হিন্দু দাঙ্গাবাজদের পক্ষে সুহরাবর্দির সম্মিলিত বাহিনীকে মাত করা সম্ভব ছিল কিনা।

...ভাজপা'র (ভারতীয় জনতা পার্টি - বিজেপি) জনপ্রিয়তা ভারতের ইতিহাসে মর্যাদার ব্যঞ্জনা কি মঙ্গলের দ্যোতনা কি শুভ সূচনা সেই বিচারের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে "মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে" এই একটাই মন্ত্রের জোরে তার অভাবিত বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠেছে ভারতের বিখ্যাত হিন্দি বলয়ের উপরে। আর ওই মন্ত্রের তাৎপর্য হল বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধন যা বাস্তবে রূপায়িত হল ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর।

একথা বলা হয় বটে যে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির হিংস্র জনতা মসজিদ চূর্ণ করেছে, কিন্তু ঘটনা এই যে মসজিদ ভাঙার জন্য হাজার হাজার করসেবক পাওয়া গেছে, শত শত মাইল পার হয়ে দেশের নানা স্থান থেকে তারা মসজিদ ভাঙার জন্য পরম উৎসাহে অযোধ্যায় ফৈজাবাদে সমবেত হয়েছে, সেখানে তারা একত্র হয়ে পরিণত হয়েছে হিংস্র জনতায়, তারপর সেই জনতা দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে প্রচন্ড উল্লাসে মসজিদ ভেঙেছে। মনকে চোখ না ঠেরে যদি আমরা বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চাই তাহলে দেখব যে ভারতীয় বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের, শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথের, রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থের, গান্ধীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের, সংবিধানের সেকিউলারিজমের সমস্ত আদর্শ ও দর্শন, সমস্ত বিচার ও বিশ্বাস, সমস্ত যুক্তি ও সত্যের বিরুদ্ধে যে-অভিযান শুরু হয়েছিল তার চূড়ান্ত সাফল্য সাধিত হল বিরানব্বইয়ের ছয়ই ডিসেম্বর।

আমরা যদি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা থেকে বাবরি মসজিদের ধ্বংস পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পর্দা সরিয়ে তাকাই তাহলে দেখব যে, এই ৪৪ বছর ধরে মিথ্যা ও হত্যার, দুর্নীতি ও হিংস্রতার, পেশীশক্তি ও বিত্তশক্তির এক বিচিত্র জয়যাত্রা নির্গত হয়েছে ভারতের রাজপথে। যারা ওই রাজপথের উদ্দাম জয়যাত্রার শামিল নয়, যারা আপন বিচার অনুসারে অন্যপথে চলতে চায়, যারা স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতে চায়, যারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টি বা শিবসেনা বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নির্ধারিত হিন্দুত্ব থেকে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চায় আজ তারা সবাই ভারতীয় জনতার শত্রু বলে পরিগণ্য ও তারা সবাই বিপন্ন এবং বিপন্নদের প্রথম সারিতেই আছে ভারতীয় মুসলমানগণ।

...গান্ধীহত্যার একটা কৌতুহলোদ্দীপক দিক এই যে দেশ ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে যারা প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যারা বাস্তু অথবা সম্পত্তি হারিয়েছিল অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয়জনদের হারিয়ে ক্রোধে বা শোকে উন্মত্ত হয়েছিল তাদের কেউ গান্ধীজিকে হত্যা করেনি, তাঁকে হত্যা করে হিন্দুত্বের নামে বা বেশে এমন একটি সংস্কৃতি যা প্রকৃতপক্ষে হিংসা ও হত্যার তথা অপরাধের সংস্কৃতি। কেমন করে ও কেন এই সংস্কৃতি মহারাষ্ট্রীয়দের একাংশকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করল সে বিশ্লেষণের অবকাশ এই সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ আলোচনায় নেই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা প্রভৃতি সংগঠনগুলির জন্ম ও কর্ম শুরু মহারাষ্ট্রের ভূমিতেই।

...বম্বে প্রেসিডেন্সির হোম ডিপার্টমেন্টের প্রমাণ অনুসারে ১৯৪০ এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় আর.এস.এস. এর নেতা বহ্‌রাও অভয়ঙ্কর ব্রিটিশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আশ্বাস দেন। চার বছর পরে যখন জাতীয়তাবাদী নেতাদের অধিকাংশই কারারুদ্ধ তখন বম্বে প্রেসিডেন্সি হোম সেক্রেটারি এইচ.ভি.আর. আয়েঙ্গার লিখিত মত দেন যে আর.এস.এস. - এর উপর কোনও নজরদারির প্রয়োজন নেই, কারণ 'the Sangh has scrupulously kept itself within the law and in particular has restrained from taking part in the disturbances that broke out in August, 1942.' হোম ডিপার্টমেন্টের আর একটি উল্লেখে দেখা যায়, 'In a secret meeting held at Rohtak on May 19, 1946 Dada Bhai of Nagpur is reported to have said that the Sangh's struggle was not against British, but against the Muslims.' মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শুরু থেকে গোলওয়ালকরের অভিযোগ ছিল তা an instrument to destroy national consciousness' কেননা গান্ধীর বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ব্যতীত কোনও 'স্বরাজ' সম্ভব নয় এবং এই সম্প্রীতির কথা বলে তিনি ভারতীয় সমাজের ভয়ংকরতম ক্ষতি করছেন, 'and committed the most heinous sin of killing the life-spirit of a great and ancient people.'

একই মানসিকতার প্রকাশ আমি দেখেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ১৯৮৫ সালের জুন মাসে বম্বে চেম্বুর অঞ্চলের একজন বিখ্যাত সমাজসেবকের বাড়িতে। সেখানে আমি যখন যাই তখন একজন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বয়সের রাজ্য সরকারী কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আমার ভাঙা হিন্দি শুনে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি কিনা।

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি জানালেন যে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা সবাই বাংলাদেশী এবং তাঁর মহারাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের কোনও স্থান নেই। গৃহকর্তা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে যুবকটিকে থামাবার চেষ্টা করলে যুবকটি আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন যে, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের থেকে ভারতীয়দের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, আমরা ভারতীয়রা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মত প্রতিষ্ঠা করব হিন্দু পবিত্র মহারাষ্ট্র - এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক আইন। বাংলা ভাষার কবি একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে বলে সব বাংলাদেশীদের ধারণা তাদের বাংলা ভাষার আলাদা মহিমা আছে। কিন্তু পবিত্র হিন্দু মহারাষ্ট্রে হিন্দী ছাড়া অন্য কোন ভাষার মহিমা নেই - যারা উর্দু কি বাংলা বলবে তাদের তাড়ানো হবে। তারা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশী 'জনগণমন' গানটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে, তার জায়গায় সংস্কৃত 'বন্দেমাতরম' বা নতুন করে রচিত হিন্দীতে কোনও গানকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করা হবে। গৃহকর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে যুবকটিকে বললেন যে অতিথিকে অপমান করা হিন্দুত্বের অপমান তখন যুবকটি নাটকীয় ভাবে শান্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

সেই মহারাষ্ট্রীয় যুবকের মধ্যে যে পুঞ্জীভূত বারুদের পরিচয় পেয়েছিলাম তা কোনও বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী ব্যাপার ছিলনা। ফিল্মস ডিভিশনের একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি বলেছিলেন ব্রিটিশ রাজের প্রশস্তি করা 'জনগণমন' কে না করে 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সংগীত করা উচিত ছিল, কিন্তু জওহরলাল ট্যাগোরের গানকেই করেন কারণ জওহরলাল নিজেও ইংরেজ-ভক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তিও মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরির একজন কর্মীর অভিনেতা দিলীপকুমার সাহেব সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল যে তাঁর এখন পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। একদা হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল বম্বের চলচ্চিত্র জগৎ এবং বহু সিনেমাতেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আদর্শ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আমি একটানা বম্বেতে ছিলাম এবং আট বছরের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে আধুনিক শহর বলে পরিচিত বম্বে রূপান্তরিত হল ঘোর মৌলবাদী মহানগরে যার সমস্ত সাধনা সপ্তদশ কি ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় বাতাবরণে প্রত্যাবর্তন।

...বঙ্কিমচন্দ্র, লালা লাজপত রাই, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতাদের নির্দেশে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠনের আদর্শ বা মতবাদ নির্মানের কাজ শুরু হয়। পরে গান্ধীজি ও গান্ধীবাদীদের প্রভাবে ১৯৩১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে গৃহীত হয় ধর্মনিরপেক্ষ রূপে জাতি গঠনের নীতি। তার সাত বছর পরে We or Our Nationhood Defined-এ গুরু গোলওয়ালকর হিন্দু জাতিসত্তাকে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে লেখেন–

'We repeat : in Hindusthan, the land of the Hindus lives and should live the Hindu Nation - satisfying all the five essential requirements of the scientific concept of the modern world. Consequently only those movements are truly 'National' as aim at rebuilding, revitalizing and emancipating from its present stupor, the Hindu Nation. Those only are nationalist patriots, who, with the aspiration to glorify the Hindu race and nation next to their heart, are prompted into activity and strive to achieve that goal. All others are either traitors and enemies to the National cause, or to take a charitable view, idiots.'

এই চিন্তাধারা ও এই দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার পরেও দেখা যায় না। একই সঙ্গে চলে ওই সংবিধানকে 'সেকিউলার' রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা অন্যদিকে চলে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র রূপে ঘোষণা। গোলওয়ালকরের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি বাল ঠ্যাকারের মন্তব্যে।

TIME পত্রিকার প্রতিনিধি যখন তাকে প্রশ্ন করেন যে বম্বে থেকে মুসলিম বিতাড়ন হিন্দু জাতি গঠনের পথে 'পা রাখার ধাপ' কিনা তখন ঠ্যাকারে বলেন, 'We don't need stepping-stones. This is a Hindu rashtra.' আবার লালকৃষ্ণ আডবানীও এক সাক্ষাৎকারে ভারত সম্বন্ধে তার রাষ্ট্রীয় ধারণা ব্যাখ্যা করেন, 'My conception is that this country, whether you call it India or Bharat, has its roots in Hindu ethos. And, in that sense, it has always been a Hindu rashtra. It was a Hindu rashtra, it is a Hindu rashtra and it shall remain a Hindu rashtra.' আডবানীজি 'হিন্দু রাষ্ট্র' আর 'হিন্দু সভ্যতা' এই দুই ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ নির্দেশ করতে পারেন বটে, কিন্তু বিশাল হিন্দু জনসাধারণের কাছে ওই ভেদ তাৎপর্যহীন।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃত্বের উপলব্ধিতেও ভারত এমন এক রাষ্ট্র যা হিন্দু জাতিতত্ত্বেই আধারিত। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল রূপে ঘোষণা করার বাঁধা হচ্ছে এর সংবিধান। ভাজপা যদি নিজেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল রূপে পরিচয় দেয় তাহলে নির্বাচন আয়োগ সংবিধান অনুসারে ভাজপাকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে দেবে। একই কথা শিবসেনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনও ধর্মীয় দলের ভারতের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংবিধান-বিরোধী। ধর্মীয় দল রূপে নির্বাচনে অংশ নিতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে এবং সংসদের বর্তমান দলবিন্যাসে সংবিধানের এত বড় পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। সুতরাং সংবিধানে 'সেকিউলার' শব্দটি অথবা সেকিউলার আদর্শ থেকেই যাচ্ছে এবং আদবানী-ঠ্যাকারে প্রমুখ হিন্দু রাষ্ট্রবাদিগণ মুখে নিজেদেরকে সেকিউলার বলে দাবি করে যাবেনই। এরা নির্বাচন আয়োগকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্য নিজেদেরকে সেকিউলার বললেও আসলে যে কী, অর্থাৎ মুখোশের আড়ালে এদের মন হিন্দু রাষ্ট্রবাদী, এমনকি জঙ্গি হিন্দু রাষ্ট্রবাদী কিনা তা নির্ধারণের কোন উপায় আছে কি?

...সঙ্ঘ পরিবারের রাজনৈতিক অঙ্গ ভাজপা-র মূখ্য লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ওই উদ্দেশ্য প্রকাশের বাধা হচ্ছে সংবিধান আর সংবিধান সংশোধনের উপায় হচ্ছে সংসদে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সেই গরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য বর্তমান সংবিধান অনুসারে নির্বাচনী সংগ্রাম করা, তার জন্য ভাজপা-র আপাতত সেকিউলার ছদ্মবেশ ধারণ করা প্রয়োজন। ততদিন পর্যন্ত তার গুপ্ত কৃত্যসূচি সম্পাদনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, শিবসেনা প্রভৃতি সংগঠন। এবং একবার সংবিধান সংশোধনের মতো প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা লাভ করলে তা নিজমূর্তি ধারণ করবে। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের তো বটেই, সমস্ত ভারতীয় অহিন্দুরই একটা গভীর শঙ্কার মধ্যে অবস্থান।

...শিবসেনার হামলার ভয়ে 'ফায়ার' ছবির প্রদর্শন মহারাষ্ট্রের সর্বত্র ও আরও কতকগুলি রাজ্যে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর শতাব্দীর শেষ বছর শুরু হতেই শুরু হল ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা বন্ধ করার খেলা। পাকিস্তান আমাদের শত্রু, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ করতে হবে এটা শিব সেনাপতি বাল সাহেবের পুরনো ফতোয়া। পঞ্চাশ বছর আগে রাতের অন্ধকারে কয়েকটা লোক বাবরি মসজিদের ভেতর যেভাবে পুতুল রেখে এসেছিল সেভাবে ৬ জানুয়ারি রাত্রে কয়েকজন শিবসেনা দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলার পিচ খুঁড়ে দিয়ে এল।

প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী যখন বললেন যে রাতের আঁধারে চুপিচুপি পিচ খোঁড়ার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই, হিম্মতওয়ালারা সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়ুক তখন বালা সাহেব জবাব দিলেন যে শিবসেনার হল গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ আর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পেলে তারা সীমান্তেও লড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে ৭ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলাকে উপলক্ষ করে শিবসেনা ও ভাজপার নেতৃত্বাধীন সরকারের মধ্যে যেসব বার্তা বিনিময় হয় সেসবের থেকে এই সত্যটাই বেরিয়ে আসে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেন আসলে শিবসেনার অনুগৃহীত অধীনস্থ কর্মচারী।

১৯ জানুয়ারি মুম্বাইয়ের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দপ্তর ভাঙচুরের পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী মুম্বাইয়ে উড়ে গিয়ে শিব সেনাপতিকে মিনতি করে কোনওমতে এক বছরের জন্য পাকিস্তানী ক্রীড়াদলকে ভারতে এসে খেলতে দেওয়ার অনুমতি লাভ করলেন। আর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে যারা ক্রিকেট বোর্ডের দপ্তর ভাঙচুর করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট, হুসেনের শিল্প, দীপা মেহতার চলচ্চিত্র ও ভারত-পাকিস্তান ক্রীড়া-সম্পর্ক নিয়ে ঘটনাগুলি এটাই প্রমাণ করে যে - বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ভারতে আইনের শাসন, সরকারের কর্তৃত্ব ও মানবিক সভ্যতার অনেক উর্ধ্বে মুসলিম তথা সংখ্যালঘুদের উপর গুন্ডাবাজির, হিন্দুত্বের নামে হিংস্রতার ও ধর্মের নামে বর্বরতার স্থান।"[১২]

সাম্প্রদায়িকতা : সাহিত্যে

এক

"...সে আজ বহুদিনের কথা, সপ্ততি বৎসরের কম নহে, আমি যে-কালে প্রথম বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করি, সে-কালে আমরা চারিজন ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান লেখক ছিলেন না। সেই চারিজনের তিনজন কালের অতল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। মাত্র আমি একা এখন জীবিত থাকিয়া কবরের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে তিনজনের নাম শুনিতে বোধ হয় আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। একজন কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়ার মীর মোশাররফ হোসেন ও অন্যজন পড়ানের পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন। ইঁহারা দুজনেই গদ্য লেখক, মাত্র আমি কবিতা লিখিতাম। ইহার কিছু পরেই শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক আসিয়া আমাদের সংগে মিলিত হন। ইনিও কবিতা লিখিতেন, মাঝে মাঝে গদ্য লেখাও তাহার অভ্যাস ছিল।

সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহারা বলিতেন, 'মুসলমান বাংলা লিখিতে জানে না'। এসব শুনিয়া আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিত, বলিতে কি হিন্দুদের ঐসব শ্লেষ উক্তি আমার হৃদয়ে বিষম বাজিত। সে সময় হিন্দুদের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশি ছিল না। মাত্র 'আর্য্যদর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'বঙ্গবাণী', 'সোমপ্রকাশ', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাত-আটখানা পত্রিকা ছিল। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়াছিলেন। আমাদের বংশীয় সাহিত্যিক বন্ধু মীর মোশাররফ লিখিয়াছিলেন 'জমিদার দর্পণ' ও 'বসন্ত কুমারী' নাটক। ইহা আমাদের পক্ষে কতকটা লজ্জাকর বিষয় বটে, রায় বাহাদুরই হউন, কি বিদ্যাসাগরই হউন, আমরা কেন তাহাদের অনুকরণ করিতে যাইব? আমরা কি লিখিতে জানিনা? খোদাতালা আমাদিগকে যে শক্তি ও প্রতিভা দিয়াছেন, কেন আমরা তাহার অপব্যবহার করিতে যাইয়া কলংকের ডালি মাথায় তুলিয়া লইব? ইহার পরও তিনি 'এর উপায় কি' প্রহসন লিখিয়া হিন্দু লেখকদের দ্বারা নিতান্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। সে সময় 'বান্ধব' সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C.I.E. বাহাদুর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত লিখিয়াছেন, 'এসব আগাছা সাহিত্যের উদ্যান হইতে কাটিয়া ফেলাই উচিত'। আরও লিখিয়াছেন, 'এর উপায় কি? শুধু মীর সাহেবকে এইরূপ বিদ্রুপ করিলে প্রাণে এত বাজিত না। মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া এসব কটুক্তি করাতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলাম। বলিতে কি, উহারা কোন বই হাতে লইয়া মুসলমান গ্রন্থকারের নাম দেখিলেই ফেলিয়া দিত।

---

১২. সুরজিত দাস গুপ্ত/ভারতীয় মুসলমানদের সংকট ও সমস্যা ॥ [ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা - জানুয়ারি ২০০৮। পৃ. ৪৫-৪৭/৭৫-৭৬/৮৪-৮৬/১০৩-১০৫/১১৬-১১৮/১২৯]

আমি এই সব অবমাননার বোঝা মাথায় লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মুসলমান লেখক বাংলা লিখিতে জানে কিনা, তাহা এই হিন্দু ভায়াদিগকে দেখাইতে হইবে। এই চিন্তা করিয়াই আমি 'অশ্রুমালা' লিখিয়াছিলাম। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে এমন একটি শব্দও ছিল না যাহা পাঠ করিয়া হিন্দু ধুরন্ধরগণ মুসলমানের লেখা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। এমন কি উহা পাঠ করিয়া সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'বঙ্গবাণী' লিখিয়াছিল, 'মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর করিয়া লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না'। মহাকবি নবীন সেন লিখিয়াছিলেন, 'মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর করিয়া লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। আপনার 'অশ্রুমালা' তাহার প্রভাত শিশির-মালা স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিল'। বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের মুখপত্র 'সারস্বতপত্র' লিখিয়াছিলেন, 'কবি কায়কোবাদ মুসলমান, কিন্তু তাহার বাঙ্গালা মুসলমানী নহে, কায়কোবাদের বাঙ্গালা সুসংস্কৃত, মার্জিত ও মধুর'।

এই সব লেখা দ্বারাই আপনারা বুঝিতে পারেন, মুসলমানদের লেখার উপরে হিন্দুদের কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। আমি এইজন্যই আমার লেখাতে বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যতীত অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করি নাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ সেজন্য বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুদের লেখার অনুকরণ করিয়াছি। বাস্তবিক তাহা নহে। হিন্দুরাই যে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, মুসলমানরা লিখিতে পারেন না, তাহাদের সেই অন্যায় ধারণা ও অযথা গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি। আমি অনেক অনাবশ্যক কথার উল্লেখ করিলাম, কারণ আমার উপরে আধুনিক মুসলিম লেখকদের যে একটি অন্যায় ধারণা ছিল উহা দূরীভূত করিবার জন্যই এই প্রয়াস।

এখন আর সেদিন নাই, আমরা উল্লিখিত চারিজন মুসলমান সাহিত্যিক মুসলিম বংগভাষার সেই শৈশব সময়ে যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া সাহিত্যের উদ্যান সৃজন করিয়াছিলাম, সেই ফুলকুল শোভিত সাহিত্য-উদ্যানে আজ আধুনিক বহু মুসলিম সাহিত্যিক নূতন নুতন সুগন্ধি ফুল ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা দেখিলেও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। এখন আর আমাদের সেই বংগভাষা দীনহীন দরিদ্রা নহে। দুনিয়ার মধ্যে যত ভাষা আছে, তাহাদের সকলের সম্মুখে আমাদের এই বংগভাষা রতনে, বসনে ও নানাবিধ অলংকারে বিভূষিতা রানীর মত দাঁড়াইতে সক্ষম।

আজ আপনাদের অনুকরণের কোন প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মুসলিম বংগভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন, কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই। আজ আপনাদের পথ উন্মুক্ত। আজ আপনাদের সাহিত্য-উদ্যানে ডক্টর শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরম খাঁ, সৈয়দ এমদাদ আলী, নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন, আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন আপনাদের চিন্তা কি?' - মহাকবি কায়কোবাদ [১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ফাগুন, ১৩৪৯ সালে মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত।][১০]

দুই

"...এতোদিন আমাদের সাহিত্যের সর্বপ্রকার আলোচনা-সমালোচনাই কলকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্যেরও পরিপূরক ছিলো। যার ফলে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগোষ্ঠী থেকে শুরু করে তথাকথিত সকল প্রগতিশীল সমালোচকই বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাম্প্রদায়িক এবং চিরকালের হীনমন্য মুসলিম বিদ্বেষী লেখককেও

১০. তথ্যসূত্র : পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য/সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম (অধ্যক্ষ, বাংলা একাডেমী)। [বাংলা একাডেমী - মার্চ, ১৯৬৮। পৃ. ৯৫-৯৭]

অসাম্প্রদায়িক লেখক বলে চালাতে দ্বিধা করেননি। অথচ জন্মসূত্রে যিনি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি যত প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী হোন, বঙ্কিমের মুসলিম বিদ্বেষী উপন্যাসগুলো নিরাসক্ত পাঠকের মন নিয়ে পাঠ করতে পারবেন না। কারন বঙ্কিম রচনার অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এতটাই প্রবল যে, নিরপেক্ষতা ও জ্ঞানী পাঠকের নিরাসক্তি সেখানে মুহূর্তের মধ্যেই বিদীর্ণ হয়ে লেখকের প্রতি প্রবল ঘৃণা পাঠকমনকে বিদ্বিষ্ট করে তুলতে বাধ্য। যেসব পাঠক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বঙ্কিমকে অসাম্প্রদায়িক বলে ঘোষণা দেন তারা প্রগতিশীল তো ননই বরং তাদের বেজন্মা বলে অভিহিত করলেই সঠিক বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের স্বনামখ্যাত মার্কসবাদী লেখক যিনি ভারতের কৃষক বিদ্রোহের উপর একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করে এই বিষয়ের ঐতিহাসিক সূত্রগুলোর দিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে প্রথম সক্ষম হন সেই সুপ্রকাশ রায়ও বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ না করে পারেননি। কিন্তু অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টায় একদল তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম নামধারী লেখক গায়ে পড়ে কলকাতার প্রীতি উৎপাদনের জন্য কিছুকাল আগে অযাচিতভাবে বঙ্কিম প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাকে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক লেখক হিসেবে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন। বঙ্কিম আলোচনায় যত চালাকিই প্রয়োগ করা হোক যে সব মুসলিম যুবক যুবতী একবার বঙ্কিম রচনার সংস্পর্শে আসবেন তারাই এই অসৎ ও হীনমন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদীর সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে আমাদের দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী অধ্যাপক ও লেখকদের সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হবেন।

যে লেখক শুধু সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেওয়ার জন্যই উপন্যাস ফেঁদেছিলেন তিনি হিন্দুদের কাছে মহালেখক হিসেবে সম্মান পেলেও বাংলাদেশের পাঠ্যতালিকা থেকে তাকে বাদ দেওয়াই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। আর যদি তাকে বাংলাদেশের সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় রাখতেই হয় তবে বাংলা ভাষার প্রারম্ভিক গদ্যরচনার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টান্ত হিসেবেই রাখতে হবে। এবং পড়াতেও হবে একজন হিন্দু জাতীয়তাবাদীর সাম্প্রদায়িক রচনা হিসেবেই। বাংলা ভাষার সাহিত্যের সম্রাট হিসাবে কদাচ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম তা ছিলেন না। আর ছিলেন না বলেই বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মনেই এই ভুয়া সাহিত্য সম্রাটের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।"[১৪]

তিন

"...বিরুদ্ধ চেষ্টা যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালাভাষা মুসলমান সমাজে আপন বলে পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুসলমানেরা রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। কে কোথায় কি করিতেছেন বা বলিতেছেন তাহার অপেক্ষায় সাহিত্যসেবিগণ বসিয়া থাকিতেছেন না। বাঙ্গালা মুসলমানের মাতৃভাষা কি না, বা বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানদিগের সাহিত্য চর্চা করা উচিত কি না, ইহা আলোচনা করিবার সময় এখন আর নাই। এখন ইহাই ঠিক করিতে হইবে যে বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা কিরূপ আকারের হইবে বা তাহাদিগের সাহিত্য-চর্চা কোন পথে পরিচালিত করিলে জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে।

আমাদের সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে এই একটা কথা উঠিয়াছে যে, আমরা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিব না; কারণ তাহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে আমরা গৃহে ও সমাজে, কথাবার্তা কাজকারবারে যে সমস্ত আরবী ও পার্শী শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেগুলি আমরা সাহিত্যে অবাধে চালাইতে চাই। কারন ঐ সমস্ত শব্দ আমাদের বালকেরা ও আমরা অতি সহজে বুঝিতে পারি।

---

১৪. আল মাহমুদ/শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। [আদর্শ - মে, ২০১৫। পৃ. ১৪৫-১৪৬]

এই প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। যুক্তিবলে যে ইহা কেহ সম্পন্ন করিতে পারিবেন তাহাও নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা অন্য একটি বৃহত্তর প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহা লইয়া হিন্দু সাহিত্যিকমন্ডলে বহুদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে।

এই প্রশ্ন সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য সাধুভাষা ও চলিত ভাষা লইয়া বিবাদ। একদল সাহিত্যিকের মতে সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখিতে হইবে, কথাবার্তায় ব্যবহৃত ও দেশ-প্রচলিত সামান্য গ্রাম্য শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না; যিনি ব্যবহার করিবেন তাহাকে শাসন করা যাইবে। কারণ চলিত ভাষা বঙ্গদেশে নানা প্রকারের; উহা চালাইলে বঙ্গভাষা নানা রূপ ধারণ করিবে এবং ভাষাও নিতান্ত হীন ও দুর্বল হইয়া উঠিবে। সাহিত্যের ভাষা আদর্শ সুন্দর, সতেজ শিক্ষণীয় রাখা আবশ্যক।

এই যুক্তি প্রবল হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

অন্য দল চলিত ভাষার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ এই দলের গুরু। ইহারা বলেন চলিত কথা আমরা আমাদের সাহিত্যে বেশি করিয়া ব্যবহার করিব, কারণ তাহাই খাঁটি বাঙ্গালা এবং তাহাতেই ভালো করিয়া ভাব ফুটে, লোকেও সহজে বুঝিতে পারে। লোকে পড়িবে বলিয়াই ত লেখা। যেমন করিয়া বলিলে আমাদের মনের কথাটি বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, কলম আপনা আপনি চলে, শব্দের জন্য ভাবিতে হয় না, আমরা তেমন করিয়াই বলিব। শুধু তাহাই নয়, যে কথা আমরা যেমন করিয়া উচ্চারণ করি, সাহিত্যেও তেমন করিয়াই লিখিব। ফলে এই শ্রেণীর লেখকগণের দ্বারা বহু গ্রাম্য ইতরজনোচিত শব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই যাহা ইহারা ব্যবহার করেন না। ইহারা 'রন্ধন গৃহ' ত দূরের কথা 'পাকশালা' 'রান্নাঘর' পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া 'হেঁসেলে' ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের কাছে 'নবীন' ত একরকম তীরস্থ, 'নূতন' পর্যন্ত 'নতুন' হইয়া দেখা দিয়াছে। 'পুচ্ছ' উহ্য হইয়াছে, এবং 'লেজের' মধ্য দিয়া তাহার কেবল 'ল্যাজাটুকু দেখা যাইতেছে। ওদিকে 'মুড়ো' মহাশয় 'প্রান্তের' উপর দৃঢ়ভাবে আসন গাড়িয়া বসিয়াছেন।

এখন মুসলমানেরা যদি ইহাদের দেখাদেখি আপনাদের নিত্য ব্যবহার্য শব্দগুলি সাহিত্যে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর লেখকদিগের তাহাতে বাধা দিবার অণুমাত্র উপায় ও অধিকার নাই। তাহারা যদি ব্যবহারের দোহাই দিয়া ঐ সমস্ত নিতান্ত জঘণ্য শব্দ সাহিত্যে চালাইতে পারেন তাহা হইলে আমরা 'জল' না লিখিয়া 'পানি' লিখিলে বা 'নিমন্ত্রণের' পরিবর্তে 'দাওয়াত' করিলে 'বে আক্কেলির দরুন' কোন কাজে 'লোকসান' হইলে 'অনুতাপ' না করিয়া যদি 'আবসোস' করি এবং কোন বিষয় হইতে ফল প্রাপ্তির আশা না করিয়া 'ফায়দা' উঠাইবার জন্য 'কোশেশ' করি, তাহা হইলে এই সমস্ত কথ্য ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী হিন্দু লেখকগণের আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে?

তাহারা যে একেবারে 'লাচার' হইয়া পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ আমরা ত আমাদের ঘরে বাহিরে আচারে অনুষ্ঠানে মজলিশে ও দরবারে এই সমস্ত শব্দই দিনরাত ব্যবহার করিয়া থাকি।

কিন্তু সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার এই বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, 'আমরা যাহা বলি তাহাই লিখিব' এই মতের পক্ষপাতী লেখকগণ এখনও হিন্দু সাহিত্যিকমন্ডলে একরূপ উপহাসের পাত্র হইয়া আছেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গভাষার সমুদয় শক্তিশালী সাহিত্যিকগণ বিশুদ্ধ রচনারীতিতে সাহিত্য-চর্চা করিয়া আসিতেছেন। 'প্রবাসী'র কোন কোন প্রবন্ধ ব্যতীত বঙ্গের অধিকাংশ মাসিক ও সমুদয় সাপ্তাহিক পত্র বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লিখিত হয়। সুতরাং জোর করিয়া বা যুক্তি দ্বারা প্রচলিত ও অপ্রচলিত অজস্র আরবী পার্শী শব্দ সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহার করিয়া বর্তমান বঙ্গভাষা হইতে পৃথক আর একটি নতুন বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিতে যাওয়া সমীচীন কিনা তৎসম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ বিদ্যমান। এইরূপ চেষ্টায় যে বর্তমান সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্য হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত হইব তাহাই নহে, সে চেষ্টায় আমাদের বহুশক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইবে। এবং আমরা আরম্ভেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব।

পরন্তু যুক্তির বলে ঐ সমস্ত শব্দ চালাইলেই যে সাহিত্যযোগ্য ভাষার সৃষ্টি হইবে এরূপ মনে করাও ভুল। তজ্জন্য ক্ষণ-জন্মা লেখকের উন্মাদিনী প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শের অপেক্ষা করিতে হইবে। শব্দ লিখিলেই হইবে না; সুন্দর করিয়া লেখা চাই। সে শব্দ এরূপ বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাতে এরূপ টান থাকা চাই যে শুনামাত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয় এবং মোহমুগ্ধ মন অজ্ঞাতসারে সে শব্দকে নিঃশেষে গ্রহণ করে, মন যেন অপরিচিত কোন কিছুর আভাস পাইয়া কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়। আজ যে বঙ্গসাহিত্যে কয়েকখানি মাসিক পত্রে ও পুস্তকে দেশ-প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ অজস্র পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ইন্দ্রজালই তাহার কারণ, তাহার প্রতিভার ইন্দ্রজাল না থাকিলে ঐ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কখনই কেহ সাহস করিত না। তিনি যাহা লেখেন তাহাই মিষ্টি শুনায় - তজ্জন্যই দেশজ শব্দ সাহিত্যে চলিয়া যাইতেছে।

আমরা মুসলমান ঐক্যের উপাসক। সকল কাজেই ঐক্যসমন্বয়ের আমরা পক্ষপাতী। বিভিন্ন জেলার দেশ-প্রচলিত কথ্যশব্দ প্রচলনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নানামূর্তি গ্রহণ করুক ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বঙ্গভাষা একে নিতান্ত কোমল প্রকৃতির; তাহার উপর নিতান্ত মৃদু খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের একাধিপত্য ঘটিলে বঙ্গভাষা একরূপ অবলার ভাষা হইয়া পড়িবে। মুসলমানের নিকট এরূপ নীতি মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তবে এক বিষয়ে আমাদের ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই আসল কথা। বাঙ্গালা ভাষার যে সমস্ত শব্দ আমাদের ধর্মমতে বিরুদ্ধ ভাবসম্পন্ন তাহা আমরা কখনও ব্যবহার করিব না; পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের জাতীয় ভাব প্রকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে আমরা তৎপরিবর্তে আরবী বা পার্শী শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাউক।

বাঙ্গালায় 'হস্তমুখ প্রক্ষালন' বলিলে যাহা বুঝায় মুসলমানের 'ওজু' তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। হিন্দুর উপাসনার আসন ও মুসলমানের 'মোছল্লা' বা 'জায়নমাজ' ভিন্ন পদার্থ। হিন্দুর 'উপাসনা' ও 'উপবাস' মুসলমানের 'নমাজ' ও 'রোজার' ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মুসলমানের 'কেবলা' 'নিয়ত' ও 'ইমানের' প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় অজ্ঞাত। 'বেহেস্ত ও দোজখের' পরিবর্তে 'স্বর্গ ও নরক', 'হালাল ও হারামের' পরিবর্তে 'বৈধ ও অবৈধ', 'গোছল ও খানার' পরিবর্তে 'স্নান ও আহার' অবশ্যই চলিতে পারে।

কিন্তু 'জবেহর' পরিবর্তে 'বলি', 'বন্দেগী' বা 'এবাদতের' পরিবর্তে 'পূজা', 'সালামের' পরিবর্তে 'প্রণাম' কিছুতেই চলিতে পারে না। স্বর্গের 'অপ্সরা' দেবতা ও মুনিগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু বেহেস্তী 'হুর' কখনও কোন পুরুষের কাম দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় নাই। হিন্দুর 'ঈশ্বর' বহু দেবত্ব ভাবের উত্তেজক, কিন্তু মুসলমানের 'আল্লাহ' একমাত্র আল্লাহ্। মুসলমান কখনও এই প্রকারের শব্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে পারে না।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত কতকগুলী শব্দ আমাদিগকে সতর্কতার সহিত পরিহার করিতে হইবে। 'এজন্যে', 'মানবলীলা সংবরণ', 'বাগদেবী', 'সহিষ্ণুতার অবতার', 'যমদূতের মত' এবং 'শ্রীযুক্ত' প্রভৃতি শব্দ হিন্দুয়ানীর দ্যোতক ও সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ধর্মমত বিরুদ্ধ। ঐ সকল শব্দ আমরা কখনই ব্যবহার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের 'তৌহিদ' 'মসজিদ' 'আজান' 'রমজান' 'কেয়ামত' 'হাশর' আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ সমস্ত শব্দের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় নাই। নূতন শব্দ নির্মাণ করিলেও 'কেয়ামত' অর্থে 'মহাপ্রলয়' বরং চলিতে পারে কিন্তু 'হাসর' অর্থে 'বিচার দিবস' বা 'পুনরুত্থান দিবস' কখনই আমাদের বিশিষ্ট ধর্মগত ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। ধর্মরক্ষার্থে যুদ্ধ ও তজ্জন্য প্রাণত্যাগ করিবার বিধান অন্য কোন ধর্মে বিদ্যমান নাই, সুতরাং 'গাজি' ও 'সহিদের' জন্য 'ধর্মযোদ্ধা' ও 'ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি' প্রভৃতি ব্যবহার করিলে কেবল বল প্রকাশ করা হইবে মাত্র।

জগতের সমস্ত ভাষায় এমন কতগুলি নিজস্ব শব্দ প্রচলিত আছে, যাহাকে ইংরেজিতে ম্যাজিক ওয়ার্ড বলে। ঐ সমস্ত শব্দের সহিত ঐ সমস্ত জাতির জীবন সাধনার সম্বন্ধ আছে; এবং মুহূর্তে জাতির যুগযুগান্তের কত কাহিনি মনে পড়িয়া যায়। যেমন জর্মাণীর 'Father Land' এব আমেরিকানের 'Congress'. বাঙ্গালায় যদি বলি 'তিনি মানবদেহ ত্যাগ করিয়াছেন' তাহা হইলে মনে পড়ে, তিনি বহু প্রকারের জীবদেহ ধারণ করিয়াছেন বা করিবেন। ইহা জন্মান্তরবাদে গভীর বিশ্বাসের কথা। তদ্রূপ মুসলমানের 'জেহাদ'। ইহাকে 'ধর্মযুদ্ধে' পরিণত করিলে কখনই 'জেহাদের' উন্মাদনা আসিবে না।

ফলত: অমরা বাঙ্গালা ভাষাকে মুসলমানী ভাষায় পরিণত না করিয়া মুসলমানের ভাবে পূর্ণ করিব। দেহের দিকে না তাকাইয়া প্রাণের দিকে চাহিব। যে সমস্ত আরবী পার্শী শব্দের বিশুদ্ধ বাঙ্গলা প্রতিশব্দ আছে তাহা ব্যবহার করিয়া অনর্থক ভাষাকে জটিল করত: কৃত্রিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিব না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের বিশিষ্ট ধর্ম ও জাতীয় ভাবের পরিচয় দেয়, - যাহা আমাদের হৃদয়কে বহুদূরে সঞ্চালিত করে, - যাহা আমাদের বালকগণের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ধর্মগত বিশিষ্টতার প্রতি চৈতন্য উৎপাদন করে, - তাহা আমরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভাষার অঙ্গে গাঁথিয়া দিব।" - সাহিত্যের ভাষা/এয়াকুব আলী চৌধুরী[১৫]

চার

"...আমার পাঠক-জীবন মোটামুটি পঁচিশ বৎসরের। বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কিছু না-জানলেও, বাংলা সাহিত্য আমার বেশ ভালোই পড়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমার অপরিচিত লেখক নন। খুব ধারাবাহিকভাবে না-হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনাই আমি প্রথম যৌবনে একবার দু-বার পড়ে ফেলেছিলাম, প্রবন্ধগুলি পড়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার আমি যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম।

আরও অনেকের মতন আমিও বাঙালী; সাহিত্যের কয়েকটি গুজবে বিশ্বাসী। গুজবগুলিকে হঠাৎ গুজব হিসেবে চিনতে পারলে নিজেকে কীরকম অসহায় মনে হয়, সেইরকমই বাংলার সুদীর্ঘকালের গুজব এই যে ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম এখনও মহত্তম। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যতই ভালো লিখে থাকুন, খাঁটি ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম এখনও আদর্শস্বরূপ। এবং তিনি যুগস্রষ্টা ও ঋষি। তাহলে আমি এগুলো কী পড়লাম?

বার্নপুর যাত্রার পর থেকে আরও একমাসের মধ্যে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সব-কটি উপন্যাস পড়ে শেষ করেছি। শুরু করেছি একেবারে প্রথম উপন্যাস থেকে, তারপর পাতার পর পাতা নিঃশেষ করেছি অধীর আগ্রহে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এত খারাপ? একি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?

এ জন্য দারুণ মনোকষ্ট পেয়েছি আমি। হায়, যৌবনের কত স্বপ্ন কত উচ্চ আদর্শ ছিল বঙ্কিমকে ঘিরে। সেগুলি সব ভুল? স্কুল-কলেজে, বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তকে আমাদের এইভাবে প্রতারণা করা হয়েছে? এই উপলব্ধি বড়ো মর্মান্তিক। এর চেয়ে, এই গ্রন্থটি আমার না-পড়াই ভালো ছিল। স্বপ্ন ভাঙার চেয়ে ভুলস্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা হয়তো মধুর!

ঋষি বঙ্কিম বা স্বদেশচেতনার উদগাতা হিসেবে বঙ্কিমের যে-চিত্র, তার প্রচার হতে শুরু হয়েছে তার মৃত্যুর দশ-বারো বছর পর থেকে। এ-কথা বলেছেন তার সমসাময়িক একাধিক ব্যক্তি, জীবিতকালে বঙ্কিম পরিচিত ছিলেন প্রধানত ঔপন্যাসিক এবং সুসম্পাদক হিসেবে। পরবর্তীকালে আমরা তাকে একমাত্র ঋষি বঙ্কিম বলেই সম্বোধন করতে শিখেছি, এবং তাঁর রচনার সবকিছুতেই মহত্ত্ব আরোপ করেছি। উপন্যাসের বিচার যে তার শিল্পরূপের বিচার - সে-কথা ভুলে গেছি।

---

[১৫]. তথ্যসূত্র : এয়াকুব আলী চৌধুরী : অপ্রকাশিত রচনা/আমীনুর রহমান। [বাংলা একাডেমী - জুন, ১৯৯৩। পৃ. ১২-১৬]

এটা আমাদের বাঙালী ন্যাকামো ছাড়া আর কিছুই না। ঔপন্যাসিক হিসেবে বিচার করতে গেলে, বঙ্কিমকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

...'বন্দে মাতরম্' পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির ধ্বনি এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাস টিকে একসময় বাঙালী বিপ্লবীরা গীতার মতন ভক্তি করেছে। যে-মানসিকতার ফলে ভারতবর্ষকে বাধ্য হয়ে বিভক্ত করা হলো, তার উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ 'আনন্দমঠে'র মতন উপন্যাসের রচনা এবং এই উপন্যাসের লেখককে 'স্বদেশী মন্ত্রের উদগাতা' হিসেবে গণ্য করা।

ছাত্র বয়সের পর বঙ্কিম আর কবিতাচর্চায় তেমন মন দেননি। তবু পরিণত বয়সে একদিন ঝোঁকের মাথায় আধা-সংস্কৃত আধা-বাংলায় একটি পদ্য রচনা করলেন, যেটিকে দেখে ছাপাখানার পণ্ডিত 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠার ফাঁক ভরাবার পক্ষে 'মন্দ নয়' বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরে সেই 'বন্দে মাতরম' পদ্যটিকে সুর দিয়ে গান করা হয় এবং আরও পরে 'আনন্দমঠ' লেখবার সময় তিনি ঐ 'বন্দে মাতরম' গানটি ঐ-উপন্যাসে ঢুকিয়ে দেন। এই নির্দোষ প্রক্রিয়ার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

'বন্দে মাতরম্' গানটির প্রথমাংশ দেশবন্দনার কাব্য হিসেবে অতি উচ্চাঙ্গের। 'বন্দে মাতরম্' এই ধ্বনিও জাতীয়তাবোধ জাগাবার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারত। দেশকে জননী বলা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুযায়ী এবং মুসলমানদের এটা মেনে না-নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই, এবং মুসলমানরা শুধু দেশকে জননীরূপে দেখার কারণেই 'বন্দে মাতরম্'কে বর্জন করলে সেটা তাদের নিকৃষ্ট গোঁড়ামি বলে আমরা ধিক্কার দিতে পারতাম অনায়াসেই। কিন্তু ক্রমশ এই দেশজননীর রূপ কল্পনা রূপান্তরিত হয়েছে সম্পূর্ণ এক হিন্দু দেবীর মূর্তিতে, মুসলমানরা সেই দেবীমূর্তির বন্দনা করতে কেন বাধ্য হবে? এবং এই 'বন্দে মাতরম্' গানটি রয়েছে এমন একটি গ্রন্থে, যে গ্রন্থের মূল বক্তব্যই হ'ল মুসলমানরা হিন্দুদের শত্রু। ইংরেজ বন্ধু, কিন্তু মুসলমান শত্রু। যাতে কেউ এই বক্তব্য বুঝতে ভুল না-করে তাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার জন্য তিনি স্পষ্ট করে উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বলে দিয়েছেন সে-কথা। মুসলমানদের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে কিন্তু হিন্দু রাজ্য এখনও স্থাপিত হয়নি ব'লে সত্যানন্দের আফশোসের উত্তরে এক অলৌকিক চিকিৎসক জানিয়ে দিলেন যে, 'যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, তত দিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে - নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। ...মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ - ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। ...শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষে জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।'

ইংরেজের জয়গান দিয়ে গ্রন্থ শেষ করলেন ইংরেজ-কর্মচারী বঙ্কিম। ভবিষ্যতের জন্য যে-আশা রাখলেন, তা-ও হিন্দু রাজ্য স্থাপনের। দেশের অর্ধেক লোক যে মুসলমান, তাদের তুচ্ছ ক'রে দেওয়া হ'ল। মুসলমান পাঠক ও সমালোচকরা 'আনন্দমঠ'কে অতি সাম্প্রদায়িক ও ক্ষতিকর গ্রন্থ বলে অভিহিত করলেও হিন্দু সমালোচকরা সে-সমালোচনার কিছুমাত্র মূল্য দিলেন না, তারা 'আনন্দমঠে' খুঁজে পেলেন স্বদেশপ্রেমের সার্থক ছবি এবং 'বন্দে মাতরম্'কে করলেন জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। এটা অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দেশের অর্ধেকসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে এ কোন্ ধরনের দেশপ্রেম? বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রও একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক লিখেছিলেন। 'নীলদর্পণে' চেষ্টা করেছেন দীনবন্ধু হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় মেলাতে, একটি প্রহসনে মাইকেলও তা-ই করেছেন, আর বঙ্কিম তার উপন্যাসগুলিতে অনবরত চেষ্টা চালিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির। বাঙালী জাতি ও তার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ড করার জন্য কাঁঠালপাড়া-নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি কিছুটা পরিমাণে দায়ী নন?"[১৬]

---

[১৬]. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/কবিতার জন্ম ও অন্যান্য।[প্যাপিরাস (কলিকাতা) - ১৯৭৯। পৃ. ৭১-৭২/৮৫-৮৬]

পাঁচ

"...প্রবাদ আছে, বিপদ কখনও একাকী আসে না। আর বাস্তবিক পক্ষে কথাও সত্য। যখন যাহার সুসময় উপস্থিত হয়, তখন চারিদিক হইতেই নদীতরঙ্গের ন্যায় সুখ-সৌভাগ্যের ঢেউ অনবরত আসিয়া চরণতলে গড়াইয়া পড়িতে থাকে, আর যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন চারিদিক হইতেই দুঃখ ও বিপদের দিগদাহকারী কালানল লেলিহান জিহবা বিস্তার পূর্বক আবেষ্টন করিয়া লয় এবং হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সময় ও সুযোগ পাইয়া রাশি রাশি উত্তপ্ত বালুকণাও সমুদ্ভূত হওত, চোখে মুখে পতিত হইয়া 'দম বন্ধ' করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। এই সুসময় এবং দুঃসময় যেমন ব্যক্তিগত জীবনে–তেমনি জাতিগত জীবনেও সমভাবে নিজ নিজ প্রভাব চিরকাল বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

বঙ্গীয় মুসলমানের এক্ষণে নিদারুণ দুঃসময়। কালচক্রের পরিবর্তনে তাহার গৌরবোজ্জল সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত। আর আমাদের প্রতিবেশি হিন্দুগণের এক্ষণে সুসময় উপস্থিত। হিন্দু-মুসলমান এক দেশের অধিবাসী এবং এক রাজার শাসনাধীন হইলেও, উভয়ের মধ্যে আলোক-আঁধারের পার্থক্য বিদ্যমান। হিন্দু এখন বিদ্যাবুদ্ধি, রাজপদ এবং শ্রী-ঐশ্বর্যে হতভাগ্য মুসলমান অপেক্ষা সহস্র যোজন অগ্রবর্তী। আর সিংহাসনচ্যুত সৌভাগ্য-মার্গভ্রষ্ট মুসলমান অনন্ত দুঃখ-দুর্দশা-অভাবের জালে জড়ীভূত। তাহাদের চতুর্দিকেই কেবল দাবানল শিখা; কেবল ভয়! কেবল অভাব!! কেবল হা হুতাশ!!! বাস্তবিকই বঙ্গীয় মুসলমানদিগের -

'জাতীয় জীবন-তরী অধ:পাত ঝটিকায়,
বিপর্যস্ত বিঘূর্ণিত বিপদ সাগরে হায়!
দুর্দশার উর্মিমালা গরজিয়া ভয়ঙ্কর -
প্রহারিছে, জীর্ণতরী কাঁপিতেছে থর থর!
ঝলসিছে - সৌদামিনী, পড়িতেছে বর্ষোপল;
অশনি গর্জিছে ঘোর কাঁপাইয়া ধরাতল,
দশদিশি সমাচ্ছন্ন সূচীভেদ্য তমোজলে;
হাঙ্গড় কুম্ভীর ঘিরিয়াছে দলে দলে;
তাহে পুন: সিন্ধুবক্ষে জ্বলিছে বাড়বানল
এ বিপদে মহাভয়ে সন্ত্রস্ত আরোহী দল।'

ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি বা কবি-কল্পনা নহে; পরন্তু সমাজের প্রকৃত ফটোগ্রাফ। মানুষের কতদূর অধ:পতন এবং শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে, বঙ্গীয় মুসলমানগণই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু হায়! শত আক্ষেপ! আমরা এমনি 'আহমক' এবং 'বে-ওকুফ' হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের অধ:পতনের পরিমাণটুকুও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বঙ্গভাষায় ইংরেজি আমল হইতেই হিন্দুগণ আত্ম-মর্যাদাশুণ্য হতভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমানদিগের প্রতি যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের হস্ত বিস্তার এবং ঘোর অবজ্ঞেয় গ্লানি কুৎসা ও কলঙ্কজনক অলীক অশ্লীভাষিণী হলাহল নিসান্দিনী রসনা এবং লেখনীর পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহাতে দুঃখ-সন্তপ্ত নিরীহ মুসলমানগণের কোমল প্রাণে বিদ্বেষের বিষদ্রি দীপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়! তজ্জনিত যন্ত্রণাসূচক 'আহা' শব্দটি পর্যন্ত আমাদের উচ্চারণের ক্ষমতা নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষের শাণিত তরবারে, তীক্ষ্ণ সঙ্গীনে, বন্দুকের গুলিতে বা কামানের গোলায় শরীরের কোনও অঙ্গ কর্তিত, বিদ্ধ, চূর্ণিত বা ভগ্ন হইয়া যায়। তাহাতে তীব্র যন্ত্রণা এবং প্রবাহ উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু প্রাণের ভিতর বৃশ্চিক দংশন করে না। বিশেষত: উহা ব্যক্তিগত ক্ষতি বলিয়া আহত যোদ্ধা স্বজাতির বা স্বপক্ষের মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে হাস্যমুখে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু লেখনী সংযোগে এবং রসনা পরিচালনায় যে বিজাতীয় আক্রমণ ও বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও, প্রাণের কোমল বক্ষে অতীব কঠোর আঘাত করে। আর উহা জাতীয় কলঙ্ক হইলে যে নিদারুণ যন্ত্রণা

এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশের উপায় নাই। আর সেই কলঙ্ককালিমা যদি মিথ্যা কল্পনা প্রসূত হয়, এবং পাঠক বা শ্রোতা যদি জাতীয় গৌরবমুগ্ধ তেজস্বী প্রভৃতি জীবন্ত পুরুষ হন; তাহা হইলে উহা প্রাণের মর্মে মর্মে যে তীব্র কালকূট ঢালিয়া দেয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কদাপি সম্ভবপর নহে।

হিন্দু ভায়াদিগের যেরূপ মতিগতি - সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদিগের প্রতি তাহাদের যেরূপ বিকট লম্ফ ঝম্ফ কুর্দন এবং হুঙ্কার আস্ফালন দৃষ্ট হয়: হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, অফিস, আদালতে, স্কুল-কলেজে, সভাসমিতিতে, পত্র পত্রিকায় পুস্তক পুস্তিকায়, কবিতা এবং কাব্যে, বক্তৃতা এবং উপন্যাসে যেরূপ বিদ্বেষ বিষ উদগীরণ করিতে দেখা যায়: তাহাতে ইহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, হিন্দুগণ যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা শারিরীক বলবীর্যে তাদৃশ ক্ষমতাশালী হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই 'অসভ্য বর্বর দুর্দান্ত পাষন্ড পাতিনেড়ে পিশাচ পামর পাপিষ্ঠ অসুর দুরাত্মা অস্পৃশ্য ছাগলদেড়ে চাষা ম্লেছ যবন' গুলিকে অর্ধচন্দ্র প্রদানপূর্বক, পূণ্যভূমি আর্যস্থান ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতেন অথবা তোপে উড়াইয়া যবন বংশ ধ্বংস করিতেন। কিন্তু হায়! 'নেহায়েৎ' দুঃখ ও 'আফসোসে'র বিষয়, বিধাতা তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিতান্তই বঞ্চিত করিয়াছেন!

আমরা এস্থলে কয়েকটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হিন্দু সাহিত্য খুঁজিলে এই শ্রেণীর রাশি রাশি কবিতা দেখিতে পাইবেন।

১. কবিতা পুস্তক/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'আসে আসুক না আরবী বানর
আসে আসুক না পারসী পামর,
খেদাইব দূরে ঘোরীর বানর।'

২. কবিতা-সংগ্রহ/ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

'বড় সব ধেড়ে ধেড়ে ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে, চড়ে ঘাড়ে,
কসে দাও হাড়ে হাড়ে ঠুকে।'
'পশ্চিমে মিঞা মোল্লা, কাছা খোল্লা,
তোবা তাল্লা বলে, কোপে পড়ে
তোপে উড়ে যাবে সব জ্বলে।'
'কেবলীই মরজীতেড়া, কাজে ভেড়া
নেড়ে মাথা যত, নরাধম নীচ
নাই নেড়েদের মত।'

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম ও নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারাণ, নারান, মধু, যদু, চুনীরাম, পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিত চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না। দিল্লির মুসলমান বাদশাহগণকে তাহাদের মর্মর খচিত শান্ত সমাহিত গোর হইতে উঠাইয়া উপন্যাস এবং কাব্যের পৃষ্ঠায় দুর্দান্ত অত্যাচারী কদাচারী পিশাচ এবং ঘৃণিত কাম কুক্কুররূপে চিত্রিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এবং তাহা নাটকাকারে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের নানা স্থানে অভিনীত হইয়া অগণ্য হিন্দু দর্শকের 'বাহবা' লাভ করিতেছে। বঙ্গের বিরাট মুসলমান সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না - শুনিয়াও শুনিতেছেন না। এমন আত্মমর্যাদা শুণ্য জাতি যদি অধঃপাতে না যায়, তবে আর কাহারা যাইবে?

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! হিন্দুগণ কি শুধু বাদশাহগণকেই কবর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন? তাহার অসূর্যম্পশ্যা বাদশাহজাদীগণকেও হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, গাঁজাখুরী কল্পনা বলে কাহাকেও বা পার্বত্য মুষিক নারীহন্তা নরপিশাচ শিবাজীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কাহাকেও বা শূকরভোজী রাজপুতের প্রেমাভিলাষিণী, কাহাকেও বা কোনও হিন্দু গোলামের চরন সেবিকারূপে চিত্রিত এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, বিমল আনন্দ উপভোগ ও অর্থোপার্জন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের শীতল রক্ত কোনও দিন উষ্ণ হইল না! হায়! যে জাতি বিজাতি এবং বিধর্মী কর্তৃক আপনাদের পরমপূজ্য পূতচরিত্রা স্বর্গনিবাসিনী মাতা, দুহিতা এবং ভগিনিগণের এ হেন লাঞ্ছনা এবং অবমাননা সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, তাহাদের যে জীবন আছে, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? হিন্দুজাতির মুসলমান ঘৃণা এবং বিদ্বেষ মজ্জাগত। এই জন্য অনেক হিন্দু মহাত্মা হিন্দুমুসলমানে সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়াও বিদ্বেষ পূরীষ বমন পরিহার করিতে পারিতেছেন না। হিন্দু লেখক, হিন্দু বক্তা, হিন্দু কবি, হিন্দু ঔপন্যাসিক মাত্রই যেন যবনের মুন্ডুপাত করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 'যবন' শব্দ লিখিয়াই হিন্দু লেখককে লেখনী ধারণ করিতে হয়, নতুবা হিন্দুর কলম মোটেই চলে না। সুতরাং মুসলমান, তুমি যতই আপত্তি করনা কেন, হিন্দু 'যবন' ছাড়িবেন কি করিয়া? হিন্দু বেদ ছাড়িতে পারেন, কালী দুর্গা শিব ছাড়িতে পারেন, মাথার টিকি কাটিতে পারেন, গলার পৈতা ছিড়িতে পারেন; কিন্তু যবন শব্দ ছাড়িতে সম্পূর্ণ অক্ষম। 'যবন' শব্দের প্রসাদেই দুর্বল এবং আশা শুন্য হিন্দু কোনওরূপে বাঁচিয়া আছেন।

পাঠক পাঠিকা! হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে কয়জন 'যবনের মুন্ডপাত' করেন নাই, বলিতে পারেন কি? এই যে, সেদিন এতবড় নামজাদা কবি ভারত উদ্ধারকারী হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন - যাহার মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ শোকসভার বক্তৃতা-তরঙ্গে টলটলায়মান হইয়াছিল - যাহার শোক চিহ্নের বিষাদ ফলক বক্ষে ধারণ করিয়া মুসলমান পত্রিকা 'নবনুর' মুসলমান-কবীন্দ্রকুলতপনদিগের দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া মহা শোকোচ্ছাস প্রকাশ করিল, হায় রে কপাল!! সেই হেমচন্দ্রই না 'বীরবাহু' কাব্যে মুসলমান বিদ্বেষ এবং হিংসার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন!! হায়! তিনি যে 'ভারতসঙ্গীতে'র জন্য বিখ্যাত, সেই 'ভারত-সঙ্গীত'ও না মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে রচিত!!

হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় এবার দিল্লী দরবারে 'রায় সাহেব' উপাধি মান্যে বিভূষিত হইলেন। তাহার উপাধি প্রাপ্তিতে হিন্দু পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান পত্রিকা 'মিহির ও সুধাকর'ও কতই না আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করিল!! কিন্তু হায়! সেই 'রায় সাহেব'ও না তাহার 'জ্যোতির্ময়ী' গ্রন্থে নির্মল চরিত্রা সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে কতই না বিভৎস বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন? 'মন্ত্রের সাধনে' তিনিই না মোগল সম্রাট আকবরকে ঘৃণিত কাম-কুক্কুটরূপে চিত্রিত করিয়াছেন!! হায়! আকবর! তুমিই না এই হিন্দুগণ এবং তৎসহ রায় সাহেবের পিতৃপুরুষ কর্তৃক জগদীশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছিলে! এই হিন্দুগনের প্রীতি এবং মঙ্গল কামনায় না পবিত্র ধর্মকেও তুমি লঙ্ঘন করিয়াছিলে? হায়! তাহার প্রতিদান কি এই! ধন্য হিন্দু! ধন্য তোমার ব্যবহার এবং কৃতজ্ঞতা, মূর্খ আমরা তোমাকে বুঝিলাম না।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আর কত নাম করিব? নাম করিতে করিতে কম্বলের লোম বাছার ফল হইবে। শুধু কি বঙ্কিম এবং নবীনচন্দ্রই মুসলমানের বুকে ছুরি বসাইয়াছেন? ইসলামের মস্তক চর্বণ করিয়াছেন? চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, প্রত্যেক হিন্দু লেখকই এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বঙ্কিম বা দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র। প্রত্যেকেই 'যবনের অরি'।

হিন্দু পুরাণে যবন শব্দের উৎপত্তির দুইটি বর্ণনা আছে। একটি এই যে, বিশ্বমিত্রের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিবার জন্য বশিষ্ঠ ঋষির ঔরসে গরুর গর্ভে একদল লোক জন্মগ্রহণ করে; তাহারাই যবন। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা এই যে, সগর রাজা কতকগুলি লোককে গুরুতর অপরাধের জন্য মাথা মুড়াইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; এই বিতাড়িত সম্প্রদায় এবং তাহাদের বংশধরগণই যবন। প্রিয় পাঠক পাঠিকা। দেখিতে পাইতেছেন, হিন্দুগণ আমাদিগকে কিরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন।

আমাদের ধারণা ছিল, কালে হিন্দুর এ মন্দ স্বভাব শোধরাইয়া যাইবে। মুসলমান পক্ষ হইতে ইহা প্রতিবাদ এবং আপত্তি উত্থাপিত হইলে, হিন্দু অবশ্যই 'যবনের মুন্ডপাতে' ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু হায়! আমাদের সকল আশাই বিফল হইয়াছে। আমাদের কাতর-ক্রন্দনে এবং সহস্র বিনয়েও হিন্দু লেখক সমাজের কিছুমাত্র চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে নাই।

হিন্দু লেখকগন যেন বাস্তবিকই মুসলমানের দুঃসময় দৌর্বল্য এবং নির্জীবতা দেখিয়া মহানন্দে বিকট উল্লম্ফে বৈশাখের ভীম বাত্যাতাড়িত মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাপুঞ্জের ন্যায়, অসংখ্য লেখনী মুখে মুসলমান হিংসা-বিদ্বেষ-কুৎসা-ঘৃণা উদ্গার করত, তৎসমুদয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশিত এবং প্রবাহিত করিয়া আমাদিগের দম আটকাইয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্যানের কুত্রাপি মুসলমানদিগের মন:প্রীণনের জন্য একটি সুগন্ধি কুসুমও পাইবার যো নাই। হিন্দু লেখক সম্প্রদায় প্রাণপণ যত্নে বিষকন্টকি লতা এবং দুর্গন্ধ কুসুম তরু সকল মুসলমানদিগের জন্য রোপণ করিয়া জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন।

মুসলমান পাঠক তাই বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া বিষবল্লীর বিষকন্টকে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ এবং দুর্গন্ধ কুসুমের পূতিগন্ধে দম বন্ধ হইয়া ছটফট করিতে থাকেন। এ অবস্থায়ও যন্ত্রণা উপশমের জন্য যদি কেহ 'আহা' শব্দটি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সাহিত্য উদ্যানরক্ষক হিন্দু মালীগণ 'কাস্তে', 'পাচন' 'খন্তা' 'কোদাল' লইয়া তাহার প্রতি তর্জন গর্জন এবং ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। হতভাগ্য মুসলমানের এমনি কপাল!

বিগত ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে মুসলমান শিক্ষাসমিতির কলিকাতা নগরীতে যে অধিবেশন হইয়াছিল - যথায় ভারতের যাবতীয় গণ্যমান্য শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান সমাগত হইয়াছিলেন; সেই বিরাট সভায় বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজ-হিতৈষী খ্যাতনামা জমিদার মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব "বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের" বিরুদ্ধে একটি রেজিলিউশন পাশ করেন। সমস্ত মুসলমানই আনন্দ এবং উষ্ণ সহানুভূতির সহিত উহার অনুমোদন করেন। পরে এই রেজিলিউশনটির বিবৃত বিষয় ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া 'Vernacular Education in Bengal' নাম দিয়া গ্রন্থকারে মুদ্রিত করা হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলেও তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই। উহা যে একটি ভাবিবার এবং বিবেচনার বিষয়, তাহা তাহাদের গর্বোন্নত মস্তকে কদ্যপি ধারণাও হয় নাই। অনেকে তাচ্ছিল্য করিয়া একবার খুলিয়াও দেখেন নাই। বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম মহারথী অত বড়ো নামজাদা কবি মাননীয় রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় সমালোচনা উপলক্ষে উহা একরূপ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

হায়রে বঙ্গের আত্মমর্যাদা শুন্য মুসলমান! তুমি বুঝিলে না, হিন্দুর নিকটে তোমার মূল্য কতটুকু। অন্ধ মুসলমান সমাজ! হিন্দু তোমাকে কতদূর অপদার্থ অসার অবস্থ (nothing) মনে করে, ইহাতেও কি তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না? যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাও বুঝিয়া লও যে, হিন্দু তোমাকে গালাগালি দিতে - পূতচরিত্রা বিমলমনা: বাদশাহজাদী এবং বেগমগণকে ব্যভিচারিণী দ্রৌপদী, কুন্তি, রাধিকা সাজাইতে - মুসলমান বীরেন্দ্রবর্গকে বালীহন্তা কাপুরুষ রামচন্দ্র অথবা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরুপায় ইন্দ্রজিত হন্তা ভীরু লক্ষণরূপে অথবা মাতৃহন্তা পরশুরামরূপে চিত্রিত করিতে - ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণকে অত্যাচারী অবিচারী কামুক লম্পট তিলক কৃষ্ণ ইন্দ্র দুর্যোধনরূপে অঙ্কিত করিতে কদ্যপি ক্ষান্ত হইবে না। অধিক কি, হে মুসলমান সমাজ! তোমার প্রানের প্রাণ ইসলাম-সূর্য হজরত রেসালতপানা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) পর্যন্ত যে হিন্দু লেখকের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই, তাহার নিকট সুবিচার সৌজন্য অত্র ব্যবহার প্রাপ্তির আশা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র।

সত্য বটে, আমাদের কাতর চীৎকারে দুই একটি হিন্দু লেখক মিষ্টমুখ লইয়া আমাদিগকে লাঞ্ছনা করিতে মধ্যে মধ্যে অগ্রসর হন; কিন্তু হায়! তাহারা আমাদের কাতরতা এবং শোকের মূল কারণ তাহাদের স্বজাতীয় স্বসম্প্রদায়ির বিষাক্ত লেখনীবাণ আমাদের অন্ত:করণে বিদ্ধ করিবার লক্ষ্য পথে কোনও প্রকার

বাধা উপস্থিত করেন নাই এবং করিতেও আন্তরিক প্রস্তুত নহেন। পাঠক! বলিতে পারেন কি, কোনও হিন্দু লেখক এ পর্যন্ত কোনও স্বকীয় সাহিত্য সভায়, পুস্তক বা পুস্তিকায় মুসলমান-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আন্দোলনের সাবধান ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছেন? সুতরাং আমরা কিরূপে হিন্দুগণের নিকট প্রীতি ও ভালবাসার স্নিগ্ধবাণীর আশা করিতে পারি?

তাই বলি, বঙ্গীয় মুসলমান! এক্ষণে হিন্দুভায়াদিগের আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা ধীরবেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্যানে তোমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিষাক্ত কন্টকীলতা রোপিত হইয়াছে; তৎসমুদয় ঐসলামিক তেজ:দীপ্ত সত্যের তীব্র কুঠারে এবং অনল নিস্রাবিণী সমালোচনার দাবানল শিখায় কর্তিত ও ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হও।" [মাসিক ইসলাম প্রচারক - নভেম্বর/ডিসেম্বর, ১৯০৩][১৭]

ছয়

"...বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন সেন, ডি.এল রায়, সুরেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষা-বীজ, যাহা প্রথমে উষর ক্ষেত্রে উপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নধর শ্যাম তরুতে পরিণত হইয়াছে। আশা করা যায়, অচিরে তাহা ফল প্রসব করিবে। এক কালে নগণ্য জাপানের ন্যায় আজ বাঙ্গালী হিন্দু জগতের সম্মুখে বড়ো হইতে চলিয়াছে। তাহার সুরেশ ব্রাজিল দেশে যশোবৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছেন। তাহার জগদীশ ইউরোপ আমেরিকায় কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র রূপে জগতের জয়মাল্য পাইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমান। যদি তুমি জড়জগতের ন্যায় বসিয়া থাক, তবে বাঙ্গালার বক্ষে তোমার স্থান নাই। জান না কি যোগ্যতমের রক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম? তোমাকে বড়ো হইতে হইবে। তোমাকে তোমার অগ্রজের সমান হইতে হইবে।

আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে। বড়ো হইতে হইলে আমাদের সাহিত্য চাই। রোমের ইতিহাস পড়, গ্রীসের ইতিহাস পড়, আরবের ইতিহাস পড়, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়, জর্মানীর ইতিহাস পড় দেখিবে - জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি কেমন একতারে বাঁধা।

প্রথমে চাই মুসলমান বালকবালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক। কি পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম, শ্যাম, গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড়ো ভালো ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লাহ কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখন হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ উপ্ত হইল। তারপর সে তাহার পাঠ্য পুস্তকে রাম-লক্ষণের কথা, কৃষ্ণার্জুনের কথা, সীতা-সাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। স্বভাবত: তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোটো জাতি, আমাদের মধ্যে বড়লোক নাই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে মুসলমানত্বহীন করা হয়। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহ নয়। মুসলমানের নিতান্ত ছোটো 'জাত'। তাহাদের মধ্যে ভালো লোক জন্মিতে পারে না। এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। আমি বলি না, মুসলমান বালক-বালিকার হিন্দুমহারাজদিগের জীবনী জানিয়া কাজ নাই। আমি কেবল বলিতে চাই, আগে নিজের ঘরের খবর জান, পরে পরের ঘরের খবর জানিও।

একথা ঠিক, বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে যতটা জানে, বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান সম্বন্ধে তাহার এক আনা জানে কি না সন্দেহ। কাজেই মুসলমানগণ পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অধিক কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। মক্তবে ও মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদিগের শিশুদিগকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, এতদপেক্ষা আর কি কলঙ্কের কথা আছে। আমরা কি এতই মূর্খ যে, তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতে পারি না?

---

[১৭]. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী/প্রবন্ধ সমগ্র (সম্পা: হোসেন মাহমুদ)। [জ্ঞানবিতরণী - ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ৫৮-৬৪]

রাজসিংহ ও চন্দ্রশেখরের লেখককে খালি গালি দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক সার্চ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্ধ-সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালী মুসলমান, তাহা করিবার কি? দেখ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তোমার কার্য্য করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালী মুসলমান, তোমার মুখের চুন কালি মুছিতেছেন হিন্দু। তুমি কি এত অক্ষম?

জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে, কতগুলি আদর্শ খাড়া করিতে হইবে। উপন্যাস ও নাটকে যেমন লোক চরিত্র অঙ্কন করা যায়, আর কিছুতেই সেরূপ সম্ভব না। আমাদিগকে উপন্যাস ও নাটক দ্বারা দেখাইতে হইবে মুসলমানের কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের পারিবারিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের সামাজিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের রাষ্ট্রীয় জীবন কিরূপ হওয়া উচিত। খালি প্রেম কাহিনি লিখিয়া কোন ফল নাই। মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকের ভিতর একটি মুসলমানি ছাপ থাকা চাই। নচেৎ জাতীয় জীবনের জন্য সে উপন্যাস, সে নাটক বৃথা। কাব্য ও খণ্ড কবিতায়ও ইসলামিক ভাব থাকা চাই। কাব্য এমন হইবে, কবিতা এমন হইবে, যাহা পাঠে মুসলমান খাঁটি মুসলমান হইতে পারে। তাহাতে মুসলমান জীবনের আদর্শ থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ তা সে যতই সুন্দর হউক, তদপেক্ষা ইসলামিক ভাবপূর্ণ মাঝারি ধরণের কাব্য ও কবিতা আমাদের এক্ষণে প্রার্থনীয়।

শত সহস্র সভা সমিতির দ্বারা যে কাজ হয়, এক সাহিত্যের দ্বারা তাহার হাজার গুণ কাজ হয়। জাতীয় জীবন গঠনের জন্য সাহিত্য অপরিহার্য্য। বাঙ্গালী হিন্দু বৌদ্ধ জাপানীর ন্যায় আজ বড়ো হইতে চলিয়াছে। আমাদিগকে ছোটো থাকিলে চলিবে না। এই আগে চলার দিনে আমাদিগকেও আগে চলিতে হইবে। নচেৎ আমাদিগকে ব্যক্তিত্ব হারাইয়া হয় জীবনে মরণে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে, নয় বাঙ্গালা হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইতে হইবে। আমাদিগকে বড়ো হইতেই হইবে। বড়ো গাছের তলায় ছোটো গাছের মত যদি আমরা শুকাইয়া মরিতে না চাই, তবে আমাদিগকে বড়ো হইতেই হইবে। এই বড়ো হইবার জন্য সাহিত্য চাই। শুধু অলস বেকার সময় কাটাইবার জন্য নহে, শুধু কল্পনার খেলা দেখাইবার জন্য নহে, বড়ো হইবার জন্য সাহিত্য চাই।

রুসো-ভলতেয়ার এবং বিশ্বকোষকারগণের রচনাদ্বারা নব্য ফরাসী জীবন গঠিত হইয়াছে। বিসমার্ক, নিটশে প্রভৃতির লেখনীদ্বারা নব্য জর্ম্মান জীবন অনুপ্রাণিত হইয়াছে। টলস্টয় প্রমুখ রুসীয় লেখকগণ দ্বারা রুসের রাষ্ট্রীয় জীবন নতুন পথে চলিয়াছে। দূরের দৃষ্টান্তের কি প্রয়োজন? বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, মনোমোহন, ডি,এল রায়, গিরিষ ঘোষ, নবীন সেন, বিবেকানন্দ, ব্রম্মঃবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে কি নূতন আশা, নূতন প্রেরণা, নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হয় নাই? হে মুসলমান সাহিত্যিক, তোমাকে তোমার অতীত গৌরব গাঁথা গাহিতে হইবে শুধু গর্ব করিবার জন্য নয়, আত্মসম্মান জাগাইবার জন্য। তোমাকে তোমার ইসলামের মাহাত্ম্য, ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্য ঘোষণা করিতে হইবে, হিন্দুকে ঘৃণা করিবার জন্য নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য। তোমাকে কাব্যসঙ্গীত রচিতে হইবে - শুধু কানের তৃপ্তির জন্য নয়, প্রাণে নব উন্মাদনা, উচ্চ চিন্তা, তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য। তোমাকে আদর্শ মুসলমান চরিত্র আঁকিতে হইবে - শুধু আত্ম প্রশংসা করিবার জন্য নয়, অনুকরণ করিবার জন্য। তোমাকে দর্শন বিজ্ঞানে আলোচনা করিতে হইবে, শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, তোমার প্রতিভায় জগৎকে মুগ্ধ করিবার জন্য।

আসিবে কি সে দিন যে দিন বাঙ্গলার মুসলমান তাহার স্পেনীয় মুর বা আরবীয় সারাসেন বা ইরানী ভ্রাতৃগণের ন্যায় ধর্মে মহীয়ান, জ্ঞানে গরীয়ান হইয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাহারও নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারিবে? যে দিন সে শুভ দিন দেখিতে পাইব, সে দিন আমার জীবন সফল হইবে, আমার মরণ ধন্য হইবে।"[১৮]

---

১৮. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ/ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ। [বাংলা একাডেমী-জুলাই, ১৯৮৫। পৃ. ২৯০-২৯১]

সাত

"...বাংলার হিন্দু-সম্প্রদায় ও মনীষীবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করলেও তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা ছিল বাংলার মুসলমানের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, উভয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের মাধ্যমে মিলনকে বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। আর এ কারণেই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যখনই মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হয়েছে তখনই এর বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে হিন্দু বিদ্বজ্জনমন্ডলীর প্রতিবাদ ও বিক্ষুব্ধ মনোভাব। এ-প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে ১৩৩৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সওগাত'-এ বলা হয়েছিল :

'হিন্দুরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা অন্তরে পোষণ করেন এবং আলাপে ও পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেন, আলোচনার সৌকর্যার্থ তাহার সারমর্ম নিম্নে লিখিতেছি :

পূর্বে হিন্দু-মুসলমানে পূর্ণ ঐক্য ছিল। হিন্দুরা মসজিদে 'সিন্নি' দিত; মুসলমানেরা নারায়ণকে সত্যপীর বলিয়া মানিত ও পূজা দিত। হিন্দুর মনসা-পূজা, শীতলা পূজা, কালী পূজা, দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতিতে মুসলমানেরা ভোগ দিত ও যোগদান করিত। হিন্দুরা পূজা-পার্বণে ও মেলাদিতে - কবি, তরজা, মচ্ছে, ভাসান, যাত্রা প্রভৃতি গানে আখড়ায় মুসলমানেরা সাগ্রহে, সানন্দে দলে দলে মিলিয়া অপূর্ব মিলন-সুখে নিমগ্ন হইত। হিন্দুরা যেরূপ গরুকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে মুসলমানেরাও সেইরূপ গোহালের গরুর খাতির-যত্ন, তোয়াজ-তাগিদ করিত এবং যে-গরু তাহাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দেয়, তাহাকে বধ করিতে ধর্মভীতির ন্যায় একরূপ ত্রাস বোধ করিত। পূজার দিনে মুসলমান বালক-বালিকারা এমন কি যুবক প্রৌঢ়রাও প্রতিমা দর্শন করিতে সমবেত হইত। খই মুড়ি প্রভৃতি লইয়া মনের সুখে খাইতে খাইতে আসিত। সদ্‌ব্রাহ্মণ দেখিলে হিন্দুর ন্যায় মুসলমান কৃষকও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর খুড়া, জেটা, বন্ধু প্রভৃতি কত প্রকার গ্রাম্য সম্পর্ক পাতাইয়া এক অপূর্ব মিলনানন্দে মাতিয়া থাকিত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। মুসলমান এখন আর পূজা-পার্বণে যোগ দিতে চাহে না, গানের আড্ডায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে, গরু মারিতে দ্বিধাবোধ করে না, বরং হিন্দুর মনে আঘাত দিবার ইচ্ছায় একটির স্থলে পাঁচটি গরু হত্যা করে এবং গোপন স্থানে না করিয়া প্রকাশ্য জায়গায় করে। হিন্দুকে দেখিলে পূর্বে মুসলমানের মন যেমন ভয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত এখন আর সেরূপ হয়। তৎপরিবর্তে মুসলমান এখন হিন্দুকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। কেন এমন হইল? কে প্রেম ও শান্তির আসনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের স্থান করিয়া দিল? ইহা গোঁড়া মোল্লা মৌলবীদেরই কাজ। তাঁহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য হিন্দুকে কাফের বলিয়াছেন, মুসলমানকে পূজা-পার্বণে যোগ দিতে নিষেধ করিতেছেন, ঈদের সময় গরু কাটিতে বলিয়াছেন, দেবগৃহ ভাঙিতে উত্তেজিত করিতেছেন। শিক্ষিত মুসলমানেরাও এই কার্যে মৌলবীদের সহায় হইয়াছেন। পূর্ণ যোগ্যতা না থাকিলেও যাহাতে সরকার তাহাদিগকে চাকুরী দেন, তদুদ্দেশ্যে তাহারা মুসলমান জনসাধারণকে হিন্দুর সহিত পূর্বেকার সেই মধুর মিলন সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া পৃথক হইতে উপদেশ দিতেছেন। শিক্ষিত মুসলমানেরা সরকারের অভীপ্সিত ভেদনীতি প্রচার করিয়া অযোগ্যতা সত্ত্বেও চাকুরির সুবিধা পাইতেছেন। এইরূপে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেমধ্যে ভেদ জাগিয়াছে, বিরোধ জাগিয়াছে, শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছে। গোঁড়া মোল্লা মৌলবীরা ও শিক্ষিত মুসলমানেরাই এজন্য দায়ী ইত্যাদি...

হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকাদিতে হিন্দু-মুসলমান মিলন বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্তসার দিলাম। ঠিক হইল কিনা জানি না, বোধ হয় একেবারে বেঠিক হয় নাই; তাহা হইলে দেখুন ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের, এমন কি হিন্দু সম্পাদকের জ্ঞান কত সামান্য।"

অতীতে যখনই মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা ঘটেছে তখনই হিন্দু বিদ্বজ্জনমন্ডলী তথাকথিত মিলন ও ঐক্যের নামে মিশ্রণের (Fusion) প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এর ফলে মিশ্রণ তো সম্ভবপর হয়নি-ই, অধিকন্তু বিরোধ এবং ভেদরেখাটিই উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। শুধু ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও

হিন্দু জনসাধারণ ও বিদ্বজ্জনমন্ডলীর উল্লিখিত মনোভাব বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে, ফলে বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যধর্মী পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের অভাব এবং ক্রমবিলুপ্তি লক্ষ্য করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন ক্রমান্বয়ে বিষিয়ে উঠেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এক সময় মুসলিম সাহিত্যসাধক ও বিদ্বজ্জনমন্ডলীর মনে বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা কিনা এ প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারেনি, কারণ হিন্দু সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের নিগড়ে বেঁধে এবং সাহিত্যকে হিন্দু ঐতিহ্যমূলক বিষয়সম্ভারে পরিপূর্ণ করে দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন যার ফলে স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম মনের পক্ষে সে সাহিত্যের রস-আহরণ এবং তার সেবায় আত্মনিয়োগ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

এই প্রতিকূল পরিবেশেও যারা সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন তাদের হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাহিত্যে মুসলিম-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক শব্দাবলী এবং বিষয়বস্তু কেন স্থান পাবে না এ নিয়ে তর্কবিতর্কেরও অন্ত ছিল না। এ কারণেই সেদিন মুসলিম চিন্তাবিদগণকে বলতে হয়েছিল :

'বাঙলা ভাষায় 'আওয়াজ' শব্দটা স্থান পেতে পারে কিনা তাই নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু প্রধানরা বলেন, সিপাহীর পরিবর্তে যোদ্ধা, হুকুম-আজ্ঞা, সাহেব-মহাশয়, বন্দুক-আগ্নেয়াস্ত্র, আব্রু-পর্দা — শুদ্ধান্ত হলে Chaste ও Elegant হয়। তাঁদের মতে ইসলামী শব্দ হলেই Unchaste ও Unelegant-এর ভিতরে একটা বিপুল জাতি-বিদ্বেষের গন্ধ পাওয়া যায়। এরূপ করে তাঁরা ভাষার স্বচ্ছন্দগতিতে আড়ষ্টতা এনে দিয়েছেন। একদল সাহিত্যিক কথ্যভাষাকে লেখ্য ভাষায় পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন সত্য, কিন্তু তাও চলতি আরবী-ফারসী শব্দগুলি বাদ দিয়ে। তারা ওগুলিকে Untouchable করে রাখতে চান। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন, যে শব্দগুলি বাঙলার শতকরা ৬০ জন লোক ব্যবহার করে আসছে, তার অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়া সোজা কথা নয়। আজ বাঙলার মুসলমানের দৃষ্টি যখন ওদিকে পড়েছে, তখন ওগুলিকে আবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিতরে ঠাঁই করে দিতেই হবে।' (বাঙলার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য, আবদুল মজিদ, সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৩)

মুসলিম সুধীসমাজ ও বিদ্বজ্জনমন্ডলীর মনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের সত্যিকার উত্তরাধিকার রয়েছে কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিক কার্যকারণ-সূত্রেই নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখা দিয়েছিল। বৃটিশ আমলে ইংরেজ শক্তির সহায়তায় এবং প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের বিদ্বজ্জনমন্ডলীর উদ্যোগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে রূপ-পরিবর্তন ঘটেছিল তার মূলে বিবর্তনের কোন স্বাভাবিক নিয়ম কার্যকরী ছিল না, বরং একটি পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রবণ কর্মসূচীই ছিল এর মূলে ক্রিয়াশীল। খ্রিষ্টান মিশনারীরা নিজেদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে এবং বৃটিশ শাসন-কর্তৃপক্ষ শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা পরিচালনার সুবিধার্থে এবং হিন্দু সমাজ সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে মুসলিম বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক পরিচয়-সমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন-ষড়যন্ত্রে উল্লিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম বৈশিষ্ট্যসমূহের বিলুপ্তি স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেনি, বরং একটি সুকল্পিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা এর অপমৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বল্প-সময়ের ব্যবধানের মধ্যেই জনজীবনে না হলেও, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রূপায়িত সাহিত্যিক চরিত্রায়ণ ও অভিব্যক্তিতে মুসলিম পরিচয়-চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে-রূপ গ্রহণ করেছিল তাতে এ-দেশে মুসলিম অস্তিত্বের কোন নিশানাও বর্তমান ছিল না। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের লোকজধারাকে বাদ দিলে অভিজাত সাহিত্যধারায় এর ব্যাপক পরিচয়-চিহ্ন খুজে পাওয়া বস্তুতঃই কঠিন।

মুসলিম সাহিত্যিকরা যে উনবিংশ শতাব্দীতেও বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও রচনার ভাষায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যধর্মী পরিচয় চিহ্নিত করতে পারেননি তার মূলেও এই ঐতিহাসিক কার্যকারণই বর্তমান। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালের শাসনামলে এবং আরবীয় বণিকদের বাণিজ্য-ব্যাপদেশে এ-দেশে মুসলিম সংস্কৃতির যে বিশেষ ধারা রূপ লাভ করেছিল তা শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধন করেনি, জনজীবনের ভাষারও ব্যাপক রূপান্তর সাধন করেছে।

এই জনজীবনের ভাষাই চলতি ভাষার পুঁথি-কাব্যের ভাষা। এমন কি পলাশীর বিপর্যয় না ঘটলে অর্থাৎ মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানী-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে উল্লিখিত চলতি ভাষাই যে বাংলা সাহিত্যের ভাষা হতো এ-সত্য ঐতিহাসিক পন্ডিতরাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বাভাবিক বিবর্তনকে স্বীকার করে নিলে এ সত্যের স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরবর্তী-পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উল্লিখিত ধারার স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হিন্দু বিদ্বজ্জনমন্ডলী এবং হিন্দু-পুনরুত্থানবাদীরা বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাখিবন্ধনে মিলিত হয়েছিলেন, তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয়কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হলে ইংরেজ রাজশক্তি এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া গতি নেই। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা আবিষ্কার করতে গেলে খ্রিষ্টান মিশনারী ও ইংরেজ রাজশক্তির উল্লিখিত প্রচেষ্টার স্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই উন্মোচিত হয়।

ইংরেজ রাজশক্তি ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের এই ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে মুহম্মদ সিদ্দিক খান তার তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা'য় লিখেছেন :

"১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চতর যুদ্ধকৌশল, কূটনীতির প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্রের বলে ইংরাজগণ কলহপ্রিয় স্বার্থপর ওমরাহ পরিবেষ্টিত আরামপ্রিয় দুর্বল নবাবের কাছ থেকে শাসনদন্ড সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তী যুগে ইংরেজ শাসন এ দেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে একদিকে মুসলমান আমলের সরকারী ভাষা ফারসীর বিরুদ্ধাচরণ ও অপর দিকে আরবী-ফারসী শব্দবর্জিত সংস্কৃতবহুল বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। তাদের বাংলা ভাষার প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগের পেছনে ভাষাগত কিংবা সাহিত্যিক মূল্যবোধের চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের প্রেরণাই ছিল প্রধান। বহুদিন পর্যন্ত মুসলমান রাজদরবারে ফারসী রাজভাষার সম্মান পাচ্ছিলো বলে সেই আমলের অন্যান্য দেশীয় ভাষার মতো বাংলাও ছিল ফারসী শব্দবহুল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা দেশের শাসনভার বৃটিশ শক্তির হাতে চলে যায়। তাই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে বিজয়ী ইংরেজ বিজিত মুসলমান শাসকদের রাজনীতি আদব-কায়দা এবং ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। আরবী-ফারসী বর্জিত সংস্কৃতগন্ধী বাংলা ভাষার উন্নয়নে ইংরাজদের এই উৎসাহ ছিল বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করার বহুবিধ কারসাজির মধ্যে অন্যতম।' (পৃষ্ঠা ১৭-১৮)

উল্লেখযোগ্য যে, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য থেকে যে সংঘাতের জন্ম হয় তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এক সময়ে বাংলা ভাষা মুসলমানের মাতৃভাষা কিনা এ নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। স্মরণযোগ্য যে, বাংলা সাহিত্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিষয়াবলীর স্থান না হওয়ায় এবং 'রিভাইভ্যালিষ্ট হিন্দু-কৃষ্টির' একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে মুসলিম বিদ্বজ্জনমন্ডলীর মনে এমন ধারণার জন্মলাভ অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রয়োজনেই আবার তাদেরকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগের অনিবার্য আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে হয়েছে।"[১৯]

আট

"...সেই কিশোরকালে। মন তখন একটি নিষ্কলুষ পুষ্পকোরক — দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিদ্বেষের কালিমা তাকে তখন স্পর্শ করতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ বিভেদ বুদ্ধির কালোমেঘ তখনও তার কাছে পরিদৃশ্যমান নয়। আমার স্ফুটনোন্মুখ চেতনায় যখন ভেদ-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা বোধগম্য নয় — তখন হাতে এলো শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'। প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে পাতা উল্টাতেই দেখি লেখা রয়েছে

[১৯]. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ/সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা। [আহমদ পাবলিশিং হাউস - ভদ্র, ১৩৭৪। পৃ. ৩১-৩৮]

'স্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'। হঠাৎ করে যেন অবধারিত সংঘর্ষ শুরু হ আর শ্রীকান্তের কণ্ঠে শরৎ চন্দ্র লিখেছেন 'পাঁচ-সাতজন মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূ রচনা করিয়াছে, পালাইবার পথ নাই।' অবশ্যই 'সুদুর্লভ' সাহসী ইন্দ্র একাই এই দাঙ্গাবাজ মুসলম ছোকরাদের হাত থেকে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করে গর্ব ভরে বললো 'ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি'।

তখন আসামের নওগাঁতে ছিলাম বলে হয়তো অহমীয়াদের মধ্যে বাঙালি পরিচয় খুব প্রধান মনে হ এবং ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাভাষী মাত্রকেই বাঙালি জ্ঞান করেছি। আমাদের ছাত্রাবস্থায় যদিও তখ পাকিস্তান আন্দোলনের যুগ, সর্বব্যাপী জোরদার সে আন্দোলন, তবুও বাংলাভাষী হিসেবে নিজেদে বাঙালিই আমরা ভেবেছি। শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলো মনে এক গভীর দাগ কেটে দিল, আশ্চর্য! ওরাতো আমাদের বাঙালি ভাবে না। মনে করে বাঙালি মাত্রই হিন্দু।

অনেককাল পেরিয়ে গেল। সেই ব্রিটিশ যুগের বিদায়ী ঘণ্টা শুনলাম কলং নদীর পারে সাতচল্লিশ সনে, তারপর কত পানি গড়িয়ে গেল গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের স্রোত ধারায়। অনেক বছর পরে ১৯৯৮ সনে ৭ নভেম্বর ঢাকার বাংলাবাজার পত্রিকার মুক্তমঞ্চে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের লেখকের নাম দেখে সাগ্রহে চোখ বুলালাম। অন্নদাশংকর রায়। যিনি সেই ১৯৫১ সনে আমার চৌদ্দ বছর বয়সকালের সম্পাদি ছোট গল্প সংকলন 'নতুন ছবি'র প্রকাশনায় (নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে প্রকাশিত) শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। যিনি ঢাকার 'মাসিক মিনার'-এ লিখেছিলেন

'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল, আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়নি ক' নজরুল।'

সেই অন্নদাশংকর রায় 'বাংলাবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'আদি পর্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন 'বাঙালি বলতে আমি সাধারণত বুঝি বাঙালি হিন্দু। তাই বাঙালি সংস্কৃতি বলতে বুঝি বাঙালি হিন্দু-সংস্কৃতি' পড়েও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি। বার বার দেখেছি। এত কিছুর পরেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম, বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষা-ভিত্তিক বাঙালি পরিচয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, যদিও যার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, আমাদের সংগ্রাম ও চেতনায় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অথচ অন্নদাশংকর রায়ের চোখে আমরা বাঙালি নই। যদি অন্নদাশংকর রায়ের এই উপলব্ধি, এই জ্ঞান বিশ্বাস - তাহলে তার সমগোত্রীয় অন্যদের কি ধারণা? রায় এর মতাবলম্বী লোকেরা তো মনে করেন আমরা বাঙালি নই এবং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা হল তারা মনে করেন বাংলাদেশের বা পশ্চিবঙ্গের বাংলা-ভাষী হিন্দুরাই শুধু বাঙালি।

আশ্চর্যের কথা ওই প্রবন্ধে অন্নদাশংকর রায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহীর নওগাঁ ইত্যাদি স্থানে দীর্ঘ চাকরি জীবন অতিবাহিত করেও তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলিম-অবদান তো দূরের কথা, মুসলমান অস্তিত্বও কি লক্ষ করেননি? দেশ বিভাগের সময় তিনি ময়মনসিংহের জেলা জজ ছিলেন। প্রচুর বাঙালি মুসলমান তার সহকর্মী ছিলেন। জেলা অধিবাসীও অধিকাংশ মুসলমান। তাদের তিনি কি জ্ঞান করতেন? বাঙালি নয় স্লেচ্ছ? অথচ এই লেখাপড়ার আগে আমি সব সময় ভেবে এসেছি অন্নদাশংকর রায় অসাম্প্রদায়িক।

কোনো কোনো নামকরা বাংলাভাষার লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি'র রচনায় শুধু যে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, বাঙালি মুসলমানকে ওরা বাঙালি বলতেই রাজি নয়। ছত্রে ছত্রে পরতে পরতে বিদ্বেষ। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র লাঠির মহিমা প্রসঙ্গে লিখেছেন 'হায় লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে। তুমি বাঙালির অক্রু পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে। ...মুসলমানগণ তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল। ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল। নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল।' এখানে মুসলমানদের শুধু বাঙালি'র প্রতিপক্ষই ভাবা হচ্ছে না, বিদ্বেষ ও রুচিহীন সাম্প্রদায়িকতায় তাদের ডাকাইত ও অত্যাচারী নীলকরের সমগোত্র ভাবা হচ্ছে। এই উস্কানিমূলক কুরুচিপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

'এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে? মহেন্দ্র। তাড়াবে কেমন করে? ভবা। মেরে।' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাম্প্রদায়িকতা ও উসকানিমূলক ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষ প্রচার একটি প্রধান স্থান দখল করেছে। বাঙালি মুসলমানসহ সব মুসলমানদের প্রায়শই তিনি 'নেড়ে' এবং 'ম্লেচ্ছ' বলেই উল্লেখ করেছেন। ধিক্কারমূলক 'যবন' শব্দও তিনি এবং অন্য কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন বলে আমার মনে পড়ে। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'য় 'ম্লেচ্ছ' শব্দের অর্থ - 'অসভ্য জাতি, যবন, অহিন্দু'।

কলকাতার 'সত্যযুগ'-এর ১৩৮৯ সনের শারদীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত নির্মল করের 'বঙ্কিমচন্দ্রের লাঠ্যোষধি' প্রবন্ধের বঙ্কিম-প্রশস্তিতেও এ সবের উল্লেখ। উপসংহারে লেখক বলছেন, 'এমনকি প্রয়োজন বোধে এক আসুরিক বিক্রমে লাঠি-সড়কি পর্যন্ত হাতে নিতে তিনি পিছ পা হননি কোনো দিন।'

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বৃক্ষের বীজ রোপণ মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। এ শুধু ছড়ায় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষমূলক উত্তেজনা - বিভেদের বিভাজন রেখাকে করে তোলে অনতিক্রমণীয়। তাই এটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অথচ উনিশ শতক থেকেই বাংলা ভাষায় কোনো কোনো হিন্দু লেখকের রচনায় বিদ্বেষে ও ব্যঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব খুব তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকের কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনিও 'নেড়ে' শব্দ ব্যবহার করে লিখেছেন–

'দিশি পাতি নেড়ে যারা, তারা পুড়ে হয় সারা
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাঁদু বাড়ি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তবু, নিদ নাহি হয়।
এঁদে যে ফুফু নানী, কলুই ডেলের পানি,
কাঁচা ক্যালা কোচুর ছালন।'

বাঙালি মুসলমানদের তিনি বিশেষ করে 'দিশি পাতি নেড়ে' বলে উল্লেখ করেছেন। আর ব্যঙ্গ করেছেন ভাষা জ্ঞানহীন অসভ্য বলে - মামু, নানী, ফুফু শব্দ ব্যবহার এবং 'কলুই' ডেলের পানি' ও 'কোচুর ছালন' ভোজনজনিত কারণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৭৫ সনে লেখা 'সরোজিনী' নাটকের সংলাপ : 'সরোজিনী: মা চতুর্ভুজ! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর। লক্ষণ : বৎসে, মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে।' তারই লেখা 'স্বপ্নময়ী' নাটকের সংলাপ — 'সুরজমল : যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন বিষতুল্য বোধ হয়।' এমনকি নাট্টাচার্য গিরিশ ঘোষের 'সৎনাম বা বৈষ্ণবী নাটকের সংলাপ' ঐতো, এ বাড়িতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে, ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশ-ব্যাপী সুর লহরী শোন। তলোয়ার হাতে আছে। যাও গিয়ে বধ করো।'

ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্রগুলোকে কলঙ্কলেপন করে ধর্মজনিত কারণে ধিকৃত করেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন

'নীল দর্পণ' রচয়িতা দীন বন্ধু মিত্রের -

'অপকৃষ্ট আওরঙ্গজীব রাজা দুরাচার
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার
ভাঙিয়া মন্দির তার মসজিদ গঠিল
প্রস্তর বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।'

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের -

সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ।'

বিশ শতকের গোড়ার দিকে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন–

'শোনরে পাপিষ্ঠ মুসলমান
বাল্যে বিনাশিয়া পতি
মোর কৈলি এই গতি
মম বাক্যে না হইবে আন।
যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ
ততদিন না ছাড়বি সংগ্রামের বেশ।'

নবীনচন্দ্র সেনের বাড়ি সম্ভবত চট্টগ্রাম ছিল। অর্থাৎ তিনি বর্তমান বাংলাদেশ থেকেই ধর্মজনিত কার সব 'ম্লেচ্ছ' (অর্থাৎ ওর ভাষায় অসভ্য জাতি, যবন, অহিন্দু মুসলমান)দের তাড়াতে চেয়েছিলেন। আম বিপ্লবী সূর্যসেন (মাস্টার দা) ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে দেওয়া একটি চিঠিতে লিখেছিলেন — 'ভার বর্ষকে স্বাধীন করিতে হইবে, সাত শত বছরের পরাধীনতা ঘুচাইতে হইবে।' অর্থাৎ মুসলমান সম্রাটদে রাজত্বকালকে তিনি পরাধীনকাল বলেই উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার তুলনামূলক বিবরণ দি দখলকারী হিসেবে মুসলমানদের এবং ইংরেজদের কথা বলেছেন। ইংরেজদের কোনো গালি-গালাজ ন করে মুসলমানদের হেয় জ্ঞান করে নবীন চন্দ্র সেন লিখেছেন–

'জানি আমি যবনেরা ইংরেজের মত ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।'

কাব্য-সাহিত্য মারফৎ এই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য সাম্প্রদায়িকতা ছড়াবার অপচেষ্টা এখনও চলছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচারিত (সম্ভবত মুসলিম সম্পাদিত) সাপ্তাহিক 'কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে শিশু-কিশোর মনকেও বিষাক্ত করে তোলার জন্যে স্কুল পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ছড় গল্প ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনাব আয়ার দানিশ তার গবেষণাধর্মী সুলিখিত প্রবন্ধ 'ভারতী পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম বিদ্বেষ' প্রবন্ধেও তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। 'কলম' এ প্রকাশিত রিপো অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার বারুইপুরের রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়, পদ্মপুকুর বিদ্যাল ইত্যাদিতে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্ধারিত একটি ছড়ার বই হচ্ছে সৌরেন বসু বিরচিত এবং প্যাপিরা প্রকাশিত 'আয় বৃষ্টি ঝেপে'। বইটিতে রয়েছে মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষ যা সাম্প্রদায়ি এবং বিদ্বেষপূর্ণ। 'মোচলমান' মিঞা 'মৌলভীর' ব্যঙ্গাত্মক ছবি সংযোজিত যা লেখকের পীড়াগ্রস্ত ম ও নিচ রুচিবোধের পরিচয় বহন করছে। শিশু পাঠ্য পুস্তকটির অন্তর্ভুক্ত ছড়াগুলোর নমুনা দেখে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

'ভিখ'

'আয়ার বিবি যায়ার বিবি, তালাক তালাক দিয়া,
কানের তুলোয় আতর গুঁজে, আয়াত পড়েন মিঞা।
ভিখ মাঙ্গনে আয়া বিবি, ভিখ মাঙ্গনে আয়া,
বোরখা কোথায়? বুঝছ মিঞা, বিবি কি বেহায়া।'

সারার্থ হচ্ছে, কানে আতর গুঁজে কোরানের আয়াত পাঠকারী মুসলমানরা কথায় কথায় তালাক দেয় এব নিরুপায় বিবিগণ বোরখাবিহীন অবস্থায় (অর্থাৎ কিছুটা বিবস্ত্র হয়তো বোঝাতে চাচ্ছেন) বেহায়ার ম ভিক্ষা চেয়ে বেড়ান। 'ভিখ মাঙ্গনে আয়া' শব্দগুলোর সংযোজন কাটা গায়ে নুনের ছিটা।

'বিবি'

'রসুল মিঞার চারটি বিবি, বড় বিবি দেখন টিভি
মেজ বিবি মাটির ঢিবি, সেজ বিবি শীর্ণজীবী।
ছোট বিবি বলেন দিবি, নগ্ন দিবি আর পাশা বিবি?
ছোট বিবি বড় চালাক, মিঞা বলেন, 'তালাক তালাক'।

রসুল নামটির ব্যবহারও এখানে হীন উদ্দেশ্যমূলক। আরো কিছু ছড়া আছে এ ধরনের যেমন বাংলাদেশ ধুক্কুমার। আরো আশ্চর্যের কথা এগুলো স্কুল কর্তৃপক্ষ পাঠ্য পুস্তক হিসেবে চালু করেছেন এবং স্কুলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে এগুলো পড়িয়ে তাদের সহপাঠীদের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ বিদ্রূপের লক্ষ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'নতুন গতি' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি প্রতিবেদন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা অনুমোদিত দ্বিতীয় একটি পাঠ্য পুস্তক হচ্ছে অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'প্রশ্নোত্তরে ইতিহাসের কথামালা;' এই পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় শুরু হয়েছে 'হযরত মোহাম্মদ (স) কথা'। অধ্যায়টির সূচনায় একটি ছবি। হযরত মোহাম্মদ (স) একটি নক্সাকাটা পাঞ্জাবি ও টুপি পরে এক মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ৭০-এর পাতায় পিতা আব্দুল্লাহ ও বোরখা পরিহিত বিবি আমেনার ছবি। ওই পৃষ্ঠারই শেষে আরেকটি ছবি, পাঞ্জাবি ও চেক লুঙ্গী পরে একটি গুহার মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (স) নামাজ পড়েছেন। লেখক, প্রকাশক ও কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন এ ধরনের ছবি মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের ধর্মবোধকে অন্যায়ভাবে আঘাত করার ভাঁড়ামি সুলভ মনোভাব। এ ধরনের উসকানিমূলক বিদ্বেষপ্রসূত কর্মকান্ড সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রচারেরই বাহক। অবশ্য এধরনের নিচু শ্রেণীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ এক জাতীয় গভীর হীনমন্যতা ও মানসিক ব্যাধি, তবুও এটাতো অনস্বীকার্য যে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এ ধরনের উদ্যোগ সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।

যদি সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে হয় তাহলে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড বিসর্জন দিতে হবে। ভারতীয় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার কিছু নমুনা দেখালাম, উর্দু ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়ও রয়েছে এর প্রচুর নজীর। এ সবের জন্যেই শিবসেনা, বজরং, আরএসএস, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জাতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যাদের প্ররোচনা ও প্রত্যক্ষ আক্রমণাত্মক উদ্যোগে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস হয়, অনুষ্ঠিত হয় সংখ্যালঘু বিরোধী দাঙ্গা। অনুসৃত হয় সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে বৈষম্যমূলক আচরণ।"[২০]

নয়

"...'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিনলক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিনসহস্র আর্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থবৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্তী সহস্র রশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচন্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমন্দ্রিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিনলক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর'

---

[২০]. ইনাম আহমেদ চৌধুরী/ভাবনায় বাংলাদেশ || [হাসি প্রকাশনী - মে, ২০০৯। পৃ. ১১৩-১১৭]

ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? বলিতে পার, সেদিনকার আর্যস্থানের সূর্যদেব সহস্র রক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক।

ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাশ্মীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুবনক্ষত্র।[২১]

দশ

"...কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গমগম করিতে থাকে এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে নিরন্তর যাহা প্রবেশ করে, মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুত এই-ই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল, সে ত কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর-কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এদেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এইজন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায় বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগলা ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তার পরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ-আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এতবড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়; কারণ কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময়-মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাঙলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ-আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য।

কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই — এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল,

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/রীতিমত নভেল ॥ [রবীন্দ্র-রচনাবলী (নবম খণ্ড)। বিশ্বভারতী (কলকাতা) - পৌষ, ১৪১০ (সুলভ সংস্করণ)। পৃ. ৩৪১]

এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ স্বগত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভরতি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ-বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ-বা বাম হস্ত, কেহ-বা চক্ষু-কর্ণ, কেহ-বা আর কিছু, হায়রে! এত বড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না! সে-যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল।

ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল — অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইঁহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পড়াইয়া কাফের-ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও।

বস্তুতঃ, মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরদোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই-সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।

কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশি তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্‌চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না।

হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল, তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।

মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় ত সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজযুদ্ধে নামান যাইতে পারিবে, এ দুরাশা দুই-একজনার হয়ত ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন দুঃখ-দুর্দশার মত শিক্ষক ত আর নাই, বিদেশী ব্যুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজরথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষাসাপেক্ষ। যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না। এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য?

হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাঙলার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাতপুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে; সুতরাং রক্ত-সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়াভিক্ষা ও মিলন-প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি ত আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে-বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন।

কাহারও বা পিতামহ, কেহ-বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাইবোন নয়। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এতবড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি! আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে, এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনিই বটে। উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজগাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর, আর কাহারও নয়।"

[১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। পরে ঐ মূল ভাষণ প্রবন্ধ হিসেবে 'হিন্দু সংঘ' পত্রিকায় ছাপা হয়, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৩ সালে।][১১]

এগারো

"...নূতন বর্ষের পূর্ব্বে চাকরী পাওয়া গেল না। তখন বসে বসে শরৎ চাটার্জির গ্রন্থাবলীর একটা সমালোচনা লিখতে আরম্ভ করলাম। পাণ্ডুলিপি প্রায় এক শ' পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখার পর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে তখনকার মতো স্থগিত রাখি। এ সমালোচনায় আমি শরৎচন্দ্রের যে বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করেছিলাম সেগুলির মধ্যে ছিল তার সুন্দর, মর্মস্পর্শী ভাষা, সহজ রচনা পদ্ধতি, অত্যাচারিত যে কোন মানুষের প্রতি দরদ, হিন্দু সমাজে নারীর অকথ্য লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাদের মনে এর সমাধানের জন্যে ব্যাকুলতা উৎপাদন। তার দৃষ্টিতে অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ বলে কিছুই নেই। সমাজে পতিত ও ঘৃণ্য নরনারীর মধ্যেও ঘটনাচক্রে মহৎ গুণের স্ফুরণ হতে দেখা যায়। আঁধারেরও যে মনোহরণ রূপ আছে তা আর কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তিনি সমাজদেহের নানা প্রকার কঠিন রোগের বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সমাধান করেননি। এটা তাঁর লেখনীর বা মানসের দুর্বলতা নয় বরং এটা তার উৎকৃষ্ট শিল্প-জ্ঞানের স্বাক্ষর। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে সকল বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তিনিও সেসব বিষয়ে লিখেছেন। কিন্তু তিনি যে বিশেষ ভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ থেকে যে ভাষায় ও যে দরদভরা আবেগে, এসব প্রশ্ন সাধারণ নরনারীর সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং তাদের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী লেখকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না। সে জন্য তিনি লক্ষ্মীছাড়া, মাতৃহারা, পথভ্রষ্ট, ভাগ্যহীনদের এবং মানুষের কুবুদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তির অত্যাচারে যারা বিনা দোষে অশেষ দুঃখ ভোগ করে, তাদের প্রতি সমবেদনায় বাংলার সজল ভূমিতে নর-নারীর চোখের জলের ঝরণাধারা বহিয়ে দিয়েছিলেন।

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তিনি যে কিছু লিখেননি সে ক্ষেদও এ পাণ্ডুলিপিতে ছিল। অনেক পরে এ সম্বন্ধে তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন তা পড়ে মনে হয়েছিল এ সমাজের প্রতি তার অবজ্ঞা কত গভীর ছিল। শ্রীকান্তের ৪র্থ পর্বে গহরের যে বাউল-চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন এবং মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের মুসলমানদের হক আদায়ের প্রচেষ্টার তিনি যে ভাষায় বিরোধিতা করেছিলেন, তাতে মনে হয়, তিনি যে এ সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখেননি তা ভালই করেছেন। নয়ত তিনিও আমাদের চোখে দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হতেন।

সরকারী কলেজের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা না দেখে আপাততঃ মাষ্টারী করব, ঠিক করলাম। পরে ভেবে চিন্তে কী করা যাবে তার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কয়েক জায়গা প্রাইভেট হাই স্কুলের হেড মাষ্টারীর জন্যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করে বুঝলাম সেটি পাওয়াও নেহায়েৎ সোজা নয়। কারণ দেশের প্রায় স্কুলই হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে গেছে মনে হলেও আসলে তা অত্যন্ত সাময়িক ছিল। এ আন্দোলনে ভাটা পড়বার সাথে সাথেই মিলনের সেতুও ভেঙ্গে পড়েছিল। এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তার কয়েকজন অনুরক্ত ভক্ত ছাড়া আর কেউ মুসলমানের মনের প্রকৃত দুঃখ বুঝতে ও তার প্রতিকার করতে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না।

---

[১১]. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ। অষ্টম সম্ভার) ॥ [এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স (কলিকাতা) - ১৯৫১। পৃ. ৩৯৭-৪০২]

...১৯৩২ সনের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমাকে পাবনা জিলা স্কুলে বদলি করা হল। আমি কাজে যো দিয়ে দেখলাম হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কিন্তু, মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছি অতি নগণ্য। হরেন্দ্র বাবু নামে স্কুলে এক জন সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তিনি কথা-বার্তায় বেশ চতু চালাক এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সুপরিচিত। দু-একজন মাষ্টার ও তাকে নিয়ে সহরের বিশি নাগরিকদের সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। পথে কথায় কথায় হরেন বাবু হঠাৎ বলে বসলেন, 'স্যা এখন ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে গেছে। আগে এরকম ছিলনা। তখনকার দিনে বেশীর ভাগ ছাত্র ছিল ভদ্রলোকে ছেলে। এখন মুসলমান ছাত্র বেশী হওয়াতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।' আমি হেসে জবা দিলাম 'আমিও ত মুসলমান।'

শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর ১ম খন্ড, ২য় পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'স্কুলে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল খেলা' - যেন মুসলমান বাঙালী নয়। এ শিক্ষক বলছেন, মুসলমান ভদ্রলোক নয়। এ সব কথা আমরা বহুদিন স করার পর আপত্তি তুলেছিলাম। ফলে পাকিস্তানের জন্ম হল।"[২৩]

সাম্প্রদায়িকতা : শিক্ষায়

এক

"...মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও সুনিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কর্তৃক (১৯১৭-১৯১৯) প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বার বার খসড়া পরিকল্পনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার বোর্ডের নিকট হস্তান্তরের বিরোধিতা করলে শিক্ষাবোর্ড গঠন কাজ স্থগিত থাকে। এছাড়া, বোর্ডের আইন-প্রণয়ন, গঠন-প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যেও মতভেদ ছিল। যার ফলে ১৯২০ সালের পর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাংলা সরকার অন্তত ৬ বার শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে এ বিষয়ে ব্যর্থ হন। [Indian statutory Commission, Vol - VIII, pp. 46-47, Bengal Education Bill, 1944, p. I.]

ফজলুল হক নানা বিতর্কের আশঙ্কায় ১৯৩৭ সালে প্রথমে গোপনে মাধ্যমিক শিক্ষার খসড়া বিল তৈরি করে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আসাম সরকারের পরামর্শ চেয়ে পাঠান। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক একটি নিযুক্ত কমিটি সরকারের খসড়া বিল পর্যালোচনা করে নিজেদের মতামত সম্বলিত একটি রিপোর্ট সরকারের নিকট প্রেরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির এই রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন করার সুপারিশ করলেও হঠাৎ করে শিক্ষা বোর্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজী হয়নি। তারা বোর্ডকে সিনেটের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুপারিশ করে এবং শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকার বিরোধিতা করে। সরকারের প্রস্তাবে বোর্ডে ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন মুসলিম সদস্য নিযুক্তির প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। [Report of the Commission on the Draft Secondary Education, 1937, pp. 3-6.]

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তৈরির প্রস্তুতি সম্পর্কে ফজলুল হক গোপনীয়তা বজায় রাখলেও কয়েকটি পত্রিকায় খসড়া বিলটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে, এ সময় মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৭ সালের ২৬ নভেম্বর 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হয় যে, এর ফলে একদিন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি হবে। 'আনন্দবাজার' বলে যে, এ বিল একশ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবে। ঐ পত্রিকায় আরও বলা হয়,

২৩. আবদুর রহমান/যতটুকু মনে পড়ে ‖ [রহমান পাবলিকেশন্স - নভেম্বর, ১৯৭২। পৃ. ১৬৫-১৬৬/২২৫-২২৭]

বোর্ডের মোট ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন থাকবে মুসলমান যা সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। এ জাতীয় প্রশ্ন তুলে হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার জন্যও গভর্ণরকে অনুরোধ জানানো হয়। [সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, এ. কে. ফজলুল হক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০২]

ফজলুল হক পত্র-পত্রিকায় এসব সমালোচনার জবাবে বলেন যে, ১৮ বছরের পূর্বে স্যার আশুতোষ মুখার্জির মতো সদস্য বিশিষ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার জোরালো সুপারিশ করেছিল। ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত বাংলায় একটি স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন সম্ভব হয় নি। তার মতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এবং স্কুল-কলেজের মান নির্ণয়ের ব্যাপারে অহেতুক কর্তৃত্ব স্থাপন করছে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফজলুল হক বলেন যে, বর্ণহিন্দুগণ মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ, যারা শুদ্রদের ছাত্রাবাসে আসন দেন না, তারাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব করছেন এবং তিনি তাদের সাম্প্রদায়িক বলে সমালোচনা করেন। বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫২% মুসলমান ও ৩০% তফসিলির পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে কোনো হাত নেই। তার মতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠণকরা উচিত। [সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, এ. কে. ফজলুল হক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০২]

ফজলুল হক হিন্দু সমাজের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে তার নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার খসড়া বিল প্রণয়নে কমিটিতে আরও কয়েকজন নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য সদস্য মনোনীত করেন। অতঃপর ১৯৪০ সালের মাঝামাঝিতে আইন পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রণীত খসড়া বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় হিন্দু সদস্যগণ এই বিলকে হিন্দু বিরোধী, শিক্ষা-কৃষ্টি ধ্বংসকারী, প্রগতি বিরোধী প্রভৃতি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত করলে তা বাস্তবায়িত হয় নি। [সাময়িকী : মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, সওগাত, আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃ. ১০৩৮]

পরবর্তীকালেও হিন্দু সমাজের একাংশ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে হাজরা পার্কে স্যার পি. সি. রায়ের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছিলেন। ১৯৪০ সালের ২১ ডিসেম্বর কলকাতার আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী'তে শিক্ষিত হিন্দু বক্তাগণ আলোচনা সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের সমালোচনা করেন। [Muhammad Sanaullah, A. K. Fazlul Huq : Portrait of a leader, 1995, pp. 224-225 & A. S. M. Abdur Rab, A. K. Fazlul Huq, 1967, pp. 92-94]

শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের একাংশের আপত্তির মূল কারণ ছিল, যেহেতু মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে সেহেতু প্রস্তাবিত শিক্ষা বোর্ডেও মুসলিম সদস্য কম ও হিন্দু সদস্য বেশি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে, তাদের আশংকা ছিল এ আইন পাশ হলে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে এগিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় তারা অগ্রবর্তী হয়েছে। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব হারাবে। সর্বোপরি, ঐ বিল আইনে পরিণত হলে হিন্দুদের শিক্ষা-সামাজিকতায় একচেটিয়া অধিকার হ্রাস পাবে এবং মুসলমানরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে সর্বক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করবে। [Muhammad Sanaullah, A. K. Fazlul Huq : Portrait of a leader, 1995, pp. 225. 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল : আপত্তির মূল কারণ,' সওগাত, আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃ. ১০৩৮]

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ, ১৯৪১ সালে হক মন্ত্রিসভার পতন এবং পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের মধ্যে উক্ত বিল আর আইনে পরিণত হয়নি।"[২৪]

দুই

"...সেকালে হিন্দু শিক্ষক মহলে বদ্ধমূল ধারণা ছিল মুসলমান ছাত্রেরা বিজ্ঞানে ও অংকে কাঁচা। কাজেই তাদের কেউ আমাদের বিজ্ঞান পড়ায় উৎসাহ দিতেন না। নুতন বড়ো শহরে গিয়ে স্থিতিশীল ও পড়াশুনায় মনোযোগী হতে আমার কিছুটা সময় কেটে যায়। কাজেই তৃতীয় বর্ষ শ্রেণীর প্রথম দিকে আমি পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলাম। হঠাৎ প্রশান্ত মহালনবিশের মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হলো। তার ধারণা হলো আমি বোধ হয় অনার্সের পড়াশুনা কুলিয়ে উঠতে পারব না। একদিন আমার ডাক পড়ল মহালনবিশের খাস কামরায়। দুরুদুরু বুকে সেখানে হাজিরা দিলাম। অধ্যাপক আমাকে অনার্স ছেড়ে দিতে বললেন। আমি মনে মনে চটে গেলাম। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে বললাম, 'আমি সুদূর সিলেট থেকে কলকাতায় এসেছি অনার্স পড়তে। পাসকোর্সে পড়ার জন্য আমার এতদূরে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমার পিতাও পাসকোর্সের জন্য এত খরচপত্র করতে রাজী হতেন না। যদি অন্য কোন বিষয়ে - অংকে বা রসায়নে - অনার্সে সিট পাই তবে পদার্থবিদ্যা ছেড়ে দিতে আমি রাজী আছি।' মহালনবিশ বললেন, 'তা হয় না। এখন দেরী হয়ে গেছে। পদার্থবিদ্যায় অনার্স ছাড়লে তোমাকে পাস কোর্সই পড়তে হবে।' আমি বললাম, 'অনার্স পাই আর নাই পাই আমাকে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স পড়তে হবে।'

আজ মুসলমান ছাত্রেরা যে রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা দেখে আমাদের হিংসে হয়। আমার বিশ্বাস মহালনবিশ শুধু মুসলমান বলেই ধারণা করেন আমি অনার্স পাস করতে পারব না। তিনি আমার পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই করেননি। অনুসন্ধান করলে জানতে পারতেন আমি পদার্থ বিদ্যায় শতকরা আশীর অধিক নম্বর পেয়েছিলাম। কাজেই আমার পক্ষে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নেওয়া দূরাকাঙ্খা ছিল না। অবশ্য অংকে ও রসায়নেও আমি লেটার পেয়েছিলাম।"[২৫]

তিন

"...নিঃসন্দেহে Scott একজন বড়ো লেখক এবং ইংরেজি শিখতে হলে ভারতে তো বটেই অন্যত্রও Scott পাঠ প্রায় অবর্জনীয়। কিন্তু দূর্ভাগ্য, প্রাচ্য জগতের প্রতি এবং প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় পবিত্র পয়গম্বরের প্রতি কটাক্ষ ও নিন্দাপূর্ণ The Talisman পুস্তকটি ছাড়াও Scott-এর বহু পুস্তক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেগুলো থেকে কোন একটি গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়নি। এ কাজ কি অসম্ভব ছিল? এশিয়ার যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম যুব সম্প্রদায় যে কি তীব্র মনোবেদনার সাথে এ গ্রন্থ পাঠ করবে তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। আপন পুত্র প্রতিদিন এ পুস্তক পাঠে বাধ্য দেখে মুসলমান অভিভাবক যদি জাতীয় মর্যাদা এবং ধর্মীয় নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ওঠে তবে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। যে শিক্ষা বিভাগ তার ধর্মবিশ্বাসকে চরম ঔদাস্যে অপমানিত না করলেও অত্যন্ত অবহেলায় অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার জ্ঞান করে তার উপর মুসলিম সমাজের কতটুকু আস্থা থাকতে পারে?

আমি বিশ্বাস করি মহামান্য বড়ো লাট আমার এসব উক্তিকে ভাবাবেগ-প্রসূত অভিযোগ বলে গণ্য করবেন না। আমি তাকে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে The Talisman পুস্তকের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগকারী আমি নই। বহু মুসলমান অভিভাবকের সকরুণ অভিযোগ আমার কাছে আসার পর আমি The Talisman পুস্তকটি পাঠ করি।

---

[২৪]. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম/ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা : সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)। [বাংলা একাডেমী - জুন, ২০০৮। পৃ. ২৫৩-২৫৫]

[২৫]. সৈয়দ মুর্তজা আলী/আমাদের কালের কথা। [বইঘর - নভেম্বর, ১৯৬৮। পৃ. ১২৬-১২৭]

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পুস্তক পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তাদের অভিমতের সঙ্গে আমি একমত। পুস্তকে ব্যবহৃত দুষ্ট অংশগুলোর উদ্ধৃতি দিতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। এতৎসঙ্গে পুস্তকটির একটি কপি প্রেরণ করা হলো - তার মধ্যে কিছু অংশ চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আমার সমাজের লোকদের মন রুজু করার ব্যাপারে আমি বিগত পঁচিশ বৎসর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছি এবং আমার এ চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফলও হয়নি। আমি তার বরাত দিয়ে মহামান্য বড়ো লাটকে মুসলমান সমাজের ক্ষোভের এই যথার্থ কারণটি দূর করার জন্য অনুরোধ করছি। জানি এজন্য হয়ত আমি পাশ্চাত্য মণীষীদের চোখে উপহাস্যাস্পদ ব্যক্তিরূপে গণ্য হবো - সেই ঝুঁকি নিয়েও আমি এ অনুরোধ করছি। পাশ্চাত্য সাহিত্য এমনিতেই প্রাচ্যের প্রতি মোহনাশক এবং জাতীয়তাবোধ উৎপাটক। আরো অনেক কিছু তার মধ্যে আছে। সুতরাং ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা কেন? পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের এই যদি নীতি ও নমুনা হয় তাহলে তা মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়ার পরিবর্তে আত্মসম্মানজ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সন্দেহের চোখেই পরিদৃষ্ট হবে।

যদি এমন হতো যে কিছুটা আঘাত না দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিস্তার করা আদৌ সম্ভব নয় - যেমন যদি নির্বিবাদী ইংরেজি সাহিত্য আদৌ পাওয়া না যেতো, তবে এ ধরণের কাজের পক্ষে হয়ত কিছু বলার থাকতো। কিন্তু মুসলিম সমাজের কপাল ভালো, ইংরেজি সাহিত্য এত ব্যাপক ও ঐশ্বর্যশালী যে, কারো মনে কোন আঘাত না দিয়েও উৎকৃষ্ট পাঠ্য-তালিকা নির্বাচন করা সম্ভব।"–নওয়াব আবদুল লতীফ খান, সি.আই.ই[২৮]

চার

"...ধারাপাতের প্রথম পাঠ দশকিয়া। এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো শিশুরা যেন সহজে মনে রাখতে পারে এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি সংখ্যার সাথে বোল ও সুর সংযোজন করা হয়েছে। যেমন, এক এ চন্দ্র, দুই এ পক্ষ ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পক্ষ থেকে বোলগুলো পরিবর্তনের প্রস্তাব উঠেছে। যেমন, এক এ আল্লাহ, চার এ কেতাব, পাঁচ এ নামাজ ইত্যাদি। হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে বুদ্ধিজীবীরা। তাদের কথা, প্রচলিত বোল অসাম্প্রদায়িক, তা বদলিয়ে সাম্প্রদায়িক বোল সংযোজনের চেষ্টা চলছে।

বলা হচ্ছে, এখানে তো কিছু হিন্দু ছেলে-মেয়েও রয়েছে। তারা আল্লাহ বলবে কেমন করে? তারা আরও বলছে, আমাদের মতো পশ্চিম বঙ্গও স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তারা এই বোল সংশোধন করেনি। আমরা করছি কোন দুঃখে?

নতুন বোলসমূহের উপযোগিতা বিচার্য হতে পারে। কিন্তু, উদ্যোগটি স্বাধীন চিন্তার অনুশীলন প্রসূত, নির্মাণধর্মী ও অনবদ্য, সেইজন্য প্রশংসনীয়। লক্ষ্য, নির্বিচার অনুকরণ ও আনুগত্যের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে স্বকীয়তা সন্ধান ও সংস্থাপন। কাজেই প্রকৃত প্রস্তাবে কুশিক্ষিত সম্প্রদায়টি মুসলিম জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, মূর্ত প্রতিবন্ধক।

প্রচলিত বোলে এক, দুই, ছয়, নয় ও দশ এর বোল প্রাকৃতিক, সেই অর্থে অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু তিন, চার, পাঁচ ও আট এর বোলের অর্থ কি?

তিন এ ত্রিনেত্র, অর্থ, শিব। হিন্দুরা ত্রিনাথ বা তিন প্রধান দেবতায় বিশ্বাস করে, তাদের একজনের নাম শিব। এও বিশ্বাস করে যে শিবের ত্রিনেত্র বা তিনটি চোখ রয়েছে। সেই থেকে শিবের অপর নাম হয়েছে ত্রিনেত্র।

চার এ বেদ। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ চার খন্ডে বিভক্ত। এই চার বেদ হলো, ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব বেদ। তাই চার এ বেদ।

---

২৮. মুসলিম বাঙ্গলা : আমার যুগে/নওয়াব বাহাদুর মৌলভী আবদুল লতীফ খান (অনুবাদ : আবু জাফর শামসুদ্দীন/মূল : A Short Account of My Public Life)। [বাংলা একাডেমী - এপ্রিল, ১৯৬৮। পৃ. ৯৮-১০০]

পাঁচ এ পঞ্চবাণ অথবা পঞ্চানন। এই দুই বোলই প্রচলিত রয়েছে। পঞ্চবাণ হলো হিন্দুদের কাম দেবতা একটি নাম। বাণ অর্থ তীর, অস্ত্র, মন্ত্র বা কৌশল। কামনার অধিদেবতা মদন বা কন্দর্প পাঁচটি বাণ বা অস্ত্র ব্যবহার করে বলে তার অন্য নাম হয়েছে পঞ্চবাণ। বাণগুলো হচ্ছে সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, মোহন, তপন বা গরমানো, স্তম্ভন বা নিষ্ক্রিয় করণ অর্থাৎ আপত্তি-অসহযোগিতা করার ক্ষমতা হরণ। পঞ্চানন, ঐ শিবের অন্য নাম। হিন্দুদের বিশ্বাস শিব দেবতার পঞ্চ আনন বা পাঁচ মুখ রয়েছে। সেখান থেকেই তার অন্য নাম পঞ্চানন।

আট এ বসু। অর্থ, আটজন বসু দেবতা। গঙ্গা দেবীর আট পুত্রই আটজন বসু দেবতা। তাদের নাম ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভব।

এই বোলগুলো তাহলে কি অর্থে অসাম্প্রদায়িক? মাত্র একটি অর্থে, অন্য কোন অর্থ নেই। তাহলো এই বোলগুলো যেহেতু শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বোল, পৌত্তলিক পরিভাষা থেকে গৃহীত, সেহেতু এগুলো অসাম্প্রদায়িক। পক্ষান্তরে যাহা কিছু অহিন্দু তাহাই সাম্প্রদায়িক।

যারা সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িকভেদ উত্থাপন করছে তারা কিন্তু এদেশেরই মানুষ, মুসলমান সম্প্রদায়ের ছোট্ট একটি অংশ। তারা নিজেদেরকে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলে দাবি করে এবং সেই কারণে মুসলমান সমাজ থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে নিয়েছে।

...প্রচলিত বোল আসলে সংখ্যা পরিচিতির ছলে পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের দেব-বন্দনা। শিক্ষা গ্রহণ করা মহৎ কাজ, শুভ কাজ, কাজেই পাঠ শুরু হওয়া উচিৎ ধর্মীয় মন্ত্র পাঠ দিয়ে। হিন্দুরা যথোচিত কাজই করেছে। শিশু শিক্ষার প্রথম ধাপে ছোটো ছোটো শিশুরা দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে এই বোলগুলোর কোরাস গাইতে থাকে। খৃস্টান শাসিত, হিন্দু প্রভাবিত, পরাধীন যুগে না বুঝে, নিরুপায় হয়ে মুসলমান শিশুরাও এতদিন দেব-বন্দনা দিয়ে দিনের পাঠ শুরু করেছে। যে কয়জন বুঝতেন তাদের হৃদয়ে রক্ত ঝরেছে। রক্তের বিনিময়েই পৌত্তলিকতার জাল ছিন্ন হয়েছে। মুসলমানদের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এখনও কি আমাদের শিশুরা দেব-বন্দনা দিয়ে দিনের পাঠ শুরু করবে? কি মতলব বুদ্ধিজীবীদের? এমনতর ধৃষ্টতা! এত বড়ো দুঃসাহস!

এরা যুক্তি দেখাচ্ছে, পশ্চিম বঙ্গওতো স্বাধীন হয়েছে, তারা বোলগুলো বদলাচ্ছে না কেন?

মূর্খ জাহেলদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া ভালো কাজ নয়। কিন্তু মূর্খরা মুখর। সাহিত্য, প্রচার মাধ্যম তাদের অস্ত্র। বিপরীতে সাধারণ মানুষ মুখ-চোরা। অশিক্ষিত ও গরিব বিধায় সাহিত্য, প্রচার মাধ্যমে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। বেকুবদের কথা-বার্তা তাদের পছন্দ হচ্ছে না, চিন্তা-চেতনায় হোঁচট খাচ্ছে, তবু জবাব দিতে পারছে না।

এই বোলগুলো কাদের স্বাধীনতা ধারণ করছে? কাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ বহন করছে? এগুলো কি কোন সম্প্রদায় তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে? নাকি নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে ভেবে চিন্তে তৈরি করে নিয়েছে? তারা বদলাবে কেন? কোন দুঃখে, কার স্বার্থে বদলাবে? নিজেরাই কি নিজেদের শিকড় উপড়িয়ে ফেলবে? প্রশ্নগুলো এই কশিক্ষিত বুদ্ধিমানদের কাছে। তাদের মগজে ধরে কি না, মনে-মনে কোন উত্তর আসে কি না। পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা বদলাবে না কেন? না বদলালে তারা স্বাধীন হতে পারলো কই? স্বাধীনতা টিকবে কেমন করে? তারা বাঁচবে কেমন করে? এগুলো তারা নিজেদের জন্যে নিজেরা নির্মাণ করেনি। দলন-পীড়ন উদ্ভূত অজ্ঞতা-অসহায়ত্বের সুযোগে বৈরী সম্প্রদায় তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছে। শুধু আর্থ-সামাজিক বৈরীতা নয়, ধর্মীয় বৈরীতা। এমন বৈরীতা যা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের শিকড় কেটে ফেলছে, বিশ্বজনীন, যৌক্তিক একত্ববাদ ছাড়িয়ে সংকীর্ণ, অমানবিক পৌত্তলিকতার দিকে হিঁচড়িয়ে নিচ্ছে।

ইংল্যান্ড থেকে আগত খৃস্টানদের ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের পূর্বাঞ্চলে দু'শ বছর স্থায়ী ছিল। ঐতিহাসিক কারণে খৃস্টান রাজারা হিন্দু লালন ও মুসলমান দলন নীতি গ্রহণ করে। হিন্দুদের প্রত্যক্ষ মদদ ও সহযোগিতায় মুসলমানদের পরাজিত করে তারা খৃস্টান উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। কাজেই ইংরেজদের চোখে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল শত্রু পক্ষ আর হিন্দু সম্প্রদায় ছিল মিত্র পক্ষ। ঔপনিবেশিক শাসনের নিরাপত্তার প্রয়োজনেও দুই শত্রু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং মিত্র সম্প্রদায়কে শত্রু সম্প্রদায়ের উপর লেলিয়ে দেওয়া একটি রাজনৈতিক কৌশল। এইভাবে ইউরোপীয় খৃস্টবাদের নাথে রাজকীয় সুবিধাবাদ ও কূটকৌশল একাকার হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বগ্রাসী আগ্রাসী শাসন-আচরণ রীতি যা হিন্দু-মুসলমান আন্ত-সম্প্রদায় সম্পর্কের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। শুরু হয় মুসলমান নিধন, দলন, নিপীড়ন। উপমহাদেশ প্রত্যক্ষ করে ইতিহাসের জঘণ্যতম মানবিক বিপর্যয়। এক সময়ের সর্বাপেক্ষা আলোকিত, সমৃদ্ধ শাসক সম্প্রদায় পর গৃহে দাস-দাসী, গৃহপালিত পশুর পর্যায়ে নেমে যায়।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য বুঝতে হলে ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট অবশ্যই বুঝতে হবে। প্রথম দৃষ্টিতে এদেশীয় জনসাধারণ, হিন্দু-মুসলমান, বৈদেশিক রাজার অধীনে একই রকম প্রজা ছিল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্নতর। এইজন্য হিন্দু প্রধান ভারতের স্বাধীনতা ও মুসলমান প্রধান পাকিস্তানের স্বাধীনতা এক নয়, ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতের স্বাধীনতা যেখানে একমাত্রিক, বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তি, পাকিস্তানের স্বাধীনতা সেখানে দ্বিমাত্রিক, জোড়া কাঁটার পীড়ন থেকে মুক্তি। প্রথম কাঁটা বৈদেশিক শাসন, দ্বিতীয় কাঁটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈরী সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যের পীড়ন। উপমহাদেশের এই সম্প্রদায়গত বিষম পরিবেশ, উৎকট সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ যাদের জ্ঞানে-অনুভবে, স্মরণে-মননে অনুপস্থিত তাদের কাছে পাকিস্তানের স্বাধীনতা অযৌক্তিক, অর্থহীন, সাম্প্রদায়িক সৃষ্টি বলে ভ্রম হবে।

মুসলমান শাসনামলে শুধুমাত্র পূর্বাঞ্চলের নবাবী এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলমানেরাই ছিল বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তখন সরকারি ভাষা ছিল ফারসী। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অফিস-আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা, কর্মচারী, উকিল, মোক্তার, হাকিম, হেকিম প্রভৃতি জনবল সরবরাহ দিত। ইংরেজ আমলে ফারসী পরিত্যক্ত হয়। তার জায়গায় ইংরেজী হয় সরকারি ভাষা। কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, উকিল-হাকিম, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান, অযোগ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সবাই চাকরি হারায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর থেকে সব রকম সরকারি সমর্থন প্রত্যাহার করা হয় এবং সেগুলো আর্থিক সংকটে পড়ে। তদোপরি এই সব প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক নতুন চাহিদার বিপরীতে সঙ্গতিহীন, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, কর্মরত শিক্ষক, কর্মচারী বেকার হয়ে যায়। এদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান।

অন্যদিকে মুসলমান প্রজাদের বিপরীতে হিন্দুরা বৈদেশিক শাসনের দেশি সহযোগী, সামন্ত শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়। জিরৎ-সৈরৎ, ভূমি-স্বত্ব, হাট-বাজার, শহর-বন্দর চিরস্থায়ীভাবে হিন্দুদের দখলে চলে যায়। মুসলমানেরা ভূমি-স্বত্ব হারিয়ে ঘর-বাড়ি থেকে উৎপাটিত হয়।

এইভাবে পঞ্চাশ-ষাট বছরের ব্যবধানে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপট পুরোপুরি উল্টে যায়।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে ইংরেজরা নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। নমুনা হিসাবে অল্প কিছু ইংরেজী স্কুল সরকারই প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজী শিক্ষা ইসলাম বিরোধী, হারাম জ্ঞান করে মুসলমানেরা এই শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান নেয়। হিন্দুরা তাৎক্ষণিক অভ্যর্থনা জানায় এবং বিপুলভাবে ইংরেজী শিক্ষায় ঝুঁকে পড়ে। নব উত্থিত হিন্দু জমিদার-জোতদার শ্রেণীর উৎসাহ ও উদার অর্থায়ন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা একক ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে পুঞ্জিভূত হয়। এইসব স্কুলে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবাই ছিল হিন্দু।

শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উপর এমন একচেটিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা হি সম্প্রদায়কে বেপরোয়া করে তোলে। শিক্ষাকে তারা পূর্ণভাবে ব্যবহার করে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জী হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশের কাজে। নতুন ধারার পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন না বা ধারাবাহিকতা রক্ষার কোন বন্ধন তাদের সামনে ছিলনা। কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতাও ছিলনা। এক পরিষ্কার স্লেটের উপর কাজ করার সুযোগ পায় তারা। হাতে-খড়ি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পা যাবতীয় পাঠসামগ্রী ইচ্ছেমত হিন্দু পুরাণ ও পৌত্তলিকতার ছন্দে- রসে আকর্ষণীয়, শ্রুতিমধুর ক সাজিয়ে দেওয়া হয়। দশকিয়ার বোলগুলো এমনি করেই নির্মিত হয়েছে।

তাহলে আর কি পরিবর্তন করবে পশ্চিমবঙ্গ? খৃস্টান প্রভাবটুকু মুছে ফেলা ছাড়া? তারাতো রাজানুকূল সুযোগে নিজেদের ঘর গুছিয়েই রেখেছে। অন্য দিকে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাস, ভাষা, সাহি সংস্কৃতি, আইন, ইতিহাসসহ বন্দি হয়ে পড়েছিল পরগৃহে। স্বাধীনতা আজ যখন সুযোগ এনে দিয়ে সগৃহে প্রত্যাবর্তনের, ঘর গুছানো, ঘর সাজানোর তখনই এই কশিক্ষিত সম্প্রদায় হৈ চৈ শুরু করে দিয়ে পদে পদে বাধা-বিঘ্ন প্রতিকূলতা গড়ে তুলছে। সেই অভ্যাসগত দাস্যতা, দেখি, বাবু কি বলে। এ স্বাধীনতার শত্রু, নব্য মীরজাফর।

বলে কি, এখানেও তো কিছু হিন্দু আছে, তারা পাঠ্য পুস্তকের আল্লাহ-রাসুল পড়বে কেমন করে? আহা পিরীতি! অবিভক্ত বঙ্গদেশে ও আসামে মুসলমানেরা 'কিছু' নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তারা এতকাল পা পুস্তকের ছত্রে ছত্রে ঈশ্বর-ভগবান, শিব-দূর্গা, রাম-সীতা, পূজা-প্রতীমা পড়তে বাধ্য হয়েছিল। তখনত কারও কোন পিরীতি দেখা যায় নি। ঐ অবস্থার জন্য কোন লজ্জা, শরম, দুঃখ আজও কোথাও নেই পাকিস্তান হয়েছে তো আল্লাহকে আল্লাহ বলতে পারার জন্য। এখানেও মুসলমানেরা ওদের দাস হয় থাকবে না কি? বরং এটাই স্বাভাবিক যে সংখ্যায় "কিছুরা" সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সা সম্পৃক্ত অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

এই কশিক্ষিতদের একটা অংশ পশ্চিম বঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা মোহাজের। পালিয়ে এসেছে প্রাণে ভয়ে, ধুতি-শাড়ির ছদ্মবেশ ধরে। হলে কি? এরা অস্তিত্ব অর্জন করেছে ওদের ধুতির ছায়ায়। এদে পান্ডিত্য ওদের বিশ্বাস-সংস্কৃতি আশ্রিতা। সেইজন্য এখানের সদ্য-স্বাধীন মানুষগুলো এদের চোখে পরাধীন, আর নিজেরা স্বাধীন। হবেইতো! নাড়ীর টান পশ্চিম বঙ্গে। বাংলার খেয়ে-পরে, বাংলার নিরাপত্তায় আয়েসে জীবন যাপন করছে, আর দালালী করছে বঙ্গে। এরা বঙ্গের অকৃত্রিম বন্ধু সেজে বসেছে। এরা স্বাধীনতার চরম শত্রু।

মোহাজের বেশে ঢুকেছে আরেকটি দল, বুধিজীবী নয়, কমরেড। প্রাণের ভয়ে নয়, ঢুকেছে প্রাণের বিনিময়ে মিশন বাস্তবায়নের নির্দেশ পেয়ে। এসেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে শক্ত আস্তানা গেড়ে বসেছে। বাংলাভাষী, ছাত্র-ছাত্রী, ধর্মত্যাগী, তবে মুসলমানী নামের সুবিধায় মোহাজের ছদ্মবেশ। সদ্য-স্বাধীন এই দেশটাকে অস্থিতিশীল রাখা, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা দানা বাঁধতে না-দেয়া এই মিশনের লক্ষ্য। এরা স্বাধীনতার শক্ত সংগঠিত শত্রু।"[২৭]

পাঁচ

"...আমি ১৯০৪ খৃস্টাব্দে রাজশাহীতে (রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার পদে) যোগদান করি। সেখানে নাটোর মহারাজার পক্ষ হইতে একটি হিন্দু ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মোছলমান ছাত্রদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমি রাজশাহী জেলার স্থানে স্থানে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষার প্রস্তাব করি। কত দিবা, কত রাত্রি বৃক্ষতলে একাকী যাপন করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইল।

---

২৭. সাইফুল ইসলাম সফিল/আনচোখ। [লেখক - জুন, ২০০৮। পৃ. ২১৬-২২২]

ইত:মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন ছোটলাট Sir Bamfylde Fuller বাহাদুর রাজশাহী পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। আমি মোছলেম নেতৃগণসহ তাহার অভ্যর্থনার জন্য ব্রতী হই, কিন্তু হিন্দু সমাজ আমাদের প্রত্যেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে থাকে। রাজশাহীর কোনো প্রেস অভিনন্দনপত্র ছাপাইতে স্বীকৃত হইল না। আমাকে সেজন্য গোপনে কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া উহা ছাপিয়া আনিতে হইল। অভ্যর্থনার জন্য বিরাট গেট প্রস্তুত হইল, রাত্রিকালে বিরোধী দল আসিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। উহা ভস্মীভূত হইল। লাট বাহাদুর সবই অবগত হইলেন ও স্বীয় লঞ্চে সন্ধ্যার পর এক সভা আহ্বান করিবার আয়োজন করিলেন। স্থানীয় কলেজ পরিদর্শনান্তে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। আমি তাহাকে স্কুলটি দেখাইয়া মোছলেম হোস্টেলের অভাব জ্ঞাপন করিলাম। প্রিন্সিপ্যাল আপত্তি করিলেন যে রাজশাহীতে অনেক সময় ভূমিকম্প অনুভূত হয় এবং বহু ব্যয়-সাপেক্ষ হোস্টেল নির্মাণ অসমীচীন হইবে। আমি তদুত্তরে বলিলাম যে, স্থানীয় কলেজ বহু দিবস যাবৎ ইষ্টক নির্মিত দ্বিতল গৃহে অবস্থিত, এযাবৎ তাহার উপর কোনো প্রকার ভূমিকম্পের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। আমরা ঐরূপ একটি মোছলেম ছাত্রাবাস পাইলেই তৃপ্ত হইব, তদপেক্ষা অধিকতর ব্যয়-সাপেক্ষ প্রাসাদের আমরা প্রয়াসী নহি। লাট বাহাদুর এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিলেন ও স্বতন্ত্র একটি হোস্টেলের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপর আমাদিগকে তাহার লঞ্চেও আহ্বান করিলেন।

মাতাদীন সুকুল ছিলেন বিভাগীয় Executive Engineer, তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছিল একটি প্লান তৈরী করিবার। তিনি প্লান লইয়া লঞ্চে আসিলেন। লাট বাহাদুর তাহা অমঞ্জুর করিয়া তখনই সর্ব্বসমক্ষে স্বয়ং একটি প্লান টানিয়া দেখাইলেন এবং তদনুসারে একটি এস্টিমেট প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। ফলে ৭৫০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। দ্বিতল বিশিষ্ট হোস্টেল প্রস্তুত হইল ও লাট সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য উহা 'ফুলার হোস্টেল' নামে অভিহিত হইল। বর্ত্তমান 'ফুলার হোস্টেল' সর্ব্বজন-বিদিত ও রাজশাহীর একটি গৌরব।

...যাহা হউক, এখানকার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের) সভ্য নির্বাচিত হইয়া বহু হিতকর কার্য্য সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম।

তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা হইত। অনেকেরই ধারণা ছিল, হিন্দু ও মোছলেম পরীক্ষার্থীর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোন পরীক্ষায় মোছলেম ছাত্র উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোছলেম পরীক্ষার্থী ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করিতে পারে, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ সহজে প্রথম বিভাগেও স্থান পায় না। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেন। যাহা হউক, ভারতে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমি সকল স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিলাম। প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইল, উত্তরের খাতায় কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি নাই। কেবল পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়। এই লইয়া আমি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলাম এবং কতিপয় নিরপেক্ষ মেম্বরের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইলাম। বিরোধী পক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম না থাকিলে শুধু ক্রমিক নম্বর দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। ইহাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমরা তদুত্তরে বলিলাম যে, বর্ত্তমান অনার্স, এম.এ পরীক্ষার ছাত্র সংখ্যা খুব কম। সুতরাং পরীক্ষামূলকভাবে অন্তত: এই পরীক্ষায় নামের পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর দেওয়ার বিধি প্রবর্ত্তন করা হউক। বহু বাক বিতন্ডার পর উহা গৃহীত হইল। ফলে কোন অসুবিধা দৃষ্ট হইল না। বরং মোছলেম পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেহ কেহ উচ্চস্থান অধিকার করিল।

তৎপর এই অনুকরণে আই.এ ও বি.এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর নাম লেখা রহিত করা গেল কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উক্ত বিধান অবলম্বন করিতে অধিকাংশ মেম্বর অসম্মত হইলেন। তাহাদের উক্তি, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অগণিত ছাত্র, সুতরাং নাম উঠাইয়া দিলে কেবল ক্রমিক নম্বর দ্বারা পরীক্ষার্থীকে নির্ভুলভাবে চিনিবার উপায় থাকিবে না। ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হইবে। দুই বা ততোধিক রোল নম্বর এর সামঞ্জস্য দেখিলে পরীক্ষক বা Tabulators ভুল করিয়া ফেলিবেন, কৃতকার্য্য ছাত্র পাশ না হইয়া হয়ত অকৃতকার্য্য ছাত্রের নাম পাশের লিস্টে উঠিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন আমরা প্রস্তাব করিলাম, যদি আই.এ ও বি.এ পরীক্ষায় ভুল দৃষ্ট না হয়, তবে অতঃপর পরীক্ষায় একই প্রথা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই দীর্ঘকাল মধ্যে পরীক্ষায় উক্ত প্রথা অবলম্বিত হয় নাই। বহুকষ্টে অন্যান্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর নাম উঠাইয়া দিবা করা গিয়াছিল, কিন্তু আমার পরবর্ত্তীগণ এ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। কয়েকবার মোছলেম ভাইস-চ্যান্সেলর Syndicate-এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বড়ো আবশ্যক বিষয়টি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

...ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থিত হইলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয়, প বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। উহার মধ্যে আমি একজন মেম্বর ছিলাম এব সাধ্য উহার আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছিলাম।

কলিকাতার মোছলেম ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। উক্ত সমর্থন করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। হিন্দু সদস্যগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন আমি বলিলাম - হিন্দুদের জন্য সংস্কৃতি কলেজের যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে মোছলেম ব আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। ব্যয় গভর্ণমেন্ট বহন করিবেন, সুতরাং আপত্তির কারণ অগ্রাহ্য। মোছলেম কলেজে আরবী, পারসী ও উর্দু শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইছলামিক ঐতিহ্য, ইছলামিক বাধ্যতামূলক নামাজ ও ইছলামিক পারিপার্শ্বিকতা গঠন এই কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য হইে প্রস্তাবে কেহ আপত্তি করিতে পারেন নাই। তবে অন্যপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ না হইবে ততদিন হিন্দু-ছাত্র ইচ্ছা করিলে মোছলেম কলেজে ভর্ পারিবে। ইহাতে আমরা সম্মতি জানাইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ফলে কিছু দিনের মধ্যে স্বতন্ত্র ই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা মদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল Mr. Harley এই কলেজের প্রিন্সিপ্যা হইলেন। কলেজ খুলিতেই প্রচুর মোছলেম ছাত্রের সমাবেশ হয়, সুতরাং হিন্দু-ছাত্রের জন্য কোনে ব্যবহার আবশ্যক হয় নাই।

...আমি সুযোগ বুঝিয়া স্বতন্ত্র মক্তব-পাঠ্য নির্ব্বাচন করিলাম ও মোছলেম ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য মোছলেম লেখকের প্রণীত পুস্তক প্রবর্ত্তনের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গভর্ণমেন্টের অনুমোদন মোছলেম স্কুলের জন্য মোছলেম শিক্ষক নিযুক্ত করিতে থাকিলাম ও মোছলেম লেখকের পুস্তক প নির্ধারিত করা হইল। হিন্দু লেখকগণ ইহাতে আপত্তি করিলেও গভর্ণমেন্ট সে আপত্তি শুনি কোমল-মতি মোছলেম ছাত্রের জন্য মোছলেম ভাবাপন্ন পুস্তকের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলাম। মোছলেম বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হইল ও প্রত্যেকের জন্য মোছলেম রচিত পুস্তকের প্রচলন হইল ফলে মখদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ও পরে ইছলামিয়া লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লা মোছলেম শিক্ষায় নতুন প্রেরণা আসিল, ধর্ম্মভাবের পুনরুদ্ধার হইল, হিন্দু মোছলেম শিক্ষার্থী অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল।"-খানবাহাদুর আহছানউল্লা/আমার জীবন-ধারা। [মখদুমী (কলিকাতা) - ১৯৪৬][২৮]

ছয়

"...জে এম সেন স্কুলে আমার ২ মাসের চাকরী শেষ হলো। অতঃপর যাই কোথা? অবশ্য বি যখন আছে প্রাইভেট হাইস্কুলে চাকরী পাওয়া যাবে, তাতে নিশ্চিত ছিলাম। শহরের মিউনি হাইস্কুলে একটি চাকরী হলে বেশ ভালো হয়। মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের চাকরী তখন লোভনী

---

২৮. তথ্যসূত্র : খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)/সম্পা. গোলাম মঈনউদ্দিন। [জয় পাবলিশার্স - ১৯৮৮। পৃ. ২৫-২৬/১০৫-১০৮]

চাকরী ও নিয়মিত বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে কোন মুসলমানের চাকরী হওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আমার স্ত্রীর জেঠতু ভাই আমানত খান যদিও ম্যানেজিং কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু চাকরীর ব্যাপারে তার কোন ভয়েস নেই। যেখানে হেড মৌলবী ছাড়া আর একজন মুসলমান আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক আছেন নাম হেদায়েৎ আলী মিয়া, বাড়ি আমাদের পূর্বদিকে মাদার্শা গ্রামে। শুনলাম সেখানে চাকরী খালি হলেও বাইরে তা প্রকাশ করা হয়না, চুপিসারে কোন হিন্দু প্রার্থী পেলে তাকে লওয়া হয়।

আমি দরখাস্ত করলাম এবং চাকরী যাতে হয় তার জন্য কুশিস করতে লাগলাম। কিছুতেই কিছু হলোনা। শেষমেশ ইন্সপেক্টার ফজলুর রহমান সাহেবের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলাম। ফজলুর রহমান সব ব্যাপার জেনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে রইলেন। তিনি রেগে মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের হেডমাস্টার হরিদয়াল নাগকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। হরিদয়াল নাগ ছিলেন গোঁয়ার গোবিন্দ, কিন্তু বড়ো সাহেবের ডাকে না এসে পারলেন না। কিন্তু আমার নামের কোন ব্যক্তির দরখাস্ত গ্রহণ করেছেন সেকথা স্বীকারই করলেন না। আপাতত: স্কুলে কোন শিক্ষকের পদ খালি নেই একথা বলে সাহেবের কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন।"[২৯]

সাত

"...এই সময়ে আমার পূর্ব বন্ধু তসদ্দুক আহমদ, কাজি ইমদাদুল হক (সাহিত্যিক), খবীরুদ্দীন আহমদ ও আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের সহিত আমার মেলা মেশার বিশেষ সুবিধা হয়। তসদ্দুক সাহেব ছিলেন কলিজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার। যে কোন মুসলমানের পক্ষে এই পদ বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের উপযুক্ততা খুব কমই স্বীকার করিত। তসদ্দুক সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, 'যে-দিন আমি কাজে যোগ দিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া স্কুলের দোতলাতে উঠি, ছাত্ররা আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে থাকে থাকে, 'চাচা আইছেরে, চাচা আইছে।' কিন্তু তিনি এমন সফলতার সহিত আপন কর্তব্য করেন যে, অচিরে ছাত্র শিক্ষক সকলেই তাহার কর্ম দক্ষতা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হন।"[৩০]

আট

"...(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে) মুসলমান অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল নগণ্য, বোধ হয় শতকরা দশজন। তাও আরবী, ফার্সী, ইসলামিক স্টাডিজ এদের নিয়ে। আরবীর হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন ডক্টর ফৃইক - জাতিতে জার্মান। এতদসত্ত্বেও কলকাতার কাগজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা ইউনিভার্সিটি' বলা হত। আমাদের শিক্ষকরা আমার জানামতে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করতেন না। তবে ফাঁক একটা ছিল। হিন্দুদের নিকট মুসলমানরা ছিল অনেকটা অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ। তাই হিন্দুদের মত মুসলমান ছেলেরা প্রফেসরদের কাছে বড়ো একটা যেত না, যেমন যেত হিন্দু ছেলেরা। অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষকরাও মুসলমান ছেলেরা খুব কাছাকাছি দাঁড়ালে ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে কাপড় ছেড়ে স্নান করে ঘরের ভিতর ঢুকতেন। এর ফলে হিন্দু শিক্ষক ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা দূরত্ব অনুভূত হত।"[৩১] - কামরুদ্দীন আহমদ/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন : তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতি

নয়

"...বাঙলার পার্লামেন্টারী রাজনীতি, মন্ত্রিসভা ও মুসলিম লীগ সংগঠনের উপর আলোকপাত করিতে যাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বাঙলার মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণী, বিশেষ করিয়া ছাত্র ও যুবকদের আন্দোলন সম্পর্কে এ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

---

২৯. ওহীদুল আলম/স্কুল কলেজে চৌত্রিশ বছর। [আলমবাগ প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪। পৃ. ১৯-২০]

৩০. খান বাহাদুর আলহাজ্জ আবদুর রহমান খাঁ/আমার জীবন। [প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী - আগস্ট, ১৯৬৪। পৃ. ১৩১-১৩২]

৩১. তথ্যসূত্র : স্মৃতিকথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/সম্পা. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। [মাওলা ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২। পৃ. ১১১-১১২]

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা বহু বৎসর উহার ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় নাই। হিন্দুরাই ব্রিটিশ সরকারের এই সন্তানটিকে সস্নেহ লালন-পালন করিয়াছে এবং বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের দেয় নানা ট্যাক্স এবং রাজস্বের টাকায় ইহাকে তাহাদেরই একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপ, আকার ও মর্যাদা দান করে। ইহাও অনস্বীকার্য যে, হিন্দুরা ইহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দানও করিয়াছে। পরবর্তীকালে মুসলমানরা যখন ইংরাজী শিক্ষা বর্জন নীতি ত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে উহাতে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন তাহারা দেখিতে পায় সেখানে তাহারা অনেকটা অস্পৃশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির দ্বার তাহাদের জন্য রুদ্ধ এবং পাঠ্য বিষয় সমূহ এমনভাবে নির্বাচিত যাহা তাহাদের আদর্শের পরিপন্থী।

১৯৩৬ সালে ইহার প্রতিকার দাবী জোরদার হইয়া উঠে। মুসলমানদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের দৃষ্টান্তসমূহ পত্র ও প্রবন্ধাকারে মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হইতে থাকিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমর্থনে আগাইয়া আসেন। কিন্তু অন্যায়লব্ধ অধিকার যত পুরাতনই হোক কিংবা উহার পশ্চাতে যত সাধনাই ব্যয়িত হইয়া থাক না কেন, উহার দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিলেই উহা আইনানুগ হইয়া উঠে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে তাহাই করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইহার পর পরই শ্রী এবং পদ্ম সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের বিরুদ্ধেও মুসলমান ছাত্র ও যুব সমাজ বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলে। শ্রী এবং পদ্ম এক যোগে হিন্দুদের বাগদেবী সরস্বতীকে বুঝায়। ইহাতে পৌত্তলিকতা রহিয়াছে বলিয়া মুসলমান ছাত্র ও যুব সমাজ উহা পরিবর্তনের জন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।

আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলনের দরুণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভয়ানক তিক্ত হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলিতে থাকেন, প্রয়োজন হইলে তাহারা সরকারি সাহায্য ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিবেন তবু জেদ ছাড়িবেন না। ক্রমবর্ধনশীল ঘাটতির প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকারও সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের পুন:পৌনিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়াছিলেন। এই ঘাটতি পূরণ করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না এবং মুসলমানরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি সাহায্য একেবারে বন্ধ এবং আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করে। অবশেষে মুসলমানদের দৃঢ়তা এবং দাবীর যৌক্তিকতার নিকট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকারে বাধ্য হন। ইহার ফলে প্রতীকে প্রয়োজনীয় রদবদল সাধিত হয়।"[৩২]

দশ

"...১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি মুসলিম নেতৃবৃন্দ পূর্ব থেকেই জানিয়ে আসছিলেন। কারণ হিন্দু প্রভাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মুসলমানের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ নানা অসুবিধাজনক ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো সংস্থা ছিল মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয় সূচনার পর থেকে সিন্ডিকেট সভায় খুব কম সংখ্যকই মুসলমান ছিল। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরির পর এই পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত একজন মুসলমানও সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচিত হতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘকাল স্বীকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে মুসলিম ফেলোর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ১৯১৭ সালেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১০ জন ফেলোর মধ্যে মাত্র ৬ জন ছিল মুসলিম। ঐ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে একজন কর্মচারীও মুসলমান ছিল না এবং শিক্ষকগণের মধ্যে ও মুসলিমের সংখ্যা ছিল অতি বিরল। ছাত্রাবাসের আবাসিক

৩২. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ/যুগ বিচিত্রা। [মাওলা ব্রাদার্স - আগস্ট, ১৯৬৭। পৃ. ৩৬৫-৩৬৬]

কিংবা প্রশাসনিক কমিটিতেও কোন মুসলিম সদস্য ছিলেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ ছাড়াও পাঠ্যসূচিতে হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব, মুসলিম ইতিহাস বিকৃতি, 'শ্রী-পদ্ম প্রতীক' প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে।

নবাব আব্দুল লতিফ সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈরী পাঠ্যক্রমের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড নর্থব্রুক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ., বি.এ., এম.এ.'র ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য কেলোসের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন। নবাব আব্দুল লতিফ এ কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে এফ.এ. ক্লাসে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত '৯৪ নম্বর স্পেকটেটরটি বাদ দিতে বলেন। কারণ এতে ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, এ ধরণের বই পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ধর্মভীরু মানুষের মনে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে যে, যারা দেশের শিক্ষা পরিচালনা করেন তারা সরকারের কোনো ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেন না। ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক তদন্ত করার জন্যে বিশিষ্ট ভারতীয়দের নিয়ে আরেকটি কমিটি গঠন করেন এবং আব্দুল লতিফকে উক্ত বিষয়ে লিখিত মতামত জানাবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুসারে ঐ বছরের ২৮ জুন তিনি তার মতামত পেশ করেন। এতে প্রথমেই তিনি অভিযোগ করেন যে, 'এফ.এ. ক্লাসের স্কটের The Talisman বইয়ের প্রায় পৃষ্ঠাতেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা হয়েছে। একজন মুসলিম হিসেবে আমি এ বিষয়ে আপত্তি না করে পারি না যে, মুসলমান ছাত্ররা দিনের পর দিন নিরর্থকভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কুৎসা এবং অবজ্ঞা উদ্রেককারী বিষয়সমূহ পাঠ করতে থাকুক।' তবে আবুল লতিফের প্রস্তাব দীর্ঘকাল অমীমাংসিত থেকে যায়। ফলে মুসলিম নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কার্যক্রম সম্পর্কে নানা অভিযোগ অব্যাহত ছিল।

পাঠ্য তালিকার সমালোচনায় মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রায়ই সংস্কৃত উদ্ধৃতি যুক্ত হিন্দু পুরাণ কাহিনিতে এবং কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। এমন কয়েকটি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, মুসলিম ছাত্ররা আর সকল বিষয়ে খুব কৃতিত্বপূর্ণ নম্বর পেয়েছে, অথচ তাদের দুর্ভাগ্য কেবল মাতৃভাষার পরীক্ষাতেই তারা অকৃতকার্য হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষদ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মুসলিম বর্জিত হওয়ায় মুসলমানদের বিষয় সম্পর্কিত পুস্তকের প্রতি কিংবা মুসলিম লেখকদের রচিত বইয়ের প্রতি সহানুভূতিমূলক বিবেচনা প্রদর্শিত হয় না।' তাছাড়া, ১৮৭২ সালে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আরবি-ফারসি চালু করলেও তার মান কলকাতা মাদ্রাসার সাথে অসামঞ্জস্য ছিল এবং যার ফলে মুসলিম ছাত্রদের নিকট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তেমন আকর্ষিতও হয়নি। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষা নির্ভর হওয়ায় অনেকেই এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। একটি Teaching ও Residential বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি নানা মহল থেকে জানানো হচ্ছিল। তেমনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুখে স্বসমাজের জন্য একটি আধুনিক উচ্চশিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি উনিশ শতকের শেষ পাদ উচ্চারিত হয় এবং পরবর্তীকালে বিশ শতকের প্রথম দু'দশকে ঐ দাবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয়।

...১৮৮২ সালে সৈয়দ আমির আলী ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য ও স্মারকলিপিতে কলকাতায় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপনের দাবি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৯ সালে আমির আলী তার এক প্রকাশিত প্রবন্ধে মুসলমানদের জন্য কলেজের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে আলিগড় কলেজের ইংল্যান্ড প্রবাসী ছাত্রবৃন্দের এক সভায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করে পুনরায় বাংলায় 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। ১৯০২ সালে গঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিশন তখন এ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।"[৩৩]

---

৩৩. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম/ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা : সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)। [বাংলা একাডেমি - জুন, ২০০৮। পৃ. ৩০১-৩০৩]

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে তারা সহ্য করতে পারেনি এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের সহ্য হলোনা। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু মনোভাব সবচেয়ে নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে 'গুরুতর বিপদ' অবলোকন করেছে। এই 'গুরুতর বিপদ'টা কি? সেটা মুসলমানদের উন্নতি ও উত্থান। অর্থাৎ হিন্দুরা হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের অস্তিত্বের বিরোধী, যা মাথা তুলেছিল শিবাজী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রী অরবিন্দের আন্দোলনে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উত্থিত এই সংহার মূর্তিই সেদিন মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামকেই অপরিহার্য করে তুলেছিল।"[৮]

ছয়

"...অতঃপর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বাতাবরণ তৈরীর মাধ্যমে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তুমুল আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে পূর্ববাঙলা আসাম প্রদেশ তথা 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হ'ল। বৃটিশ ভারতের 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' অধ্যুষিত পান্ডববর্জিত অঞ্চল পূর্ববাঙলা ও বৃহত্তর আসামের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ আবারও ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'ল।

১৯০৫ সালে পূর্ববাঙলা ও বৃহত্তর আসাম (আজকের সেভেন সিস্টার্স) নিয়ে বৃটিশ ভারতে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল তা উগ্র বর্ণহিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনের মুখে বাতিল না হয়ে যদি স্থায়িত্ব লাভ করতো, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল পূর্ববাঙলা ও বৃহত্তর আসামে, এমনকি গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ৫টি বড়ো মাইলফলক তৈরি হতো। সেগুলো হল :

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১ সালের পনেরো বছর আগেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো এবং সেই পনেরো বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২১ সালের মধ্যেই পূর্ববাঙলা ও আসাম অঞ্চলের ভয়াবহভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমান ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে যেতো।

২. ঢাকা তখন কলকাতার হিন্টারল্যান্ড (উপনিবেশ) থেকে মুক্ত হয়ে নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য নগরীর প্রতিযোগী নগর হিসেবে বিকাশ লাভ করতো।

৩. চট্টগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধি তৎকালীন বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম, কলকাতাসহ ভারতবর্ষের সকল সামুদ্রিক বন্দরের সমৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতো। বাংলাদেশের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী-সুশীলরা যে, চট্টগ্রাম বন্দরকে মার্কিন ও ভারতের হাতে তুলে দিয়ে চট্টগ্রামকে 'সিঙ্গাপুর' বানানোর অলীক স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্ন আজ থেকে অন্তত: সত্তর বছর আগেই বাস্তবে পূরণ হতো।

৪. পূর্ববাঙলা-আসাম প্রদেশ বৃটিশ শাসনকালের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়ে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতিতে এবং ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী প্রদেশে রূপান্তরিত হতো।

৫. এর ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবই হতো না, কারণ পাকিস্তান আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন কলকাতার 'উপনিবেশ' পূর্ববাঙলার জনগণ। ১৯০৫ সালের পূর্ববাঙলা-আসাম প্রদেশ স্থায়ী হলে ১৯৪৭-এর মধ্যেই এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভারত-ভাগ ও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণের শর্তই তৈরী হতো না। বরং সমগ্র ভারতবর্ষে নিজের পণ্যের বাজার সম্প্রসারনের স্বার্থেই তারা ভারত-ভাগের বিরোধিতা করতো। আর, কোন কারণে সাতচল্লিশ বা তার আগে-পরে ভারত যদি বিভক্তও হতো এবং পাকিস্তানও যদি প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে সে ক্ষেত্রে পূর্ববাঙলা-আসাম প্রদেশের পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হতো না,

৮. আবুল আসাদ/একশ' বছরের রাজনীতি। [বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি - মে, ২০১৪। পৃ. ৭১-৭৪]

বরং পূর্ববাঙলা-আসাম প্রদেশ নিজেই একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হতো। সেটি হ'লে স্বাধীন পূর্ববাঙলা-আসাম রাষ্ট্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতো। আজ যারা দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশ, সেভেন সিস্টার্স ও দার্জিলিং নিয়ে 'কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস (সি.আই.এস)' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্ন ষাট-সত্তর বছর আগেই পূরণ হতো।

দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল - তৎকালীন পূর্ববাঙলা ও বৃহত্তর আসামের যে-সব রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের লেজুড়বৃত্তি করেছিলেন এবং ১৯০৫-এ এই সম্ভাবনাময় প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে তার বিরুদ্ধে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলে চিৎকার করে পূর্ববাঙলা-আসাম প্রদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন এবং আজও তাদের উত্তরসূরী বাংলাদেশের একশ্রেণির 'মুসলমান ব্রাহ্মণরাও' যে কথিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে করে মুখের ফ্যানা তোলেন - তারা কি বুঝেন, এ অঞ্চলের জনগণের কত বড়ো ক্ষতি তারা করেছিলেন? তারা কি কখনও এ-ও ভেবে দেখার অবকাশ পান যে, তাদের চিৎকার পরবর্তীতে ৪৭-এর বঙ্গভঙ্গ ঠেকাতে পারেনি, ভারত ভাগও ঠেকাতে পারেনি?

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যে ঘোরতর মুছলিম-বিদ্বেষী উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল সে বিষয়ে ভারতীয় লেখক বিমলানন্দ শাসমল তার 'ভারত কী করে ভাগ হ'ল' গ্রন্থে লিখেছেন-

এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীতভাবে মুসলমানবিরোধী এবং গভীরভাবে মুছলিম স্বার্থের পরিপন্থী। এই আন্দোলনের তাগিদে যে-সকল সন্ত্রাসী বা বিপ্লববাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন তারা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলমান বিরোধী।"[৬৯]

সাত

"...১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবী পেশ করেন। অন্যতম দাবীটি ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। হিন্দুদের চক্রান্তে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ভারতের বড়লাট নবাবকে সান্তনা দেয়ার জন্য ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। কিন্তু অন্যান্য উগ্রবাদী হিন্দু নেতাদের সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ আশ্বাসেরও চরম বিরোধিতা করেন।

১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রতিবাদ সভা ডাকে। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ তিনি ছিলেন জমিদার। তিনি মুসলমান প্রজাদের মনে করতেন লাইভ স্টক বা গৃহপালিত পশু। [নীরদচন্দ্র চৌধুরী, দি অটোবায়োগ্রাফি অব এন আননোন ইন্ডিয়ান দ্রষ্টব্য]

কাজেই বাংলার মাটি, বাংলার জলের জন্য একবছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমে গদ গদ হয়ে গান লিখলেও এক বছর পর বাংলার কৃষকদের ছেলে শিক্ষিত হবে তা তিনি সহ্য করেননি। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে নবশিক্ষিত মুসলমান সমাজকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সন্তানদের শিক্ষিত হয়ে বুদ্ধিজীবী হলে চিরকাল সেবাদাস করে রাখা যাবে না। একথা চিন্তা করেই বোধ হয় হিন্দু বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা সেদিন আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উগ্রবাদী হিন্দুরা কতটা ক্ষিপ্ত হয়েছিল এর প্রমাণ পাওয়া যাবে সেকালের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, বিবৃতি ও পত্রিকার ভাষ্য থেকে।

---

৬৯. রইসউদ্দিন আরিফ (সাবেক সম্পাদক, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি)/অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ : বাঙালী ও বাংলাদেশ। [পাঠক সমাবেশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। পৃ. ৮০-৮২]

এগারো

"...নতুন করে জানা নয়। যথার্থই আমি এসব জানতাম না। আজ দেখছি, এ তথ্যগুলোর একটা তা আছে। আমার (বড়) ভাইয়ের লেখাপড়া তথা সেদিনকার হাইস্কুলে পড়া মানে একটি মুসলিম গ কৃষক পরিবারে প্রথমবারের মতো আধুনিক শিক্ষার প্রবেশ ঘটা। সেই পরিবারের এই ছেলেটি কৃতি সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছে। আই.এ এবং বি.এ পাস করে ঢাকা এসেছে এম.এ পড়তে, এটার ম একটা সামাজিক রূপান্তরের আভাস আছে। শুধু একজন ব্যক্তির জীবনযাপন নয়। যুগ পরিবর্তিত হচ্ছি এ কথা সত্য। তাই এই শতকের গোড়ার দিক থেকেই মধ্যবিত্ত এবং গরিব ঘরের কৃষকের ছেলেও মক্তব নয়, হাইস্কুল আর কলেজে আসছিলো, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

মিয়াভাই সাহেব তার এই পাসের কথায় দুঃখ করে বললেন, কলেজে তো আমাকে সকল প্রফে অসম্ভব স্নেহ করতেন। সলিল চৌধুরী, তিনি পরীক্ষার পরে আমার খাতা দেখে বলেছিলেন, 'ইওরস দি বেস্ট।' তবু তো রেজাল্ট ভালো হলো না। এক নম্বরের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পেলাম না। অ প্রফেসরের কাছে শুনেছিলাম আমার খাতায় 'হাই সেকেন্ড ক্লাস' উঠেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এর কারণ কি?

মিয়াভাই বললেন, কারণ, মুসলমান ছেলে ভালো কেন করবে?

মিয়াভাইয়ের এমন অভিযোগের কথাতেও বিস্ময়বোধ ছিলো। আমি বললাম, কিন্তু আপনার গুণের কা হিন্দু শিক্ষকরা তো আপনাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

একথা তিনি স্বীকার করলেন। মনে করে বললেন, বি.এম স্কুলের হেডমাস্টার অমৃতলাল দাশগুপ্ত, নি ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন আমাকে।

...কিন্তু একথা ঠিক যে ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক রেষই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন প্রী সম্পর্ক বিরল হয়ে আসছিলো। কিন্তু মিয়াভাই সাহেব একদিকে যেমন কোনোদিন হিন্দু সমাজের য তাকে স্নেহপ্রীতি দিয়েছেন তাদের কথা ভুলতে পারেননি, তেমনি সমাজে সাধারণভাবে যে সাম্প্রদা মনোভাব ছিলো এবং সাধারণভাবে হিন্দু প্রধানরা যে মুসলমান সমাজ, এমনকি তার বিকাশমান মধ্য শিক্ষিত অংশকেও বৈরী দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই অনুভবটি নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি।

তাই নিজের বি.এ পরীক্ষার ফলাফলে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবটি যে কাজ করেছিলো সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটি খুবই সম্ভব বলে আমারও মনে হলো। যখন বললাম, কিন্তু হি অধ্যাপকরা তো আপনাকে ভালো ছেলে বলে জানতেন। তখন তিনি বললেন, আমার কলে প্রফেসররা জানলে কি হবে। তখন তো খাতার ওপর পরীক্ষার্থীর নাম লেখা থাকতো। আর তা থে ধরা যেত কোন খাতা হিন্দু-ছাত্রের এবং কোন খাতা মুসলমান ছাত্রের। আর এ কারণেই মুসলমান ছা পক্ষে সেদিন ভালো করা ছিলো প্রায় অসম্ভব।

সেকালের কথা ভালো করে আমি জানিনে। কিন্তু মিয়াভাইয়ের এ ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে।"[৩৪]

বারো

"...উপমহাদেশে আমাদের এসময়, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প বেশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়াতে আমাদের দৈনন্দিন জী তা প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। নিজেও টের পাচ্ছিলাম হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, ওদের আর আমাদের মাঝে প্র

[৩৪]. সরদার ফজলুল করিম/আমি সরদার বলছি। [অন্বেষা - ফেব্রুয়ারি, ২০১৩]

কলকাতায় পড়তে এসে ধর্ম বিষয়টি মাঝে মাঝেই আমার রাগ ও হতাশার কারণ হয়ে উঠতে লাগলো। বোটানি বিভাগে অনার্স ক্লাসে মোট আটজন ছাত্রের মাঝে আমিই ছিলাম একমাত্র মুসলমান ছাত্র, অন্যরা সবাই হিন্দু। কোন কোন অধ্যাপক যে আমার সঙ্গে একটু অন্যরকম ব্যবহার করতেন তা ছোটোখাটো ঘটনায় প্রকাশ পেত। হতে পারে এ আমারই ভুল কিন্তু সে সময় আমার তাই মনে হতো।

একদিন লাইবেরি থেকে একটা বিশেষ বই নিতে গিয়েছি। লাইব্রেরিয়ান দিলেন না। বললেন এক অধ্যাপকের কথা, তিনি বুকিং দিয়েছেন। বইটি আমার খুব দরকার তাই গেলাম সেই অধ্যাপকের কাছে। মাত্র একদিনের জন্য বইটি চাইলাম। অনেক অনুরোধ করলাম। তিনি দিলেন না। বললেন বইটি ওর নিজেরই ভীষণ দরকার। পরে জানতে পারলাম, বইটি তিনি নিজে ব্যবহার করেননি, অন্য এক ছাত্রকে দিয়েছেন।

শিক্ষকের এইরকম ব্যবহারে খারাপ লাগবারই কথা, তবুও নিজের পড়া একমনে করে গিয়েছি। বই কিনে পড়েছি যখন লাইব্রেরিতে গিয়ে সুবিধা পাইনি। পরে, চাকরিতে জয়েন করার আগে কলেজ ছাড়ার সময়, যে ক'জন মুসলমান ছাত্র বোটানি পড়তে এসেছিল, তাদের সে বইগুলি দিয়ে আসি। বলি, দ্যাখ সব সময় বই পাবি না, এই বইগুলি রাখ। বুঝেছিলাম 'সেই সময়' মুসলমান ছাত্র হয়ে 'এ' কলেজে পড়াশোনা করার কিছু অসুবিধা আছে।"[৩৫]

তেরো

"...আমাদের একজন প্রফেসর, বৃদ্ধ, সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সেদিন ক্লাশে বসেই এক ঘটনার কথা বললেন। তোমরা আজ আমার সামনে বসে রয়েছ, সবাই মুসলমান ঘরের সন্তান। মাত্র কবছর আগেও এই অবস্থা ছিল না। একদিনের ঘটনা। মদ্রাসা পাস এক মুসলমান ছেলে। খুবই মেধাবী। বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির আবেদন করেছে। ফরমখানা স্বাক্ষরের জন্য প্রিন্সিপ্যালের সামনে। প্রিন্সিপ্যাল হিন্দু। ছেলেকে বললেন, তোমার বাবাকে ডাক। বাবা আসলো। মুসলমান বাবাকে অনেক সম্মান দেখিয়ে তার সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। ভর্তি ফরমখানা দেখিয়ে বললেন, আপনার ছেলের ফরম। খুবই ভালো ছেলে। শেষ স্বাক্ষরের জন্য এসেছে। আমি স্বাক্ষর করলেই ভর্তি হয়ে যাবে। আর, এই ফরমে স্বাক্ষর করায় যে আনন্দ তার সৌভাগ্য আমারই। আপনার সামনে স্বাক্ষর করার জন্য আপনাকে ডেকেছি, যেন ভাগ্যবান বাবা হিসেবে আপনি সেই আনন্দের একটা অংশ পান। তবে একটু কথা। দেখেন, আমরা, হিন্দু-মুসলমান, সবাই পরকালে বিশ্বাস করি। পাপ-পূণ্য, কর্মফল, নরক-দোজখ, স্বর্গ-বেহেস্ত সবই আমরা বিশ্বাস করি। আমার মত আমরা অনেকেই ভবমোহে ধর্ম, ধর্ম-শাস্ত্র না শিখে বিজ্ঞান-ইংরেজী শিখেছি। এই যে আমি, আপনার সামনে ক্ষমতার চেয়ারে বসা, অনিত্য ধরণীর অলীক ক্ষমতা, নরকমুখী তার টান। পার পাব কি পরকালে? তরাবে কি তারিণী? আমার ভরসা নেই। এই বয়সে এসে বড়ো আক্ষেপ হয়, ভগ ভুলি ভবে মজিলারে মন। আমাদের সময়ে সুপথ দেখানোর মানুষ ছিল না। তাই বলছিলাম কি আপনার এই ছেলে, ভগবানের কৃপা তার উপর, খুবই মেধাবী। সে যদি মদ্রাসা লাইনেই থাকতো নিজে পার পেতো, আর দশজনকেও হেদায়েত দিতে পারতো। বলার কথা এইটুকুই। অন্তত: একজনকে সুপথ দেখালাম, তাতেও যদি ভগবানের কৃপা পাই। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।

প্রিন্সিপ্যাল বাবু একটু থামলেন। সন্ধানী দৃষ্টি ছড়ালেন। কলমটা কালির দোয়াতে আলতো ঠুকে বললেন, তা, লিখেদি তাহলে, ভর্তি, হয়ে যাক?

একেতো হিন্দু, তার উপর প্রিন্সিপ্যাল। ছেলের বাপ তার খাস কামরায়। আধো বসা, আধো নাবসা। ত্বরিত দাঁড়িয়ে গেল। সার, একটু ভাবতে দেন, ফরমখানা আমার হাতে দেন। প্রিন্সিপাল একটু হাঁ না করে দিয়ে দিলেন ফরমখানা।

---

৩৫. নুরউদ্দিন আহমেদ (সাবেক সচিব, বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম বদরুন্নেসার স্বামী)/জীবনের বনে বনে। [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ৪৪-৪৫]

ছেলেকে নিয়ে তার বাপ চলে গেছে। আর ফিরে আসেনি।

প্রফেসর সাহেব একটু থামলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, প্রিন্সিপ্যাল মুচকি হেসে হয়তো স্বগত করেছিলেন, মুসলমানের বাচ্চা! বিজ্ঞানী হবে?"[৩৬]

চৌদ্দো

"...শুধু 'বন্দে মাতরম' নয়, আরো এক ব্যাপারে মুসলিম তরুণদের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে সেটা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার 'শ্রীপদ্ম' মনোগ্রাম। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে এই 'শ্রী-প মনোগ্রামের তীব্র প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম তরুণ মহলে বিক্ষো ছড়িয়ে পড়ে। 'শ্রী-পদ্ম' মনোগ্রামের বিরোধিতার মূলে মুসলিম তরুণদের যুক্তি ছিল এই যে, 'শ্রী' হ সরস্বতীর অপর নাম, আর 'পদ্ম' হচ্ছে তার আসন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই হিন্দু-প্রতীকী মনোগ্রাম মুসলমান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না শুধু এই কারণে নয় যে এটা হিন্দুয়ানী-প্রভাবিত, বরং এ কারণেও যে, এর আইডি পৌত্তলিক যা তৌহিদবাদী মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ 'শ্রী-প মনোগ্রাম সম্পর্কে মুসলমানদের এ আপত্তিও মেনে নিতে চান নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মনোগ্রাম র পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। মনোগ্রাম থেকে 'শ্রী' বর্জিত হয় এবং 'পদ্ম'ও রূপান্তর গ্রহণ করে।"[৩৭]

পনেরো

"...হক সাহেব বললেন : আরে সে জন্য ভেবো না। পাকিস্তান ঠিকই কায়েম হবে। মুসলমান জাতি যে একবার জেগেছে তখন তাদের দাবী আদায় না করে ছাড়বে না। আমি মুসলমানদের স্বাধিকার অর্জন বিরুদ্ধে? আমি ১৯৩৯ সালে কোলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে অভ্যর্থ সমিতির সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দেই, তা তোমরা শুনেছ?

আমরা সবাই বললাম, শুনেছি স্যার।

তিনি এ কথায় আস্বস্ত হলেন না। নিজে উঠে গিয়ে তার আলমারী থেকে পুরানো একটা ছাপানো ভা বের করে এনে এক এক করে পৃষ্ঠা নম্বর বলতে লাগলেন এবং সেখানে কি কি কথা বলেছিলেন অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। আমরা ৭০ বৎসর বয়সের এই অসাধারণ মানুষটির স্মরণ শক্তির পরিচ পেয়ে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

হক সাহেব তাঁর অভিভাষণের পাতা খুলে খুলে আমাদের পড়ে শুনাতে লাগলেন। তিনি তাতে বলেছে শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের বিধান থাকবে, এবং এই বিধানে ইসলামি সংস্কৃতি উন্নয়নের ও পূর্ণতা বিধানের সুযোগ থাকতে হবে, যাতে তারা শরীয়ত ও জাতীয় ঐতিহ্যের পূর্ণ বিকাশে অব্যাহত সুযোগ পায়। মুসলিম ভারত একটি সাংস্কৃতিক ইউনিট এবং এদের জন্য এমন একটি শিক্ষ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে যা মুসলমানদের সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ঐক্য নিশ্চিত করবে।

অভিভাষণের আরও কয়েকটি পাতা উল্টে তিনি পড়তে লাগলেন। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাধার সৃষ্টি করছে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলার অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে আছে। বাংল শিক্ষাকে ব্যাপক ও কার্যকরী করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে করতে হবে এবং কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক মুরুব্বিয়ানা হ্রাস করতে হবে, কারণ এটা কায়েমী স্বার্থের চক্রে পরিণত হয়েছে।

---

[৩৬]. সাইফুল ইসলাম সজিল/আনচোখ। [লেখক - জুন, ২০০৮। পৃ. ২৩৫-২৩৬]
[৩৭]. আবুল কালাম শামসুদ্দীন/অতীত দিনের স্মৃতি। [খোশরোজ পাবলিকেশনস লি : (প্রথম সংস্করণ - সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮) জুন, ২০০৯। পৃ. ১৪৫-১৪৬]

এই পর্যন্ত পড়ে হক সাহেব বইখানা বন্ধ করে বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমার চেয়ে কঠোর ভাষায় কথা বলেছে, এমন একজনেরও নাম করতে পারবে?"[৩৯]

ষোলো

"...১৯২৪ সালে দ্বৈত-শাসনের সময় তিনি (শেরে বাংলা) ১লা জানুয়ারি থেকে অল্পকালের জন্য বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। মাত্র কয়েক মাসের জন্য এ পদ গ্রহণ করলেও তিনি ঐ সময়ের মধ্যে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ স্থাপন করেন। এর পূর্বে মুসলমানদেরকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হতো না। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ স্থাপন করেই তিনি সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমান শিক্ষকদের এনে ঐ কলেজ স্থাপন করেন। উত্তরকালে শিক্ষক হিসেবে যারা যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাবান হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সর্বজনাব রেজা আলী ওয়াসিত, মাজহারুল ইসলাম, মামুন হেনা, আলতাব হোসেন, আলতাব ইসমাইল, এস. জি. ডক্টর সাদেক, কাজী আকরাম হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বৈত শাসনকালে মন্ত্রীদের ক্ষমতা খুবই অল্প ছিল। তাছাড়া দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় ভূমিকা ছিল খুবই শক্তিশালী। এসব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও হক সাহেব মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরেট স্থাপন করেন। তখন স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা শেখানো হতো। মুসলমান ছাত্রদের স্কুলে ভর্তি হওয়া ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্কুলসমূহে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবই ছিল ষোলআনা। সরকারি স্কুল ছাড়া অন্য কোনো স্কুলে আরবী ফারসী ও উর্দু পড়ানো হতো না। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আদেশ জারী করলেন যে, কোনও বেসরকারি স্কুলে সরকারি সাহায্য পেতে হলে একজন সহকারী মুসলমান শিক্ষক ও একজন মওলবী শিক্ষক রাখতে হবে। মুসলমান ছাত্রদের নানা অজুহাতে সরকারি স্কুল ও কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া হতো না। তাই তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা করেন। যদি ছাত্র না পাওয়া যায় তাহলে সিট খালি রাখতে হবে। এ ব্যবস্থার ফলে সেকালে বহু মুসলমান শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সে সময়ে আর একটি বড়ো বাধা ছিল পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার নিয়ম থাকা। এর ফলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষকের হাতে খাতা পড়লে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষায় পাশ করা কিংবা প্রতিভাবান মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত নম্বর পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। ফলে মুসলমান ছাত্রদের পরীক্ষায় পাশের হার অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান দখল করতে পারাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। হক সাহেব এসব প্রতিকূলতা দূর করার জন্য পরীক্ষার খাতায় ছাত্রদের নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লেখার নিয়ম চালু করলেন। এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমান ছাত্রদের পাশের হার বাড়তে শুরু করল। পরীক্ষার নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কোনও মুসলমানের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের স্বীকৃতি পাওয়াও ছিল ভীষণ দুরূহ ব্যাপার। ফলে এসব স্কুল কলেজের জন্যও হক সাহেবকে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

শিক্ষা বিল, কংগ্রেসী সংবাদপত্র সমূহ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, অননুমোদিত খসড়ার মুদ্রণ :

কংগ্রেস নেতৃবর্গ কর্তৃক কংগ্রেসী পত্রিকাসমূহ পরিকল্পিত, অননুমোদিত খসড়া বিল মুদ্রণ ও হক সাহেব কর্তৃক আনীত বাংলার শিক্ষা বিলের বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য পেশের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালের ৩০ শে নভেম্বর হক সাহেব নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন :

'...জনসাধারণের স্মরণ আছে যে, প্রায় আঠারো বছর পূর্বে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সদস্যবিশিষ্ট 'স্যাডলার কমিশন' বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুলসমূহকে পরীক্ষার্থী পাঠাবার মঞ্জুরী দেবার কাজে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের জোরালো সুপারিশ করেছিলেন। এ সুপারিশের পরে

[৩৯]. মোহাম্মদ মোদাব্বের/সাংবাদিকের রোজনামচা। [বর্ণমিছিল - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। পৃ. ১০৫-১০৬]

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই ঐ সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন করেছে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুবিধ কারণে এ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯২৪ সালে আমি যখ শিক্ষা দফতরের ভার গ্রহণ করি তখন একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বিল তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমি স্বল্পকালীন সময়ে অনেক বেশি কাজে ব্যস্ত থাকায় কাউন্সিলে ঐ বিল উত্থাপন করতে পারিনি যখন আমি গত এপ্রিলে আবার শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন ওটা প্রকৃতপক্ষে আমার ১৯২ সালের দায়িত্ব ত্যাগ করার সময়ে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই পড়ে থাকতে দেখলাম। ব্যতিক্র এটুকু যে, মধ্যবর্তী সময়ে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়েছে এবং বিলের জরু বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছতে সমর্থ হয়েছে।'

সরকারের উদ্দেশ্য

আমি কালক্ষেপণ না করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নটি হাতে নিলাম। 'স্যাডলা কমিশনে'র সুপারিশ এবং স্কুল সমূহকে মঞ্জুরী দেবার জন্য একটি স্বায়ত্বশাসিত বোর্ড গঠনে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত ইচ্ছাই সরকারের কাছে এ বিল উত্থাপনের ন্যায্যতা প্রমা করে দেয়। যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমি একটি বিলের খসড়া তৈরী করলাম এবং তা বিবেচনার জন্য এক একটি অনুলিপি যথাক্রমে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আসাম সরকারের কাছে প্রেরণ করি। এ বিল তখন পর্যন্ত বাংলার কেবিনেটে আলোচিত হয়নি এবং আমার কোনো সহকর্মীও এ বিল দেখেননি। আমি সময় বাঁচিয়ে এ বিলটিকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং আসাম সরকারের পরামর্শ (Suggestion) চেয়ে পাঠাই। বিলটি যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল গোপনেই পাঠানো হয়েছিল এবং আশা করা গেছিল যে, সরকারের অনুমোদন ছাড়া তা বাইরে ছাপা হবে না। দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস সংবাদপত্রগুলো আর একবার দেখিয়ে দিল যে, তারা অননুমোদিত দলিলের খসড়া প্রকাশ করায় কত কৌশলী; যেমন করেছিল তারা রাজশাহী টেলিগ্রামের ব্যাপারে। খসড়াটি হাতে পেয়েই সামান্য বিবেচনা ও শালীনতার ধার না ধেরেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগল।

অরাজকতার পুনরাবির্ভাব

সংবাদপত্রগুলোর অন্যতম 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' বিলে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে বাংলার যুবসমাজকে আগের দিনের মতো অরাজকতা ও উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য উচ্চকণ্ঠে আবেদন জানিয়েছেন। গত ১৯৩৭ সালের ২৬শে নভেম্বর একটি নিবন্ধে 'আজ বাংলাদেশ কোথায়?' এ প্রশ্নবোধক শিরোনাম দিয়ে বলা হয় - 'বাংলাদেশ কি মৃত? হিন্দুস্থানের মানচিত্র থেকে সে কি মুছে গেছে? তাঁর সন্তানগণ কোথায়? ঐসব সাহসী নর নারীরা কোথায় - যারা একদিন এদেশেরই শাসক শ্রেণীর মনে ভীতি সঞ্চার করতো আজ তারা কোথায়? যদি কোনো আপোষহীন ও আমরণ সংগ্রাম তা যত দীর্ঘ ও তীব্রই হোক না কেন — করার কারণ ঘটে থাকে - তাহলে এটাই উপযুক্ত কারণ ও এখনই সময়।' আর একটি উদাহরণ'-এর ধারাগুলোতে এ কথা পরিষ্কার যে, মুসলমানরা শিক্ষাকে এখনই এবং চিরদিনের জন্য এমন একশ্রেণির হাতে তুলে দিতে চায়, যারা শিক্ষা-দীক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অন্যপক্ষে যারা এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, যারা তাদের উদ্যোগ, টাকা-পয়সা সব কিছু দিয়ে 'বাংলার' মাধ্যমিক স্কুলগুলো গড়ে তুলেছেন এরা তাদেরকে বঞ্চিত করে এবং একদল চিৎকারপরায়ণ মূর্খ - যারা মূর্খের চেয়েও অধম বিকারগ্রস্ত এবং ভীত সন্ত্রস্ত কর্মচারী, যারা শিক্ষার স্বকীয়তার পক্ষে বিপদজনক বাধা, তাদের হাতে তুলে দিতে চায়। এর একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো, একদল সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টি করা। আর একটি উদাহরণ — আমরা জিজ্ঞেস করি আজ বাংলা কোথায়? কোথায় স্যার আশুতোষের কণ্ঠস্বর যা অবিচার অত্যাচার এবং অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বজ্রের মতো গর্জে উঠত? কোথায় আমাদের সাহসী সমাজ? তারা কি তাদের ক্ষমতা সম্মান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে নতি স্বীকার করবে?'

মুসলিম আধিপত্য

এরপরে আনন্দ বাজার পত্রিকায় আসা যাক। আমি গত ১৯৩৭ সালের ২৫ নভেম্বর সম্পাদকীয় থেকে তুলে দিচ্ছি। সম্পাদকীয় এ কথা দিয়ে শুরু হয়েছে - 'সরকার প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে বাধা দিতে চায় এবং বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলসমূহের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত করতে চায়। (কি মিথ্যা কথা!) আরও বলেছে যে, বিলটি দ্বারা সরকার খোলাখুলিভাবে বাংলার গত একশো বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। (কি মিথ্যা কথা!) এরপরে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথায় আসা যাক। ৩৪ জন সদস্যের বোর্ডে আইন দ্বারা মুসলমানদের ১৫টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি শিক্ষামন্ত্রী একজন মুসলমান হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তার স্বসম্প্রদায়কে আরো কয়েকটি আসন দেবেন যাতে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে মুসলমান সদস্যরা কর্তৃত্ব করতে পারবে।'

সর্বশেষে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এ বিলের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি হলো অনেকগুলো চমৎকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা, যা হিন্দুদের জ্ঞান, উদ্যোগ এবং অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো আগামীতে সোজাসুজি হিন্দু মানসিকতা ও বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশকে প্রতিহত করা।'

এ উভয় লেখা দুটি ভালোভাবে পড়া দরকার এবং যারা দেশের ভালো চান তাঁরা এ সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করবেন। এ সমস্ত খবর কংগ্রেসের পত্রিকাসমূহে প্রত্যেকদিন হাজার হাজার বার উল্লেখ করেও মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক, একথা বলতে তারা ক্লান্ত হচ্ছে না। বরং তারা কোনো কিছুই নিখুঁত জাতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। আমি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে কয়েকজন মুসলমানকে আসন দিতে বলায় যেসব হিন্দুরা তাদের সংবাদপত্রে বিষোদগার করছে এবং ক্রোধে তাদের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছে তাদের আচরণ সম্পর্কে জনগণকে ভেবে দেখতে বলছি। সর্বোপরি মুসলমানরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী। সুতরাং তারা মুসলিম শুধু এ কারণেই তাদের বোর্ডের বাইরে রাখা হবে কেন? হিন্দু সংবাদ পত্রগুলো এ যুক্তি দেখাতে চায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে মুসলমানদের বের করে দিয়ে সেসব আসন হিন্দুদের দ্বারা পূর্ণ হলে উক্ত বোর্ড আরো সুরক্ষিত হবে।

যদিও বাংলার হিন্দুরা অন্য জাতের লোকদের সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই সহ্য করতে পারে না। প্রাচীন গ্রীকদের মতো তারাও পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের বর্বর মনে করে। অথচ তাদেরকে মানবগোষ্ঠীর সাধারণ গণনার মধ্যেই আনা যায় না। তাদের কাছে বাংলার শতকরা মাত্র ৬ জন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতামত, অনুভূতি ও আবেগের সম্মুখে অন্যদের মতামত, অনুভূতি ও আবেগের কোনো অর্থই নেই এবং তারা এ কথা সহ্য করতে পারে না যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাইরে আর কারোরই মানুষ বলে নিজেদেরকে দাবী করার অধিকার থাকতে পারে।

আরো ছয়টি আসন

পূর্বনির্দিষ্ট আসনের চেয়ে আরো ছয়টি বেশি আসন মুসলমানদের দেবার প্রস্তাবে হিন্দু পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের ক্রোধে চৈতন্য হারবার উপক্রম হয়েছে। একটি কাগজ যুব সম্প্রদায়কে এমনভাবে উস্কানী যুগিয়ে আসছে যা ইতিপূর্বে বাংলাদেশকে চরম অবমাননার পথে টেনে নামিয়েছে। এ সমস্ত উন্মত্ত আস্ফালনের কে তোয়াক্কা করে? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সমস্ত লেখা বিবৃতিগুলো হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির অবদানকে একেবারে অসম্ভব করে তোলে। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ হতাশায় ও ক্রোধে মাননীয় গভর্নরকে বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙে দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছে এবং তাদের মতো উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলেছে। আহা! মূর্খ -বেচারা, কি করে তোমাদের করুণা করবো।'

৫২তম নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন

১৯৩৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর, সকালে নিখিল-ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের ৫২তম অধিবেশন কলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে নবাব ঈয়ার কামাল জঙ্গের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব এ. কে. ফজলুল হক ভাষণ দেন। তিনি তার বক্তৃতায় সমগ্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐক্য, শিক্ষার অগ্রগতি এবং মুসলিম শিক্ষার পথে যে বিপদ ও অসুবিধা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্মেলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে জোর দেন। ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, এটি বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মি. জিন্নাহ, স্যার সেকান্দার হায়াত খান, স্যার আবদুল কাদির, বেগম মোহাম্মদ আলী, নবাব মোজাফফর খান, স্যার রহমতুল্লা চিনয়, ডাঃ মরিয়া সেঙেসরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বাণী প্রেরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা

হক সাহেব তার বক্তৃতায় ভারতে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির পথে বহু বহু সমস্যার এবং 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনার' বিষদ আলোচনা করেন। তিনি ঘোষনা করেন যে -

যতদিন মুসলমানেরা ইসলামের সত্য আঁকড়িয়ে থাকবে ততদিন তাদের জাতিচ্যুত করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমার মতে তিনি বলেন, ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার আদর্শ তিনটি শব্দে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন, স্বায়ত্তশাসন, সংহতি এবং অগ্রগতি। স্বায়ত্তশাসন অর্থে আমি মনে করি, ইসলামি সংস্কৃতির সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, মুসলমানদের ভাবী এবং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি, সামাজিক বিধি-বিধান, শরিয়ত এবং ভারতীয় মুসলমানদের নিজেদের জাতীয়তার ঐতিহ্য। সংস্কৃতি অর্থে আমি এ কথার উপর জোর দিতে চাই যে, মুসলিম ভারত একটি সাংস্কৃতিক ইউনিট এবং একটি অখন্ড সামগ্রিকতা এর এমন একটি শিক্ষা পরিকল্পনা থাকা চাই - যা ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি এবং সুস্পষ্ট রাজনৈতিক একাত্মতাকে নিশ্চিত করবে।

অগ্রগতির অর্থে আমি বুঝি যে, যখন মুসলমানরা তাদের শিক্ষার কাঠামো, ইসলামের নীতি এবং ঐতিহ্যের ওপর দাঁড় করাতে পারবে তখন তারা সকল রকম কলা, বিজ্ঞান আয়ত্তে এবং সাধারণ শিক্ষার সার্বজনীন বিকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবে। তারা সকল রকম কলা, বিজ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তিনি ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের জন্য একটি নতুন গণতান্ত্রিক গঠণতন্ত্র তৈরীর পরামর্শ দেন। যাতে তা বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় দেশ ও সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা তদন্ত কমিটি গঠিত হোক, তার কাজ হবে আলীগড় শিক্ষা সম্মেলনের জন্য একটি নতুন গঠণতন্ত্র তৈরী করা এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের এবং দেশিয় রাজ্যসমূহের শিক্ষার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। তাছাড়া বর্তমান অবস্থার আলোকে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলমানদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি নতুন শিক্ষার কর্মসূচী তৈরী করা।

তিনি বলেন, সম্মেলনের সম্মুখে প্রকৃত সমস্যা হলো যে, যেসব প্রদেশ ও দেশিয় রাজ্যে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম রক্ষা করা। বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধ এবং বেলুচিস্তানের মুসলমানদের সম্মুখে একটি উজ্জল ভবিষ্যৎ রয়েছে। তারা আসন্ন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের শুভ দিনগুলোতে তাদের অবস্থা উন্নত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশসমূহ যেখানে হিন্দুদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এগুলো হলো ভারতের

ঐ সকল প্রদেশ যেখানে মুসলমানরা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক দাসত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। রাজপুতনা, মধ্য-ভারত, সাঁওতাল পরগনা এবং আরো কয়েকটি হিন্দু রাজ্যের মুসলিম সংখ্যালঘুরা আসন্ন শুদ্ধি অভিযান এবং সাংস্কৃতিক অবদমনের বিপদে রয়েছে। যদি মুসলমানরা তাদের প্রতি তৎপরতার সাথে দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে মুসলমানরা তাদের হারাবে।

বাংলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণসমূহ আলোচনা করেন, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহুরী কারিকুলাম সংরক্ষণ এবং শিক্ষানীতি বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজের মান নির্ণয়ের ব্যাপারে অসাধারণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মাধ্যমিক এবং ইন্টারমেডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিরোধিতা করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়কে অসামান্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

শতকরা ৫০ জন মুসলমান এবং শতকরা ৩০ জন তফশিলী হিন্দুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজে বা এর নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আদৌ কোন হাত নেই। কোনো শুদ্র ছাত্র এর কোনো হোস্টেলে ভর্তি হতে পারেনি। এটা হলো স্বার্থান্ধ সাংস্কৃতিক বক্রদৃষ্টির একটি উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। কারন বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো স্ব-নির্ধারিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং কার্যত শতকরা ১৫ জন বর্ণ হিন্দুরাও তাতে প্রতিনিধিত্ব করে না।

কায়েমী স্বার্থক

এ সুদীর্ঘ কালের গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের যুগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বহু দিনের কায়েমী স্বার্থের চক্রে পরিণত হয়েছে এবং এদের বাংলার শতকরা ৮৫ ভাগ জনতার সামাজিক জীবন, চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। বরং তা তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ও বিরোধী মনোভাব পোষণ করে আসছে। বাংলার মুসলমানেরা ন্যায়তঃ এ দাবী করছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন হওয়া, একটি বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি গঠন করা এবং একটি মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠন করা উচিত।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আরবী শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা এবং স্ত্রী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্বন্ধেও হক সাহেব আলোচনা করেন।"[৩৯]

সতেরো

"...The Animosity of the Hindus :

According to Naba Nur in 1903 : "This is the Hindu predominance there (in Calcutta University) which prevails even in the Faculties. As soon as the responsibility for the distribution of State scholarships fell into the hands of Hindus talented Muslim pupils were deprived from getting them." [Editorial comment, Naba Nur, 1st yr. 8th no., Agrahayan, 1310 B. S. (1903)]

And Al-Eslam in 1920 wrote : 'In class the Hindu teachers and pupils will address Muslims in such abusive terms as Mochla, Mleccha, Yavana, Nere, Mama and the comments given vent to by the teachers in the course of the class laughingly and with their faces screwed up like owls will almost invariably be tainted with anti-Muslim sentiment.' [M. Idrish, 'Kaifiyat,' Al-Eslam, 5th yr., 11th no. Falgun, 1326 B.S. (1920)]

---

[৩৯]. তথ্যসূত্র : বাঙলার জীবন্ত ইতিহাস : শেরে বাঙলা/সম্পা: আবু মাহমুদ। [এশিয়া পাবলিকেশন - ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ৬৬-৬৭/১৮৫-১৮৮/২৩০-২৩৩]

Islam-darsaan in 1924 pointed out : 'The Bengal Government spends from its revenue one crore thirty nine lacs of rupees on the spread of education...From the point of view of their percentage in the total population Muslims are entitled to at least seventy lacs of rupess out of that amount, but actually receive only thiry one lacs...Muslim students are virtually denied government Scholarships. Of the several lacs of rupees awarded in scholarships of various kinds Muslims received only ten thousand rupees ....This year Calcutta University had granted 121 Matriculate scholarships, Muslims have got only one of these worth Rs 15 ...What more shameful proof of unjust partiality could there be?' [Mohammad Abdul Hakim, 'Bharate Hindu Musalman sammasya', Islama-darsan, 4th yr., 3rd no.; Aswin, 1331. B. S. (1924)]

And Masik Mohammadi in 1930 commented : 'The Government has so far made no practical provision whatsoever for the rapid educational advance of the Muslim community. On the contrary, in most instances their doings have merely impeded Muslim progress ...The Government by the establishment of Islamia College provided to keep Muslims deprived of the higher standard of education available in general Colleges.' [Editor, 'Siksa o Muchalman.' Masik Mohammadi, 3rd yr., 12th no.; Aswin, 1337 B. S. (1930)]

Naba Nur's editor in 1903 said : 'Calcutta University - is virtually a Hindu University.' [Editorial comment, Naba Nur, 1st yr., 8th no. : Agrahayan, 1310 B. S. (1903)]

And Islam-darsaan in 1924 wrote: 'Calcutta University is the main centre of higher education for the whole of Bengal but Muslims are denied entrance there. Hindu graduates become members of the University and of the Senate and syndicate Committees, but old, tried Muslim graduates are not entitled to do so. The number of Muslim High School teachers, College lecturers and professors is negligible.' [Mohammad Abdul Hakim, op. cit.]

Saogat in 1928 commented : 'At the 9th of August session of the Bengal Legislative Council a bill to reform Calcutta University was introduced by Dr. Pramatha Nath Banerjee ...It makes no provision for Muslims ...Such representation is indispensable for the success of the University. ...respectable and dignified bodies like the Sadler Commission, the Post Graduate Council of the Calcutta University and the Dacca Intermediate Board have also pointed out the need for Muslim representation in the (Calcutta University) Senate.' [Editor, 'Kalikata bisvabidzalay sanskar ain,' Saogat, 6th yr, 2nd no.; Bhadra, 1335. B. S. (1928)]

Saogat that same year said again: "Not a single Muslim has occupied this post (of Vice-Chancellor) since Calcutta University was established ...It seems to be inconceivable that any Muslim could occupy the post ...Thus the other community has established a monopoly to it ...We believe that ...Sir Abdur Rahim, Sir Guznavi, Mr. A.K. Fazlul Haq, Maolvi Abdul Karim, Mr. A. F. Rahman could occupy the post and discharge its duties with competence. We hope that the Minister for Education will give the matter his consideration.' [Editor, 'Kalikata bisvabidyalayer bhais chyan selar,' Saogat, 6th yr., 1st no.; Sraban, 1335. B. S. (1928)]

Hinduised text books in schools and colleges :

According to some journals one of the defects of western education, stemming directly from the earlier Muslim indifference to it, was that the educational system had become Christian and Hindu oriented. [The Education Commission, 1882 referred Muslim objections to 'the use in Government schools of books whose tone was hostile or scornful towards the Muhammadan religion' - Report, p. 483. And in 1900 Abdul Karim pointed out that 'Muhammadan boys reading these Bengali books (in schools) imbibe unpalatable ideas with regard to their religion and nationality.' [Abdul Karim, Muhammadan Education in Bengal, 1900, pp. 44-46.]

For example, in 1903 Islam-pracharak cried, 'Who can stem the course of this western educational system introduced by an alien Christian Government into a land teeming with Hindus?' [Ebne Ma'az, 'Amder ki kara uchit,' Islam-pracharak, 5th yr., 11th-12th no.; Agrahayan-Paus, 1310 B. S. (1903)]

And the following year elucidated, 'those employed to administer our education, being members of different religious communities, compelled us to follow courses consonant with Christianity and Hinduism rather than devising for us courses consonant with Muslim scriptures.' Elsewhere the same article lamented, 'We were forced to learn parrot-fashion three languages, Bengali, English and Sanskrit, that were devoid of the least trace of Islamic religion.'

The difficulty was that in most educational institutions the text books were written by Hindus. In 1891 Islampracharak complained, 'Being misled by their education they (Muslim students) are becoming completely ignorant of their national religion ...(English education is) gradually anglicising (their) sensibilities ...How many of these boys and young men are acquainted with the life story of...Hazrat Mohammad?' [Editor, 'Suchana, Islam-Pracharak, 1st yr., 1st no.; Bhadra, 1298 B. S. (1891)]

Nur-al-Iman in 1900 similarly complained that 'There are no particular books included in the Pathsala-syllabuses to teach Muslim boys about their religion, etiquette, ethics and customs ...(they) are instructed by the educated Hinduised Muslims, who have been substituted for Hindu teachers ...(the texts) contain Hindu mythological stories ...(they are) exposed to the maligning of Muslims ...the reviling of Islamic codes of conduct, and smearing of the Muslim race with such names as Mleccha and Yavana." [Editor, 'Hemayet Eslam', Nur-al-Iman, 1st yr, 2nd no.; Sraban, 1307 B. S. (1900) See also chapters on Hindu-Muslim Relations and Literature.]

In 1909 Basana made the same complaint and added, "It is the duty of every Muslim to strive to get incorporated in our school curriculum the basic essentials published in simple Bengali about Muslim historical events, accounts of our heroes and heroines, tales about our Saints and dervishes, histories of the prophets, narratives about our religious men and women, the lives of rulers and kings and stories about the virtues of chaste women (sati ramani), the essence of the Islamic religion, the substance of Hadith and religious documents (dalil), the utility of prayer and fast and accounts of Muslim festivals...' [Mohammad Fakiruddin Sarkar, 'Chatra jibane neitik siksa,' Basana, 2nd vol., 2nd no.; J'aistha, 1316 B. S. (1909)]

Mohammad Shahidullah in 1916 made a similar complaint and then asked : 'What can be more shameful than that even in Maktabs and Muslim Girls schools our children have to read books by Hindus?' Commenting on school history books, he complained, 'these devote four pages to the life of Buddha and a mere half page to the life of Mohammad, yet not a single pupil in the class will be Buddhist, whereas half of them will be Muslims. School history text books generally conceal anything derogatory to the Hindu kings, yet loudly publicise Muslim defects whilst remaining virtually silent about their virtues. The consequence is that the study of Indian history leads children to conclude that the Muslims are a useless, untrustworthy, oppressive and cruel people which it would be in the world's interests to become extinct.' [Mohammad Shahidullah M. A. B. L., 'Amader sahityik daridrata,' Al-Eslam, 2nd yr, 2nd no.; Jyaistha, 1323 B. S. (1916)]

A similar point is again made in Al-Eslam in 1920 : 'The most of the text books in class will have been based on fantastic yarns from the Ramayana and the Mahabharata and quoted from writings of great anti-Muslim authors like Bankim.'

But probably the worst offence committed by a Hindu was that of Sri Bholanath Sen in writing his Prachin Kahini containing 'an imaginary picture of the Prophet of the world Hazrat Mohammad and Hazrat Jibrail (Gabriel).' Sariyate Eslam warned the Education authority to withdraw this book. Otherwise if ...fresh unrest and dissatisfaction ares up ...the responsibility for it will rest solely with the Education authority and the Government. [Editor, Bibidhaprasanga, Sarivate Eslam, 6th yr. 2nd no.; Falgun, 1337 B.S. (1931)]

Discontent with western, Hindu-oriented education resulted in two demands : one, a demand for reform, two, a demand for some other means of protecting the national religion of the Muslims."[৪০]

আঠারো

"...Calcutta University and Muslim Education :

The foundation of the Dacca University in 1920 and the opening of the Islamia College in Calcutta in 1926, besides the Muslim High Schools in Dacca and Chittagong, contribute largely to attract Muslim pupils in increased number to general scheme of English education in Secondary and high stages. The measures, however, did not solve the basic problems of Muslim education in Bengal. The Calcutta University, founded in 1857 which controlled the Secondary as collegiate education in Bengal, excepting the Dacca city, - virtually been developed 'into a Hindu temple of learning whose in uence steadily filtered through the several stages of instruction down to the Primary School.' The Muslim Education Advisory Committee of 1931, reviewing the policy adopted by the Calcutta University authorities towards Muslim education observed :

1. 'The University of Calcutta controls the working of Schools and Colleges, and as such it should look to the interests of classes and denominations. It is to be regretted that the question of Muslim education has not received as mach attention as it should have from the University of Calcutta. The main reason is the inadequated representation of Moslem on its controlling bodies and boards. This can not but be highly detrimental to the best interests of Moslem education in Bengal....'

3. 'The state of things in the Calcutta University is still worse. Since the creation of the University not a single Moslem gentleman, has been successful in being elected a fellow of the University, though some of the candidates were graduates of approved merit and ability. As the Hindu graduates control the voting by virtue of their number and seldom consent to record a vote in favour of Moslems in preference to non-Moslem candidates, the door of admission of Moslems to the University through election is closed to Moslem candidates. The only opening, therefore, for the qualified Moslem to get a seat in the University is through nomination by the Chancellor. It is really distressing to find that in spite of the fact that Government has repeatedly admitted the need of adequate Moslem representation in the University of Calcutta, the power of nomination has not been exercised in favour of the Musalmans to put in an adequate number of Moslem fellows in the University....'

5. 'We find that in the clerical staff of the University there is not a single Moslem, against some hundreds of Hindu employees. For some time past the University has been making their appointments in such a manner as to virtually shut out qualified Moslems to come in.

[৪০]. Mustafa Nurul Islam (Associate Professor of Bengali, JU)/Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali Press| [Bangla Academy - September, 1973| p. 174-176/178-181]

the most notorious example of which is the recent appointment of Registrar and Asst. Registrar without even advertising the posts. In the post-graduate Department, even though there is no dearth of qualified Moselms, no one is appointed except in the Departments of Arabic or Persian. In the administrative departments of the University, viz: the Senate and syndicate, Board of Examiners, the number of Muslems is very small.'

Prominent Moslems in their evidence observed 'Moslem interests are neglected by Calcutta University.' 'The interests of Muslem students of Calcutta University are not properly attended to' and 'the Muslim minority members of the Senate Can not take any active part in furthering the cause of Muslem education.' (M.E.A.C. Report, 1931, p. 67-69)

There was a dearth of High English School in Muslim areas. Inspite of this fact, a few such schools which were maintained and managed by the Muslim did not receive due consideration from the University authorities in the matter of recognition. The Schools recognised by the University showed 'a Callous disregard for Moslem sentiments in the selection of books, appointment of teachers, teaching of classical languages and the provision of School holidays, etc.'

Commenting upon the text books prescribed by the University, the Advisory Committee observed : 'There are Moslem writers of Bengali books of merit and ability, but still the Moslem works are not to be found as prescribed in the University curriculum. The text books in Bengali prescribed by the University are in some cases repugnant even revolting to Moslem sentiments. Text-books prescribed by the University are associated only with traditions, Hindu legends and Hindu philosophy. Some of the books sometimes misrepresent Islamic culture and civilisation.' (Ibid, p. 69-70).

'The Calcutta University, as already mentioned, selected as texts for their examinations some book which were "full of the foulest abuse of the Prophet of Islam.'

Condition in Dacca University : As regards the Dacca University, it was expected at the time of its foundation that the Muslim should have an effective voice in the management of this new University and on this ground, a section of people even nick-named it as the "Mecca University'. But unfortunately this expectation was also belied and the University could not contribute to the promotion of Islamic learning and research as has been expected. The Muslim Education Advisory Committee of 1931, commenting on the affairs of the Dacca University made the following observations :-

'The constitution of the Dacca University is so predominantly Hindu that the Moslems find it difficult, nay, impossible to hold their own against the Hindus. Cases have occurred where with equal qualifications a Hindu candidate has been choosen in preference to a Muslim'...(Ibid, p. 68). Even the Department of Islamic Studies of the University was then headed by a non-Muslim Professor and the Muslim Advisor Education Committee had to demand for appointment of Muslim as the Head of this Department. When this department was incorporated in the residential University of Dacca, it expected by the Muslims and the Calcutta University Commission also entertained a hope that this department will make valuable contribution to the promotion of higher studies research in the various fields of Islamic learning and culture. But this department also did not receive due consideration of the University authorities, and as a result this high hopes were never realized.'[৮১]

---

৮১. Dr. A. K. M. Ayyub Ali/History of Traditional Islamic Education] [Islamic Foundation - May, 1983] p. 98-100/102]

উনিশ

"...Bengal Provincial Conference (1913) :

The Bengal Provincial Conference sat this noon (Saturday the 22nd March 1913) at Dacca. The huge pandal which provided accommodation for 4,000 people is almost as big as the pandal of the last Calcutta Congress and was decorated most tastefully and beautifully. Flags with inscription of Bande Mataram were fixed to pots and the pandal was fitted up with electric installations. The main gate exhibited special art of Dacca and the whole way from the gate to the pandal was lined with ags. Outside the pandal there was a nice exhibition of Dacca arts. The number of delegates exceeded 400 and there was a large attendance of Bengali ladies. Long before the appointed hour crowds of visitors, Hindus and Mahomedians, ladies, and delegates began to pour in. By noon all available space in the pandal was filled up. The President Babu Aswinikumar Datta entered amidst shouts of 'Bande Mataram' followed by a procession consisting of the Chairman of the Reception Committee, Secretaries and prominent delegates and volunteers. Police officers were seen both inside and outside the pandal.

The proceedings opened with a suitable prayer said by Babu Bishnupada Chatterjee of Hughly. 'Bande Mataram' was sung in chorus when the whole audience except three Europeans kept standing. This was followed by another song beginning with the discourse of sweet music by Swadeshi dhulis.

Chairman's Speech : The Hon'ble Babu Anandachandra Ray, Chairman of the Reception Committee, in welcoming the delegates to the provincial conference On 22nd March, said -

...Dacca University Scheme : Brother delegates, I confess I do not exactly know what, besides welcoming you and beseeching you to put your shoulder to the wheel of progress and push on the car to its destined goal, are my duties as Chairman of the Reception Committee. I do not think, I can fore-shadow the subjects which should engage your whole attention. If I did so, I think that would be an act of supererogation on my part.

Moreover as Chairman of the Reception Committee, I would not enter into any controversial topics, but leave them for the consideration of the delegates. A passing reference to the Dacca University Scheme, is probably necessary, but unfortunately it has recently become a subject of keen controversy. Even the higher education of females, is a subject upon which I am indeed very sorry to say, there are many well-educated and well-meaning gentlemen who do not look with favour. Having been a member of the Committee which framed the Dacca University Scheme, which includes higher education for girls, and the education of the sons of Well-to-do persons who want education (not for seeking employment but for the purpose of improving themselves, their stock of knowledge and to be able to look after their own affairs), I cannot, under the circumstances discuss its details, except for the purpose of impressing upon you the fairness and desirability of the whole scheme.

These are some of the reasons why I did not wish to act as Chairman of the Reception Committee. I, therefore, beg your leave to remain quiet on the subjects of your deliberation at this stage.

...Resolution XXXIII (Dacca University)

That this Conference protests against the recommendations of the Dacca University Committee on the following amongst other points :-

a. Separate Art College and degrees for Mahomedans.

b. A College for well-to-do classes.

c. Separate representative of Mahomedan graduates on the convocation and the Council of the University.

d. Inadequacy of non-official element in the Convocation and its practical exclusion from the Council.

e. Want of fully-equipped Medical College.

f. Want of an Agricultural College.

g. Recommendation for changing the character of the Bengali language and literature.

h. The absence of any provision giving option to any private College to be affiliated to the Calcutta University.

i. The absence of any provision for religious and moral training of students.

j. The perpetuation of the distinction between Imperial and Provincial Educational Service in the appointment of University and College Professors and Lecturers.

k. Differential treatment of Mahomedan and Hindu boys in the matter of residence.

l. Differential treatment of the Anglo-Indians and Indians in the matter of admission Engineering College.

m. Want of uniformity in the tests for entrance into the University.

n. Placing the Eden Girls' School under the management of the College for Women and locating it in the premises of the Women's College, and also placing it under the Control of the Dacca University any more than boys' schools.

o. Making the University for all practical purposes, a department of State,

This Conference suggests that Islamic and Sanskritic studies be placed on the same footing among the optional subjects for the Intermediate and B. A. courses.

This Conference further urges upon the Government the necessity for guarding against the idea of a system of repressive discipline in the proposed University and insists that true discipline can only be maintained by promoting healthy association between teachers and pupils, by developing freedom in the students so as to help the growth of a healthy sense of self-respect and self-restraint and 'espiritde-corps'.

This Conference also protests against the Scheme of the Women's College as framed by the Committee and urges that the education of our girls be mainly under Indian management and be conducted on Indian lines and that a distinguished lady graduate be placed at the head of the institution."

Proposed by- Mr. Nareschandra Sengupta, M.A., M. T. Seconded by- Babu Trailokyanath Basu.[42]

বিশ

"... সম্ভবত: ১৮৫২ সালে, সুপরিচিত এক নর্তকীর এক অবৈধ সন্তান পরিচয় গোপন করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়, এবং এক বছর পরে তা প্রকাশ পায়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় বঙ্গসমাজ'-এর প্রথম সংস্করণে লিখেছেন,

৪২. Source : Bengal Provincial Conference (1913) : Dacca Session/Ed. Yatindrakumar Ghosh| [Adhyayan (Calcutta) - 1970| p. 115-117]

"...হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা সহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুলবুল একজ পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা সহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংযুক্ত হইয়াছি আমরা বালক কালে সহরে হীরার যে প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। (দে বাক্যটি তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জন করেন) হীরার ছেলেকে কলেজে ভর্তি করবার সময়েই গোলম দেখা দিয়াছিল।"

রক্ষণশীল সমাজ যথেষ্ট চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"...এতন্নগরের সর্ব্বত্র এমত জনরব হইয়াছে যে নেপালদেশীয় একটি বেশ্যানন্দন অধ্যয়নার্থ হি কালেজে নিযুক্ত হইয়াছে, কি আক্ষেপ। যবন ও খ্রীস্টান এই দোষ ছিল, এইক্ষণে বেশ্যাপুত্র আসি ত্রিদোষ প্রাপ্ত করাইল। আমাদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন "ড্রোজু সাহেবি" হেঙ্গামায় একবার হি কালেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল, এইক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় "মুসলমানি" "খ্রীস্টানি এবং "জারজী" এই ত্রিদোষ জন্য সেই লেখনীকে আবার কর সদনে নৃত্য করাইতে হইল। (সংব প্রভাকর : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩)।"[৪০]

একুশ

"...(নাটোর) মহকুমার কার্যভার গ্রহণ করার পর সরকারী কাজের বাইরে প্রথম যে কাজ করব ঠি করলাম তা হল মহকুমা শহরের সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। আছেই মাত্র তিনটি হাইস্কুল। একটি অতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে - জিন্নাহ স্কুল। দ্বিতীয়টি মহারাজা স্কুল এবং তৃতীয়টি বালিকা স্কু জিন্নাহ স্কুল কাছারির কাছেই। একদিন গেলাম সেখানে। প্রধান শিক্ষক বেশ মার্জিত শিক্ষাবিদ। স্কুলে পরিবেশ দেখে মনে হল শিক্ষকমন্ডলী দায়িত্ব-সচেতন।

পরদিন গেলাম মহারাজা স্কুলে। প্রধান শিক্ষক বেশ ভারিক্কি কিসিমের লোক, একটু যেন লা-পরো গোছের। ক্লাস রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ছেলেদের দু'একটা প্রশ্ন করলাম। খুব মামুলি ধরনের যে নাম কি, বাড়ী কোথায়, বাপ কি করেন? ইত্যাদি। দেখলাম শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র আরবী শিক্ষ মুসলমান, বাকী সবাই হিন্দু। সবিস্ময়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সামনের বেঞ্চ খালি থাকা সত্ত্বে সেখানে মুসলমান ছাত্রদের বসতে দেওয়া হয়নি। যে গুটিকয়েক মুসলমান ছাত্র স্কুলে আছে তাদের স্থা চতুর্থ ও পঞ্চম সারিতে। প্রতিটি ক্লাসে একই অবস্থা। দশম শ্রেণীতে প্রশ্ন করলাম, 'কায়েদে আজম কে প্রশ্নটা অবশ্য করেছিলাম প্রথমসারির ছাত্রকেই। কিন্তু সে নীরব রইল, জবাব দিতে পারল না। অবা হলাম। বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না যে আমি পাকিস্তানের সরেজমিনে একটা স্কুল পরিদর্শন করছি কিন্তু আমি জানতাম না তখনো যে আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। দশম শ্রেণীর একটা ছি ছেলেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। আরও কিছু প্রশ্ন করলাম, কিন্তু সবাই লা—জবাব। হেড মাস্টা সাহেবকে বললাম, 'কি ব্যাপার, আপনার ছেলেরা তো কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারছে না।' হে মাস্টার যা বললেন তা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'এ প্রশ্নগুলো সাথে তো আমিও পরিচিত নই'।

বৃথা সময় নষ্ট করতে চাইলাম না। ক্লাস রুম থেকে সরাসরি চলে এলাম শিক্ষকদের কমনরুমে। কয়েক বইয়ের আলমারী। আলমারীগুলোর মাথার উপর দেওয়ালে টাঙ্গান রয়েছে বেশ কতগুলো লাইফ-সাই রঙ্গীন ছবি। এতে ছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষ এবং মহারাজা। হেড মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কায়েদে আজমের ছবি কোথায়?' জবাব পেলাম, 'এটা আমাদের স্কুলে নেই

---

৪০. প্রসাদ সেনগুপ্ত/হিন্দু কালেজ ॥ [আনন্দ পাবলিশার্স (কলিকাতা) - সেপ্টেম্বর, ২০১৬। পৃ. ১১৮]

শুধু মাথাটায় নয়, সত্যি বলতে কি, সারা শরীরে উষ্ণ রক্ত বহু আগে থেকেই সঞ্চালিত হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। কিন্তু সর্বশেষ প্রশ্নের জবাব শুনে রক্তের সে গতি আরও বহু গুণ বেড়ে গেল। বুঝতে পারলাম আর এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। কি থেকে কি ঘটে যায় কে জানে! চলে এলাম। কিন্তু আসার সময় হেড মাস্টার সাহেবকে সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় বললাম, 'আমি পরশু আবার আপনার স্কুলে আসব। বাবায়ে কওমের অর্থাৎ আমাদের সবার বাবার ছবিটা এই রুমে দেখতে চাই এবং কাল থেকে কওমী ঝান্ডা সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের সাথে উত্তোলন করতে হবে।'

পরদিন আমাকে একটু অবাক করে দিয়েই মহারাজা স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব আমার বাংলোয় এলেন। কাল তাঁকে বলে এসেছিলাম যে, পরশু আমি তাঁর স্কুলে যাব। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে সেই দাওয়াত দিতে এসেছেন। তাঁর এই আচরণ আমার খুব ভাল লাগল। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে গেলাম। স্কুল মাঠে ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথমবারের মত জাতীয় পতাকা উড়ছে। আমাকে ছেলেরা অভ্যর্থনা করল 'ব্রতচারী' গান শুনিয়ে। শিক্ষক কমন রুমে এলাম। দেখলাম, কায়েদে আজমের ছোট্ট মানের ছবির ফ্রেমটা খুব উঁচুতে স্থাপন করে একটা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে এবং একটা রশি লাগিয়ে রুমালটা টানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাকে পর্দা উন্মোচন করার জন্য অনুরোধ করা হল। আমি রশি টানলাম। সবাই করতালিতে কামরাটা মুখর করে তুলল। ফ্রেমের মধ্যে ছবিটা পোস্ট কার্ড সাইজের।

এবার বক্তৃতার পালা। কিছু বলতে হবে। বললাম, 'যে গতিতে আপনারা অগ্রযাত্রা শুরু করেছেন, তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।' মনে হল তারাও খুব খুশী হয়েছে এসডিওকে খুশী দেখে। কিন্তু তারা এটা মোটেও আঁচ করতে পারেনি যে এই ব্যাটা এসডিও কাল আবার স্কুল বসার সময় সশরীরে এসে হাজির হবেন।

পরদিন সকাল ঠিক দশটায় গিয়ে মহারাজা স্কুলে উপস্থিত হলাম। স্কুলের ত্রিসীমানার কোথাও জাতীয় পতাকার নাম-নিশানা পাওয়া গেল না। এতে অবশ্য আমি অবাক হলাম না। শিক্ষকদের কমন রুমে গিয়ে ঢুকলাম। 'কায়েদে আজম' উধাও। এটাও অপ্রত্যাশিত ছিল না আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম হেড মাস্টার সাহেবকে, 'ছবিটা কোথায় গেল?' কোন উত্তর পেলাম না। কারো মুখে রা নেই। সবাই হতচকিত ও বিহবল হয়ে পড়েছেন। এরকম একটা ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে এটা যেন তারা কল্পনাও করতে পারেননি।

এই নীরবতা ভঙ্গ করে আমার এক নতুন আর্দালী এক পানের দোকানদারের হাত ধরে প্রায় টেনে-হেঁচড়ে আমার সামনে হাজির করল। 'ব্যাপার কি?' জানতে চাইলাম। সে যা বলল তা হল কাল যে ছবিটা এখানে টাঙ্গানো হয়েছিল সে ছবিটা এই ব্যাটা দোকানদার ওর দোকানে টাঙ্গিয়ে রেখেছে আজ। কত বড় সাহস! পান দোকানদার কাচুমাচু হয়ে যা বলল তা হল, এতে ওর কোন অপরাধ নেই। এই ছবিটার প্রকৃত মালিক সেই, স্কুল কর্তৃপক্ষ কাল কিছুক্ষণের জন্য এই ছবিটা তার কাছ থেকে ভাড়া করেছিল। কাজ শেষে কালই আবার তাঁরা ছবিটা তাকে ফেরত দিয়েছে। এমনভাবে এঁদের হাটে হাড়ী ভাংবে এঁরা ভাবতেও পারেন নি।

একজন শিক্ষক (হেডমাস্টার নন) বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলব।' আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নির্ভয়ে বলুন।' তিনি বললেন, 'স্যার, আপনি যা চাচ্ছেন তার সাথে যদি আমরা একমত না হই তবে কি আমরা বিনা ঝামেলায় পদত্যাগ করতে পারব?' জবাবে শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'নিশ্চয়ই পারবেন, খুশী মনে পারবেন। কোন ঝামেলাও হবে না।' এবার হেড মাস্টার মরিয়া হয়ে মুখ খুললেন, 'স্যার, এই স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট কলকাতাবাসী মহারাজা, এসডিও নন।' বললাম, 'সে আমি খুব ভাল করেই জানি। এসডিও হিসাবে আমি জানি আমাকে কি করতে হবে এবং আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন। হেড মাস্টার সাহেব আর কিছু বললেন না। আমি পায়চারি করতে করতে হেড মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ স্কুলটির এ্যাফিলিয়েশন কি কলকাতার সঙ্গে না ঢাকার সঙ্গে?' উত্তর পেলাম না। হেডমাস্টার সাহেবের চেহারা আরো গম্ভীর হল। হঠাৎ কাঁচের আলমারীর ভিতর একটা বইয়ের উপর নজর পড়ল। The Calcutta University Calendar 1956. বইটা দেখতে চাইলাম।

একজন শিক্ষক নীরবে বইটা আমার হাতে তুলে দিলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে কাঙ্খিত জায়গা পেয়ে গেলাম। নাটোর মহারাজা হাইস্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত। আগের বছর এই স্কুলের কত জন ছাত্র পাস করেছে তারো একটা হিসাব এতে আছে।

আমার মনে নানা ধরনের সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি দিলেও, সত্য বলতে কি, আমি এতটা ভাবতে পারিনি। ইট ইজ টু মাচ! এই স্কুল সম্পর্কে যা সিদ্ধান্ত নেবার তা নিয়ে ফেলেছি তৎক্ষণাত, নিজের অজান্তেই। চুপচাপ চলে এলাম নিজের বাংলোয়। সরকারী স্কুলের একজন অবসরপ্রাপ্ত হেড মাষ্টার নাটোরের কানাইখালিতে থাকতেন। তাঁকে রেক্টর নিয়োগ করে মহারাজা স্কুলে পাঠালাম পরদিন।

এদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহী থেকে আমার কাছে এক বার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি জানালেন যে, কলকাতায় বসবাসকারী মহারাজা প্রাদেশিক গভর্নর এ কে ফজলুল হক সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মহারাজা অভিযোগ করেছেন, এক ছোকরা এসডিও তার স্কুলটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং হক সাহেব যেন ত্বরিত ব্যবস্থা আনেন।

ঐ দিন বিকেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং নাটোরে তশরিফ আনলেন। সোজা নিয়ে গেলাম তাঁকে মহারাজা স্কুলে। শিক্ষকদের কাছে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম এই বলে যে, ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা এই যে, মহারাজা স্কুলের নব অগ্রযাত্রাকালে আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুদূর রাজশাহী থেকে আপনাদের আশীর্বাদ করার জন্য স্বয়ং হাজির হয়েছেন। আরও বললাম, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনাদের এই যাত্রা শুভ হবে, কামিয়াব হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মনে যাই থাক, তিনি তাঁর বক্তৃতায় আমার কথাগুলোরই পুনরুক্তি করলেন মাত্র।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর সদর দফতরে ফিরে গিয়ে মহারাজা স্কুল সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন জানি না। তবে সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি আমাকে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, এটা কি করে সম্ভব হল - যে স্কুলটি এই দেশে অবস্থিত, স্কুলের পাঠ্য বইগুলো এখানকার টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অথচ ছেলেরা পরীক্ষা দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস অনুসারে। তাঁকে এ তথ্যও দিয়েছিলাম, যে কটি মুসলমান ছেলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তারা হয় প্রাইভেট পরীক্ষা দেয় নতুবা পাশের দিঘাপতিয়া স্কুলের ছাত্র হিসাবে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ স্কুল থেকে যারা মেট্রিক পরীক্ষা দেয় তারা সবাই হিন্দু ছাত্র এবং পরীক্ষা দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস অনুসারে।

যা হোক, মহারাজা স্কুলের কীর্তিমান হেড মাস্টার এবং তাঁর চার জন সহকর্মী শিক্ষক হঠাৎ এক দিন লাপাত্তা হয়ে গেলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, তাঁরা সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে তাঁরা স্বেচ্ছা কৌমার্য পালন করে আসছিলেন বহু বছর যাবত।

সুখের কথা যে, নাটোর মহারাজা স্কুল তার নবযাত্রা সফলতার সাথে সম্পন্ন করল। এদিকে এসডিও 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যায় ভূষিত হলেন। এই সম্মানসূচক ভূষণ আনুষ্ঠানিকভাবে হাসিমুখে গ্রহণ করলাম স্কুলে প্রথম বারের মত একটা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। এ মাহফিলে সানন্দে ঘোষণা করলাম যে, নিজেকে একজন মুসলমানের সন্তান বলে পরিচয় দিতে আমি নিঃসন্দেহে গর্ব বোধ করি।"[৪৪]

বাইশ

"...Most of the students at the Presidency College were the best and the brightest having secured the top positions in the intermediate examinations and the overwhelming proportion of them was Hindus. There were a very few Muslim students in my

৪৪. পি এ নাজির/স্মৃতির পাতা থেকে ‖ [নতুন সফর প্রকাশনী - জুলাই, ১৯৯৩। পৃ. ১২-১৫]

Economics BA Honors class- not more than eight in a class of 35 or so. Among the Muslim students, there were Musharraf Hossain, Moazzemul Huq, Mafizur Rahman,and Rafique ur Rahman Bhuyian. All of them later on joined me in the Master's degree (MA) final year at Dhaka University. Many years later, Musharraf Hossain was my colleague at the Bangladesh Planning Commission; Moazzemul Huq preceded me to Harvard and settled in the United States. Rafique ur Rahman was an advocate in the Supreme Court.

Similarly, there were only two Muslim professors - one for English named Ahmad Ali and the other for mathematics, Suleiman Kerara. They were both from the province of the Punjab and trained at Oxford Cambridge University receptively.

When I encountered my fellow Hindu students at the college, their introductory questions to me were all related to the aggregate marks that I had obtained in the IA examination. My expectation was that they would engage in pleasantries asking me about home town, my family, the college where I studied, etc. But quite surprisingly their enquiry was directed elsewhere, which I found to be strange. They all knew that my aggregate marks were much higher than those of the second highest student, who was of course a Hindu, in the list of scholars. This was for them a very strange experience for two main reasons. The first reason was that usually a very few Muslim students secured a place among the top ten of the successful candidates; and the other, and more surprising to them, was that the aggregate marks obtained by me were much higher than those obtained by the student who stood second.

They could scarcely believe that a Muslim student from nowhere - i.e., the Chittagong College in the periphery of the intellectual life of Bengal - could perform so well. I must say after some weeks a few of the brighter students among them started to befriend me and decided that after all I might not have been very undeserving. In fact, a few of them thought that I might be accepted in their select company. One of my Hindu fellow studens, who was a Brahmin by the name of Sukumar - son of a well-known Bengali writer, Suniti Kumar Chatterji - became my close friend and decided to invite me to his home for tea. The family was prosperous, home was spacious and food was sumptuous. Everything went on well until next week when my friend was absent from his class for a few days.

On the day he returned to his classes, his head was clean shaven and he had a traditional chador and dhoti on, He looked very pensive and I was rather worried and asked him what happened. He confessed that after I had left his house, his grandmother found out that he had brought a Muslim friend to home for tea. In his grandmother's view, what he did was a serious breach of the conservative Hindu Brahmin code of conduct by allowing his Muslim friend to partake of food in the house. Accordingly, her grandson had to go through the process of penance and purification which explained his shaven head and special dress. Moreover, in the process of purification, all the utensils that were used or touched by me were thrown away. At this distance of time, it may appear strange but this incident does provide a small window to the pre-1947 Hindu-Muslim social relations."[৪৫]

৪৫. Nurul Islam/An Odyssey : The Journey of My Life || [Prothoma Prokashan - 2017| p. 24-26]

সাম্প্রদায়িকতা : নগর জীবনে

এক

"...ইসলামপুর এলাকায় অবস্থিত আমাদের হোস্টেল থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে আমাদের কলেজে যেতে আমরা সাধারণতঃ পটুয়াটুলী, সদরঘাট হয়ে যেতাম। এর চাইতে সংক্ষিপ্ততর পথ অবশ্য একটা ছিল শাঁখারী পট্টি হয়ে। কিন্তু ঢাকার পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ থাকতো, তখনও সে পথ দিয়ে মুসলমানরা সাধারণতঃ যেতে সাহস করত না। শাঁখারী পট্টি ছিল দুর্ধর্ষ হিন্দুদের দূর্গের মত। ফলে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ দু'বছরে দু'চার দিনের বেশি সে পথে কলেজে যেতে সাহস হয়নি আমাদের।

সাতচল্লিশ সালের আগে ঢাকা শহরে দু'একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দেখেছি। পাঁচচল্লিশের আগেও মাঝে মধ্যে ঢাকায় দাঙ্গা হত বলে শুনেছি। বিশেষতঃ হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ঢাকায় এলে তার পরের দিন ঢাকায় সাধারণতঃ রায়ট লাগতই। রায়ট লাগলে ঢাকা শহরের মানচিত্র এক নতুন রূপ ধারণ করত। তখন সারা ঢাকা শহর ছোট-বড় অসংখ্য হিন্দু ও মুসলিম অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ত। হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের এবং মুসলমান এলাকায় হিন্দুদের চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। শাঁখারী পট্টী আর ইসলামপুর এলাকার সংযোগস্থলে একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। শাঁখারীপট্টি, তাঁতীবাজার, পটুয়াটুলী, সদরঘাট, শ্যামবাজার, ফরাসগঞ্জ, বাংলাবাজার, লক্ষীবাজার, সূত্রাপুর, নবাবপুর, ঠাঁটারীবাজার, ওয়ারী এসব এলাকা ছিল হিন্দু এলাকা। পক্ষান্তরে শাঁখারী পট্টির সামনের পুলিশ ফাঁড়ি ও কোতোয়ালী থানা থেকে শুরু করে আহসান মঞ্জিলসহ সমগ্র ইসলামপুর, আশেক লেন, জিন্দাবাহার, বাবুবাজার, আরমানিটোলা, নয়াবাজার, মালিটোলা, বংশাল, নাজিরাবাজার, আগাসাদেক রোড, আগামসিহ লেন, কায়েতটুলী, নওয়াব কাটরা, হোসেনী দালান, নাজিমুদ্দিন রোড, বকশীবাজার, বেগম বাজার, মৌলভীবাজার, চকবাজার, লালবাগ প্রভৃতি এলাকা ছিল মুসলিম এলাকা। মাঝে মাঝে পকেট যে ছিল ছিল না, তা নয়। যেমন মিটফোর্ড এলাকা ছিল মুসলিম বেষ্টিত একটি হিন্দু এলাকা। আবার রায়সাহেব বাজার, রোকনপুর, কলতাবাজার এলাকা ছিল হিন্দু পরিবেষ্টিত একটি মুসলিম এলাকা।

আমাদের কলেজের একদিকে হিন্দু প্রধান লক্ষীবাজার, সদরঘাট ও শাঁখারী পট্টি, অপরদিকে একমাত্র মুসলিম প্রধান এলাকা ছিল রায় সাহেব বাজার, কলতাবাজার, রোকনপুর এলাকা। রায়ট শুরু হলে ইসলামপুর থেকে কলেজে যেতে শাঁখারীপট্টির সংক্ষিপ্ত রাস্তার কথা তো মনেই উঠত না, এমনকি পটুয়াটুলী, সদরঘাট হয়ে কলেজে যাওয়ার কথাও কল্পনা করতে পারতাম না। তখন আমরা লায়ন সিনেমা সংলগ্ন আশেক লেন হয়ে নয়াবাজার ঘুরে ইংলিশ রোডের একাংশ দিয়ে নয়াবাজার, মালিটোলা, কলতাবাজারের সংযোগকারী একটা জঙ্গলঘেরা ডোবার পাশ দিয়ে অতি কষ্টে কলেজে যাতায়াত করতাম। তখন এই ডোবায় কলাগাছ, বনজঙ্গল কেটে অস্থায়ী সংযোগ পথ তৈরী করা হত। এপথ অবশ্য আমরা খুবই ভয়ে ভয়ে অতিক্রম করতাম। কারণ এ পথটি তাঁতীবাজারের হিন্দু দাঙ্গাবাজদের নাগালের মধ্যে অবস্থিত ছিল। আর রায়টের ব্যাপারে কলতাবাজারের মুসলমানদের মত তাঁতীবাজারের হিন্দু দাঙ্গাবাজদেরও একটা খ্যাতি ছিল।

তবে ঢাকার রায়টের ব্যাপারে একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। মুসলমানদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত, গরিব তারাই সাধারণত রায়টে অংশ নিত। মুসলমানদের শিক্ষিত খুব কম লোকই দাঙ্গায় অংশ নিত। কিন্তু হিন্দুদের বেলায় দেখা যেত, হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা রায়টে প্রত্যক্ষ অংশ নিত। একবার তাঁতীবাজার এলাকায় রায়ট শুরু হয়েছে শুনে আমরা কয়েক বন্ধু প্যারাডাইস হোস্টেল থেকে আশেক লেন হয়ে নয়াবাজারের কাছে গিয়েছিলাম রায়ট সম্পর্কে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে। দেখলাম তাঁতীবাজারের দোতলা, তেতলা দালানের ছাদ থেকে ধুতি শার্ট পরা বহু হিন্দু ভদ্রলোক বন্দুক হাতে একশনে রয়েছে। পক্ষান্তরে সিরাজউদ্দৌলা পার্কের দিক থেকে আদুল গায়ে লুঙ্গি পরা গরিব মুসলমানরা তাদের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যাচ্ছে ইট-পাটকেল সম্বল করে। আর ইট-পাটকেল ভেঙে ঝাঁকা ভরে যারা জোগান দিচ্ছে তারাও তাদেরই মত গরিব ঢাকাইয়া মেয়েরা। আমরা শার্ট-পাজামা পরে

ভিড় করে এই দৃশ্য দেখছি, দেখে ইট-পাটকেল যোগানরত কয়েকটি ঢাকাইয়া মেয়ে আমাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগল 'জঙ্গে' আমরা অংশ নিচ্ছি না বলে। আরও অপদস্থ হবার ভয়ে আমরা সেখান থেকে সরে এলাম।

রায়ট খুব সিরিয়াস পর্যায় চলে গেলে আমরা নয়াবাজার, মালিটোলা, কলতাবাজার হয়েও কলেজে যেতে পারতাম না। তখন আহসান উল্লাহ রোডের মাথায় ইসলামপুর রোডের একটা চায়ের দোকানে সারা দিন আড্ডা দেওয়া ছাড়া আমাদের কাজ থাকত না। এসব দোকানে দেশের খবরাখবরসহ শহরের দাঙ্গা পরিস্থিতির সর্বশেষ টাটকা খবর পাওয়া যেত।"[৪৬]

দুই

"...বেলডাঙ্গা, পলাশীপাড়া, নদীয়ার আরও কোন কোন গ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দাঙ্গার অভাবে উত্তেজনার সংবাদ এমনভাবে কলিকাতার হিন্দু সংবাদপত্রে দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতে থাকিল, যাহা পাঠ করিলে মনে হইত এ সকল স্থানে একটি হিন্দুও আর অবশিষ্ট নাই। কথায় কথা বাড়ে। নায়ক সম্পাদক শ্রী পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় খুব রসিক লোক ছিলেন। প্রথম মহাসমরের প্রথম সংঘর্ষের দিন হইতে অস্ত্র সমর্পনের দিন পর্যন্ত চারি বৎসরে রয়টার পরিবেশিত নিহত জার্মানদের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখান, জার্মানীর মোট লোক সংখ্যা যাহা ছিল, উহার চেয়ে অনেক অধিক জার্মান যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। সুতরাং তিনি মিত্রশক্তির নিকট জানিতে চাহেন, তাহারা কাহার সহিত সন্ধি করিতে যাইতেছেন? ইহার কোন সদুত্তর ছিল না, তেমনি ছিল না শত শত হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকসহ শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপদ্রুত এলাকায় গমনের। তাহারই কাগজের এক কলামে যাহা লিখিত হইত, অন্য কলামে স্থান পাইত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা।

কথার সহিত বাস্তবের সঙ্গতি না থাক, ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রচারনাকে করা হইল হিন্দুদের ইজ্জতের প্রশ্ন - বাঁচা মরার প্রশ্ন। সারা হিন্দু বাঙলা ভাঙ্গিয়া পড়িল বেলডাঙ্গায়। হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের সেবার স্পর্শে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল মুসলমানদের ঘর বাড়ি। তারপর আবির্ভুত হইল দলে দলে হিন্দু পুলিশ। দূর্গত মুসলমানদের মালমাত্তা আগেভাগে দাঙ্গাবাজদের কবলিত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের জানের হেফাজতের ভার লইল পুলিশ বাহিনী। দোষী নির্দোষের বাছাই হইল না। গ্রামতদ্ধ মুসলমানকে তাহারা পুরিল জেল হাজতে। দাঙ্গা, নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানি প্রভৃতি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বাছা বাছা ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইল তাহারা। ক্ষেতের ফসল যাহারা ঘরে তুলিতে পারে নাই, ঘরে যাহা ছিল উহার সবটাই যাহাদের হইয়াছিল লুণ্ঠিত তাহাদের জন্য খরচ জোগায় কে? সেই ঘোর দূর্দিনে কাহার অথবা কাহাদের নামে সাহায্যের আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল তাহা আর এখন আমার মনে পড়িতেছে না। তবে আমরাও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। আমার মনে পড়ে, জনাব এ. কে. ফজলুল হক, জনাব স্যার আজিজুল হক, জনাব সামসুদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুর ইসমাইল প্রমুখ কতিপয় উকিল এবং কয়েকজন মোক্তার দায়রা আদালতে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বেলডাঙ্গার কোন মুসলমানই জেলখানার বাহিরে থাকিতে পারিত না।"[৪৭]

তিন

"...দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হয় ঢাকা শহরে। কাচারির বিপরীত দিকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের বিরাট প্রাঙ্গণ। সেখানে বিশাল চন্দ্রাতপের নিচে নিখিল বাংলীয় অথবা নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হচ্ছে। খুব সম্ভব ১৯২৮ সালের অথবা ১৯২৯ সালের প্রথম দিককার কথা - ঠিক মনে করতে পারছি না।

---

[৪৬]. আবদুল গফুর/আমার কালের কথা। [বিসিবিএস - ফেব্রুয়ারি, ২০০০। পৃ. ১৩৩-১৩৫]

[৪৭]. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ/যুগ বিচিত্রা। [মাওলা ব্রাদার্স - আগস্ট, ১৯৬৭। পৃ. ২৮৫-২৮৬]

সম্মেলন উপলক্ষে শহরে জোর প্রচার চলছিল। পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু তরুণ-তরুণীদের ব্যায়াম কুস্তির আখড়া। সেগুলোতে লাঠি খেলা শেখানো হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে লাগে অবস্থা। স্মরণীয় যে, ঢাকা শহর ইতিপূর্বেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রচারপত্র এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের গেটে ঝুলন্ত ব্যানারে দেখলাম, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর মুঞ্জে এবং এন. সি. কেলকার সভায় বক্তৃতা দেবেন। সম্মেলনে বিধর্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বেনজীর সাহেব (কবি বেনজীর আহমদ) সর্বক্ষণ ধুতি শার্ট পরতেন। আমাকে বললেন, ধুতি শার্ট পরে চলুন, ওরা কি বলে শুনে আসি। আমি মাদ্রাসার ছাত্র, ধুতি ছিল না। বাবা নিজে সাদা তহবন, সাদা পাঞ্জাবি এবং সাদা টুপি পরতেন, আমাদের ধুতি কিনে দিতেন না: ঢাকা কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে আমি প্রথম ধুতি ক্রয় করি। এক বন্ধুর কাছ থেকে ধুতি জোগাড় করলাম। বিকেলে দু'জনে গেলাম সভায়। ডক্টর মুঞ্জে এবং এন. সি. কেলকার উভয়েই উগ্র-সাম্প্রদায়িকতাবাদী বক্তৃতা করলেন। দু'জনের মধ্যে কোন জন, আজ এতকাল পরে ঠিক মনে করতে পারছি না: কিন্তু দুজনেরই একজন বলেছিলেন যে, মুসলমানরা যদি এ দেশে থাকতে চায়, তাহলে হিন্দু জাতির সঙ্গে লীন হয়ে থাকতে হবে নতুবা সাতশ' বছর বস-বাসের পর মুসলমানরা স্পেন হতে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছিল আমরাও তাদেরকে সেভাবেই আরব সাগর পার করে দেবো। তখন পাঞ্জাবে জোর শুদ্ধি আন্দোলন চলছিল। স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন আর্যসমাজ ও শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা। দয়ানন্দের মৃত্যুর পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সেই আন্দোলনের নেতা হন। ১৯২৬ সালে আবদুর রশীদ নামক এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার দারুণ অবনতি ঘটে। ঢাকা এবং কলকাতায় দাঙ্গা হয়। বলা বাহুল্য, ঐ বক্তৃতা শুনে বেনজীর সাহেব এবং আমি খুবই ক্ষুব্ধ হই। আমরা সভা শেষ হওয়ার আগেই করোনেশন পার্কের (বাহাদুর শাহ পার্ক) কাছে পৌছে দেখি আতঙ্কগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে গিয়েছিল কিনা আজ আর তা মনে করতে পারছি না।"[৪৮]

চার

"...মোহনদার পুরো নাম ক্যাপ্টেন পি. কে. সেনগুপ্ত। তিনি শল্য চিকিৎসক। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের সবাই ওকে দেখাত। সদাপ্রফুল্ল, অমায়িক ও সর্বজনপ্রিয়। ১৯৪৬-এর আগস্টের দাঙ্গায়ও তিনি এ অঞ্চল ছেড়ে যাননি। কিন্তু সুযোগ বুঝে জনাতিনেক আততায়ী বোরকা পরে তাকে রোগী দেখাবার নাম করে গুলি করে হত্যা করে। তিনি বিয়ে করেননি বলেই জানতাম। পরে তদন্তে বের হয় ঐ তিনজনই হিন্দু এবং কোন ব্যক্তিগত গোপনীয় কারণে দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে খুন করে। এরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল ধর্মতলায় ওয়াছেল মোল্লা ম্যানসনে। হরেন ঘোষ সম্ভবত প্রথম ভারতীয় ইমপ্রেশারিও। ১৯২৮-২৯ সালে জগদ্বিখ্যাত ব্যালে নর্তকী আনা পাভলোভাকে কলকাতায় এনেছিলেন। সেবার সঙ্গে ছিলেন উদয়শঙ্কর। এর দলকেও এনেছিলেন। বাবার বদান্যতায় আনা পাভালোভার 'সোয়ান লেক' দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রায় চার দশক পরে মস্কোতে বলশয় থিয়েটারে ব্যালে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কলকাতার দাঙ্গার সময় হরেন ঘোষকে মুসলমান সেজে এক আততায়ী হত্যা করে।"[৪৯]

পাঁচ

"...মুসলিম লীগেও ইতিমধ্যে ভয়ানক অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কোথাও মুসলমানরা পুলিশ সাহায্যপুষ্ট হিন্দুদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অহিংসাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যে আস্থাবান কংগ্রেসী নেতাদের কেহ কেহ এসকল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উস্কানি দিতে থাকায়, মুসলমান জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস অত্যন্ত ঘৃণার স্থল হইয়া উঠে।

---

৪৮. আবু জাফর শামসুদ্দীন/মুসলিম সমাজের ঝড়োপাখি বেনজীর আহমদ। [মুক্তধারা - ১৯৮৮। পৃ. ২২-২৩]

৪৯. আকবর কবির/আত্মকথা : স্মৃতি-বিস্মৃতির বাংলাদেশ। [পাঠক সমাবেশ - জানুয়ারি, ২০১০। পৃ. ৮৯]

আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে মুসলমানেরা একদা দিল্লীর জুমা মসজিদের ইমামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান হইতে বক্তৃতা করিতে দিয়া উদারতার পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সেই উদারতার কথা ভুলিয়া গিয়া কোন এক অদৃশ্য হস্তের অশুভ ইঙ্গিতে তিনি হঠাৎ আজরাইলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। লাহোর জেলে উক্ত প্রদেশের একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর সহিত তাহার গোপন সাক্ষাৎকারের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই কারাগার হইতে তাহার মুক্তিলাভ হয় এবং দিল্লী পৌঁছিয়াই তিনি মুসলমানদিগকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্পের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। এই নতুন প্রচেষ্টার 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামকরণ করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানদিগকে এক অপবিত্র জাতির পর্যায়ে ঠেলিয়া দিবার যে অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিলেন তাহা ভারতীয় মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত দেয়। গুরগাঁও, আলোয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে নানা প্রলোভন এবং হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইতে থাকে। ধর্মান্তকরণের পূর্বে মুসলমানদিগকে গোবরের পানি খাইতে ও উহাতে অবগাহন করিতে বলা হইত। বল-প্রয়োগক্রমে এরূপে অল্পদিনের মধ্যে বহু সহস্র নিরক্ষর মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

হিন্দু কিংবা মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বৃটিশ সরকারের কোনকালেও কোন আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং তাহারা ইচ্ছা করিলেই জনসাধারনের স্বার্থের খাতিরে এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিতেন। কিন্তু উহারা এ ব্যাপারে নীরব ও নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া রহিলেন। অবশেষে আবদুর রশীদ নামক জনৈক মুসলমান যুবক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। বিচারে তাহার ফাঁসি হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় হাজার হাজার লোকের ন্যায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দও অবগাহন করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সাময়িক। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনিই বিনাকারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কংগ্রেস মহলেও তাহার কার্যককলাপ সম্পর্কে নানা জল্পনাকল্পনা চলিয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশন ছিল সেসময় কংগ্রেসীদের করতলগত। এই সন্দেহভাজন ব্যক্তির প্রতি করপোরেশনের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ কংগ্রেসী কাউন্সিলরগণ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নামবাহী মির্জাপুর পার্কের নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক রাখেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গদীচ্যুতির পর এই পার্কের নিকটে অবস্থিত একটি দ্বিতল বাড়ি মীর জাফরকে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল।"[৫০]

সাম্প্রদায়িকতা : মফস্বলে

এক

"...বরিশালে চারু রায় নামে এক উকিল ছিলেন, তার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে পানাউল্লাহ সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আফতাবুদ্দীন সাহেব, জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর তাদের ভাড়াটিয়া বাসায় বাস করতেন। পানাউল্লাহ সাহেবের এক শ্যালক মহীউদ্দীনের সঙ্গে চারু বাবুর মেয়ে শোভনা রায়ের বন্ধুত্ব ও পরে প্রেম হয়। শোভনার লেখা অনেক চিঠি মহীউদ্দীন আমাকে পড়ে শোনাতেন - শোভনার বিশেষ অনুরোধেই মহীউদ্দীন একদিন শোভনাকে নিয়ে বরিশাল থেকে পালিয়ে যায়। চারু বাবু এ ব্যাপারটা চেপে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খবরটা কলকাতা পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু খবরের কাগজে এক তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। প্রায় তিন মাস পরে ওরা দুজনেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং বরিশাল কোর্টে তাদের বিচার আরম্ভ হয়। মহীউদ্দীনের পক্ষ সমর্থন করেন বরিশালের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ফৌজদারী উকিল জনাব হাশেম আলী খান (পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের মন্ত্রী)। কলকাতা আক্রাম খানের প্রেস হতে শোভনার

---

৫০. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ/আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ১৯৬৭। পৃ. ২২৬-২২৮]

যে সকল চিঠি কোর্টে প্রমাণ করা হয়েছিল 'একজিবিট' হিসেবে তা 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। কারণ এ ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। মহীউদ্দীনের অবশ্য সাজা হয়ে যায়, কারণ ডাক্তারের সাক্ষীতে বলা হয়েছিল যে শোভনা তখনো সাবালিকা হয়নি– তবে অপরাধের জন্য যতটা নয় তার চেয়ে বেশি বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার জন্য। যাহা ১৯২৬ সন থেকেই ধীরে ধীরে মফস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

...মসজিদের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে জোর করে বাদ্য বাজিয়ে মিছিল করার জন্য হিন্দুদের জেদ ও মুসলমানদের হিন্দুরা দেখতে পায় এমনি স্থানে গরু জবাই - এ নিয়ে বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধতে লাগল। সবচেয়ে বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে ১৯২৭ সলে কুলকাঠিতে - সেখানে পোনাবালিয়ার মসজিদের সম্মুখে। বরিশালের বিখ্যাত হিন্দু নেতা সতীন সেনের (পরবর্তীকালে বরিশাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট) নেতৃত্বে এমনি একটি মিছিল নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে পৌছালে মুসলমানেরা বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ পরিস্থিতির কথা পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিল। উপরে খবর দেবার ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই. এন. ব্লান্ডি, পুলিশ সুপার টেইলর, ভূতনাথ দারোগা (তখন সে ইন্সপেক্টর হিসাবে প্রমোশন পেয়েছে) সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানরা বাদ্য বাজিয়ে মিছিল যেতে অস্বীকার করলে - ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং তাদের পথ থেকে সরে যেতে বলে - কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না - তখন গুলি চালানোর জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেয়, যার ফলে সতের জন মুসলমান ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। তাছাড়া মসজিদের মধ্যে যারা ছিল তারাও অনেকে আহত হন, এর ফলে বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর কিছুকাল আগে পটুয়াখালীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল হালিম চৌধুরীকে মসজিদ থেকে সকালে নামাজ পড়ে বেরুবার সময় সতীন সেন নিজে লোহার রড দ্বারা আঘাত করেন- আঘাত মাথায় না লেগে তার ডান কানে লাগে এবং তিনি ভূমিতে পরে যান, পরবর্তীকালে হালিম চৌধুরীর সন্তানরা - কবির চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী ও নাদেরা বেগম- সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় আস্থা রেখেছেন। মুনীর চৌধুরী ১৯৭১ সনে বদর বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।"[৫১]

দুই

"...সে সময়ের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। কুড়িগ্রামের মহিউদ্দীন এবং শোভনা নাম্নী এক হিন্দু কিশোরীর প্রেমঘটিত ব্যাপার খবরের কাগজ এবং মামলার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ...মহিউদ্দীন ও শোভনা পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল। প্রেম কোনোদিন ধর্মাধর্ম মানেনি। তবু এ ঘটনা সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। মামলার বৃত্তান্ত ফলাও করে প্রকাশিত হতে থাকে সংবাদপত্রে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমাবাসী মাহফুজুর রহমানের নর্থবেঙ্গল পাব্লিশিং হাউজ নামে কুড়িগ্রামে একটি বইয়ের দোকান ছিল। মহিউদ্দীন ছিল তার বন্ধু। মাহফুজুর রহমান মহী-শোভনার প্রেমপত্রাবলি বই আকারে প্রকাশ করে রাতারাতি 'সাহিত্য খ্যাতি' অর্জন করেন। আশরাফ আলী খাঁর কামরায় তিনিও মাঝে মধ্যে আসতেন। তৎকালে সচিত্র প্রেমপত্রের বইও বাজারে যথেষ্ট ছিল। এসব বইয়ের বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হতো। পত্রিকায় অল্পশিক্ষিত তরুণরা সেগুলো দেখে প্রেমিকা বা স্ত্রীর কাছে পত্র লিখতো। 'মহী-শোভনা' বইটি ছিল বাস্তব প্রেমপত্রের সঙ্কলন। তাই এটির একাধিক সংস্করণ হয়েছিল। মাহফুজুর রহমান এ সুযোগে বেশ দু'পয়সা করে নিলেন।"[৫২]

---

[৫১]. কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ। [ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন - ২০০৬। পৃ. ৫৮-৫৯]

[৫২]. আবু জাফর শামসুদ্দীন/সাহিত্য প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০০৫। পৃ. ১১৯]

তিন

"...একদিনের কথা এখনও মনে আছে। বরিশালের কুলকাঠিতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয় ইং ১৯২৭ সালে। ঘটনাস্থল ছিল কুলকাঠির অন্তর্গত পোনাবালিয়া। ই. এন. ব্ল্যান্ডি ছিলেন তখন বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সতীন সেন নামক একজন হিন্দু নেতা ছিলেন ব্ল্যান্ডির পরামর্শদাতা। তার পরামর্শ মত হিন্দুদের হুকুম দেওয়া হল মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়ার। মুসলমানেরা বাধা দেয়। পুলিশও মুসলমানদের উপর গুলী চালায়। ফলে মসজিদের ভিতরেই সতেরজন এবং পরে হাসপাতালে আরো ৭ অথবা ৮ জন মৃত্যুবরণ করে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলল দারুণ উত্তেজনা। 'দি মুসলমান' তখন সপ্তাহে তিনদিন বের হয়। তবুও এর প্রভাব ইংরেজ শাসক এবং উপরতলার নেতৃত্বের উপর অত্যধিক। আমার উপর যেন স্বাভাবিকভাবেই পড়ল গুরুদায়িত্ব। দেখলাম জনাব ফজলুল হককে কেন্দ্র করে অনেক মুসলমান নেতার তৎপরতা। বরিশাল থেকে এলেন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, জনাব আজীজ উদ্দীন আহমদ এবং আরো অনেক মাঝারী ও ছোটো নেতা। আমি এদের পিছনে ঘুর ঘুর করছি পুরো ঘটনাটা জানবার জন্য। মনে হচ্ছিল, সরকারের অনুগৃহীত বলে ওরা যেন ইংরেজদের দোষটাও হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাতে ব্যস্ত। আসলে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও হিন্দু নেতারা সমান ভাবেই দোষী। কিন্তু মুসলিম নেতারা আমায় বিশেষ আমল দিতেই চান না। তারা হক সাহেব, গজনবী সাহেব ও মজীবুর রহমান সাহেবের কাছে ঘোরাঘুরি করেন। দেখলাম, সরকারের নিকট তারা স্মারকলিপি পেশ করার পায়তারা করছেন। জোঁকের মত তাদের পিছনে লেগে থেকে নানাজনের কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে সোজা বরিশাল রওনা হয়ে গেলাম।

ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সকল বৃত্তান্ত শুনে এমন এক রিপোর্ট তৈরী করলাম, যাকে নিরপেক্ষ ও নির্ভুল তথ্য বলা চলে। এই রিপোর্ট ও সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করার ফলে হিন্দু ও ইংরেজ সরকার মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির যুদ্ধ। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ধুমায়িত হতে লাগল। ইংরেজ শাসকরা তথাকথিত শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বেকায়দায় পড়লো। ফলে লালবাজার পুলিশ সদর দফতর থেকে জরুরী তলব এল 'অবিলম্বে দেখা কর'।

ব্যাপারটা বুঝতে বাকী থাকলো না। যথা সময়ে লালবাজার পুলিশ সদর দফতরে হাজির হলেম। তখন কমিশনার ছিলেন স্যার চার্লস টেগার্ট। আমায় দেখে ইনি হুঙ্কার ছেড়ে উঠলেন : 'জানো, তোমরা রাজদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পার। পুলিশ গুলী চালিয়েছে শান্তি রক্ষার জন্য। যদি বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, তার বিচার দাবী করতে পার। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অধিকারের প্রশ্ন তুলে ১২৪ক ধারার অপরাধ করেছ।'

আমি ধীরভাবে জবাব দিলাম : 'মসজিদে মুসলমানেরা সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে সমবেত হয়েছিল। সে সময় হিন্দুরা বাদ্য বাজিয়ে উপাসনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। পুলিশ বাদ্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করলে তাদের ধর্মের ক্ষতি হতনা। কিন্তু তা না করে নির্বিচারে নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর গুলি চালনা কি ন্যায় নীতির বিগর্হিত কাজ হয়নি? মনে করুন, ওটা মসজিদ না হয়ে যদি গির্জা হত, এবং খৃস্টানরা যদি উপাসনায় বিঘ্ন হবে বলে বাদ্য বাজাতে নিষেধ করত তাহলে খৃস্টানদের উপরও কি এমনিভাবে গুলী চালানো হতো? আমরা রাজদ্রোহিতা করিনি, রাষ্ট্রপরিচালনায় শুভ বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি। এটা কোনক্রমেই অপরাধ নয়।'

পুলিশ সাহেবের লালমুখ আরো লাল হয় আমার জবাবে। কিন্তু মনে হল তিনি নিজের ক্রোধ দমন করলেন। ধীরে ধীরে একটু শান্তভাবে বললেন : 'তোমরা একটু সুর নরম করতে পারোনা? আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের কৈফিয়ত তলব করেছি। কিন্তু তোমাদের লেখার ফলে যদি আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি হয়, তাহলে হয়তবা তোমাদের জেলে পচতে হবে।'

আমি জবাবে ধীরভাবে বললাম : 'সত্য প্রকাশ করা যদি অপরাধ হয়, তা হলে আমরা অপরাধী। বিচারে যা হয় শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু সত্য গোপন করা অপরাধ বলে আমরা মনে করি। রাজনীতিকরা মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকরা নন।'

টেগার্ট সাহেব মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলেন। তারপর মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললেন : 'I appreciate your courage young Editor. But this is my last warning. You may go now.'

বাড়ি ফিরে সব ব্যাপার মওলবী মুজিবুর রহমান সাহেবকে বললাম। তিনি বললেন : ঠিক জবাব দিয়েছ। ওরা শক্তের ভক্ত। নরম হলেই পেয়ে বসতো। কিছুই আর লিখতে দিত না।"[৫৩]

সাম্প্রদায়িকতা : হিন্দু মানসে

এক

"...দশ বছর আগে লিখি আর একটি প্রবন্ধ। নাম 'আদিম পাপ'। তার এক জায়গায় ছিল -

'বরাবরই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুটি চিন্তাধারা পাশাপাশি বয়ে আসছে। একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ। আজকের দিনে একটির নাম পাকিস্তান, অপরটির নাম নিখিল ভারত। হঠাৎ ইংরাজ বিদায় নিলে যে এ দু'টি চিন্তাধারা অভিন্ন হয়ে ভারতাভিমুখ হবে, এ ভরসা আমার নেই। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি মুসলমানের দোটানা কোনদিনই ঘুচবে না। আরব ও ভারত তাকে ডান হাত ও বাম হাত ধরে টানতেই থাকবে চিরটা কাল। আরবাভিমুখ মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়, বোধ হয় বেশিই। সংখ্যা কম হলেও প্রতিপত্তি যে বেশি সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সে প্রতিপত্তি যে কেবল তৃতীয় পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে তা নয়। সে প্রতিপত্তি নির্ভর করে ইসলামের কেন্দ্র মক্কার উপর, নামকরণের ও প্রার্থনার ভাষা আরবীর উপর, খেলাফৎ নামক সার্বভৌম আইডিয়ার উপর।'

সেই বছরই 'জন্মস্বত্ত' নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখি। তাতে ছিল -

'আজকের দিনে যারা নেশনের মেলায় নেশন নয় তাদের দাবী কেউ কানে তোলে না। এটা বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান নেতারা তাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ত্যাগ করে নৈশনিক পরিচয় গ্রহণ করছেন। ছিলেন মুসলিম, হতে চান পাকিস্তানী। একদিক থেকে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেননা মুসলমানের মন ন্যাশনালিজমে সাড়া দেয় না সহজে। পাকিস্তানের খিড়কি দিয়ে এই যে ন্যাশনালিজম ঢুকল এর ধাক্কায় একদিন সাম্প্রদায়িকতা হটে যাবে। এই রকমই হয়েছে মিশরে, তুর্কীতে, ইরানে, আফগানিস্তানে। পাকিস্তান মুসলমানকে ন্যাশনালিস্ট করবে। তাতে অবশ্য ভারতের অঙ্গচ্ছেদ। ভারতীয় বলে যারা পরিচয় দেয় তারা বিনা দ্বন্দ্বে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়বে না। তবু স্বীকার করে উপায় নেই যে ন্যাশনালিজমের কুইনিন খাওয়াতে গেলে পাকিস্তানের চিনি দরকার। আর ন্যাশনালিজমের চিনি না খেলে সাম্প্রদায়িকতার জ্বর ছাড়বে না।'

...ন্যাশনালিজম মুসলমানের মনে সহজে ঢোকে না। সেইজন্যে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান হওয়ার ফলে চার কোটি মুসলমান এক দিনেই ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট হয়ে গেছেন। নয়তো এদের ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট করে তুলতে আমাদের দশ বিশ বছর লাগত। বাকী ছয় কোটি মুসলমান হয়েছেন পাকিস্তানী ন্যাশনালিস্ট। এটাও ইসলামের ইতিহাসে যুগ পরিবর্তনের সূচনা। এই অনুরূপ ঘটনার জন্যে যেতে হয় ইউরোপের ইতিহাসে, যেদিন প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশন শুরু হয়। এত বড়ো একটা ব্যাপারের জন্যে কিছু দাম না দিলে কি চলে? দেশ বিভাগ হচ্ছে সেই দাম। এর জন্যে আমাদের মনে ক্ষোভ আছে,

---

৫৩. মোহাম্মদ মোদাব্বের/সাংবাদিকের রোজনামচা। [বর্ণমিছিল - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। পৃ. ১৫-১৭]

এ ব্যাথা আমরা এ জীবনে ভুলব না। কিন্তু ব্যাথা কি মুসলমানেরা কম পেলেন? এই যে তাদের অখন্ড সমাজ দ্বিখন্ড হয়ে গেল এ ব্যাথা পাকিস্তানী মুসলমানের মনে লাগছে বৈকি। আমরা স্বভাবত: অসংহত। কিন্তু তারা স্বভাবত: সুসংহত। তাদের সংহতি ভেঙ্গে গেল তাদেরই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে। অনুশোচনার জন্যে তখন সময় পাননি। এবার তার সময় আসবে।

তবে পাকিস্তান হচ্ছে সেটলড ফ্যাক্ট। তাকে আনসেটলড করা চলবে না। একবার আমরা সেটলড ফ্যাক্টকে আনসেটেল করতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। আরেক বার সে ভুল করব না। ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস দুই ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে। এটা আমাদের মালুম ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। তা যদি করি তা হলে দেখব পাকিস্তানের মাটিতে একদিন কামাল পাশার আবির্ভাব হয়েছে, তার তলোয়ারের খোঁচায় এমন সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে যা আমাদের সাহসে কুলোতো না। বহু বিবাহ রদ হয়েছে, এক বিবাহ কায়েম হয়েছে, বোরখার বালাই নেই, আরবীতে নামাজ পড়া হয় না, কোরান পড়া হয় বাংলায়, মোল্লারা শোলার হ্যাট পরে, ফেজ মাথায় দিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, পীর সাহেবরা নিরুদ্দেশ। এ নহে কাহিনি এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে।" - অন্নদাশঙ্কর রায়/নতুন অধ্যায়। [মাসিক দ্যুতি - ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২][৫৪]

দুই

"...আমাদের দেশে ভারতবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সংগে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে, তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশত: সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি; আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।

তাহাকে যথার্থ আমাদের সংগী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষংগিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল এতদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোন বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়, - সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগ বাঁটোয়ারার বেলায় উভয়পক্ষে ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে করিয়াই আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অংক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কিনা মুসলমানের সেটাই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে, আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এ রকম মিলিয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাব মাত্র,

---

৫৪. তথ্যসূত্র : মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা/আসকার ইবনে শাইখ। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - জুলাই, ১৯৮৮। পৃ. ৪১৩-৪১৭]

ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে - আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনায় আমাদের অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুশী হইত সন্দেহ নাই: কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সংগে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন - কারণ সেখানে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পর জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে: পরিণামের দিকে দেখিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের আপাত: যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনি না হইলে দান করা কষ্টকর: মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যতদিন অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন সে আর কাহারো সাথে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে - সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ: বড়ো হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়:।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক পিছনে পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান করিয়া লইতে হইবে। সে বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবীতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত: পদ মান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুর পক্ষেই মংগলকর।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না। ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। যে স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান। এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলিই প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া যাইবে এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশংকার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোন কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে এক ঝোকারকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।" -পাকিস্তান কেন?/শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[উপরোক্ত অভিমতটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 'পাকিস্তান' পত্রিকা, ২৬ শে জুন, ১৯৪৪ সালে উদ্ধৃত করিয়াছে। প্রন্ধটির প্রকাশকাল বাংলা ১৩১৮ - সম্পাদক।][৫৫]

[৫৫]. তথ্যসূত্র : পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য/সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম। [বাংলা একাডেমী - মার্চ, ১৯৬৮। পৃ. ৯০-৯৩]

তিন

"...গত জনসংখ্যা (গণনা) দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বিস্তর অধিক। এই মুসলমানেরা ভিন্ন দেশবাসী নয়, ইহাঁরা ইংরাজ বণিক কি কর্মচারীদিগের ন্যায় কিছুদিন এখানে অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ইহাঁদের গৃহ, সম্পত্তি, সহায়, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সমুদয় এদেশে। ইহাঁরা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। শুদ্ধ ইহা নহে। ইহাঁরা হিন্দুসমাজের মজ্জাগত হইয়াছেন। এদেশীয় যত শ্রেণীর লোক আছে সকল শ্রেণীতেই মুসলমান প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এদেশে মহামারী উপস্থিত হইলে তাহারা আমাদের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, বিপ্লব হইলে আমাদের ন্যায় বিপদে পড়েন। এদেশের উন্নতি হইলে সেই সঙ্গে ইহাঁরাও উন্নত হন। সুতরাং সংখ্যা অনুসারে যদি গণনা করা যায় তবে বাঙ্গালা হিন্দু কি মুসলমানদিগের দেশ সে বিষয়ে সাব্যস্ত করা কঠিন। তবে এদেশ যে উভয়েরই এবং উভয়েরই এদেশের উন্নতি অবনতির সঙ্গে ক্ষতি বৃদ্ধি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত এদেশের উন্নতি করিতে হইলে যে উভয় মুসলমান ও বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে বলা বাহুল্য।

পূর্বে মুসলমান ও বাঙ্গালীর অবস্থার যত তারতম্য থাকুক, এক্ষণ আমরা সকলেই পরাধীন, সকলেই সমান দুরবস্থাপন্ন। যখন মুসলমানদিগের সুখের সময় ছিল, তখন তাহারা আমাদিগকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতেন, আমরাও তাহাদিগকে ঈর্ষা ও দ্বেষ করিতাম। কিন্তু এখন তাহারাও দাস আমরাও দাস, যে শৃঙ্খলে তাহাদের হস্ত আবদ্ধ আছে আমাদের হস্তও সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। যে বেত্রের আঘাত দ্বারা আমাদের পৃষ্ঠের চর্ম খণ্ড খণ্ড করা হয়, তাহারাও সেই বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হন। আমরাও যে ইংরাজিদিগের নিকট কম্পিত কলেবর হইয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হই, তাহদেরও সেখানে সেই অবস্থাপন্ন হইতে হয়। সুতরাং পূর্বে অনৈক্যের যে কারণ ছিল এক্ষণ আর তাহা নাই। মুসলমানেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের এখন সে সুখের দিন আর নাই। প্রত্যুত বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি দ্বারা হিন্দু বাঙ্গালিরা অনেক উন্নত হইয়াছেন। এখন মুসলমানেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন না, আমাদিগকে যত্ন ও আদর করেন, আমরা উহাদের সঙ্গে মিশিতে গেলে তাঁহারা আদরপূর্বক আমাদিগকে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালিরা দীর্ঘকাল হইতে দাস, মুসলমানেরা একশত বৎসরের কিছু অধিক পরাধীন হইয়াছেন। বাঙ্গালিরা নিরীহ, সহিষ্ণু, তেজহীন। আবার মুসলমানেরা উগ্র, অহংকারী, অভিমানী এবং তেজীয়ান। সুতরাং অবস্থা অবনতির নিমিত্ত আমরা যত কষ্ট পাই, ইহাঁরাও সম্ভবতঃ তাহার সহস্রগুণ কষ্ট সহ্য করেন। মুসলমানদিগের একটি বিশেষ গুণ আছে এবং কেবল এই গুণটি না থাকায় আমাদের দূর্দশা। ইহাঁরা ঐক্যবদ্ধ হইতে জানেন, ইহাঁদের অধ্যবসায়, উৎসাহ, জীবন আছে। ইহাঁরা যে কোন কাজে আগ্রহের সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারেন এবং প্রবিষ্ট হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা সমাধা করিবার যত্ন করেন।

নীল বিদ্রোহের প্রধান প্রবর্তক মুসলমান প্রজারা। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে দমন করিয়া নীল বুনাইবার নিমিত্ত ফাটকে দিয়া অনাহারে রাখিয়াছিলেন। অনেক কুঠিয়ালগণ তাহাদিগকে যতপরনাস্তি কষ্ট দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা নীল বুনিবে না যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে তাহা কোন মতেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না।

এই সময় একদিন লেপটেনেন্ট গবর্ণর নৌকা যোগে গোড়াই নদী দিয়া গমন করিতে ছিলেন। নদীর দুই ধারে অসংখ্য প্রজা উচ্চৈঃস্বরে নীলের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া গমন করিতে থাকেন। প্রজারা গবর্ণরের তাচ্ছিল্য দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিল। গোড়াই নদী ভয়ানক। তাহার স্রোতের বেগে ষ্টিমার স্থিরভাবে গমন করিতে পারে না। আবার কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। কুল এত উচ্চ এবং অসমান যে যত্নপূর্বক কেহ নদী হইতে উপরে উঠিতে পারে না। প্রজারা ইহা লক্ষ্য না করিয়া প্রাণের শঙ্কা কিছুমাত্র না করিয়া এই ভয়ানক নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গবর্ণর নৌকা হইতে দেখিলেন শত শত প্রজা জলে ঝম্প দিয়া তাহার নৌকাভিমুখে গমন করিতেছে এবং দেখিয়া অবাক হইলেন। তিনি আর গমন করিতে পারিলেন না। তিনি কুলে নৌকা লাগাইলেন,

প্রজারা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আপনাদিগের দুঃখের কাহিনি বলিল, তিনি সমুদয় শুনিলেন এবং প্রজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

পাবনার গোলযোগও মুসলমান প্রজারা আরম্ভ করিয়াছে এবং সেখানে অধিক মুসলমান, সেই জেলায় প্রজারা এইরূপ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। সেদিন কলকাতার গাড়োয়ানগণের জোঠ কি অদ্ভুত বিষয়। একদিনে এক একজন মুসলমানের যত্নে ইহারা সমুদয় ঐক্যবদ্ধ হইল।

যে জাতির এই গুণ আছে লক্ষী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। সৌভাগ্য তাহাদিগকে বিস্মৃত হন না। মুসলমানদিগের এই গুণের সঙ্গে যদি আমাদিগের বুদ্ধি কৌশল একত্রিত করা যায়, তাহাদের উগ্রতা যদি বাঙ্গালিদিগের বিবেচনা, বুদ্ধি ও শান্তস্বভাবের সঙ্গে একত্রিত করা যায়, তবে আমরা যাহা প্রার্থনা করিব ঈশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। স্থানীয় যে সমুদয় সভা হইতেছে তাহারা যেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মুসলমান ও বাঙ্গালির সদ্ভাব ও ঐক্যতা যাহাতে হয় তাহার যত্ন করেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবেন।"[৫৬]

চার

"...ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এইজন্য। 'Effeminate Hindoos' ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে —মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকবে। প্রাচীন ভারতববর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বের যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে — দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন 'পুরাণ' বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডার বা সেকন্দর দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন-লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া,

---

৫৬. অমৃতবাজার পত্রিকা/৮ কার্তিক, ১২৮০ (২৩ অক্টোবর, ১৮৭৩ইং)
তথ্যসূত্র : উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক/সম্পা: নরহরি কবিরাজ। [কে পি বাগচী এন্ড কোং (কলকাতা) - ১৯৮৪। পৃ. ৩০৯-৩১১]

সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমা পরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে।

এই জন্য দেশিয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্যে মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশিয়েরা এক প্রকার দিগবিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।

কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্‌বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিনেষ্টান বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশিয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য, যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরাজিত-পদানত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য

বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। (পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।)

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের প্রায় অতীত হইয়াছিল, রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান। তাহারা ভূয়োঃভূয়োঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যেরূপ গ্রীকসৈন্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশলাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লিক শক, হূন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণ-স্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় না যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম, – হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই; – আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়, গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায়, তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশিয় ভাষায় 'ভাল মানুষ' শব্দের অর্থ — ভীরুস্বভাবের লোক, অকর্ম্মা। 'হরি নিতান্ত ভালো মানুষ।' অর্থ — হরি নিতান্ত অপদার্থ!

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্ কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন, তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্মে বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ — হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয়, এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এতকাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজ্যশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড়ো হৃদয়সঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র — সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভালো বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত?

প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদিগের বিবেচনা 'যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?' স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।

আমরা এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভুক্ত জাতি ছিল না। মীবাররাজপুতদিগের অপূর্ব্ব কাহিনি যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যানুরক্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বন্ধে যথার্থ।

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যসকল

হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত, কি যদু, ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কার্য্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতা লাভে অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব। জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্ট-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার, — নির্ব্বাণই মুক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবন প্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে 'আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় রাজা হইতে দিব না' বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত

বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করেন নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই।

যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহ্লিক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্যজাতীয়, আর্য্যজাতীয়দের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়; — মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ; সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োঃভূয়োঃ ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরাজিত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ, — হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষণার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য আর এইরূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরিজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাই করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল, বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন্ কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যজাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজনিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যেরূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল।

কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল।

পরিশেষে, কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল।

পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশিয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কানোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই।

ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাসকীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল।

তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মার্হাট্টা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।"[৫৭]

পাঁচ

"...ডঃ করিম লিখেছেন, 'বঙ্গদেশ ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু সদস্যরা ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের পক্ষে মত না দিলে বর্তমান রাজনৈতিক বিভাগের সৃষ্টি হইত না।' ঐ সব হিন্দু সদস্যরা বাংলা বিভাগের পক্ষে মত না দিলে সমগ্র বাংলাই (পশ্চিম ও পূর্ব) পাকিস্তানে চলে যেত এবং পূর্ব বাংলার লোকদের ১৯৪৭-'৭১খ্রিষ্টাব্দে যে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমাদেরও (বর্তমান লেখক পশ্চিম বাংলার আদি ও অকৃত্রিম অধিবাসী, তার পূর্বপুরুষরা পূর্ব বাংলা থেকে আসেন নি) সেই অভিজ্ঞতা লাভ হত। কাজেই ঐসব হিন্দু সদস্যরা উচিত কাজই করেছিলেন।"[৫৮]

প্রথাগত বর্বরতার সেকাল

এক

কৌলীন্য

আদীশূর আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশ হওয়ায় বল্লাল সেন বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের জন্য আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'কুলীন' আখ্যা প্রদান করেন। কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপনের পর, তাহার আদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ "ঘটক" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঘটকগণ কুলীনগণের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্তন পূর্বক তাহাদের দোষ-গুণ ও কৌলীন্যমর্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে কৌলীণ্য লইয়া মহা গোলমাল হওয়ায় 'নির্বাচন প্রথা' রদ হয় এবং কৌলীন্য 'বংশানুগত' হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহার রাজত্বকালে কায়স্থ সমাজে ঘোষ, বসু,

---

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/বিবিধ প্রবন্ধ। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) - জুন, ১৯৫৯। পৃ. ১২৭-১৩৭]

৫৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়/বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল। [ভারতী বুক স্টল (কলিকাতা) - ১৯৯৮। পৃ. vi]

মিত্র প্রভৃতি কুলীনগণের 'পর্যায়' নির্দিষ্ট হয় এবং সমপর্যায় ব্যতীত আদান-প্রদান হইবে না বলিয়া এক নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। লক্ষণ সেনের সময় হইতেই কৌলীণ্য প্রথাটিকে জটিল করিয়া তোলা হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বিবাহের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া সমাজের যে কি অনিষ্ট হয় তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। তাহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ কিরূপ বিলাসে মগ্ন ছিল তাহা পবনদূত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তৎকালীন সামাজিক দূর্নীতি ও অনাচার-ব্যভিচারের জন্যই হিন্দুশাসন বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়।

লক্ষণ সেন নিয়ম করিলেন যে, কুলীন কন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার নাম বংশ পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত: কুলীনদের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চ-নীচ কুলে আদান-প্রদান করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া কুলীনদের পদমর্যাদার সমতা স্থির করা হয়; ইহার নাম 'সমীকরণ'। কৌলীন্য সংস্থাপিত হইলে গৌড়ের ব্রাহ্মণগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হন; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় শ্রোত্রীয়, তৃতীয় বংশজ, চতুর্থ গৌণ-কুলীন এবং পঞ্চম সপ্তশতী সম্প্রদায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে গৌড়দেশে মুসলমান প্রভাব আরম্ভ হয়; এই সময় হইতে মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে এবং কৌলীন্য প্রথার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। কুলীনের কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য, অর্থ দিয়া কুলীন পাত্র সংগ্রহ করিতে হইত এবং এই সুযোগে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক করিয়া 'বিবাহ-ব্যবসায়' আরম্ভ করিল।

কুলীন কন্যার কুলীন ছাড়া অন্য শ্রেণীতে বিবাহ হইলে কুলক্ষয় হইত বলিয়া অনেক সময় আশী বৎসরের বৃদ্ধ বর একই লগ্নে দশ বৎসর হইতে ষাট বৎসরের কুড়ি পঁচিশটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিত। বিবাহের কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত আর তাহার সকল স্ত্রী বিধবা হইত।

বহুবিবাহ

কৌলীন্যের এই মূঢ় ব্যবহারের ফলে কুলীন-কন্যার বিবাহ দেওয়া যেমন দুঃসাধ্য ছিল, বংশজদের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব হইল। একদিকে কুলীনগণ শত শত বিবাহ করিতেন, অন্যদিকে বংশজগণ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারিতেন না। কারণ কন্যা সংগ্রহের জন্য পণ দিতে হইত। বংশ ব্রাহ্মণগণের কন্যা সংগ্রহ করিবার জন্য একদল প্রতারকের দল ব্যবসায়ী, বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্নশ্রেণির বালিকা আনিয়া, ব্রাহ্মণ-কন্যা বলিয়া পরিচয় পূর্বক মূল্য লইয়া বিবাহ দিয়া দিত। নৌকা বা 'ভরা' করিয়া এই সব মেয়েকে আনয়ন করা হইত বলিয়া ইহাদিগকে 'ভরা মেয়ে' বলিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ দেশাচারের ফলে, কুলীন-কন্যাগণ অনূঢ়ার মত পিতৃগৃহেই থাকিত এবং বংশজ ছেলেরা কন্যাভাবে ও অর্থাভাবে চিরকাল অবিবাহিত রহিত। এই জন্য সমাজের মধ্যে কিরূপ ব্যভিচার চলিত, তাহা ভাষায় ব্যক্ত না করাই ভাল।

১৮৬৫ খৃস্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া বহুবিবাহকারী কুলীনদিগের সন্ধান করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম এবং জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করেন। আজ তাহার চেষ্টায় বহু-বিবাহ প্রথার প্রাবল্য বিডন আইনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাঁচটির কম যাহারা বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি তদসংগৃহীত তালিকা হইতে তাহাদের নাম বাদ দিয়া ছিলেন। পূর্বে এই জেলায় কতজন বিবাহ-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' ১ম পুস্তক হইতে (সংক্ষিপ্তাকারে) উদ্ধৃত হইল।

সতীদাহ

এই দেশের নারীগণ পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন এবং পতিপরায়ণতাই একমাত্র ধর্ম ছিল। পতির সহিত সহমরণই সেই জন্য বঙ্গরমণীগণ তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন

এবং ইহাতে তাঁহারা জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই প্রথা কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। হিন্দু শাস্ত্রেও সতীর স্বামীর সহিত সহমরণ করিবার কথা লিখিত আছে। 'পরাশর সংহিতা'র এক বচন হইতে জানা যায় যে, মানবদেহে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে; যে নারী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন অর্থাৎ স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গে বাস করেন।

তৎকালে সহমরণ দেখিবার জন্য ভীষণ জনসমাগম হইত, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজিত এবং সতী তাঁহার শেষ বেশবিন্যাস করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিমুখে (অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায়) স্বামীর মৃতদেহ কোলে লইয়া দক্ষিণ হস্তে একটি আম্র-শাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভস্মীভূতা হইতেন। সতীর শেষ সিন্দুর ও শাঁখা পাইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাড়াকড়ি পড়িয়া যাইত, কারণ সতীর সিন্দুর মাথায় দিলে বা ব্যবহৃত শাঁখা পরিলে আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এইরূপ একটা বিশ্বাস তৎকালীন মহিলাদের মধ্যে ছিল।

হিন্দু রাজত্বকালে কোন রাজা এই প্রথা রহিত করিবার কথা স্বপনেও চিন্তা করতে পারিতেন না। বরং সতীরমণীর আত্মবিসর্জনের পবিত্র স্মৃতি জাগরুক রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ 'সতীচোড়া ঘাটের' কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। বেশি দিনের কথা নয়, ১৭৪২ খৃস্টাব্দেও মুর্শিদাবাদে যে স্থানকে 'সতীচোড়া' বলে, তথায় জগৎ শেঠের বাড়ির কিছু উত্তরে কোন সতীর সহমরণ-স্মৃতি রক্ষা কল্পে একটা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ সহমরণ-স্মৃতি তৎকালে বঙ্গদেশে বহু স্থানে ছিল, কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে সতীদাহের কথা লিখিত থাকিলেও ঠিক কোন সময় হইতে সতীদাহ ভারতবর্ষে প্রচলিত তাহা বলা যায় না। সেলুকাস আলেকজান্দারের ভারত অভিযান বর্ণনার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, রাজপুতনার এক অনার্য্য রমণী বিষপ্রয়োগে তাহার স্বামীকে হত্যা করে বলিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়। সেই সহমরণ হইতেই সতীদাহের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৎকালে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে বহু নারীকে সহমৃতা হইতে হইত; কেহ সহমৃতা না হইলে সমাজের ব্যক্তিগণ তাহাকে 'অসতী' বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং সেইজন্য অপবাদের হাত হইতে নিস্তার কল্পে পুত্রও মাতাকে প্রজ্জলিত চিতায় ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাগনপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিল; ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে, সাঁইত্রিশ জন স্ত্রী সহমৃতা হন এবং উপর্যুপরি তিন দিন ধরিয়া তাহার চিতাগ্নি প্রজ্জলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।

উলার মুক্তারাম নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার ত্রয়োদশজন ভার্যা সহমৃতা হন, কিন্তু শেষ দুইজন সূর্যার্ঘ্য দিবার সময় মন্ত্রপাঠকালে প্রাণভয়ে পলাইতে উদ্যত হইলে, তাহার পুত্র ধরিয়া আনিয়া মাতাকে চিতায় ফেলিয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রমানাথ এই ঘটনা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সতীর স্বামীর সহিত সহমরণ হিন্দুগণ অনুমোদন করিত বলিয়া ইহা রোধ করা যাইত না। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে লেডী আর্মহার্স্ট কলিকাতার নিকটবর্তী কোন একটি স্থানে সতীদাহ দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, একটি সতী প্রাণভয়ে জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিলে, ক্ষুব্ধ জনতা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর নৌকায় চড়াইয়া নদীর মধ্যে বলপূর্বক তাহাকে ফেলিয়া দেয়।

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ডাক্তার বার্নিয়ার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে কয়েকটি সতীদাহ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রথাকে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সকল প্রসূতি নিজ কন্যাকে বাল্যকাল হইতে স্বামীর সহিত সহমৃতা হওয়ার পূণ্য ও প্রশংসার কাজ আর নাই, এই শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বশীভূত রাখিবার, রোগে শুশ্রুষা পাইবার এবং বিষপ্রয়োগে স্বামী হত্যা না করে, এই সকল কারণে সহমরণের পোষকতা করিয়া থাকে।

বৈদেশিক ভ্রমণকারী কর্তৃক বিষ-প্রয়োগে স্বামী হত্যা হইতে সতীদাহের উদ্ভব হইয়াছে এই বিবরণ পাঠ করিয়া বার্নিয়ার সাহেবও 'বিষ-প্রয়োগ স্বামী হত্যার' কথা উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক লেখকগণ এই প্রথার উৎপত্তির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অমূলক ও ভুল। কারণ পূর্বে হিন্দু-নারী সর্ব ক্ষেত্রেই সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গে বাস করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় 'সতী' হইত। শেষে স্বেচ্ছায় সতী হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও, সামাজিক ব্যবস্থায় 'সতী' হইতে বাধ্য হইত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪১৯ হইতে ১৪৪৯ খৃ: পর্যন্ত) নিকোলো ডি কন্টি (Nicolo-de'Conte) নামে এক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষ পর্যটন করেন এবং তিনি কয়েকটি সতীদাহ দেখিয়াছিলেন। তিনি সতীদাহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

ভারতে মৃতদেহকে দাহ করা হয় এবং তাহাদের স্ত্রীগণকেও প্রায় তাহাদের সহিত দাহ করা হয়। বিবাহের সময় যেরূপ নির্ধারিত হয়, সেই হিসাবেই স্ত্রীকে সহমৃতা হইতে হয়। প্রথমা স্ত্রী আইনানুসারে সহমৃতা হইতে বাধ্য — এমন কি সে স্ত্রী একমাত্র পত্নী হইলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীগণকে এই শর্তে বিবাহ করা হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভা বৃদ্ধি করণার্থ সহমৃতা হইবে। এতদ্দেশে ইহা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

মৃত স্বামীকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া খাটিয়ার উপর স্থাপন করা হয়। পিরামিডের আকারে শবের উপরে চিতা সজ্জিত করা হয়। এই চিতা সুগন্ধী কাঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়। চিতায় অগ্নি প্রদান করিলে, স্ত্রী বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করে। বহুসংখ্যক লোক সতীর সঙ্গে সঙ্গে চিতা প্রদক্ষিণ করে এবং নানারূপ জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে একজন পুরোহিত উচ্চস্থানারূঢ় হইয়া জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। চিতার চতুর্দিকে কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া সতী শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অবগাননান্তর চিতায় ঝম্প প্রদান করেন।

হুগলী জেলায় শেষ সতী-দাহ ১৮২৯ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়: জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিডে সাহেব ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বার্নিয়ার সাহেবের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাঁহাই প্রমাণিত হইবে।

'...১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা হয়। সেই সময় আমি হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আইন চালু হবার কিছুদিন আগে আমাকে জানান হল যে, আমার বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি সতীদাহ অনুষ্ঠিত হবে। হুগলীতে এ ধরণের ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত। লোকের ধারণা ছিল, ভাগীরথীর পশ্চিম দিক এইরূপ পুণ্যের কাজের পক্ষে প্রশস্ত। 'কারণ ভাগীরথীর পশ্চিমকূল — বারাণসী সমতুল'।

খবরটা যখন আমার কাছে পৌছোল তখন চিকিৎসা বিভাগের ডাঃ ওয়াইজ এবং গবর্ণর-জেনারেলের (ভদ্রলোকের নামটা আমার মনে নেই) পুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই অনুসারে গাড়ী করে আমরা নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে যাত্রা করলাম। তখন নদীর তীরে দেশিয় লোকদের একটি ভিড় জড়ো হয়ে গেছে। চিতা জ্বালান হয়েছে। যিনি সতী হবেন তিনি সেই জ্বলন্ত চিতার সামনে মাটিতে বসে আছেন। আমাদের বসতে দেবার জন্যে চেয়ার আনানো হলো। আমরা মহিলাটির সন্নিকটে বসলাম। আমার সঙ্গীদ্বয় দেশিয় ভাষা না জানলেও মহিলাকে এই কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। তাদের বক্তব্য আমি মহিলাকে তার ভাষায় তর্জমা করে শোনাতে লাগলাম। মহিলা সশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি কথা শুনলেন। কিন্তু আমাদের যুক্তি তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। পুরোহিত এবং সমবেত জনতাও মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

অবশেষে মহিলার মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল। তিনি চিতায় প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমাদের করার আর কিছু নেই দেখে আমি মহিলাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু চিতায় আরোহণের পূর্বে পাদ্রী সাহেব মহিলাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করলেন, 'মহিলা কি জানেন, কি নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে? Did she know what pain she was about to suffer?'

ভদ্রমহিলা আমার পায়ের কাছে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলাম তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। প্রশ্নের জবাবে মহিলা বললেন - একটা প্রদীপ আনান।

প্রদীপ আনান হলো - নৌকো ধরণের যে প্রদীপ চাষীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে এলো ঘি আর বেশ বড়ো একটা সলতে।

প্রদীপটা মহিলা নিজেই যথারীতি সাজালেন। তারপর বললেনঃ এইবার জ্বালান। প্রদীপটা জ্বালিয়ে মহিলার সামনে রাখা হলো। তারপর উপেক্ষার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে মহিলা মাটিতে কনুই রেখে একটা আঙ্গুল প্রদীপের শিখার উপর ধরলেন। আঙ্গুলটা পুড়ে ফোস্কা উঠলো তারপর কালো হয়ে ঝুলে পড়লো - পালকের কলম মোমবাতির উপর ধরলে যেমনটি হয়। মহিলা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আঙ্গুল সরালেন না। একটি শব্দ করলেন না বা বা তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একটুও পরিবর্তিত হলো না। এই রকম কিছুক্ষণ চললো। তারপর ভদ্রমহিলা বললেন, এইবার আপনার সন্দেহভঞ্জন হয়েছে তো?

She then said: 'Are you satisfied?'

আমি বললাম, হাঁ হয়েছে। I answered hastily 'Quite satisfied.'

মহিলা তখন আঙ্গুল সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন, এইবার তাহলে আমি চিতায় আরোহণ করতে পারি? Now, may I go?

আমি সম্মতি দিলাম। To this I assented.

ভদ্র মহিলা তখন ধীরে ধীরে চিতায় আরোহণ করলেন। নদীর তীর ঘেষে চিতাটি রচনা করা হয়েছিল। চিতাটি ছিল প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু এবং প্রায় অতটাই লম্বা। চওড়া ছিল প্রায় তিন ফুট। মহিলাকে বার-তিনেক চিতাটি প্রদক্ষিণ করান হল। তারপর তিনি চিতায় আরোহণ করলেন। উপুড় হয়ে হাতের উপর মুখ রেখে মহিলা চিতার উপর শুলেন - যেন ঘুমুতে যাচ্ছেন। মহিলার উপর তারপর আর এক পর্দা কাঠ চাপান হল। ইচ্ছা করলেও যাতে তিনি চিতা ছেড়ে বেরোতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে জনতা তাঁকে চিতার সঙ্গে বাঁধতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম। তারা অনিচ্ছার সঙ্গে আমার নিষেধ শুনলো। এইবার তার ছেলেকে ডাকা হলো চিতায় আগুন দিতে।

প্রাণান্তকর প্রথা

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে বহু প্রাণান্তকর সংস্কার প্রচলিত ছিল। এই সকল বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এক একটি করিয়া এদেশ হইতে তিরোহিত হয়। এই নিষ্ঠুর প্রথা কোন সময়ে কিরূপে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা অজ্ঞাত।

ভারতে যে সকল প্রাণান্তকর প্রথা প্রচলিত ছিল, হুগলী জেলাতেও সেই সব প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ, নরবলি, চড়কে বান-ফোঁড়া, তপ্তমুক্তি, গঙ্গাযাত্রা, নবজাত কন্যা সন্তান গঙ্গায় বিসর্জন, সাগরে বা গঙ্গায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ প্রভৃতি নানা রকম প্রথা নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতায় বড়ো কম ছিল না। এই সকল প্রথার মধ্যে শিশুকন্যা বধ সমস্তই হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। নরবলি ও সতীদাহ হিন্দু শাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও সতীদাহ স্বেচ্ছাকৃত অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু সতীদাহও কখনও স্বেচ্ছাকৃত ছিল না।

সতীদাহ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইবার হুগলী জেলায় প্রচলিত অন্যান্য প্রথাগুলির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

নরবলি

ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় হুগলী জেলায় বহু প্রাচীনকাল হইতে নরবলি হইত বলিয়া জানা যায়। সাধারণতঃ বালকদিগকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইত্। প্রাচীনকালে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নরবলি দিয়া, উক্ত দেহ ক্ষেত্রমধ্যে প্রোথিত হইত। লং সাহেব শান্তিপুর, নদীয়া ও বিষ্ণুপুরের নিকট ব্রাহ্মনিতলার দুর্গাপুরে বহু প্রাচীনকাল হইতে নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ডাকাতি করিবার পূর্বে ডাকাতগণ কালির নিকটে নরবলি দিত। তাহদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, দেবী প্রসন্না হইলে ডাকাতি করিয়া তাহারা বহু ধন রত্ন পাইবে। হুগলি জেলার বহু স্থানে অদ্যাপি 'ডাকাতেকালি" বর্তমান আছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্বপ্রথম লেফটেন্ট্যান্ট হিকস নামক এক ব্যক্তি এই প্রথা রহিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলেও, তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। জেমস লং নরবলির কথা তার Annals of Tripura-তে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন।

'পূর্বাধিকারী রাজাগণ কর্তৃক সমর পরাভব ব্যক্তিদের চতুর্দশ দেবতার স্থানে বলি সমাধান হইত। ইহা ব্যতিরেকে বৎসরে বৎসরে নিয়মিতরূপে চৌদ্দটি নরবলির বিধান ছিল। এই সকল নর পর্বত-শিখর প্রদেশ হইতে নরদেব সেবায় আত্মবলি করনার্থ স্বয়ং আনন্দের সহিত উৎসাহ প্রকাশ করিত। এই কথা লোকমুখে অবগত হওয়া যায়, কি আশ্চর্য্য।'

পূজার বিধান আজও প্রচলিত, অবশ্য নরবলি এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। রেভারেন্ড লং সাহেব 'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রিকায় লিখিয়াছেন :

Human sacrifices were also frequent even as late 1832. A Hindu at Kalighat sent for a Musalman barber to shave him. He asked him afterwards to hold a goat while he cut off its head as a offering to Kali. The barber did so but the Hindu cut off the barber's head and and offered it to Kali. He was sentenced by the Nizamut to be hung.

নরবলি তৎকালে শাস্ত্র-সম্মত ও ধর্মমূলক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়াই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যেরূপ ছাগবলি দেওয়া হয়, নরবলিও সেইভাবে পূণ্যসঞ্চয়ের জন্য সম্পন্ন হইত। প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলে বহু নরবলির সংবাদ উণবিংশ শতাব্দীতেও অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২২ খৃস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল :

'সমাচার পাওয়া গেল যে, পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের শিববাটি কালিকাপুর গ্রামের অর্ধক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরীর প্রতিমা আছে। সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে। পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই। কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারী ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড়া পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারি থান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমান পিতলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে। ইহাতে অননুমান হয় যে আট বলিদান হইয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান হইয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই। কেহ কেহ অনুমান করে যে নরবলি হইয়া থাকিবেন। এবং নগদ পাঁচটি টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে, এই তাবৎ সামগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।'

যাহা হউক। ১৮২৯ খৃস্টাব্দ হইতে ছয় বৎসর যাবৎ ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল ও মেজর ম্যাকফারসনের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই প্রথা বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত হইলেও, ১৮৩৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্যে মধ্যে হুগলী জেলায় নরবলির সংবাদ পাওয়া যাইত। এই সম্বন্ধে ৪ঠা জুলাই ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের সমাচার দর্পণের আর একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল :

'কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলীর অন্তবর্তী কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন। তাহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারীরা দ্বারবন্ধ করণানন্তর গমন করিয়াছিল। পরদিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারীরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেক যে, পূর্ব রজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেক। ইহাতে পূজারীরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্থ রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যবহারে তথায় সন্ধান করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই। আমরা অনুমান করি যে দস্যুদিগের কর্তৃক এরূপে কর্ম হইয়া থাকিবেক।'

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও এই অঞ্চলে পুত্রার্থে দেব পূজা করিবার জন্য নারী বলির একটি সংবাদ ১২ জুলাই ১৯২৪ খৃস্টাব্দের 'আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটি এই :

'বিষ্ণুপুর থানার এলাকায় কাশীবাটি নিবাসী ফুলমণি নামে এক হিন্দু রমণী ভূষণ দাসী নামে এক প্রতিবেশিনীকে হত্যা করিবার অপরাধে আলীপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। সন্তান হয় না বলিয়া ভূষণের মনে বড়ো কষ্ট ছিল, একথা জানিতে পারিয়া ফুলমণি তাহকে পুত্রার্থে দেবপূজা করিবার জন্য সমস্ত অলঙ্কারাদি পরাইয়া গভীর জঙ্গলে এক ভগ্ন দেবমন্দিরে লইয়া যায়। পূজার পর ভূষণ ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিতেছে এমন সময় ফুলমণি নিজ বস্ত্র হইতে একখানি দা বাহির করিয়া শিরচ্ছেদ করিয়া তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু পথে তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়া অনেকের খুব সন্দেহ হয় এবং অনুসন্ধানের পর এই হত্যাকান্ডের ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে। পুলিস ফুলমণিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহার গৃহে সমস্ত অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ফুলমণি পুলিসের নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছে। তাহাকে এখন হাজতে রাখা হইয়াছে।'

গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন

প্রাচীনকাল হইতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বক্ষে হিন্দুগণ ধর্মার্থ জীবন বলি দিত দেখিতে পাওয়া যায়। নর-নারী উভয়েই স্বর্গে যাইবার জন্য এই ভাবে জীবন দান করিত। পুরুষেরা গোঁফ-দাড়ি ও মস্তক মুন্ডন করিয়া এবং রমণীগণ স্নান করিয়া গঙ্গায় জীবন বিসর্জন দিত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বহু হিন্দু ত্রিবেণীতে নিজের গলা কাটিয়া বা কুমিরের মুখে আত্মদান করিয়া জীবন দান করিত। শিশু ও বৃদ্ধগণ আত্মবিসর্জন দিতে ভয় পাইত বলিয়া তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করা হইত।

রেভারেন্ড লং সাহেব গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন সম্বন্ধে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে লিখিয়াছেন–

'Chogdah as well as Bansberia and Gangasagar were formerly noted for human sacrifices by drowing, the aged and children were thrown into the river; In November 1801 some pilots saw 11 persons at Sagar throw themselves to sharks and that month 29 persons were devoured by them.'

এতদ্ব্যতীত শিশু সন্তানকে গঙ্গায় উৎসর্গ করা আর একটি নৃশংস প্রথা ছিল। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী যে, স্ত্রীলোকগণ বিবাহের পর বহু দিন অপুত্রক থাকিলে গঙ্গার নিকট মানত করিত যে, সন্তান হইলে প্রথম সন্তানটিকে তাহারা গঙ্গায় উৎসর্গ করিবে। মৃতবৎসা দোষ কাটাইবার জন্যও অনেকে গঙ্গার নিকট সন্তান উৎসর্গের মানত করিত। ঢাকা এবং যশোহর হইতে নরনারী সন্তান-বিসর্জনের জন্য ভাগীরথী সমীপে উপস্থিত হইত। এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিয়ু পত্রে লং সাহেবের কথা উদ্ধারযোগ্য :

'In 1813 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Brahmins for their ransom. People from Dacca and Jessore used to throw their children to the Ganges here. Calcutta Review, 1846.'

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮০১ খৃস্টাব্দে আইনের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এ কার্যে যাঁহারা সাহায্য করিবে তাহাদিগকে হত্যাকারী হিসাবে গণ্য করা হইবে বলিয়া স্থির হয়; বর্তমানে এই প্রথা ভারতবর্ষে আর প্রচলিত নাই।

চড়কে বান-ফোঁড়া

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সর্বত্র আর একটি প্রাণান্তকর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা চড়কের সময় ঝুলিবার জন্য পৃষ্ঠদেশে বান-ফোঁড়া বলিয়া কথিত। চড়কগাছে ঝুলিবার জন্য জনসাধারণকে পূণ্যসঞ্চয়ের লোভ দেখাইয়া, সাধারণত মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া, উক্ত কার্যে প্রলুব্ধ করা হইত। চড়কের সময় চড়কগাছে ঘোরা একটি প্রধান উৎসব ছিল। চড়ক দেখিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে জন-সমাগম হইত এবং যাহারা চড়কগাছে ঝুলিত, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িত তাহাদিগকে ঘুরান হইত। বহু বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বর্ণনার মধ্যে এই নিষ্ঠুর প্রথার উল্লেখ আছে। ১৮৩০ খৃস্টাব্দ হইতে তৎকালীন সংবাদপত্রে চড়ক পূজা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রাদি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য :

'চরক পূজার অতি ঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময়ে ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবর্তী প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সী নামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল। স্থান সমূহ সর্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুন্সীর চাকর বাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব করিতেছিল। কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাঁহা দৈবাৎ ছিড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬০ হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা তাহার একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখখানা পিন্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না।' [২২শে এপ্রিল, ১৮৩৭]

'আমি এইবার কোন স্থানে দুই মোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সন্ন্যাসীকে ঘুরিতে দেখিলাম। তাহার মধ্যে একজন মহাদেবের ন্যায় বেশভূষা করতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুড়িয়া উৰ্দ্ধপদে অধঃশিরে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। দে পাক দে পাক তাহাতে অর্ধ ঘন্টার পর ঐ চারিজন সন্ন্যাসীকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলেই মুমূর্ষপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশধারী দীর্ঘ জটাযুক্ত ফণিফণাশ্বির ভক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবং তাহার যে স্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল। আর কিঞ্চিৎকাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধকরি ঐ সন্ন্যাসী ছিঁড়িয়া পড়িয়া দিদৃক্ষগণ সহিত নিধন হইত।' [১২ মে, ১৮৩৮]

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে এই প্রাণহারী প্রথা চিরতরে রদ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয় এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে ক্রমশঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৪-৬৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট বিডন সাহেব বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত পরামর্শ করিয়া চড়কের সময় পৃষ্ঠে বাণ-ফোঁড়া বে-আইনী কার্য বলিয়া ঘোষণা করেন। বাণ-ফোঁড়া বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর, ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হুগলী জেলায় উক্ত বৎসরে তিনজন বাণ-ফোঁড়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়।

ধর্মের নামে কুপ্রথা প্রচলিত হইলেও, সরকার হইতে কোনপ্রকার উৎসাহ এযাবৎ দেওয়া হয় নাই, বরং ইহা রদ করিবার সব প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রথা রহিত না হওয়ায় মহামান্য মহোদয়ার ভারতীয় সেক্রেটারী ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের "ডেসপ্যাচে" এই কুপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিবার চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়াছেন। যাহা হউক, সরকার হইতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলা ব্যতীত বঙ্গের সর্বত্র ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়।

তপ্ত-মুক্তি

পশ্চিম বঙ্গে 'তপ্ত-মুক্তি' বলিয়া দোষী ব্যক্তিকে সাজা দিবার একপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তপ্ত-মুক্তি অর্থাৎ গরম ঘৃত মুখে প্রয়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলা হইত। ইংরাজ রাজত্বে সামাজিক শাসন শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণান্তকর প্রথা দূরীভূত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জনৈক যুবতী তাঁহার স্বামী কর্তৃক অসতী বলিয়া প্রমাণিত হইলে গ্রাম্য সামাজিক বিধানে তাহার

'তপ্ত-মুক্তি'তে মৃত্যু হয় এবং সাতহাজার নরনারী উহা দর্শন করেন। বর্তমানে এই প্রকার সামাজিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। রেভারেন্ড লং সাহেব এই সম্বন্ধে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিয়্যু পত্রে লিখিয়াছেন :

'In 1807 the Topta-Mukti or ordeal by hot clarified butter was tried before 7000 spectators on a young woman accused by her husband of adultery.'

গঙ্গা-যাত্রা

বহু প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ, জরাতুর এবং মৃতকল্প ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করা হইত। কারণ গঙ্গাতীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, হিন্দুগণের নিকট এক মহাপূণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। হুগলী জেলার মধ্যে নিমাই তীর্থের ঘাট ও ত্রিবেণীতে বহু দূর দেশ হইতে সেই জন্য 'গঙ্গাযাত্রী' আগমন করিত এবং তাঁহাদের জন্য নির্মিত গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ ঘরগুলি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিয়া ঐ সকল অন্তিম শয্যাশায়ী পূণ্যার্থী নরনারীর ভব-যন্ত্রণা দূর করিয়া দিত। যাহাদের মৃত্যু হইতে দেরী হইত, তাহদের আত্মীয়বর্গ মহা বিপদে পড়িতেন; পরিশেষে মুমূর্ষ রোগীকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান এবং ঠান্ডা দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া তাহার মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া দিতেন। কারণ, হিন্দুগণের তৎকালে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, কোন গঙ্গাযাত্রী যদি রোগমুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে সংসারের অমঙ্গল হয়। সেই জন্য কিংবদন্তী এইরূপে যে, যাহারা গঙ্গাযাত্রার পর দৈবকর্মে প্রাণে বাঁচিয়া যাইত, তাহারা আর দেশে ফিরিয়া যাইত না; শান্তিপুরে যাইয়া ভাগীরথীর তীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিত। এইরূপ আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত গঙ্গাযাত্রী নরনারীর জন্যই শান্তিপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া হনিবার্জার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

When a patient thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it was, acquired a new life and thenceforth all his former relations and friends are treated as stranger; he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges until he arrives at Santipore, where he settles himself and it is a curious fact, that the whole populations of Santipore composed of such person.

সোমড়ার স্বর্গীয় দূর্গাচরণ রায় ত্রিবেণীতে এক গঙ্গাযাত্রীর যে বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

'এক বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রার জন্য আনিয়াছে; প্রাচীনের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই - অতি কষ্টে দুই একটি কথা বাহির হইতেছে। শীতকাল, কিন্তু তাহাকে অতি প্রত্যুষে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইয়াছে। ডাবের জল, দধি, মর্তমান রম্ভা এবং চিনির জল ঘন ঘন খাওয়ান হইতেছে। টক দই খেয়ে রোগীর দাঁত টকিয়া যাওয়ায় কহিতেছে - ওঁরে আঁর দঁই দেসনে বড়ো দাঁত টকে গিয়েছে, কিন্তু 'যাবে আর কি' বলিয়া তথাপি তাহার মুখে দধি প্রদান করা হইতেছে।

উঃ কি নিষ্ঠুর! কি পাষণ্ড! যখন মৃত্যুকালে রোগীর মুখে বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল দিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়, তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশ্যকতা কি? আর এই প্রকার হত্যাসাধন করা কি মানুষের উচিৎ?'

১৮৬৫ খৃস্টাব্দে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রে এই কুপ্রথার নিন্দা করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্গের শিক্ষিত জনসাধারণ এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য ছোটো লাট বিডন সাহেবের নিকট আবেদন করেন। এই বিষয়টি লইয়া অনুসন্ধান করা হয় এবং গঙ্গাযাত্রা শাস্ত্র-সম্মত হইলেও 'অন্তর্জলি' অর্থাৎ মৃতপ্রায় বা অসুস্থ ব্যক্তির অর্ধাংশ গঙ্গায় ডুবাইয়া রাখাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। আইনের সাহায্য না লইয়া যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হইবে, তাহার নিকট-আত্মীয়, রোগীর বাঁচিবার আশা নাই, এই মর্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ পুলিশে দরখাস্ত করিলে তবে গঙ্গাযাত্রা করিতে দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হয়। ক্রমশঃ এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়।"[৭৯]

---

৭৯. তথ্যসূত্র : হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (প্রথম খণ্ড)/সুধীরকুমার মিত্র। মিত্রাণী প্রকাশন (কলিকাতা) - মার্চ, ১৯৬২। পৃ. ২২৭ - ২৫৮।

দুই

গোঁড়ামির বেদী

'...বৌদ্ধ যুগে এবং তাহার পরেও পান-ভোজন ব্যাপারে ভারতবাসী বিদেশিয় ভিন্নধর্মাবলম্বিগণকে সমকক্ষের তুল্য ব্যবহার করিতেন। 'ছুৎমার্গ' ব্যাপারটা পৌরাণিক যুগে বা বৌদ্ধ যুগে, পূর্বগামী কোনো কালেই প্রচলিত ছিল না। চাঁদ বর্দ্দয়ের 'রাসা' গ্রন্থ হইতে একটা উপাখ্যানের কথা বলিব। বাপ্পা রাওয়ের সময়ে আরব দেশ হইতে দুই জন মোসলেম ধর্মাবলম্বী চিতোরে আগমন করেন। তাঁহারা চিতোরের রাণার বৃত্তিভোগী সেনানির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া শিশোদীয় ক্ষত্রিয়গণ এক পংক্তিতে পান-ভোজন করিতেন: তাঁহারা দুই শিশোদীয়া রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই দুই আরবি মুসলমান কিছুকাল চাকরি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাদের দুই হিন্দু রমণী সতী' হইয়া জ্যান্ত গোরে প্রবেশ করেন। ইহারা যখন চিতোরে আসেন, তখন সিন্ধুদেশেও মুসলমানদের সমাগম ঘটে নাই। পরম্পরায় একটা কথা প্রচারিত হইয়াছিল যে, আরব দেশে ইসলাম ধর্ম নামক এক নব ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে; উহা বৌদ্ধবিরোধী, 'বোধপরস্ত' নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই উহার অভ্যুত্থান। এই সমাচার শুনিয়া নব্য হিন্দুগণ, অগ্নিকুলের ক্ষত্রিয়গণ আশান্বিত এবং আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তাই মুসলমান অতিথিদ্বয়কে চিতোরের ক্ষত্রিয়গণ সমাদর করিতে ভুলেন নাই। শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে পাঠানদের অভিযানের কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এবং সকল জাতির মধ্যে বৌদ্ধবিরাগ অতিমাত্রায় প্রবল হইয়াছিল। এই বিরাগের ফলে সর্বত্র অন্তর্বিপ্লব, অন্তদ্রোহ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। বৌদ্ধবিদ্বেষবশতই পাঠানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন; বৌদ্ধ গোয়েন্দার ইঙ্গিতে পাঠানগণ–

'ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি পালটি লুটি নিল যা ছিল সার ও — ।'

এই লুটপাটের ফলে, গজনবীর মামুদের উপদ্রবের ফলে, ঘোরের মহম্মদের চাতুরিবশেই পরে ভারতবাসী হিন্দুর মনে মোসলেম বিদ্বেষ অনপনেয়, লেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। আর এই বিদ্বেষবশতই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবাসী সংযম এবং তিতিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সে সংযম ও তিতিক্ষা পরবর্তী সকল প্রাদেশিক হিন্দু সমাজের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কথাটা একটু খুলিয়া বলিব।

কমঠব্রত ও কমঠকবচ

বৌদ্ধ যুগের ব্যসন-বিলাস ও সামাজিক অনৈক্যের ও আত্মদ্রোহের ফলেই পাঠানগণ ভারতবর্ষে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাও অনায়াসে সিদ্ধ হয় নাই। ঘূর্ণাবর্তের মতন অপ্রতিহত প্রভাবে বার বার একুশ বার উত্তর ও পশ্চিম-ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া, লুটিয়া কাটিয়া পোড়াইয়া জনশূন্য করিয়া গজনবীর মামুদ মোসলেম বাহুবলের প্রতিষ্ঠা সাধন করেন। তাহার উপদ্রবে উত্তর-পাঞ্জাব হইতে গুর্জরের সোমনাথ পর্যন্ত পশ্চিম ভূভাগ দুই শতাব্দীকাল যেন জনশূন্য শ্মশানতুল্য হইয়াছিল। তাহার পরে ঘোরের মহম্মদ আসিলেন, তিনি সম্মুখসমরে হিন্দুগণকে পরাজিত করিয়া পাঠানরাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করেন। এ কার্যও এক প্রচেষ্টার ফলে সম্ভবপর হয় নাই। তাহার পর এক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত পাঠান অধিকারভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু বুধগণ বুঝিলেন, এ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বাহুবলে সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না, তিন শতাব্দীর চেষ্টায় কোনো ফল দেখিল না। অথচ জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রে, কাশীধামে, গৌড়ের নিকট গঙ্গা এবং কৌশিকীর (কুসী নদীর) সঙ্গমক্ষেত্রে সাধু সন্ন্যাসী সকলের মহাসভা ও বিচার হইয়াছিল। সে বিচার ফলে নৃসিংহাচার্য-ব্যাখ্যাত কমঠব্রত সমাজের অবলম্বনযোগ্য বলিয়া নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে ও জাতিবিশেষের মধ্যে এই কমঠব্রত কোন আকারে অবলম্বিত হইবে, তাহাই ধার্য করিবার জন্য স্মার্তপরম্পরা পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে ভবদেব, জীমূতবাহন হইতে স্মর্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন পর্যন্ত স্মার্তপরম্পরা বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও মীমাংসা ঘাঁটিয়া

এই কমঠব্রতের অত্যুৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই কমঠব্রত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের হিন্দুসমাজ এখনও সজীব আছে। সাতশত বর্ষের মুসলমান-প্রধান, তুরগি হারশির উপদ্রব আমাদের বিশিষ্টতা নষ্ট করিতে পারে নাই। এই কমঠব্রতের একটু আলোচনা প্রয়োজন। আগে উহারই ব্যাখা করিব।

কমঠ শব্দের অর্থ কচ্ছপ। কচ্ছপের যেমন বুকে পিঠে কঠিন কঠ আবরণ কবচের কাজ করে, তেমন এক এক সময়ে সমাজকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে কমঠকবচের আশ্রয় লাইতে হয়, কচ্ছপপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। কমঠব্রতের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হইল সংযম ও তিতিক্ষা। ব্যসন-বিলাস বহু লোকের, বহু শিল্পীর, বহু দেশজ সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। পরাজয়ের অবস্থায় পতিত জাতির জনবল ও ধনবল কমিয়া যায়; বিশেষত পরাজিত অবস্থায় বিলাসী হইতে হইলে রাজার জাতির অনুচিকীর্ষু হইতেই হইবে। বিজেতার অনুচিকীর্ষার ফলে পরাজিতের জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। বিশিষ্টতা নষ্ট হইলে জাতিনাশ ঘটে, ধর্মনাশ ঘটে, পরাজিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না।

অতএব বিজিত জাতিকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ব্যসন-বিলাস পরিহার করিতেই হইবে, সংযম তিতিক্ষার আশ্রয় লইতেই হইবে। জার্মান যুদ্ধের সময় যখন বিলাতের জাহাজের গতাগতি অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হয়, তখন কিছু কালের জন্য ব্রিটিশ জাতিকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কমঠব্রত আংশিকভাবে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। জার্মান জাতিকে মহারণের সময়ে, চারি বৎসরকাল আগাগোড়া কমঠব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই কমঠব্রত অবলম্বনের প্রথম স্তর হইল বিদেশিয় সামগ্রী সকলের নিন্দাকীর্তন; উহা যে অস্পৃশ্য, তাহা স্বজাতীয়গণকে বুঝাইয়া দেওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য। বিলাতে জার্মান যুদ্ধের কালে মহারানি আলেকজান্দ্রা হইতে সামান্য পুরনারী পর্যন্ত সকলকে British made goods-এর গুণকীর্তন করিতে হইয়াছিল; এখন বিলাতে Made in Germany ছাপ-মারা সামগ্রীপত্র অনেকের কাছে অস্পৃশ্য; ফ্রান্সে তো বটেই।

নৃসিংহাচার্য বলিয়াছেন যে, কমঠকবচ সনাতন মানবমনীষাসঞ্জাত ধর্ম এবং কর্তব্য। পরাজয়ের দুর্বর পোষণে অধীর হইলে প্রত্যেক জাতিই ঐ ব্রত অনাদি কাল হইতে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। কমঠব্রতের ফলস্বরূপ 'ছুৎমার্গ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার, জলচল এবং জল আচলের ব্যবস্থা।' কমঠকবচ পাইয়াই আমরা হাজার বৎসরকাল কেবল গাড়ু গামছা, খড়ম ও ধুতি সার করিয়া জীবিত ছিলাম, দরজির আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, সেলাই-করা কাপড় পরি নাই, পূর্বপুরুষের পোলাও, কোর্মা, কাবাব উদরস্থ করি নাই। কমঠকবচ পাইয়া আমরা দই চিড়ে খাইয়া, কাঁচকলা-ভাত খাইয়া বাঁচিয়া আছি। কমঠকবচ পাইয়া মুসলমানের-বিদেশিদের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করি নাই। ট্রিভিলিয়ান সাহেবের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব–'We have learnt the rare art of living upon nothing and we have secured for ourselves the path to immortality.' কমঠকবচই আমাদিগকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছে, আমরা অমরত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছি।

এই কমঠকবচের প্রকৃতি ও ধাতু ঠিকমতো বুঝিতে পারিলে আমাদের সমাজ-বিন্যাসের তত্ত্ব অনেকে বুঝিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ এবং নন-কো-অপারেশন এই কমঠকবচের বেদীর উপরে বিন্যস্ত। কমঠকবচ আছে বলিয়া আমাদের সমাজের মূল তত্ত্ব হইল স্থিতি; ইউরোপ, এতকাল গতি বা progress লইয়া ব্যস্ত ছিল, এইবার তাহাকেও স্থিতির অক্ষয় বটকে আলিঙ্গন করিয়া বাঁচিতে হইবে।

গোঁড়ামি

গোঁড়ামি এই কমঠকবচের প্রথম ও প্রধান ফল। আমার যাহা, তাহা অত্যুত্তম, নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, জগতে তাহার তুল্য আর নাই, আর হইতে পারে না, — এই ভাব, এই ধারণা, এই বিশ্বাস গোঁড়ামির বেদী। আমার জাতি অতি পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ, আমার আচারপদ্ধতি আমার পক্ষে অতি উপযোগী এবং নির্দোষ,

আমার বসনভূষণ অতি সুন্দর ও মনোহর, আমার ভাষা অতি মধুর দেবভাষা, আমার নারী লোকললামভূতা অনিন্দ্য সুন্দরী, আমার ধর্ম স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত, — সোজা কথায় আমার যাহা, তাহার তুলনা হয় না — করিতে পারা যায় না। ইহাই সকল স্বাধীন জাতির ভাষা ও ভাব। সকল স্বাধীন জাতির গোঁড়ার দল এই ভাবের কথাই বলিয়া থাকে। কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, গোঁড়া যে দেশে যাইবে, সেই দেশে ও জাতির মধ্যে স্বীয় সভ্যতাগত বিশিষ্টতা পরিস্ফুট রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। ব্রিটিশ জাতির তুল্য গোঁড়া জাতি আর দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই উষ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে বাস করিলেও তাহারা সেই তুষারধবল ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলন্ডের উপযোগী আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাক, পান-ভোজনপদ্ধতি, অশন বসন পুরামাত্রায় বজায় রাখিতে সার্থক চেষ্টা করে।

ইংরেজ ইংরেজের দোকানে বেসাতি করিতে ভালোবাসে, ইংল্যান্ডের শিল্পজাত সামগ্রীপত্রকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে, বিলাতি টিনে-মোড়া কত কালের শুটকি মাছ, গো-বলদ জিহ্বা, জেলি, হ্যাগিশ প্রভৃতি সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে, মোটা ধোক্কড় বিলাতি কম্বলের কোট পাৎলুন এ দেশে বারো মাস দেহের উপর চড়াইয়া বহন করিবার প্রয়াস পায়। কেবল নিজেরাই স্বদেশের এবং স্বজাতির সভ্যতার ও জীবিকা নির্বাহের বিষয়গুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া তৃপ্তি বোধ করে না, ব্রিটিশ জাতির প্রায় সকলেই বিজিত ভারতবাসী ইংরেজিশিক্ষিতগণকে নিজেদের আদর্শে কালা গোরা বানায়, আমাদিগকে ঐ সাজ-পোশাক পরাইয়া, ঐ রকমের পান-ভোজনের, বচন-বাচনের পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। ভারতবর্ষের কালা আদমি অন্তত একবার বিলাত ঘুরিয়া না আসিলে যেন সে ইংরেজের মনোমতো সভ্য ও সুমার্জিত হয় না; কোনো উচ্চপদের যোগ্য হয় না।

ব্রিটিশ জাতির এই দুর্বর গোঁড়ামির প্রতিরোধ করিতে হইলে বিজিত ও সম্মূঢ় প্রজার জাতির পক্ষে কমঠকবচ অবলম্বন করা ছাড়া জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষার উপায়ান্তর নাই। সাধারণত সকল বিজেতা জাতিই পরাজিত প্রজার কাছে মাত্রাধিক্যে গোঁড়া হইয়া থাকে। প্রজাকে তাহার সামাজিক গণ্ডির বন্ধনী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, বিজেতার অনুচিকীর্ষ করিতে হইলে, তাহার জাতি, কুল, ধর্ম নাশ করিতে হইলে, তাহার সমাজগত সংহতিশক্তি চূর্ণ করিতে হইলে, তাহার সম্মুখে বিজেতা জাতির সকল বিষয়েরই অধিক মাত্রায় শ্লাঘা প্রকাশ করিতে হয়, এবং প্রজার সকল বিষয়ের, সভ্যতার সকল প্রত্যঙ্গের ঘোরতর নিন্দা করিতে হয়। রাজার জাতির মুখে প্রজার সাজ-পোশাক, সভ্যতা-ভব্যতার নিন্দা অহরহ শুনিতে থাকিলে প্রজার যদি কমঠকবচের আবরণ না থাকে, তাহা হইলে ক্রমে প্রজা বিগড়ায়, স্বীয় জাতি, কুল, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া বিজেতা জাতির অঙ্গীভূত হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। এক বার বিজেতার অঙ্গীভূত হইবার বাসনা মনে জাগিলে পরাজিতের বিশিষ্টতা আর রক্ষা পায় না। মোগল পাঠানের আমলে এমন প্রজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত, ইংরেজের আমলে এমন প্রজা হ্যাট-কোট পাৎলুন পরিহিত, বিলাতি হাবভাবপূর্ণ সাহেব সাজে। সাহেবি পোশাকের নগদ বিদায়টা যে খুব মোটা। রেলগাড়িতে চড়িলে সাহেবি পোশাকে আঠারো আনা লাভ, আইন আদালতে অনেক সুবিধা, রাজপথে পদে পদে সুবিধা, কদাচিৎ যে কনেস্টবলের নিকট হইতে সেলামও পাওয়া যায়। সামাজিক গোষ্ঠীপতিগণ এটুকু বুঝেন বলিয়া কমঠকবচের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সকলকে গোঁড়া হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কবীর বলিয়া গিয়াছেন যে, উর্বশী মেনকার মনোমোহিনী শক্তি অপেক্ষা বিজেতা জাতির সম্মোহনশক্তি প্রবলতম, দুর্বর এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য। পরাজিত হইলেই একটু মনটা ছোটো হইয়া পড়ে; বিজেতা জাতিকে মনে মনে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করে, প্রজা এক বার বিজেতাকে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলে বিজেতার গোঁড়ামি প্রজাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবেই। তাই কবীর বলিয়াছেন — জয়-পরাজয় ক্ষণসাপেক্ষ; হারিয়াছি বলিয়া যে একেবারে স্থায়ীভাবে ছোটো হইয়াছি, অসভ্য বর্বর হইয়াছি, এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক নহে। এই ধারণাই জাতিনাশের মূল।

গোঁড়ামির বেদী

আমাদের হিন্দুয়ানির গোঁড়ামির বেদী হইল পাপ-পুণ্যের নির্দেশ। আমার যাহা, তাহা পুণ্যময়; অন্যের যাহা, তাহা পাপজ; এই ধারণা হইতেই হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি গজাইয়াছে। ভালো মন্দ বুঝি না, সুন্দর কুৎসিত বুঝি না, কেবল বুঝি এই যে, আমার যাহা, আমার অবলম্বনীয় যাহা, তাহা পুণ্যময়, আমার ইহপরকালের পোষক ও রক্ষক, পক্ষান্তরে তোমার যাহা, তাহা আমার পক্ষে পাপজ; তাহার দ্বারা আমার আয়ুক্ষয় ঘটে, বংশনাশ ঘটে, শেষে সর্বনাশ সম্ভবপর হয়।

আমি হিন্দু, আমার বিশিষ্টতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, আমাকে অমর অজর করিয়া রাখিবার বাসনায় আমি গোষ্ঠীতে ও ব্যষ্টিতে কমঠব্রত অবলম্বন করিয়াছি। সেলাই-করা জামা-জোড়া আমার পরিতে নাই, পোলাও কোর্মা কাবাব খাইতে নাই; পায়ের দিক দিয়া অর্থাৎ প্রথমে পা গলাইয়া যাহা পরিতে হয়, তেমন ইজার, পায়জামা, মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নাই, মৃৎপাত্র ব্যতীত অন্য পাত্রে কিছু রন্ধন করিয়া খাইতে নাই; নিত্যসংযমী তিতিক্ষীপরায়ণ হইয়া, গাড়ু গামছা সার করিয়া আমাকে থাকিতে হয়। তুমি রাজা, বিজেতা; জগৎ ছানিয়া তুমি ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়া উপভোগ করিতে পার — করিতেছও; তুমি তেজস্বী, তোমাতে ঐ সকল শোভা পায়। আমি পরাজিত; আত্মরক্ষার হিসাবে, বংশরক্ষার সাধে, আমার জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষার বাসনায় আমি কমঠব্রত অবলম্বন করিয়াছি, কচ্ছপমূর্তি অবলম্বন করিয়াছি; পৃথিবীর আর সকল দেশ, আর সকল জাতি আমার পক্ষে নাই বলিলেও চলে; আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করিতে চাহি না; গ্রহণ করিয়া করিবাই বা কি! রাখিবই বা কোথায়– কোন দেশে — কোন স্থানে? আমার বলিয়া আমার কিছু আছে কি? আমার ঘর নাই, দুয়ার নাই, দেশ নাই, সমাজ নাই,-আমার বলিবার কুত্রাপি কিছু নাই। থাকিবার মধ্যে আছে দেহব্যষ্টি, তাহাকেই নিত্যশুদ্ধ এবং পৈতৃক ধারানুযায়ী পবিত্র রাখিবার জন্যই আমি ব্যস্ত; এই দেহ ঠিকমতো রক্ষা পাইলে হিন্দু Type বা আদর্শ এই চৌদ্দ পোয়া দেহে অব্যাহত থাকিলে আবার শুভ দিন উদয় হইতে পারে, আবার শুভ অবসর আসিলে আমার অপহৃত সর্বস্ব, আমার আগামীগণ তেমন ভাগ্যবান হইলে তাহারা পরে করায়ত্ত করিবে, এই আশায় আমি দেহে জীবন ধারণ করিয়াছি। ইহাই হইল আচারধর্মের, রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের শুদ্ধিতত্ত্বের ফিলজফি। এই ফিলজফির আবৃত্তি রামানুজ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জীব গোস্বামী পর্যন্ত সকল আচার্যপাদ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই করিয়া গিয়াছেন; ইহারই ব্যাখ্যা কবীর দোঁহাবলীতেও করিয়াছেন, এই কথাই গোস্বামী তুলসীদাস অপূর্ব হিন্দিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কমঠ-তত্ত্বই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের আধুনিক সকল জাতির প্রচলিত সকল উপধর্মের ও নব সমাজবিন্যাসের গোড়ার কথা। প্রথমে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বৌদ্ধগণ পাঠানদিগকে আদর করিয়াছিলেন, বাংলার রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণে সে বার্তা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; পরে যখন সব যায়, এমন সম্ভাবনা ঘটিল, যখন কালাপাহাড়ের উপদ্রবে, মোগল পাঠানের ঘোরতর সংগ্রামে সর্বনাশের সম্ভাবনা ঘটিল, তখনই কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টায় সমাজ গঠন, নব ধর্ম প্রচার প্রভৃতি আরব্ধ হইয়াছিল, তখনই কমঠব্রতের প্রচলন হয়, তখনই কমঠকবচ হিন্দু মাত্রেই অবলম্বন করে, তখনই মোসলেম হিন্দুর অস্পৃশ্য হইয়াছিল, মুসলমানের ছায়া মাড়াইলে হিন্দুর জাতি যাইতে লাগিল। কমঠকবচ অবলম্বন করিয়াছিলাম বলিয়া মুসলমানের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতা করিয়া মোগলাই আমলে আমরা জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম। কেবল বাঁচিয়া থাকাই নহে, রাজপুতপ্রমুখ অনেক হিন্দু জাতি মোগলের সমকক্ষ হইয়াছিল। সেটুকু বুঝিয়াই আওরঙ্গজেব আবার হিন্দুপীড়ন আরম্ভ করেন, আবার মন্দির-মঠ ভাঙিতে উদ্যত হন, আবার জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে ব্যস্ত হন। উহার পরিণাম শিখ ও মারাঠার উদ্ভব, মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ। তাহার পর ইংরেজের পূতনার আদরে, নগদ টাকার লোভে, বিলাসব্যসনের মোহে, ইংরেজি স্বাধীনতার বংশীধ্বনির আকর্ষণে আমরা সে শুদ্ধিতত্ত্বের কমঠকবচ পরিহার করিয়া যাহা সাজিয়াছি, তাহা প্রত্যেক গৃহের মুকুরেই প্রতিফলিত। আমাদের পল্লীবাস গিয়াছে, স্বাবলম্বন গিয়াছে — আমার বলিবার যাহা ছিল, তাহার কণা মাত্র নাই। আছে কেবল স্মৃতি, তাহারই তাড়নায় এত কথা ব্যক্ত করিলাম। এ স্মৃতিও আর অধিক দিন বুঝি টিকে না।

কষ্টিপাথর

নৃসিংহাচার্য-ব্যাখ্যাত কমঠ-ব্রতের এই তত্ত্ব বৌদ্ধ যুগের পরে নব্য হিন্দুজাতির অভ্যুত্থানের মূল বেদী – কষ্টিপাথর। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য প্রভৃতি আচার্যপাদগণ এই জাতিগত মমত্ববোধের নানাবিধ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন। তঁহাদের ব্যাখ্যা বিবৃতির প্রভাবে হূণ, শবর আদি জাতিসকলের আক্রমণ হইতে হিন্দু আত্মরক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছে; শেষে মোগল পাঠানের আমলে উহারই কল্যাণে ভারতবর্ষের বারো আনা অংশ হিন্দু ছিল, এখনও আছে। উহাই Indian Federation-এর মূল বেদী, মৌলিক ফিলজফি। বাংলায় যত রকমের সমাজসংস্কার ও সমাজ-গঠন হইয়াছে, সকলই এই কমঠব্রতকে কীলকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, উহারই অবলম্বনে পরিবর্তন বা কোনোরূপ পরিবর্ধন ঘটাইয়াছেন। এই কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সকল ব্যবস্থা ও পদ্ধতির যাচাই করিতে হয়। Nationalism বল, Imperialism বল, সকল ism-ই এই কমঠ-ব্রতের বনিয়াদের উপর বিন্যস্ত। উহা যে ভারতবাসীর একচেটিয়া সম্পত্তি, এমন কথা বলিতে পারি না। উহা সকল সজীব, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জাতির শেষ অবলম্বন; উহা না হইলে, উহার সাধনা করিতে না পারিলে কোনো জাতিই জাতিগত বিশিষ্টতার ধারা অব্যাহত রাখিয়া চিরজীবী হইতে পারে না। জার্মান মহাযুদ্ধের পরে এই কমঠ-কবচের তত্ত্ব ইউরোপে আকারান্তরিত হইয়া উন্মেষ লাভ করিতেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, উহার আলোচনায় ব্যস্ত হইয়াছে। বল্লভাচার্য বলিয়া গিয়াছেন দৃ প্রেমিক ভক্ত কখনই উদার হইতে পারে না; প্রেমিক রেশমের গুটিপোকার মতন মমত্বের আবেষ্টনীর ভিতরে স্বীয় ঈপ্সিতকে রক্ষা করে। এই কমঠ-কবচই ভক্তিধর্মের প্রধান উপাদান।'[৬০]

তিন

"...উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের তথাকথিত উচ্চ জাতিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং অংশতঃ কায়স্থেরা বিবাহের ব্যাপারে কৌলীন্য মর্যাদার বিশেষ মূল্য দিতেন। বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন ও প্রসার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত অনেক বিষয়েই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। মধ্যযুগের কুলজী গ্রন্থমালা (১৫শ-১৮শ শতাব্দী), গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্টের "বল্লাল-চরিত' (১৪শ-১৬শ শতাব্দী) এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ নামে দুটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণগ্রন্থ (১২শ-১৪শ শতাব্দী) কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয়, আধুনিক যুগের বহু পণ্ডিত তাকে একান্তই অনৈতিহাসিক বলে মনে করেন।

উপরের সূত্রগুলি থেকে জানা যায় যে রাজা আদিশূর (১১শ শতাব্দী) কনৌজ বা কাশী থেকে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাদের সেবক কায়স্থদের বাংলাদেশে এনেছিলেন, তাদের বংশধরদের মধ্যে বিদ্যালোপ ও অনাচারের প্রসার রোধ করার জন্য সেনরাজ বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) এ দেশে প্রথম কৌলীন্য প্রথার প্রচলন করেন। কোনো বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা বল্লাল সেন সে যুগের ব্রাহ্মণদের পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন : এই পাঁচটি ভাগ হচ্ছে ক্রমনিম্নমর্যাদা অনুসারে কুলীন, শ্রোত্রিয়, গৌণ কুলীন, বংশজ ও সপ্তশতী গোষ্ঠী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বংশজদের পরিবর্তে কাপ ও শ্রোত্রিয়দের পরিবর্তে মৌলিকেরা সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এদের মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নবগুণযুক্ত কুলীনেরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণত, কুলীনেরা নিজেদের মধ্যেই বৈবাহিক আদান-প্রদান করবার অধিকারী ছিলেন। তবে শ্রোত্রিয় পরিবার থেকে কন্যা গ্রহণ করা দোষের ছিল না। কিন্তু যে সব কুলীন শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদান করতেন, অথবা গৌণ-কুলীনদের সঙ্গে কোনো রকম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন, তঁরা কুলভ্রষ্ট হয়ে বংশজ নামে পরিচিত হতেন। গৌণ-কুলীনের কিছুকাল পরে শ্রোত্রিয় শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে 'সাধ্য শ্রোত্রিয়' বা 'কষ্ট শ্রোত্রিয়' নামে পরিচিত হন, আসল শ্রোত্রিয়েরা তখন আপন সম্মান বজায় রাখার জন্য নিজেদের 'সিদ্ধ শ্রোত্রিয়' বলে ঘোষণা করেন।

---

[৬০]. পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়/বাঙালি সমাজের গোড়ার কথা [বঙ্গবাণী - ১৩২৯ বাং]
তথ্যসূত্র : দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য (১ম খন্ড)/সম্পা: অলোক রায়। [সাহিত্য আকাদেমি (প: বঙ্গ) - ২০০২। পৃ. ৪২০-৪২৫]

কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ আসার আগে বাংলাদেশে যে সব অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন, তাদের বংশধরেরা সপ্তশতী নামে পরিচিত ছিলেন। এদের সঙ্গে অন্য চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কোনো বৈবাহিক যোগাযোগ ছিল না। বল্লাল শুধু ব্রাহ্মণদের নয়, বৈদ্য, কায়স্থ এবং সৎশূদ্রদের মধ্যেও কোনো কোনো জাতির গুণ ও সঙ্গতি বিচার করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকেদের কৌলীন্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। এ কথাও বলা হয় যে বল্লাল নাকি কৌলীন্য মর্যাদাকে বংশানুক্রমিক করে যান নি, ছত্রিশ বৎসর অন্তর তিনি সমাজে গুণ ও কর্ম অনুসারে কুলীন নির্বাচনের আদেশ দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) এই রকম একটি নির্বাচনের সাহায্যে কয়েকজন শ্রোত্রিয়কে কৌলীন্য মর্যদা দান করা হয়, এবং বিপরীত ভাবে কয়েকটি কুলীন বংশ পতিত হয়ে বংশজ বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হয়ে যান। কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে সমাজে মহা বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় লক্ষ্মণ সেন কৌলীন্য মর্যাদাকে বংশানুক্রমিক করে যান, এবং একমাত্র পুত্র-কন্যার বিবাহের উৎকর্ষ-অপকর্ষের দ্বারা এই মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে গোলযোগের হয়ত অবসান ঘটেছিল, কিন্তু সমাজে দূর্নীতি প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়।

আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে স্বগত রমাপ্রসাদ চন্দ্র ও আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়, যাঁরা প্রথম কুলজী গ্রন্থগলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরুপণের চেষ্টা করেছিলেন, তারা কিন্তু উপরের এই কাহিনিকে একেবারেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন নি। তাঁদের মতে পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে যখন প্রথম কুলজী গ্রন্থগুলি রচিত হয়, তখন প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। রাজা আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না সে বিষয়েই সন্দেহ রয়েছে। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তাঁর বহু পূর্বেই, খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকেই, যে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গের চর্চা যথেষ্ট ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, যে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের নামের সঙ্গে কৌলীন্য প্রথা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, তাঁদের নিজেদের লিপিমালায় অথবা তাঁদের আমলে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থগলির কোথাও এই প্রথা সম্বন্ধে ইঙ্গিত মাত্র নেই। এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একজনকেও কেউ কুলীন বলে উল্লেখ করেন নি। সুতরাং ঠিক কি ভাবে, কোন সময়ে বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার আবির্ভাব হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে এখন বলা যায় না, যদিও অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেই যে এর সূচনা হয়েছিল, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন।

শুধু কৌলীন্য প্রথা সমাজের যত অনিষ্ট সাধন করতে পারত, তার চেয়ে অনেক বেশি অনিষ্ট সাধন করার শক্তি তাকে দিয়েছিল সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত দেবীবর ঘটক বিশারদের 'মেল-বন্ধন' ব্যবস্থা। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে বল্লাল সেন গুণ-অনুসারে ব্রাহ্মণদের কুলীন, শ্রোত্রিয় ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, আর তাঁর প্রায় দুশ' বৎসর পরে দেবীবর ঘটক দোষ অনুসারে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে মেল-বন্ধনের সৃষ্টি করলেন। সেন রাজাদের আমল থেকেই বাংলাদেশে, বিশেষতঃ বিত্তবান নাগর সমাজে, দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দেয়। কুলীন সম্প্রদায়ও এই সব দোষ হতে মুক্ত ছিলেন না, এবং ব্যভিচার, ম্লেচ্ছ-সংসর্গ প্রভৃতি যে সব গুরুতর অপরাধে সমাজে পতিত হবার কথা, বোধ হয় বহু কুলীন সে সমস্ত দোষে দোষী হয়েছিলেন। যে যে কুলীন বংশ একই রকম দোষে দূষিত, দেবীবর তাদের এক সম্প্রদায় বা 'মেল-ভুক্ত করেন, এবং এই ভাবে পৃথক পৃথক দোষ অনুসারে সে যুগের কুলীনেরা মোট ছত্রিশটি 'মেলে' বিভক্ত হয়ে যান। ফুলিয়া ও খড়দহ মেলই এদের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য হন। এর আগে কুলীনেরা নিজেদের মধ্যে অবাধে বৈবাহিক আদান-প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু দেবীবরের বিধি অনুসারে মেলের বাহিরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কুলীন কন্যাদের বিবাহ এর ফলে এক বিরাট সামাজিক সমস্যা হয়ে দাড়ায়। দেবীবরের প্রবর্তিত বহু মেল কালক্রমে সংখ্যার বিচারে খুবই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, অথচ তাঁর নিয়ম অনুসারে এক মেলের কুলীন কন্যার সঙ্গে অপর মেলের (বিশেষতঃ নিম্নতর মেলের) কুলীন পাত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ থেকে যায়। অন্যদিকে আবার শ্রোত্রিয় ও বংশজ পরিবারের পিতারা তাদের কন্যাদের কুলীন পাত্রে সমর্পণ করে সামাজিক মর্যাদা লাভের চেষ্টা করতেন।

কুলীন পাত্রদের জন্য সমাজে এই ভাবে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলে স্বাভাবিক কারণে তাদের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং কুলীনদের বহুবিবাহ (hypergamy) প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে যে কুলীন পাত্র শ্রোত্রিয় বা বংশজ কন্যা বিবাহ করতেন, তারা 'ভঙ্গকুলীন' বা 'স্বকৃতভঙ্গ' বলে পরিচিত হতেন। কিন্তু একবার এরূপে গণ্য হলে তিনি যে কোনো ব্রাহ্মণ বংশে যতবার ইচ্ছা বিবাহ করতে পারতেন, তাতে তার বা তার পরবর্তী চার পুরুষের আর কুলক্ষয় ঘটত না। পঞ্চম পুরুষ অবশ্য বংশজ বলে পরিচিত হতেন, পাত্র হিসাবে তার আর বিশেষ জাতিগত মর্যাদা থাকত না। এই ধরনের ভঙ্গকুলীনকে জামাতা করবার জন্য শ্রোত্রিয় ও বংশজ কন্যার পিতারা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন, এবং ঘটকেরাও অর্থপ্রাপ্তির লোভে এই ধরনের বিবাহে উৎসাহ দিতেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন বলে মনে হয়।

এই পরিস্থিতিতে বহু কুলীন-সন্তান বিবাহকে ব্যবসায় বা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং এই ব্যবসায় সে যুগে নিতান্ত কম লোভনীয় ছিল না। Risley সাহেব তার বিখ্যাত গ্রন্থ Tribes And Castes of Bengal-এ বলেছেন যে এ রকম বিবাহে বরপণের অঙ্ক দু'হাজার টাকা পর্যন্ত প্রায়ই উঠত, এবং পূর্ববঙ্গে কুলীনের চাহিদা এত বেশি ছিল যে, দশ বৎসর বয়স হলেই কুলীন-সন্তানের বিবাহের কথা তার বন্ধু মহলে আলোচিত হত। একই রাত্রে একটি কুলীন সন্তান এক অথবা ভিন্ন গ্রামে চার বা ততোধিক কন্যার পানিগ্রহণ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত সে যুগে খুব বিরল ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও শোনা যায় যে কোনো গৃহকর্তা তাঁর সমস্ত অবিবাহিতা ভগ্নী এবং কন্যাদের উপযুক্ত পাত্রের অভাবে একই কুলীন সন্তানের হাতে সমর্পণ করেছেন। বলা প্রয়োজন, এই সব কুলীন পাত্রেরা তাদের বিবাহিতা পত্নীদের অধিকাংশেরই ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। পত্নীদের অধিকাংশই তাদের পিত্রালয়ে সারা জীবন কাটাতেন, এবং তাঁদের সন্তানেরাও মাতুলালয়ে পালিত হতেন,- কুলীন পিতারা সব সময়ে তাদের সন্তানদের পরিচয়ও জানতেন না। যোড়শোপচারে পূজা না পেলে কোনো কুলীন সন্তান বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বিশেষ যাতায়াত করতেন না, এবং কুলীন জামাতার মনোরঞ্জনের জন্য শ্বশুর মহাশয় সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন।

অনেক সময় রাত্রিকালে পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার আত্মসাৎ করে কুলীন জামাতা শ্বশুরালয় ত্যাগ করেছেন এমন কাহিনিও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংবাদপত্রে পড়া যায়। কুলীনপাত্রে কন্যা সমার্পণ করে কলকাতার জনৈক ধনী ব্যক্তির নিঃস্ব ও দেশত্যাগী হওয়ার সংবাদ ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্র থেকে জানা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকে (১৮৫৪) এবং টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বইটিতে কুলীন জামাতাদের এ রকম বহু অত্যাচারের কাহিনি পাওয়া যাবে। সমকালীন সমাজের চিত্র হিসাবে এই বই দুটির সাক্ষ্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

কুলীন-বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কুল রক্ষার প্রয়োজনে পাত্র-পাত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে কোনো লক্ষ্য রাখা হত না। এক দিকে যেমন মুমূর্ষ, গঙ্গাযাত্রীর হাতে কিশোরী কন্যা সমর্পণ করার বহু কাহিনি শোনা যায়, অপর দিকে তেমনি শিশুপাত্রের সঙ্গে বিগত যৌবনা কন্যার বিবাহও নিতান্ত বিরল ছিল না। O Malley সাহেব 'Jessore District Gazetteer'-এ স্থানীয় কুলীনদের প্রসঙ্গে লিখেছেন — 'Little boys sometimes marry aged women and vice Versa.' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' (১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত)–'নারীগণের পতিনিন্দা' অধ্যায়ে জনৈকা কুলীনললনার আক্ষেপ একই সঙ্গে হাস্য ও করুণ রসের অবতারণা করেছে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে। যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই।'

আবার 'অন্নদামঙ্গলে'ই অন্যত্র শিশুকন্যার বৃদ্ধ কুলীনের কণ্ঠালগ্ন হওয়ার কাহিনিও পাওয়া যায়। বৃদ্ধ জামাতা শিবের দর্শনে পার্বতীমাতা মেনকার বিলাপ বাঙালীগৃহের কুলীনকন্যার জননীর মর্মভেদী শোকোচ্ছাস ছাড়া আর কি?

কৌলীন্য প্রথার ফলে কুলীন পাত্রদের সুখসুবিধা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলেও কুলীন কন্যাদের অনেককেই দীর্ঘকাল অবিবাহিতা থাকতে হত, কারো কারো সারা জন্মে পাত্রই মিলত না। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে কয়েকজন পত্রলেখিকা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন এই ভাবে–'আমরা প্রৌঢ়া, পতিহীনা, দীনা, ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণদের কন্যা।'

যে সব কুলীন কন্যাদের পাত্রাভাবে আজীবন কুমারী থাকতে হত, তাদের বলা হত 'ঠেকা মেয়ে'। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৯১২), নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', প্রথম খণ্ডে, লিখছেন, 'যশোরের অন্তর্গত কাশীপুর, লক্ষীপাশা প্রভৃতি গ্রামে এরূপ 'ঠেকা মেয়ে' অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।' কুলীনকন্যাদের মতো শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রদের বিবাহও ক্রমশ দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। কুলীন কন্যাদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ ত' হতই না, উপরন্তু তাঁদের স্বজাতীয়া কন্যার পিতারাও প্রচুর পণের বিনিময়ে কুলীন জামাতা সংগ্রহ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। ফলে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রদের পণ দিয়ে পাত্রী সংগ্রহ করতে হত, এবং পণের অভাবে অনেক পাত্রের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিবাহই হত না। শ্রোত্রিয় ও বংশজদের পাত্রী সংগ্রহের জন্য একদল ব্যবসায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিম্নজাতির, এমন কি দরিদ্র মুসলমান পরিবারের কন্যা কিনে এনে তাদের ব্রাহ্মণ-কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে মূল্য বিনিময়ে বিবাহ দিত। অনেক সময় নৌকা করে আনা হত বলে এদের 'ভরার মেয়ে' নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় বর্ধমানে জনৈক বংশজ ব্রাহ্মণের ৪০০ টাকা মূল্য দিয়ে যবনীকন্যা ক্রয়, বিবাহ ও পরে পত্নীর বংশপরিচয় অবগত হয়ে তাকে পরিত্যাগ করার কাহিনি পাওয়া যায়। কুলীন পাত্রের পিতার মতো শ্রোত্রিয় কন্যার পিতাও অবশ্য অনেক সময়ে প্রচুর পণের বিনিময়ে শ্রোত্রি জামাতার হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করতেন। 'কুলীনকোল সর্বস্ব' নাটকে জনৈকা বংশজ গৃহিণী গর্ব করে বলেছেন,- 'তবে আপনি শুনুন, আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড়ো ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোঁঠা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে।' শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যাশূল্ক গ্রহণ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে দুটি নাটকও আছে, - একটি নফর চন্দ্র পালের 'কন্যা বিক্রয়' (১৮৬৩) অপরটি জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ প্রণীত 'আসুরোদ্বাহ নাটক'(১৮৬৯)।

কৌলীন্য প্রথার আরো দু'একটি কুফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানা যেতে পারে। প্রথমত, এই প্রথার ফলে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে মতের দলাদলি অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। কুলীনদের মধ্যে উচ্চ মেলের লোকেরা নিম্ন মেলের লোকেদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন, তা ছাড়া কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজদের মধ্যে ক্রিয়া-কর্মে যথেষ্ট প্রভেদ করা হত। এই দলাদলির জন্যই কুলীনদের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম কখনোই শান্তিতে নিষ্পন্ন হত না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল"-এ ছদ্মবেশী দেবী অন্নপূর্ণার প্রতি ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি 'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল'- বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, বহু কুলীন কন্যা এবং শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্র দীর্ঘকাল বা আজীবন অবিবাহিত থাকার জন্য এবং বিবাহিতা কুলীন কন্যাদেরও অনেক ক্ষেত্রে চিরকাল পিত্রালয়ে বাস করার ফলে সমাজে বিরাট দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানের মহারাজা গভর্নর-জেনারেলের আইন-পরিষদে কৌলীন্য প্রথা রহিত করার জন্য যে আবেদন পত্র পাঠান, তাতে এই দূর্নীতির কথা খুব জোর দিয়েই বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তার 'বহু বিবাহ-প্রথম পুস্তকে' সমাজের এই দুষ্টক্ষতের দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তৃতীয়ত, সতীদাহ ও কৌলীন্য প্রথা একই সময়ে প্রচলিত থাকার ফলে বাংলাদেশের নারীজাতির দুর্ভোগ বেড়ে গিয়েছিল। একটি কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে অনেক সময় তাঁর বহু পত্নীকে সহমরণে যেতে হত। পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর 'A View of The History. Literature And Religion of The Hindus' (১৮৭৭) বইটিতে যে সব বীভৎস সতীদাহের কাহিনি উল্লেখ করেছেন, তাদের সত্যই কোনো তুলনা নেই।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার কাছে বাগনাপাড়া গ্রামে অনন্তরাম নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। শবদাহ হয়ে যাওয়ার পর তিন দিন চিতাগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং তার শতাধিক পত্নীর মধ্যে ৩৭ জন সহমরণে যান।

এই সতীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার বয়স ছিল ৪০ এবং কনিষ্ঠার মাত্র ১৬। এদের মধ্যে মাত্র তিন জন তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন, অন্যেরা তাঁকে জীবদ্দশায় খুব কমই দেখেছিলেন। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে চুণাখালিতে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তিনি সর্বসমেত পঁচিশটি বিবাহ করেছিলেন। তার মধ্যে তেরো জন পত্নী তাঁর জীবদ্দশাতেই মারা যান। আর অপর বারো জন তার সঙ্গে সহমৃতা হন। এর ফলে ত্রিশটি এর ফলে ত্রিশটি শিশু সহসা অনাথ হয়ে পড়ে। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে The Calcutta Review (Vol. VI) পত্রিকায় প্রকাশিত 'The Banks of Bhagirathi' নামে একটি প্রবন্ধে রেভারেণ্ড জেমস লঙ শান্তিপুরের জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তার এক শত পত্নীর মধ্যে আটজনের সহমৃত্যু হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যারা স্বামীর সহমৃতা হতেন না, সেই সব বিধবা কুলীন পত্নীদের অবশিষ্ট জীবন যে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে কাটত, তা বলাই বাহুল্য।"[৬১]

চার

"...শারদীয় দুর্গা পূজা হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্যে রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক চালুকৃত একটি হিন্দু উৎসব। আমি নিজেও ইতিহাসবিদ নই। আমি এ কথা লিখছি কলকাতার বিখ্যাত পত্রিকা The Statesman থেকে। ১৯৯০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তপতি বসু তার 'When Durga rode a Mlechcha' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন,

'...Sardotsav or Durga Puja in the autumn, was then quite unfamiliar to Bengalis. Durga rode her lion into Bengal once a year in the spring ...The battle of plassey had been won. Sirajud-daulah defeated. But the Hindus were still to be wooed. And portraying the defeat of Siraj as the victory of Hindus over Muslim was not enough ...out come. Robert Clive obviously assisted by his treacherous aides. Raja Krishna Chandra Ray and Nabakrishna Dev with the idea or celebrating the victory by holding a Hindu festival ...Durga Puja was decided upon. But there was a problem. Clive had won the battle at the wrong time of the year. June 23. 1757. to be precise. Pundits were consulted. And Nabakrishna Dev settled for an elaborate Akal Bodhon - an untimely awakening - practiced in Calcutta even today ...Clive had played the Hindu card only too well. He had a personal interest in making this Puja a success. And a success it was.'

তপতি বসুর অনেক বড়ো নিবন্ধের এই উদ্ধৃত অংশের সারাংশ হলো : '...শরৎকালে দুর্গা পূজা আগে হতো না। পলাশী যুদ্ধের পর এ বিজয়কে হিন্দুদের বিজয় হিসেবে দেখানো এবং তাদেরকে খুশী করার জন্যে ক্লাইভ একটা উৎসবের কথা চিন্তা করেন এবং এই উৎসবই দুর্গা পূজা হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়।' ধীরে ধীরে এই পূজাই সার্বজনীন দুর্গা পূজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"[৬২]

পাঁচ

"...ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূলসন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুজে, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে ধুক্তে ধুক্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কার কত্তে হলো; মূলসন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাসের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাথায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, –বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানায় মেকাবি ক্লাকে টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো, সূর্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা কেটিং, সেলফ ড্রাইভিং বগী ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন; কেউ বাগানে চল্লেন। দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পেছনে

---

[৬১]. অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়/জাতিভেদপ্রথা ও ঊনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ। [কে পি বাগচী এ্যান্ড কোং (কলকাতা) - ১৯৮১। পৃ. ৩১-৪৩]

[৬২]. আবুল আসাদ/যুগ সন্ধিক্ষণের পৃথিবী। [কমপিউটার পাবলিকেশন্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৬। পৃ. ১১০]

মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো; পাছে লোকে জান্তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সহিস-কোচম্যানকে তকমা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন, খাতির নদারৎ– কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতরে থেকে উকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো; সন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে - শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্ছে। প্রায় আধা ঘন্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেল; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণবদনে 'কোন অপরাধ হয়ে থাকবে' বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন– উপস্থিত দর্শকেরা 'বোধ হয় মূলসন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়' এই বলে নানাবিধ তর্কবিতর্ক আরম্ভ কল্লে অবশেষে গুরুপুরুত ও গিন্নির ঐক্যমতে বাড়ির কর্তবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো।

একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে - 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল তো পড়ে না, সন্ধ্যা হয়।' - বাবুর ফিটন প্রস্তুত, পোষাক পরা, রেশমি- রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন - শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে-কাণ্ড বন্দ করা হয় না; অগত্যা পায়নাপেলের চাপকান পরে সেই সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন –বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ির দারোয়ানেরা আগে আগে সার গেথে চল্লো; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ণবদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগলো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে ভন্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' বলে চিৎকার কত্তে লাগলো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন। বড়ো বড়ো হাত-পাখা দুপাশে চলতে লাগলো। বিশেষ কারণ না জানলে অনেকে বোধ কত্তে পাততো যে আজ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি-রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, বাবা ফুল দাও' বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরুতে লাগলো, আধ ঘন্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে পড়লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, 'বলে ভন্দেশ্বরে শিবো' বলে বলে চিৎকার হতে লাগলো, সকলেই বলে উঠলো, 'না হবে কেন - কেমন বংশ'।

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বইচির ডাল তুলে আনলে। গাজনতলায় বিশ আঁটী বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুইজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে - সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ শিবের কি মাহাত্ম্য! কাঁটা ফুটুলে বলবার যো নাই! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু একজন কুটিল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মতো অন্তরীক্ষে রয়েছেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জানতে পাল্লে না। কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উলটো ঝাঁপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠলো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটনি কত্তে লাগলেন– গিন্নীরা বলে দিয়েছেন–'ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।'

...আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন — আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগগু করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোনো উপাচার্য বড়ো ধূম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে

গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসব হবে। আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন না— আড্ডা থেকে না ডাক্‌লে শুনতে পাবেন না? ক্রমে কৃশ্চানি ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি-কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকরণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড়ো বড় জুড়ী, ফেটিং ও স্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সঙের মতো পাল্কীগাড়ির ছাতের উপর বসে চলেচেন! ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ-বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই— বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন; ক্রমে ছোটো জাতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো। –সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু ন্যাবড়ানোর বদলে— ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্ট্রোডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ি আহার করা, মেয়েদের বাঁ-নাক বেধাঁন চলিত হলো দেখে বোতলের দোকান, কড়ি গণ্য, মাকু ঠেলা ভালুকের লোমব্যাচা কোলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। থরকামান চৈতন্যফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্তি হলেন। চাবির থলো কাদে করে টেনা ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভালো দেখায় না; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ি, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক, মোসাহেব, তকমাআরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে-কৌশলে, বেণেতী বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেছেন— প্রায় অনেকেরই এক-একটি পোষা পাশবালিশ আছে–'যে আজ্ঞে' ও 'হজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক' বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ-কর্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিস্টের খরচে চার-পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউন্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগগির ফুরায় না, বারোইয়ারি পূজোর প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে - সেসব বলতে গেলে পুথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা চড়ক টাটকা-টাটকাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মুহুরি দেওয়া তলতাবাঁশের বাঁশি, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলায় নানাপ্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেছে; 'ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং' ঢাকের বোল বাজে; গোলাপি খিলির দোনা বিক্রি হচ্চে। একজন চড়কী পিঠে কাঁঠ ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল 'দে পাক দে পাক' শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার হাজার লোক মজা দেখছেন।"[৬৩]

---

৬৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ/কলিকাতায় চড়ক পার্বণ [হুতোম প্যাঁচার নক্সা - ১৮৬১ ইং] তথ্যসূত্র : দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য (১ম খণ্ড)/সম্পা: অলোক রায়। [সাহিত্য অকাদেমি (প: বঙ্গ) - ২০০২। পৃ. ৯৪-৯৫/১০২-১০৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : স্মৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা

এক

"...তাকে (খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান ওরফে ডক্টর জনসন, সিএসপি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বর্ণযুগ' বা সেরকম কোন গৌরবদীপ্ত সময় হিসেবে কোনো মেয়াদকে চিহ্নিত করা যায় কিনা। তখন শামসুর রহমান এক কথায় কোন জবাব দেননি। তবে একটু পূর্বকথার মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন ঝগড়া-ফ্যাসাদ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিলেন।

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবির পেছনে অনেক রকমের যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। তবে ইংরেজ শাসকদের কাছে অন্য সব যুক্তি ছাপিয়ে রাজনীতির যুক্তিটাই ছিল প্রবলতম। আর কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিটাও ছিল রাজনৈতিক। আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তির খ্যাতি অর্জনকারী একমাত্র বাঙ্গালী মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঢাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে জোরেসোরে অভিমত দিয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে কিভাবে তা নিয়ে তিনি ঘোর সন্দিহান ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহল হ'তে ছিল সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর বিরোধিতা ছিল একেবারে সর্বজনবিদিত ও অতি প্রকাশ্য। এক্ষেত্রে তার পরম সুহৃদ ও বন্ধু পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন একাট্টা। কিন্তু অবশেষে ঢাকায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েই গেল তখন এর ভাইস-চ্যান্সেলর হার্টগের মেধা-শিকারযজ্ঞের প্রথম দিকের পাত্রই হয়ে গেলেন এই বিখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অনেকে অবাক হ'লেন। আশুতোষ মুখার্জী তো ক্ষেপে অস্থির হ'য়ে গেলেন। ক'দিন আগেই না দু'বন্ধু মিলে প্রস্তাবিত ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে ব্যঙ্গ ক'রে 'মক্কা ইউনিভার্সিটি' নামে অভিহিত করেছেন। কত যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর ক'দিনের ব্যবধানে হরপ্রসাদ সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলেন। হরপ্রসাদের ছুটি বা রিলিজ নেওয়া ও তার পাওনাদি আদায়ের আবেদনের ওপরও বাগড়া বাঁধানো হয়েছিল তখন।

আশুতোষ ও হরপ্রসাদের বন্ধুত্ব তো আশৈশবের। একেবারে হরিহর-আত্মা ছিলেন দু'জনে। বন্ধুতার গভীরতা এতখানি ছিল যে, বয়স হলে তাদের যখন ছেলে হ'তে থাকে তখন উভয়েই তাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর নামের সাথে মিলিয়ে ছেলেদের নাম রাখতেন। যেমন, হরপ্রসাদের ছেলেদের নাম মহীতোষ, ভবতোষ ইত্যাদি। আবার আশুতোষের ছেলেরা হ'লেন শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ইত্যাদি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পর ছুটিতে একবার কলকাতায় গিয়ে বন্ধুর সাক্ষাতের চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হন। যে ক'বছর বেঁচে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী আর হরপ্রসাদের মুখদর্শন করেননি। বাক্যালাপ তো দূরের কথা, পত্রালাপও হয়নি কখনো।"[৬৪]

দুই

"...আর. সি. মজুমদার এক সময়ে বলেছেন যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে মুসলমানরা খুবই খুশি হলেন বটে কিন্তু হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।' তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণত যারা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তারাও এবার এর প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। এরা হলেন রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তাদের প্রধান যুক্তি হল যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে সত্য কিন্তু তার বদলে এখন একটা সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে এতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। হিন্দু নেতাগণ একে 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তাচ্ছিল্য করেছেন। অনেকে 'ফাক্কা' বিশ্ববিদ্যালয়ও বলেছেন।

---

[৬৪]. ড. শেখ আব্দুর রশীদ/সেই সিভিল সার্ভিস সেইসব সিভিলিয়ান। [মুক্তচিন্তা প্রকাশনা - ২০১১। পৃ. ২২৬-২২৭]

অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। বহু বছর পর ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ. কে. ফজলুল হক চ্যান্সেলরের ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তিনিও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে প্রবল বাধা আসে এবং তাদের সেটাকে অতিক্রম করতে হয়।

...যারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রদান করেন তারা কোন সময়ে এ অঞ্চলের মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় আনেননি। বহুকাল থেকে বাংলার পূর্বাঞ্চল শিক্ষা-দীক্ষায় অবহেলিত হতে থাকে। কলিকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রলোক শ্রেণী কেবল কলিকাতার উন্নতিকেই দেশের উন্নয়ন হিসেবে গণ্য করেছেন। সে কারণে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কলিকাতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা কোন সময়ে চাচ্ছিলেন না যে, কলিকাতার অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান মুসলমান অধ্যুষিত ঢাকায় গড়ে উঠুক।

কলিকাতা তখন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। পিছিয়ে পড়া মুসলমান ছাত্ররা সুদূর কলিকাতায় গিয়ে লেখাপড়া করতে পারতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের যেমন পড়ার সুযোগ কম ছিল তেমন পরিচালনা সংস্থাগুলোতেও তাদের তেমন প্রাধান্য লক্ষ করা যায় না। ১৯০৪ সালের পূর্বে কোন মুসলমান সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন না। এ সময় পর্যন্ত কোন মুসলমান ফেলোও প্রবেশ করতে পারেননি। ১৯১৭ সালে দেখা যায় ১১০ জন ফেলোর মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ৭ জন। আবাসিক বা প্রশাসনিক কমিটিতে কোন মুসলমান ছিলেন না। পাঠ্যসূচিতে হিন্দু প্রভাব লক্ষ করা যায়। মুসলমানদের যে সব ইতিহাস ছিল তাও বিকৃত করা হয়। পাঠ্যতালিকা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রায়ই সংস্কৃত উদ্ধৃতিযুক্ত পুরাণ কাহিনি এবং কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। এমন কয়েকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মুসলমান ছাত্ররা আর সকল বিষয়ে খুব কৃতিত্বপূর্ণ নম্বর পেয়েছে, অথচ তাদের দূর্ভাগ্য কেবল মাতৃভাষার পরিক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। মুসলমান ছাত্রদের সমস্যা সৃষ্টি করে পাঠ্যপুস্তক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষদ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মুসলমান বর্জিত হওয়ায় মুসলমান বিষয় সম্পর্কিত পুস্তকের কিংবা মুসলমান লেখক রচিত পুস্তকের প্রতি সহানুভূতিমূলক বিবেচনা প্রদর্শিত হয়নি।' এ কারণেই ১৯০৩ সালে সৈয়দ আমীর আলী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লন্ডনস্থ ছাত্রদের সমাবেশে বলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আসলে হিন্দুদের বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শিক্ষা সম্মিলনে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রনের ভারও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অথচ সেখানে কোন মুসলমান সিন্ডিকেট সদস্য নেই। একশত জন সাধারণ সিনেট সদস্যের মধ্যে কেবল মাত্র ৬ জন হলেন মুসলমান। কোন অফিসে মুসলমান কর্মকর্তা দেখা যায় না। ১৯১৫-১৬ সালে বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, আজ পর্যন্ত সেখানে মুসলমান ছাত্রেদর কোন হল নির্মিত হয়নি। এজন্য তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট করে থাকতে হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, ল কলেজ - কোথাও কোন ছাত্রাবাস ছিল না। ভারতীয় আইনসভায় ১৯২০ সালে বলেন, ২৩টী কলেজের গভর্ণিং বডিতে কোন মুসলমান প্রতিনিধি নেই, ১০৬৫ জন কলেজিয়েট শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন মুসলমান। ল কলেজের ৭০ জনের মধ্যে কোন মুসলমান নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন প্রভাষক হলেন মুসলমান। সে কারণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

...পূর্বে কলিকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রলোক শ্রেণীর ধারণা ছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়। কেউ কেউ একে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে তাচ্ছিল্য করেছেন। কিন্তু আমরা যদি গঠণ প্রণালী, ছাত্র সংখ্যা, পাসের হার সব কিছু বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সেখানে হিন্দুদের প্রাধান্য কম ছিল না। প্রথম একাডেমিক কমিটির ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন হিন্দু, ৮ জন ইংরেজ ও ৫ জন মুসলমান। এর মধ্যে আর. সি. মজুমদার একজন সদস্য। মুসলমান সদস্যের মধ্যে ছিলেন স্যার এফ. রহমান ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

...আসলে কমিটি গঠন, ছাত্র সংখ্যা, পাসের হার সবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হিন্দুদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তাহলে তারা আগাম কি করে বলেন যে, ঢাকা হবে মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়? ছাত্র হবে না, কেননা কৃষক সন্তান আর কয়জনইবা পড়তে আসবে। আসলে সুযোগ পেলে পরিস্থিতি যে আলাদা হতে পারে তা তারা বুঝতেই চাননি। অনেকে বলেছেন যে, এটা হবে 'ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থাৎ এখানে তেমন মেধাবী ছাত্র পড়তে আসবেন না। যারা সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান তারা কলিকাতায় গিয়েই পড়াশোনা করেন। এটা আসলে তেমন ফলদানকারী প্রতিষ্ঠান হবে না। কিন্তু ফলাফল বিশ্লেষণ করলে তা প্রমাণ হয় না। ১৯২২ সালে বি.এ. প্রথম শ্রেণীতে যারা পাস করেন এর মধ্যে ৫ জন ছিলেন হিন্দু, এম.এ. - তিনজন প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন এবং তারা সবাই ছিলেন হিন্দু। তুলনামুলক আলোচনা করলে দেখা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢাকার ফলাফল ভালো ছিল। প্রমাণসহ বলা যায়, ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাবর্ষে ১০ জন বি.এ. পরীক্ষা দেন। দশজনের মধ্যে ঢাকা কলেজ থেকে ১ জন অংশ নেন। সকলেই অকৃতকার্য হন। পরে দুজনকে প্রমার্জন নম্বর দিয়ে পাস করান হয়। এর মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন এবং অন্যজন হলেন যদুনাথ বসু। সেই থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমার্জন নম্বরের বিধান চালু হয়। এতকিছু জানা ও বুঝার পরও অন্নদাশঙ্কর রায়ের মত ব্যক্তিও বলেছেন যে, আসলে মুসলমানদের সুবিধার জন্য নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মুসলমানদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের সুপারিশ করে। প্রথমে তিনটি হল ছিল। যথা: ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল। মুসলিম হলে ১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছিলেন ৭৫. ১৯২৩-২৪ ১২৭, ১৯২৫-২৫ ১৬০, ১৯২৬-২৭ ২০৪, ১৯২৭-২৮ ২২৯ জন। ছাত্র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন স্যার এফ. রহমান এবং হাউজ টিউটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এসব ছাত্রের বিভিন্ন স্থানে আবাসন দেওয়া হত। সেজন্য একটি স্বতন্ত্র বিল্ডিং নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ১৯২৭ সালে একটি হল নির্মিত হয়। ১৯২৯ সালে এর নাম হয় এস. এম. হল বা সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। ১৯২৩ সালে এ হল নির্মাণের সংবাদ শোনার পর পরই নানা কথা বলতে থাকেন। কেউ কেউ বলেন যে, মুসলমান ছাত্র সংখ্যা কোন সময়ে এত বেশি হতে পারে না, তাই প্রকাণ্ড হল নির্মাণের কোনোই প্রয়োজন নেই। তারা মন্তব্য করেন যে, এ হলে ছাত্রের অভাবে এক সময়ে গরু-ছাগল থাকবে। এস. এম. হলের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেটি আমি সম্পূর্ণ পাঠ করেছি এবং স্বাভাবিকভাবেই স্তম্ভিত হয়েছি যে, ঐ হল কত পৃথিবীখ্যাত ও দেশবরেণ্য ব্যক্তিকে বুকে ধারণ করেছে।

...এসব আলোচনা থেকে একটি ভাব বেরিয়ে আসে, তাহল এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নকে কোন সময়ে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা হয়নি। সে কারণেই একটি মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে কেন্দ্র করেও তাদের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গের ফলে যে উন্নতি হয় তা রদ হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এর কিছু ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনে ভাষণদানকালে লর্ড লিটন বলেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল বঙ্গভঙ্গ রদের কিছুটা ক্ষতি পূরণ। এ অঞ্চলের মানুষ একে মনে প্রাণে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নানাভাবে ক্ষতি করতে তৎপর হয়। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকার সে সময়ে ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয় অথচ শিক্ষামন্ত্রী প্রভাস সিং তা সমগ্র বাংলাদেশের কাছে এনে সেটা সমগ্র বাংলা প্রদেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বরাদ্দ দেন।

এমনিভাবে বিস্তারিত আলোচনা করলে এটা সহজে প্রমাণিত হয় যে, এ অঞ্চলের মানুষের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন ছিল। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের কল্যাণের জন্য কোন প্রকার দরদ প্রদর্শন করা হয়নি আর এভাবেই সহানুভূতি দেখান হয় বাঙালীকে মানুষ করার জন্য।"[৬৩]

---

[৬৩]. ড. মো: মকসুদুর রহমান (অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ - রা.বি)/বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির ঐক্য। [প্রতীক - ফেব্রুয়ারি, ২০০৬। পৃ. ১৪৬-১৫১]

তিন

"...বস্তুত ১৯০৪ সালেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম ছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের ব্যাপক আন্দোলনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ ধামাচাপা পড়েছিল। যখন ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো - কলিকাতা ঢাকা এক হলো এবং পূর্ববঙ্গের নেতৃস্থানীয় মুসলমান যখন ক্ষুব্ধ তখন ১৯১২ সালে বড়ো লাট হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে, বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকার উন্নয়ন সাধন করা হবে, তারই একটি অংশ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। সাথে সাথেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ শুরু হয়। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জি, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ নেতারা এর তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা শুরু করেন। এ কথাও বলা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে বাঙালি জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে বিভক্ত হয়ে যাবে। (বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক : ডঃ নজরুল ইসলাম ২২০ পৃ.)। প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত সরকার নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবীদের সাথে আপোস করতে বাধ্য হন। পরিকল্পনাটি পাল্টে ঘোষণা করা হলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে, তবে তা হবে আবাসিক বিশ্বব্দ্যালয় মাত্র। মাত্র দশ মাইল থাকবে চারদিকের সীমানা। কোনো কলেজ তার অধীনে থাকবে না।

উপরন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো নতুন চারটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করতে হলো। বড়লাট তার ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বছরে মাত্র ৫ লাখ টাকা অর্থ মঞ্জুরি করেছিলেন। কিন্তু পরে খতিয়ে দেখা গেল ১৯১৯ সালের আইন মোতাবেক শিক্ষা কার্যক্রম প্রদেশের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ার ফলে বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কী অবলীলাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বড়লাটের বরাদ্দকৃত মঞ্জুরি কেটে ফেলেন। এসব প্রতিবন্ধকতা থেকেই বোঝা যায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা উঠে এসেছিলেন তাদের কত বিঘ্ন-বাধা মাড়িয়ে উঠে আসতে হয়েছিল। বস্তুত ত্রিশের দশকে প্রবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমাণ করতে সক্ষম হলো পূর্ববঙ্গের জন্য সত্যিই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন ছিল। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম-ইতিহাসও সাম্প্রদায়িকতার কলংকে রঞ্জিত।"[৬৬]

চার

"...১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়ায় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য ইংরেজ সরকার প্রতিশ্রুতি দেয়। মুসলমানেরা হতভম্ব হয়ে দেখল, তাতেও হিন্দুরা আপত্তি করছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী ঘোষের মত বুদ্ধিজীবীরাও বলতে থাকেন যে, তার ফলে, বাঙ্গালী জাতি ও সংস্কৃতির ক্ষতি হবে। ঢাকার হিন্দুরাও ঐ মত সমর্থন করে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তার পঠন-পাঠন ক্ষেত্র হয় বেশ সীমাবদ্ধ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ব্যাপারটি ঠিকভাবে নিতে পারেননি। তিনি তাই লিখেছিলেন : 'আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদযোগ লইয়া মুসলমানরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে ইহাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা। অতএব যাহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না।' (পরিচয় - "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।'[৬৭]

---

৬৬. আবু আল সাঈদ/ফজলুর রহমান : অনুদার ইতিহাসের একদশক (১৯৩৭-৪৭)। [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭। পৃ. ১৫]

৬৭. সৈয়দ আব্দুল হালিম/বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী বিকাশের ধারা (তৃতীয় খণ্ড/পরাধীনতা ও প্রতিকার)। [নবযুগ প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০১৬। পৃ. ২১১]

পাঁচ

"...সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হিংসা এবং মুসলমানদের সর্বনাশ দেখার জেদ বঙ্গভঙ্গ রদ করেই শেষ হয়ে গেলনা এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কারের পৃথক নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব-সুযোগের বিরোধিতা অব্যাহত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলোনা, মুসলিম বিরোধী তাদের সহিংস মন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও মেনে নিতে পারলো না। উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলমানদের স্বান্তনা দেবার জন্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ল হিন্দুরা। ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে তারা সভা করল। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ। [দ্রষ্টব্য : অধ্যাপক আব্দুন নুর (চ.বি)/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিলেবাস বিতর্ক এবং অতীত ষড়যন্ত্রের কাহিনি - দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৩ইং] বিস্ময়ের ব্যাপার, পূর্ববঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জমিদারি ছিল, সে রবীন্দ্রনাথও তার মুসলিম প্রজারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক তা চাননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেদিন একাট্টা হয়ে প্রচারে নেমেছিল হিন্দু সংবাদপত্রগুলো। হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন শহরে মিটিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে পাঠাতে লাগলেন বৃটিশ সরকারের কাছে। [দ্রষ্টব্যঃ Calcutta University Commission report. Vol. IV পৃষ্ঠা ১১২, ১৫১।] 'এভাবে বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারক লিপি সহকারে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিগণ বড়ো লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না। [দ্রষ্টব্যঃ Calcutta University Commission report. Vol. IV পৃষ্ঠা ১১৩।]

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে সব হিন্দু যেমন এক হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাই হলো। পূর্ববঙ্গের, এমনকি ঢাকার হিন্দুরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে এল। 'A History of Freedom Movement' গ্রন্থে বলা হয়েছে, The Controversy that started on the Proposal for founding a university at Dacca, throws interesting on the attitude of the Hindus and Muslims. About two hundred prominent Hindus of East Bengal, headed by Babu Ananda Chandra Ray, the leading pleder of Dacca, submitted a memorial to the Viceroy vehemently against the establishment of a University at Dacca For a long time afterwards. They tauntingly termed this University as 'Mecca University'. [দ্রষ্টব্য : 'A History of the Freedom Movement', গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের Dacca University; Its role in Freedom Movement' শীর্ষক অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০ (Published in 1970).] অর্থাৎ 'ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে বিতর্কের সৃষ্টি করল তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে মজার তথ্য প্রকাশ পেল। পূর্ব বাংলার প্রায় দুই'শ গণ্যমান্য হিন্দু ঢাকার প্রখ্যাত উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে ভাইসরয়কে একটি স্মারক লিপি দিয়েছিল। পরে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বিদ্রূপ করা হতো।'

হিন্দুদের এই সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের বিরোধিতা ও ঘৃণা তারা অব্যাহতই রাখল। এর একটা সুন্দর প্রমাণ পাই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর' এর বক্তব্যে।

শ্রীভাণ্ডারকর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া তার এক বক্তৃতায় বলেন 'কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতগ নামক একজন অসুর জন্ম গ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষি এবং তাদের শিষ্যগণ বাস করে। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্যে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যাবে। যারা অর্থ লোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হবে।' [দ্রষ্টব্য : শ্রী ভাণ্ডারকরের এই উক্তিটি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার স্মৃতিকথা 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে' উল্লেখ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সভায় শ্রী ভাণ্ডারকরের এ উক্তি করেন, সে সভায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।]

পরিষ্কার যে, শ্রী ভাণ্ডারকর এই বক্তব্যে 'হরতগ' বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ ফিলিপ 'হরতগ' কে বুঝিয়েছেন। মিঃ হরতগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৫ বছর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। শ্রী ভাণ্ডারকরের বক্তব্যে হরতগ-এর 'আশ্রম' বলতে বুঝানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। আমাদের 'বুড়িগঙ্গা' হয়েছে শ্রী ভাণ্ডারকরের বক্তব্যে 'বৃদ্ধাগঙ্গা'। আর মূল গঙ্গা-তীরের 'পবিত্র আশ্রম' বলতে শ্রী ভাণ্ডারকর বুঝিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শ্রী ভাণ্ডারকরের কথায় ঢাকা অর্থাৎ পূর্ববাংলা অসুরদের স্থান। পবিত্র স্থান কলকাতা থেকে যেসব ঋষি শিষ্য ঢাকায় চাকরি করতে আসবেন তারাও অসুর হয়ে যাবে। এ থেকেই বুঝা যায়, মুসলমানদের প্রতি শ্রী ভাণ্ডারকরদের বৈরিতা কত তীব্র, ঘৃণা কত গভীর।

তাদের এ বৈরিতার কারণে উপযুক্ত বরাদ্দের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভীষণ অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয় এবং অঙ্গহানিও হয়েছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর ভাষায় '(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়) মুসলমানরা খুবই খুশী হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণত যারা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তারাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাস বিহারী ঘোষ ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তাদের প্রধান যুক্তি হলো এই যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এখন একটি সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে, এতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে বড়ো লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের এমন আশংকার কোন কারণ নেই। ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতা ও অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।' [দ্রষ্টব্য : 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে', ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এই ভাবে হিন্দুরা একে 'ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেটে হিন্দু যারা নির্বাচিত হয়ে আসতেন তারাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈরিতা ত্যাগ করতেন না, তাদের ভোট বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করারই চেষ্টা করত। ডক্টর রমেশচন্দ্র লিখছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (সিনেটের) সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক ছিলো মুসলমান এবং অর্ধেক ছিলেন হিন্দু। প্রফেসররা কোর্টের সদস্য ছিলেন। বার লাইব্রেরীর অনেক উকিল রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এর সভ্য হতেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে হিন্দুরা ভালো চোখে দেখেনি, একথা পূর্বেই বলেছি। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে, অনেকটা তা পূরণ করার জন্যই এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রীতির চোখে দেখেননি। বাইরে এ বিষয়ে যে আলোচনা হত কোর্টের সভায় হিন্দু সভ্যদের বক্তৃতায় তা প্রতিফলিত হত। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা অনেকটা নিশ্চিত ছিলাম। মুসলমান সদস্য এবং হিন্দু শিক্ষক সদস্যরা একত্রে হিন্দু সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন।' [দ্রষ্টব্য : 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে', ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।]

সংখ্যাগুরু হিন্দুরা মুসলমানদের কোন ভালই সহ্য করতে পারেনি। মুসলিম লীগ গঠন তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিল, মর্লি-মিন্টোর শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তারা বরদাশত করেনি,

১৯১২ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বড়ো লাটের সাথে বর্ধমানের স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিমন্ডলী সাক্ষাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা না করার পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তির জাল বিস্তার করেন।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে আভ্যন্তরীণ বঙ্গ বিভাগ-এর সমার্থক, তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক; তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তারা কোন মতেই উপকৃত হবে না।' [Report of the Calcutta University Commission Vol. IV, Prt. II, P. 133]

'সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশিক্ষিত ও কৃষক বহুল পূর্ববঙ্গের শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হবে; পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষানীতি ও মেধার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না।' [ঢাকা প্রকাশ, ১১ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি - ১৯১২]

এছাড়া হিন্দু সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং সভার সিদ্ধান্তগুলো বৃটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করতে থাকেন। বাবু গিরিশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বড়ো লাট হার্ডিঞ্জের কাছে ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করেন [Report of the Calcutta University Commission]

আশ্চর্যের বিষয়, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মিছিলে শরীক হয়েছিলেন মানবতার কবি দাবীদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও।

...১৯১৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নবাব সলিমুল্লাহর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে শক্ত হাতে হাল ধরেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। সেই ১৯১১ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণার দিন থেকে ১৯২০ সালের ২৩শে মার্চ-এ বড়ো লাটের আইন সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাস হওয়ার দিনটি পর্যন্ত তিনি বিরামহীন প্রচেষ্টা চালান। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। অবশেষে কট্টর হিন্দু নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কাঙ্খিত বিশ্ববিদ্যালয়টি নবাব দেখে যেতে পারেননি। এছাড়া জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীও (চাঁদ মিয়া) পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। অথচ আজ নবাব সলিমুল্লাহর নামে একটি হল আছে বটে; কিন্তু কায়েদে আযম জিন্নাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী ও জমিদার চাঁদ মিয়ার কোন স্মৃতি চিহ্ন ক্যাম্পাসে নেই।

...আর যাদের আন্দোলনের ফসল এই এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অনেকে তাদের নামই জানে না। তাদেরকে নিয়ে কোন আলোচনা বা স্মৃতি সভা হয় না। আলোচনা বা স্মৃতি সভা হয় বঙ্কিম, সূর্যসেন ও রবীন্দ্রনাথদের নিয়ে। যাদের কল্যাণে চাষার ছেলে থেকে আজকে যারা ভাইস-চান্সেলর, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, আমলা, রাজনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, বিচারপতি, শিল্পপতি, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক-পরিচালক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, সে-সব কৃতি সন্তানেরা আজ উপেক্ষিত, নিন্দিত। হায়রে দূর্ভাগা দেশ। হায়রে দূর্ভাগা জাতি।

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। পূর্বে এই এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে রবীন্দ্র বাবুরা। বর্তমানে করছে মুসলমান নামধারী রবীন্দ্র ভক্তরা।

বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন :

'রবীন্দ্রনাথের মাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সাধনা, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার কিংবা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার বর্বর অহংকার হচ্ছে পায়ের তলায় জমি শুন্য, শেকড় শুন্য, নির্বোধের অহংকার।' [সরদার ফজলুল করিম : রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব /দৈনিক সংবাদ - ২৪ ফাল্গুন, ১৩৯৬]

সচেতন মহলের মতে, দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফজলুল করিমের এই মন্তব্যে নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন করারই কথা। তারা স্বভাবতই বিশ্বাস করবে 'রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্ব'। এই বিশ্বাসের পরিণাম কি হবে তাও ভেবে দেখা সময়ের দাবী।"[৭০]

আট

"...As compensation for the annulment of the partition as well as protest against the general antipathy of the Calcutta University towards the Muslims, the deputation pressed a vigorous demand for a University at Dacca. In his reply, Lord Hardinge said that the Government of India realised that education was the true salvation of the Muslims and that the Government of India, as an earnest of their intentions, would recommend to the Secretary of State the constitution of a University at Dacca. On 2 February, 1912, a communique was published stating the decision of the Government of India to recommend the constitution of a University at Dacca. [C. U. Commission Report, Vol. IV, Pt. II, P. 133]

The Hindu leaders were opposed to the plan of setting up a University at Dacca. They voiced their disapprobation in press and platform. On February 16, 1912 a delegation headed by Dr. Rash Behary Ghose waited upon the Viceroy and expressed apprehension that the creation of a separate University at Dacca would be in the nature of 'an internal partition of Bengal'. They also contended that the the Muslims of Eastern Bengal were in large majority cultivators and they would benefit in no way by the foundation of a University. [Ibid., P. 122]

In his reply, Lord Hardinge referred to the progress made by the people of Eastern Bengal and Assam during the few years of the partition and said, "when I visited Dacca I found a wide-spread apprehension, particularly among the Muhammadans, who form a majority of the population, lest the attention which the partition of Bengal secured for the eastern provinces should be relaxed, and that there might be a setback in educational progress. It was to allay this not very unreasonable apprehension that I stated to a deputation of Muhammadan gentlemen that the Government of India were so much impressed with the necessity of promoting education in a province which had made such good progress during the past few years that we have decided to recommend to the secretary of state the constitution of a University at Dacca and the appointment of a special officer for education in Eastern Bengal."

The viceroy assured the delegation that no proposals which could lead to the internal partition or division of Bengal would meet the support of the Government of India; and he added that from the fact that he announced the intention of the Government in regard to Dacca to a deputation of Muhammadans it did not follow in any way that the new University would be a Muhammadan University; it would be a University open to all - a teaching and a residential University. [Ibid., Vol. I, Pt. I, P. 151]

...Dr. R. C. Majumdar, in his article 'Dhakar Smriti' has referred to the opposition by Sir Ashutosh Mukharjee, Gurudas Banerjee and others. Dr. Majumder writes that Lord Hardinge told Sir Ashutosh that he was determined to establish Dacca University in spite of all opposition and the Viceroy wanted to know at what price he was prepared to withdraw his opposition to it. Sir Ashutosh thought of using this occasion for a bargain in favor of

---

৭০. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ/ইতিহাসের নিরিখে নজরুল-রবীন্দ্র চরিত। [বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি - জুলাই, ১৯৯৮। পৃ. ২৩০-২৩৩]

Calcutta University, of which he was the Vice-Chancellor. He asked for four Proffesorships for his University. The Viceroy accepted his demand and Sir Ashutosh agreed to stop his opposition. This agreement between the Viceroy and Sir Ashutosh was named the 'Dacca University Pact'. (Sir Ashutosh Bhattacharya, Amader Shei Dhaka Visva Vidyalaya, pp. 24-29)

The educated Hindus criticised the Dacca University as 'Mecca University', 'Fucca (Hollow) University' and expressed that 'a good College (Dacca College) was killed to create a bad University. [Sir Ashutosh Bhattacharya, Amader Shei Dhaka Visva Vidyalaya, pp. 6 & 56]

...Educated Hindus said that three Jews, Vice-Chancellor Hartog, Viceroy Lord Reading and Secretary of State E. Montage, had contaminated the University and it would not function. [Syed Mostafa Ali, Atmakatha, p. 115]

...In the annual Court meeting of 1922-23 the Vice-Chancellor in his Presidential speech replied to these critics of the Dacca University. He said that he felt proud of the achievement of the Dacca University in a year and spoke of its progressive type of Syllabuses, effective tutorial system, better laboratory and library facilities and personal contacts between the teachers and students. There were increasing demands for books both by students and teachers and such demand for books hardly existed before the University was created. He also recalled that the Dacca University, though open to all, was created in response to the demand of the Muslim community and it was intended as an organ to raise them form their backward position in regard to education. [Minutes of the Court, 13 February, 1922]."[৩৯]

নয়

"...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহবান অনুযায়ী ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর (বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দিবস)-কে 'রাখীবন্ধন দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৯০৩ সালে লিখিত "আমার সোনার বাংলা" গানটি 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনে যথেষ্ট গতি সঞ্চার করে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ ও বিমর্ষ মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ প্রশমনের জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পুর্ববঙ্গ সফরের কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং তদানুযায়ী তিনি ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা সফরে আসেন। ঐদিনই নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বিশেষ অনুরোধক্রমে তৎকালীন বড়লাট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত ঘোষণার পর একই বছর মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করার জন্য 'নাথান কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর অত্র কমিশন একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। পূর্ববাংলার মানুষ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদানের সাথে সাথেই এবারো শুরু হয়ে যায় কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবিদের চরম গাত্রদাহ। সেই একই হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবি যারা বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবারো তারা গর্জে ওঠে, গড়ে তুলে ব্যাপক আন্দোলন। হিন্দু নেতারা সারা বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে ব্যাপক সভা-সমাবেশের আয়োজন করে। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলিকাতার গড়ের মাঠে

[৩৯]. Muhammad Abdur Rahim/The History of the University of Dacca| [University of Dacca - September, 1981] P. 5-6/39]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। ১৯১২ ইং সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হিন্দু নেতৃবৃন্দের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালীন উক্ত প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আভ্যন্তরীণভাবে বঙ্গভঙ্গেরই সমতুল্য। কেননা এর ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ আরো বাড়বে। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মানুষ প্রধানত কৃষক। তাই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কোন উপকারেই আসবে না।

১৯১৭ ইং সালের ২০ মার্চ সৈয়দ নওয়াব অলী চৌধুরী ভারতীয় আইনসভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন এবং অবিলম্বে 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল' পাসের দাবি জানান। আইনসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের 'খসড়া' প্রস্তুত রয়েছে তবে যুদ্ধ সঙ্কটের মধ্যে সরকার এ বিলে হাত দিতে চান না। যুদ্ধশেষে যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

অতঃপর একই বছর 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিশন পূর্বেকার 'নাথান কমিশন' রিপোর্ট অনুমোদন করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ট' পাস হয়। অবশেষে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ নয় বছর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবল বাঁধার মুখে রমনার বিশাল সবুজ চত্বরে প্রায় ৬০০ একর জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুল প্রত্যাশিত ও অনেক সংগ্রামের ফসল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে এবং এক বছর পর ১৯২২ সালে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে এ দেশের মুসলমানদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও, প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে মুসলমানরা নিয়োজিত ছিল না, হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল সর্বক্ষেত্রে। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার জন্য কিন্তু তাদের মাঝে কোন সংকোচ বা কার্পণ্য মোটেই দেখা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর জনৈক ইংরেজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দু পণ্ডিতগণ পরিচালকের আসনে সমাসীন হন। তারা তাদের রুচি ও মন-মানসিকতা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

ফলে দেখা যায়, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, ঢাকার বুকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর পর সে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন এবং তারো দশ বছর পর তিনি সেখান থেকেই সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। শুধু তাই নয়, একই কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'অশোক চক্র' স্থান লাভ করে। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে সে মনোগ্রাম পরিবর্তিত হয়ে তাতে পবিত্র কোরআনের আয়াত সংযোজিত হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী নিজেকে মাত্রাতিরিক্ত 'স্যাকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' প্রমাণের হীন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তান আমলে পরিবর্তিত সে মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কোরআনের আয়াতকে নির্বাসিত করে। একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল' এবং 'ফজলুল হক মুসলিম হল' দুটির নাম থেকে মুসলিম শব্দ তুলে দেওয়া হয়।"[৭২]

দশ

"...লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফর শেষে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতার বিশিষ্ট অমুসলমান নেতাদের এক প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ

---

[৭২]. মেজর জেনারেল (অব:) এম. এ. মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি/আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা। [আহমদ পাবলিশিং হাউস - ফেব্রুয়ারি, ২০০০। পৃ. ১৮-২২]

এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ ওই প্রতিনিধি দলকে জানান, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হবে না, তা হবে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গভঙ্গ এবং পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ রদের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, তা খানিকটা হলেও প্রশমনের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বলা চলে, বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে যেমন পরিণতিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অনিবার্য ছিল, তেমনি আবার বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, প্রথম বঙ্গভঙ্গ এবং তা রদের ফলেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, এ কথাও বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গ না হলে হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতো না। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জের ওই আশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে শুধু কলকাতা নয়, এমনকি ঢাকায় অমুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধিতা বা প্রতিকূলতা দূর করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবনা থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯১২ সালের মে মাসে গঠিত হয়েছিল নাথান কমিটি। যে কমিটি মোট ২৫টি সাব-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ৫৩ লাখ টাকা এবং বাৎসরিক খরচের জন্য ১২ লাখ টাকা ধরা হয়েছিল। নাথান কমিটি রমনা অঞ্চলে অধুনালুপ্ত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর পরিত্যক্ত ৪৫০ একর জমির ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপনের সুপারিশ করে। এই রিপোর্ট ১৯১৩ সালে ভারত সচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু সৃষ্টির লগ্ন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৈরিতার শিকার। প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংকোচিত বাজেট পেশ করতে বলা হয় ১১ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে। ফলে ঢাকা ও জগন্নাথ হল এবং মোহামেডান ও নতুন আর্টস কলেজ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করা হয়; কিন্তু তা-ও কার্যকর হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দেরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে 'ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে' সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী অবিলম্বে সরকারের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের আহ্বান জানিয়ে বলেন,

'পূর্ববাংলাকে বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু যুদ্ধের কারণে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের বিলম্ব হেতু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি বা স্থগিত রাখার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সালে বাংলার গভর্নর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড চেমসফোর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা তদন্তের জন্য নিয়োজিত স্যাডলার কমিশনের ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ দানের দায়িত্ব প্রদান করেন। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও তা আবাসিক না এফিলিয়েটিং হবে, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মূলত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় করার পক্ষপাতি ছিল। পক্ষান্তরে পূর্ববাংলার মুসলমান নেতারা পূর্ববাংলার কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন, যাতে পূর্ববাংলার উচ্চশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের হাত থেকে রেহাই পায়।

বাংলার অমুসলমান জনমত ঢাকায় এফিলিয়েটিং বা মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষমতাযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোরতর বিরোধী ছিল। স্যাডলার কমিশন মধ্যপথ অবলম্বন করে, পূর্ববাংলার বিভিন্ন কলেজের পরিবর্তে ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক হলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটরূপে গণ্য করার সুপারিশ করে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল হাউসের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধ এলাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আওতাভুক্ত এলাকারূপে গণ্য করার পরামর্শ দেয়। ওই কমিশনে প্রদত্ত ১৩টি সুপারিশ কিছু রদবদলসহ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯২০' ভারতীয় আইনসভায় গৃহীত হয় এবং গভর্নর জেনারেল ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ তাতে সম্মতি দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দেরির কারণ শুধু প্রথম মহাযুদ্ধ বা ভারত সরকারের লালফিতার দৌরাত্ম্য নয়, অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা ও প্রতিকূলতা তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকার স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কী মূল্যে অর্থাৎ কিসের বিনিময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকবেন। 'বাংলার বাঘ' নামে খ্যাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চারটি নতুন প্রফেসর পদের বিনিময়ে তার বিরোধিতার অবসান ঘটিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার ফিলিপ হার্টগ প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ সালের ১ জুলাই। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ, ঢাকাকে রাজধানীরূপে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ বাতিল হওয়ার প্রায় দশ বছর পর বিলোপকৃত রাজধানীর জন্য নির্মিত নতুন বাগিচা শহর রমনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয় মুসলিম হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলের যথাক্রমে ১৭৮, ৩৮৬ ও ৩১৩ মোট ৮৭৭ জন ছাত্র নিয়ে।

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরেও তা অবিভক্ত বাংলা সরকার এবং ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী মহলের নিরন্তর বাধার সম্মুখীন ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

'১৯১৯ সালের নতুন আইন অনুসারে বাংলার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন পশ্চিমবঙ্গের সন্তান প্রভাসচন্দ্র মিত্র। তিনি মন্ত্রী হয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কমানোর নির্দেশ দেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফান্ডে ৫০ লাখ টাকা গচ্ছিত ছিল, বাংলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত ভবনগুলোর জন্য সে টাকা কেটে নেয়। বাংলা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর মাত্র ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করে। ফলে শিক্ষকদের বেতন কমিয়ে দিতে হয়।'

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৭৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদের পুনর্মিলনী উপলক্ষে প্রকাশিত 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' স্মরণিকায় 'ঢাকার স্মৃতি' প্রসঙ্গে আরো লিখেছেন,

'এই সমুদয় গোলমালের মূল কারণ ছিল হিন্দুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী এবং শিক্ষামন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের লোক হওয়ায় তার পূর্ববঙ্গের প্রতি সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। ঢাকাবাসী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় কোনদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুনজরে দেখেননি। যেসব হিন্দু প্রফেসর ও রিডার ছিলেন, সকলেই ঢাকার বাইরে থেকে এসেছিলেন - তারা এতো মোটা মাইনে পাবে, এতো বড়ো বড় বাড়িতে থাকবে এটা কোনদিনই তারা সহ্য করতে পারেননি। একজন অধ্যাপক একবার ঢাকার এক বিশিষ্ট হিন্দু নেতাকে বলেছিলেন যে, আমরা এসব বাড়ি দখল না করলে কি গভর্নমেন্ট আপনাদের এসব বাড়িতে থাকতে দিত? তবে আপনারা আমাদের হিংসা করেন কেনো? মুসলমানরা হিন্দু শিক্ষকদের বিরোধিতা করেননি। তবে তারা চাইতেন লেকচারারের পদে যথাসম্ভব বেশি মুসলমান নিযুক্ত করতে - অধিকতর যোগ্য হিন্দু থাকলেও; কিন্তু প্রফেসর ও রিডারের বেলায় মোটামুটি যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচন করারই পক্ষপাতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেকে পদানুসারে কোর্টের সভ্য ছিলেন, অন্য অনেক হিন্দুও এর সভ্য ছিলেন, তাদের বিরোধী দল বললে বিশেষ অতিরঞ্জন করা হবে না। শিক্ষক সদস্যদের মুখপাত্র ছিলেন ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত - তারপর আমাকেই বিরোধী হিন্দুদের সঙ্গে কোর্টের সভায় লড়াই করতে হয়। এ জন্য ঢাকার হিন্দু জননায়কেরা আমার ওপর খুশি ছিলেন না। তবে কোর্টসভায় মুসলমানেরা হিন্দু শিক্ষকদের পক্ষে থাকায় শিক্ষকদের বা শিক্ষা সম্বন্ধে অনিষ্টকর কোনো প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হতো না।'

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে পূর্ববাংলার কৃষিনির্ভর দরিদ্র মুসলমান সমাজের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রসারিত হয়েছিল। কৃষক পরিবারের সন্তানদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সঙ্গতি ছিল না,

তবে অভিজাত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাত্র কলকাতা, আলিগড় বা লন্ডন গিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতেন। ঢাকা শহরের আদিবাসী ঢাকাইয়া মুসলমান সমাজে শিক্ষার আগ্রহ ছিল কম, তবে তারা ঢাকার বাইরে থেকে আগত ছাত্রদের নিজেদের বাড়িতে জায়গীর রাখতেন। ফলে অনেক দরিদ্র ছাত্র জায়গীর থেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার খরচও ছিল কম। যদিও দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুসলমান ছাত্ররাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণের কারণে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল।"[৭৩]

এগারো

"...ঢাকা নগরীতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অব্যাহতি পায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রবৃন্দও এই পৈশাচিক কাজে লিপ্ত হয়েছিলো। ১৯২৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শ্রেণী কক্ষে বাদলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী নামে জনৈক ছাত্র সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখে, যার ফলে এই শ্রেণী কক্ষে মুসলমান ছাত্রদ্বয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। একই দিন সে দু'টি শ্রেণী কক্ষে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করে। রসায়ন বিভাগের শিক্ষক এ. এন. কাপ্পানা ও গণিত বিভাগের শিক্ষক ড. এন. এম. বসুর ক্লাসে এই ঘটনা ঘটে। ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের, যারা এই ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। ছাত্রদ্বয় ছিলো ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী ও মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। তারা এই ঘটনা মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ও ইতিহাস বিভাগের রীডার স্যার আহমেদ ফজলুর রহমানকে (১৮৮৯-১৯৪৫) জানান, যিনি বিষয়টি উপাচার্য ল্যাংলীর নজরে আনেন। ঢাকা নগরীতে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এই অবস্থা উপাচার্য ল্যাংলী খুব দ্রুত সামলানোর চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমেই প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে বাদলকৃষ্ণ গাঙ্গুলীকে তার সাথে ১৫ সেপ্টেম্বর দেখা করার নির্দেশ দেন। [Letter from Dr. J, C. Ghosh, Provost, Dhaka Hall to Badal Krishna Ganguli, a student of Dhaka Hall, 15 September, 1926. File-BM, Serial No. 523, Dhaka University Record Room.]

ইতোমধ্যে উপাচার্য এই ঘটনার সময় উপস্থিত শিক্ষকদ্বয় এ. এন. কাপ্পানা ও ড. এন. এম. বসুর নিকট হতে ঘটনা সম্পর্কে তাদের লিখিত বক্তব্য আদায়ের চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে স্যার আহমেদ ফজলুর রহমানের নিকট হতে এই ঘটনার তথ্য অবগত হয়েই অত্যন্ত দ্রুত উপাচার্য এক বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরোধ জানান যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন মন্তব্যকারী যে কোন ছাত্রের নাম অতি দ্রুত যেন উপাচার্যকে জানানো হয়। শিক্ষকদের আরো অনুরোধ জানানো হয় তারা যেন ছাত্রদের বুঝাতে সক্ষম হন যে এরূপ আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গের সামিল এবং মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

...প্রকৃতপক্ষে ঢাকা নগরীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অশোভন মন্তব্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মুসলমান ছাত্রবৃন্দ এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও খুব দ্রুত এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে সক্রিয় হন। উপাচার্য ল্যাংলীর নেতৃত্বে ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষগণ সম্মিলিতভাবে এই ঘটনার সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাদলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী এ. এন. কাপ্পানা ও ড. এন. এম. বসুর ক্লাসে যে আপত্তিকর ও অশোভন মন্তব্য করেছিলো সে সময় ক্লাসে মাত্র দু'জন মুসলমান ছাত্র ছিলো।

---

[৭৩]. রফিকুল ইসলাম/স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। [ঐতিহ্য - ফেব্রুয়ারি, ২০০৪। পৃ. ১২-১৬]

এ. এন. কাপ্পানার ক্লাসে বাদলকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর অশোভন মন্তব্য ও পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছে প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী। তার বিবরণ অনুযায়ী :

'...আমি ক্লাশে গেলে পরই আমাদের ক্লাশের বাদল কৃষ্ণ গাঙ্গুলী তাহার হিন্দু বন্ধুবর্গের নিকট বলিতে থাকে - 'আমি আজ ক্লাশ attend করিতে আসি নাই, কেবল তোমাদিগকে organize করিতে আসিয়াছি। মুসলমান শালাদের যন্ত্রণায় থাকা দায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। মহাশয়, মোহাম্মদ আলী সৌকৎ আলীকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না আর ঢাকার নবাবকে বিশ্বাস করিব? সে ত মতলবিয়া চাউলের বেপারী। কলিকাতার এক নম্বর devil স্যার আবদুর রহিম আর ঢাকার আবদুল হাফিজ এই দুই গুন্ডাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে হিন্দু সমাজের আর শান্তি নাই। গাড়োয়ান শালাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করিতে হইবে। মহাশয়, আমি কি করিয়াছি জানেন? আমাদের পাড়ায় এক গৃহস্থ মোছলমান আছে - তাহার জ্বালানী কাঠের দোকান আছে। আমি কোন হিন্দুকে তাহার দোকান হইতে কাঠ কিনিতে দিইনা। সেদিন যখন সে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল আমরা শালাকে আক্রমণ করি এবং বলি আমাদের রাস্তা দিয়া যাইতে পারিবি না। তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম কিন্তু আমাদের পাড়ার এক হিন্দু ভদ্রলোক আসিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া নেয়, নচেৎ মারিয়া ফেলিতাম। এই কথা যখন বলিতে থাকে তখন আমাদের Teacher Mr. A. N. Kappana ক্লাশে আসেন। তাহাকে বকবক করিতে শুনেন এবং বাদলকে জিজ্ঞাসা করেন 'Why do you murmur?' সে তখন বলে 'Sir, আর শান্তি নাই Sir. মুসলমানদের যন্ত্রণায় আর থাকিতে পারিবনা। তাহাদের শান্তি করিতে না পারিলে আর শান্তি হইবে না। Sir, কলিকাতার স্যার আবদুর রহিম ও ঢাকার আবদুল হাফিজ এই দুজনই সমস্ত গুন্ডামীর মূল।' ইহাতে আমাদের Mr. A. N. Kappana বলে উঠেন 'Can you prove this in the law court?' সে বলে 'না Sir'। 'তবে এসব কথার ভিত্তি কি? তোমার ক্লাশে এসব কথা বলা উচিৎ নয়।' 'Sir, আমি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছি না।' তখন Mr. Kappana বলেন 'Religion' বড়ো উন্মাদক জিনিস - মুসলমানেরা ধর্মের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহার পর রীতিমত ক্লাশ চলে আর কোন কথাবার্তা হয় নাই।' [Letter from Waliullah Patwary to Ahmed Fazlur Rahman, Provost, Muslim Hall, 14 September, 1926. File-BM, Serial No. 523, Dhaka University Record Room.]

ড. এন. এম. বসুর ক্লাসে বাদলকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর মন্তব্য ও কথোপকথনের বিবরণ দেয় প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন। তার বর্ণানুযায়ী -

'...আমরা যখন ১২টা ৩০ মিনিটের সময় ডাক্তার N. M. Bose এর ক্লাসে আসি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন 'তোমাদের ঢাকা হলের কতজন arrest হইয়াছে?' তখন বাদলকৃষ্ণসহ সকলে বলিয়া উঠে 'কই আমাদের কেহ গেরেফতার হয় নাই।' তখন ডাঃ N. M. Bose বলেন 'তোমাদের না অরুণ মুখার্জী arrest হইয়াছে?' তখন বাদল বলিয়া উঠে 'পুলিশ তাহাকে innocent declare করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।' আবার ডাঃ N. M. Bose বলেন, 'তোমরা ঢাকা হলের ছাত্ররা নাকি মুসলিম হলের একজন দারোয়ানকে মারিয়াছ?' তখন তাহারা উত্তর দেয় 'আমরা মারি নাই।' তার পর তিনি নাথ মেসের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন একজন বলে আহতদের মধ্যে না কি দুইজন মারা গিয়াছে। তখন ডাঃ বোস বলিলেন 'অশিক্ষিত লোক কয়েকজন হিন্দু মারিয়াছে তাই বলিয়া তোমরা কি নিরীহ পথিক মারিবে ও শিক্ষিত লোক হইয়া টাউনের দিকে দৌড়াদৌড়ি করিবে?' তখন সুকুমার সেন ও বাদলকৃষ্ণ কি পরামর্শ করিতেছিল। আমাদের ডাঃ N. M. Bose তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ? তখন তাহারা বলিয়া উঠে 'Sir আমরা শ্রীকৃষ্ণ নই যে প্রেম করিব। আমাদের স্বজাতিদিগকে মারিবে আর আমরা চেয়ে থাকব! আমাদের যদি ছোরা থাকিত তবে মুসলমানদের সহিত যুঝিয়া equilibrium produce করিতাম।' ইহার পরে ডাঃ বোস আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমরা নিজেদের in uence exert করিয়া ইহা বন্ধ করিতে পার না?' উত্তরে বলিলাম যে, 'আমাদের ইহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই এবং তাহাদের উপরে আমাদের কোন control নাই।' তখন বাদলকৃষ্ণ বলে 'Sir, তাহারা গুন্ডাদিগকে থামাইবে কেন? Sir Abdur Rahim ও আজিজ গুন্ডাদিগকে ত back করিতেছে।' Dr. Bose remarked : 'This is wrong'. তারপর Dr. Bose বলেন যে 'তোমরা সকল হলের ছাত্ররা কোন agreement করে নিতে পার না?'

তখন বাদলকৃষ্ণ বলিল 'উহাদের লক্ষ্য হইল ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল। তাহারা ভয়েই ত অস্থির।' [Letter from Md. Ismail Hossain to Ahmed Fazlur Rahman, Provost, Muslim Hall, 14 September, 1926. File-BM, Serial No. 523, Dhaka University Record Room.]

...১৯৩৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে দেখা গেল একটি পোস্টার যেখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে খুবই আপত্তিকর মন্তব্য লেখা ছিল। এই ঘটনা খুব সঙ্গত কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের উত্তেজিত করে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হিন্দু-মুসলমান ছাত্রনেতৃবৃন্দের দ্রুত হস্তক্ষেপে ঘটনাটি কোন সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।

...উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিবরণানুযায়ী ১৯৩৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বেলা ১টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ফুলস্কেপ কাগজে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অশালীন, অশোভন ও অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য সম্বলিত লিফলেটটি দেখতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বহু সংখ্যক মুসলমান ছাত্র সমবেত হয়। কিন্তু নোটিশ বোর্ড বন্ধ থাকায় লিফলেটটি খুব ভালভাবে দেখা যাচ্ছিলো না। এ সময় প্রক্টর ড. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নোটিশ বোর্ড খুলে লিফলেটটি নিজের দখলে নিয়ে আসেন। মুসলিম ছাত্রবৃন্দ লিফলেটটি দেখতে চাইলে প্রক্টর তার অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় ১৫০ জন ছাত্র প্রক্টরকে ঘিরে দাঁড়ায়। তারা লিফলেটের প্রতিলিপি দাবী করে। উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

...১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত বিষয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র প্রবোধচন্দ্র রায় শ্রেণীকক্ষের 'ব্লাক বোর্ডে' একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক লিখে বিপদে পড়ে। অনিচ্ছাকৃত হলেও শ্লোকটি মুসলমান ছাত্রদের অনুভূতিতে আঘাত করে। প্রবোধচন্দ্র রায় শ্রেণীকক্ষের ব্লাক বোর্ডে লিখেছিলো :

'আকারান্তা মায়া লিঙ্গা, কথম তর্হি পিতা ভ্রাতা কচিৎ কচিৎ ব্যভিচারী যথা ছাগীর মুখে লম্বা দাড়ী।'

বিষয়টি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত হলে প্রবোধচন্দ্র রায় ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং একই সাথে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনাটি সকলে ভুলে যায়।

...১৯৪১ সালের মার্চ হতে জুন মাস পর্যন্ত ঢাকায় চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রক্তক্ষয়ী এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয় 'হোলী' খেলা দিয়ে। অভিযোগ করা হয় যে বোরখা পরিহিতা একজন মুসলমান মহিলাকে শাঁখারী বাজারে রঙ দেওয়া হয়েছিলো। [Reports of the Dacca Riots Enquiry Committee, (Alipore : Bengal Government Press, 1942), p. 2.]

এই পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাধারণভাবে ভীতি ছিল এবং ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে কোন কোন স্থানে দাঙ্গাকারীদের দ্বারা নিগৃহীতও হয়েছিল। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করা হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে। ১৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোতাহার উদ্দীন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে দুপুর বেলা ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, বিশেষভাবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে।"[৭৪]

বারো

"...ঐ সময়ে আমরা কথায় কথায় শুনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিতৃষ্ণার কথা। অবিভক্ত বাংলায় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কলকাতায় এবং ঢাকায়, প্রথমটি অনেক পুরনো শতাব্দী প্রাচীন, সেই তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন, মাত্র পঁচিশ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। আমরা ভর্তি হওয়ার পরে

---

৭৪. ড. রতনলাল চক্রবর্তী/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রথিত ইতিহাস (১৯২১-১৯৫২)। [দি ইউনিভার্সেল একাডেমী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ২১৪-২১৭/২৬৪-২৬৫/২৬৮-২৭০]

সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠিত হয়। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি অঘোষিত বিরোধ ছিল, কলকাতার বুদ্ধিজীবিরা এবং সাধারণভাবে হিন্দুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা ও ফক্কা ইউনিভার্সিটি নামে বিদ্রূপ করত: অন্যদিকে ঢাকার লোকেরা মোটামুটিভাবে পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা পিছনে থাকতে রাজী ছিল না, তারা ক্যালকাটার 'সি' এর স্থলে 'বি' অক্ষর দিয়ে এমন একটি শব্দ বানাত যা লিখা যায় কিন্তু মুখে উচ্চারণ করা ভদ্রতা বিরোধী। আমাদের কৌতুহল জাগে: বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা দশ জনের বেশি ছিলনা, যাও ছিল তারা আরবি, ফারসি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে (তখন উর্দু বিভাগ ছিল না), অন্যান্য সকল বিভাগ মিলে দুই তিন জনের বেশি ছিল না। অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যাও তদ্রুপ, তবে দু'টি মুসলিম হলের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ছিল মুসলমান। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা বিশ্ববিস্যালয় বলে বিদ্রুপ করায় আমরা বিস্মিত হই, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়েই আমরা ইহার উত্তর খুঁজে পাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের আন্দোলনের ফসল। ইহা জানা কথা যে মুসলমানের রাজশক্তি হারাবার পরে ক্রমে ক্রমে জমিদারী এবং লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি হারায়। তারা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ হয়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের কারণ প্রধানত দুইটি, ১ম, খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয় এবং ২য়, মুসলমানেরা মনে করত যে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই তাদের প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষা লাভ করলে ধর্ম শিক্ষা ব্যাহত হবে, এই ভয়ে তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী ছিল না। আজকাল কেহ কেহ বলে যে শিক্ষার প্রতিই মুসলমানদের অনীহা ছিল, কিন্তু তারা জানে না বা জানার চেষ্টা করেনা যে, মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করলেও আরবি, ফারসি এবং ইসলামিয়াত বিষয়ে শিক্ষায় তারা কোন সময় পশ্চাৎপদ ছিল না। ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য দেশিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি সাহায্য বন্ধ করা হলে মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব চেষ্টায় মক্তব মাদ্রাসা চালু রাখে। ইংরেজী জ্ঞান না থাকলে সরকারি চাকুরির দরজা বন্ধ হয়ে গেলে (১৮৪৪) মুসলমানদের বোধোদয় হয়, তারা বুঝতে পারে যে তাদেরও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কিন্তু ততদিনে তারা ইংরেজী শিক্ষা লাভের আর্থিক সংগতি হারিয়ে ফেলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা বা তার আশেপাশে, মুসলমানেরা তখন শহর ছেড়ে গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়, এবং ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে একই বৎসরে মোম্বাই ও মাদ্রাজেও (বর্তমান নাম চেন্নাই) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সজাগ হয়ে উঠে। যারা বাংলার মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তাদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলীর নাম অগ্রগণ্য। আব্দুল লতিফ, ওবাইদুল্লাহ, সৈয়দ ওয়ারেস আলী (আমীর আলীর বড়ো ভাই) এবং মুসা আলী জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন, প্রথম দু'জন কলকাতা মাদ্রাসা থেকে এবং শেষোক্ত দু'জন হুগলী কলেজ থেকে। তাঁরা সকলেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন। প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট ছিলেন দেলওয়ার হোসেন আহমদ, তিনি ১৮৬১ সালে বি. এ. পাশ এবং ১৮৬৯ সালে বি. এল. পাশ করেন এবং পরে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন, পরে তিনি জজের পদে উন্নীত হন। আব্দুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ সালে পুরস্কার ঘোষণা করেন। মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে মোম্বাই-এর আবদুল ফাত্তাহ নামক একজন আরবী-ফারসী শিক্ষক একশত টাকার ঐ পুরুস্কারটি লাভ করেন। আব্দুল লতিফ ১৮৬৩ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৮৫৭ সালে আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করে আন্দোলনের বাস্তব রূপ ও ভিত্তি দান করেন। এরা সকলেই নব্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত অন্যান্য মুসলমানদের সহায়তায় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভে উদ্বুদ্ধ করেন।

উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই কয়েক জন মুসলমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভের সুযোগ পান, সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তারা সকলেই ছিলেন সমাজ হিতৈষী এবং তারা যেখানেই যেই অবস্থায় থাকুক না কেন মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মুসলমানের সংখ্যা স্বল্প ছিল, কারণ মুসলমানেরা তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। কলকাতা বাংলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত, আশে পাশের লোকেরা স্বল্প আয়াসে এবং স্বল্পব্যয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত, কিন্তু এই জিলাগুলো ছিল হিন্দু প্রধান। মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার জিলাগুলোতে অবস্থানরত উচ্চ শিক্ষা লাভে উৎসাহী ছাত্রদের পক্ষে কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করা দুরূহ ছিল। মুসলিম সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাই মুসলিম সমাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারে নি।

রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে, প্রথমে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন কিছুটা গতিলাভ করে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরে। লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ মুসলিম রাজনীতিতে যেমন গতি সঞ্চার করে, বঙ্গ-ভঙ্গ ও রহিতকরণ উভয়ে মিলে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যে পরিণত হয়, পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়, রাজধানী হয় ঢাকা, এর ফলে পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং পূর্ব বাংলা যেহেতু মুসলিম প্রধান, ইহার সুফল ভোগীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাও বেশি ছিল। রাজধানী ঢাকার চেহারাই পাল্টে যায়, বিভিন্ন ভবন এর লাল দালানগুলো মূলতঃ ঐ সময়েই নির্মিত হয়। কিন্তু হিন্দুরা বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে এমন তীব্র আন্দোলন করে যে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য হয় এবং দিল্লীর দরবারে ১৯১১ সালে ১৮ ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত ঘোষণা করা হয়, ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল তারিখে ঘোষণা কার্যকর করা হয়; একই সঙ্গে ভারতের রাজধানীও কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়; মাত্র ছয়বছর ঢাকা রাজধানী থাকে, কিন্তু এই স্বল্প সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার নানা অবকাঠামো সৃষ্টি হয়, স্কুল কলেজের সংখ্যা, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা, আবাসিক হোস্টেলের সংখ্যা, টেকনিক্যাল শিক্ষা, সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মাত্র ছয় বৎসরে পূর্ব বাংলায় সকল পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে পড়েন, যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নতুন প্রদেশের প্রশাসনিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে তারা আত্মনিয়োগ করে তা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার ঘোষণায় পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে, এবং প্রতিবাদ এতই তীব্র ছিল যে বড়ো লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজে ঢাকা এসে মুসলমানদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়ো লাটের সঙ্গে দেখা করেন, এই দলে ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক এবং অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ, তারা বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার আশংকা করেন। তারা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীও জানান। বড়ো লাট মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত হয়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন যে, এ বিষয়ে তিনি বিলেতে সেক্রেটারী অব স্টেটের (ভারত-সচিব) নিকট সুপারিশ পাঠাবেন। বড়ো লাট তার কথা রাখেন এবং রাজধানীতে ফিরে গিয়ে এক ইশতেহার জারী করে ঘোষণা করেন যে ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং সভা সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় বলতে থাকে যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ইহা হবে আভ্যন্তরীন বঙ্গ-ভঙ্গ (ইন্টারন্যাল পার্টিশন অব বেঙ্গল), অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল, বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হলেও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে বাংলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভাজন সৃষ্টি হবে। তারা আরো বলে যে পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা প্রধানত কৃষক শ্রেণীর লোক, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তাদের কোন উপকার হবে না, কৃষকেরা আবার লেখাপড়া করবে কি? হিন্দু নেতৃবৃন্দ

শুধু বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে সন্তুষ্ট হল না, ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বড়ো
সঙ্গে দেখা করে উক্ত কথাগুলো বলেন এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের
জানান। বড়ো লাট হিন্দু নেতৃবৃন্দের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিলেন না, তিনি বলেন, পূর্ব বঙ্গ ও
প্রদেশ চালু থাকার সময় তিনি সেখানে সফরে যান এবং ঐ স্বল্প সময়ে শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ববঙ্গ
উপকৃত হয়েছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখেন, তিনি পূর্ব বাংলার লোকদের আশাহত হতে দিতে পা
তিনি বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি টিচিং ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ
বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এফিলিয়েটিং হবে না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর পরিবর্তন হ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যা
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনিও বড়ো লাটের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানান।
তাকে টোপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন বিরোধিতা প্রত্যাহারের জন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক
বিশ্ববিদ্যালয়ের) জন্য কি চান? স্যার আশুতোষ ৪টি প্রফেসরের পদ সৃষ্টির দাবী করলে বড়ো
মেনে নেন এবং তিনিও তাঁর বিরোধিতা প্রত্যাহার করে নেন।

ভারত সরকার সত্যি সত্যিই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আন্তরিক ছিল। সেক্রেটারি অব স্টে
ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করলে ভারত সরকার বাংলায় প্রাদেশিক সরকারের
নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রূপরেখা প্রণয়নের অনুরোধ করে এবং প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জ
নীতিমালাও নির্ধারণ করে দেয়। নীতিমালায় বলা হয় যে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশ্ববি
প্রতিষ্ঠা অবশ্যই জরুরী। তবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হবে টিচিং এবং আবাসিক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা
আদলে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রশাসনে মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাক
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে আলাদা অনু
ফ্যাকল্টি গঠনের আবশ্যকতার উপর জোর দেওয়া হয়। সরকারের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়, প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই বিলম্বের জন্য দায়ী। স
ইতোমধ্যে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে নাথন কমিটি নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে বিশ্ববিদ্যালয় নীতি
ব্যাপারে সুপারিশ করার দায়িত্ব দেয়, পরে ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনকে এই
মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। অনেক চেষ্টা চরিত্র এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের জোর দাবীর
১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয় এবং পরের
অর্থাৎ ১৯২১ সালের ১লা জুলাই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হয়, আর্টস, স
এবং আইন তিন ফেকাল্টিতে ১২টি বিভাগ খোলা হয় তন্মধ্যে একটি আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ
এবং অন্য একটি ফারসি ও উর্দু বিভাগ।

শিক্ষিত হিন্দুরা তখন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা' ও 'ফক্কা' ইউনিভার্সিটি বলা শুরু করে।
বলার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছিল এবং ফক্কা অর্থ ফাকা। আর একটি কারণ
বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে (বর্তমান কালে সিনেট) মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। তবে সর্বাপেক্ষা
কারণ বোধ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের অধিক হারে পড়ার সুযোগ লাভ। হিন্দুদের
একটা বক্তব্য ছিল এই যে, সরকার একটা বাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি ভালো কলেজকে (
কলেজ) বলি দিয়েছে। তারা আরো বলত যে তিনজন ইহুদী মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলুষিত ক
এই তিন ইহুদী হল প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পি. জে. হার্টগ, বড়ো লাট লর্ড রেডিং এবং সেক্রেটারী
স্টেট মন্টেগু। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই সুবিধা ভোগ করে বেশি; কলকাতা বিশ্ববিদ
থেকে বাছা বাছা শিক্ষকেরা ঢাকায় চলে আসেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পছন্দের শি
ঢাকায় পাঠিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। ১৯৪৭
পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি।"[৭৫]

---

[৭৫]. ড. আবদুল করিম/সমাজ ও জীবন। [হাসি প্রকাশনী - জুলাই, ২০০৬। পৃ. ১৭২-১৭৬]

তেরো

"...REMINISCENCES OF DACCA UNIVERSITY/A. K. Fazlul Haq

'As the Governor of East Pakistan and Chancellor of the Dacca University, A. K. Fazlul Haq, in his Convocation address, said, 'In the beginning of the present century the Muslims of Bengal were very backward in education. The number of Muslim students in the Presidency College of Calcutta was negligible. In 1912 there were less than 80 Muslim students in the Colleges of Dacca. The leaders of the Muslim community, men like the late Nawab Khwaja Salimullah and Nawab Ali Choudhury realised that unless there was rapid development of education the Muslim community would remain backward and weak, and would continue to be exploited by more advanced communities. The partition of Bengal had brought new hopes to the people of East Bengal where Muslims were in majority; the annulment of the partition was a grievous wrong and it dashed all our hopes for the development of this country and the advancement of its people. The late Nawab Salimullah received a great shock from which he aid not recover. The Government of India said that as an Imperial concession to the Muslims of East Bengal a University would be established at Dacca.'

Mr. Haq stated, 'I was very closely and actively associated with all the plans and schemes and I know the difficulties which we Muslims had to face and the obstinate opposition we had to overcome at that time in pushing the scheme for the establishment of University. In January, 1912 we presented an address to Lord Hardinge, the then Viceroy, and submitted our proposals for the improvement of the conditions of Muslims in East Bengal : he said that the Government of India would take steps to establish a University at Dacca. The promise was officially confirmed in a communique published on 2nd Febru ary, 1912. A protest was made against this proposal and on the 16th of February, 1912, Sir Rash Behary Ghosh led a deputation and told the Viceroy that the creation of a separate University at Dacca would be an 'internal partition.'

'In the same month Government appointed a Committee under Mr. Nathan to frame the scheme for the proposed University. The late Maulana Mohammad Ali of revered memory was one of its members. The Nathan Committee's Report was the basis of the scheme of the new University of Dacca with its emphasis on Islamic Studies. The outbreak of the First World War was made an excuse for delaying the implementation of the scheme and we Muslims of East Bengal instructed the late Nawab Nawab Ali Choudhury, who was then a member of the Imperial Legislative Council, to move in the Council that the Bill for incorporation of the University of Dacca should be introduced at an early date'. This was in March, 1917. The Viceroy confirmed the intention of the Government to establish Dacca University; and in its communique dated 26th November, 1917, the Government of Bengal assured the Muslim community that the University would be established after the Calcutta University Commission had given its 'valuable advice regarding its constitution and management.'

The Government of India built up a fund of Rs. 65 lakhs for capital expenditure on the University; this sum was transferred to the Government of Bengal, and Sir Pravash Mitter, who was then in charge of education, merged this money with provincial funds and said that Government would make grants to the University from time to time. I believe that the University received about 9 lakhs, out of the fund of 65 lakhs, and invested it in Government securities. When the late Sir Mohammad Shafi was a member of the Government of India I was in close association with him, moved about with him and used his help and in uence for the advancement of higher education in Bengal. The University of Dacca had to beg for money every year from the Government of Bengal; through the help of Sir Abdur Rahim I obtained from Government a statutory recurring grant of 5.5 lakhs for the University ...

The University of Dacca was established in July, 1921; in the first meeting of the University Court I moved the resolution recording the appreciation and gratefulness of the Muslims of East Bengal to the late Nawab Salimullah who was a true lover of his country and people, and a courageous and unselfish fighter for their progress and prosperity.'

Fazlul Haq then gave his views on the functions of the University, academic freedom, education and life.

In conclusion, Fazlul Haq said, 'I have spoken more than I had intended. My only excuse is that I am an old man, and old men are proverbially garrulous. I am the living history of Bengal and of East Pakistan of the last sixty years. I am the last Survivor of that band of unselfish and courageous Muslims who fought fearlessly against terrific odds in order to secure the rights and prestige of Muslims in this part of the world."[৭৬]

(Annual Convocation of Dacca University, 19 February, 1957)

সাম্প্রদায়িকতার বলি : শহিদ নজীর

এক

[স্মৃতির পট শুধু স্মৃতিকাহিনি নয়। ইহা ইতিহাস। ইতিহাস লিখিতে যাইয়া কোনো ঘটনা যদি কাহারও মনঃপুত না হয় সে জন্য আমি দুঃখিত। তবে যাহাদের কথা আমি লিখিয়াছি, মনের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লইয়াই লিখিয়াছি। নিরপেক্ষ বিচারক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। জীবনের নানা পথে যাহারা মনের পটে দাগ কাটিয়া গিয়াছেন, এ তাহাদেরই কাহিনি। আমার সীমিত মনের পটে তাহারা যতটুকু আসিয়াছেন, আমি শুধু সেইটুকুই লিখিয়াছি। হয়তো তাহাদের জীবনে আরও অনেক মহত্ত্বের, অনেক গৌরবের কাহিনি আছে; সেসব সন্ধান করিতে গেলে যে বিরাট মহাভারত লেখার প্রয়োজন, আমার সে ক্ষমতা নাই।

যাদের কথা আমি লিখিয়াছি, তাহারা, বারবার আসিয়া আমার মনের পটে উদয় হন। তাহাদের কাহিনি আমার কাছে গল্প-উপন্যাসের মতো ভালো লাগে। সেই বৈষ্ণবী ঠাকরুণ, আইজদ্দির বউ, আনন্দ, আব্বাস উদ্দীন, নজীর ও গোলাম মোস্তফা -এনারা আমার মনে জীবন্ত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন। আমার পাঠক বন্ধুদের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বড়োই আনন্দ অনুভব করিতেছি। - লেখক]

"...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরী পাইয়া কাজে যোগ দিয়াই মুসলিম হলের নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়। গোটা দশ পনেরো ছেলে রাত্রে লেখাপড়া করিতে আসে। অধিকাংশ ছাত্রই মুসলিম হলের আশে-পাশের কুলী-মজুরদের ছেলেরা। কেহ অল্পবয়স্ক, কাহারও বয়স বেশি। মুসলিম হলের ছাত্ররা পালা করিয়া এক একজন এক একদিন তাহাদিগকে পড়াইতে আসে। একজন ছাত্র এইসব জনসেবার কাজের জন্য সম্পাদক নিযুক্ত হয়।

পরের বছর মুসলিম হলের এই নাইট স্কুলে যাইয়া দেখিলাম ছাত্র-সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট এ দাঁড়াইয়াছে। অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম নজীর নামক একটি ছাত্রের চেষ্টায় নাইট স্কুলের এই উন্নতি হইয়াছে। আমি নজীরের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য সেদিনকার ছাত্র-শিক্ষকের কাছে আগ্রহ জানাইলাম। তাহাকে বারবার বলিয়া দিলাম নজীর যেন অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করে; কিন্তু নজীর আমার সহিত দেখা করিতে আসিল না। ছাত্রদের অনেক কাজে-কর্মে নজীরের কথা শুনি। নজীরের এই মত, সুতরাং এরূপ করা হইবে না, নজীর এইরূপ বলিয়াছে সুতরাং ওখানে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

---

৭৬. Source : Muhammad Abdur Rahim (professor, Dept. of History, DU)/The History of the University of Dacca [DU - 1981] p. 139-141/191-193]

একদিন আমার এক বন্ধুর বাড়িতে মুসলিম হলের তিন চারিটি পরিচিত ছাত্র আসিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের নাম ধরিয়া আলাপ আলোচনায় কে নজীর চিনিতে পারিলাম। রঙ কালো তামাটে, পাতলা গঠন কিন্তু শরীরের স্বাস্থ্য ভাল। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। এই নজীর– ইউনিভার্সিটিতে, মুসলিম হলে তাহাকে কতবার দেখিয়াছি। কিন্তু কোনদিনও তাহাকে একটা কেউকেটা বলিয়া মনে হয় নাই। নজীরকে ডাকিয়া বলিলাম : 'দেখ, মুসলিম হলের নাইট স্কুলে তোমার কাজ দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আমি তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই।'

নজীর একটু লজ্জিত হাসিল। আমি বলিলাম: 'আচ্ছা বাড়িতে তোমার অবস্থা কেমন?' নাজীর বলিল : 'স্যার। আমার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সবগুলি পাঠ্যবই এখনও কিনিতে পারি নাই।' আমি বলিলাম : 'আচ্ছা তবে চার-পাঁচ টাকার মধ্যে আমি তোমাকে একখানা পাঠ্য-বই কিনিয়া দিব। তুমি যে কোন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করিও।' পাঠক মনে রাখিবেন সেটা ১৯৪১ সন। আমি মাত্র ১২৫ টাকা বেতন পাইতাম। নজীর অল্প একটু হাসিল। ইহার পরে টাকা লইবার জন্য নজীর আর কোনদিন আসে নাই। আমিও গরজ করিয়া তাহাকে কোন টাকা সাধি নাই। তাহার মত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার সেই ভাগ্য আমার হইল না।

পরে খবর লইয়া জানিয়াছিলাম ব্যক্তিগতভাবে খুব অভাবও তাহার ছিল না। তাহার এক চাচা তাহার পড়াশুনার খরচ চালাইতেন। সেই টাকার অল্পই নজীর নিজের জন্য ব্যয় করিত। অধিকাংশই গরিব বন্ধু-বান্ধবদের অভাব মিটাইবার কাজে লাগিত।

আমার নিজের দেশ ফরিদপুর। ঢাকা শহর হইতে তিন মাইল দূরে এক বাড়িতে আমাদের দেশের একটি ছাত্র অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেখানে তাহার সেবা শুশ্রূষার বড়ই অভাব। নজীরকে ডাকিয়া বলিলাম : 'নজীর বল ত কি করা যায়?' নজীর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল : 'স্যার কোন চিন্তা নাই। মুসলিম হল হইতে দুইটি ছাত্র প্রতিদিন তাহাকে সেবা করিতে যাইবে।' পরে জানিয়াছিলাম নজীরের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। নজীর ভালো বক্তৃতা করিতে পারিত না। মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কোন পদই সে কোন দিন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এমন একটা কি যেন তাহার মধ্যে ছিল যে জন্য তাহার সমসাময়িক ছাত্রেরা চক্ষু মুদিয়া সে যখন যাহা বলিত তাহা পালন করিত।

ফেণীতে বোমা পড়িতেছে। আমরা ঢাকা বসিয়াই আতঙ্কে অস্থির। ষ্টেশনে নজীরের সঙ্গে দেখা।

'নজীর কোথায় যাইতেছ?' সহাস্যমুখে সালাম করিয়া নজীর উত্তর করিল : 'যাই স্যার, দেখিয়া আসি ওখানকার লোকজনেরা কেমন আছে।'

'বল কি নজীর? তোমার ভয় করে না? শুনিলাম ফেণীতে প্রতিদিনই বোমা পড়িতেছে।'

'সেই জন্যই ত যাইতে হইবে স্যার। ভয় করিয়া কি করিব? মরিতে ত হইবেই। ফেণীর লোকগুলি কি অবস্থায় আছে একবার নিজের চোখে দেখিয়া আসি।'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সহাস্য মুখে আবার সালাম করিয়া নজীর গাড়িতে উঠিল। দূরে - বহুদূরে গাড়ী চলিয়া গেল, তবু ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানস-নয়নে দেখিতে পাইলাম - সুদূর ফেণীর শত শত অসহায় নরনারীর ক্রন্দন। আকাশ হইতে শত্রুর বোমা মৃত্যুর মত শেল বর্ষণ করিতেছে। দেশের অস্ত্রবিহীন শত সহস্র নর-নারী-বালক-বৃদ্ধ যে যেখানে পারিতেছে ছুটিয়া পালাইতেছে। আর ঢাকা হইতে সশব্দে রাশি রাশি ধুম' উদগীরণ করিয়া গাড়ী চলিয়াছে। সেই গাড়ীর একটি কক্ষে নজীর। সে আমাদেরই ছাত্র। কে বলে বাঙ্গালী মুসলিম জাগে নাই? নজীরের মত এমনই হয়তো মুসলিম হলের সবগুলি ছাত্র। মানুষকে মানুষ ভালবাসে। সেই ভালবাসার টানই আজ নজীরকে ফেণীতে আকর্ষণ করিয়াছে। সেই ভালবাসার আকর্ষণই বোধ হয় আজ তাহাকে এতটা নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর নজীর বহুদিন আমার বাসায় আসিয়াছে। 'পাকিস্তান' কাগজের জন্য লেখা চাহিয়া আমাকে ব্যস্ত-সমস্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'পাকিস্তান' ছাড়া কোন কাগজেই বোধ হয় আমি এরূপ ভাবে নিয়মিত লেখা দেই নাই। তাহা সম্ভব হইয়াছে নজীরের তাগিদের গুণে। আজ পুরাতন কাগজপত্র ঘাটিতে ঘাটিতে এক টুকরা কাগজ চোখে পড়িল। নজীর আমাকে বাসায় পায় নাই। ছোটো একটি চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। 'পাকিস্তানের ঈদ সংখ্যা বাহির হইবে। স্যার! আপনার লেখা চাই-ই চাই।' আজ নজীর নাই। 'পাকিস্তানের' আরো অনেক বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে, কিন্তু সৌম্যমূরতী নজীর আর লেখা চাহিয়া তাগিদ দিতে আসিবে না। নজীরের সেই একটুকরো ছোটো চিঠি খানি চিরদিন আমার বাক্সে থাকিবে।

কার্জন হলে বন্দে মাতরম গান লইয়া হিন্দু মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যে আকস্মিক গন্ডগোল হয় তাহার খবর সকলেই জানেন।

সেদিন ছিল নিখিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সমাবর্তন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে ডঃ হাসান (ভাইস চ্যান্সেলার) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই কতিপয় হিন্দু ছাত্র বন্দেমাতরম গানটি গাহিতে আরম্ভ করে। ইহাতে মুসলমান ছাত্রেরা প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু হিন্দু ছাত্রেরা তাহাতে কর্ণপাত করে না। সঙ্গে সঙ্গে এদলে ওদলে চেয়ার ছুড়াছুড়ি আরম্ভ হয়। তখন যদি ডঃ হাসান সভা ভঙ্গ করিয়া দিতেন সমস্ত ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। কিন্তু তিনি সবেমাত্র ভাইস চ্যান্সলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার সভাপতিত্বে সভা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার বদনাম হইবে তাই তিনি বারবার মুসলিম ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তোমরা চুপ কর। তাহারা চুপ করিলে হিন্দু ছাত্রেরা আবার বন্দেমতরম গানটি গাহিতে আরম্ভ করিল। ইহার পরে চেয়ার ছুড়াছুড়ি হইতে দুইদলে মারামারি আরম্ভ হইল। দুই তিন জন ছাত্র আহত হইল।

তখন ভাইস চ্যান্সেলার সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক তাহাদের প্রিয়তম ছাত্রদিগকে এই আত্মঘাতী দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া যার যার মত পালাইয়া গেলেন। ইহার পরে মুসলিম ছাত্রেরা কার্জন হল হইতে বাহিরে আসিয়া হিন্দু ছাত্রদের প্রতি ইট পাটকেল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। হিন্দু ছাত্রেরাও অনুরূপ মুসলিম ছাত্রদের প্রতি ইট পাটকেল ছুঁড়িতে লাগিল।

তখন আমার মনে হইল যেমন করিয়াই হোক, ছাত্রদের মধ্যে এই দাঙ্গা থামাইতে হইবে। ইহাদের পিতামাতা আমাদের উপরে নির্ভর করিয়াই নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। আজ তাহারা এখানে উপস্থিত থাকিলে কিছুতেই আপন সন্তান সন্ততিদিগকে এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না। দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে এরূপ দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া গেলে আমার ভিতরকার মানবতা অপমানিত হইবে। প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও আমি এই দাঙ্গা থামাইব। একবার আমি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করি অমনি মুসলিম ছাত্ররা ইট পাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করে। আবার মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে থামাই। হিন্দু ছাত্রেরা আক্রমণ আরম্ভ করে। সেদিন যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমার ভিতরে আছর করিয়াছিল। একবার আমি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছি এমন সময় একটি হিন্দু ছাত্র, 'শালা জসীম উদ্দীনকে মার' বলিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। আমি তার সামনে যাইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলাম : 'আমাকে মারিয়া যদি তোমরা এই দাঙ্গা হইতে নিরস্ত হও তবে আমাকে মার।' ছাত্রটি কেমন যেন নিজ্জুম হইয়া গেল। আর একবার মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এরূপ ভাবে আবেদন করিতে গেলে আমাদের ছাত্র বদরুদ্দীন আহম্মদ অধুনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাকে গাল দিয়া বলিল : 'জসীম উদ্দীন আসিয়াছে হিন্দুদের গোলাম হইয়া আমাদের কাছে শান্তির কথা বলিতে।' সুন্দর ইংরেজী উচ্চরসের জন্য এবং অপূর্ব ব্যক্তিত্বের জন্য মনে মনে এই ছাত্রটিকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করিতাম। পরদিন সে রবাহুত ভাবে নিজেই আসিয়া তাহার ইত্যকার ব্যবহারের জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিল।

প্রায় ঘন্টা দুই এইভাবে দাঙ্গা চলিতে লাগিল। আমি কিছুতেই ছাত্রদিগকে থামাইতে পারিতেছিলাম না। নজীর সেখানে উপস্থিত ছিল না। সন্ধ্যা বেলায় সে কোথা হইতে আসিয়া মুসলিম ছাত্রদের আপন আপন

ছাত্রাবাসে ডাকিয়া লইয়া গেল। সাপুড়িয়ার মন্ত্রে যেন তাহারা উদ্যত ফনা নত করিয়া চলিয়া গেল। এই গন্ডগোলে একজন মুসলিম ছাত্র একটু বেশি প্রহৃত হয়। খবর পাওয়া গেল সেই ছাত্রটি ঢাকা হলের (হিন্দু ছাত্রাবাসের) ভিতরে আছে। নজীর একাকি ঢাকা-হলের ভিতরে যাইয়া সেই আহত ছাত্রটিকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। নজীরকে হিন্দু-মুসলিম সকল দলই ভালবাসিত। এই মাত্র যাহারা এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গায় মাতিয়াছিল তাহারা নজীরকে এতটুকুর অসম্মান করিল না।

পরদিন খবরের কাগজগুলিতে ছাপা হইল 'বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের দাঙ্গার সময় ইহার সুযোগ্য ভাইস চ্যান্সেলার ডা: হাসান প্রাণপন চেষ্টা করিয়া ছাত্রদের দাঙ্গা থামান।' আমার কথা কেহই উল্লেখ করিল না। এমন কি আমার সহকারী শিক্ষকেরাও কেহ আমার এই কার্যের জন্য উচ্চবাচ্য করিলেন না। করিবেনই বা কি করিয়া? তাহারা যে অসহায় ছাত্রদিগকে দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

শহীদ নজীরের মৃত্যুর পর আমি এই স্মৃতি কথাটি লিখিয়াছিলাম। কেন জানি না, এই স্মৃতিকথা প্রকাশের ভার যাহাদের উপর পড়িয়াছিল তাহারা উপরের এই অংশটুকু বাদ দিয়াছিলেন। সেবার কক্সবাজারের এক সভায় বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমাদের প্রিয় ছাত্র, পরে পাকিস্তান গবর্ণমেন্টের মন্ত্রী আসরাফউদ্দীন সাহেব তাহার ভাষণে কার্জন হলের দাঙ্গায় আমার কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। মনে বিশ্বাস জন্মিল, কোন ভালো কাজ করিলে তাহা প্রচারের অপেক্ষা রাখেনা। একজন না একজন তাহা মনে করিয়া রাখে। ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন নতুন অধ্যাপক হইয়া প্রবেশ করিলাম তখন হিন্দু ছাত্রেরা কত ভাবেই না আমার ক্লাশে উৎপাত করিয়া আমাকে চাকরি ছাড়া করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহারা আমার কাজের সত্যকার পুরুষ্কার দিল এই কার্জন হলের দাঙ্গার দিনে। এই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান প্রায় ত্রিশজন ছাত্র যখম হইয়াছিল। আমি যে একজন মুসলমান, দুই দলের মধ্যেই ঘোরাফেরা করিয়া দাঙ্গা থামাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম, আমার গায়ে কিন্তু একটি কাঁটার আচড়ও লাগে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা জীবনে এটি আমার শ্রেষ্ঠ পুরুষ্কার।

প্রথম দিনের দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান কয়েকজন ছাত্র সামান্য আহত হয়। নজীর সারারাত্র জাগিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করে। দ্বিতীয় দিনের দাঙ্গার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় দেওয়ান বাজারের মোড়ে নজীরের সঙ্গে দেখা হইল। নজীর কেবল হাসপাতালের নার্স, ডাক্তার ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিল : 'স্যার, দেখুন ওরা কত বড়ো জনসেবার ভার লইয়াছে কিন্তু প্রায় সকলেই হৃদয়হীন। সকালে রোগীদের ঠান্ডা দুধ দিয়াছে। আমি নিজে নার্সকে বকিয়া হিন্দু মুসলমান সকল আহত ছাত্রের জন্যই দুধ আবার গরম করাইয়া দিয়াছি।' বুঝিলাম হাসপাতালের প্রতি অভিযোগে কিছু বাড়াবাড়ি আছে কিন্তু নজীর তাহাদের সমালোচনা করিতেছে নিজের উন্নত হৃদয়ের মাপকাঠি দিয়া। এত অভিযোগ যাহাদের বিরুদ্ধে, হায়রে! তাহাদেরই আশ্রয়ে পরদিনই নজীরকে শেষ নিঃশ্বাস লইতে হইল।

আমি নজীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম : 'নজীর, আর ত কোন গন্ডগোল হইবে না?' 'না স্যার, আর কোন গন্ডগোল হইবে না। তবে দু'একটি খারাপ 'এলিমেন্ট' আছে বটে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিব।' পরে নজীর আমাকে বলিল : 'স্যার, এখন আমি বড়ই ব্যস্ত রাত্রে একবার হাসপাতালে আসিবেন। আলাপ করা যাইবে।' নজীর চলিয়া গেল। তখন পশ্চিম আকাশে রক্তের লোহিত সাগরে দিবসের শান্ত বেলা সাঁতার ধরিয়াছে। ইহাই নজীরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। প্রথম দিনের দাঙ্গার পরে ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব যদি কিছুদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ দিয়া দিতেন তবে হয়ত কিছুই হইত না। কিন্তু তিনি সবেমাত্র উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ছুটি দিলে বাহিরে জানাজানি হইয়া তাহার অক্ষমতা প্রমাণিত হইতে পারে। এইজন্য প্রথম দাঙ্গার পর দিনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার হুকুম দিলেন।

পরের দিন হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আবার দাঙ্গা লাগিল। দাঙ্গা শেষ হইলে খবর পাইলাম নজীর সামান্য রকম আহত হইয়াছে। ইতিমধ্যে হাসপাতাল হইতে একজন আসিয়া বলিল : নজীরের অবস্থা গুরুতর। তাহার শরীরে রক্ত দিবার জন্য কয়েকজন সবল যুবক চাই। এই খবর যে যে ছাত্র শুনিল তাহারা সকলেই নজীরের দেহে রক্ত দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ছয়-সাত জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে আসিলাম। কাহাকেও হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। আমরা খবর পাঠাইলে হাসপাতালের অধ্যক্ষ অসিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : 'আহত ছাত্রেরা কেমন আছে?' তিনি উত্তর করিলেন : 'সকলেরই আঘাত সামান্য। একমাত্র নজীরের অবস্থাই গুরুতর।' একজন জিজ্ঞাসা করিলেন : 'আপনি কি বলিতে চাহেন তাহার অবস্থা আশাহীন?' ডাক্তার বলিলেন : 'I am sorry that his condition is very serious'. ছাত্রদের মধ্যে যাহারা রক্ত দিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া দিলাম। সাহেব বলিলেন : 'আপনাদিগকে ধন্যবাদ, এখন আর রক্ত দিবার প্রয়োজন নাই। দরকার হইলে আপনাদিগকে খবর পাঠাইব।' তখন দেখিলাম যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত ব্লাড ব্যাঙ্কের গাড়ী হাসপাতালের দরজায় দাঁড়াইয়া। বোধ হয় সেখান হইতেই নজীরের জন্য রক্ত লওয়া হইয়াছিল।

অশ্রু-সজল নয়নে খোদার কাছে মোনাজাত করিতে করিতে আমরা হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গের শিক্ষক বন্ধুরা স্থির করিলেন মুসলিম হলে ও ফজলুল হক হলে নজীরের আরোগ্য কামনা করিয়া দোয়া দরূদ পড়ার ব্যবস্থা করা হইবে। যে এ খবর শুনিল সেই সজল নয়নে আসিয়া মসজিদে জড় হইল। না ডাকিতে দুইটি মসজিদ ভরিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে একজন ডাক্তার বন্ধু খবর লইয়া আসিলেন আমাদের নজীর আর ইহজগতে নাই। এই খবর দাবানলের মত সমস্ত ঢাকা শহরে ছড়াইয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে পা ভাঙ্গিয়া আসে। চোখের পানি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারি না। পরিচিত সকলেরই আমার অবস্থা।

হাসপাতালে ছুটিয়া আসিলাম। শহরে সান্ধ্য আইন জারী হইয়াছে। মৃতদেহ আজ দেওয়া হইবে না। কালও মৃতদেহ অমাদের হাতে দেওয়া হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। নাজীরের সহপাঠিও সহকর্মীরা ঘন ঘন চোখের পানি মুছিতেছে। গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সারা রাত ঘুম আসিল না।

নজীর আমার আত্মীয় নয়, পরিজন নয়। দেশের একজন নামকরা নেতাও নয়, যাহার জন্য ঘটা করিয়া সভা ডাকিয়া করুণ রসের বক্তৃতা করা যায়। আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ হইলেও বন্ধুবান্ধব সান্তনা দিতে আসে। গৃহে আনন্দ উৎসব থামিয়া যায়। কিন্তু এ বেদনা যে কি করিয়া সহ্য করা যায় তাহার সন্ধান কে দিবে। গৃহে সকলের স্নানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা সবই সমানে চলিতেছে। কিন্তু সকলের সঙ্গে চলিতে যাইয়া কেবল ঘন ঘন তাল কাটিতেছে। কবিতার খাতা লইয়া লিখিতে চেষ্টা করিলাম। চোখের পানিতে কবিতার লাইনগুলি ভিজিয়া গেল।

পরের দিন সকালবেলা ইউনিভার্সিটিতে আসিয়া খবর পাইলাম আজিমপুর গোরস্থানে নজীরের মৃতদেহ আনা হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই দাফন কার্য শেষ হইবে। তাড়াতাড়ি আজিমপুর গোরস্থানে চলিয়া আসিলাম।

মুসলিম হলের ফজলুল হক হলের যে যে ছাত্র খবর পাইয়াছে তাহারা সকলেই আসিয়াছে। ঢাকার মুসলিম জনসাধারণকে খবর দেওয়া হয় নাই। ধীরে ধীরে নজীরের মৃতদেহ গোছলখানার ধারে লইয়া যাওয়া হইল। তাহাকে গোছল করাইয়া কাফনে সজ্জিত করা হইল। কেহ একটি ফুল লইয়া আসে নাই, একটি লোবান জ্বালাইয়া আনে নাই। এসব চিন্তা করিবার মনের অবস্থাও ছিল না কাহারও। সকলেরই চোখে অজস্র অশ্রুধারা। সকলের সামনে আনিয়া মৃতদেহের মুখমন্ডল উন্মোচন করা হইল। মাথায় একটা আঘাতের চিহ্ন। মুখের চেহারার একটুকুও পরিবর্তন হয় নাই। সেই চির পরিচিত স্বাভাবিক হাসিটি যেন লাগিয়াই আছে। যেন এই মাত্র সে ঘুমাইয়াছে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বাঙ্গালী মুসলমানের উজ্জল ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

তোমরা তাহাকে কেহ ডাক দিও না। তাহার এই সুন্দর স্বপ্নভরা ঘুম ভাঙ্গিয়া দিও না। যদি তাহাকে ভালবাস, তার জন্য যদি কাহারও অন্তর কাঁদে তবে যে কাজ সে আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই, সেই কাজে আপনাকে নিয়োজিত কর। যাহারা নিপীড়িত, পদদলিত, বন্ধুবিহীন, মহাবুভুক্ষায় কঙ্কালসার তাহাদের জন্য কিছু করিতে চেষ্টা কর। নজীরের মত নির্ভীক হইবার শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৭৭]

---

৭৭. জসীম উদদীন (পল্লীকবি)/স্মৃতির পট। [পলাশ প্রকাশনী - নভেম্বর, ১৯৬৮। পৃ. ১৮৪-১৯২]

দুই

"...নজীর আহমদ, শহীদ: চল্লিশের দশকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সন্ত্রাসের শিকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শহীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম নির্ভীক ছাত্রনেতা। নজীর আহমদ বৃটিশের নাগপাশ মুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলনে ছিলেন বলিষ্ঠ ছাত্র নেতা, 'পাক্ষিক পাকিস্তান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফোরাম ও কর্মকান্ডের নেতৃত্বদানসহ বহু জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে জড়িত নজীর আহমদ জাতির জন্য অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার দায়িত্ব-কর্তব্য সচেতনতা এবং কর্মোদ্দীপনা তাঁহাকে সুধীজনের শ্রদ্ধালাভে ধন্য করিয়াছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: শহীদ নজীর আহমদের জন্ম বাংলা ১৩২৪ সনের চৈত্র মাসে (১৯১৮ সনের এপ্রিল)। ফেনী জিলার দক্ষিণ আলিপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান হইয়াও তিনি বাল্যকাল হইতেই নিষ্ঠা আর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। তাঁহার বংশপরিচয় যতদুর জানা যায় তাহাতে দেখা যায়– তাঁহার পিতৃকূল বিভিন্ন সদগুণাবলীর জন্য স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা: শহীদ নজীর আহমদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় নিজ গৃহে। স্থানীয় প্রথামত তিনি প্রথমে আরবী ও কু'রআন শিক্ষা করেন। অতঃপর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দরিদ্রতার কারণে তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয় কষ্টের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি হাইস্কুলে ভর্তি হন। আর্থিক অনটন আর প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হইয়াও তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৩৭ খৃ. তিনি বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাস করেন। ১৯৩৯ খ্রি. ফেনী কলেজ হইতে আই.এ পাস করিয়া তিনি ঢাকা আসেন। ঐ বৎসরই তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪২ খৃ. তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্মান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ তাঁহার এম. এ পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে নিহত হওয়ায় সেই পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ নজীর আহমদ স্কুল জীবন হইতেই বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে জড়াইয়া পড়েন। স্কুল জীবনে তিনি 'দরিদ্র ছাত্র ভান্ডার' প্রতিষ্ঠা করিয়া গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ছাত্র যুব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান। স্ত্রী শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন। বয়সের তুলনায় তাঁহার কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও দায়িত্ব সচেতনতার গভীরতা সমসাময়িক প্রবীণ ব্যক্তিগণকেও বিস্মিত করে। বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁহার ডাকে অবলীলায় সাড়া দিতেন। তাঁহার সামাজিক কর্মকাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ মানবতাবোধ ও জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে নিবেদিত। ছেলেবেলাতেই তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট হন। ইসলামি চেতনাবোধ-উৎসারিত নির্মল সংস্কৃত রচনার চিন্তায় তিনি ছিলেন বিভোর। পরাধীন মুসলমানগণকে স্বকীয় চেতনাবোধে উজ্জীবিত করিয়া স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪২ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। নজীর আহমদ প্রথম হইতেই এই দলের ছাত্রকর্মী হিসেবে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি) এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন সৈয়দ আলী আহসান। সংসদ প্রতিষ্ঠার পর ইহার পাক্ষিক মুখপাত্র 'পাকিস্তান' প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব আসিয়া পড়ে নজীরের ঘাড়ে। তিনি অতি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করিয়া তৎকালীন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টি কাড়েন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারি মাসে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। এই অধিবেশন সফল করিতে নজীর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কবি ফররুখ আহমদ, কবি জসীম উদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসানসহ সমসাময়িক কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে নজীরের ছিল অকৃত্রিম সম্পর্ক। এই অধিবেশনে বাংলাভাষাকে শিক্ষা-সাহিত্যের বাহনরূপে দাবি উত্থাপিত হয় এবং সেই দাবির পেছনে সুধিগণ যুক্তি উপস্থাপন করেন। নজীর আহমদ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রাজনৈতিক তৎপরতাঃ রাজনীতির সঙ্গে নজীরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর। ১৯৪০ খৃ. গৃহীত লাহোর প্রস্তাব এবং ইতিপূর্বে (১৯৩০) আল্লামা ইকবাল প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে তখন মুসলমানদের মধ্যে গণজোয়ার চলিতেছে। কংগ্রেস বাদে প্রায় সবগুলি আঞ্চলিক দলই মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। নেতৃবৃন্দ ভারতব্যাপী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া ফিরিতেছেন। জনগণ মিছিল মিটিং, সম্মেলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করিতেছে। এই অবস্থায় নজীরের মতো সচেতন ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চুপ বসিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। নজীর আহমদ ছাত্রজনতার মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মকথা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটিয়া বেড়ান। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাবিবুল্লাহ বাহারসহ অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। নজীর এই সম্মেলনে বিরাট ছাত্র কাফেলাকে নিয়া উপস্থিত হন। ইহা ছাড়া হাবীবুল্লাহ বাহার লিখিত 'পাকিস্তান' গ্রন্থটি তিনি ছাত্র-জনতার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিক্রির উদ্যোগ নেন। এইভাবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন।

ছাত্র রাজনীতিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াই নজীর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রশ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা ও সারা প্রদেশের ছাত্রগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। আশ্চর্যের বিষয়, নজীর কোন বিশেষ দলের সদস্য বা নেতা না হইয়াও ছাত্রাঙ্গণে যে প্রভাব বিস্তার করেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভারই স্বাক্ষর মিলে। হিন্দু ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নজীর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম ছাত্রগণ সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের সঠিক নেতৃত্ব নজীরের উপর প্রদান করে। হিন্দু ছাত্ররা তাঁহার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের তৎপরতার প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য নজীর আহমদকে হত্যা করে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজীর আহমদঃ ১৯৩৭ খৃ. প্রাদেশিক নির্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠনকারী কংগ্রেসীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষাঙ্গনে বন্দে মাতরম সঙ্গীত গাহিতে বাধ্যতামূলক করে। অথচ একই সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই প্রেক্ষাপটে নজীর আহমদ কলেজ জীবনেই বন্দেমাতরম সঙ্গীতসহ কংগ্রেসী সরকারসমূহের সাম্প্রদায়িক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে থাকেন। ১৯৪০খৃ. লাহোর প্রস্তাব পাস এবং পাকিস্তান আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে হিন্দু ছাত্ররা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে, তাহারা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাহাদের সাম্প্রদায়িকতার চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৩ খৃ. অনুষ্ঠিত একটি ছাত্রী সমাবেশকে কেন্দ্র করিয়া। এই সমাবেশে হিন্দু মেয়েরা হিন্দু সংস্কৃতির আলোকে সভামঞ্চ ও সভাস্থানটি সাজায়। তাহা ছাড়া মুসলমান ছাত্রীগণকেও ইহাতে অংশগ্রহণে চাপ দেওয়া হয়। অবশেষে পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রী সমাবেশের এহেন সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে নজীর আহমদের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্ররা মিছিল করিতে থাকে। হঠাৎ হিন্দু ছাত্ররা তাহাদের পালটা মিছিল হইতে আক্রমণ করিয়া নজীর আহমদকে ছুরিকাহত করে। তাঁহাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

শহীদ নজীর নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইসলামি আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধে উৎসর্গীকৃত। তাই যখনই ইসলামের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে ডাক আসিয়াছে তখনই তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন জনতার মাঝে। নেতৃত্বের প্রতি তাঁহার কোন লোভ ছিল না, এমনকি তিনি ঘোষিত কোন নেতাও ছিলেন না, তবু তাঁহার নেতৃত্ব বয়স ভেদে কেহই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শের প্রতি তাঁহার উৎসর্গের মাপকাঠি নিরূপিত হয়।"[৭৮]

৭৮. তথ্যসূত্র : ইসলামি বিশ্বকোষ (১৩শ খন্ড)/ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - ডিসেম্বর, ১৯৯২। পৃ. ৬১৭-৬১৮

তিন

"...These continuous riots in Dacca - predominantly a Hindu city like all other towns of Bengal - affected muslim education very much. The entire Muslim community was shocked when Nazir Ahmad, leader of the Muslim students of the Dacca University and editor of Pakistan - a Bengali periodical, was stabbed in broad day light in front of his class and in the presence of the teachers. He succumbed to the injuries in the hospital. The University was closed for an indefinite period. [f.n : The University authority maintained that the trouble started in the women's hostel two days before the stabbing of Nazir when Muslim students protested the 'Bande Mataram' song sung by the Hindu girls inspite of the opposition of the Muslim girls who were in minority in the hostel. And as the disturbances were spreading the classes had to be closed down.] But these cruel actions only increased the determination of the Muslims. Until 1942 only towns, where Hindus formed the majority were affected by communal riots, but rural areas where the Muslims formed almost ninety per cent of the population were peaceful. Such incidents began to disturb the mental equilibrium of the villagers and by the end of 1942 the communal riots spread to the villages. Narayanganj Sub-Division in Dacca was the first be effected."[৭৯]

চার

"...উপমহাদেশের রাজনীতির দিক থেকে এ সময়কালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমান বিরোধটি প্রবল আকার ধারণ করেছে। উভয় সমাজের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে, এর ওপর ভিত্তি করে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। দুটি বিরোধী চিন্তাধারা একে অন্যকে আঘাত-প্রতিঘাতে টেনে এনেছিল। এসব নিয়ে ছাত্রমাজের মধ্যে তখন প্রচন্ড বিক্ষোভ চলছে। পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্ররা এ আন্দোলনকে প্রচন্ড গতি দিয়েছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হোস্টেলের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পূজার্চনা বিধিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। এ দাঙ্গায় নজীর আহমদ নামে একটি ছেলে মারা যায়। নজীর আহমদ নামক পুস্তকে এ সময়কালের ইতিহাস পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।"[৮০]

পাঁচ

"...নির্বাচিত ছাত্রী ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে 'মঙ্গল ঘট' প্রদর্শন ও 'বন্দে মাতরম' সংগীত পরিবেশনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারী যে অপ্রীতিকর ঘটনার সূচনা হয়, তা শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহ করে ২ ফেব্রুয়ারি - যেদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নির্মম শিকার হয় নজীর আহমদ।

...১৯৪৩ সালের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম তথ্য প্রদান করেছেন যে, '...৪২ সনের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘাত ঘটেছিলো। এর সূত্রপাত হয়েছিলো কার্জন হলে ছাত্রীদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্রের আচরণ নিয়ে, হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের ফলে। পরের দিন এর বিস্তার ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এবং অফিস বিল্ডিং অর্থাৎ এখনকার বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং-এ। এ ভবনের দোতলার একদিকে ছিল ফজলুল হক হল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রদের বাসস্থান। ভবনের পূর্বদিকে ছিল ক্লাস ঘর, ছাত্রীদের কমন রুম আর শিক্ষকদের বসার ঘর। নিচে ছিল লাইব্রেরি। এই দিনের সংঘাতের সময়টাতেই নজীর আহমদ নামের একজন মুসলমান ছাত্র আকস্মিকভাবে ছুরিকাহত হন

---

৭৯. Kamaruddin Ahmad/The Social History of East Pakistan| [Crescent Book - 1967| P. 47-48]

৮০. সৈয়দ আলী আহসান/জীবনের শিলান্যাস। [বাড কম্প্রিট - ফেব্রুয়ারি, ২০০২। পৃ. ৮৮]

এবং ঐদিনই বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালে তিনি মারা যান। আমি তখন মাত্র আই. এ. পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। নজীর আহমদের স্মরণে পরবর্তীকালে নাজিরাবাজার এলাকায় একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিম ছাত্রবৃন্দ, যার নাম দেওয়া হয়েছিল শহীদ নাজির লাইব্রেরি।' [কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম/চল্লিশের দশকের ঢাকা। সাহিত্য প্রকাশ- ২০০১। পৃ. ৯৫-৯৬] ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত নতুন মাত্রা লাভ করে এবং কতকটা রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে যখন এই প্রতিষ্ঠানের মুসলিম ছাত্রবৃন্দ ৩ ফেব্রুয়ারি এক সভায় মিলিত হয়ে বেশ কয়েকটি দাবী উত্থাপন করে। এই দাবী সমূহের মধ্যে দুটি দাবি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ - প্রথমত: নজীর আহমদের মরদেহ পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মের জন্য ছাত্রদের নিকট প্রত্যার্পণ ও দ্বিতীয়ত: নজীর আহমদের মরদেহ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বা ফজলুল হক হলের নিকটে কবর দেবার অনুমতি প্রদান যাতে ছাত্রবৃন্দ তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

...১৯৪৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতির পক্ষ হতে 'শহীদ নজীর আহমদ দিবস' পালিত হয়। এই সভায় তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অগ্রণী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

...ছাত্রী হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। ১৯৪৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কলিকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে যে 'শহীদ নজীর আহমদ দিবস' পালিত হয় সেখানে সভাপতিত্ব করেন বাংলার আইন সভার সদস্য ও খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রী সভার শিক্ষামন্ত্রী তমিজুদ্দীন খান (১৮৮৯-১৯৬৩)। এই সভায় অন্যান্য বক্তা ছিলেন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার আর এক সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩), আজাদ পত্রিকার সহ-সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

...আহতদের মধ্যে ছিলেন সুবোধ রঞ্জন সেন, চিত্তরঞ্জন সাহা, সুধীর দত্ত, নিত্যানন্দ পাল, রুপেন্দ্র ব্যানার্জী, রামপ্রসাদ দাশ শর্মা, অমল রায় ও ক্ষিতীন্দ্র নাথ বসু। অন্যদিকে ফজলুল হক হলের ছাত্রদের মধ্যে যারা আহত হয়েছিলেন তারা হলেন এ. এইচ. এম. মুসলেউদ্দীন, আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ দানেশ এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মোহাম্মদ এমদাদউল্লাহ, এ. এম. সিদ্দিক আহমদ, মোহাম্মদ চান্দ মিয়া ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ। উল্লেখ্য শেষোক্ত ছাত্র খোন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন প্রথম বর্ষ (সম্মান) ইংরেজী বিভাগের, আর ইনিই পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, মন্ত্রীত্ব লাভ করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ যে একই ব্যক্তি তার প্রমাণ কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল পত্রে খোন্দকার মোশতাক আহমদের পরিচয় এভাবে লেখা হয়েছে যে, Khandaker Mostaq Ahmad, S/O Kabiruddin Ahmad Khandakar, Vill - Doshpara, P.O. Gouripur, Dr. Tippera (D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76). খোন্দকার মোশতাক আহমদের প্রায় ঠিক অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা একাডেমী চরিতাভিধানে (২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৪২-৪৩)।

...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত শহীদ নজীর দিবস পালিত হতো।"[৮১]

---

৮১. ড. রতন লাল চক্রবর্তী/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত ইতিহাস : ১৯২১-১৯৫২। [দি ইউনিভার্সেল একাডেমী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ২৮১/২৮৩-২৮৪/২৯১/৩৬৬]

ছয়

"...সম্ভবত এটা ছিল মেয়েদের হোস্টেলের অভিষেক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সম্ভবত পিটন হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আনুষ্ঠানিক কর্মে ও পরিচর্যায় যারা নিযুক্ত ছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু। গেট সাজানো থেকে আরম্ভ করে প্রবেশ পথ, সভাকক্ষ এবং মঞ্চ সাজানো সবই হিন্দু মেয়েরা করেছিল। তাদের দেওয়া আলপনার মধ্যে স্বস্তিকার চিহ্ন ছিল। প্রবেশ পথের দু'পাশে মাটির হাঁড়ির উপর সিঁদুর চর্চিত শুকনো নারকেল ছিল, মঞ্চটিও হিন্দু দেবীর পূজার চত্বরের মতো সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হবে তখন দুটি মুসলমান ছাত্রী প্রবেশ তোরণ এবং সভামঞ্চ দেখে হল থেকে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসে। ঢাকার চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে যায় এবং মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। যাতে বিভিন্ন হলে আলোচনা হতে থাকে যে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। নজীর আহমদ সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরবর্তী ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেবেন এটাই ঠিক হয়। ছাত্রদের বুদ্ধি দেবার ক্ষেত্রে কবি জসীম উদ্দিনের সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। সিদ্ধান্ত হয় যে, পরের দিন মুসলমান ছেলেরা ক্লাসে যাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও মিছিল করবে। আমার ধারণাও করতে পারিনি যে, হিন্দু ছেলেরাও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। পরে শুনেছিলাম যে, ইংরেজীর অধ্যাপক পি.কে. গুহর বাসভবনে নেতৃস্থানীয় ক'জন হিন্দু ছাত্র মিলিত হয়েছিল পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। পি. কে. গুহ আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাসভবনে যে সভা হয়েছিল তা আমি স্পষ্ট জানতাম না। আমি শুনেছিলাম কবি জসীম উদ্দীনের কাছ থেকে। যাই হোক, দুর্ঘটনা এলো পরের দিন এবং এলো প্রচন্ডভাবে। সভা এবং মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে চলেছিলো। কিন্তু অকস্মাৎ হিন্দু ছেলেদের আক্রমণে সংঘর্ষ বাঁধে এবং নজির আহমদ মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি ছুরিকাবিদ্ধ হন। প্রথমে এই আঘাতটি কেউ গুরুতর ভাবেনি। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ক্রমশ নজীর আহমদ দুর্বল হতে থাকেন তখন মিডফোর্ড হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি জসীম উদ্দিন হাসপাতালে সর্বক্ষণ তার শয্যাপাশে ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে নজীর আহমদ মারা যান। তার মৃত্যুতে কবি জসীম উদ্দিনের হাহাকার ও আকুল কান্নাকে আমি কখনও ভুলবো না।"

[নজীর আহমদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ঢাকায় অন্যতম মুসলিম লীগ নেতা ফজলুর রহমানের অর্থ সাহায্যে সৈয়দ আলী আহসান 'নজীর আহমদ' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সংকলনে নজীর স্মরণে জসীম উদ্দীনের একটি কবিতা, সৈয়দ ড. সাজ্জাদ হোসাইনের একটি, বেনজির আহমদের একটি, আব্দুর রাজ্জাকের একটি এবং সৈয়দ আলী আহসানের তিনটি প্রবন্ধ তথা কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ স্থান পায়। পবিত্র কুরআনের আয়াতের বঙ্গানুবাদের প্রথমটি আজিমপুর গোরস্থানে শহিদ নজীরের সমাধিলিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে-'খুনে রাঙা পথে শহীদ হয়েছেন যারা, আল্লাহর রাহে, রূহ বিলায়েছে যারা, মৃত্যু তাদের মৃত্যুই নয় জীবন এনেছে সাথে।' এতদ্ব্যতীত কাজী নজমুল হক সম্পাদিত *শহীদ নজীর* (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫)-এ বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ, আব্দুল গনি হাজারী এবং অন্যান্যদের রচিত কবিতা ছিল।][৮২]

সাত

"...১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সম্মেলনে হিন্দু ছাত্রদের বন্দেমাতরম গান গাওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। টেনিস মাঠে দু'পক্ষের মধ্যে ইট ছোঁড়াছুঁড়ি চলছিল। একদল হিন্দু ছেলে কাছে দাঁড়িয়ে এতে উৎসাহ দিচ্ছিল। ব্যাপারটি যাতে সহজে মিটমাট হয়ে যায় সে জন্য তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। নজীরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারাও অন্তর থেকে অশান্তি চায় না। শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ যাবে না। কিন্তু তা হলো না। অতর্কিতে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেওয়া হলো। ওঃ করে ওঠে নজীর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

---

৮২. সৈয়দ আলী আহসান/দৈনিক ইনকিলাব ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ইং

মাত্র একদিন পূর্বে ছাত্রদের এক সংঘর্ষে কিছু ছাত্র আহত হয়। আহত হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়, নজীর তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং কি হিন্দু কি মুসলমান সকল ছাত্রই তার সেবা পেয়েছিল। মানবতার এমন এক উৎসর্গীকৃত সেবককে এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে গিয়ে প্রাণ দিতে হবে, এটা ছিল সবারই কল্পনার বাইরে।"[৮৩]

আট

"...শহীদ নজীরের নাম এদেশে আজ সুপরিচিত। পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে আজ তার বিচিত্র জীবনের কর্মোজ্জ্বল কাহিনি আলোচনা হচ্ছে। আত্মগোপন করে থাকা ছিল যার জীবনের আদর্শ, মৃত্যু তাকে নিয়ে এসেছে মশহুরিয়াতের তীব্র আলোকে।

শহীদের মৃত্যু নজীরের জীবনকে বিশিষ্টতা দান করেছে নিশ্চয়, কিন্তু কর্মময় জীবন এবং সুস্পষ্ট জীবনাদর্শ তার মৃত্যুকে করেছে মহিমান্বিত, এ কথাইবা কেমন করে অস্বীকার করি?

নজীর আহমদ আমার দেশের ছেলে। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে নানা জায়গায় - ফেণীতে, সিরাজগঞ্জে, হয়ত কলকাতায় এবং ঢাকায়ও। কিন্তু তার জীবনের সব কথা জানবার তখন সুযোগ হয়নি। কে জানত তার জীবনকাহিনি লিখবার প্রয়োজন হবে এত শীগগির?

ফেণীতে পড়বার সময়ই দেখেছি তার প্রাণ-ধর্মের একটু একটু করে বিকাশ হচ্ছে। প্রেমধর্মী কিশোর-মনুষ্যত্বের বেদনাবোধ তাকে করে তুলেছে খানিকটা চঞ্চল। সে সেবার কাজে মেতেছে - দরিদ্র ছাত্র ভান্ডার খুলছে - ছাত্রসমিতি গড়ছে। সবাইকে ডেকে যেন বলতে চাচ্ছে: চল আমরা বড়ো হই। আমাদের জাতকে বড়ো করি - দেশকে সুন্দর করি।

ফেণীর পড়া শেষ করে নজীর গেল ঢাকায়। নানা দিক থেকে কানে আসে: নোয়াখালী থেকে একটা কাজের ছেলে এসেছে ঢাকায়। যে কাজে কাউকে পাওয়া যায় না সে কাজে সেই হয় অগ্রণী। ভাবালুতা তার নেই - বড় বড় দুঃস্বপ্ন দেখার চাইতে সত্যিকারের ছোটো কাজ তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। দলগত সংকীর্ণতা ব্যক্তিগত প্রাধান্যের খায়েশ বা যশোলিপ্সা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কাজের মধ্যে নিজেকে একেবারে সে ডুবিয়ে দিতে পারে। কর্মপ্রেরণা সে লাভ করে অন্তর থেকেই। মনে পড়ল, ষাট বছর আগে ঢাকায় নোয়াখালীর আর কয়টি ছেলে একত্র হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এরা গ্রহণ করেছিলেন সবার আগে। মাতৃজাতির মনের অন্ধ গুহায় প্রদীপ জ্বেলে তার আলোকে গৃহকে পরিপ্লাত করবার, বাংলা সাহিত্যকে স্বীকার করে বাঙালী মুসলিমের মুক মুখে আবার জীবনের ভাষা ফিরিয়ে দেবার ছিল তাদের সাধনা। কয়টি মাত্র ছেলের চেষ্টায় ১৮৮৫ সনে বিরাট কর্মপন্থা নিয়ে 'মুসলমান সুহৃৎ সম্মেলন' গড়ে উঠেছিল। এই সমিতি পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় গোড়াপত্তন করেছিল স্ত্রী-শিক্ষার। পাঠ্যবই লেখা, সিলেবাস তৈরী করা, এক তারিখে বাংলা জুড়ে পরীক্ষা নেওয়া, সার্টিফিকেট দেওয়া - সবই ছিল এই সমিতির কাজ। কাজ করেছে এই সমিতির সদস্যরা সমগ্র জীবন দিয়ে - নামের কাঙাল কিন্তু ছিল না এরা কেউই। দৃষ্টি ছিল এদের পরিচ্ছন্ন - স্বপ্ন ছিল এদের বিরাট। নজীরের কর্মসাধনার কাহিনি শুনে মনে হল - তার জীবনও ঐ একই ছাঁচে গড়া। জেলাবাসী এই তরুণদের সে মানস সন্তান।

সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনে নজীরের সঙ্গে দেখা কয়েক ঘন্টার জন্য। বিরাট কাফেলা নিয়ে এসেছে সে ঢাকা থেকে। সে ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এক সঙ্কট সময়। বাংলার তরুণ মুসলিম এতদিন ফজলুল হক সাহেবের দরদী মন ও ব্যক্তিত্বের জন্য তাকেই নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। হক সাহেবের আদর্শচ্যুতি গভীরভাবে আঘাত করেছে সেদিন বাঙালী মুসলিমের নব চেতনাকে। ব্যক্তি বড়ো কি আদর্শ বড়ো - এই ছিল সেদিনকার বড়ো প্রশ্ন।

---

৮৩. ডঃ রফিকুল ইসলাম/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ বছর। দৈনিক বাংলার বাণী, ৬ মার্চ ১৯৯২ইং।

যে আদর্শ হাতছানি দিয়ে নজীরের তরুণ মনকে ব্যক্তিত্বের কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে, সেই আদর্শের সঙ্গে তার জেলাবাসী আমিও এসে দাঁড়িয়েছি, এইজন্য সেদিন তার আনন্দের অবধি ছিল না। আমার 'পাকিস্তান' বই তখন সবেমাত্র বেরিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে সকলের আগে তার জেলাবাসী এক তরুণ - সেদিন এও ছিল তার আনন্দের অন্য কারণ। আমি তাকে এক কপি বই উপহার দিতে চাইলাম, সে মৃদু হেসে বললে - 'তা হয় না। পাকিস্তান পুস্তকের দায়িত্ব লেখকের চেয়ে পাঠকের অনেক বেশি। যে আদর্শ আমাদের রক্ত মাংসে মিশে গেছে তার প্রচারের জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকারের গৌরব থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না।' সে পয়সা দিয়ে এক কপি 'পাকিস্তান' ষ্টল থেকে কিনে নিলে, কয়েক ঘন্টা পরেই দেখি ছাত্রদের অনেকের হাতে এককপি করে 'পাকিস্তান'। বুঝতে দেরী হল না- এর গোরায় ছিল আদর্শের জন্য নজীরের অকৃত্রিম প্রীতি।

নজীরের জীবনকে আমরা গ্রহণ করতে পারি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হিসাবে। আজ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও দলগত সংকীর্ণতা বাংলার ছাত্র আন্দোলনে যে বিকৃতি এনেছে নজীর ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; সংকীর্ণ পরিধির ক্লেদাক্ত রাজনীতি তার জীবনকে কোনদিনই বিষাক্ত করতে পারেনি। অতীতের বা নেতা বিশেষের অন্ধ অনুবর্তিতা তার পক্ষে ছিল না সম্ভবপর। জনতার নবজাগরণ সে চেয়েছিল সমগ্র জীবন দিয়ে। তার যেমন ছিল প্রাণের প্রাচুর্যের - তেমনি ছিল তার বাক্যে দৃষ্টিভঙ্গী। সে বুঝেছিল জাতীয় জীবনে নব সৃষ্টির খাতিরে অতীতকে কিছুটা রূপান্তরিত না করে উপায় নেই। এই জন্য প্রয়োজন পুরোনো নেতৃত্বকে নতুন করে ঝালাই করবার।

পাকিস্তান আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করা ছিল তার জীবনের স্বপ্ন সাধ। এই জন্য সে ভেবেছিল বিপ্লবের কথা - সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করবার কথা। সে জানত ইসলামের সাফল্যের গোড়ায় ছিল সাম্যের প্রোগ্রাম - এর বিপ্লবীরূপে। বাংলার মুসলমান আজ পরিণত হয়েছে সর্বহারা শ্রেণীতে। এদের যারা কল্যাণকামী, শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে তাদের উপায় নেই একথা নজীর উপলব্ধি করেছিল মর্মে মর্মে। তার সাহিত্য রচনা, তার রাজনীতি চর্চা, তার পত্রিকা পরিচালন - সব কিছুর গোড়াই এই আদর্শ কার্যকরী হয়েছিল। আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য নজীর তার কর্মের পরিধিকে বাড়িয়ে ফেলেছিল নানা দিকে।

দুনিয়ায় বড়ো আদর্শের অভাব হয় না - অভাব হয় আদর্শের সত্যিকারের অনুভাবকের, একথা নজীরের জানা ছিল। এই অভাব দূর করবার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল বলেই দেখতে পাই তাকে কর্মজীবনের নানা ক্ষেত্রে রাজনীতি, সাহিত্য, জার্নালিজম, সেবা, কোনটাকেই সে বাদ দিতে পারে নি। আদর্শচ্যুত এম. এল. কে শায়েস্তা করতে গিয়ে সে ফেরার হচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে, হাতের পতাকা দেয়নি অবনমিত হতে। জনসেবা সঙ্ঘের সম্পাদক হয়ে সে সেবার কাজ চালিয়েছে। নাইট স্কুল করে গরিব দুঃখীর শুকনো বুকে দিয়েছে আশা - ম্লান মুখে জাগিয়েছে ভাষা। 'পাকিস্তান' কাগজে কর্মীর অভাব দেখে সারারাত জেগে সে প্রুফ সংশোধন করেছে। ফেণী কলেজ ধর্মঘটের সময় শাসকদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সে দাঁড়িয়েছে নির্যাতিত ছাত্রদের পাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশের পরে অন্য ছেলেরা যখন রাজা উজির মারছে তখন নজীর বেরিয়েছে গরিব দুঃখীর এক ঝাঁক ছেলে নিয়ে রমনার মাঠে - যদি এদের মনের উষর ভূমিতে দু'চারটি করে মনুষ্যত্বের বীজ বুনে দেওয়া সম্ভব হয়।

এককথায় বলা যায় পুঞ্জীভূত প্রাণহীনতার মাঝখানে নজীর জ্বলেছে অপূর্ব প্রাণবহ্নি নিয়ে। চারিদিকের ছন্দপতনের মধ্যে সে আত্মপ্রকাশ করেছে, নূতন সৃষ্টির ছন্দে। ক্ষুদ্র হলেও সাধনা তার পূর্ণাঙ্গ।

নজীরের জীবন যেমন নাটকীয় - মৃত্যুও তেমনি আকস্মিক। ঘাতকের ছুরির আঘাতে তার স্বল্প পরিসর জীবনের হয়েছে অবসান। কিন্তু বলতে পারি তার জীবন ব্যর্থ হয় নি, না ফুটতেই ঝরে পড়ে যে ফুল - মরুর বালুতে হারিয়ে যায় যে নদী, তা যেমন ব্যর্থ হয় না।

'ওয়াল্লাযিনা কুতেলু ফি সাবিলিল্লাহে ফালাইয়ুজেল্লু আ'মালাহুম' - আল্লাহর রাহে যার জীবন গেল তার কর্ম হতে পারে না অর্থবিহীন।"[৮৪]

নয়

"...চল্লিশের দশকে পুরাতন ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত নতুন ঢাকায় অর্থাৎ রমনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও অনুপ্রবেশ করে এবং দুটি দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ ও ত্রিশ দশকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করে। এ প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ হল সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের কৃতী ছাত্র আজীজ-উল-হক 'চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে সলিমুল্লাহ হল' প্রবন্ধে লিখেছেন :

'...১৯৪১ সাল থেকে সংঘটিত ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং যুদ্ধের ক্রম অবনতিশীল পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। দাঙ্গার শিকারদের মধ্যে ছিলেন সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র জনাব মোতাহার হোসেন। জগন্নাথ হল ও এখনকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী সদর রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনাব হোসেনের পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরও উত্তেজনা ও ভয় বিরাজ করতে থাকে। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ছাত্রীদের এক সভা উপলক্ষে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ স্টেজের সজ্জার একটি দিক নিয়ে আপত্তি তোলে। ফলে তুমুল লন্ডভন্ড ঘটে এবং অবশেষে সভায় অংশগ্রহণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর অব্যবহিত পরে কার্জন হলের ভেতরে-বাইরে এবং ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) ও জিমন্যাসিয়ামের ভেতরে-বাইরে অবস্থানকারী ছাত্রদের মধ্যে ইষ্টক বর্ষণ হয়। উভয় পক্ষের ছাত্ররাই কম-বেশি আহত হয়। ফলে কয়েকদিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ রাখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন হলের প্রভোস্টগণ একাধিকবার আলোচনায় বসেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যখন খুলল - ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সেই বিষাদময় দিনটিতে - সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র জনাব নাজির আহমদ ঘাতকের ছুরিতে মারাত্মকভাবে জখম হলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের দক্ষিণ গেটের কাছাকাছি এক স্থানে যে মারামারি চলছিল, জনাব আহমদ গিয়েছিলেন সেটা থামাতে। আর আঘাত হলো তারই দেহে। তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু তার অবস্থা দ্রুতাবনতির দিকে চলতে থাকে এবং শরীরে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কয়েকজন ছাত্র হাসপাতালে চলে যায় নিজেদের রক্ত দেয়ার জন্য। কিন্তু এরই মধ্যে খবর এসে গেলো নাজির শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যাই হোক, পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দাঙ্গা থেমে যায়। তবে ঘটনার গুরুত্ব তাতে কমলো না। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সবাইকে অল্প সময়ের মধ্যে হল ছেড়ে চলে যেতে হয়।'

শহীদ নাজির আহমদ সাপ্তাহিক পাকিস্তান পত্রিকা চালাতেন এবং মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার নির্মম হত্যাকান্ডে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার প্রভাব পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের সম্পর্কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছরের ইতিহাসে এমন নৃশংস ঘটনা আর ঘটেনি।"[৮৫]

দশ

"...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এস. এম. হলে দীর্ঘ বিশ বৎসর (১৯৪৬-১৯৬৬) সম্পৃক্ত থাকাকালে এই এসেম্বলী হলে অনেক সভা দেখেছি, সনগুলোর কথা বলা যাবেনা, মনেও নাই, কিন্তু এই প্রথম সভাটি আমার মনে দাগ কেটেছে দুই কারণে, ১ম এটি আমার বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল জীবনে প্রথম সভা; ২য়,

---

৮৪. হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী)/হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী। [বাঙলা একাডেমী - নভেম্বর, ১৯৭১। পৃ. ৩১২-৩১৫]
৮৫. রফিকুল ইসলাম/স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। [ঐতিহ্য - ফেব্রুয়ারি, ২০০৪। পৃ. ২১-২২]

সভার বিষয়বস্তু অর্থাৎ শহীদ নাজিরের স্মৃতিচারণ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। হলের একজন ছাত্র নাজির আহমদ শহীদ হয়েছিলেন ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে, পত্রিকায় সংবাদটি পড়েছিলাম। শহীদ নাজিরের স্মৃতির প্রতি নিবেদন করে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়, এই স্মরণিকার একটি কপি আমাদের হাতে আসে। এটি সম্পাদনা করেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (পরে ইংরেজীর অধ্যাপক এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস-চ্যান্সেলর), তিনি নিজে, সৈয়দ আলী আহসান এবং সৈয়দ আলী আশরাফ পৃথক পৃথক প্রবন্ধ লিখেন; কবি জসীম উদ্দীনের একটি দীর্ঘ কবিতাও স্মরণিকায় ছাপা হয়। প্রভোস্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হলের সিনিয়র ছাত্ররা বক্তৃতা করেন এবং কবি মোহাম্মদ কাসেম (প্রফেসর ডঃ আবদুল কাইয়ুমের পিতা) জসীম উদ্দীনের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। শহীদ নাজিরের স্মরণ সভা প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠিত হত, একবার কবি জসীম উদ্দীন নিজেই কবিতাটি আবৃত্তি করেন এবং আর একবার ডঃ আবদুল কাইয়ুম ইহা আবৃত্তি করেন। স্মরণ সভা বেশ কয়েক বৎসর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, পরে অনিয়মিত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত স্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যায়।

স্মরণিকা এবং সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে জানতে পারি কার্জন হলে (১৯৪৩ সালে) ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ হয়, হিন্দু ছেলেরা সভামঞ্চে মঙ্গল ঘট দেওয়ার চেষ্টা করাতে মুসলিম ছাত্ররা বাধা দেয়, তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিলে সভা বন্ধ করে দেওয়া হয়, পরে শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে বিরোধ মিটে যায়, কিন্তু এক পর্যায়ে লাইব্রেরীর প্রবেশ মুখে নাজিরকে একা পেয়ে কোন এক হিন্দু ছাত্র তাকে ছুরিকাঘাত করে, প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে নাজির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখনো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালেই চিকিৎসা হত। স্মরণিকা এবং বক্তব্যে আরো প্রকাশ পায় যে, সমঝোতা হওয়ার পরে নাজির নিঃসঙ্কোচে লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে যায়, হিন্দু ছেলেটি বিশ্বাসঘাতকতা করে তার উপর হামলা করে। নাজির আহমদের বাড়ি ছিল নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুর অঞ্চলে। সেই থেকে নাজির দিবস পালিত হত। স্মরণীয় যে তখন রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত, পাকিস্তান দাবীর পিছনে মুসলিম জনমত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে, অন্যদিকে হিন্দুরা কংগ্রেসের পতাকা তলে অখন্ড ভারতের দাবী নিয়ে আন্দোলনে লিপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ রাজনীতিতে পরিবর্তনের ফলে ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশার সঞ্চার হয়। ফলে কংগ্রেস এবং লীগ তথা ভারতীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়, এরই প্রেক্ষিতে শহীদ নাজিরের স্মৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করে।"[৮৯]

এগারো

"...আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই সে সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দাঙ্গা হয়। সেদিনকার দাঙ্গার কারণটা ছিল এ রকম। কার্জন হলে হিন্দু ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছিল। সব ছেলেমেয়েরাই গেছে সেখানে, হিন্দু ছাত্ররা যেমন গেছে, মুসলমান ছাত্ররাও গেছে। বোধহয় মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কেউ ইয়ার্কি করার জন্যে কিছু ফুল বা পাতা বা এ রকমের কিছু দোতলার ব্যলকনি থেকে হিন্দু মেয়েদের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। এই এরিয়াটা ছিল হিন্দু ছেলেদের। পাশেই ঢাকা হল। হিন্দু ছেলেরা এতে অফেন্স নেয় এবং মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধর করে। পরদিন যখন ক্লাস শুরু হয়, তখন মুসলমান ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। সেই সময় একটা মারামারি হয়। মারামারির মধ্যে নাজির আহমদ নামে এক ছাত্র ছুরিকাহত হয়। নাজির আহমদের নামে একটি লাইব্রেরি আছে কোথাও। তখন মিটফোর্ড ছিল একমাত্র হাসপাতাল। নাজির আহমদকে মিটফোর্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাকে আর বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ...নতুন ছাত্র থাকা অবস্থায়ই একটা অনুষ্ঠানকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতে সাম্প্রদায়িকতার খানিক মহড়া হয়। ঘটনাটা শুরু হয়েছিলো ঢাকা হলের বসন্ত উৎসব

---

৮৯. ড. আবদুল করিম/সমাজ ও জীবন। [হাসি প্রকাশনী - জুলাই, ২০০৬। পৃ. ১৪৪-১৪৫]

বা এ জাতীয় কোন একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। কার্জন হলের অডিটোরিয়ামে মেয়েরা উৎসব উপলক্ষে নাচ-গান করার সময় উপর তলার ফজলুল হক বা সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্র হয়তো খানিকটা বখামী করেছিলো। এবং ঢাকা হলের হিন্দু ছাত্ররা অপমানিত বোধ করে মুসলিম ছাত্রদের মারধোর করে। পরদিন ফজলুল হক হলের মুসলিম ছাত্ররা ক্লাশ চলাকালে হিন্দু ছাত্রদের আক্রমণ করে। দুই পক্ষের সংঘাতের সময় নাজির আহমেদ নামে একজন ছাত্র ছুরিকাহত হয়ে পরে মারা যায়। সে সময় কোন কোন হিন্দু ছাত্রের ছুরি চালানো সম্পর্কে কুখ্যাতি ছিলো।"[৮৭]

বারো

"...পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার কতো জানা-অজানা তরুণ যে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল তাদের কয়জনের খবরই বা আমরা রাখি। যাদের নাম একদিন সারাদেশে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো, তাদের অনেকেই এখন বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া এমনি একটি নাম শহীদ নজীর আহমদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা নজীর আহমদের জন্ম নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমায়। নজীর আহমদ ছিলেন মেধাবী একজন ছাত্র, প্রচারবিমুখ একজন আত্মনিবেদিত সংস্কৃতিকর্মী। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট নজীর আহমদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'পাকিস্তান' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকায় পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট সুধীজনদের রচনাদি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। নজীর আহমদ একজন অমায়িক-আদর্শবাদী তরুণ হিসেবে হিন্দু-মুসলমান সকল মহলেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। নিজে কখনও পদ বা স্বার্থের পেছনে ছুটতেন না বলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম ছাত্রসমাজের অঘোষিত নেতা ছিলেন।

১৯৪৩ সালের প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে আপত্তিকর একটি আইটেম সংযোজনের জন্য হিন্দু ছাত্রদের জিদকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহলে নজীর আহমদ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বলে তিনি এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সুরাহা করতে পারবেন - এই ভরসায় হিন্দু ছাত্রদের সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু বুকভরা যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি হিন্দু ছাত্রদের সাথে কথা বলতে যান, তারা সে বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারেনি। শান্তিকামী নজীরকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে হিন্দু ছাত্ররা তার পিঠে ছুরিকাঘাত করে বসে। আঘাত সুপরিকল্পিত ও কঠিন ছিল বিধায় ডাক্তাররা শত চেষ্টা করেও নজীরকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ক্যাম্পাস প্রথম রক্তাক্ত হয় শহীদ নজীরের রক্তে। নজীর আহমদ শাহাদাৎ বরণ করেন ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। শহীদ নজীর ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে কত জনপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তার মৃত্যুতে প্রকাশিত দুটি স্মরণিকায়। এতে যাদের কবিতা ও অন্যান্য রচনাদি প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন কবি জসীমউদ্দীন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী নাজমুল হক এবং আরও অনেকে।

১৯৪৪ সাল থেকে বহুদিন পর্যন্ত প্রতিবছর দোসরা ফেব্রুয়ারি ভাব-গম্ভীর পরিবেশে 'শহীদ নজীর দিবস' প্রতিপালিত হতো। ঢাকা শহরের নাজিরাবাজার এলাকায় শহীদ নজীইরের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি উন্নতমানের পাঠাগার, যার নাম ছিল 'শহীদ নজীর লাইব্রেরী'। ১৯৪৫ সালে আমি যখন ঢাকায় আসি, তখন ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর পরই পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রাণকেন্দ্র ছিল নাজিরাবাজারে অবস্থিত এই শহীদ নজীর লাইব্রেরী।"[৮৮]

---

৮৭. সরদার ফজলুল করিম/আমি সরদার বলছি। [অন্বেষা - ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ৩৮/২৫১]

৮৮. আবদুল গফুর/আমার কালের কথা। [বিসিবিএস - ফেব্রুয়ারি, ২০০০। পৃ. ১৫৬-১৫৭]

তেরো

"...সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স থেকে ফিরে এসেই শহীদ নজীর একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করার প্রস্তাব ফজলুর রহমান সাহেবের নিকট উল্লেখ করেন - ফজলুর রহমান সাহেবের সম্মতি লাভ করে অবাঙ্গালী রফিক সাহেব ও এ. কে. ফজলুল হক (মাওলা মিঞার) আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে 'পাকিস্তান' কাগজটি বের করে। প্রথমেই সাপ্তাহিক কাগজ বের না করে দুই সপ্তাহ পরে পরে কাগজখানা বেরুতে থাকে। লেখা জোগাড় করা, প্রেসে বসে প্রুফ দেখা, তারপর গ্রাহক সৃষ্টি করা, কাগজের যোগাড়, পোষ্ট করা - বেশির ভাগ কাজই নজীরের একাই করতে হয়েছে। অনেকদিন গভীর রাতে দরজার খট খট আওয়াজ, প্রায়ই খুলে দেখতাম নজীর - আমার স্ত্রীকে বলত খাওয়া হয়নি। আমাদের খাওয়া শেষ - একদিন তো বাসিভাত খেয়েই খুশী - তার জন্যে আর শামসুল হকের জন্যে ঘরে কিছু না কিছু খাবার রাখতে হত - তাদের আসার কোন স্থিরতা ছিল না - হঠাৎ কখন হুট করে আসবে বলা যেত না।

...১৯৪১ সন থেকেই ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। মাঝে মাঝে শান্তি ফিরে আসলেও একটা থম থম ভাব সর্বসময় বিরাজ করছিল। ১৯৪২ সনে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। ১৯৪২ সনের শেষের দিকে গুপ্তহত্যা ও স্থানে স্থানে দাঙ্গা সংগঠিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দেয়। মেয়েদের হোস্টেলে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মুসলমান মেয়েদের প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাদের হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয় হিন্দু মেয়েরা। কারণ মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ১৯৪৩ সনের জানুয়ারি মাসে মাঝে মাঝে হকি স্টিক নিয়ে দলবদ্ধভাবে মারামারি চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে একটা সমঝোতার চেষ্টা চালান শহীদ নজীর ও অন্যান্য ছাত্রনেতারা কিন্তু পরের দিন আবার ঘোর উত্তেজনা দেখা দিল। শহীদ নজীর আবার তাদের মধ্যে শান্তি আনয়নের জন্য হিন্দু ছাত্রনেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য গেলে একজন হিন্দু ছাত্র অতর্কিতে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। নজীর সেখানেই পড়ে যায় এবং হাসপাতালে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সনে তার মৃত্যু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।"[৮৯]

চৌদ্দ

"...কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের সাথে দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক বৈরিতার পটভূমিতে ঢাকা ও কলকাতার মুসলিম সাংস্কৃতিক কর্মীগণ তখন গঠন করেছিলেন বিভিন্ন সমিতি ও সোসাইটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় ছিল পূর্ব বাংলার মুসলিম নব জাগরণের সূতিকাগার। পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে 'পাকিস্তান' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নযীর আহমদ ছিলেন এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয়।

এ সময় কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পাকিস্তান আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ এ সময় নানা চক্রান্ত করেন। ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারী কার্জন হলে একটি অনুষ্ঠানে মেজরিটি হিন্দু ছাত্ররা হকিস্টিক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র মুসলমান ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনার জের ধরে সংঘর্ষ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টাকালে মুসলিম ছাত্রনেতা নযীর আহমদকে হিন্দু ছাত্ররা পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। শহীদ নযীর তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের প্রেরণা ও আদর্শ ছিলেন। নযীর আহমদ

৮৯. কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ। [ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন - ২০০৬। পৃ. ১৩৩। ১৩৮]

শহীদ হবার দুই বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মোতাহার নামে আরও একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে একা পেয়ে হত্যা করা হয়।"[৯০]

সাম্প্রদায়িকতা : বিপ্লবে

এক

"...বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল একটি গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের আগেই তাদের দল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে বাঙলা দেশেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। বাঙলার শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের ভিতরেই ছিল তার উর্বর ক্ষেত্র। বাঙলার বাহিরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু বাঙলার মতো দীর্ঘস্থায়ী তা কোথাও হয়নি।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনের যে অবস্থা ছিল, আর যে-রোমাঞ্চ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছিল তাতে আমার পক্ষে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান। তাতে আছে–

বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী ইত্যাদি।

একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম ছেলে কি করে এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনোদিন বুঝতে পারেননি। বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বারীন্দ্রকুমার ঘোষও আন্দামান হতে ফেরার পরে এই কথাই লিখেছিলেন। তাঁর সেই পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। উনিশ শ' বিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। তবুও আমি ১৯২৩-২৪ সালে তাদের একজন বড়ো নেতাকে দেখেছি, যে বিকালে তিনি জেলে এলেন তার পরের সকালেই জেল অফিসে একটি সম্ভ্রমকর্ষক কালীর ছবির জন্য (an imposing picture of Goddess Kali) অর্ডার পাঠালেন। উনিশ শ ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাদের ভিতর হতে বহু সংখ্যক লোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।"[৯১]

দুই

"...বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন বাংলা দেশে বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ১৮৮৫ থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল যাদের উপরে, তঁরা ছিলেন মোটের উপরে নরমপন্থী এবং ইংরেজের শুভবুদ্ধিতে আস্থাবান। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা তাঁদের নেতৃত্বকে শিথিল করে দিল। বিশ শতকের শুরুতে চাকরির অভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্নসমস্যা প্রবল হয়ে ওঠায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই বিক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের প্রবল ঘৃণার ভাব। 'আবেদন-নিবেদনের থালা' বহন করে উদারনৈতিক রাজনীতিবিদরা বিশেষ কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। শিক্ষিত হিন্দুর মনে

---

[৯০]. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান/বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শতবছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। [কথামেলা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। পৃ. ২৫৮]

[৯১]. মুজফফর আহমদ/আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (১৯২০-১৯২৯)। [খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭]

আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছিল বিবেকানন্দের বক্তৃতায়, সিষ্টার নিবেদিতার ভক্তিতে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি থিওসফিস্টদের শ্রদ্ধানিবেদন প্রভৃতিতে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ ইওরোপীয় সামরিক শক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সশ্রদ্ধ ভীতি খর্ব করে দিয়েছিল। চীনে ইওরোপীয় পণ্যবর্জন-আন্দোলনের সার্থকতায় নতুন প্রেরণা এসেছিল শিক্ষিত বাঙালীর মনে। অতএব, এটা স্বাভাবিক যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সেদিন সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধের মনোভাবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। চীনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়েই ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী এবং বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আন্দোলন সর্বত্র শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে নি। তাই নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠল। পরের বছর সুরাট কংগ্রেস এই দু দলে ভাগ হয়ে গেল। এই আন্দোলনের মুখে সরকার নিলেন দমননীতির আশ্রয়। আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে নির্বাসিত করে এবং শক্তি প্রয়োগ করে সরকার ভীতির সৃষ্টি করতে চাইলেন; বিস্ফোরক আইন, সংবাদপত্র আইন, প্রেস আইন, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সভাসমিতি সংক্রান্ত আইন জারী করে অসন্তোষ দমন করতে চেষ্টা করলেন। তার ফলে, প্রকাশ্য পথ ছেড়ে আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকলে গুপ্ত পথে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী হিন্দুর মনে যে দেশাত্মবোধ জাগল, তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব। মুসলিম-মানসের কাছে তা গ্রাহ্য হবার কথা নয়, হয়ও নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের অবদান স্বীকার করেও একথা বলতে হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের নৈকট্য বিধান না করে তারা দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সাধারণতঃ তারা মুসলমানদেরকে ইংরেজের পোষ্য জ্ঞান করতেন। এ বিষয়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ মূল্যবান সাক্ষ্য দিয়েছেন :

'...In those days (1905-06) the revolutionary groups were recruited exclusively from the Hindu middle classes. In fact all revolutionary groups were then anti-Muslim. They saw that the British Government was using the Muslims against India's political struggle and the Muslims were playing the Government's game. ...They [the Government] imported a number of Muslim officers from the United Provinces for the Intelligence Branch of the police. The result was that the Hindus of Bengal began to feel that the Muslims as Such were against political freedom and against the Hindu Community.'

অতএব, মুসলমানের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষের মনোভাব যে এই সময়ের বাঙালী হিন্দুর মধ্যে আশ্রয়লাভ করল, এতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

ঠিক এই আবহাওয়ার মধ্যেই মুসলমানের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবরে সিমলায় ভাইসরয় লড মিন্টোর সঙ্গে উচ্চবিত্ত ভারতীয় মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য আগা খাঁ ছিলেন দলের নেতা। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপরে এরা খুব জোর দেন। ঐ বছরের ডিসেম্বরে এদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষা-সম্মেলন। সম্মেলনের শেষেই জন্ম হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের।"[৯২]

তিন

"...বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় দু'শ বছর পর কালীভক্ত একদল ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবক সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত দল, যেমন অনুশীলন দল ও যুগান্তর দল গঠন করে নানাভাবে ইংরেজ বিদ্বেষকে জাগিয়ে তোলে। শুরু হয় ইংরেজ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রশাসকের ওপর বেপরোয়া হামলা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য হামলা হয়। যদিও এসব বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহকে অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা হিসেবে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনকারীরা প্রচার করে। কিন্তু আজ মনে হয় ওসব ছিলো রোমান্টিক ধরনের অপরিণামদর্শী

---

৯২. আনিসুজ্জামান/মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)। [লেখক সংঘ প্রকাশনী - অক্টোবর, ১৯৬৪। পৃ. ১০১-১০২]

কিছু বালকের কাজ মাত্র। ক্ষুদিরাম তো একজন কিশোর মাত্র ছিলেন। যিনি ইংরেজ বড়লাটকে মারতে গিয়ে কিছু নিরীহ লোককে হতাহত করে ইংরেজের আদালতে ফাঁসির সাজা পেলেন। সবই ছিল বালসুলভ বিপ্লবী ঘটনা। যে বিপ্লব হিন্দু ধর্মীয় উন্মাদনার সাথে জড়িত এবং অতিশয় ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের নেতৃত্বে সংঘটিত। তবুও এ কথা আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বাঙালি হিন্দু পুনরুজ্জীববাদীদের মন্ত্র নিয়েই বৃটিশ শাসনের ওপর প্রথম আঘাত হানা হয়। আর ঐ কৃতিত্ব একান্তভাবেই বাঙালি হিন্দুদের। যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য ধর্ম সংস্কারবাদী হিন্দু যাদের ফেরকাকে বলা হয় ব্রাহ্মধর্ম তারা এই সন্ত্রাসবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর মুসলমান বাঙালিরা এতে অংশগ্রহণ করেনি কিংবা অংশ নিতে দেওয়া হয়নি, তারা কালী পূজায় ঘোর অবিশ্বাসী বলে। শুধু অবিশ্বাসীই নয়। ঐ বীভৎস উলঙ্গ চামুন্ডাধারিণী নারী মূর্তিটিকে নিয়ে বাঙ্গালি মুসলমান তরুণরা আবাল্য বিদ্রুপ করতেই অভ্যস্ত। অথচ ঐ ভয়ংকর মূর্তি হিন্দু যুবকদের কাছে মহাশক্তিশালিনী মাতৃকা দেবী হিসেবে পূজিত। এ কারণে প্রথম যুগের স্বদেশী সন্ত্রাসী আন্দোলনের বাঙালি মুসলমানের কোন অংশ নেই।"[৯৩]

চার

"...এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল হ্যারিসন দালানের ওদিকে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ভয়ে সকলের বাড়ির দরজা জানালা ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল।

কার্ফু জারি হলো, একসঙ্গে তিন মাথার বেশি পথে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ হলো।

একদিন বিকেলের দিকে সামনের সিঁড়িতে বসে আছি, আমাদের কাঠের ছোটো গেটটা শব্দ করে ভীষণ জোরে খুলে গেল। দেখতে পেলাম বাইরে থেকে এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ একটি যুবককে এতো জোরে একটা লাথি মারলে যে ধাক্কা খেয়ে ছেলেটি কাঠের গেটটা খুলে ছিটকে এসে আমাদের সামনের যে জমিটুকুতে আমরা বাগান করেছিলাম তার মধ্যে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে।

আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, দৌড়ে কাছে এলাম, বেদনাবিদ্ধ গলায় বললাম, 'ইশশ। কী অসভ্য। আসুন, ঘরে আসুন।' ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একবার তাকালো, তারপর গা ঝেড়ে বলল, পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে, আমাকে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট থেকে তাড়া করে এসেছে এই শয়তান, আমি এখানে ঢুকেই আত্মরক্ষা করবো ভেবেছিলাম, তার আগেই ধরে ফেললো — আপনি ঘরে যান, বাইরে বসবেন না, এই জন্তুদের বিশ্বাস নেই। রাস্তারমোড়ে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, পুলিশের গাড়ি দেখে যে-যেখানে পারে ঢুকে পড়েছে, আমিই শুধু পারিনি।' চলে যেতে যেতে বলল, 'অপমান ভুলবেন না। আজকের প্রতিশোধ আমি নিজেই নেব।'

আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার ধারণা, এই ছেলেটির নাম বিনয়।

তারপরের দিনই আবার এক সাংঘাতিক ভয়াবহ সংবাদে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল সারা পাড়া। বেলা ন'টা দশটার সময় পুলিশ এসে আমাদের এবং আশেপাশের সব বাড়ি সার্চ করে যা হাতের কাছে পেলো সব নিয়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্য একটুকরো কাঠও রাখলে না। পুলিশের ধমকধামক হুমকিতে ম্রিয়মান আমরা যখন দিশেহারা হয়ে জটলা করছিলাম, এই সময়ে একটি ছেলে ঢুকে এলো আমাদের বাড়ির ভিতর। বলল, 'শুনুন, আজ রাত্রিবেলা উয়ারি পাড়া আক্রমণ হবে। সব সাবধান।'

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, 'সেজন্যই পাটের আপিসের সাহেবগুলো এসে বাড়ির লাঠিসোটা যা যেখানে পেল সার্চের নাম করে সব নিয়ে গেল। কিন্তু দীনেশ, এখন কীভাবে আমরা সাবধান হবো বা আত্মরক্ষা করবো সেটা বলে দাও।'

---

৯৩. আল মাহমুদ/শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। [আদর্শ - মে, ২০১৫। পৃ. ৭৩-৭৪]

এই দীনেশ সেই দীনেশ, এবং ঐ বিনয়ও সেই বিনয়, যাদের নামে বি-বা-দী বাগ নাম মরতে দেয়নি।

দিনের পর দিন যখন বাজার বন্ধ থাকার দরুন সকলের কিছু না খেয়ে মরবার অবস্থা, এরাই কোথা থেকে চিড়ে মুড়ি গুড় দই এনে, কখনোসখনো চালও এনে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

দীনেশ বলল, 'সারা বাড়িতে ইটপাটকেল যে-যেখানে যা পান সব নিয়ে জড়ো করুন ছাদে, ঐ তো ওখানেই কতো ইট–' বলে আমাদের ছোট্ট বাগানটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। গেট থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত কোনা করে করে দুপাশে ইটের ঘেরাও দিয়ে, মাঝখানে লাল সুরকির যে রাস্তাটা করেছিলাম সেই ইটগুলো দেখালো সে। পাশের জায়গায় রঙিন ফুলের বেড করেছিলাম ঐ রকমই ইটের ঘেরাও দিয়ে, সেগুলোও দেখালো। কতো কষ্ট করে বাগান সাজিয়েছি, তার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি প্রায় ক্রন্দনমুখী হয়ে বললাম, 'এসব তুলতে অনেক সময় লাগবে, তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না?'

'কী?' সকলেরই উচ্চকিত দৃষ্টি।

'সবার বাড়ির সব কয়লাগুলো ছাদে নিয়ে গেলে হয় না? আছাড় দিয়ে দিয়ে ভেঙে টুকরো করে নেবো। অনেক ঢিল হবে।'

দীনেশ বলল, 'এটা ভালো বলেছেন। তা হলে তাই করবেন। সবাই।' আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ঢুকে পড়লে বাগানটা কি থাকবে? থাকবে না।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না না বাগানের জন্য নয়, বাগানের জন্য নয়। ইট তুলতে অনেক সময় তো লাগবে। তা ছাড়া, সকলের বাড়িতে তো ইট নেই। কিন্তু কয়লা কয়েক মণ করে সকলের বাড়িতেই আছে–

দীনেশ বলল, 'দেখতে পেলেই শিলাবৃষ্টির মতো ঐ সব কয়লার টুকরো ছুড়ে মারবেন। আরো শুনুন, একটা করে উনুনও জ্বালিয়ে রাখবেন, জল বসিয়ে ফোটাবেন। ইটপাটকেল উপেক্ষা করেও যদি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে গরম জল ঢেলে দেবেন। পুরোনো কাপড়ে কেরোসিন মাখিয়ে রাখবেন, আগুন জ্বালিয়ে ছুড়ে দেবেন। মনে থাকে যেন। ভয় পেলে বাঁচবেন না।' বাঁচবো কি বাঁচবো না সেটা পরের কথা, ভয় আমরা সকলেই পেলাম। যে রাস্তা দিয়ে এসে তারা আক্রমণ করবে সে রাস্তাটা আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে। আসলে ওটা যে একটা রাস্তা আমরা জানতামই না সেটা। জানতাম একটা পতিত জমি, সব বাড়ির ময়লা সেখানে স্তূপীকৃত হয়, জমাদারদের ময়লা-ফেলা ঠেলা গাড়ি জমা থাকে সেখানে। ওখান দিয়ে যে মৈশন্ডী যাবার মতো ফাঁদ আছে সেটা সেদিনই প্রথম জানলাম।

দীনেশ লুঙ্গি পরে, গোলাপি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, কাজ-করা সাদা টুপি মাথায় দিয়ে পান জর্দা খেয়ে, চোখে সুর্মা টেনে ঢুকে পড়েছিল ওদের নবাব বাড়ির মিটিংয়ে, অত লোকের মধ্যে কেউ ধরতে পারেনি। শুধু এক বুড়া মিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুই কে রে?'

দীনেশ একগাল হেসে বলেছিল, 'আমি তোমাগো করিম চাচার লাতি গো। চাচা তো আইবার পারলো না, আমারেই পেঠিয়ে দিল।'

'ও তুই করিম চাচার লাতি, তাই বল।'

করিম চাচা একজন অতি বৃদ্ধ পরামর্শদাতা। দীনেশ সব খবর নিয়েই ঢুকেছে। করিম চাচার নাতি আছে তেরোজন, তাদেরই একজন সেজে গেছে সে। করিম চাচা যায়নি। সে খবরও নিয়ে গেছে। মিটিংয়ে স্থির হয়েছে কখন কোন সময়ে মৈশন্ডী থেকে ঐ নোংরা ফেলা সরু জায়গা দিয়ে এক এক করে ঢুকে পড়বে সবাই। খবরটা জেনেই দীনেশ হন্তদন্ত হয়ে সকলকে সংবাদটা দিতে ছুটে এসেছে। দলের নেতা সে, কীভাবে এই যুদ্ধের মোকাবিলা করবে তারও বন্দোবস্ত করে এসেছে।

বলল, 'ভয় নেই, একটু সজাগ থাকবেন আর যা বললাম তাই করবেন। আমি বিকেল পাঁচটা নাগ আবার আসবো।'

তাই এলো। একা দীনেশ এলো না, আস্তে আস্তে এই ফাঁকে সেই ফাঁকে, এই রাস্তা সেই রাস্তা করে প্র জনা দশ-পনেরো ছেলে এসে জুটলো ঘরে। এসেই এর-ওর বাড়িতে বন্টন হয়ে গেল। দীনেশ তার চ সাগরেদ নিয়ে আমাদের বাড়িতে রইলো। দেখলাম সঙ্গে ওদের প্রত্যেকেরই একটা করে চারখানার গামছ বাঁধা আছে কোমরে।

মাথা রক্ষা করবার জন্য পুরোনো শাড়ি চাইলো আমাদের কাছে। সেই পুরোনো শাড়ি দিয়ে মস্ত মো পাগড়ি বাঁধলো মাথায়। আমি হতবাক হয়ে ওদের কার্যকলাপ দেখছিলাম। দীনেশ হেসে বললো, 'এ যে কোমরে গামছা বাঁধা দেখছেন এটাই আমাদের অস্ত্র। আমরা সব মিলিয়ে সতেরোজন ছেলে যাচ্ছি সতেরোশো লোক ঠেকাতে। এই অস্ত্র দিয়েই ঠেকাবো। পারবো না?'

এই বলে নিজের কোমরের গামছোটা খুলে দেখালো। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম গামছাটার দুই মাথ দুটি ঢালাই করা পিতলের বল। সাইজটা ছোটো টেনিস বলের মতো।

'এই আপনাদের অস্ত্র? আমার ভয়ার্ত মুখ থেকে প্রশ্নটা স্খলিত হলো। দীনেশ বলল, 'এই অস্ত্র দিয়েই কী করি দেখুন না। তার আগে এক কাপ করে চা দিন আমাদের।'

মা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন চা করতে, সঙ্গে খাবারও আনলেন। খুব পরিতৃপ্তি করে খেলো ওরা। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই সব বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে বলল, 'আবার বলছি, খুব সাবধানে থাকবেন, সজাগ থাকবেন, ছাদে যথেষ্ট ঢিল যেন থাকে, যেন পুরোনো কাপড়ে কেরোসিন মাখা থাকে, উনুন সারা রাত জ্বালিয়ে রাখবেন, বড়ো পাত্রে জল বসিয়ে ফুটন্ত করে রাখবেন। যা মনে হয়, এবার ওর সংখ্যায় খুব বেশি লোক আসবে, পাঁচ ছশো লোক তো নিশ্চয়ই ঢুকে পড়বে পাড়ায়। এখনই সবাই খেয়ে নিন, সামনের দরজা ভালো করে বন্ধ করে দিন।'

ভয়ে ভয়ে তখুনি সবাই খেয়ে নিয়ে সব ঘরের সব দরজা সব জানালা আটকে দিয়ে দোতলার ঘরে গিয়ে বসলাম। দোতলায় মাত্র একটাই ঘর ছিল, আমার ছোটো কাকু অসুস্থ বলে দিদা-দাদু চলে এসেছেন দেশ থেকে। তাঁরা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের সাহস দিচ্ছিলাম। জানি না কেন আমার মনে যথেষ্ট বল ছিল। দীনেশের কথামতো সব কয়লা টুকরো করে বস্তা ভরে গৃহভৃত্য কেশবকে দিয়ে আমিই উপরে তুলিয়ে আনলাম। উনুন জ্বালালাম, বিশাল হাঁড়িতে জল বসিয়ে দিলাম।

হাতে হাতে বাবা-মাও সাহায্য করছিলেন বটে। কিন্তু আমার মা নার্ভাস হয়ে কেবলি বাথরুমে যাচ্ছিলেন। আর কেশব এতো কাঁপছিল যে তাকে দিয়ে উনুন ধরানো এক ব্যাপার। বাবা আর আমিই শক্ত ছিলাম।

তারপরে শুধু প্রতীক্ষা। কী ভয়াবহ প্রতীক্ষা। বিপদ কখন আসবে সেই প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন। সে যে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণা তা শুধু তারাই জানে যারা তেমন বিপদের মোকাবিলা করেছে। একটা শব্দ হলেই হাঁউমাঁউ করে উঠছে সবাই। কেশব খাটের তলায় ঢুকে যাচ্ছে। আমি আর বাবা ছাদের দরজা ফাঁক করে দেখছি জল ঠিকমতো ফুটছে কিনা। প্রতিটি সেকেন্ড গুনে গুনে রাত কাটছে। সময় থমকে থেমে আছে স্থবিরের মতো। কেউ ঘুমুচ্ছি না, সবাই জেগে বসে আছি কখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করবো সেই আশঙ্কায়।

আস্তে আস্তে দুর্যোগের রাত্রি ভোরের আলোর সঙ্গে মিলিত হলো, আমরাও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। অন্তত এক রাতের জন্য তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল? ছাদের উপর তপ্ত উনুনে তখনো জল ফুটছে, বাবা বললেন, 'এবার খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসো কেশব, আর ভয় নেই। জল তো ফুটছেই চা করো, আমি আসছি।'

আসলে বাবা দেখতে যাচ্ছিলেন সেই যোদ্ধা ছেলেরা কোথায়। সত্যি সত্যি তারাই আমাদের রক্ষা করেছে না কি আক্রমণই হয়নি। একা বাবাই নয়, সব বাড়ির সব পুরুষরাই তখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। যোদ্ধারা ততক্ষণে সরে গেছে সেখান থেকে।

বেলা এগারোটা নাগাদ দীনেশ একবার এলো মাথায় বাঁধা পুরোনো শাড়িগুলো ফেরত দিতে। আমি দরজা খুলে দিতে বলল, 'দাঁড়াবো না, পিছনে হুলিয়া লেগেছে, এগুলো নিন।'

বললাম, 'ভিতরে আসুন, আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

ভিতরে এসে হেসে বলল, 'আমাকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। আমি খুব বিপজ্জনক ব্যক্তি, যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়তে পারে।'

'আসুক। কাল তা হলে ওরা আক্রমণ করলো না?'

'করলো না মানে? সারা রাত তা হলে ঐ নরকে বসে থাকলাম কেন?'

নরকই বটে। রাজ্যের নোংরা ময়লা মানুষ এবং জন্তুর বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ সে স্থল। যে কাণ্ড করে মাত্র দশটি ছেলে প্রায় সাত-আটশো আক্রমণকারীদের ঠেকিয়েছে সেটা একটা অবাস্তব ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। জঞ্জাল বিধ্বস্ত জায়গায় সতেরোটি ছেলের বসবার মতো স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সাতটি ছেলে চলে গিয়েছিল। মৈশন্ডী থেকে ঢুকে পড়বার জায়গাটাও খুবই সরু ছিল, অতি কষ্টে একজন একজন করে ঢুকতে পারে। এরা সব পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের আলোয় অগুনতি মানুষের ভিড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। দীনেশ সামনে রইলো, যে ঢুকবে দীনেশই প্রথমে তাকে ঐ কোমরের গামছা খুলে শক্ত পেতলের ভারি বল দিয়ে মাথায় আঘাত করবে। যদি ফসকে যায় তবে তার পরে দাঁড়ানো ছেলেটি আঘাত করবে। আবার আর একজন ঢুকলেও সেই একই প্রসেস। এক দীনেশের আঘাতেই সব পালিয়ে গেল। একজন একজন করে প্রায় সাত-আটজন ঢুকেছিল। সাত-আটজনের মস্তিষ্কই দু ফাঁক করে দিতে পেরেছে একা দীনেশ।

এরপরে ঠিক দুদিন বাদেই ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব গুলিবিদ্ধ হলেন। যদি স্মৃতি-বিভ্রম না ঘটে তবে তার নাম সম্ভবত হাডসন ছিল। সেই বিনয়ই গুলি করেছিল তাকে। লাথি মেরে বিজয়ী হয়ে গাড়ি হাকিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাবার প্রতিশোধ এভাবেই নিয়েছিল বিনয়। পর পরই আরো একজন গুলিবিদ্ধ হলেন, তিনি গোয়েন্দা বিভাগের কোনো বঙ্গ সন্তান। বিনয় বাদল দীনেশ রাতারাতি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, ইংরেজ প্রভুরা সারা শহর সারা দেশ তোলপাড় করেও তাদের হদিস পেলো না। পেলো না তো পেলোই না। অনেক পরে ধরা পড়লো কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। চন্দননগরে গিয়ে ফরাসী দেশে গা ঢাকা দিয়েছিল এতোদিন।"[৯৪]

পাঁচ

"...ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী ধরনধারণ আর প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলেছে। সবচেয়ে বেশি অশান্তি মাথা চাড়া দিল বাংলায়; কেননা এই প্রদেশের ওপর লর্ড কার্জন বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি ছিল ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর অঞ্চল। বাংলার হিন্দুরা ভারতের রাজনৈতিক জাগৃতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর ফলে হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এতে বাংলার হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে।

---

৯৪. প্রতিভা বসু/জীবনের জলছবি। [আনন্দ পাবলিশার্স - বৈশাখ, ১৪০০। পৃ. ৭১-৭৪]

বাংলা এ ব্যবস্থা মুখ বুজে মেনে নেয়নি। বরং এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক আর বিপ্লবী উদ্দীপনায় ফেটে পড়েছে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে চলে এসে কলকাতায় তার কাজের ঘাঁটি গাড়লেন। তার পত্রিকা 'কর্মযোগী' হয়ে উঠল জাতীয় জাগৃতি আর বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক।

এই সময়ে আমি তখনকার একজন বাঘা বিপ্লবী কর্মী শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসি। তাঁর মারফত অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে আমি বার দুই দেখেছি মনে আছে। ফলে আমি বিপ্লবী রাজনীতির দিকে ঝুকি এবং ছোটো ছোটো উপদলের একটিতে ঢুকে পড়ি।

সে সময় বিপ্লবী দলগুলোতে শুধু হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদেরই নেওয়া হত। সত্যি বলতে কি, বিপ্লবী দলগুলো তখন ছিল কায়মনোবাক্যে মুসলিম বিরোধী। তারা দেখতে পেত যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাজে লাগাচ্ছে এবং তারা সরকারের হাতে পুতুল হয়ে খেলছে। পূর্ববঙ্গ ততদিনে ভিন্ন প্রদেশ; সে সময়ের জঙ্গীলাট ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যেই বললেন যে, ব্রিটিশদের চোখে মুসলিম সম্প্রদায় হল তার সুয়োরানী। বিপ্লবীরা মনে করত, ভারতের মুক্তি সাধনায় মুসলিমরা হল পথের কাঁটা; বাধাস্বরূপ বলেই পথের সেই কাঁটা সরাতে হবে।

বিপ্লবীরা যে মুসলিমদের দেখতে পারত না, তার আরও একটি কারণ ছিল।

সরকার এটা মনে মনে জানত যে, বাংলার হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ এত বেশি যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে ঢিট করার ব্যাপারে কোনো হিন্দু কর্মচারীকেই ষোল আনা বিশ্বাস করা যায় না। সরকার তাই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোকবল বাড়ানোর জন্যে উত্তর প্রদেশ থেকে বিস্তর মুসলিম অফিসার আমদানি করেছিল। এর ফলে, বাংলার হিন্দুরা মনে করতে আরম্ভ করল যে, যেই মুসলিম সেই বুঝি রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শত্রু।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমাকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবলব্ধ বন্ধুরা যখন শুনলেন আমি তাদের দলে যোগ দিতে চাই, তাদের চোখ ট্যারা হয়ে গেল। গোড়ায় গোড়ায় আমাকে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি; গোপন আলোচনায় আমাকে তারা বাইরে রাখার চেষ্টা করতেন। আস্তে আস্তে সে ভুল তারা কাটিয়ে উঠলেন; আমি তাদের আস্থাভাজন হলাম। যুক্তি দিয়ে আমি তাদের বোঝাতে শুরু করলাম যে, সম্প্রদায়গত ভাবে মুসলিমদের শত্রুজ্ঞান করাটা তাদের ভুল। আমি তাদের আস্থাভাজন হলাম। আমি তাদের বলি যে, বাংলায় গুটিকয়েক মুসলিম অফিসারের কীর্তিকলাপ দেখে তা থেকে তাদের সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার জন্যে মিশর, ইরান আর তুরস্কের মুসলমানেরা বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কাজ করি, আমাদের বন্ধু হিসেবে তাদের যদি টানবার চেষ্টা করি, তাহলে তারাও রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দেবে। আমি এও তাদের স্পষ্ট করে বলি যে, মুসলিমরা যদি সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করে অথবা এমন কি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাহলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই ঢের বেশি কঠিন হবে। কাজেই আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে ঐ সম্প্রদায়ের সমর্থন আর বন্ধুত্ব অর্জন করা যায়।

গোড়ার দিকে আমার ধারণা যে নির্ভুল, সেটা আমার বিপ্লবী বন্ধুদের আমি বোঝাতে পারি নি। পরে তাদের কেউ কেউ আমার মতে সায় দেন। এই সময়টাতে আমি মুসলিমদের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। দেখলাম তাদের মধ্যে একদল তরুণ নতুন রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত।"[৯৫]

---

৯৫. ভারত স্বাধীন হল (মূল : India Wins Freedom)/মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (অনুঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। [ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন - ২০০৮। পৃ. ৪-৫]

ছয়

"...ঢাকার 'অনুশীলন-সমিতির' নাম অনেকেই অবগত আছেন। বাবু পুলিন চন্দ্র দাসের নাম এই সমিতির জন্যই রটিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালার বোমা-বিভ্রাটের বহু পূর্ব হইতেই ব্যায়াম-চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন, লাঠি খেলায় এবং অস্ত্র চালনায় ইহাদের বেশ খ্যাতি ছিল। আমি যখন প্রথম ময়মনসিংহে ও ঢাকায় বক্তৃতা করিতে যাই, তখন এই অনুশীলন সমিতির কথা বিশেষ করিয়া জানিতে পারি। অনুসন্ধানে জানিলাম এই সমিতির সমস্ত মেম্বরই হিন্দু। মুসলমান একজনও নাই। আমি চিরকালই ব্যায়াম-চর্চার পক্ষে। বাহুবলের উপরে আর কোনও বল নাই, ইহাই ছোটবেলা হইতে আমার হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল। আমি একদিন সভার চলমান ছাত্রদিগকে ব্যায়াম চর্চার সুবিধার জন্য অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিতে অনুরোধ ও আদেশ করি। আমার উপদেশে দুইটি বলিষ্ঠ পাঠান যুবক মাতিয়া উঠে। তাহারা অনুশীলন সমিতিতে ভর্তি হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই। আমি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। লাঠি-ব্যায়াম চর্চার সমিতিতে মুসলমান যুবক কেন ভর্তি হইতে পারিবে না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা আমাদের নিকট অনেক দিন প্রহেলিকার মত থাকিয়া যায়। পরে ইহার রহস্য উদঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে ঘটনাক্রমে ঐ সমিতির জনৈক সভ্য আমার নিকটে কোনও বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হওয়ায় আমার নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা স্বীকার করে এবং আমি সেই সুযোগে সমিতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের রহস্যের জন্য তাহাকে ধরিয়া বসি। তাহাতে তাহার কাছে জানিতে পারিলাম দরকার হইলে উহার শক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত হইবে, সেই জন্যই মুসলমানকে সভ্য করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

বঙ্গ-বিভাগের সময় কলিকাতা ও ঢাকায় কৃত্রিম-যুদ্ধ (mock-fight) শিক্ষার সময়েও মুসলমানকে দলে লওয়া হইয়াছিল না।

আসল কথা এই যে, মদন মোহন মালবীয়ার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানকে জব্দ করা বা নির্মূল করা, নতুবা 'হিন্দু-সংগঠনে' অস্ত্র-চর্চা ও বল বিন্যাসের কোনও আবশ্যকতা নাই। আর যদি ভারতীয় জনসাধারণের শারীরিক বল বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মুসলমানকে বাদ দিবার কারণ কি? বরং বীরজাতি মুসলমানকে শৌর্য্যে মাতাইয়া তোলাই ছিল আবশ্যক। ফলতঃ হিন্দু সংগঠনের সমস্ত কাণ্ডকারখানা এবং হাবভাব দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে যে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :

১. লাঠির জোরে গো-হত্যা বন্ধ করা।

২. মুসলমানদিগকে নানা কায়দা, অসুবিধা ও নির্যাতনে ফেলিয়া হিন্দু করা বা নির্জীব করা।

৩. স্বরাজ লাভ করিলেও মুসলমানদিগকে পদানত করিয়া রাখা।

৪. আফগান, তুর্কী যাহাতে ভারতবর্ষে আসিয়া ইসলাম প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারে, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া।

৫. মুসলমানদিগের সহিত কালে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কুমারিল ভট্টের সময়ে যেমন সাত কোটি বৌদ্ধকে মারিয়া, পোড়াইয়া এবং তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে নির্মূল করা হইয়াছিল তাহার পুনরাভিনয় করা। হিন্দুদিগের দ্বারা যে এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে, তাহা যাহারা আরা-শাহাবাদের ঘটন ও কাঁটারপুরের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড অবগত আছেন, তাহারা সহজেই বিশ্বাস করিবেন।

৬. কেহ কেহ বলিতে পারেন যে; হিন্দুরা কি এতই প্রবল হইবে যে, মুসলমানদিগের উপর ভবিষ্যতে অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা দলবদ্ধভাবে বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে সর্বত্রই বল প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ এই সমস্ত প্রদেশ ব্যতীত মুসলমানের সংখ্যা সর্বত্রই মুষ্টিমেয়। মুসলমান সংখ্যা কোন কোন স্থানে

শতকরা ৬ জন, বিহার ও উড়িষ্যায় মুসলমান সংখ্যা ৯ জন। যুক্তপ্রদেশে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ২৫ জন মাত্র। আরা, শাহবাদ ও কাঁটারপুরে হিন্দুরা যে নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্তমান যুগে বর্বর গ্রীকদিগের দ্বারাই শুধু সম্ভবপর। বাঙ্গালা ব্যতীত হিন্দুদিগের নিম্নশ্রেণির লোকেরা প্রায় সর্বত্রই অসভ্য প্রকৃতির। তাহারা উন্নত ও পরিমার্জিত নহে। তৎপর হিন্দুসমাজের মধ্যে নরবলি, বামাচার, তান্ত্রিকতা ও শবসাধনা প্রভৃতির বিধি থাকায় তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিলে ভীষণতম ও নৃশংসতম অত্যাচার পর্যন্ত খুবই করিতে পারে। বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিবার পর তাহাদের মাথা পর্যন্ত হিন্দু-রমণীরা ঢেঁকিতে কুটিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল। যাহাদের উপাস্য কালিকা-মূর্তি নরমুণ্ডমালা-ধারিণী, তাহাদের রমণীদিগের পক্ষে এরূপ নৃশংস কাণ্ড করা কদাপি অসম্ভব নহে।

এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কি? ইহাই ভারতীয় মুসলমানদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়। বিপদ আসিবার পূর্বে যাহারা সাবধান হয়, তাহারা বিপদগ্রস্ত হয় না। হইলেও সে বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বিপদ যখন ঘাড়ে হুড়মুড় করিয়া চাপিয়া পড়ে, তখন তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব। মুসলমান ভ্রাতারা যাহারা আমার কথায় হাস্য বা উপেক্ষা করিতে চাহেন তাহারা যেন দয়া করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশ, স্পেন-পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ, অষ্ট্রাখান ও কাজানের মুসলমানদের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখেন। যাহা এক জায়গায় ঘটিতে পারে তাহা অন্য জায়গায়ও ঘটিতে পারে। সুতরাং দিন থাকিতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।"[৯১]

সাত

"...বিশ শতকের শুরুতেই হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবী রূপ নিল। ১৯০২ সালেই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কোলকাতায় সার্কুলার রোডে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো। আমরা ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসবের মধ্যে হিন্দু-উত্থানের যে মারমুখো প্রবণতা দেখেছি এবং বালগঙ্গাধর তিলকের ঘোষণায় হিন্দুদের হিংসাত্মক উত্থানের যে ইংগিত পেয়েছি, তারই আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো 'গুপ্ত সমিতি'র মাধ্যমে। কংগ্রেসের ছায়াতেই এই আন্দোলন চলল। কংগ্রেসের জনশক্তি এবং কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মী অব্যাহত ভাবে এ আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করেছে।

বিপ্লবী এ গুপ্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অরবিন্দ। শ্রী অরবিন্দ তাঁর কর্মস্থল বরোদা থেকে বাংলাদেশে বিপ্লবী কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্যে ১৯০১ সালে পাঠান যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে এবং এর কিছু পরে পাঠান তার ভাই বারীন ঘোষকে।

১৯০২ সালে কোলকাতার সার্কুলার রোডে যে গুপ্ত সমিতি গঠিত হলো, তার পরিচালনার জন্যে ছিল পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি। কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র, সহসভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের) পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোলকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। সমিতির কেন্দ্রগুলোতে শরীর চর্চার সাথে সাথে রাজনৈতিক পাঠও নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। 'এই বিপ্লবী দলের একটা প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল এবং তা ছিল সংস্কৃতি ভাষায়। সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেককে উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। শর্ত ছিল- 'ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে।' প্রতিজ্ঞার এই শর্ত থেকে পরিস্কার, এই বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। এখানে উল্লেখ্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এই বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন অতীতের হিন্দু রাজনীতিরই এক ধারাবাহিকতা। উনবিংশ শতকেও হিন্দুদের

[৯১]. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী/সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা : ২১শে ভদ্র ১৩৩০ (৭ই মে ১৯২৩): ছোলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি/সম্পাদনা : ইমরান হোসেন। [বাংলা একাডেমি- এপ্রিল, ২০০১। পৃ. ২৬৩-২৬৫]

এই ধরনের আন্দোলনের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৭৯ সালে পুনার চিত পাবন ব্রাহ্মণদের একজন শ্রী বাসুদেও বলবন্ত নিজেকে দ্বিতীয় শিবাজীর মন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের পাহাড়িয়া এলাকায় গিয়ে এক সৈন্য বাহিনী গড়ে তুললেন। দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি ইংরেজদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালালেন। কিন্তু হিন্দুরাজ কায়েম হলো না। ব্যর্থ হলেন তিনি। ব্যর্থ হলেন বটে, কিন্তু হিন্দু মানসে তিনি সৃষ্টি করলেন এক বুক ভরা আশা এবং প্রেরণা। সেই প্রেরণায় জেগে উঠেছিলেন বিষ্ণুহরি চাপেকার নামে এক যুবক কবি। তিনিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হিন্দুরাজ কায়েমের। তার শিক্ষা, তাঁর দেশ প্রেমমূলক কবিতা মানুষের মধ্যে চেতনার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বাল গঙ্গাধর তিলক, প্রমুখ এই ধারারই দিকপাল। সবাই শিবাজীর একনিষ্ঠ উত্তরসূরী। গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরা এই ধারারই ছদ্মবেশী নাট। কিন্তু শ্রী অরবিন্দরা এলেন শিবাজীর কোষমুক্ত কৃপাণ হয়ে।

কিন্তু ১৯০২ সালে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি বাংলাদেশে তার যাত্রা শুরু করলেও খুব বেশি এগুতে পারল না, গণমানুষের কাতারে এসে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। বংগ ভঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষণার পর এই সুযোগ তাদের এল। নতুন ভাবে গা ঝাড়া দিল গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি। গঠিত হলো নতুন প্রয়োজন পূরণের জন্যে নতুন সমিতি। বঙ্কিমী আদর্শের অনুকরণে তার নাম দেওয়া হলো 'অনুশীলন সমিতি'। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির ব্যারিষ্টার পি. মিত্র হলেন এরও সভাপতি। এইভাবে কার্যত এক হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতি ও অনুশীলন সমিতি। বঙ্গভঙ্গ রদে বৃটিশকে বাধ্য করার জন্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ১৯০৫ সালের আগস্টে 'বৃটিশ পণ্য বর্জন' করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে প্রবল 'স্বদেশী আন্দোলন' এ রূপ নিল। এই 'স্বদেশী আন্দোলন' এর অস্ত্রে পরিণত হলো গুপ্ত সমিতি বা অনুশীলন সমিতি। এ অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। বাংলার শহরে মফস্বলে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন নতুন আখড়া, ব্যায়ামাগার ও সমিতি এবং যুবকের দল দেশোদ্ধারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রহণ করলো এর সভাপদ। ১৯০৫ সনের নভেম্বরে পি. মিত্রের উৎসাহে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে গুপ্ত সমিতির যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানেও মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্যরিষ্টার পি. মিত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্রুত গতির সাথে তাল রেখে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় ক্লাব ও আখড়া প্রতিষ্ঠিত হলো।

সেগুলিও ছিল কলকাতাস্থ অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত। সতীশ বসু (কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সেক্রেটারী) ও পুলিন দাস (ঢাকা অনুশীলন সমিতির সেক্রেটারী) উভয়কেই বলা হয় বৈপ্লবিক দলের প্রথম ধারার প্রতিনিধি। এই দুই নেতার নেতৃত্বে বাংলায় হাজার হাজার যুবক তৎকালে শক্তিযোগের সাধনায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। শক্তিযোগী বাংগালীর নতুন চরিত্র ও মেজাজ লক্ষ্য করে সেদিন সারা ভারতবর্ষের লোকেরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল।

বলা যায়, ১৯০৫ এর আগস্ট মাসে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বাংলার মরা গাঙ্গে নতুন ভাব, আবেগ ও কর্মের জোয়ার এলো। এই জোয়ারে তরী ভাসালেন রবীন্দ্রনাথও। রবিকণ্ঠ থেকে বের হলো 'জয় মা বলে ভাসা তরী'। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার বলেছেন, 'শব্দই হোক আর বস্তুই হোক - দুইয়েই ছিল লাখ লাখ মানুষের স্বার্থ, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, ভাবুকতা আর কৃতিত্ব, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবত্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো। অসংখ্য বাঙ্গালীর সুরও বদলে গেল। মেজাজ বদলে গেল। বাঙ্গালী সেদিন ভারতের জন্য স্বরাজ চাইলো, কারণ স্বরাজের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীদের জীবনে ঘটবে পুনরুজ্জীবন। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাঙ্গালী সেদিন নতুন তেজ ও নতুন সংকল্প নিয়ে স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলো।' 'স্বদেশী আধুনিক বাঙলার ইতিহাসের প্রথম ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন যা বাঙলার সমাজ কাঠামোকে দীর্ণ করেছিল বিপুল ঘটনা বিস্তার ও অভূতপূর্ব হিংস্রতা ও স্ববিরোধী চরিত্র প্রকাশ করেছে। বাঙলাদেশ পরবর্তীকালের সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বসূরী ও পথিকৃত ছিল স্বদেশী। বাঙালী জাতির ভবিষ্যতও নির্ধারণ করেছিল বহুজাত স্বদেশী আন্দোলন। এ যুগে ভদ্রলোক শ্রেণীর নতুন নেতা হলেন 'র‍্যাডিকাল বিপিন' বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ ও বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন দাস। গুপ্ত সমিতি,

রাজনৈতিক হত্যা ও সন্ত্রাসবাদ, ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ, অসহযোগ, সত্যগ্রহ, ধর্মঘট, বন্ধ, পিকেটিং, অনশন প্রভৃতি রাজনৈতিক কলা কৌশল স্বদেশী যুগেরই অবদান। স্বদেশীর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বাংলায় জন্ম হয়েছিল মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।'

স্বদেশী আন্দোলনের এ ঢেউ সেদিন আরও অনেকেরই মুখোশ খুলে দিয়েছিল। 'মহান জাতীয় নেতা' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আচরণেও 'স্বদেশী'র হিন্দু চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কলিঘাটের বিখ্যাত কালিমন্দিরে পুজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বদেশীরা আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে বৈদ্যবাটির কালিমন্দিরেও স্বদেশীরা শপথ নেয়। মন্দিরে এই শপথ নেয়ার উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখছেন, 'আমি কথা বলছিলাম যখন, আমার চোখ মন্দির এবং প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পারিপার্শ্বিকতা আমার হৃদয়কে আবেগে পূর্ণ করে তুলেছিল। হঠাৎ আমি আবেদন জানালাম জনতার প্রতি, আপনারা উঠুন, চলুন, আমরা আমাদের পূণ্য দেবতার কাছে গিয়ে শপথ গ্রহণ করি। মন্দিরে শপথ বাক্য আমিই পাঠ করিয়েছিলাম। আমি শপথ বাক্য বলছিলাম, আর জনতা দাঁড়িয়ে আমার কথার পুনরাবৃত্তি করছিল।'

স্বদেশীদের এই চরিত্র স্পষ্ট হবার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, 'বাঙালীর' শক্তিযোগী বা সামরিক এই উত্থানের লক্ষ্য কি? স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল? স্বদেশীদের যে স্বপ্ন 'স্বরাজের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীদের জীবনে ঘটবে পুনরুজ্জীবন। সেই জীবনের স্বরূপটা কি?

এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আন্দোলনের নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। এ জবাব দিয়েছেন তিনি তার লিখিত 'ভবানী মন্দির' শীর্ষক পুস্তিকায়। 'অরবিন্দ চাইলেন ভারতের কোনও এক পর্বত শীর্ষে আরাধ্য দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। বহু দিনের পরাধীনতার পরিণামে যে ক্লৈব্য ও তামসিকতা ভারতবাসীর মানসকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার কবল থেকে জনমানসকে মুক্ত করে অরবিন্দ সেখানে ক্ষাত্রতেজের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে চাইলেন। তাই তিনি সেদিন শান্তির ললিত বাণী উচ্চারণ না করে জাতির নয়ন সম্মুখে তুলে ধরলেন শক্তি রূপা ভবানীর মূর্তি। এই ভবানী শিবাজীরও আরাধ্য। শিবাজীর হাতের খড়গ ছিল ভবানীর প্রিয় এবং খড়গের কারণে শিবাজীও ছিলেন ভবানীর প্রিয়। 'খড়গ-হস্ত শিবাজীকে রঘুপতি যোজনা করেছিল যবনদিগের বিরুদ্ধে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে।' শ্রী অরবিন্দও শিবাজীর এ খড়গ তুলে দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের হাতে, স্বদেশীদের হাতে। লক্ষ্য ঐ একই, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা এবং স্বদেশী আন্দোলন ছিল এই লক্ষ্য অর্জনের উপলক্ষ। এই কথাটা 'যুগান্তর' পত্রিকার 'ধর্মরাজ্য ও মহারাজা শিবাজী' নিবন্ধে সুন্দরভাবে স্বীকার করা হয়েছে এইভাবে, 'ধর্ম রাজ্যের আদর্শের দ্বারা সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভবপর নহে। তাহাদের নিকট ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ আদর্শকে ব্যক্ত না করিয়া স্বদেশ প্রতিষ্ঠারূপ আদর্শকেই স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মস্থাপন রূপ আদর্শকে সহজেই অবলম্বন করিতে পরিবেন এবং উহারই একমাত্র উপায়স্বরূপ স্বদেশ প্রতিষ্ঠানকে ধ্রুবলক্ষ বলিয়া ধারণা করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে করিতে নবজীবন লাভের জন্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্বদেশ বা নেশনের প্রতিষ্ঠাই ধর্মরাজ্য স্থাপনের মূল ভিত্তি, অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব বিপদরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ এই মূল ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছে। সমগ্র ভারতকে এ রাজচক্রবর্তিতে সম্মিলিত করিয়া ধর্মরাজ্য স্থাপনারূপ মহাব্রত ব্রতী হইয়া ভগবান বাসুদেব মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস অভিনিবিষ্ট হইয়া পাঠকর, দেখিবে এই যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষ সহস্রবর্ষ ধরিয়া আহুতি মন্ত্রের অনুসন্ধান করিতেছে। ভারতের দুঃখ তমিস্ররাশির মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভায় স্বদেশ বা নেশন প্রতিষ্ঠারূপ আদর্শের প্রকাশ হইয়া সেই মন্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী, তুমি কি আজ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে পার যে, 'বন্দেমাতরমই' সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের আহুতি মন্ত্র?'

হিন্দুভারত যুগান্তরের এই সব কথা সবই বিশ্বাস করেছিল। এই সংগে চেয়েছিল যে, সমগ্র ভারতকে এক রাজচক্রে সম্মিলিত করে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভারতবর্ষ সহস্র বছর ধরে যে আহুতি মন্ত্রের সন্ধান করছে, 'বন্দেমাতরম' কে সেই আহুতি মন্ত্র হিসেবে প্রত্যেক হিন্দুই সমস্ত আবেগ দিয়ে গ্রহণ করুক।

এই চাওয়ার বিশ্বস্ত বাস্তবায়ন হিসাবে সর্বভারতীয় কংগ্রেসও একে গ্রহণ করল। গ্রহণ করল একে আধুনিক ভারত রাষ্ট্র তার প্রিয় সংগীত হিসেবে।

...চট্টগ্রামে সূর্যসেনের আন্দোলন ছিল মিঃ গান্ধীর পদাংক অনুসরণে এবং গান্ধীরই আইন অমান্য আন্দোলনের একটা অংশ। সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মতিলাল নেহেরু জওহর লাল নেহেরুকে লিখেছিলেন, 'বাংলায় বিপ্লবীরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।' সূর্যসেন ছিলেন এই সম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিপ্লবীদেরই একজন। তিনি ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অস্ত্রাগার লুন্ঠন পর্যন্ত যাবতীয় বিপ্লবী কার্যক্রম চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হয়েছে। সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির সাথে একাত্ম। ১৯২৮ সালে কোলকাতার যে সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট পাশ করা হয় এবং যে সম্মেলনে লীগ-কংগ্রেস বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় ও জিন্নাহ অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেন, সে সম্মেলনে সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং গান্ধীপন্থী হাইলাইনারসের একজন।

এরপর ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের যে সম্মেলনে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস এককভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে সম্মেলনেও সূর্যসেন চট্টগ্রাম থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মতে এই সময় সূর্যসেন চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সর্বেসর্বা ছিলেন এবং তার পছন্দমত লোক তিনি কংগ্রেসের লাহোর সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলেন। চরম মুসলিম বিদ্বেষী নেতা এবং হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা মদন মোহন মালব্যের সাথেও সূর্যসেনের একাত্মতার পরিচয় এ সম্মেলনকালে পাওয়া যায়। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে একটি সর্বভারতীয় হিন্দু ছাত্র সংগঠন তৈরী করার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ঐ সময় লাহরে নিখিল ভারত ছাত্র কনভেনশন ডাকা হয়েছিল। সূর্যসেন এই কনভেনশনের জন্যেও প্রতিনিধি নিয়ে যান। তার কংগ্রেস প্রতিনিধিদেরও অনেকে সেখানে যোগদান করে। - বস্তুত সূর্যসেন মদন মোহন মালব্যের মতই কট্টর পন্থী একজন কংগ্রেস নেতা এবং কংগ্রেসের সব প্রোগ্রামই আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেন।

১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তারিখকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে এই দিন কংগ্রেস রচিত 'স্বাধীনতা দিবেসের' সংকল্প পাঠ করা হয়। --- চট্টগ্রামেও কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্যসেন স্বাধীনতা দিবসে' কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য কর্মসূচী পালন করেন। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল মিঃ গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে কংগ্রেস কর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠান। প্রতি গ্রামে নিষিদ্ধ লবণ তৈরী ও আমদানী শুরু করা হোক। --- ছাত্রগণ সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন করুন, সরকারি চাকুরেরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আমরা শিগগিরই দেখতে পাব স্বরাজ কবে দ্বারে সমাগত হবে তার জন্যে অপেক্ষা না করে স্বরাজ হাতে তুলে নেওয়ার জন্যে অস্ত্রাগার লুট করার সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যসেন। নিজেদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পুলিশকে বিভ্রান্ত ও নিজেদের ব্যাপারে সরকারকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্যে ১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল একটা ইস্তাহার ছাড়লেন সূর্যসেন। পূর্ণ স্বরাজ আমাদের দ্বারে সমাগত।

ইস্তাহারটি এই –'দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। সর্বত্র আইন অমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরো ভাগে আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে - ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয়। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবন আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমন রাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরাও ২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি। ইহার জন্যে সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই। লোক ও টাকা চাই।'

শ্রী সূর্যসেন সম্পাদক, চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি

সূর্যসেনরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কালেও সূর্যসেন ছিলেন নিখাদ কংগ্রেস কর্মী, এবং বন্দেমাতরমের নির্জলা সৈনিক। অস্ত্রাগারের বিরাট লোহার গেট যখন দেওয়াল থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তখন উল্লসিত বিপ্লবীদের গগণ বিদারী 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে চট্টগ্রামের নৈশ-আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। একরকম বিনা আয়াসেই জিলার বিদেশি শক্তির শেষ প্রধান সশস্ত্র ঘাটি বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল, তখন আবারও জোর গলায় ধ্বনি উঠল 'বন্দে মাতরম', 'স্বাধীন ভারত কী জয়'।

রিজার্ভ ফোর্সের শেষ প্রধান এই সশস্ত্র ঘাটি বিনা আয়াসে দখলে আসার পেছনে একটা কাহিনি আছে। এই ঘাটি দখলের জন্যে 'বিপ্লবীরা যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উপর দিকে উঠছেন, তখন তারা ধ্বনি দিতে থাকেন 'গান্ধীরাজ হো গিয়া, ভাগো'। তাদের বক্তব্যকে আকাশের দিকে গুলীর আওয়াজ দিয়ে তারা সঠিক ভাবে বুঝাবারও চেষ্টা করছিল। ফলে সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং রিজার্ভ ফোর্সের সিপাহী ব্যারাকের বিপরীত দিক থেকে পালাতে শুরু করে। সূর্যসেনদের এই সংগ্রাম ছিল মূলত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যদের 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সূর্যসেনের বিপ্লবী সৈনিকরা ছিল গান্ধীর 'সত্যগ্রহী সেনা', আনন্দ মঠের 'বন্দে মাতরম' মুখরিত 'সন্তান সেনা'। এই কারণেই সূর্যসেনের বাহিনীতে কোন মুসলমান ছিল না। যারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নিয়েছিল, যারা জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে সূর্যসেনের সাথী ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমানও ছিলনা।

পাহাড়তলী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় বিপ্লবীরা লালদিঘী ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একজন মুসলিম ড্রাইভারকে জোর করে পাহাড়তলীতে নিয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম ছিল আহমদ। লুণ্ঠন কাজ শেষে ড্রাইভারের চোখে মুখে এসিড ঢেলে তাকে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল। ড্রাইভারের বক্তব্য অনুযায়ী সে যেহেতু মুসলমান ছিল এবং লুণ্ঠনাকারীদের চিনিয়ে দিতে পারত, এ কারণেই তার চোখে-মুখে এসিড ঢালা হয়েছিল।

আসলে সূর্যসেনের আন্দোলনটাই এমন ছিল যে, তাতে কোন মুসলমান শামিল হওয়া সম্ভব ছিল না। সূর্যসেনের সহযোগী শ্রীমতি কুন্দপ্রভা সেন তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'দেশ সেবা শিক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে সূর্যসেনের সাথে দেখা করলে তিনি বললেন যে, পূজো করতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে।' এই পূজোর বিবরণ দিতে গিয়ে কুন্দ প্রভা লিখছেন, 'আমি পিছু পিছু চললাম, কিছুদূর এগিয়ে একটা মন্দিরের কাছে দু'জনেই পৌছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাষ্টার দা আর আমি ভেতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম, ভীষণ এক কালী মূর্ত্তি। মাষ্টার দা এক হাতে লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিলেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো কর। ওখানে বেল পাতা আছে। বুকের মাঝখানের চামড়া টেনে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোটা রক্ত বের হল। তা বেল পাতায় করে মাষ্টার দার কাছে নিয়ে গেলাম। -- আমি মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম।'

ভারতের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা মোজাফফর আহমদ যথার্থই লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।' গান্ধীর অসহযোগ, স্বরাজ্য, আইন অমান্য আন্দোলন, প্রভৃতি সবই ছিল এই হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই কারণেই বাংলার জননেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে গান্ধী, সূর্যসেনদের এই আন্দোলন তৎপরতাকে গন্ডগোল বলে অভিহিত করেছিলেন। সূর্যসেনদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ১৭ দিন পর গান্ধী গ্রেপ্তার হলে এই বিষয়ের উপর এক আলোচনায় শেরে বাংলা বলেন, 'ভারতের ৭ কোটি মুসলমানের ৭০ জনো কংগ্রেসের সমর্থক নয়। মিঃ গান্ধী যে রকম গন্ডগোল সৃষ্টি করেছেন তাতে তাকে গ্রেফতার করে রাখার জন্যে আমি ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, সূর্যসেনেরা তাদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দায় মুসলমানদের উপর চাপাতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সুন্দর একটি তথ্য দিয়েছেন চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী ও সংগ্রামী পরিবারের সন্তান ব্যারিষ্টার এস. এ. সিদ্দিকী। তিনি বলেছেন,

'বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক শ্রী সূর্যসেনের অধিনায়কত্বে তারই পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্পন্ন হলো চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি ঘটনা, বলা যায় উপঘটনা। কোন ইতিহাসে সে উপ-ঘটনার কথা লেখা না হলেও আজও চট্টগ্রামের হাজার হাজার মানুষের মুখে তা জলজ্যান্ত সত্য হয়ে আছে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসেই অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে সাড়া জাগানো মুসলিম কনফারেন্স। ঐ কনফারেন্সের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে তাতে যোগ দিয়েছিলেন এই উপমহাদেশের চিরস্মরণীয় মল্লবীর গামা। মুসলীম কনফারেন্সের কর্মীদের মাথায় ছিল তুর্কি টুপি, গায়ে বিশেষ রকমের ব্যাজ। সম্মেলনের পরপরই আরম্ভ হলো বিপ্লবীদের অভিযান। অভিযান শেষে বিপ্লবীদের পালাবার পথে দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদের অনুরূপ তুর্কী টুপি ও বিশেষ ধরনের ব্যাজ। তাতে সহজেই মনে হতে পারে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঐ কনফারেন্স কর্মীরা। সরকারের কাছেও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু যার কর্মতৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায় বিপ্লবীদের অনিষ্টকারী এই সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা, তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর মোমিন সাহেব। তারই তদন্তে উৎঘাটিত হয় সত্যিকার ঘটনা। বেঁচে যায় মুসলিম কনফারেন্সের কর্মীবৃন্দ।'

এই ঘটনা প্রমাণ করে মুসলমানরা ছিল সূর্যসেনের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ।"[১৭]

আট

"...সন্ত্রাসবাদী পার্টি থেকে আগত শতকরা ৯৫ জন সংখ্যালঘু পার্টি নেতৃবৃন্দ যে এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ঐতিহ্যগত চিন্তা-আচার-আচরণকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে অপারগ হয়েছে আমি সে কথা উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া পার্টি নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতাকে এত যান্ত্রিকভাবে দেখেছে, যার ফল হয়েছে মারাত্মক।

...আমাদের সংখ্যালঘু প্রধান পার্টি নেতৃবর্গ মার্কসবাদী বলে নিজেদের যতই ঢাক-ঢোল পিটাক না কেন নিজেদের আচরণে সে পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রমাণ - পার্টিশনের পরে জেল থেকে বেরিয়ে ব্যাপক সংখ্যক বলতে গেলে শতকরা ৯৫ জন পার্টি সংখ্যালঘু কমরেডরা কলিকাতা চলে যায়। তাদের এই হিন্দুস্থান বা ভারত প্রীতি এদেশের পার্টির বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে। যে সমস্ত সংখ্যালঘু কমরেড জেলে বসে এ দেশকে ভালবাসে বলে দাবি করেছে এবং কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করবে না বলে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তারাই সবচেয়ে আগে কলিকাতার পথে পাড়ি জমিয়েছে।

আমি যখন ১৯৭২ সনে কলিকাতায় যাই তখন আমার নিজ জেলার কিছু কিছু কমরেডদের বাসায় যাই - তাদের মধ্যে ২/১ জন ছাড়া অন্য সবাই কোনদিন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল কিনা তাও হয়ত ভুলে গেছে এমন ভাব করলেন। আমি আমার কারাস্মৃতিতে উল্লেখিত কিছু কিছু ঘটনার কথা বললে জনৈক কমরেড বললেন - বাঃ রে ওসব আর কিছু মনে আছে?

ঐ সময় কলিকাতায় পূর্ব বঙ্গের বেশ কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তারা ভুলেও মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও মুখে আনেনি। তাদের হাবভাবে মনে হলো পূর্ব বাংলা বলে যে কোন দেশ আছে তাও যেন তারা জানে না। অথচ তারা প্রবীণ। এককালে তাদের মুখে বিপ্লবের খৈ ফুটত।

---

১৭. আবুল আসাদ/একশ' বছরের রাজনীতি। [বিসিবিএস - মে, ২০১৪। পৃ. ৫৬-৬০। ১১৪-১১৮]

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চেয়ে বা জিন্নাহর চেয়ে জওহরলাল বেশি প্রগতিশীল, কাশ্মীরের ভারতভুক্ত হলে সে রাজ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সহজসাধ্য হবে ইত্যাদি বহু রকম উদ্ভট তত্ত্ব দিয়ে তারা পার্টিকে একটি গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল।

অথচ আসল কথা হলো সঠিক পার্টি নেতৃত্ব, তত্ত্ব ও বাস্তবে পার্টি নীতি শুদ্ধ হলে ভারতের চেয়ে পাকিস্তানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আগেই সমাধা হওয়ার কথা, কারণ একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে এই দ্রুত সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সহজ, এ জন্য যে এখানে অত্যাচার প্রত্যক্ষ। শাসক শ্রেণী অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং কৃষক শ্রেণী ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তাদের সংগঠিত করে চীনের পদ্ধতিতে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা সহজ ছিল। কিন্তু পার্টি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আধুনিক বুর্জোয়া শাসিত ভারতকে বেশি প্রগতিশীল মনে করেছে। এটা তাদের অবচেতন স্তরে ভারত প্রীতি তথা স্বজাতি প্রীতি বই কিছুই নয়। '৪৮ সনে ভারতীয় সরকার মাদ্রাজের সালেম জেলে ১৯ জন কমরেডকে গুলী করে হত্যা করেছে। আর পূর্ব পাকিস্তানে - তাও পার্টির অতি মাত্রায় গোড়ামী ও হঠকারিতার ফলে - রাজশাহী জেলে গুলী চালিয়ে ৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে।

পার্টিশনের বা দেশ বিভাগের পর যে সমস্ত কমরেড ভারতে গিয়েছেন তারা সেখানে দিব্যি যা করবার তা করেছেন ভ্রু ভুলেও আর পূর্ববঙ্গের নাম মুখেও আনেননি। আর যে সমস্ত কমরেড এখানে রয়েছেন তারা তাদের পোশাক-আশাকে আচার-আচরণে নিজেদের স্বজাত্য পুরোপুরিই বজায় রেখে চলেছেন।

...শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, এমনকি রবীন্দ্রনাথকে যে কারণে আমরা অন্য পাঁচজনের মত সাম্প্রদায়িক বলি না - অথচ তারা কিন্তু তাদের সাহিত্যে মুসলিমদের সামনে আনতে পারেননি। আমরা বলেছি - যে পরিবেশে, যে স্থানে ও কালে ও শিক্ষা-দীক্ষায় বড়ো হয়েছে তাতে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের চিত্র সার্থকভাবে তুলে ধরাই সঙ্গত হয়েছে - এবং তা তারা সার্থকভাবেই তুলে ধরেছেন। যদিও তারা মুসলমানদের সমাজ চিত্র সামনে আনতে পারেননি বলে আফসোসও করেছেন।

তেমনি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কমরেডগণ - তত্ত্বগতভাবে তারা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠলেও যেহেতু দেশে সংগ্রাম অনুপস্থিত সেজন্য তারা মূলতঃ তাদের সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। এ দোষ তাদের নয়- এ দোষ পার্টি নীতিনির্ধারণে ব্যর্থতার। সংগ্রামহীন একটা দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে এরূপ সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব প্রকাশ আদৌ বিচিত্র কিছু নয়।"[৯৮]

নয়

"...'আনন্দমঠ' নামক উপন্যাসটি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে সে প্রভাব অল্পকাল স্থায়ী ছিল না। উপরন্তু, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষমূলক ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করে তার ওপর এক গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

জাতিকে হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের সাথে এক করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা দেশে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেন সে জাতীয়তাবাদ একদিকে ছিল বৃটিশ শাসন বিরোধিতায় বিমুখ এবং অন্যদিকে ছিলো সাম্প্রদায়িক হলাহলে পরিপূর্ণ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই দুই চরিত্রই আবার মূলতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট। ইংরেজের ব্যবহারে অপমানিত হয়ে তাঁদের মধ্যে যে জাত্যাভিমান দেখা দিয়েছিল, সে জাত্যাভিমান ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ার কোন পথ না থাকায় তা প্রায় সর্বাংশে পরিচালিত হয়েছিলো মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। শত্রু ব্যতীত জাতীয় আন্দোলন সংহত ও শক্তিশালী হয় না। জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে শত্রু প্রয়োজন। ইংরেজকে শত্রু হিসাবে গণ্য করা সেই মেরুদণ্ডহীন

---

৯৮. আবদুশ শহীদ/আত্মকথা : একটি রাজনৈতিক পরিক্রমা। [কীর্তনখোলা প্রকাশনী - নভেম্বর, ১৯৮৪। পৃ. ৫-৮]

শ্রেনীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়কেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শত্রু হিসাবে দাঁড় করিয়ে যে রাজনৈতিক মত 'আনন্দমঠে', 'ধর্মতত্ত্বে' (অনুশীলন) এবং 'কৃষ্ণ চরিত্রে' প্রচার করলেন তার কুপ্রভাবে হিন্দু উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশও বহুলাংশে প্রভাবিত হয়।

'জাতীয়তা ও হিন্দুত্বকে সমার্থক করে ফেলার ফলে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ছাড়াও সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তারও যে গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। হিন্দুত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে ব্যক্তিজীবনের নৈতিক সমস্যাগুলির উপর যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সামগ্রিক জীবনের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি ঠিক সেই পরিমাণে অবহেলিত হয়ে পড়ে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের রচনায় কোথাও আমরা মানুষের অধিকার সম্বন্ধে, স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য রাজনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের চরিত্রের বিষয়ে কোন আলোচনা পাই না। অথচ রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে যদি কেবল নৈতিক ভাবনা থাকে এবং রাজনৈতিক চিন্তা ও সচেতনতা যদি অনুপস্থিতির দরুন লক্ষ্যগোচর হয়, তবে তার ফলে আর যা-ই হোক রাজনৈতিক সাফল্য সুদূরপরাহত হয়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তাই যুবকদের অমিত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এত করুণ।' (অসিতকুমার ভট্টাচার্য : বংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা। পৃষ্ঠা: ৭৭-৭৮)

উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা দীক্ষার কিছুটা সম্প্রসারণ হচ্ছিলো এবং পূর্ববর্তী ইংরেজ বিরোধিতা বাদ দিয়ে নিজেদের আর্থিক জীবন নোতুনভাবে তারা গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত ছিলো। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এই উচ্চ ও মধ্যশ্রেণিও সে সময় হিন্দুদের মতোই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরকারি চাকরীর ওপর নির্ভরশীল এবং সমান মেরুদণ্ডহীন ছিলো। বৃটিশের প্রতি আনুগত্য এবং সাম্প্রদায়িকতা সে সময় তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাকেও সর্বাংশে আচ্ছন্ন করে রাখে। হিন্দু মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণি এই ভাবে একদিকে বৃটিশের সাথে আপোষ এবং অন্যদিকে পরস্পরের ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সংঘর্ষকে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দু এবং মুসলমান শোষক শ্রেণীসমূহের হাতে পৃথক পৃথকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

...'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষক ও কর্মহারা কারিগরদের সশস্ত্র বিদ্রোহকে কতকগুলি ধর্মান্ধ সন্ন্যাসীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হিসেবে চিত্রিত করে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন একটি ইংরেজ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামকে ইংরেজের সাথে আপোষমূলক ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি একটি গণসংগ্রামকে দান করেছেন সন্ত্রাসবাদী চরিত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'অনুশীলন' তিনি এই ধরনের সন্ত্রাসবাদেরই দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেন।

সন্ত্রাসবাদ কিন্তু উপরোক্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা পদ্ধতি হিসেবে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এই না পারার কারণ, সন্ত্রাসবাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দিকে। পদ্ধতিগত দিক থেকে ভ্রান্ত হলেও লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাকে ভ্রান্ত বলা চলে না।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে প্রায় চল্লিশ বৎসর ভারতে এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের একটা অপ্রধান ধারা হিসেবে বর্তমান থাকে এবং এই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের মাধ্যমেই বৃটিশ বিরোধিতা এই পর্যায়ে সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে।

কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদী যুবকেরা ছিলেন মধ্যশ্রেণিভুক্ত এবং তাদের ওপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম যুগের কতকগুলি কুপ্রভাবও অনেকাংশে বর্তমান ছিলো। ঐতিহ্য হিসেবে সেই সমস্ত কুপ্রভাবগুলির একটি হলো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজনৈতিক চিন্তা এবং অপরটি হলো সাম্প্রদায়িকতা।

তথাকথিত কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী নেতাদেরকে (যাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই ছিলেন) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরান্মুখ দেখে মধ্যশ্রেণির একদল যুবক প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। বাঙলাদেশের মধ্যশ্রেণিভুক্ত এই সমস্ত যুবকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে নামার সময় তারা 'আনন্দমঠ,' 'ধর্মতত্ত্ব, 'ভগবদগীতা' হাতে নিয়েই সেই আন্দোলনে নামেন। এজন্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিন্তা ও পদ্ধতিগত দিক থেকে যেমন তারা ভ্রান্ত পথের অনুসারী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অভাব ছিলো না।

একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সন্ত্রাসবাদীরা সকলেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন, অথবা যাদের মধ্যে সেই পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা ছিলো তাঁরা কেউই সেই চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এর সরল অর্থ হলো এই যে, তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে ইতিপূর্বে বর্নিত চরিত্র সম্পন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যশ্রেণির প্রাধান্য থাকার ফলে সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একদিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা উভয়ই বর্তমান ছিলো। এই সন্ত্রাসবাদী ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক শত্রু হত্যার দিকে পরিচালিত না হলেও অতি সুক্ষভাবে এবং সাধারণভাবে তা সামগ্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করে। চিন্তার কাঠামোকেও তা অনেকাংশে নির্ধারণ করে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বক্মাত্তের জন্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতে এবং বিশেষতঃ বাঙলাদেশে যত বিচিত্র পথগামী হয়, অন্যত্র তা হতে দেখা যায় নি। এদিক দিয়েও এদেশীয় সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস গুরুতর পর্যালোচনার যোগ্য।

কিন্তু অন্য আর এ কারণেও এই সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব আমাদের দেশে খুব বেশি। সে কারণটি হলো এই যে, এই সন্ত্রাসবাদের মধ্যে থেকেই ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্ম এবং সন্ত্রাসবাদীদের হাতেই তার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত। অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের কিছু কিছু গৌণ প্রভাব থাকে কিন্তু ভারতে ও বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদীরাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্ম দেন এবং তার প্রাথমিক বিকাশ ঘটান।

পৃথিবীর সব দেশেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে মধ্যশ্রেণির যুবকদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একটা অস্তিত্ব দেখা যায়। এবং সেই হিসেবে কমিউনিষ্ট আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবেই হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও কমিউনিষ্ট আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিরই পরবর্তী পর্যায়। কিন্তু তবু এক্ষেত্রে একদিক দিয়ে অন্যান্য দেশের পরিস্থিতির সাথে আমাদের দেশের পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশে (উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়া ও চীনে) কমিউনিষ্ট আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় হলেও সন্ত্রাসবাদীরা সেখানে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্মদান অথবা বিকাশ ঘটান কোনটিই করেননি। কিন্তু এদেশে ঠিক তাই হয়েছিলো। বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তার শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদীরা দলে দলে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। এই প্রক্রিয়া পূর্বেই শুরু হয়ে তিরিশের দশকে একটা পরিণতি লাভ করে। অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা সকলেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন এবং গণ আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা মার্কসবাদীদের থেকে সংখ্যা ও প্রভাবে দিক দিয়ে তারা প্রথম থেকেই প্রাধান্যে আসেন। এই কারণেই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্টালিন, মাও সেতুঙ প্রভৃতি পাঠ এবং অনুশীলন সত্ত্বেও ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের এবং সেই সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট ঐতিহ্যিক লক্ষণগুলি (এমনকি আপোষমুখীতা পর্যন্ত) থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে কোন দিনই মুক্তি হতে পারেননি। এই লক্ষণগুলির মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তা (জনগণের প্রতি যথোপযুক্ত আস্থার অভাব) এবং সাম্প্রদায়িক কাঠামোর মধ্যে চিন্তা এই উভয়ই হলো প্রধান লক্ষণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার (পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের) সর্বত্র কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার পর্যালোচনা তো আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে হয়ইনি, উপরন্তু তার প্রচেষ্টা পর্যন্ত কেউ করেন নি। কিন্তু বর্তমান বাঙলাদেশ এবং ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের দিকে, বিশেষতঃ ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ইতিহাসের দিক তাকালে মনে হয়, উপরোক্ত দুই কুপ্রভাব স্থূলভাবে না হলেও অতি সূক্ষ্মভাবে কি পরিমাণে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অবক্ষয় সৃষ্টি করে বারবার তাকে বিভ্রান্ত করছে তার একটা হিসেব সেই পর্যালোচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদ, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন এবং সে বিষয়ের উল্লেখের জন্য অনেকে বিক্ষুব্ধ এবং ক্রোধান্বিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কতকগুলি মূল সমস্যার পর্যালোচনা ও চরিত্র উপলব্ধি এই পর্যালোচনা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়। সততা ও সাহসিকতার সাথে এই আত্মসমালোচনামূলক পর্যালোচনায় এগিয়ে আসতে কমিউনিষ্টরা যতদিন বিলম্ব করবেন ততদিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্তার অভ্যাস তাদের দূরীভূত হবে না এবং সাম্প্রদায়িকতা কত সূক্ষ্মভাবে, অচেতন ও আধা সচেতনভাবে, এদেশের প্রগতিশীল কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে ভেতর থেকে ছুরিকাঘাত করছে সেটাও তারা যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ সম্পর্কে এই আলোচনা আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে করি নাই। সামন্তবাদ, দেশিয় মুৎসুদ্দী পুজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে নানান ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতির সাথে এই আলোচ্য বিষয় যদি সম্পর্কহীন হতো তাহলে এই সমালোচনাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের পর্যায়েই ফেলা যেতো। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই আলোচনা বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোটেই অবান্তর অথবা অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপরন্তু অতিশয় সম্পর্কিত এবং প্রাসঙ্গিক।

'আনন্দমঠে যে বিষবৃক্ষের বীজ, রামরাজ্যবাদী গান্ধিজীর সমধর্মী আন্দোলনের (পাকিস্তান আন্দোলনের) মাধ্যমে তার পরিণতি ঘটে দেশ বিভাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের নারী চরিত্রে সামাজিক বিদ্রোহের আভাস আছে; কিন্তু আনন্দমঠের পর তাঁর রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কাহিনিগুলিতে যে-সব বীরাঙ্গনার আবির্ভাব ঘটে তাদের অনেকে অবাস্তব। তাদের ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝে অত্যন্ত পুরুষোচিত, অতীব বীরত্বব্যঞ্জক। শক্তির ধারিকা এই নায়িকারা হিন্দী সিনেমার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে বিভ্রান্ত রাজনীতি 'বন্দে মাতরম' গানের পেছনে, যে মনোভাবের ফলে মাতৃমূর্তির এত প্রচলন, সে রাজনীতি ও মনোভাব এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান বলে আজকাল রাস্তাঘাট 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে যখন-তখন মুখরিত হয়। কিন্তু এই মাতা অবাস্তব। একদিকে ছিলো সতীদাহ, অন্যদিকে মা নিয়ে আবেগ। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার বঙ্কিম চন্দ্রের বিরূপ সমালোচনা নকশাল পন্থীরা পর্যন্ত করেন নি।' (সমর সেন : বন্দে মাতরম। এক্ষণ : দশম বর্ষ। ১-৩ সংখ্যা, শারদীয় ১৯৭৯। পৃষ্ঠা, ৩৫-৩৬)।"[১১]

দশ

"...রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গান। এই গানে সাত কোটি সন্তানের কথা বলা হয়েছে, সেটাই ছিল তখনকার বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার জনসংখ্যা। তাই এটি সকলেরই গান হবার কথা। কিন্তু হয় নি। তার প্রথম কারণ হচ্ছে এর অন্তর্গত পৌত্তলিকতা, মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। মাতৃভূমিকে দুর্গা ও সরস্বতী হিসাবে কল্পনা করতে মুসলমানের তীব্র আপত্তি।

১১. বদরুদ্দীন উমর/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ। [মাওলা ব্রাদার্স - জুলাই, ১৯৭৪। পৃ. ৯২-৯৯]

'বন্দে মাতরম' 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অংশ হিসাবে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেলো বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়। ওই আন্দোলনের পথে একটি নির্দয় বক্রাঘাত হলো এই যে, ঐক্যবদ্ধ রাখতে গিয়ে তা মাতৃভূমিকে বিভাজনের পথে ঠেলে দিলো। তার কারণ সাম্প্রদায়িকতা, যে সাম্প্রদায়িকতা বন্দে মাতরমের মাতৃভক্তির দ্বারা উত্তেজিত হয়েছে। বন্দে মাতরমের বিপরীত ধ্বনি উঠেছে আল্লাহ্ আকবারের; এবং পরিণতিতে ভাগ হয়েছে বঙ্গদেশ।"[১০০]

এগারো

"...ধর্ম ও স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন বিসর্জন দেন তাদের 'শহীদ' বলে। কিন্তু এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব রক্ষার জন্য যারা জীবন দিতেন ইংরেজরা তাদেরও 'শহীদ' বলতেন। এবং তারা ঘটা করে এই সব তথাকথিত শহীদদের বড়ো বড় তৈলচিত্র ও নাম খোদাই করা পিতলের ফলক স্থান বিশেষে টাঙ্গিয়ে রাখতেন। এমনি কতকগুলো তৈলচিত্র ও একটি পিতলের ফলক সেকালে কোলকাতার আই. বি. অফিসের দেয়ালে টাঙ্গান ছিল। এ-সব ছবি ও খোদাই করা নামগুলো ছিল ঐ সব পুলিশ কর্মচারীদের যারা ইংরেজ-রাজত্ব রক্ষার্থে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। অবশ্য মাত্র ছবি টানিয়েই ইংরেজরা তাদের কর্তব্য শেষ করতেন না। তারা এ-জন্য তথাকথিত শহীদদের অসহায় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের এবং ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখারও ব্যবস্থা করে দিতেন। এমনকি ছেলেদের চাকরী ও মেয়েদের বিয়েও তারা দিয়ে দিতেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনটা হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে প্রধানত: হিন্দু অফিসারদেরই আই. বি.'তে নেওয়া হতো। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পলিসি ইংরেজরা ঠিকই ধরেছিলেন এবং এর পেছনে অজস্র টাকা খরচ করে কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছিলেন। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হলো না। তথাপি ইংরেজরা তাদের চেষ্টার ত্রুটি করেননি - যদিও তারা জানতেন বন্যার জোয়ার এলে কোন বাঁধ দিয়েই তাকে ঠেকান যায় না। তথাপি 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই প্রবাদ বাক্যটিও তারা বোধ হয় মেনে চলতেন।"[১০১]

বারো

'বিপ্লবীদের জীবনে গীতা'

'...পরাধীন ভারতে আমাদের দীনহীন জীবনে যিনি প্রথম মৃত্যুর গর্জন শুনিয়েছিলেন তিনি শহীদ ক্ষুদিরাম। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে এই কিশোর বিপ্লবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মৃত্যুকে তোমার ভয় করে না?' তিনি অকম্পিত কণ্ঠে বলেন, 'না, আমি মরতে ভয় পাই না। আমি গীতা পড়েছি।' বিদেশী শাসনে পদদলিত, আকণ্ঠ হীনম্মন্যতায় নিমজ্জিত ভারতবাসী যখন কাপুরুষের মতো ক্লীবের জীবন যাপন করছিল, তখন তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে আমাদের মনে আনলেন যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ। ক্ষুদিরামের বিচার ও ফাঁসি নিয়ে সারা দেশে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে, তাতে ভারতবাসীর সংবিৎ ফিরে এল। সত্যিই আমাদের দীন উদাসীন জীবনে তিনি যেন আনলেন মৃত্যুর গর্জন। তাতে উদ্বুদ্ধ হল, অনুপ্রেরণা পেল দেশের অগণিত তরুণ। নিজের জীবন দিয়ে তিনি জাগালেন সারা দেশকে- বিশেষ করে তরুণ সমাজকে। তারা জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশজননীর শৃঙ্খল মোচনে - জীবন উৎসর্গের শপথ নিয়ে তারা যোগ দিল বিপ্লবী সংগঠনে। বাংলা তথা ভারতের তরুণরা সেদিন এই প্রেরণা পেয়েছিল ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবন উৎসর্গ থেকে। বিশেষ করে ক্ষুদিরামের বিচার ও ফাঁসির বিবরণ তখনকার পত্র-পত্রিকায় যেন অগ্নি-আখরে লেখা হতে লাগল। সে আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। তরুণ সমাজ গোগ্রাসে গিলতে থাকে সেইসব বিবরণ। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' –লোককবির গান সুদূর অজ পাড়াগাঁয়েও তুলল কান্নার রোল। মায়ের শৃঙ্খল ভেঙে চুরমার করতে বাংলামায়ের ছেলেরা দলে দলে এগিয়ে এল আত্মবলিদানের শপথ নিয়ে।

১০০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/বাঙালীর জাতীয়তাবাদ। [ইউপিএল - ২০১১। পৃ. ৩৮৪]

১০১. আহসান উদ্দীন মোহাম্মদ (পুলিশ কর্মকর্তা)/সেকাল ও একাল। [প্রগতি - জানুয়ারি, ১৯৭৪। পৃ. ২৭৪-২৭৫]

এই কিশোর ক্ষুদিরাম কোথা থেকে পেলেন এই প্রচণ্ড শক্তি। কী করে নিজেকে নিঃশেষে দান করলেন ভারতের মুক্তিযজ্ঞে? তিনি তো হঠাৎ হুজুগে মেতে মজঃফরপুরে ছোটেননি অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে বোমা মারতে। আত্মোৎসর্গের আগে তিনি দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন। মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তৈরি করেছিলেন নিজের মনকে। প্রায় বালক বয়স থেকেই তিনি দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে নিবেদিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য। মজঃফরপুরে যাওয়ার আগেই তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন বিপ্লবীদের গোপন ইস্তাহার বিলি করতে। ধরা পড়েছিলেন তাঁর নিজের জেলা মেদিনীপুরে বাজেয়াপ্ত পত্রিকা 'সোনার বাংলা' সেখানকার যুবসমাজের মধ্যে প্রচারের সময়। বয়স কম বলেই বালক ক্ষুদিরাম তখন ছাড়া পান। বাংলার অগ্নিকিশোর আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরি করেছিলেন দুর্গম পথের অভিযানে - আত্মবলিদানের জন্য।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হলেন দুই ইংরেজ মহিলা। অত্যাচারী বিচারক কিংসফোর্ডের বদলে মারা গেলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। ধরা পড়ার পর যখন ক্ষুদিরামকে পুলিশের ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেন। মৃত্যুদণ্ডের পরও তিনি ছিলেন নির্ভীক, অচঞ্চল। অতুলনীয় তাঁর মনোবল। সে কথা লিখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখক :

'To a question by the lawyer Khudiram replied that he had no cause to fear. He had read the Gita perfectly well. There is no question of his pleading not guilty as he felt fully conscious of his responsibility in the matter and he was sorry that Kingsford was still alive and that two innocent ladies had been killed instead.' (Roll of Honour, Kalicharan Ghosh, p. 166)

দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্বিধাহীন চিত্তে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেলেন এই কিশোর। এই মনোবল, এই শক্তি তিনি গীতা থেকেই পেয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' (১৬-৮-১৯০৮) এবং সমকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় সে বিবরণ আছে।

এই ভগবদ গীতাই পরাধীন ভারতে তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে। বিশেষ করে গীতার কর্মযোগ পড়ে তরুণরা উদ্বুদ্ধ হতো দেশকে স্বাধীন করার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে গীতা অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। গীতার মন্ত্র বিপ্লবীদের নিষ্কাম কর্মে অনুপ্রাণিত করেছে, রাজনৈতিক হত্যাকে সাধারণ খুনের থেকে ভিন্ন বস্তু, আদর্শকৃত্য বলে ভাবার মানসিকতা দিয়েছে। সে যুগে গীতা পাঠ ছিল বিপ্লবীদের পক্ষে আবশ্যিক। কোনো কোনো বিপ্লবী সংস্থায় সদস্যদের মুণ্ডিত মস্তকে গীতা হাতে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হতো। বহু বিপ্লবী ও স্বাধীনতাসংগ্রামী তাদের জীবনে গীতার এই প্রভাবের কথা লিখেছেন।

ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, যুগান্তর দলের নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজী ও গীতা প্রভাবের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন : 'বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ও অনুশীলন সমিতিতে (৪১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট) গীতা ক্লাস নিতেন স্বামী সারদানন্দ। অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শকে কার্যকরী করবার জন্য। অনুশীলন সমিতিতে নানারকম শিক্ষা দেওয়া হত। শরীরচর্চার ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের ক্লাস হত, সখারাম গণেশ দেউস্কর ইতিহাস পড়াতেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি শেখাবার জন্য গীতা ক্লাস নিতেন সারদানন্দ।' (বিশ্ববিবেক, সম্পাদনা - অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর, পৃঃ ২৪৭) বিপ্লবীরা নিজেরাও পুলিশের কাছে তাঁদের বিবৃতিতে ও পরবর্তীকালে তাঁদের লেখায় গীতা পাঠের কথা বলেছেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখেছেন : 'নৈতিক উন্নতির জন্য সপ্তাহে একদিন (রবিবার) Moral class হইত। রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা, গীতা, চণ্ডী পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত।' (অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শ্রী জীবনতারা হালদার, পৃঃ ১১)

বিপ্লবীদের সংস্থা অনুশীলন সমিতিতে গীতার শিক্ষা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হত। সে কথাও লিখেছেন বিপ্লবী জীবনতারা হালদার : '...কারণ এই সমিতিতে যুবকদিগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সর্বোপরি এই সমিতিতেই একমাত্র গীতার মহৎ শিক্ষা সমুদয় অতিশয় নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত হইত। বিশেষতঃ গীতার 'নিষ্কাম কর্ম' ধ্যান ও ধারণার বস্তু হইয়াছিল। কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। কেবল 'মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পাতন।' এই জন্যই অনুশীলন সমিতির সফলতা বিস্ময়কর।' (ঐ, পৃ. ১১) বিপ্লবী মতিলাল রায়ও লিখেছেন : 'যুগান্তর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ভবানীমন্দির', 'বর্তমান রণনীতি' ও 'মুক্তি কোন পথে' —এই তিনখানি গ্রন্থ যেমন বৈপ্লবিক চিন্তা গঠনে সহায়ক হইল, তেমনি অন্য দিকে 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত', অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' ও কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত 'গীতা' হইল সংস্কৃতি রক্ষার আশ্রয়। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণাই বাংলার মর্মে ফুটিয়াছিল। বিধাতার বিধানে চন্দননগরই ক্রমে তাহার পীঠস্থানে পরিণত হইল।' (আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী, শ্রীমতিলাল রায়, পৃঃ ৭)

বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যে নিয়মিত গীতা ক্লাস ছিল, তা রোনাল্ডসে তাঁর 'দি হার্টস অফ আর্যবর্ত' গ্রন্থেও লিখেছেন। তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল : '...And in the 'Bhagabat Gita', the most widely treasured, perhaps, of all the sacred books of the Hindus, they (revolutionaries) found materials which, torn from its context, could be made to wear the appearance of giving sanction to deeds of violence. ...Such, in brief, is the 'Song of the Lord'. Its popularity in revolutionary circles, when the reason for that popularity is considered, provides one of the most tragic of the many examples with which the history of mankind abounds, of religious zeal perverted to irreligious ends. More than a dozen copies of the 'Gita' were found among the effects of the Dacca Anushilan Samity, when the Society was first proscribed and its premises searched in 1908; and there was evidence to show that special 'Gita' classes were regularly held there. The Juguntur newspaper, the most violent, perhaps, of all the revolutionary organs which had sooner or later to be suppressed, had as its motto the verse from the poem which declares the repeated incarnation of God for the protection of the good and the destruction of evildoers and members of the Society were required to take its vows with a sword and copy of the 'Gita' on the head, while the observance of certain ceremonies in which the 'Gita' played an essential part was customary when some revolutionary enterprise was about to be undertaken.' (The Hearts of Aryavarta, Earl of Ronaldsay, p. 25-16, 116).

বিশিষ্ট বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও বিপ্লবীদের চরিত্র গঠনের জন্য গীতা পাঠের কথা লিখেছেন। তাঁর ভাষায় : '১৯০৫ সালে আমি অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রে যোগ দিই। কলকাতার ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এই সমিতির অফিস ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ছিল। এটি দেশের ভাবী মুক্তিকামীদের প্রস্তুত করার কেন্দ্র ছিল। সারা বাংলায় এটির বহু শাখা গড়ে উঠেছিল। তখনও কিন্তু প্রধানতর প্লাবনীশক্তি ছিল বিবেকানন্দের। চরিত্রগঠন কর, মানুষ হও, সমাজসেবায় এগিয়ে পড়, দেশকে মা জ্ঞানে পূজা কর, সমাজের দুর্বলতা দূর কর, কেন্দ্রীভূত হও, অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হও। সমাজে যারা অনুন্নত, হীন, দরিদ্র, মুর্খ, নিপীড়িত তাদের সেবায় লেগে যাও। এ সবই স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া কর্মতালিকা। এর ওপর ছিল ঋষি বঙ্কিমের সত্য ধর্ম। প্রতি রবিবারে আমাদের moral class হত। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এখানে নীতিকথা, ইতিহাস, ধর্ম, চরিত্রগঠন, রাজনীতি, সেবাব্রত এবং দেশহিতৈষণার বিশেষ অনুষ্ঠান হত। স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারি আমাদের গীতা ক্লাস নিতেন।' (বিশ্ববিবেক, পৃ. ২৫৩)

আমাদের দেশে গীতাই বিপ্লববাদের বীজ বপণ করেছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ভারতে জাতীয় আন্দোলন গ্রন্থে লিখেছেন : 'বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীরা বাংলাদেশের সমিতিগুলির মাধ্যমে বালক ও যুবকদের সহিত ভাবচর্চা, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন। তাহাদের গীতা পড়াইয়া বুঝাইতেন আত্মা অমর, হত্যা পাপ নহে ইত্যাদি। এইভাবে বিপ্লবের বীজবপন হইল।

১৯০২ সালে অরবিন্দ যখন বাংলাদেশে আসেন, তখন তিনি মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে গীতা ও আর এক হাতে তরবারি দিয়া গুপ্ত সমিতির কার্যে দীক্ষা দেন। 'যুগান্তর' গীতার আদর্শে যুবকদের মৃত্যুভয়হীন করে তোলে। ...১৯০৬ সালের মার্চে অর্থাৎ বঙ্গচ্ছেদ হইবার পাঁচমাস পরে যুগান্তর নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা যুবকদিগকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করিতে দেখা গেল। যাহারা পড়িল তাহারা চমকিয়া উঠিল –ইহার ভাব ও ভাষা 'হিতবাদী' 'বঙ্গবাসী' 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক শক্তির দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে হইবে - ইহা পাপ কার্য নহে - গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন - আত্মা অমর এই শিক্ষা দিয়া যুগান্তর যুবকগণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করিবার চেষ্টা হইল; পরযুগে গান্ধীজীও অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন।' (ভারতে জাতীয় আন্দোলন, প্রভাতকুমার মুখখাপাধ্যায়, পৃঃ ১৪২, ২৪১)

অনুশীলন সমিতিতেও গীতা নিয়ে শপথ নিতে হত বিপ্লবীদের। সে কথা লিখেছেন বিপ্লবী ও বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস লেখক নলিনীকিশোর গুহ। তাঁর ভাষায়: 'এখানে অনুশীলনের গোড়াকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের নমুনা দিতেছি; এখানে পুলিনবাবু স্বীয় দীক্ষা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বর্ণনা করিতেছেন –'পি মিত্রের আদেশ মতে একদিন (কলিকাতায়) একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি মিত্রের বাড়িতে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবেদ্য পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম - আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইলেন - উভয়হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি মিত্রকে নমস্কার করিলাম। (বাংলার বিপ্লববাদ, শ্রী নলিনীকিশোর গুহ, পৃঃ ২২)।' কলকাতার মতো ঢাকাতেও এইভাবেই গীতা নিয়ে শপথ নিতে হত বিপ্লবীদের। পুলিনবাবু বলেন : 'পি মিত্র যে পদ্ধতিতে আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন, গুপ্ত চক্রের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমিও অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার বাসায় দীক্ষা দিতাম। একসঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিতে হইলে ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ও নির্জন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। অর্থাৎ সংযম উপবাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে কালীমূর্তির নিকট আলীঢ়াসনে বসাইয়া গীতা ও অসি ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতাম।' ...পুলিনবাবু দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকে পর্যায়ক্রমে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত কাঁচা দুগ্ধ সেবন করিতে দিতেন। এই সকল প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিতে বঙ্কিমের আনন্দমঠের অনুকরণ লক্ষ্য করবার।' (বাংলার বিপ্লববাদ, নলিনীকিশোর গুহ, পৃ. ২২, ৭৮)

গীতা পড়ে কীভাবে বিপ্লবীরা নিষ্কাম কর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতেন, তা লিখেছেন একজন বিপ্লবী - গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। তাঁর স্মৃতিকথা আছে তাঁর 'অবিস্মরণীয়' গ্রন্থে : 'আজ মনে পড়ে বৈপ্লবিক কর্মধারার কাল-বিস্তৃত চেতনার প্রতিফলনে রঙিন কৈশোরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মৌল পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দিনগুলি। মৃত্যুর জন্যে সব সময় তৈরি থাকায় সে কী দুঃসাধ্য সাধনা। কর্মে আনন্দই এখন অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিচয়। মনে হত এ উৎসাহ, এ উদ্যম, এ স্পর্ধা, কাল-তিরোহিত চিন্ময়ীশক্তির এষণা - প্রাণের কেন্দ্র থেকে প্রকাশমান। হৃদয়াবেগের প্রমত্ততায় স্বপ্নের মত সেদিনগুলো আজও মনে পড়ে। সেদিন বিপ্লবের আদর্শ মাথায় ঢুকিয়েছিল দেশজননী জগৎজননীর বরাভয় মৃন্ময় মূর্তি। গীতার জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্বের মধ্য থেকে পেয়েছিলাম সংসার কুরুক্ষেত্রে প্রাণ-পীড়িতের একমাত্র শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ধর্মযুদ্ধ; মুক্তি উপাস্য কর্তব্য নিরাসক্ত নিষ্কাম কর্ম বিশুদ্ধ প্রেম - জয় পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর। চণ্ডী ও গীতার পথই একমাত্র পথ - জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ মায়া মরীচিকামাত্র। সেই সংগতি ও অসংগতির মধ্যে মনের গভীরতম উপলব্ধির পথের সন্ধানে শক্তির নিরলস উদ্যমে, আত্মদানযজ্ঞের হোমাগ্নিবেদীতলে, সর্ব সমর্পণের পরমৈশ্বর্যে যাঁরা পথ দেখিয়ে আমাকে কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে আশ্চর্য নৈপুণ্যে এসে দাঁড় করিয়েছিলেন –দেখিয়েছিলেন মৃত্যুর সামনে অফুরন্ত হাসাধারা, তাঁরা বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত,

প্রাণশক্তিতে আচ্ছন্ন আবৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ...বেনারসের মদনপুরায় শ্রীসুশীলচন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়াবার জন্য বহু খোঁজ করেও পুলিশের কর্তারা সফল হননি। ১৯১৮ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ-এ ধরা পড়লেন। তাঁর বাসা তল্লাশি করে দুটি রিভলবার ও পাশের ঘর থেকে দুশো কার্তুজ পাওয়া গেল। তার কদিন আগে ৯ই ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌ-এর খাসিয়ারী মণ্ডির রাজপথে দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক বিনায়ক রাও কাপলে ওরফে সত্যেন ওরফে বড়বাবুর মৃতদেহ। ৬ই মে, শ্রী সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলায় পাঁচ বছরের জেল ও এক হাজার টাকার জরিমানা হয়। আপীল অগ্রাহ্য হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কাপলের হত্যাকাণ্ড জড়িয়ে তাঁর ও অন্য একজন পলাতকের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা আনলেন। ১৯১৮ সালে ১৭ই জুলাই তাঁর ও সেই পলাতকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হল। বিচারে ১১ই আগস্ট তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। তিনি গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে উঠলেন ফাঁসির মঞ্চে। মুখে শুধু হাসি।' (অবিস্মরণীয়, ১ম খণ্ড, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, পৃঃ ৮৯, ১২৬-১২৭)।

এ ধরনের নজির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামে কত যে আছে তার হিসাব নেই। কিছু কিছু মাত্র উল্লেখ করলাম। গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবীরা দলে দলে এগিয়ে গেছেন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। এই সাহস আমাদের কাপুরুষতার অবসান ঘটিয়েছে। তাঁদের মন্ত্র ছিল : 'মোরা আপনি মরে মরার দেশে, আনব বরাভয়'। যে সব বিপ্লবাদী লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, তাঁরাও জানতেন গীতার বাণী। এজন্য নিয়মিত ক্লাস হতো, যা আগে লিখেছি। বাংলার বিপ্লববাদ গ্রন্থে বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহও তাই লিখেছেন : 'বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনায় তাহারা জাতীয়তার সন্ধান বিশেষ করিয়া পাইত। যে বিপ্লববাদী লেখাপড়া তেমন জানে না –সেও দেশের অনেকখানি ইতিহাস, দেশের অনেকখানি সাধনার কথা ও বিদেশের অনেক বিপ্লবের খবর রাখিত। পৃথিবীর বিপ্লববাদীদের চিন্তাধারার সহিত তাহারা ঐ ধরনের সাহিত্য ও নানা আলোচনার ভিতর দিয়া যুক্ত হইয়াছিল। এসব বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষিত লোক হইতে অনেক বেশি ছিল। তবে পল্লবগ্রাহিতা প্রভৃতি দোষ যে ছিল না তাহা নহে। সাধারণ বিপ্লববাদীর পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণত দেশবিদেশের ইতিহাস, বিপ্লববাদীদের জীবনী, বিপ্লব সাহিত্য, ফরাসী-বিপ্লব ও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ, যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণী সংক্রান্ত পুস্তক, কর্মী ও ত্যাগীদের জীবনী, প্রচুর ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি স্থান পাইত। একপাশে গীতা, উপনিষদ, অপর পাশে রুশবিপ্লবের ইতিহাস। নিষিদ্ধ পুস্তক তাহারা সযত্নে রক্ষা করিত।' (পৃঃ ৭৪)।

বিপ্লবীদের পাঠ্য বইয়ে গীতা ছিল। আরও অনেক বিপ্লবীর লেখায় তা পাই। বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'আমরা ভগবদগীতা, স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, সখারাম গণেশ দেউর রচিত দেশের কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রচনাবলী এবং ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার নিহিলিজম, ইতালির কারবোনারি আন্দোলন, আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহ, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিতাম ও তাহা নিয়া আলোচনা করিতাম। আমরা সিপাহীবিদ্রোহ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, রাণা প্রতাপ প্রভৃতির জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি এবং যুগান্তরে প্রকাশিত 'মুক্তি কোন্ পথে', ও 'বর্তমান রণনীতি' নামক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতাম।' (স্বাধীনতার সন্ধানে, শ্রী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮)

বিপ্লবীদের উপর গীতার প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল এইসব উদ্ধৃতি থেকে তা পরিষ্কার। এ নিয়ে আর উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে সরকারী আমলা ও গোয়েন্দারা এ সম্পর্কে কী বলেছেন উদ্ধৃতিসহ তা আলোচনা করছি। গীতা বাজেয়াপ্ত না হলেও পুলিশের বিপজ্জনক গ্রন্থের তালিকায় গীতা ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রখ্যাত ইতিহাসকার কালীচরণ ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'Bhagabat Gita was listed by police as a highly seditious literature and cases were not rare the sacred book of Hindus was taken by police in course of search for dangerous weapons and seditious literature.' (Roll of Honour, Kalicharan Ghosh, p. 70)

বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর গীতার এই প্রভাবের তথ্য পাই গোপন সরকারী নথি থেকেও। বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' বিংশ শতাব্দীর গোড়া (১৯০৮) থেকেই বের হয়। তাতে ও অন্যান্য ইস্তাহারে বিস্তৃতভাবে গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করা হত। 'The lea ets, like the writings in the Yugantar paper, were religious in tone and quoted largely from Gita. Several of them clearly showed the in uence of Ananda Math. One lea et had the following at the bottom. 'Satyananda, Ananda Math, Himalaya'. Two leaflets gave an easy recipe from the preparation of bombs and death with explosives and shells.' (Freedom Movement paper No. 64, State Archives, Writers' Buildings, West Bengal Government.) ওই প্রতিবেদনে আরও আছে, অধিকাংশ গোপন ইস্তাহার, লিফলেট, পুস্তিকা শুরু হত গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। 'Most of the leaflets commenced with quotations from the Gita or with the well-known line from the Upanishad - Arise, awake and be enlightened having received the boom.' (ibid)

বিপ্লবীদের অনেক কেন্দ্রেই বোমা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে 'গীতা' অধ্যয়নও চলতো। গোপন সরকারী নথিতে মানিকতলার বিপ্লবীদের আখড়া সম্পর্কে সেই তথ্যই আছে : 'Enquiry in connection with Manicktala garden Ashram of Aurobinda and Barindra, revealed that it is a semi-religious institution where they combined the study of Gita with the preparation of bombs, explosives and revolver practice. Upen Bannerjee, before he joined the same Ashram, wandered about India as sannyasi to find out similar Ashram. Jatin Bannerjee alias Niralamba-Swami, a revolutionary, travelled throughout Northern India as wandering Sadhu.' (Papers collected by the State Committee for compilation of History of Freedom in India, Bengal region, paper No.49, State Archives, Writers' Buildings, West Bengal Government.)

সে যুগে ভগবদ্গীতা যে বিপ্লবীদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ ছিল, সে কথা বলা হয়েছে সিডিশন রিপোর্টেও। ১৯১৭ সালে বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত রাউলাট কমিটি বা সিডিশন কমিটির রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য আছে : 'নিজেদের মত দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁদের পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল।' ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দের রচনা এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনকথা। (অনূদিত) (Sedition Committee's Report, p. 25).

পদস্থ প্রশাসক জেমস ক্যাম্বেল কারও গীতার এই প্রভাবের কথা লিখেছেন। তিনি কেবল মুক্তিসংগ্রামীদের উপর গীতার প্রভাবের কথাই বলেননি, বিপ্লবীদের সংস্থায় গীতা কত জনপ্রিয় ছিল সে তথ্যও দিয়েছেন। 'Political trouble in India' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : 'এই পরিচ্ছেদে যেসব বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন তল্লাসিতে এই প্রতিটি বইয়ের অনেকগুলি কপি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঢাকার অনুশীলন সমিতির কয়েক শত বই আছে এবং ওখানে পাওয়া বই ইস্যুর এক তালিকা থেকে এইসব বইয়ের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে। সহজেই প্রথম প্রিয় বইটি হচ্ছে 'জালিয়াৎ ক্লাইভ', যা ওই সময়ের মধ্যে ১৩ বার নেওয়া হয়েছিল। বইটির চরিত্র জানার পক্ষে এর নামই যথেষ্ট। যার উদ্দেশ্য, এটাই দেখানো যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়েছে জালিয়াতির মাধ্যমে। যেসব তরুণ অনুশীলন সমিতির লাইব্রেরী থেকে এই বইটি নেন, তাদের একজন বই ইস্যুর রেজিস্টারে সই করেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র চাকি বলে। মজঃফরপুরের খুনীদের একজনের নাম গ্রহণে দেখা যাচ্ছে, তিনি কি ভাবছেন, যখন তিনি ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিনগুলি সম্পর্কে পড়াশুনা করছেন। এই ধরনের আর একটি বই 'মহারাজ নন্দকুমার'ও বহুবার লাইব্রেরী থেকে ইস্যু হয়েছে। এই বইটিও একই কারণে জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঠকদের কাছে এর পরই জনপ্রিয় ছিল রাণা প্রতাপের জীবনী। বইটি ১৯০৬ সালে ছাপা হয়। বইটি বাংলার ছাত্রসমাজকে উৎসর্গ করা হয় এই আশায় যে, নিজের মাতৃভূমির জন্য প্রতাপ যেমন বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, তাঁরাও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন। পাঠকদের কাছে সমান প্রিয় ছিল 'শিখের বলিদান' ও 'ভগবদ্গীতা'। প্রতিটি বই ওই সময় ৮ বার করে ইস্যু হয়েছিল।

প্রায় একই রকম জনপ্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। যা ৬ বার ইস্যু হয়েছিল ওই সময়ে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য এবং তরুণ বিপ্লবীদের কাছে সবচেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টি করেছিল 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি। সহজেই দেখা যায়, এইসব পুস্তক পাঠে কীভাবে একজন যুবককে সহজে ও সরাসরি ধর্ম ও দর্শনের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ থেকে রিভলবার ও বোমা ব্যবহারে নিয়ে যেত।' (ভাবানুবাদ - James Campbell Ker, I.C.S. Political trouble in India (1907-1917), p. 4) বিপ্লবীদের উপর 'গীতা'র কত প্রভাব ছিল, সে সম্পর্কে লিখেছেন জেমস ক্যাম্বেল তাঁর ওই গ্রন্থে। তাঁর ওই গ্রন্থেই আছে যে, ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাঠাগারে শুধু গীতাই ছিল ১৭ খণ্ড। মানিকতলার বিপ্লবীদের আস্তানা থেকেও ৩ কপি গীতা পাওয়া যায়। 'বিপ্লবীদের বইপত্রে যে দুটি ধর্মগ্রন্থ প্রাধান্য পেত, তা হল ভগবদ্গীতা ও চণ্ডী। ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে ১৭ খানা গীতা মানিকতলার বাগানে ৪টি চণ্ডী ও ৩টি গীতাগ্রন্থ পাওয়া যায়।' (অনূদিত — Political trouble in India, James Campbell Ker, I.C.S. (১৯০৭-১৯১৭) p.৪৪).

এ জন্যই গীতা হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হয়েও পুলিশের চোখে বোমা রিভলবারের মতোই বিপজ্জনক বস্তু হয়ে ওঠে। পুলিশ বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন ঘাঁটিতে হানা দেবার সময় যখনই 'গীতা' পেয়েছে আটক করেছে। যদিও এই পবিত্র গ্রন্থটিকে তারা সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি। এ সম্পর্কে বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ তাঁর বিখ্যাত 'Roll of Honour' গ্রন্থে লিখেছেন : 'বইপত্র নিষিদ্ধ হত প্রায়ই। কর্তৃপক্ষ যখনই নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করতে পারতেন, তখনই বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত। লঘু অভিনব ভারতকথা (সাভারকরের মারাঠী কবিতা), মুক্তি কোন পথে, বর্তমান রণনীতি, ভবানী মন্দির, স্বাধীনতার ইতিহাস, ম্যাসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, দেশের কথা (বাংলা) প্রভৃতি গ্রন্থের উপর বিশেষ নজর রাখা হত। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, অনলপ্রবাহ, নব উদ্দীপন, রণজিতের জীবনযজ্ঞ প্রভৃতি গ্রন্থও এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। পুলিশের তালিকায় ভগবৎ গীতা অত্যন্ত বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থ। এবং এমন ঘটনা কম নয় যে, বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র ও বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থের খোঁজে তল্লাসির সময় পুলিশ হিন্দুদের এই পবিত্র গ্রন্থটি আটক করেছে। (অনূদিত)

সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মুক্তিসংগ্রামীরা। স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন গীতার আদর্শের কথা দেশে ও বিদেশে। গীতার ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে, তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখও। দেশকে স্বাধীন করার প্রেরণা পেল যুবসমাজ গীতা থেকেও। গীতার প্রচারিত বাণী ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হল দেশের মানুষ। মৃত্যুকে তুচ্ছ করার সাহস পেল। এগিয়ে গেল সব বাধাবিঘ্ন চুরমার করে দেশজননীর শৃঙ্খল মোচনে। গীতার এই প্রভাবের কথা লিখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীচরণ ঘোষ। গীতার প্রভাব সম্পর্কে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখক ও বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থে (দি রোল অফ অনার, পৃ ১২৭) আরও লিখেছেন : 'স্বাধীনতার জন্য যখন কোনো জাতি সর্বপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে জাতি শুধু নতুন নতুন উৎস থেকেই উদ্বুদ্ধ হয় না, সে তখন অনুপ্রেরণার জন্য পুরাতন ঐতিহ্যের দিকেও ঝোঁকে। 'গীতা' কত হাজার বছরের যে প্রাচীন, তা কেউ সুস্পষ্ট করে বলতে পারে না। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে গীতাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও শিক্ষার আকর বলে গণ্য করা হয়। জাতীয় নবজাগরণের পটভূমিতে জাগ্রত বাংলা এই গ্রন্থটির নব মূল্যায়ন করল। কর্মযোগ এবং সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়ার আলোক বর্তিকা হয়ে উঠল গীতা। গীতা মানুষকে বিরামহীন, নিরবচ্ছিন্ন কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করে। যোদ্ধাকে অনুপ্রাণিত করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। গীতায় আছে সজ্জনদের রক্ষা ও দুর্জনদের বিনাশের কথা। (সাধুদের রক্ষার জন্য দুষ্টদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।) নিষ্কাম কর্মের আহ্বান জানিয়ে গীতায় বলা হয়েছে : কর্মত্যাগ কর না, নিষ্কাম কর্মে আত্মনিয়োগ কর। শ্রীঅরবিন্দ গীতাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর গ্রন্থে (এসেস অন দি গীতা) আছে কর্মে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান। ভারতের তিলকই প্রথম গীতার শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র করেন। তিনি বলেন, শুধু রাজনৈতিক মনকে নয়, জনগণের আত্মাকে জাগাতে হলে ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের যোগসাধন দরকার। এ কাজে গীতার চেয়ে কার্যকর ভূমিকা অন্য কোনো গ্রন্থ নিতে পারে না। গীতায় বলা হয়েছে, সংগ্রামীদের সঙ্গে আছেন ঈশ্বর, মানুষ নিমিত্ত মাত্র।

(আমার দ্বারা ইহারা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র।) এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিপ্লবীদের সংগঠন 'যুগান্তর' শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে তাদের মটো হিসাবে নিয়েছিল। এবং ভারতে বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য যে কোনো গ্রন্থের চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল গীতা।' [ভাবানুবাদ] (দি রোল অফ অনার, পৃ. ১২৮)।

বিপ্লবী সংগঠনগুলি এবং অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও অনুপ্রেরণা পান গীতা থেকে। বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের বিপুল সাফল্যও এদেশের তরুণদের অনুপ্রেরণা জোগায়। শিকাগোর এই সম্মেলনে স্বামীজী গীতার আদর্শের কথাই বলেছিলেন। গীতার দর্শন প্রয়োজন ছিল বিপ্লবীদের। বিপ্লবীদের অনেক সময় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে হত। অথচ তাঁরা ছিলেন মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষ। এক্ষেত্রে এমন একটা দর্শন দরকার ছিল যা তাঁদের মনকে গ্লানিমুক্ত রাখতে পারে। তা হল গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শ। ঈশ্বরে সব কর্মফল অর্পণ করে যেমন কর্মযোগ কাজ করে যান, সেইভাবে বিপ্লবী ঈশ্বরে ও দেশমাতৃকার কর্মফল অর্পণ করে কর্মসাধনে অগ্রসর হতেন। অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন : 'বিপ্লবীরা বিশেষতঃ বাংলাদেশের বিপ্লবীরা বিবেকানন্দের কর্মযোগকে জীবনাদর্শের উৎস গ্রন্থ বিবেচনা করতেন। তাঁদের একজন নিজের মতের পক্ষে সেই গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন : 'তোমরা কেউ কেউ ভগবদ্গীতা পড়েছ। পাশ্চাত্যদেশে তোমরা অনেকেই বোধহয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে বিস্মিত হয়েছ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভণ্ড ও কাপুরুষ বলেছেন, কেননা অর্জুন তাঁর বিপক্ষে বন্ধু ও আত্মীয়রা সমবেত বলে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর অজুহাত -অপ্রতিকারই সর্বাপেক্ষা প্রেমাদর্শ। এখানে একটি মস্ত শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে -দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্ত প্রায় একই রকম দেখতে - চূড়ান্ত অস্তি ও চূড়ান্ত নাস্তি আকারে সদৃশ। আলোক স্পন্দন অতি মৃদু হলে তা আমরা দেখতে পাই না, অতি দ্রুত হলেও নয়। শব্দের ক্ষেত্রেও তাই সত্য –অতি নিম্নগ্রাম বা অতি উচ্চগ্রাম কোনো ক্ষেত্রেই শব্দ শোনা যায় না। প্রতিকার বা অপ্রতিকারের ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখা যায়।' স্বামীজী আরও লিখেছেন : 'দেখা গেল কোনো একজন প্রতিরোধ করছে না, যেহেতু সে অলস, দুর্বল: বস্তুত সে প্রতিকারে অসমর্থ। আর একজন জানে যে, সে ইচ্ছা করলেই দুর্নিবার আঘাত হানতে পারে, কিন্তু সে শত্রুকে আঘাত নয়, আশীর্বাদ করছে। যে লোকটি দুর্বলতার কারণে অশুভের প্রতিরোধ করল না, সে পাপ করল, সে তার 'অপ্রতিকার' থেকে কোনো সুফলই পেল না। অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রতিরোধ করতে চায়, সে পাপ করবে। বুদ্ধ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করেছিলেন, যথার্থ তাঁর ত্যাগ, কিন্তু নিঃস্ব ভিখারীর ত্যাগের কোনো কথাই ওঠে না। সুতরাং অপ্রতিকার বা প্রেমের আদর্শ ইত্যাদির কথা বলবার সময় আমাদের সর্বদাই সাবধান হতে হবে। আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে অপ্রতিরোধের শক্তি আমাদের আছে কি না? সেই শক্তি যদি থাকে, তখন ত্যাগ করলে বা অপ্রতিরোধ করলে আমরা বিরাট প্রেমের আদর্শ দেখাব। কিন্তু যদি অপ্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে, অথচ আত্মপ্রতারণা করে ভাবি যে, আমরা সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শের দ্বারা চালিত, সেক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো আচরণই করছি। অর্জুন বিপক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী সৈন্য সমাবেশ দেখে ভীরু হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর তথাকথিত 'প্রেম' তাঁকে দেশ ও রাজার সম্বন্ধে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভণ্ড বলেন : 'তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছ, অথচ কাজ করছ কাপুরুষের মতো। ওঠো, দাঁড়াও, যুদ্ধ করো।' (বিপ্লবী স্বামীজীর যে রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন তা স্বামীজীর 'কমপ্লিট ওয়ার্কস'-এর (১৯৫৭) ২য় খণ্ডের ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায় আছে –দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৭ম খণ্ড, শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ২৪-২৫)

আমাদের দেশের সেরা বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে আমাদের পৌঁছে দেন স্বাধীনতার তোরণদ্বারে, তিনি তো নিজেই বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।' নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করতে এই মৃত্যুপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনিও 'গীতা' 'চণ্ডী' পাঠ করতেন নিজের মনকে তৈরি করতে, আত্মবিশ্বাস ও শক্তি সংগ্রহের জন্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে

চরম আঘাত হানতে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশত্যাগ করেন। সেই মহানিষ্ক্রমণের সময় তিনি অনুপ্রেরণার জন্য গীতা পড়তেন, তখন গীতা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি তিনি কলকাতার এলগিন রোডের বাসভবন থেকে ধুরন্ধর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হন। এক মাসের বেশি (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ থেকে) তিনি ওই বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন, তখন গীতা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস লেখক সুভাষচন্দ্রের তখনকার দিনগুলির যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে আছে, তাঁর সঙ্গে সবসময় গীতা থাকত। 'Subhas kept himself strictly confined within his room, gradually refusing to see anybody including his nearest relations. Food was given outside a screen where from he would take his plate at his convenience and put it in the same place when finished. One or two persons who were privileged to see him during this period wondered at the beard that he had grown round his hitherto clean shaven face, looking rather thin, with one copy each of the Gita and Chandi on his either side. He would reply, if enquired that due to his aunt's death, he was in a state of mourning and would not as a devout Hindu, shave. With a friend, called to his presence from time to time after nightfall, he used to discuss matters of grave important details of a plan of work to be carried on in his absence.' (The Roll of Honour,K.C. Ghosh,p. 387)

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে রণাঙ্গনে যখন শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতেন, তখনও তাঁর পকেটে নাকি একটা 'গীতা' থাকত। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়ক এস এ আয়ার এবং আরও অনেকের লেখায় সে তথ্য আছে। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার মন্ত্রী এস এ আয়ার তাঁর 'স্টোরি অফ দি আই এন এ' গ্রন্থে লিখেছেন : 'সন্দেহ নেই, ২৩ বছর বয়স থেকেই তিনি রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার আবর্তের মধ্যে ডুবে ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনের গভীরে যে আধ্যাত্মিকতার ঝড় প্রবহমান ছিল, তা কোনদিনই শান্ত হয়নি। ভগবদগীতার মধ্যেই তিনি পেয়েছেন শক্তি, পেয়েছেন সান্ত্বনা, প্রতি রাত্রেই ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি গীতা পাঠ করে নিতেন, দিনের ২৪ ঘণ্টা তিনি গীতার নির্দেশ অনুযায়ী চলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। রাজনীতির প্রয়োজনে তিনি সর্বক্ষণ কাটাতেন জনতার মধ্যে, কিন্তু এটা হল বাইরের পরিচয়। তাঁর অন্তপ্রকৃতি চেয়েছে নিঃসঙ্গতা, চেয়েছে ঈশ্বরের চেয়ে আত্মার একাগ্রতা। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করতেন, কিন্তু মঞ্চ থেকে নেমে এসেই তিনি একাকীত্বের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন, কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলতে চাইতেন না। পূর্ব এশিয়ায় যখন ছিলেন, দেখা গিয়েছে হয়তো ডিনারের পর তিনি হালকা চালে কাউকে কাছে ডেকে এনে বসিয়েছেন, কিন্তু আবার দেখা গেছে পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেলেও সঙ্গীর সঙ্গে তিনি দু-একটির বেশি কথা বলতেন না। লোকসান্নিধ্যের জন্য নয়, ভগবৎচিন্তার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল নৈঃশব্দ্যের। এই সময়টিতেই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নতুন প্রাণসঞ্চার করে নিতেন এবং জাগতিক নানা সমস্যার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি বাড়িয়ে তুলতেন। দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল রাত দুটো বা তিনটে, যখন তিনি ঘুমোতে যেতেন। ঘুমোত যাবার আগে প্রতি রাত্রেই গীতা পাঠ করে নিতেন। সারাদিন বিরামহীন কর্মের শেষে এই যে আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা, তার ফলস্বরূপ সকালে গাত্রোত্থানের ফলে দেখা যেত, তাঁর মুখমণ্ডল থেকে শক্তি ও প্রশান্তির দীপ্তি বিকশিত হয়ে চলেছে। সিঙ্গাপুরে এটা নিয়মিত ব্যাপার ছিল, অনেক রাত হলেও তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠাতেন, অথবা নিজেই আশ্রমে চলে যেতেন, সিল্কের ধুতি পরে নগ্ন গাত্র সুভাষ বন্ধ ঘরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং পরের দিনের কর্মব্যস্ত জীবন শুরু করার আগে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার জন্য নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতেন। তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও আধ্যাত্মিক চিন্তা পাশাপাশি চলেছে, একটি অন্যটিকে কোনক্রমেই ব্যাহত করেনি। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলেও বাস্তবে তা ছিল না। মূলতঃ তিনি ছিলেন কর্মযোগী এবং কর্মযোগীর মতোই তিনি গীতার নির্দেশগুলিকে কাজে রূপ দিয়ে এসেছেন। বাইরের পৃথিবীর কাছে তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন রাজনীতিক, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী। ফলাফলের দিকে দৃকপাত না করে ভগবানের ওপর পূর্ণতম বিশ্বাস রেখে

কাজ করে যাওয়ার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন গীতার কর্মযোগ থেকেই। (আজাদ হিন্দ ফৌজ, এস এ আয়ার, পৃঃ ১৩৩-১৩৪, মূল ইংরাজি — Story of the I.N.A')।[১০২]

তেরো

'...মালাবারের মোপলা-বিদ্রোহের কথা সকলেরই মনে আছে। এই মোপলা-বিদ্রোহটা ছিল সত্যকারভাবে তথাকথিত অত্যাচারী ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ, আর এই কৃষক-বিদ্রোহ কিন্তু মালাবারে একবার হয়নি। গত বিদ্রোহের পূর্বে এমন বিদ্রোহ আরো পঁয়ত্রিশবার সেখানে হয়ে গেছে। মোপলা কৃষকেরা সবই মুসলমান, আর ওখানকার ভূম্যধিকারীরা প্রায় সবাই হিন্দু। কাজেই, কৃষক আর ভূম্যধিকারীতে যে সংঘাত বাধলো সেটা আর একদিক থেকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ হয়ে পড়লো। ডাক্তার মুঞ্জে এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলেন যে, এটা নিছক হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক একথাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বিদ্রোহের সময় দু'একজন মাত্র যে মুসলমান জমিদার ছিলেন তারাও বিদ্রোহীদের হাত থেকে রেহাই পাননি। একটা গন্ডির ভিতরে থেকে থেকে এ সকল লোকের মন এতই ছোট হয়ে গেছে যে তারা সব জিনিসের ভিতরেই ধর্মগত পার্থক্য দেখতে পান। হাজীপুরে হিন্দুতে হিন্দুতে যে ঝগড়া হ'ল সেটাও এ শ্রেণীর লোকের কৃপায় হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। তারপরে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের হিন্দু-মুসলমান তাঁতি একসঙ্গে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল তাদের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্যে, কিন্তু, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেটাকেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বলে প্রচার করতে ছাড়লেন না। হিন্দু তাঁতিও যে মুসলমান তাঁতির সহিত একত্রে ধর্মঘট করেছিল একথা 'আনন্দবাজার পত্রিকা গোপন করে রেখে বললেন যে মিলের মালিকরা কেবলমাত্র হিন্দু বলেই মুসলমান তাঁতিরা সাম্প্রদায়িক বৈর-নির্যাতনের জন্যে ধর্মঘট করেছিল।

হিন্দুদের তরফ থেকে বরাবর বলা হচ্ছিল যে, মুসলমানদের কোনো ভৌগোলিক দেশাত্মবোধ নেই, তারা 'প্যান ইস্লামিজম'-এর স্বপ্ন দেখে থাকেন। এ দেশাত্মবোধ না থাকা আর 'প্যান ইস্লামিজম'-এর স্বপ্ন দেখাকে হিন্দুদের তরফ থেকে বরাবর খারাব বলা হয়েছে। মজা এই হয়েছে যে, যে জন্যে তারা মুসলমানদের অভিযুক্ত করেছিলেন সেই অভিযোগে এখন তারা নিজেরাও অভিযুক্ত হয়েছেন। 'হিন্দু মহাসভা এখন 'প্যান হিন্দুইজম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দু নেই। তাই তারা বৌদ্ধদের নিজেদের দলভুক্ত করে বৌদ্ধ চীন ও জাপানের সহিত বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করছেন। এ হিন্দু-মহাসভার নেতা লালা লাজপৎ রায় ও মিঃ কেলকার বলেছেন —মুসলমানদিগকে বাদ দিয়ে, তাদের কোনো সাহায্য না নিয়েও তারা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। আর সকলকে বাদ দিয়ে তারা যদি একা একা স্বরাজ লাভ করতে পারেন তা হলে সেটা শুধু তাদেরই স্বরাজ লাভ হবে, ভারতের স্বরাজ লাভ হবে না।

...উনিশ শ' ত্রিশের দশকের শেষার্ধে দীর্ঘ কারাবাসের পরে বেশ কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ভেঙে পড়লেন। অর্থাৎ তারা স্থির করলেন, কোনো রকম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় তারা আর থাকবেন না। যাঁদের ভিতরকার বিপ্লবের আগুন তখনও নেভেনি এবং মার্কসীয় সাহিত্য অধ্যয়নের দ্বারা তার তেজ তারা আরও অনেকগুণ বাড়িয়েছেন, বন্দীদশা হতে মুক্তি পাওয়ার পরে তারা দলে দলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরে ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত গবর্নমেন্টের দ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। যারা সন্ত্রাসবাদী ছিলেন তাঁরা প্রবল বিপদের ঝুঁকি নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে এলেন।

এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু আগেকার ইতিহাস আমার বিবৃত করা দরকার। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বাঙলা দেশে উনিশ শ' চার-পাঁচ সালে অভ্যুদয় হয়েছিল। কেউ কেউ উনিশ শ' দু' সালও বলে থাকেন।

---

১০২. শিশির কর/বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী ॥ [আনন্দ পাবলিশার্স (কলকাতা) - জানুয়ারি, ১৯৯২। পৃ. ৫৪-৬৫]

এই বিপ্লবীরা নিজেদের এই ভাবে 'বিপ্লবী' নামে প্রচার করেন যে যেন তারাই একমাত্র বিপ্লবী, আর কেউ নন। শ্রেণী বিশ্লেষণের দিকে তাঁরা যান না। তাদের বিপ্লবে কোন্ সামাজিক পরিবর্তন আসবে সে কথাও তাদের দ্বারা কোনো দিন উচ্চারিত হয়নি। কমিউনিস্ট যাঁরা হয়েছেন তাদের কথা আমি বলছি না, অন্যরা 'সন্ত্রাসবাদী' নামে অভিহিত হতে ভালবাসেন না। অথচ তারা অন্য কোনো বিশেষণ নিজেদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করতেও চান না। তাদের বিপ্লব কোন্ সামাজিক পরিবর্তন আনবে সে কথা না বলেও তারাই 'একচেটিয়া বিপ্লবী'– তাঁদের এই আবদার কে মানবে? সরকারী দফতর তাদের 'এনার্কিস্ট' 'টেররিস্ট' ও 'বিপ্লবী' বলেছেন। 'টেররিস্ট'-দের মধ্যেও কেউ কেউ পুঁথিপুস্তক লিখতে গিয়ে নিজেদের টেররিস্ট বলেছেন। তারা যদি নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী' বলতেন তবে আমি সে নামেই তাদের ডাকতাম।

এখন আমি অন্য কথায় আসি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। এই দুই দশকে বিপ্লবীরা পরম ধার্মিক ছিলেন। তাঁরা 'কালীমাতার' নিকটে শপথ গ্রহণ করতেন। প্রেরণা লাভ করতেন গীতা ও বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হতে, আর যোগাভ্যাস করতেন। যোগ যে তাদের ব্যায়ামের অঙ্গ ছিল তা নয়, শুনেছি তারা নাকি বিশ্বাস করতেন যে যোগবলেই তারা স্বাধীনতা লাভ করবেন। দাদাদের (নেতাদের) কড়া অনুশাসন ছিল বিপ্লবীদের ওপরে। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এদেশে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা অচল। অতএব বিপ্লবী ভাইদের ব্রহ্মচারী হতে হবে। ভাইয়েরা ছিলেন বাঙলাদেশের বিশিষ্ট 'ভদ্রলোক' (বর্ণহিন্দু) শ্রেণীর লোক। লেখাপড়া জানা লোক। দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে অল্প ক'জন দণ্ডিত বন্দী বাদে বাকি সকলেই বন্দীদশা হতে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন আবার নূতন করে আরম্ভ হলো না। খুব জোর অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন দেশে চলেছিল। ১৯২২ সালে এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেল।'[১০৩]

চোদ্দো

'...দুঃখের বিষয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় পর্বের লড়াইতে হিন্দুরা যে এক তরফা যুদ্ধে লিপ্ত হন এতে মুসলিম যুবকদের অংশগ্রহণ সমর্থন লাভ করেনি।

নজরুল ইসলাম 'কুহেলিকা' উপন্যাসে এই বাস্তবতার ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'কুহেলিকা'র নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লববাদীদের দলে যোগ দিলে হিন্দু-সদস্যরা তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'তাহারা প্রমত্তের (শিক্ষা সদস্যের) জাহাঙ্গীরকে 'মাতৃমন্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল। তখন শিক্ষক প্রমত্ত 'বলিল, দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার এ মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাঙলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না।' জাহাঙ্গীরের বন্ধু অনিমেষের মুখ দিয়ে নজরুল বলিয়েছেন–

'তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? 'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গি এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লণ্ডন এবং মক্কা অধিকার করে? তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না।'

এটাই ছিল বেনজীর আহমদের হিন্দু সন্ত্রাসবাদী দল ছেড়ে অন্য মুসলিম সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করার কারণ। বেনজীর আহমদের, 'আজাদ সংঘ' করার আর একটা কারণ ছিল হিন্দু সন্ত্রাসীদের মা কালীকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণ করা। ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন তার 'অগ্নিযুগের ইতিকথা'য় লিখেছেন–

'এই বাগানবাটিকাই (কলকাতার মানিকতলার মুরারীপুকুর লেন-এর বাগানবাড়ী) ছিল কলকাতার প্রধান বিপ্লব কেন্দ্র। ভূগর্ভস্থ একটি প্রকোষ্ঠে বিরাট কালিমূর্তি স্থাপিত ছিল। নবদীক্ষিত বিপ্লবীকে উক্ত কালিমূর্তির সাক্ষাতে স্বীয় দেহরক্ত ক্ষরিত করিয়া দেহরক্তের অক্ষরে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণদানের শপথ বাক্য লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে হইত।'

---

১০৩. মুজফফর আহমদ/নির্বাচিত প্রবন্ধ। [ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (কলকাতা) - আগস্ট, ২০১১। পৃ. ৪৬-৪৭/৩১২-৩১৩]

জনাব শামসুল আলম বেনজীর আহমদের উপর লিখতে গিয়ে বলেছেন–

'এ শতাব্দীর সন্ত্রাসবাদ শুরু করেছিলেন আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুগণ। মুসলমানেরা বহু চেষ্টা করেও তাদের দলে জায়গা পেত না। কারণ; মা কালিকে সাক্ষী রেখে শপথ করতে হত যা মুসলমান ছেলেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কবি বেনজীর আহমদ যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি দলে জায়গা না পেয়েই নিজেই 'আজাদ সংঘ' (আজাদ পার্টি) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন।'

'চেনা-অচেনার বেনজীর ও অন্যান্য' গ্রন্থে কবি জামালউদ্দীন মোল্লাও একই কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন-

'জগন্নাথ কলেজে থাকা অবস্থায় প্রথমে তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 'যুগান্তর পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু হিন্দু নেতারা শুধু তাকে ব্যবহার করত; কাজে-কর্মে খাটাত; বিশ্বাস করত না। 'যুগান্তর' পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কোন সভায় কোন মুসলমান সদস্যের প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং বেণু মিয়াকেও (বেনজীর আহমদ) এ জাতীয় কোন সভায় প্রবেশ করতে দেয়া হত না। মুসলমান যুবকদের প্রথমে নভিস হিসাবে নেয়া হত। এই বিশ্বস্ততা আরও একটু বাড়াতে পারলেই ছোটখাটো অপারেশনেও পাঠানো হত। কিন্তু অপারেশনে যাবার আগে কিছু নিয়ম পদ্ধতি মানতে হত।'

জামালউদ্দীন মোল্লা লিখেছেন–

'একদিন বেণু মিয়াকেও বলা হ'ল কালীমূর্তির পায়ে কপাল ঠুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শপথ নিতে। তিনি তৌহিদী মুসলমান। অতএব তিনি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসেন এবং আজাদ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৫-এ তার এই পার্টি গঠিত হয় এবং বলা বাহুল্য, আজাদী আন্দোলনের সশস্ত্র এই মুজাহিদ স্বদেশী বৃটিশ দালালদের দ্বারা বেণু ডাকাত নামে চিহ্নিত হন।'

ডাকাতি কিন্তু হিন্দু সন্ত্রাসীরাও করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'অগ্নিযুগের ইতিকথা'য় লিখেছেন–

'এই সময় বাংলার পুলিশ বাহিনী নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত বিপ্লব দমনের নামে নানা প্রকারের অত্যাচারের সূচনা করে। চারিদিকে অনর্থ হয়রানী, যত্রতত্র তল্লাসী, পথিকদের উপর পুলিশী অত্যাচর, পুস্তক-পুস্তিকাদি বাজেয়াপ্তি, বৈপ্লবিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র অন্বেষণ ব্যাপদেশে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সম্মান ধ্বংসায়ন, গ্রাম পল্লীতে হানা দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর জোর-জুলুম ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। তাছাড়া কলিকাতা ও মফস্বল শহর সমূহে ছাপাখানা বন্ধ করা, দেশবরেণ্য নেতৃবর্গের ফটোচিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করা, গুপ্তচরের মিথ্যা রিপোর্টের উপর নির্ভর করত নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে গ্রেপ্তার করা ও তাদের অযথা হয়রান করা প্রভৃতি জবরদস্তিমূলক কার্যকলাপ অনবরত চলতে থাকে।

পুলিশের এবংবিধ স্বৈরাচারে বিপ্লবপন্থীরাও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহারা সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। বিপ্লবী নেতারা বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থবিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট সংগোপনে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় ভিন্ন পথ অবলম্বনে অর্থপ্রাপ্তির প্রয়াসে ব্রতী হয়। বিপ্লবীরা তখন অনন্যোপায় হইয়া ধনী মহাজনদের বাড়ীতে হানা দিতে থাকে এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া সেই অর্থে বিপ্লব পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১৯০৮ সনে ঢাকা অনুশীলন সমিতির যুবকরা বহু গ্রামে ডাকাতি করে।'

মনে রাখতে হবে তাদের এই কাজ ব্যক্তিস্বার্থে নয় জাতীয় স্বার্থে ব্যয়িত হয়। বিপ্লবী বে-নজীর এই আদর্শকে মুসলিম জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত করেন। এই ধরনের একটা অপারেশনের পর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা দেন (জামালউদ্দীন মোল্লা লিখিত 'অচেনার বেনজীর ও অন্যান্য' গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সেটি এই–

'আমরা আপনাদের ভাই, বন্ধু, আপনাদের ছেলে। আমরা আপনাদের জন্য এসেছি। আপনাদের জন্যে দিনের আরাম, রাত্রির বিশ্রাম হারাম করেছি। আমাদের ব্যক্তিগত কোন লাভের জন্যে নয়।'

এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেন 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে মুসলমান তরুণদের বলিদানের কারণসমূহ। তুলে ধরেন এদেশী দোসর জমিদার আর নরখাদক, সুদখোর বেনিয়া সাহা সওদাগরদের অত্যাচারের অসংখ্য জলজ্যান্ত কাহিনী। তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসও তুলে ধরেন।'

বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গসংযুক্ত করণের আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গ যেমন পূর্ব বঙ্গের মুসলিম স্বার্থের জন্য আশীর্বাদ ছিল এদেশের হিন্দু-জমিদার ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের জন্য তা ছিল হিন্দু জনগণের স্বার্থবিরোধী।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তার বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে বাংলা বিভাগ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সুদূর কলকাতা থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চল শাসন তার জনগণের প্রতি সুবিচার নয় মনে করে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি দুইভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে সংযুক্ত করে গঠিত প্রদেশের নাম করা হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম। আর পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে মিলিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম রাখা হয় বাংলাদেশ।

এই বিভক্তিকরণে পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা খুশি হয়। এর কারণ এই বিভক্তির ফলে ঢাকা রাজধানী হওয়াতে এই অঞ্চলের মানুষেরা মনে করে কলকাতা নির্ভরতা কমে যাবে এবং কলকাতার আধিপত্য মুক্ত হলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা দূর হবে। কিন্তু এর বিভক্তিকরণে হিন্দু-স্বার্থে বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা ধারণা করে এর ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত হবে এবং তাদের ক্রমবর্ধমান একাত্মতা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হবে। এতে হিন্দুরা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয় এবং প্রবলভাবে বাধা দিতে থাকে। জনাব এ বি এম মাহমুদ তার 'বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও তৎকালীন রাজনীতি' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন–

'হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের মূল কারণগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করিলে এই বিরোধিতার তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হইবে। বাংলা বিভাগ সত্যই তাহাদের জন্য এক দুর্যোগের ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। নিছক ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা করিয়াই হিন্দু নেতৃবর্গ ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শীঘ্রই নতুন ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে এই অঞ্চলের এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কৃষক শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং তৎসঙ্গে নবজাগরণ দেখা দিবে। ফলে পূর্বের ন্যায় আর তাহাদিগকে পেষণ ও নিষ্পেষণ করা যাইবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক তাহারা কোনদিনই সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত মুসলমান কৃষক সকলের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগরিত হইবে –এই ভয়ে রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।'

তিনি আরও লিখেছেন–

'বাস্তবিক পক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে হিন্দুদের মনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার বীজ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। তখন এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমশঃ ইহা মুসলিমবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। হিন্দু নেতৃবর্গের কায়েমী স্বার্থ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধই তাহাদিগকে এত উত্তেজিত ও মারমুখো হইতে বাধ্য করিয়াছিল। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু হইতে ইহারা নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। এই সমস্ত জমিদারদের অনেকেই এই অঞ্চলের সম্পদ অপহরণ করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্যের নিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিল কলিকাতায়। এই সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের ও সুখ-সুবিধার দিকে তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না।'

বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে এই হিন্দু-স্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে –এই কারণে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রথম পর্বে, যারা একদা ব্রিটিশের আগমনকে আশীর্বাদ বলে মনে করেছিল, তারাই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে স্বাগত জানায়।

বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থীদের যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয় এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তা স্তিমিত হয়ে যায়। একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কংগ্রেস হিন্দুদের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেদিন বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে ঘোষিত হয় সেদিন কংগ্রেস দেশব্যাপী শোক দিবস পালন করে। বাঙালির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখীবন্ধন' ধারণ করে, ১৬ই অক্টোবর উপবাস করে, সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সকলে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবাদ জাগানোই ছিল ঐ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আন্দোলনকারীরা চরমপন্থী নেতাদের প্ররোচনায় নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটানো। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এরা হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিপ্লব সংঘ গড়ে ওঠে। এই গুপ্ত সমিতির একটির নাম 'যুগান্তর' যেটি কলকাতায় গড়ে ওঠে, অন্যটি 'অনুশীলন সমিতি' যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ঐতিহাসিক সত্য এই গুপ্ত বিপ্লব সংঘ মূলতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হলেও কিছু কিছু মুসলিম যুবক এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু দেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ করা এবং 'বন্দে মাতরম' গান চালু করা হলে মুসলমানদের উৎসাহে ভাটা পড়ে এবং এটা হিন্দু আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। বেনজীর আহমদ এই সব মুসলিম যুবকদের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে বিশের দশকে। ততদিনে অবশ্য বঙ্গভঙ্গ পুনরায় অভঙ্গ বঙ্গের রূপ নিয়েছে। ১৯১৪ সনে শুরু হওয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। ভারতকে দেয়া স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে ব্রিটিশ। নতুন আকারে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সূচিত হয়েছে। সারা ভারত লাভা উদগীরণ-উন্মুখ আগ্নেয় গিরির রূপ লাভ করেছে। গান্ধী, শওকত আলী, মোহাম্মদ আলীর যৌথ অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছে। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী', 'আনোয়ার' ও 'কামাল পাশা' লিখিত হয়েছে। এই সময়ে নব-বিপ্লবী বে-নজীরের আবির্ভাব।

১৯২২-এ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন বেনজীর আহমদ এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কামনায় তিনি হিন্দু-সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লেখান। গবেষক জামালউদ্দীন মোল্লা 'চেনা-অচেনা বেনজীর ও অন্যান্য' গ্রন্থে লিখেছেন–

'পরীক্ষা পাশের পর বেণু মিয়া (বেনজীর আহমদ) লাপাত্তা। অনেক খোঁজাখুজির পর তাকে কলকাতা থেকে ধরে এনে জগন্নাথ কলেজে আইএসসিতে ভর্তি করে দেয়া হল। ...জগন্নাথ কলেজে থাকা অবস্থায়ই তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যুগান্তর পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু নেতারা শুধু তাকে ব্যবহার করত। কাজে-কর্মে খাটাত। বিশ্বাস করত না।...

মুসলমান যুবকদের প্রথমে নভিস হিসাবে নেয়া হত। ফাইফরমাস খেটে বিশ্বস্ত হতে পারলে প্রাথমিক সদস্যপদ দেয়া হত। এই বিশ্বস্ততা আর একটু বাড়াতে পারলে ছোটখাট অপারেশনেও পাঠান হত। কিন্তু অপারেশনে যাবার আগে কিছু নিয়ম পদ্ধতি মানতে হত। সে নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ছিল : যে-কোন ধর্মের লোকই হোক না, কোন অপারেশনে যাবার আগে চাটগাঁর সদরঘাটের কালীমন্দিরে কালীমূর্তির পায়ে কপাল ঠুকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ নেয়া।...

একদিন বেণু মিয়াকেও (বেনজীর) বলা হ'ল কালীমূর্তির পায়ে কপাল ঠুকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শপথ নিতে।'

মুসলিম তরুণ হিসাবে সেটা বেনজীর আহমদ পারেন নি। পরে তিনি অনুশীলন পার্টিতে যোগদান করে একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেখানেও তিনি ইসলামবিরোধী কাণ্ডকর্ম দেখে বেরিয়েআসেন এবং নিজস্ব পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির নাম দেয়া হয় 'আযাদ পার্টি'। ১৯২৫-এ তিনি এই পার্টি গঠন করেন। এতে যোগ দেন মওলানা আকরম খাঁ'র জামাতা আবদুর রাজ্জাক (পরে ইনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন), কংগ্রেস নেতা সৈয়দ জামালউদ্দীন হাশেমী। সাহিত্য পত্রিকা 'নওরোজ' ছিল এই আযাদ পার্টির মুখপত্র। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। এই 'নওরোজ' পত্রিকাতে নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

সেখানে তিনি সন্ত্রাসবাদী দলে মুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বিতর্ক বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন। পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে। বে-নজীরের কবিতার পিছনে যেমন নজরুলের কাব্যপ্রেরণা, তার বিদ্রোহের প্রেরণা আছে তেমনি আছে ভারতের পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং মুসলিম বিপ্লবীদের সংগ্রামী জীবন ও শাহাদাতের ইতিহাস।'[১০৪]

সাম্প্রদায়িকতা : নেহরুর প্রতি শের-এ-বাঙলা

"··· ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলমানদের ওপর জুলুমের অভিযোগ প্রমাণের তদন্তের জন্য পণ্ডিত নেহেরুকে দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে সংবাদপত্রে প্রদত্ত সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিকে হক সাহেব (শের-এ-বাঙলা এ. কে. ফজলুল হক) অস্বীকার করেন এবং বলেন,

'...আমি (হক সাহেব) বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘণ্য অত্যাচারের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য পণ্ডিত নেহেরুকে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করার প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছি বলে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেখে বিস্মিত হলাম। আমি এরকম কিছুই করিনি, আমি যা বলেছিলাম তা হলো, আমার তথ্যাবলী পণ্ডিত নেহেরুর রায়ের জন্য তার কাছে দাখিল না করে মুসলিম লীগের সভাপতি মি: জিন্নাহর দাবী অনুযায়ী 'রয়েল কমিশনের' নিকট দাখিল করার কথা বলেছি। পণ্ডিত নেহেরু চার্জশিটের কথা বলেছিলেন। আমি প্রথম কিস্তির চার্জশিট কাগজে দিলাম। এটা শুধু নেহেরুর জন্য নয়, বরং বিশ্ববাসীর জন্য।

যদি তিনি মনে করেন যে, যে সংগঠনের তিনি সভ্য সে সংগঠনের পক্ষপাতিত্ব ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম এবং যে মন্ত্রীসভার আমলে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে সে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণের সাহস রাখেন বলে মনে করেন তাহলে তার ঘোষণায় এটা পরিষ্কার বলা উচিত। তারপর যদি তিনি ইচ্ছা করেন আমি তখনই তাকে সাথে নিয়ে আমাদের অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে ইচ্ছুক। অবশ্য এতে আমাদের 'রয়েল কমিশনের' দাবী করার সিদ্ধান্ত সঠিকই থাকবে।

যখন এরূপ একটা ট্রাইবুনাল গঠিত হচ্ছে তখন আমরা এ সমস্ত বাস্তব অভিযোগগুলোর প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ উক্ত নিরপেক্ষ এবং আইন অনুমোদিত ট্রাইবুনালের কাছে উপস্থিত করব।

আমি এছাড়াও ভারত এবং ব্রিটেনের সকল নিরপেক্ষ লোকদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষন করতে চাই যে, কিভাবে কংগ্রেস সংবাদপত্রসমূহ আমার বিশদভাবে উল্লিখিত ঘটনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলোকে গায়েব করার চেষ্টা করছিল এবং এখনো করে যাচ্ছে। তারা অভিযোগগুলো সুনির্দিষ্ট আকারে চাইছে। আমি যথাসম্ভব সেগুলিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছি, যা যেকোন লোকের বোধগম্য হতে পারে। তবুও কংগ্রেস সংবাদপত্রসমূহ তাকে খাটো করার চেষ্টা করছে। এমন কি সেগুলো অনুসন্ধানের কোন কথা বলছে না। এরকম অভিযোগও হয়েছে যে, বাংলার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কিছু হিন্দুর অভিযোগের পাল্টা জবাব দেবার জন্য আমি কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগসমূহ উত্থাপন করেছি। এ বক্তব্য আমার কাছে এত ঘৃণ্য যে, তা নিন্দাবাদেরও অযোগ্য।

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষনা করছি যে, বাংলার হিন্দুরা যদি মনে করে যে, আমাদের শাসন আমলে তাদের ওপর অত্যাচারের কোনো প্রমাণ তাদের কাছে আছে, তাহলে তারা তার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তৈরী করুক। আমরা তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, বাংলার মন্ত্রীসভা তাদের প্রমাণাদি রয়েল কমিশনের কাছে দাখিলের অনুমতি দেবে। আমরা এরূপ তদন্তের মুখোমুখি হতে ভয় পাই না।'

---

[১০৪]. শাহাবুদ্দীন আহমদ/বে-নজীর আহমদ রচনাবলী ‖ বাংলা একাডেমী - মার্চ, ২০০৭। পৃ. ৬-১০।.

কংগ্রেসের দুষ্কার্য এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বহু দৃষ্টান্ত, হিন্দী আন্দোলনের অত্যাচার সম্পর্কে বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন :

'...আমার কাছে কংগ্রেস শাসনে ভারতের মুসলমানদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের নিখুঁত চিত্রসম্বলিত অকাট্য দলিলপত্র আছে। আমি যখনই এ অত্যাচার ও মুসলমানদের নানা অসুবিধার কথা তুলে খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছি তখনই কোন এক দলের সংবাদপত্রসমূহ আমি কংগ্রেস ও কংগ্রেস শাসনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইচ্ছা করেই ওই সমস্ত বানানো ঘটনা প্রচার করছি বলে প্রচার করছে। এবং এ ব্যাপারে দায়িত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও পিছিয়ে ছিল না।

এখনো দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতারা ও কংগ্রেস পত্র-পত্রিকাসমূহ কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের ওপর এ অত্যাচারের অভিযোগসমূহকে তাচ্ছিল্যের সাথে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমি বর্তমানে ওই সমস্ত ঘটনাবলী কাগজে ছাপা থেকে বিরত রয়েছি। কারন আমি মনে করি ওগুলো ছাপা হলে ভারতের দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজিত দুঃখজনক সম্পর্ক আরো তিক্ততায় ভরে উঠবে। কিন্তু যতই আমি আমার তাস টেবিলে রাখা থেকে নিবৃত থাকি ততই তারা আমাদের অভিযোগসমূহ মিথ্যা বলে অনবরত প্রচার চালাচ্ছে। কাজেই আমি ওই সমস্ত ঘটনাসমূহকে আর লোকচক্ষুর আড়াল রাখতে পারছি না। অত্যন্ত বেদনার সাথে আমাকে এগুলো প্রকাশ করতে হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, এছাড়া আমার আর অন্য কোন কোন উপায়ও ছিল না। ভারতের কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহ মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে দাঙ্গায় এত লোকের প্রাণ নাশ ও এত সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা ভারতের ইতিহাসে আর ঘটেনি।

এ সমস্ত দাঙ্গা ও দূর্ঘটনায় মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা কি হঠাৎ ঘটেছে? আসল ব্যাপার হল সংবাদপত্রের একচেটিয়া হিন্দু মালিকেরা ওই সমস্ত সংবাদসমূহ সম্পূর্ণভাবে চেপে গেছে, অথবা এ সম্পর্কে মিথ্যা ও বিকৃত বিবরন পেশ করছে। বর্তমানে আমি বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বেরারের মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত জুলুমের কয়েকটি কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দেব। এ দৃষ্টান্তগুলো অবশ্য খুব দীর্ঘ হবে না কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও দৃষ্টান্তস্থাপনকারী হবে। আমি প্রত্যেক সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের এগুলো পড়ে দেখতে বলছি। এবং তারা নিজেরাই বিচার করে দেখবেন যে, কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের যে অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়েছে তা বানান কি না। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, আমার বিবৃতি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি ঘটনাগুলোকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারেই তুলে ধরছি। তাছাড়া মুসলমান সংখ্যালঘুদের ওপর অনুষ্ঠিত বহু ধরণের রাজনৈতিক অত্যাচার ও অবিচারের কথা বাদ দিয়েছি (মধ্য প্রদেশ এবং বেরার ব্যতীত)। আমি মূলত বয়কট, লুট, ধর্ষণ, আক্রমণ, হত্যা এবং গণসন্ত্রাসের ঘটনাগুলোই লিখছি। বলা বাহুল্য, হিন্দু প্রধান এলাকার কংগ্রেস সরকারের অধীনেই আমাদের সম্প্রদায়ের অসহায় লোকগণ উপরোক্ত বেদনাদায়ক ঘটনার শিকার হয়েছেন।

প্রকৃত ঘটনার বিবরন দেবার আগে আমি অবশ্য কয়েকটি তথ্য তুলে ধরতে চাই - যার পটভূমিকায় নিম্নোক্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে তার সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণের সাথে সাথে কতকগুলো অদ্ভুত কাজ করে বসল। তারা স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সাথে পরামর্শ করার জন্য লিখিত বা মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিল। তারা সরকারি ভবন, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্থানসমূহে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলনের আদেশ দিয়েছিল। অনেক মন্ত্রীই সফরে গিয়ে মফস্বলের শহরগুলোতে খুব জাকজমকের সাথে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেছে। তারা নির্ধারিত অনির্ধারিত যে কোন অনুষ্ঠানে মুসলমানদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বা এভাবে আপত্তি করার জন্য অপমানিত করেও কংগ্রেসদলীয় সঙ্গীত গাইবার অনুমতি দিয়েছে। তারা হিন্দী এবং মাদ্রাজী চালু করল এবং তা শেখবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। তারা সমস্ত ছাত্রদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করল এবং এভাবে একটি বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি তাদের আসক্তি প্রদর্শন করল।

তারা মুসলিম লীগকে একটা ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রচার করল এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে কোন চেষ্টা থেকেই বিরত রইল না। হিন্দু নেতৃবৃন্দ আরও অগ্রসর হয়ে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য মুসলিম লীগকে দোষারোপ করতে লাগল। কিন্তু অন্যপক্ষে হিন্দু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা পন্থীদের- যাদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের কাছেই প্রমাণ রয়ে গেছে, নিন্দা করা থেকে সর্বদাই বিরত ছিল।

হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এর ফল হয়েছে মারাত্মক এবং সরকারি কর্মচারীরা এর দ্বারা বিপজ্জনক নেতৃত্ব লাভ করেছে। পূর্বোক্তরা মনে করেছে যে, শেষ পর্যন্ত তাদের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হতেই হবে। শেষোক্তরা এটা জানেন যে, একমাত্র মন্ত্রীসভায় তাদের নতুন প্রভুদের সাথে একাত্ম হয়ে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষরূপে তাদের স্থানীয় এজেন্টদের খামখেয়ালী চরিতার্থ করেই পথ পরিষ্কার রাখা হবে।

এ অবস্থায় উগ্র হিন্দুদের ঔদ্ধত্য চরমে পৌছেছে এবং তারা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। এ ব্যাপারে সরকারও আদৌ নিরপেক্ষ থাকেনি। প্রতি শহরে, বন্দরে, গ্রামে, তপশিলে, তালুকে কংগ্রেস কর্মীরা, মহাসভাপন্থীরা আকাশে বাতাসে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি প্রচার করছে। এটা 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত লেখকের ধ্যাণ-ধারনাকেই পুষ্ট করছে। তারা মনে করছে তাদের মর্যাদা বেড়েছে এবং হোমারের যুগে যেভাবে সাইক্লোপসরা পুমিদের ঘৃণা করত তেমনি মুসলমানদেরও ছোটো মনে করতে লাগল।

সাইক্লোপসদের মতো তারা এক চক্ষে দেখতে লাগল। তাদের অন্য চক্ষু দ্বারা যদি ন্যায় ও সমতার দৃষ্টিতে দেখতে পারত তাহলে দেখত যে, যদিও সংখ্যায় অল্প তবুও তাদের প্রতিবেশি মুসলমান ভাইদের ভারতীয় আকাশের নিচে বেঁচে থাকার অধিকার রহিত হয়েছে। এ রকম পরিবেশে তারা সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর তাদের ইচ্ছানুযায়ী জুলুম চালিয়ে যেতে লাগল। কি তাদের ইচ্ছা? সংক্ষেপে তা এই :

গো-মাতাকে রক্ষা করতেই হবে। তাই মধুপুর, দাদ্রী এবং অন্য জায়গায় তান্ডবলীলা।

মুসলমানদের কিছুতেই গো-মাংশ খেতে দেওয়া হবে না। তাই তিলকৌরতে যে অমানুষিক, পাশবিক ও অবিশ্বাস্য অত্যাচার করেছে তার সত্যতা কেউ অবিশ্বাস করতে সাহস করবে না।

মুসলমানদের ধর্ম অত্যন্ত বিনীত হতে হবে। কারণ এটা কি হিন্দুস্থান নয়? কাজেই আজান নিষিদ্ধ করা, মসজিদে প্রার্থনারতদের আক্রমণ, নামাজের সময় বিজয়ীর বেশে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্যসহ মিছিল নিয়ে যাওয়া, এছাড়া আরও বহু ক্রিয়াকলাপের উদ্ভাবন করে দেখানো যে তাদের সনাতন ধর্ম মুসলিম ধর্মের চেয়ে কত উন্নত। তাছাড়া বকর ঈদের সময় গরু কোরবাণীতে বাধা দেওয়া এবং মুসলমানদের যত্রতত্র কবরস্থান, মসজিদ এবং অন্যান্য প্রার্থনা স্থানগুলোকে তছনছ করে দেওয়া চলতে থাকে। এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তারপর দুঃখের পর দুঃখ ঘটতে থাকে। দুধের পরিবর্তে রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

এখানে সেখানে লড়াই এক তরফা হয়নি? বাস্তবিকপক্ষে জার্মান ঐতিহাসিকরা আক্রমণকারী এবং মৃত্যুলোলুপ জার্মান নাজীদের ওপর আক্রমন চালাবার জন্য 'পোলদের' দোষারোপ করতে পারেন। আমি এখন আমার কাছে রক্ষিত কিছু ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করব, যা আমার জ্ঞানে সম্পূর্ণ সঠিক কিন্তু একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের এ বক্তব্যগুলোই সব নয়। আমি ইচ্ছে করেই হিন্দী আন্দোলন সম্পর্কিত জুলুমের উল্লেখ করিনি। 'বিদ্যা মন্দির' পরিকল্পনা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহে মুসলমানদের আরো বেশি মাত্রায় অসহায় ও নগণ্য করে তুলছে। উর্দু স্কুলগুলোকে একেবারে অকেজো করে ফেলা হয়েছে। আপত্তিকর পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য অসংখ্য ঘটনা যা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো এখানে উল্লেখ করব না। সেগুলো তুলে ধরা হবে তখন যখন একটি ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাইবুনালের সামনে সমস্ত মামলাগুলোকে উপস্থাপন করা হবে।

এখন দৃষ্টান্তগুলো স্থাপন করার আগে আমি পাঠকদের এটা লক্ষ করতে বলব যে, যখন মুসলমানরা অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয় তখন কংগ্রেস মন্ত্রীরা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় এক নতুন কৌশল অনুসরণ করে চলে - অন্যান্য উপায়ের মধ্যে ঐ কৌশলগুলো হলো :

১. কোনো জায়গার মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করার পর স্থানীয় সরকারি কর্মচারী বিশেষ করে পুলিশদের আপোষ করার অনুমতি দেয়া। সাধারণত আপোষ করার শর্ত হলো মুসলমানরা স্বেচ্ছায় গোমাংস খাওয়া বা গরু কোরবানী করা থেকে বিরত থাকবে। অথবা কোনো অজ্ঞাত অপরাধের জন্য হিন্দু অত্যাচারীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

২. পুলিশকে গ্রেপ্তার বা অনুসন্ধান চালাবার ব্যাপারে বিলম্ব করার সুযোগ দেয়া; কারণ যদিও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে অস্বীকার করা যায় না তা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবুও মুসলমানদের শাস্তি দেওয়া হতো। এবার ঘটনায় আসছি :

আওরঙ্গবাদ (গয়া জেলা, বিহার)

২৫শে জুলাই, ১৯৩৭। মদনপুর গরুর মেলায় মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয় এবং তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করা হয়। হিন্দুরা বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। মুসলমানদের বিপুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়। একজন মহিলাসহ অনেকেই আহত হয়। এর আগের দিন একজন হিন্দু পণ্ডিত জনসভায় হিন্দুদের উত্তেজিত করেছিল। এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার ফল হিসাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিপদ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে বিহার সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

৩০শে আগস্ট, ১৯৩৭। বিহারের প্রধানমন্ত্রী দাঙ্গায় আহতদের আরও অপমান করে একটি বিবৃতিতে দাঙ্গার জন্য মুসলমানদের দায়ী করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭। বিহারের প্রধানমন্ত্রী কোনো মেয়েলোকের আহত হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। আওরঙ্গবাদের একজন কংগ্রেসকর্মী প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির বিরোধিতা করে উক্ত মহিলার নাম প্রকাশ করে বলেন যে, এমন মারাত্মকভাবে মহিলাটি আহত হয়েছে যার জন্য তাকে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রায় এক মাস আওরঙ্গবাদ হাসপাতালে রাখা হয়।

নাগর নোসকা (পাটনা জেলা)

এই অঞ্চলের হিন্দু গোয়ালারা সেপ্টেম্বরের দিকে (১৯৩৭) একটি মুসলিম কবরস্থান জোর করে দখল করে সেখানে একটি বাড়ি তোলে। হিন্দু কর্তৃক কয়েকজন মুসলমান সেখানে আহত হয়, কারণ তারা কবরস্থান রক্ষা করতে চেয়েছিল। হিন্দুরা গ্রামে গ্রামে ঢুকে মুসলমানদের ওপর আরো আক্রমণ চালায়। এজন্য বিহারের এসডিও কয়েকজন হিন্দুকে সাজা দেন। কিন্তু আপীলে আসামীরা বিচারক এস. পি. চ্যাটার্জী কর্তৃক খালাস পায়। তাদের খালাসের জন্য ঐ গ্রামের হিন্দুরা মিছিল করে উৎসব করে এবং উক্ত মামলার একজন সাক্ষীকে আক্রমণ করে। কবরস্থানের এ ঘটনার পর আরো আক্রমণ চালানো হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টির করা হয়। এ ব্যাপারে বিহার মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা মুসলমানদের রক্ষার জন্য কিছুই করেনি।

রাজপুর খাইরা (গয়া জেলা)

৯ নভেম্বর, ১৯৩৭। এ গ্রামের হিন্দুরা স্থানীয় ইমামবাড়া তছনছ করে এবং আজানের পর মুসলমানরা যখন এশার নামাজের জন্য একত্র হয়েছে তখন তাদেরকে আক্রমণ করে। তারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আসে। বহু মুসলমান আহত হয়। এরপর হিন্দুরা মুসলমানদের বাড়িঘর আক্রমণ করে। একটা ঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ফেলা হয়। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।

করণপুর (সারণ জেলা)

২০ অক্টোবর, ১৯৩৭ (শবে বরাত)। মৌজা পরগণায় দুইজন হিন্দু সিপাহী একজন মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করে বলে, সে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তাকে ঘরে না পেয়ে একবারে ঘরের পেছনে চলে যায়, সেখানে দুইজন মহিলা কাজ করছিল। তারা আপত্তি করায় তাদেরকে টেনে বের করে প্রহার করে। তাদের চিৎকারে পাশের বাড়ির লোক দৌড়ে এসে প্রতিকার করলে তাদের হিন্দু জমিদারের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং প্রহার করা হয়। পরে প্রত্যেককে দশ টাকা করে জরিমানা করা এবং অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্যন্ত আটক রাখা হয়। যারা এ সমস্ত দুষ্কার্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

খয়রাতিয়া (সারাম জেলা)

৩০ নভেম্বর, ১৯৩৭। একজন মহিলাসহ বহু মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত এবং আহত হয়। তিনজন মুসলমানের ঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি মসজিদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করা হয়। মসজিদটির দেওয়ালে বর্শার কোপ, ইটপাটকেল মারার চিহ্ন রয়েছে। কয়েকজন মুসলমান মসজিদের ভেতর পালালে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তাদের জখমের রক্ত মসজিদের মধ্যে দেখা গেছে। একজন মুসলমানের দোকান লুট করা হয়। আক্রমণের সময় মুসলমান শিশু ও নারীরা ভয়ে সারারাত আখক্ষেতে পালিয়ে থাকে। মুসলমানদের যাবতীয় জিনিসপত্র যেমন লোহার খাম্বা, কাপড়-চোপড়, শস্যাদি, গরু ছাগল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি হয় নিয়ে যায় নয় পুড়িয়ে দেয়।

আহত মুসলমানদের ঘটনার পরবর্তী ২০ ঘন্টার মধ্যেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি এবং তৃতীয় দিনের পূর্বে তাদের এজাহার নেওয়া হয়নি।

লালুপুরা (পাটনা জেলা)

নভেম্বর শেষ সপ্তাহ, ১৯৩৭। খুরিয়া বাজিতপুরের জনৈক হিন্দু মোড়ল একদল হিন্দু নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য খোলাখুলিভাবে হিন্দুদের উত্তেজিত করতে থাকে। এর দু'দিনের মধ্যে সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

কয়েকজন মুসলমান আহত হয়। একজনের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও মারাত্মক। হিন্দুরা 'জয় মহাবীর' ধ্বনি দিয়ে মুসলমানদের ক্ষেতের ধান কাটতে থাকে। মুসলমানরা আপত্তি করলে পুলিশ বাধা দেয়, তখন পুলিশের ওপর হিন্দুরা আক্রমণ চালায়। পরে পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে। কিন্তু যারা সরাসরি দুষ্কর্মে ইন্ধন যুগিয়েছিল তাদের কোন শাস্তি হয়নি।

১৯৩৮ সালের বকর-ঈদের প্রাক্কালে বিহারের বহু জায়গায় হিন্দুরা গো-মাতা রক্ষার অভিযান চালায় এবং যেকোন মূল্যে গো-মাতা রক্ষার জন্য হিন্দুদের উত্তেজিত করতে থাকে। এ ধরনের উত্তেজনামূলক কর্ম-কলাপের বিরুদ্ধে মুসলিম সংবাদপত্রসমূহের মারফত বিহার সরকারকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করে দেওয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যার যার এলাকার মুসলমানরাও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নয়া দাহ ও গয়ায় পণ্ডিতদের লিখিত 'পাটিয়া' অবাধে বিলি করা হয়। তাতে জোর করে গরু বিক্রি ও গরু কোরবানী বন্ধ করার জন্য হিন্দুদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। এর ফলে বিহারের বহু জায়গায় হিন্দু জনতা এমন মারাত্মক মনোভাব গ্রহন করে যাতে বিহারের প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গরু কোরবানী থেকে বিরত রয়েছে।

চক রাইন (মুজাফফরপুর জেলা)

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে এ স্থানে হিন্দুরা হঠাৎ মুসলমানদের গরুর মাংস খাওয়া ও আজান দেয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সম্মুখে ডেকে এনে ভয় দেখিয়ে একটি তথাকথিত আপোষনামায় দস্তখত করিয়ে নেওয়া হলো। আপোষনামার শর্ত হলো যে, তারা তাদের বাড়িতে গোমাংস ভক্ষণ করবেনা, যদি কেউ করে তাহলে তাকে পাচশত টাকা জরিমানা দিতে হবে। অন্যথায় তিনদিনের ভেতর উক্ত গ্রাম ত্যাগ করতে হবে। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর উক্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে মুজাফফপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন, কিন্তু বিবৃতিটি সঠিক নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় হিন্দুরা গো-মাংস খাওয়া ও আজান দেয়ার জন্য মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করার সিদ্ধান্ত করেছিল।

ঘটনাটি বিহার কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, উক্ত অভিযোগ সত্য। এর পরে হিন্দুদের এ বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে পুনরায় হিন্দুদের হস্তক্ষেপ ঘটলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এভাবে বহু মাস ধরে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কর্মচারীরা যারা সরকারকে ভুল রিপোর্ট দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। অথবা সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কংগ্রেস শাসন আমলে বিহারের বহু জায়গায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

মাজহিওয়ান (সাঁওতাল পরগণা)

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮। এ গ্রামের মুসলমানগণ আক্রান্ত হয়েছিল। হিন্দুরা তাদের কূপ থেকে জল নিতে মুসলমানদের বাধা দিয়েছিল। এর কারণ মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের ধর্মানুষ্ঠানে গরু কোরবানী করেছিল। মুসলমানদের রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এবং অপরাধী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

রসুলপুর কাটেনসার (পাটনা জেলা)

নিজেদের ধর্মানুষ্ঠানে গরু কোরবানী করার ফলে হিন্দুরা মুসলমানদের বয়কট এবং নানাভাবে উত্যক্ত করেছিল। কিন্তু যথাসময় পুলিশ এসে পড়ায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। পরদিন তারা কয়েকজন মুসলমানের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং পুনরায় তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। তাদের জন্য গ্রামের জলের কূপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, দিনাজপুরের মহকুমা হাকিম মি. বিলটা ডাকবাংলোয় আপোষ করতে এসেছিল। কাছেই একদল হিন্দু জমায়েত হয়ে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছিল। হিন্দুদের শান্ত করার জন্য পুলিশ অফিসার স্থানীয় মুসলমানদের গরু কোরবানী করতে নিষেধ করেছিল, যদিও সিভিল কোর্টে তাদের গরু কোরবানী দেবার রায় দিয়েছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে একজন মুসলিম মহিলার অভিযোগ পুলিশ কানেই তুললনা। অন্য একজন মুসলমান যখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়েছিল তখন তাকে গালাগালি করা হয়েছিল। এ অঞ্চলে বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নাজেহাল করা হয়েছিল এবং দুষ্কৃতকারী হিন্দু নেতাদের নাম দিয়ে বিভিন্ন পাঁচ রকম অভিযোগসহ তারা বিহারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরজি পেশ করেছিল। অভিযোগের ফলাফল হলো একটি বিশেষ ধরনের আপোস। মুসলমানরা বিনম্রভাবে তাদের ধর্মীয় অধিকার পরিত্যাগ করেছিল। এটা মুসলমানদের ওপর এক ধরনের অন্যায় আপোস চাপিয়ে দেয়। নিরপেক্ষ তদন্তে এগুলো কখনো টিকবার কথা নয়।

মাঝাউল (ভাগলপুর জেলা)

হিন্দুদের ক্রোধমত্ত না করার জন্য এ মুসলিম প্রধান গ্রামটিতে গরু কোরবানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি সুবিদিত ঘটনা এবং বিহার সরকারের নিজেদের প্রেসনোটে প্রকাশ পাচ্ছে যে, অন্য গ্রাম থেকে দাঙ্গাকারী হিন্দুরা এসে এখানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করলেও স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। অন্যপক্ষে তারা হিন্দু জনতাকে সহায়তা করেছিল। এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছিল।

কারা (পাটনা জেলা)

১৯৩৮ এর মার্চ মাসে একটি মুসলিম সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, তিনশত হিন্দুর একটি বিরাট দল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে 'বন্দে মতরম' ধ্বনি দিতে দিতে মুসলমানদের একটি জায়গা জোর করে দখল করার চেষ্টা করছিল। তারা একজন মুসলমান জমিদারের আত্মীয়কে হত্যা করার পরিকল্পনা ও তার ছোটো ভাইদের মারাত্মকভাবে জখম করেছিল। এ ব্যাপারে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

ঝামাপুর (পাটনা জেলা)

৮ এপ্রিল, ১৯৩৯। রাত এগারোটায় একদল সশস্ত্র হিন্দু একজন মুসলমানদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল। তারা বাড়ির চাকরকে আক্রমণ করে এবং পর্দানশীন মহিলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের অলংকারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

খান্দিয়া এবং আকরাহা (চম্পারণ জেলা)

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮। পুর্বোক্ত জায়গায় হিন্দুরা একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে মারাত্মকভাবে জখম করে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের অবাধে চলে যেতে দেওয়া হয়। অপর একটি জায়গায় তারা একটি মসজিদ অপবিত্র করে এবং শুকর কেটে তার একটা অংশ মসজিদের কুপে নিক্ষেপ করে। এ ব্যাপারে ৩০শে মার্চ ১৯৩৮, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয় কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের এখনো কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি।

টি লোথু (সাহরান জেলা)

১২ মার্চ, ১৯৩৮। একটি মসজিদকে অপবিত্র করা হয়। এ ঘটনার চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অপরাধীদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি।

তিলোকারী (হাজারিবাগ জেলা)

এ জায়গায় একটি বিবাহ উৎসবে গরুর মাংস পাক করার জন্য তাদের পরিবারের উপর বর্বর অত্যাচার চালানো হয়। ঘটনাটি সুবিদিত। বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমানদের বাড়ি দখল করে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং সে অসহায় অবস্থায় তাদেরকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে, বাড়ির মেয়েদেরকে আক্রমণ করে, তাদের বাসন-পত্র ভেঙ্গে ফেলে এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। হিন্দু-পুলিশ অফিসার রাতে অনেক দেরীতে উপস্থিত হলেও কোনো রকম অনুসন্ধান চালায়নি। পরদিন সকালে তারা গরিব অসহায় মুসলমানদের অন্য একটি বিশেষ ধরনের আপোস মেনে নিতে বাধ্য করে। ব্যাপারটা এভাবেই শেষ হতো যদি না একজন ইংরেজ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধানের কাজ হাতে নিতেন। যদি সুপারিনটেনডেন্টের হস্তক্ষেপ না হতো তাহলে কোনো অপরাধীকে বিচারের জন্য পাঠানো হতো না।

তাদের এত হালকা দণ্ড দেওয়া হলো যে, সেসন জজের কাছে আপীল করা হলে সেও এ রায় দেখে একে আশ্চর্যজনক আইন বলে মন্তব্য করেছিল। তাই মামলা শেরিফের ১নং তথ্যের রিপোর্ট কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় গোপন ও অভ্যন্তরীন কার্যাবলী প্রকাশ পেয়েছিল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সাজা বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টা করেনি। যে ইন্সপেকটর জোর করে আপোস করিয়ে দিল তাকেও শাস্তি দেওয়া হয়নি। বিচারের সময় বিখ্যাত হিন্দু নেতারা খোলাখুলিভাবে দোষী হিন্দুদের সহায়তা দান করেছিল। অপরাধীকে শহরে কংগ্রেস অফিসঘরে রাখা হয়েছিল। সেটা ছিল একজন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর বাড়ি।

ভাগলপুর

জুলাই, ১৯৩৮। ভাগলপুরের কুখ্যাত দাঙ্গা ছিল স্থানীয় মেজিস্ট্রেটের মাধ্যমে একটি রথমেলা উপলক্ষে বিহারের মন্ত্রীসভার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ। এ দাঙ্গার মাধ্যমে মুসলমানদের বয়কট করা হয়েছিল। এবং হিন্দু পুলিশদের হাতে তাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। মাওলানা শাহ মিন্নাতুল্লাহ, কংগ্রেস সমর্থক এম,এল,এ মি. আবদুল হামিদ রাস, মি. সম্পাদক ভাগলপুর কংগ্রেস জনসংযোগ কমিটি, মি. জামাল আহম্মদ খান, কংগ্রেসি মিউনিসিপাল কমিশনার সংবাদপত্রে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতিতে উক্ত দাঙ্গা সম্বন্ধে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যারা পূর্বোক্তদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কাজ করেছে তাদের আচরণের জন্য তাদের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে। তারা নিজেরা কংগ্রেস এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনয়ন করেছে।

ঘরিবাইনীগঞ্জ (মুঙ্গের জেলা)

এ গ্রামে মাত্র চারজন মুসলমান গরুর মাংস খাওয়ার জন্য নানা রকমভাবে উৎপীড়িত হয়েছিল। তাদের জন্য গ্রামের কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের কাছে অভিযোগ করার ফলে আর একটি বাধ্যতামূলক আপোস সংঘটিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের অপরাধী করে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় এবং নানাভাবে অত্যাচার করা হয়।

মাসমোহানা (হাজারীবাগ জেলা)

এখানে একটি মুসলমান কবরস্থানকে তছনছ করা হয়। মুসলমানদের বয়কট করা হয়। পুলিশ এ সকল অপরাধীদের কার্যের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। অনেক অত্যাচারের পর এখানেও আরেকটি আপোস মেনে নিতে বাধ্য করা হয়।

কানোদ (গয়া জেলা)

নভেম্বর ১৯৩৮। গ্রামে গরুর মাংস আনার জন্য মুসলমানদের ওপর অত্যাচার, আক্রমণ এবং অন্যায়ভাবে আটক করা হয়। তাদেরকে হত্যা করার ভয় এবং জরিমানা আদায়ের ভয় দেখানো হয়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা শোনা যায়নি।

রাধুই (গয়া জেলা)

এ গ্রামের মুসলমানদের বয়কট করা হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে গরুর মাংস খাওয়ানোর জন্য অত্যাচার করা হয়েছিল। ১৫০ টি মুসলমান পরিবারের মধ্যে ১৭ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য উল্টো অভিযোগ আনা হয়েছিল।

কানোদ

১৬ আগস্ট ১৯৩৮। একজন মুসলমান কশাইকে রাস্তার পার্শ্বে ফেলে দিয়ে তার গরু ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তারপর বিরাট একদল হিন্দু এসে তাকে আক্রমণ করে এবং সাতজন মুসলমানকে জখম করে। তার মধ্যে একজন বিহার শরীফ হাসপাতালে মারা যায়। তথাপি বহু মুসলমানদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুকেও গ্রেফতার করা হয়নি।

মনিপুর (দারভাঙ্গা জেলা)

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। এ স্থানের হিন্দুরা দু'জন মুসলমানের সাথে ঝগড়া বাধার ফলে সেখানে একটা বিরাট সংখ্যক হিন্দু সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। মুসলমানদের মধ্যে একজনকে অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে, হিন্দু নেতাটি এ বলে অত্যাচার করতে আদেশ দেয় 'ভিতরে ভিতরে মারো' (ভিতরের দিক দিয়ে মারো)। বেচারা মুসলমানের দাড়ি উপড়িয়ে ফেলা হয়, অন্যান্য ব্যাপারও এত সাংঘাতিক যে বর্ণনা করা যায়না। যে হিন্দু সাব ইন্সপেক্টর ঘটনার অনুসন্ধান চালিয়েছিল সে অত্যাচারের বহু ঘটনা চেপে গেছে। হিন্দু ডাক্তারও শরীরের আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন এড়িয়ে গেছে। কিভাবে এ নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছিল তা বর্ণনা করা যায়না। সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

দাউদনগর (গয়া জেলা)

সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। হিন্দুরা একটি ইমাম বাড়ায় জোর করে মূর্তি স্থাপন করেছিল। হিন্দু পুলিশ সাবইন্সপেক্টর মুসলমানদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে এবং সে পরে তাদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করে। ইতিমধ্যেই হিন্দু ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুসন্ধানের পূর্বেই কংগ্রেসী শাসকদের রীতি অনুযায়ী মুসলমানদেরকে আর একটি আপোস করতে বাধ্য করে।

মাঝাউল (মুঙ্গের জেলা)

ডিসেম্বর ১৯৩৮। এ স্থানের হিন্দুরা মুসলমানদের অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং তাদের সম্পদ লুটপাট করে। একজন মুসলমানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এগুলো ঘটার কারণ একজন মুসলমান গরু কুরবানী দিয়েছিল। অপরাধীদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি।

কারওয়ান (গয়া জেলা)

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯। (ঈদের দিন) একদল সশস্ত্র হিন্দু 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। ১২ জন মুসলমান 'মোমিন' সম্প্রদায়ের বাড়ি আক্রমণ করা হয়। তাদের সম্পত্তি লুট করা হয় এবং তাদের তাঁতগুলো ধ্বংস করা হয়। দুষ্কৃতিকারীদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি।

বারারা (দ্বারভাঙ্গা জেলা)

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। (ঈদের দিন) হাজার হাজার সশস্ত্র, সুসংগঠিত হিন্দুরা এ গ্রামের মুসলমানদেকে আক্রমণ করে। তারা কংগ্রেসী পতাকা উড়িয়ে 'কংগ্রেস', 'গান্ধী' ও 'গো মাতা'র জয়ধ্বনি দেয়। সমস্ত মাঠের শস্যসহ মুসলমানদের সম্পত্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গুলি ছুঁড়ছিল। কিন্তু ঘটনার অন্তরালের প্রকৃত নেতাকে গ্রেফতারের কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

কাইয়া (ভাগলপুর জেলা)

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯। (ঈদের দিন) মুসলমানরা ঈদের নামাজের জন্য ময়দানে জমায়েত হলে একদল হিন্দু তাদেরকে আক্রমণ করে এবং নামাজ পড়া বা গরু কুরবানী দেওয়া থেকে বিরত রাখে। সরকার এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

নয়া গাও (মুজাফফরবাদ জেলা)

অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হলেও মুসলমানদেরকে গরু কুরবানী পরিত্যাগ করার জন্য হিন্দুরা জিদ ধরেছিল। বকরা ঈদের দিন (১৯৩৯) মুসলমানরা আগের মতোই তাদের কাজ করছিল। এর প্রতিশোধকল্পে ৬ই মার্চ ১৯৩৯, হিন্দুরা 'গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল। এতে একজন মুসলমান নিহত হয়, এবং মহিলাসহ ১৬ জন আহত হয়। ১৫৯টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এটা ছিল ঠান্ডা মাথার একটি সুসংগঠিত, অত্যন্ত অমানুষিক, নিষ্ঠুরতম পাশবিক ও নৃশংস কার্যাবলীর অন্যতম। এতে বিহার কংগ্রেসের বদনাম চরমে উঠেছিল, বহু অপরাধী শাস্তি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থদের কোনো প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়নি।

হাসনাউলি, মোর হাট্টা এবং মাওহাল (পাটনা জেলা)

ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। বকরী-ঈদের দিন, এ সমস্ত গ্রামের মুসলমানদের ওপর হিন্দুরা অত্যাচার চালায়। হাসনাউলিতে তারা কোরবানীর গরু নিয়ে যাবার দাবি ও ছয়জন মুসলমানকে জখম এবং তিনবার গ্রাম আক্রমণ করে। ১লা ফেব্রুয়ারি খুব ভোরে হিন্দুরা অতর্কিতে মারহানা গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং গরু ছিনিয়ে নিতে চায়। এ গ্রামের মুসলমানরা পূর্বাহ্নে হিন্দুদের মনোভাব সম্বন্ধে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে খবর দেয়। কিন্তু সরাসরি কর্মচারীটি তা অগ্রাহ্য করে। ফলে কয়েকটি মুসলিম বাড়ি আক্রান্ত হয় এবং তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়।

তিউবি (পাটনা জেলা)

একটি মুসলিম বালককে অমানুষিকভাবে আক্রমণ করা হয় এবং একদল হিন্দু তাঁকে পোড়াতে গেলে পথিকরা তাঁকে উদ্ধার করে। ঘটনাটি বিহার সরকারের প্রেসনোটে স্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

গয়া

৬ মে, ১৯৯৩৯। গয়াতে যে দাঙ্গা শুরু হয় সে ঘটনা অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিষাদময়। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ ব্যাপারে বিহার সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা হিন্দুদের জন্য পক্ষপাতমূলক এবং মুসলমানদের জন্য শত্রুতামূলক।

সরকারি বিবৃতিতে মুসলমানদের ক্ষতি এবং হিন্দুদের আক্রমণ ও অপরাধকে কম করে দেখানো হয়েছে। দায়িত্বশীল লোকদের প্রকশিত বহু বিবৃতিতে মুসলমানদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মহল্লাগুলোতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পুলিশ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ মহল্লাগুলোতে খুব অল্পসংখ্যক বা কোনো পুলিশই দেওয়া হয়নি। পুলিশরা মুসলিম লীগ কর্মীদের সহায়তা করতে অস্বীকার করে। মসজিদের ক্ষতি সাধন, মুসলমানদের দোকান লুট ও পুড়িয়ে দেয়ার সংবাদ চেপে রাখা হয়েছিল। এমনকি মুসলমানরা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও তাদেরকে ইচ্ছেমতো নাজেহাল করা হয়েছে। অন্যপক্ষে হিন্দু নেতাদেরকে স্বাধীনভাবে যে কোন জায়গায় যেতে দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে মুসলমানদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, যার সমস্ত অভিযোগই প্রমাণ করা হয়েছিল।

পরানপুর (গয়া জেলা)

এপ্রিল ১৯৩৯। এ গ্রামের মুসলমানরা স্মরণাতীত কাল থেকে কসাইয়ের কাজ করে। তাদের পেশা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে গরুর মাংস খেতে বাধা দেওয়া হয়। হতভাগ্য মুসলমানদের রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

পাঁচরুমা (গয়া জেলা)

১৩ জুন, ১৯৩৯। হিন্দুরা একটি মুসলমান বরযাত্রীদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং ১৩ জন মুসলমান আহত হয়। বিহার সরকার একটি বিভ্রান্তিকর প্রেসনোট মারফত জানায় যে, একটা খোলা জায়গায় গরু কোরবানী দেওয়া নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধে। যে জায়গায় গরু কোরবানী দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ গ্রামের ঐ জায়গাটি বহুদিনের গরু কোরবানীর জায়গা বলে হিন্দুরাও স্বীকার করেছে।

তাছাড়া ঐ গরুটি কোরবানী করা হয়েছিল গভীর রাতে। তথাপি হিন্দুরা আক্রমণ করে। এমন-কি মুসলিম নারীদের উপরও অত্যাচার করে। ঘটনার পাঁচ দিনের মধ্যে কোনো হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয়নি, কোনো হিন্দুর ঘর তল্লাসী হয়নি এবং এভাবে ইচ্ছে করেই সাক্ষী এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আরা (ভাগলপুর)

হিন্দুরা মুসলমানদের আজান দেওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিল। মুসলমানরা স্বভাবতই এতে রাজী হয়নি। নানা রকম অপদস্থ ও অপমান করে হিন্দুরা জুন মাসে (১৯৩৯) মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং তাদের সম্পত্তি লুটপাট করে। এর ফলে যে মামলার উদ্ভব হয় তা চিরাচরিত কংগ্রেসী কায়দায় আপোস করে ফেলা হয়।

চারো (দ্বারভাঙ্গা জেলা)

নামাজে সময় মসজিদের সম্মুখ দিয়ে একটি নতুন 'হরি কীর্তন' শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিদ করা নিয়ে গন্ডগোল বাধলে একদল হিন্দু মে মাসে (১৯৩৯) এ স্থানের মুসলমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বাড়িঘর লুট করে। শুধু তাই নয়, তারা নানারকম জঘণ্য কার্যকলাপ করে এবং ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ মুসলমানকে মারাত্মকভাবে জখম করে।

পাটনা শহর

১১ মে, ১৯৩৯। দু'জন মুসলিম মহিলাকে 'আর্য সমাজীরা' জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়, 'আর্য সমাজীদের' সাথে বিরাট একদল হিন্দুও ছিল তারা মুসলমানদের বাড়িসমূহ বেষ্টন করে ফেলে। একজন মহিলা পালাতে সক্ষম হয়, কিন্তু অন্য একজনকে নিয়ে আর্য-আশ্রমে আটকে রাখা হয়। পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। যখন মুসলিম লীগ সভাপতি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করে তখন একটা লোকদেখানো তদন্ত করা হয়। তাতে মুসলমানদের বাড়ি আক্রমন করা স্বীকার করা হলেও অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। এ ঘটনা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রেকর্ড করা হয়েছে। যে মুসলিম মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে আর ফেরৎ দেওয়া হয়নি, বরং তার স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাকে জোর করে আরেকজন হিন্দুর সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। তার মুসলিম স্বামী তাকে দেবার দরখাস্ত করে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি পাটনায় এ ধরেনের আর একটি ঘটনা ঘটেছে। তাতে একজন হিন্দু সাব-ডিভিশনাল অফিসার একজন মুসলিম মহিলাকে সাজা দিয়েছে। যদিও তার কোন অপরাধই ছিল না। ঐ দণ্ডাদেশকে বিহার সরকার অবিচার বলে আখ্যায়িত করেছে কিন্তু অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। অন্য একটি ঘটনায় একজন মুসলিম মহিলাকে হিন্দুরা জোর করে নিয়ে যায়, অবশ্য বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করা হয়। তাকে জামিন দিতে বাধ্য করা হয় যদিও তার কোনো অপরাধ ছিল না। এ ক্ষেত্রেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

সমস্তিপুর (দ্বার ভাঙ্গা)

১৭ জুলাই, ১৯৩৯। একজন 'আর্য সমাজী' একজন মুসলিম মহিলাকে ধর্ষন করতে চেয়েছিল এবং তাকে জোর করে আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

ফুলওয়ারী শরীফ (পাটনা জেলা)

রীতিবিরুদ্ধ হলেও হিন্দুদের মূর্তি ও বাদ্য-বাজনাসহ মসজিদের সম্মুখ দিয়ে যেতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

বারাহ (পাটনা জেলা)

একজন মুসলমানকে তার স্ত্রীসহ তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং তাকে তার স্ত্রীকে ধর্ষন করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সে মহিলাকে হিন্দু বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। লোকটি বিচারে খালাস পায় কিন্তু তাকে নানাভাবে অপদস্থ করা হয়েছিল। পুনরায় মুসলমানদের আক্রমন করা হয় এবং একজন মহিলাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৯, রাতে তারাবির নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখ দিয়ে হিন্দুরা শোভাযাত্রা করে বাদ্য বাজিয়েছিল। পুলিশ তাদের কাছে লাইসেন্স দাবী করলে তা দেখাতে অস্বীকার করে এবং পুলিশকে অমান্য করে কিন্তু পুলিশ তা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

পান্তারক (পাটনা জেলা)

মহররমের সময় (১৯৩৯) হিন্দুরা মুসলমানদের তাজিয়া মিছিলের ওপর ইটপাটকেল মেরে সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। পুলিশের কাছে খবর দিলেও কোনো কাজ হয়নি।

মাইফি (পাটনা জেলা)

মহররমের পূর্ব থেকে (১৯৩৯) মুসলমানদের বয়কট করা হয়। ওই বছর হোলির সময় একদল সশস্ত্র হিন্দু মুসলমানদেরকে লুট ও হত্যার ভয় দেখায়। পুলিশে খবর দিলে তারা এসে যে সমস্ত মুসলমান নিজেদের ঘরবাড়ি রক্ষা করছিল তাদেরকেই গ্রেফতার করে।

পালখি (পাটনা জেলা)

হিন্দুদের অত্যাচারের ফলে এ গ্রামের মুসলমানদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

কামরিনা (পাটনা জেলা)

মুসলমানদের আজান বন্ধ করে দেয় এবং একটি মুসলমান কবরস্থানে 'মহাবীর' পতাকা উত্তোলন করে। পুলিশ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

মাযার (পাটনা জেলা)

কোন মুসলমানদের ঘরে একটি হিন্দু মহিলাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এ অযুহাতে হিন্দুরা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর নেতৃত্বে মুসলমানদের ঘরবাড়ি তছনছ করে। কর্তৃপক্ষ তদন্তে উক্ত মহিলাকে গোপন করে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দেখতে পায়। কিন্তু অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহন করা হয় নি।

কারাই পারছারাই (পাটনা জেলা)

হিন্দুদের দ্বারা গরুর হাট লুণ্ঠিত হয়। মুসলিম কসাইদেরকে তাদের ঘরের মধ্যেই আক্রমন ও লোকদেখানো একটি পুলিশী তদন্ত করা হয়। অপরাধীদের দণ্ড ছিল ত্রুটিপূর্ণ। দোষীদের খালাস দেওয়া হয়।

সালেচপুর (পাটনা জেলা)

মুসলমানদের একটি গরুর হাট লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু অপরাধিদের কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি।

কারতি সারাই (পাটনা জেলা)

১৯ আগস্ট, ১৯৩৯। একজন মুসলমান কসাইকে গরু বিক্রী করার জন্য আক্রমন করা হয়। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর তদন্ত করেছিল, কিন্তু অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূল ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নি।

করভা

একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের সম্মুখে একজন মুসলমানের বাড়ি আক্রমন করে সম্পত্তি অলংকারাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলমানরা বকর-ঈদের নামাজ পড়তে এবং কোরবানী দিতে পারেনি।

গাউসপুর (গয়া জেলা)

একজন পুলিশ অফিসার একজন মুসলমানকে গরু কোরবানীর অধিকার দিয়ে চুক্তি নামায় আঙ্গুলের টিপ নিয়ে নেয়। সে মুসলমানটিকে এবং অন্য একজনকে পরবর্তী সময় ২১১, ২৯৩, ২১৪ আই. পি. সিতে শাস্তি দেওয়া হয়। পরে ইউরোপীয়ান সেসন জজ এই সাজা বাতিল করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সাংঘাতিক রকম শাসিয়ে দেয়।

আরাহ্ শহর (শাহাবাদ জেলা)

কতক 'আর্য-সমাজী' একজন মুসলমান স্বামীকে হঠাৎ গ্রেফতার করে (যেন তারাই পুলিশ); তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, সে একজন হিন্দু (নিজের স্ত্রী) মহিলার সাথে বসবাস করছে। তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে আবদ্ধ করে রাখা হয়। ঐ মহিলাটিকে হিন্দু বলে প্রমান করা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত লোকটিকে যথেষ্ট অপদস্থ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর্য-সমাজীদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি এ ঘটনায়।

বেথোহ নাউল (সাহরান জেলা)

২৫ মে, ১৯৩৯। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দু'জন মুসলমান নিহত হলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে ঘটনা চেপে যায়। হত্যাকারীদের ছেড়ে দেয়।

সভরন (সাহরান জেলা)

একজন মুসলমান যখন মেলা শেষে গরু কিনে বাড়ি ফিরছিল তখন একজন হিন্দু চৌকিদারের সাহায্যে হিন্দুরা জোর করে তার গরু ছিনিয়ে নেয় মুসলমানদের অনাবশ্যকভাবে অপদস্থ করে একটা মিথ্যা মামলায় সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু পরে সে খালাস পায়। তার গরু ফেরৎ দেওয়া হয়নি। মুসলমানটি মামলা চালাতে গিয়ে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু দোষী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থাই গ্রহন করেনি।

গরখাট (সাহরান জেলা)

ওপরে বর্ণিত ঘটনাবলীর ন্যায় দু'টি ঘটনা এ গ্রামেও ঘটে।

চালাখ পালি (সাহরান জেলা)

এ গ্রামের হিন্দুরা হঠাৎ মুসলমানদের জন্য পানির কূপ বন্ধ করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা গো-মাংস খায়। যদিও ঐ কূপ তারা আগে থেকেই ব্যবহার করত। পুলিশ মুসলমানদের কোনো সাহায্য করেনি।

লুঠি (সাহরান জেলা)

এ গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানদের কবরস্থান দখল করে সেখানে ভাণ্ডার স্থাপন করে। ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান চালিয়েছিল। কিন্দু দুস্থ মুসলমানদের প্রতিকারের জন্যে কিছুই করা হয়নি।

ভাদরপুর (সাহরান জেলা)

এ গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানদের কবরস্থানের কয়েকটি কবর তছনছ করে এবং মুসলমানদের মৃতদেহ মাটি দিতে বাধা দেয়। একটি মৃতদেহ ২৪ ঘন্টা মাটি দিতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ মুসলমানদের কোনো সাহায্য করেনি। কিন্তু হাজার হাজার হিন্দু কবরস্থানটিকে দখল করে বসে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

আরাহ (সাহরান জেলা)

হিন্দুরা আলাওল পীর নামে একজন মুসলিম সাধকের সমাধি আক্রমন করে তার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ওটা মুসলমানদের 'মাজার' বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনাবশ্যকভাবে মুসলমানদের নাজেহাল করে সাজা দেয়। কিন্তু অভিযোগ করা সত্ত্বেও হিন্দুদের কোনো শাস্তিই দেওয়া হয়নি।

বাঘা (চম্পারন জেলা)

পূর্বপ্রচলিত সকল রকম নিয়ম-কানুনের জোরে হিন্দুরা রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে 'মহাবীরি' ঝাণ্ডা উড়িয়ে সোজা যাত্রি নিয়ে যায়। এ গ্রামের মুসলমানদের ওপর বহুরকম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, বাজার থেকে মুসলমান দরজীদের বের করে দেয়া, মুসলমানদের কাছে কাফনের কাপড় বিক্রী করতে অস্বীকার করা, মুসলমানদের দোকান লুট করা এবং সাধারনভাবে মুসলমানদের বয়কট করা। এছাড়া একজন মুসলিম প্রসূতির কাছে একজন হিন্দু ধাত্রীকে যেতে বাধা দেয়া। মুসলমান মহিলাদের ওপরেও কয়েকবার আক্রমন চালানো হয়। দুষ্কৃতিকারীদের কোনো সাজা দেওয়া হয়নি।

বানুলি (দার ভাঙ্গা জেলা)

একজন মুসলমান তার স্ত্রীকে 'জেনানা সোয়ারী' করে নিয়ে যাচ্ছিল। কংগ্রেসী হিন্দুরা সোয়ারীতে হিন্দু মহিলা রয়েছে বলে সেটাকে আটক করে। একটি হিন্দু যুবক মহিলাটিকে তার বন্ধুর স্ত্রী বলে দাবী করলে সাথে সাথে তার পর্দা উন্মোচন করা হয়। অপরাধীদেরকে কোন সাজা দেওয়া হয় নি।

ভাগলপুর (সাহরান জেলা)

ভাগলপুর দাঙ্গা সম্বন্ধে কতগুলো উত্তেজনাপূর্ন ইস্তেহার খোলাখুলি বিলি করা হয়। ঐ ইস্তেহারে লেখকের নাম ও প্রেসের নাম মুদ্রিত ছিল। অপরাধীদের কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি। ইস্তেহার আমার (হক সাহেবের) হাতে রয়েছে।

যোধপুর (মুঙ্গের জেলা)

এ গ্রামে গরু কোরবানী দিতে বাধা দেওয়া হয়। যদিও এটা ছিল এখানের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী একটি আপোস চুক্তি। পরের দিকে মুসলমানদের বাড়িঘর লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়। একজন মুসলমানকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়। দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

রক্ষী সরাই (মুঙ্গের জেলা)

একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলমানদের শোভাযাত্রা বের করলে জোর করে বাধা দেওয়া হয়। মুসলমানদের পাঁচটি বাড়ি লুন্ঠিত হয়। দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

ভাণ্ডা (মুঙ্গের জেলা)

একটি মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে পবিত্র কোরআন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কোনো হিন্দুকে সাজা দেওয়া হয়নি। উপরন্তু কোনো হিন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হলে মুসলমানদের ২১১, আই.পি.সি ধারায় মামলা দেয়ার ভয় দেখায়।

ইসলামপুর হাট (পুর্ণিয়া জেলা)

কংগ্রেসীরা ঠিক মসজিদের সামনে মুসলমানদের ওয়াকফ করা জমিতে একটি মন্দির তৈরী করে। কংগ্রেস সরকারের ভয়ে মুসলমানরা এটা নীরবে সহ্য করে।

কেয়াদা (হাজারীবাগ জেলা)

এখানে মুসলমানদের একটি কাঁচা মসজিদ পাকা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

সাহেবগঞ্জ (সাঁওতাল পরগণা)

১. ২৯শে মার্চ, ১৯৩৯। হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়ে মহাবীরি শোভা যাত্রা নিয়ে আসায় মুসলমানরা আপত্তি করলে, তাদের দোকান ভাঙ্চুর করে এবং জিনিসপত্র গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। দুজন মুসলমান বালককে মারাত্মকভাবে জখম এবং অন্যান্য জঘন্য অত্যাচার চালানো হয়। এই সমস্তই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়। কিন্তু তারা হিন্দু অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। অন্যপক্ষ্যে ৭ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যায়ভাবে নাজেহাল করে সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা খালাস পায়।

২. এ মহকুমার এস-ডি-ও র মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপ শেরিফ রিপোর্টের ২ নং ভলুমে বর্ণনা করা হয়েছে। শোনা গেছে সে নাকি মুসলিম লিগ সেক্রেটারিকে বলেছে যে, সে মুসলমানদের গুলি করে তাদের ঠিক পথে আনবে। এ সমস্ত অন্যান্য অভিযোগগুলি উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে লেখা হয়েছে কিন্তু তিনি তার প্রাপ্তি স্বীকার করার মত ভদ্রতা দেখাননি।

যুক্ত প্রদেশ

বিহারে বর্নিত ঘটনায় ন্যায় যুক্ত প্রদেশেও অনুরূপ বহু ঘটনা ঘটে। তার অল্প কয়েকটি মাত্র নিম্নে দেওয়া গেলো।

দাদ্রী (বাল্লা জেলা)

২০ই নভেম্বর, ১৯৩৭। একটি গরুর হাটে মুসলামানদের উপর সংগঠিত হামলা চালানো হয়। দুজন মুসলমান মারা যায়। ৫০ জন আহত হয়। তাদের গরু ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। মেলায় একটা বিরাট সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর সম্মুখেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে পুর্বাহ্নেই পুলিসকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা মুসলমানদের রক্ষা করেনি। মওলানা সৈয়দ আহমেদ খোলাখুলি কর্তৃপক্ষের নিন্দা করেছেন। তিনি কয়েকজন কংগ্রেস নেতার নাম উল্লেখ করেছেন যারা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে যুক্ত প্রদেশের সরকার হিন্দুদের আড়াল করার প্রচেষ্টায় একটি সরকারি বিবৃতি দান করেন। কিছু হিন্দুর সাজা হয়েছিল কিন্তু আসল অপরাধীদের সমন্ধে কিছুই করা হয়নি। এবং প্রকৃত নেতারা সম্পুর্নই মুক্ত ছিল।

গৌজাইকল (গোরাম জেলা)

১০ আগস্ট, ১৯৩৭। এ গ্রামে একজন মুসলমান নিহত হয়। দু'শ হিন্দু পরিবারের মধ্যে মাত্র দু'টি মুসলমান পরিবার বাস করতো। এ ঘটনায় স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতি এবং অন্যদের বিচারের জন্য পুলিশের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু তাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে ১৮ই নভেম্বর (১৯৩৭) মৃত পরিবারের অন্য লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে মাত্র ৭ বছরের একটি বালিকাও ছিল। পরিস্থিতি সম্পর্কে পুলিশকে জানানো হলে তারা কোন রক্ষা ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি।

সাতারপুর

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। একদল সশস্ত্র বিরাট হিন্দু জনতা তিরাহ বাজারের মুসলমানদের দোকান লুট করে মুসলমানদের আক্রমণ করেছিল। নামকরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দাঙ্গাকারিদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এর পর পেরাগ্রামের মুসলমানদের সম্পত্তি, ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করা হয়েছিল। ৭০টি মুসলমান অধ্যুষিত মুসলিম গ্রামের সমস্ত বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। অতঃপর কংগ্রেস নেতার নেতৃত্বে স্থানীয় অভিজাত মুসলমান কাজি ইফতেখার আহমেদের বাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল।

মহিদাবাদ (গোরাখপুর জেলা)

প্রথা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৮ সালে বকর ঈদে এই গ্রামে কোরবানি দেওয়া হয়নি। দুজন মুসলমান এম এল এ এবং ৩০০ জন লীগ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করা হয়। যুক্ত প্রদেশের আইন সভায় মুসলিম লীগকে দোষী করে তাদের অপমানিত করা হয়। যদিও হিন্দুরা জোর করে কোরবানি বন্ধ করেছিল।

হাযরান

মুসলমানদের দোকানগুলি লুট এবং তাদের মধ্যে এমন ত্রাস সৃষ্টি করা হয় যে তারা অভিযোগ করতেও ভয় পায়। এটা হয়েছিল ১৯৩৯ সালের মে মাসে একজন মুসলিম পুলিশ অফিসার কর্তৃক একজন হিন্দুকে গ্রেফতারের ফলে। হিন্দু দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অন্যপক্ষে তাদের সভা করে উস্কানিমূলক বক্তৃতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

গণেশপুর তহশিল

আরবাইনের নিকটে গণেশপুরের একটি উঁচু যায়গায় একজন মুসলমান নামাজরত থাকা অবস্থায় তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়। এবং সে নামাজ ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় তার নামাজের উঁচু ভিটিটি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তার পর তাকে বয়কট এবং বাড়ির মেয়েদের অপমান করা হয়। দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সনথ (বেনারসের নিকট)

১লা অগাস্ট ১৯৩৭। একটি হিন্দু মেলায় হঠাৎ মুসলমানদের আক্রমণ করা হয় এবং এলোপাথাড়ি মার দেওয়া হয়। তথাপি দলের পাণ্ডাদের অবাধে চলে যেতে দেওয়া হয়।

আনোলা (বেরিলী)

১৪ই মে, ১৯৩৯। নবী দিবসে একটি মুসলিম শোভাযাত্রার উপর হিন্দু কর্তৃক হঠাৎ আক্রমণ চালানো হয়। এতে কয়েকজন মুসলমান আহত হন। কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

আগ্রা

২২ মে, ১৯৩৯। হিন্দুরা খোলাখুলি পুলিশকে অমান্য করে বাদ্য বাজাতে থাকে। ফলে সংঘর্ষ বাধে ও মুসলমানরা আহত হয়। হিন্দুদের মধ্যে পাণ্ডারা বিনা বাধায় চলে যায়।

এলাহাবাদ

মার্চ, ১৯৩৮। এলাহাবাদের অনুষ্ঠিত দাঙ্গার ঘটনাসমূহকে খুব সংক্ষিপ্ত করা যাবে না। এটা বলাই যথেষ্ট যে, ১৯৩৮ সালের মহররমে সরকার পুর্ব রীতি অনুযায়ী (১ থেকে ১০ই মহররম) শোকযাত্রা বের করায় বাধা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু হিন্দুদের উস্কানিমূলক আচরনে অবস্থার অবনতি ঘটায় বাধ্য হয়ে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ৯ মহররম (২৭ই মার্চ) সরকারি অনুমতি সাপেক্ষে মুসলমানরা তাজিয়া সহ শোকযাত্রা বের করলে হিন্দুরা তাজিয়াটি কেড়ে নেয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সেটিকে ভেঙ্গে চুরমার করা হয়। উপরন্ত মুসলমানদের এই বলে ভয় দেখানো হয় যে, দাঙ্গা করলে সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলি ছোড়া হবে। মুসলমানরা সংযত থাকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমানদের সংযমের প্রশংসা করেন। তাজিয়া ভাঙ্গা সম্পর্কে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ মামলাটি এমন অগোছালো করে ফেলে যে দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়; যদিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হিন্দুদের মারমুখী আচরণের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়।

এর অল্পদিন পর হোলির দিনে ১৪৪ ধারা জারি করে হিন্দুদের থামিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশ্যই এটা করা হয়েছে দাঙ্গা করে মুসলমানদের আক্রমণ, লুটপাট ও হত্যা করার পরে। এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণে কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলমানদের অন্যায়ভাবে নাজেহাল করার কথা জানা গেছে। এটা জানা যায় এলাহাবাদের জহুর আহমেদের এবং পীরপুরের রিপোর্ট থেকে।

আবাইল (এলাহাবাদ জেলা)

এখানে হিন্দুরা কয়েকবারই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করে একটি মুসলিমপ্রধান গ্রামের মধ্য দিয়ে জোর করে 'রামলীলার' শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে বাধা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মুসলমানদের রাস্তায় বের করে দেয় এবং যত্রতত্র আক্রমন করে। নৈনিতে মুসলমান ছাত্ররা স্কুলে যেতে পারতো না, এবং মুসলমানরা নিরাপদে বাজারে যেতে পারতো না। সশস্ত্র হিন্দুরা ঘুরে বেড়াতো এবং তাদের উপর প্রতিশোধের ভয় দেখাতো। এ ব্যাপারে স্থানীয় কিছু হিন্দু অফিসারের হাত আছে বলে জানা যায়। মুসলমানদের জন্য কোন রকম প্রতিরক্ষামূলক ব্যাবস্থা না নিয়ে এ অরাজক অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে দেওয়া হয়েছিল।

রায়পুর (পলিভিত জেলা)

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মুসলমানদের উপর জুলুম ও নির্যাতন শুরু হয়। একটা গ্রামের মুসলমানরা খামারিয়া গ্রামে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। যখন তারা গরুর গাড়ি করে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছিল তখন হিন্দুরা তাদের বাধা দেয়। একদল বিরাট হিন্দু জনতা, প্রতিবেশি গ্রাম থেকে আগত হিন্দুদের একত্রিত হয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে মুসলমানদের আক্রমণ করে। কিন্তু মুসলমানদেরই দণ্ড দেওয়া হয়। অথচ হিন্দুদের মধ্যে যারা পাণ্ডা ও আক্রমণকারী যাদের ভেতর বিখ্যাত কংগ্রেসিরাও ছিল - তারা শাস্তি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়।

টাণ্ডা (ফৈজাবাদ জেলা)

২১শে আগস্ট, ১৯৩৮। এ অঞ্চলের মুসলমানদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর্ণ মুসলমানদের ওপর গুলি করার আদেশ দেয়। তার এক মাত্র কারণ তারা একটি হিন্দু শোভাযাত্রাকে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য সহকারে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিল। মুসলমানরা নিহত ও আহত হয় এবং গুলির পরে পুলিশরা মুসলমানদের উপর যত্রতত্র আক্রমণ করে। মুসলমানদের ঘরে ঢুকে এমন-কি ঘুমন্ত অবস্থায় বৃদ্ধ ও শিশুদেরও গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখানো হয় যেন সামরিক আইনের অবস্থা বহাল রয়েছে।

ট্রেনযোগে স্থান পরিবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ ও সন্ত্রাসের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনার সঙ্গে টাণ্ডা কংগ্রেস সভাপতির নিজের এবং মওলানা হোসেন আহমেদ মাদানীর মত শক্তিশালী কংগ্রেস সমর্থকদের বিবৃতির মিল রয়েছে। এ কংগ্রেসিরা নিজেরাই হিন্দু সাব-ডিভিশনাল অফিসার এবং স্থানীয় পুলিশকে তাদের আচরনের জন্য তীব্র সমালোচনা করেন।

দীর্ঘ বিলম্বের পর যুক্ত প্রদেশ সরকার বিচারপতি ইয়র্ককে তদন্ত চালাবার জন্য নিযুক্ত করেছিল। এই সময় সাক্ষীদের বক্তব্য চেপে যাওয়া হয়েছিল। সুতরাং মুসলমানরা এই ভুয়া আর বিলম্বিত তদন্ত বয়কট করেছিল। হিন্দু কংগ্রেস নেতারা সব সময়ই মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত এ অত্যাচারের যথার্থতা স্বীকার করে আসছিল।

আলীগড়

২৬ জানুয়ারি, ১৯৩৯। সেবা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর বিনা উস্কানিতেই আক্রমণ চালায়। একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবল আক্রমনকারীদের পক্ষ নিয়েছিল। তাছাড়া মুসলমান ছাত্রদের ওপর লাঠি চালনার আদেশ দিয়েছিল। এমনকি একজন হিন্দু পুলিশ সুবেদার রিভলবারের গুলি চালিয়েছিল। উপ-ভাইসচ্যান্সেলর কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

জামান্তিয়া (সাগিপুর জেলা)

১৩ জুন, ১৯৩৯। একদল হিন্দু কোনরকম উস্কানী ছাড়াই তিনজন মুসলমানকে আক্রমণ করে। তখন তারা একা গাড়ীতে করে গাজীপুর যাচ্ছিল। তারা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। আহতদের মধ্যে একজন পুলিশের কাছে আক্রমণকারীর নাম বলেছিল কিন্তু মুমূর্ষ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সন্তোষজনক নয় এ অজুহাত দিয়ে হিন্দু সাব-ইন্সপেক্টর তার নাম রেকর্ড করেনি। এর কিছুকাল পরেই লোকটি হাসপাতালে মারা যায়। অন্য দুজন হাসপাতালের হিন্দু ডাক্তারদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছিল। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকা সত্ত্বেও ভয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে।

জামান্তিয়ার মুসলমানদের বহুবার বিভিন্ন উপায়ে নাজেহাল করা হয়েছিল। হিন্দু পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে তার কর্তব্যে মারাত্মক অবহেলার জন্য এবং পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

মোরাদাবাদ (বরিলা এবং বাদুল)

এ সমস্ত জায়গায় অন্যান্য ঘটনার মধ্যে মুসলমানদের মহররমের ওপর এবং তাদের ধর্মীয় কাজের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। যদিও বহুজায়গায় হিন্দুদের কাজ-কর্ম করা ও শোভাযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বানডা

১৯৩৯ সালের হোলির সময় একজন স্থানীয় কংগ্রেসীর নেতৃত্বে এ স্থানের নেতৃবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠান প্রতিপালনের এক অস্বাভাবিক প্রস্তুতি নেয়। নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখ দিয়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই মুসলমানদের ওপর রং ছিটানো হয়। মসজিদটি অপবিত্র করা হয় এবং ভিতরে ইটপাটকেল মারা হয়। পরে মসজিদটি আক্রমণ করা হয় এবং দেয়ালের একটি অংশ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। মসজিদের অভ্যন্তরে কয়েকজন আহত হয়। হিন্দুরা এর ভেতরে ঢুকে ঘড়ি এবং কার্পেট বিনষ্ট করে। মুসলমানদের একটি আটার কল এবং অন্য একটি গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। অন্যান্য অত্যাচারও অনুষ্ঠিত হয়। তথাপি কোনো হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং আগের মতোই সাক্ষীর কাগজপত্র ধ্বংস করা হয়।

মাদারপুর (তহশিল ধামপুর)

হোলির সময় এখানেও হিন্দু জনতা কর্তৃক মুসলমান বাসিন্দারা আক্রান্ত হয়। অনেকেই আহত হয়। কয়েকজনের অবস্থা মারাত্মক। মুসলমানদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। দুজন মহিলাসহ মাত্র ১৫ জন মুসলমানকে বিজনৌরের হাসপাতালে পাঠানো হয়। যদিও গ্রামের সমস্ত মুসলমানই আহত হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং হাসপাতালেও তাদের ওপর দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা জারী করে মুসলমানদের গরু কোরবানী নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও বহু বছর আগে থেকেই সিভিল কোর্ট তাদের সে অধিকার দিয়েছিল।

মুহম্মদপুর এবং জমাদারপুর (বিজনৌর জেলা)

প্রথমোক্ত জায়গায় হোলির সময় (১৯৩৯) হিন্দুরা মুসলমানদের ঘরে ধাওয়া করে, রং ছিটায় এবং তাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে। এমনকি একজন মহিলার সাথে ধস্তাধস্তি করে। শেষোক্ত জায়গায় মুসলমানরা একইরকম মার খায়। মসজিদের মধ্যে দেয়ালে রং ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

বেনারস (১৯৩৮)

মার্চের হোলির দাঙ্গায় অনেক মুসলমান নিহত এবং আহত হয়। তাদের সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়। একজন হিন্দু দোকানদার মুসলমানদের ওপর গুলি চালায় কিন্তু আইন পরিষদে একজন মন্ত্রী ঘটনাটিকে হাল্কাভাবে উপস্থিত করে। উক্ত বন্দুকটিকে একটি খেলনা বন্দুক হিসেবে উল্লেখ করে উক্ত দোকানদারে গুলি ছোড়াকে আত্মরক্ষামূলক কাজ বলে উল্লেখ করে। সমস্ত ব্যাপারটাকেই এভাবে খেলো করা হয়। যার ফলে স্থানীয় পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সমস্ত মুসলিম বাসগৃহ পুলিশ এবং মিলিটারী দিয়ে ঘেরাও করানো হয়। অন্যপক্ষে হিন্দুদের বাড়িতে কোনো পুলিশ ছিল না বললেই চলে।

বেনারস (১৯৩৯)

মহররমের সময় মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হয়। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একজন উদার হিন্দু পণ্ডিত সিটি ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি লিখিত সতর্কবাণীতে জানিয়েছেন যে, হিন্দুরা দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলমানদের হত্যার পরিকল্পনা করেছে। পণ্ডিত ১১৭ জন হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীর নাম দিয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। হিন্দুদেরকে সংঘর্ষে উত্তেজিত করে হায়দরাবাদের নিজামকে অপমান করার জন্য খোলাখুলি উস্কানীমূলক ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল। এসমস্ত বন্ধ করার জন্য কিছুই করা হয়নি।

৩ মার্চ, ১৯৩৯। হিন্দুরা একটি অজুহাত পেল এবং দাঙ্গা বাধাবার একটা দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করল। পরদিন একজন প্রাদেশিক কংগ্রেসী হিন্দু মন্ত্রী স্থানটি পরিদর্শন করে। মন্ত্রী সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়, এরপর থেকেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যাবতীয় সহায়তায় পুলিশ মুসলমানদের অহরহ নাজেহাল করতে থাকে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা যেন পুলিশের ক্ষমতা পেয়ে বসেছিল। তারা থানায় বসে থাকত, মুসলিম অভিযোগকারীদের তাড়িয়ে দিত। হিন্দুদের গ্রেপ্তার করে আনলে তাদের ছেড়ে দিতে পুলিশকে বাধ্য করত। এরকম ব্যবস্থার জন্যই মুসলমানদের জীবনহানি ও সম্পত্তি হারাবার সম্পূর্ণ হিসাব সংগ্রহ করা তখন সম্ভব হয়নি। দাঙ্গার সময় বেরার এবং তার আশেপাশে দশটি মসজিদ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বলতে গেলে বিচারকদের বিবেকের রায়ের বিরুদ্ধেই স্থানীয় মুসলিম লীগ সেক্রেটারীকে সাজা দেওয়া হয়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল একেবারে মিথ্যা। হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেটই ওই মামলা বাতিল করে দিয়েছিল। মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা এবং সাধারণ কর্মীরা এভাবে অপদস্থ হয়েছিল।

হাপুর

এখানে একটি কবরস্থানের অনেক কবর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কবরস্থান চষে ফেলেছিল। অপরাধী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সিয়ানা

১৫ মে, ১৯৩৯। একজন মুসলমান কসাইকে কয়েকবার আক্রমণ করা হয়েছিল। স্থানীয় মসজিদের ইমাম পুলিশকে খবর দিলে তাকেও আক্রমণ করা হয়েছিল। পরে ইমামকে একটি লুটের মামলায় জড়ানো হয়। অন্যান্য কয়েকজন মুসলমানকেও আক্রমণ করা হয়। মুসলমানদের গরুর মাংস না খাওয়ার জন্য সম্মতি আদায় করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের রক্ষার জন্য কিছুই করেনি।

হারণয় (বুলন্দ জেলা)

এখানে মুসলমানদের মূর্তি পূজার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে দিতে বাধ্য করা হয়। প্রথমে তারা আপত্তি করলে তাদের বয়কট করা হয়। তাদের পশু চারনের মাঠ ও পানির কূপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। কর্তৃপক্ষ এদের রক্ষা করার জন্য কিছুই করেনি।

নোগনা সরাই (বদাউন জেলা)

মুসলমানদের ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপরে অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের উপর ১০৭ সিআরসিপি প্রয়োগ করে তাদের গ্রেপ্তার ও নাজেহাল করা হয়। এখানকার গন্ডগোলে দুজন হিন্দু পরিষদ সদস্য নেতৃত্ব দিয়েছিল।

ওরিয়া (এতোওয়াহ জেলা)

একই প্যান্ডেলে তফশীলীদের একটি সম্মেলন করতে দেয়ায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ বয়কট করা হয়। বয়কট ঘোষনার জন্য ছাপানো ইস্তাহার বিলি করা হয়। স্থানীয় মুসলমানদের বাজারে যেতেও নিষেধ করা হয়। স্থানীয় মুসলমান নেতাদেরকেও বাজারে যেতে বাধা দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

সুরিয়া (এতাওয়াহ জেলা)

৭ মার্চ, ১৯৩৯। একজন সশস্ত্র হিন্দু তার কিছু পান্ডাসহ গ্রামটি অবরোধ করে এবং মুসলমানদের এ অজুহাতে হত্যা করতে চায় যে তারা দুজন হিন্দুকে হত্যা করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যে জনতা মুসলমানদের হত্যা করতে এসেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

আতরাউল (আলীগড় জেলা)

হিন্দুরা জোর করে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের সভ্য করতে চেয়েছিল। একজন মুসলিম শিক্ষক কংগ্রেসের সদস্য হতে অস্বীকার করায় কোন অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। একজন মুসলমান সাব-ইন্সপেক্টর ছুটিতে থাকাকালে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের একটি তদন্তে সে সাহায্য করে। এ অপরাধে হিন্দুরা কয়েকমাস পর্যন্ত তাকে অপদস্ত করে এবং পরে একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে দেয়। এ জায়গায় একটি মসজিদ ছিল, যার সম্মুখ দিয়ে আগে কখনো বাদ্যসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হতো না। ১৯৩৯-এ হিন্দুরা এ মসজিদের সামনে দিয়ে জোর করে একটি শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর ফলে উদ্ভূত গন্ডগোলের তদন্ত করা হলে ঈদুল আজহার দিনে সম্মানিত মুসলমানদের অনাবশ্যকভাবে গ্রেপ্তার এবং নাজেহাল করা হয়।

কুতুবপুর (আলীগড় জেলা)

একজন মুসলমান একটি মহিষ শাবককে জবাই করেছে এ মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণ করে। মসজিদের মিনার ধূলিস্মাৎ করে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু অন্যপক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে মুসলমানদের একটি আপোষনামায় চুক্তি করতে হিন্দুরা বাধ্য করেছিল।

মধ্য প্রদেশ ও বেরার

নিম্নে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্টভাবে এ প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগ সমূহ বর্ণিত হচ্ছে :

১. একদিকে হিন্দু মহাসভা ও তাদের চাইদের প্রচন্ড মুসলিমবিরোধী প্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীদের ভারতীয় পেনালকোডের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ হিন্দু পত্রিকাগুলোকে কোনোরূপ বাধা দেওয়া হয়নি। যদিও তাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষকরে মারাঠি কাগজগুলোতে চরম উত্তেজনাকর সাম্প্রদায়িক লেখাসমূহ ছাপা হয়েছে। কিন্তু অনেক কম উত্তেজনাকর সংবাদ পরিবেশনের জন্য সমস্ত মুসলিম কাগজগুলো বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. কোনো কোনো 'আর্যসমাজীদের' বক্তৃতার বিরুদ্ধে আকোলা, নাগপুর, খামাগাউন, মালকাপুর এবং খান্দোয়রের মুসলমানেরা জোর আপত্তি প্রকাশ করেছে কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মাত্র একজন আর্যসমাজীকে ১৫৩, সি.পি.সি. তে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। ঐ লোকটি অনশন ধর্মঘট করে এবং হিন্দুরা তার সমর্থনে হরতাল, জঙ্গী শোভাযাত্রা করায় সরকার মাথা নত করে। কিন্তু অনেক কম অপরাধের জন্য খ্যাতনামা মুসলমানদের দণ্ড ও শাস্তি দেওয়া হয়।

৩. বহু জায়গায় হিন্দুদের বিরাট শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক সময় প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে শোভাযাত্রা যেতে দেওয়া হয়। কোনো কোনো সময় তারা মসজিদগুলো অপবিত্র করেছে এবং সেখানের সম্পত্তিগুলো ধ্বংস করেছে। এগুলো ঘটেছে পাণ্ডুরনা (সাওনের তহশিল), পাটন গাঙ্গি (নাগপুর তহশিল), গাডিগোডাম (নাগপুর শহর), ধামতারি (রায়পুর জেলা) খামগাওন কুররাহ, মালকাপুর, চান্দপুর বিশ্বঅয়া (বিহার) ও অন্যান্য জায়গায়।

৪. এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে হিন্দু মহিলারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে, মুসলমান স্বামী গ্রহণ করেছে। কিন্তু মহাসভার সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী তাঁকে তার স্বামীর কাছ থেকে জোর করে ছাড়িয়ে এনেছে। পুলিশের কাছে খবর দিয়ে কোন ফল পাওয়া যায়নি। এসব ঘটনা নাগপুরে ঘটেছে বেশি। বিচারের জন্য একটি মামলাই কোর্টে পাঠানো হয়েছিল। বাকীগুলোর কোন খোজই পাওয়া যায়নি।

৫. খামগাওনে একদল সশস্ত্র হিন্দু জোর করে মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করেছে। তাদের অজুহাত ছিল তারা একজন হিন্দু মহিলাকে মুসলমান করেছে। এ অভিযোগ ছিল মিথ্যা, কিন্তু একই তালুকে সুপরিচিত হিন্দু নেতাদের নেতৃত্বে একদল হিন্দু কয়েকটি মুসলিম পরিবারে অনুরূপ অজুহাত দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করে। কিন্তু শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

৬. বেরারের বুলাসন্দসাহ, জেলার লুনার মুসলমানদের একমাত্র মিষ্টি জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, ঐ মিষ্টি জলের আধারটি প্রাচীন মুসলিম রাজারা দান করেছিল।

৭. ১৯৩৫ সালে নাগপুর এবং আবাভি দাঙ্গায় মুসলিমদের হত্যাকারীরা দীর্ঘ মেয়াদী সাজা খেটে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসার পরই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

৮. ১৯৩৮ জব্বলপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই অভিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ঐ মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হয়। অথচ অন্য কয়েক জায়গায় একই রকম ঘটনায় দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কারণ অভিযুক্তরা ছিল মুসলিম। জব্বলপুরের দাঙ্গায় চারজন মুসলমান নিহত হয়েছিল। এবং সেখানে হিন্দুদেরকেই চরম শাস্তি ভোগ করতে হতো। সে জন্যই জব্বলপুরের মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

৯. একটি নিরপেক্ষ তদন্তে প্রকাশ পায় যে দেশের প্রায় সব দাঙ্গাগুলোই হোলি উতসবের সময় সঙ্গঠিত হয়েছে। ঐ সময় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথচ সাজাপ্রাপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সংখ্যার চেয়ে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।

১০. কাটনীতে একজন মুসলিম বালককে হত্যা করা হলে কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দুদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারপরই শুরু হয় হিন্দুদের প্রতিবাদসভা, শোভাযাত্রা। ফলে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে বালকটিকে হত্যার জন্য কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি।

১১. কাটাঙ্গিতে এক মুসলিম যুবককে সন্দেহজনক ভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু সরকার অপরাধীকে বের করার কোণো চেষ্টাই করেনি।

১২. উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা ধরণের ঘটনা ঘটে যখন চান্দপুর বিশ্বওয়ার একজন হিন্দু নিহত হয় এবং তাতে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আহত হয়। এর অব্যবহিত পরেই গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করা হয়, এবং সাঙ্ঘাতিকভাবে নাজেহাল করা হয়। কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী আইন পরিষদে ঐ গ্রামের সমস্ত মুসলমানদের দোষী করে বক্তৃতা করেন। নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা সমস্ত ঘরগুলো দখল করে এবং শিশু বৃদ্ধ অসুস্থসহ ১৫৭ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে রাখে ও অকথ্য নির্যাতন করে। শেষ পর্যন্ত ৪৩ জনকে সাজা দেওয়া হয়, বাকী সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলেও তারা ভয়ানক নির্যাতন ভোগ করে। পুলিশ গ্রামে অভিযান চালানোর সময় এবং মুসলমানদের গ্রেপ্তার করার সময় ভয়ানক জুলুম করেছিল। পরে যদিও চান্দপুর বিশ্বওয়ায় পাইকারীভাবে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পরে কিন্তু এডভোকেট জেনারেল আদালতে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছিলেন যে ঐ সময় ঐ এলাকায় কোনো উত্তেজনা ছিলনা।

১৩. সারা প্রদেশব্যাপী হিন্দুরা অবাধে সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ থেকে মুসলিম বয়কটের প্রচারকার্য চালিয়ে আসছিল। এর ফলে মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। হিন্দুদের খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে যে মুসলমানদের দোকান থেকে তারা যেন কিছু ক্রয় না করে এবং বহু জায়গায় মুসলমানদের দোকানগুলোর সামনে পিকেটিং করা হয়। গ্রামে অবস্থানকারী মুসলিম ফকীরদের বের করে দেওয়া হয়। মুসলমানদের ঈদগাহ অপবিত্র করা হয়েছে। চান্দপুর বিশ্বওয়ায় মহররমের তাজিয়ার ওপর গোবর নিক্ষেপ করা হয়েছে। মসজিদগুলো ও মুসলিম লাইব্রেরীতে অনুরূপ কার্য চলেছে। মুসলিম ঠিকাদারগণ মুসলিম মজুর নিয়োগের জন্য স্থানীয় অফিসের দায়িত্বশীল অফিসার কর্তৃক কৈফিয়তের সম্মুখীন হয়েছে। মুসলিম টাঙ্গাওয়ালা ও ট্যাক্সিড্রাইভারদের বয়কট এবং কারখানায় ও বেসরকারি কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান ছাটাই করা হয়েছে।

১৪. হিন্দুদের শোভাযাত্রার সময় আক্রমণাত্মক শ্লোগান দেয়া, যেমন 'হিন্দুস্থান হ্যায় না কিসকা বাপকা' একরকম প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও তারা 'নিজাম মুরদাবাদ' নিজাম বেশরম, মুসলমান বেশরম, ইসলাম বেশরম প্রভৃতি ধ্বনি দিত। পুলিশ এদিকে কোনো দৃষ্টিই নিক্ষেপ করতো না।

১৫. মালকাপুরে নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে দিয়ে বাদ্যসহ একটি শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল। মহররমের সময় একটি তাজিয়া পুড়িয়ে দেওয়া হলে কয়েকজন মুসলিম যারা শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিল তাদের লাঠি বর্শা দ্বারা আক্রমণ করা হয়।

১৬. মুর্তজাপুর আর্যসমাজীরা হায়দারাবাদ বিরোধী সভা ডেকেছিল। এসময় মুসলমানরাও নবী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সভা ডেকেছিল। মুসলমানদের সভায় ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হলো। অথচ সাজা ভোগ করল শুধু মুসলমানরাই।

১৭. একটি হিন্দু বালিকা ঘটিত ব্যাপারে একজন মুসলমানের জেল হলো। জেল খাটা থেকে তাঁকে রেহাই দেয়ার জন্য মি. শরীফকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেতে হয়েছিল। অথচ তখনই একজন কংগ্রেস মন্ত্রী হোসাঙ্গাবাদের একজন হিন্দু গানওয়ালাকে আরো মারাত্মক অপরাধে প্রাপ্ত মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এ ঘটনায় নির্যাতিত হয়েছিল একজন মুসলিম মহিলা এবং অপরাধী ছিল একজন হিন্দু। এ একটিমাত্র ঘটনা থেকেই কংগ্রেস মন্ত্রীবর্গের মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮. এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে যখন স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ মুসলমান কর্মচারীদেরকে জোর করে কংগ্রেস সদস্য হতে বাধ্য করেছে।

১৯. অনেক জায়গায় গরু কেনা-বেচা ও জবাই করার উপর ট্যাকসের টাকা ধার্য করা হয়েছে। খাস খাউনে, নলুয়া, চীফলা, বুলকশা, আকলা, কার্জিয়া, মুর্তজাপুর, আরকট, আমরাওতী, ধামাং গাও, ইউটামলে, ঘাটাংগী এবং উন এ সমস্ত মিউনিসিপ্যাল্টিতে গরু হত্যার উপর অত্যাধিক মাত্রায় ট্যাকস ধার্য করা হয়েছিল এবং উপ আইন তৈরী করে গরু বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল।

২০. খাসগাও-এ মিউনিসিপ্যালটি কমিটি একটি মুসলিম হাইস্কুলের মঞ্জুরী বন্ধ করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে এ স্কুলটি সবসময় সাহয্য পেয়ে আসছিল।

২১. বাল-গঙ্গাধর তিলক এবং গান্ধীজির জন্মদিবসকে ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারিভাবে মহাত্মা উপাধি স্বীকৃত না হলেও মুসলমানদের উক্ত উপাধি ব্যবহার করে সম্বোধন করতে বলা হয়েছিল।

২২. কয়েকটি লোকাল বোর্ড উর্দু স্কুলগুলোতে এ মর্মে লিখিত আদেশ জারী করেছিল যে, তাদের গান্ধী জয়ন্তী পালন ও গান্ধীর মূর্তি পূজা করতে হবে।

২৩. হিংগাল হাট মিউনিসিপ্যালটির মুসলমানদের 'পবিত্র পানির' ব্যবসার ওপর অত্যাধিক লাইসেন্স ফী ধার্য করা হয়। উক্ত ব্যবসায় প্রায় সবটাই মুসলমানদের হাতে ছিল। ইটর্যাসি মিউনিসিপ্যালটি সাধারণভাবে এমন-কি বকর ঈদের সময় মিউনিসিপ্যালটি এলাকায় গো-হত্যা নিষেধ করে দিয়েছিল।

২৪. প্রদেশের ২৩ টি লোকাল বোর্ডের এক হাজার পাঁচ'শ নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে আধডজনেরও কম ছিল মুসলমান নির্বাচিত সদস্য এবং মাত্র পনের জনের মত ছিল মুসলমান কর্মচারী।

২৫. মন্ত্রী ও সরকারি কর্মচারীরা খোলাখুলিভাবে জনসাধারণকে মুসলিম লীগের কাজে অংশ গ্রহণ না করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং এ ও বলেছে যে এর অন্যথা করলে তারা যেন সরকারের কোনো সাহায্য প্রত্যাশা না করে।

২৬. খাসগাও-এ মিউনিসিপ্যালটি কমিটি এ অজুহাতে মাধ্যমিক উর্দু স্কুলে মঞ্জুরী অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করেছে যে, উর্দু শিক্ষায় সাহায্য করলে সংকীর্ণতাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। চাকরি

২৭. সমস্ত সরকারি ও স্থানীয় সংস্থার স্কুলগুলোতে মুসলমান বালকদের হয় 'বন্দে মাতরম' গান গাইতে হয়, নয় উক্ত গান গাইবার সময় হিন্দুদের মতো মাথা নত করতে হয়।

২৮. অধস্তন মুসলিম কর্মচারীরা উপরস্থ হিন্দু কর্মচারীদের দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে। এগুলো বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে জব্বলপুর, সওগর এবং দামেতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর।

২৯. খাসগাওতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এ মর্মে একটা লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যে, জব্বলপুর মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্যসহ কোনো শোভাযাত্রা যেতে দেওয়া হবেনা। রমযান মাসে এ চুক্তি ভঙ্গ করে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে সাভারকারের শোভাযাত্রা যেতে দেওয়া হয়েছে। সরকারকে ব্যাপারটি জানানো হলে সরকার নীরবতা পালন করে।

৩০. এখানে মুসলমান কসাইদের সাজা দেওয়া হয় এবং গরু জোর করে ছিনিয়ে নেয়ার কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তাতে কোনো অপরাধীকে সাজা দেওয়া বা... কোনো সাহায্য করা হয়নি।

৩১. মুসলিম কৃষকদের নাজেহাল করে কয়েকটি প্যটেল এবং পাটোয়ারীপন্থী অনেকগুলো মামলা দায়ের করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাওয়ানোবায় মুসলিম কৃষকদের উপর অন্যায় আদেশ জারী করা হয়েছিল।

৩২. যেসমস্ত শিক্ষকরা মুসলিম কমিটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়েছে।

৩৩. একজন শহর পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং একজন সহকারী পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টকে অপদস্থ করা হয়, কারণ তারা একজন মুসলিম বালিকার অভিযোগ সমর্থন করেছিল। তার অভিযোগ ছিল একজন উপরস্থ হিন্দুর বিরুদ্ধে যে তার উপর অত্যাচার করেছিল মামলাটি চেপে যাওয়া হয় এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

৩৪. মিউনিসিপ্যাল ফান্ড জমা না দেয়ার জন্য একজন কংগ্রেস এম এল এর ভাইকে দণ্ড দেয়ায় একজন মুসলিম সুপারিনটেনডেন্টকে উল্টো দণ্ডভোগ করতে হয়।

৩৫. মুসলিম সঙ্গগঠনসমূহকে মঞ্জুরী দেওয়া বা সহানুভূতি দেখানোর জন্য সমস্ত মুসলিম অনারারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

৩৬. মন্ত্রীসভা জব্বলপুর এর কোতওয়ালিসংলগ্ন মুসলমানদের জমি দখল করার জন্য হিন্দুদেরকে আদেশ দিয়েছে।

৩৭. আলমেহের মিউনিসিপ্যাল কমিটি কংগ্রেসের আদেশ অনুযায়ী তার আওতাধীন সমস্ত মুসলমান দুধ বিক্রেতাদের ভোটারলিস্টে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছে।

৩৮. কংগ্রেস সরকার সমস্ত হিন্দু তাতীদের সাহায্যের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে। কিন্তু মুসলমান তাতীদের কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি।

৩৯. হিন্দুদের অবাধে এবং সংগঠিতভাবে কসাইদের কাছে মুসলমানদের গরু বিক্রি করায় বাধা দেয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

৪০. জব্বলপুরের আঞ্জুমানে ইসলামিয়া প্রেস সহকারী কাগজপত্র ছাপানোর অর্ডার পেত এবং তার মুনাফা দিয়ে সেখানকার একমাত্র উর্দু হাইস্কুলটি চলত। কংগ্রেস সরকার সেখান থেকে তাদের কাগজপত্র ছাপানো বন্ধ করে দেয়। ফলে উর্দু হাইস্কুলটি অত্যন্ত অসুবিধায় পতিত হয়।

৪১. যদিও জব্বলপুরে মুসলমানদের শতকরা ২৫ জন, তবুও সেখানে জেলা অফিসে ক্রমবর্ধমানভাবে মুসলিম কর্মচারী কমানো হয়।

৪২. সাউগরের মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের মুসলিম ছাত্রদের 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাইবার আদেশ দিয়েছে, অন্যথায় স্কুল ত্যাগ করতে বলেছে।

৪৩. কতগুলো জায়গায়, উদাহরণস্বরূপ মান্দখানায় গরু কোরবানি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আমি যেসব খবর পেয়েছি তার বর্ণনা এখানেই শেষ করছি। এমন হতে পারে যে, কোনো কোনো জায়গায় দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে হয়তো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সে খবর এখনও আমার কাছে পৌছায়নি। তাতেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মামলাগুলোর কোনো তারতম্য হবে না। কেউ একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, অসহায় মুসলমানরা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল, মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিল এবং সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক কম ছিল বলে তাদের দূর্ভোগ চরমে পৌছে ছিল। কংগ্রেসের শাসন আমলে মুসলমানদের সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করতে এবং জঘণ্য আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে আইনের শাসন ছিল অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় এমনকি আদৌ ছিল না বললেই হয়।"[১০৫]

---

১০৫. বাংলার জী… - ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ১৯৮-২২৮]

সাম্প্রদায়িকতা : বিবিধ

এক

'...রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় সফরে। রামানন্দ বাবু মাঝে মাঝে আসিয়া শান্তিনিকেতনের কাজ দেখাশুনা করেন। এমন সময় একদিন এক অঘটন ঘটিল। হিন্দু মহাসভার এক বক্তা আসিয়া শান্তিনিকে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে এক বক্তৃতা দিলেন। এখানকার নিত্য একঘেয়ে জীবনে ম্যাজিক লণ্ঠনের দেখা মস্ত বড় আকর্ষণের ব্যাপার। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষকদের স্ত্রী-পুত্র সকলে আসিয়া একস্থানে হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, 'বাঙলায় নারী নির্যাতন'।

জ্বালাময়ী বক্তৃতা সহযোগে বক্তা ছবির উপর ছবি দেখাইয়া চলিলেন। লুঙ্গীপরা মুসলমান গুণ্ডারা যুবতী মেয়েটিকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার চিৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হইতেছে। এ মেয়েকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ছালায় ভরিয়া মুসলমান গুণ্ডারা নদীতে ফেলিয়া দিতে যাইতে তেমনি নানারকম হৃদয় বিদারক দৃশ্য। তারপর তিনি রামায়ণের ছবি দেখাইলেন। সীতাকে রাবণ হ করিয়া লইয়া যাইতেছে! তারপর রাম-লক্ষ্ণ ধনুর্বাণ লইয়া কি করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করিতেছে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের দৃশ্য দেখাইয়া তারপর দেখাইলেন কি করিয়া ভীম-অর্জুন নকুল-সহদেব দুর্যোধন নিধন করিয়াছিলেন। এই সব দেখাইয়া বক্তা তার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন, 'হিন্দুগণ! প্রস্তুত হও যেমন করিয়া ভীম-অর্জুন-নকুল দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, যেমন করিয়া রাম-লক্ষ্ণ সীতা হরণের পর রাবণকে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া আসুন আমরা মুসলমানদিগে সবংশে নিধন করি। বক্তৃতা শেষ হইল। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই যার যা মত চলিয়া গেলেন। তাহারা কি মনোবৃত্তি লইয়া চলিয়া গেলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কেহ এই বক্তৃতার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। আমার সমস্ত অন্তর বেদনায় রি রি করিতে লাগিল। আ রবীন্দ্রনাথ সুদূর আমেরিকায়। তিনি থাকিলে কখনো এরূপ বক্তৃতার অনুমতি দিতেন না।

তা নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সারা রাত আমার ঘুম হইল না। নিজেকে মনে মনে কেবলই ধিক্কার দিতেছিলাম। আমি কেন সেই সভায় বক্তার এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করিলাম না। আমি উপস্থিত থাকিতে আমার সম্প্রদায়কে কেন এইভাবে এক তরফা আক্রমণ করিতে দিলাম?

প্রতিদিন ভোরে গ্রন্থাগারের সামনে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষকেরা মিলিত হইয়া প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার শেষে কয়েকজন শিক্ষক ও অধ্যাপকের সঙ্গে মিলিত হইলাম। তাহারা প্রত্যেকে বিগত রাত্রের বক্তৃতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখুন, আপনাদের সম্প্রদায় যে এইভাবে হিন্দু মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, আপনার মত উদারপ্রাণ মুসলমানের কাছে আমরা এর প্রতিবাদের আশা করি।' আমি বলিলাম, 'রবীন্দ্রনাথের এই পবিত্র ভূমিতে হিন্দু মহাসভার বক্তা যে ভাবে মিথ্যা নারী-নির্যাতনের নামে আমার সম্প্রদায়কে একতরফা আক্রমণ করে গেলেন, আমার মনে খুবই আশা ছিল আপনাদের মত উদারমনা শিক্ষকদের মধ্যে কেউ ইহার প্রতিবাদ করেন।'

আমার কথা বলা মাত্র যেন মৌমাছির চাকে ঢিল পড়িল। একজন বলিলেন, 'আপনার কাছে এরূপ উত্তর আশা করিনি।' আমি বলিলাম, 'কি উত্তর আশা করেছিলেন? আপনাদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মত বলব যে, বক্তার বক্তৃতা সবই সত্য। আপনারা আশা করেছিলেন আমি স্বীকার করব আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব আমার সমাজের আপামর সাধারণ সবাই হিন্দু রমণীকে বলৎকার করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে? আপনারা আশা করেছিলেন আমার সমাজকে এই ভাবে হেয় করে আমি আপনাদের কাছে উদারমনা বলে পরিচিত হব?'

আর একজন বলিলেন, 'তবে কি আপনি বলতে চান কালকে যে সকল ঘটনার কাহিনী বক্তা ছায়াচিত্র-যোগে দেখালেন তা সবই মিথ্যে?'

আমি উত্তর করিলাম, 'সব মিথ্যে কিনা বলতে পারব না। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে গুণ্ডা বদমাশ নেই। কিন্তু একজন মুসলমান গুণ্ডা একজন হিন্দু মেয়েকে হরণ করে নিয়ে এসেছে এজন্য গোটা মুসলিম সমাজকে দায়ী করার কোন যুক্তি আছে বলতে পারেন? কাল কি শুনলেন বক্তার মুখে? রাম-লক্ষণ যেমন সীতা হরণের জন্য রাবণকে সবংশে নিধন করেছিল, দ্রৌপদী হরণের জন্য ভীম-অর্জুন যেমন দুর্যোধনকে নিধন করেছিল, তেমনি মুসলিম ধ্বংসের জন্য বক্তা আপনাদের কাছে আবেদন জানালেন। এই যদি সমস্ত হিন্দু সমাজের মনোবৃত্তি হয় তবে কোন্ আকর্ষণের জোরে আমরা আপনাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকব? আপনাদের হিন্দু সমাজে গুণ্ডা নেই? বদমাশ নেই? কলকাতার অসংখ্য পতিতালয়ে যারা দেহ ব্যবসার জন্য আসে তাদের এখানে কারা নিয়ে আসে? মুসলমানেরা না হিন্দুরা?'

একজন প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, এই মুসলমান গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কোন মুসলমানই কেন প্রতিবাদ করে না?'

আমি বলিলাম, 'করে, নিশ্চয়ই করে। আমাদের পূর্ববঙ্গে হিন্দুর পাড়ার সঙ্গে মুসলমানের পাড়া। স্ত্রী পুত্র দেশে রেখে বহু হিন্দু বিদেশে চাকুরী করতে যায়। মুসলমানেরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। জানেন? আমাদের পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা অনেক কম। মুসলমানেরা সবাই বদমাশ অথবা বদমাশদের সমর্থক এই যদি আপনারা বলতে চান, তবে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মেয়েদের শালীনতার উপরে কতটা কটাক্ষপাত করলেন একবার ভেবে দেখেছেন? কাল বক্তা ছবিতে দেখালেন একটি হিন্দু মেয়েকে কেটে কুচি কুচি করে মুসলমান বদমাশ নদীতে ফেলে দিতে যাচ্ছে। আচ্ছা বলুন ত, বলৎকার করার জন্য যে সব মেয়েকে তারা নিয়ে যায়, তাদের ত শাড়ী গহনা দিয়ে আরও যত্ন করে রাখার কথা। কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেবে কেন? জানেন অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে ভালবাসা করে স্বেচ্ছায় ঘরের বার হয়ে যায়?' দুই তিন ভদ্রলোক রি রি করিয়া উঠিলেন, 'বড় আজগুবি কথা শুনালেন ত?'

আমি ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিলাম, 'যদি বিশ্বাস না করতে চান আমার ঘরে আসবেন। হিন্দু মেয়েদের লেখা বিশখানা প্রেমপত্র আপনাদের দেখাতে পারব।' বস্তুতঃ আমার কাছে এরূপ একখানা প্রেমপত্রও ছিল না। আমার কথা শুনিয়া ভদ্রমহোদয়েরা একে একে চলিয়া গেলেন।

তখনকার শান্তিনিকেতন একটি ছোট পুকুরের মত। একটা ঢিল দিলে চারি পাড়ে যাইয়া ঢেউ আছড়াইয়া পড়ে। এর কান হইতে ওর কানে-ওর কান হইতে তার কানে কথা ছড়াইতে বেশী সময় লাগে না। এখানে শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রচুর অবসর। সারাদিন যেখানে সেখানে ফিস্ ফিস্ আলোচনা চলিল। বন্ধু নিশীকান্ত আর সান্ত্বনার মারফত তার যথাযথ বর্ণনা পাইতে লাগিলাম। স্বয়ং রমানন্দ বাবু এখানকার বড় বড় নেতাদের লইয়া আমার বিষয়ে আলোচনা করিলেন। নন্দলাল বাবু নাকি বলিলেন, আমার প্রতি আর তার মনে কোন স্নেহ-মমতা নেই। শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। মানুষের স্নেহ-মমতা এতই ক্ষণস্থায়ী যে এতটুকুতেই তা খসিয়া পড়ে।

একদিন প্রভাতদা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'জসিম! তোমার বিরুদ্ধে এখানে ভীষণ আলোচনা চলছে। এখানকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

বলিলাম, 'আমি ত কোন অপরাধ করি নাই। অপরাধ করেছে এখানকার কর্তৃপক্ষ, রবীন্দ্রনাথের এই শান্তির নিকেতনে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা করতে দিয়েছে। তাদের যদি সাহস থাকে জোর করে আমাকে এখান হতে তাড়িয়ে দিক। লোকের কাছে প্রকাশ হউক, সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার প্রতিবাদ করে আমি এখান হতে বিতাড়িত হয়েছি। এখানকার লোকদের মানসিকতা দেখে এখানে থাকবার আমার তিলমাত্র ইচ্ছা নেই। আর পাঁচ-ছয় দিন পরে বর্ষা মঙ্গলের উৎসব হবে। সেটা দেখে আমি আপনা হতেই চলে যাব।'

এরপর আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-ছাত্র কেহ কথা বলে না। তার জন্য আমার কোন তোয়াক্কাও ছিল না। নিশীকান্ত আর সান্ত্বনা আমার সঙ্গী। তিন বন্ধুতে গল্প করিয়া কবিতা লিখিয়া সময় কাটে। আর সকাল বেলা প্রভাতদার বাসায় যাইয়া আসর জমাই। এখানে আমার আদর-যত্নের এতটুকুও কম হয় না।

শেষবর্ষণ অনুষ্ঠান শেষ হইলে কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। রাতের পর রাত আমার ঘুম হয় না। আমি নীরবে এই অপমান হজম করিয়া আসিলাম, এই চিন্তা আমাকে তিলে তিলে দাহন করিতে লাগিল।

এই ঘটনার প্রতিবাদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া বন্ধুবর বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পড়িয়া শুনাইলাম। সে বলিল, 'তোমার নামে যদি এই লেখা প্রকাশ হয় লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে। তাছাড়া তোমাদের সমাজে এতে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এক কাজ কর। লেখাটি নকল করে আন। ওটি আমার নামে ছাপা হবে। তাতে আমাদের সমাজে আমার কিছুটা বদনাম হতে পারে। তা' আমি গ্রাহ্য করিনে। তোমাদের সমাজের লোকেরা জানবে হিন্দু সমাজে এমন বহু লোক আছে যারা মিথ্যা সমাজ ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।' উত্তেজনা কমিয়া গেলে লেখাটি আর নকল করিয়া প্রেসে পাঠাই নাই। সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি এখনও আমার খাতায় আছে।"[১০৬]

দুই

'...বাংলা দেশের বড় বড় শহরে-বন্দরে নোয়াখালী জেলার দরিদ্র ভূমিহীন ব্যক্তিরা শ্রমিক হিসাবে কাজ কর্ম করে। কলকাতার দাঙ্গায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এ জেলার শ্রমিকেরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। নোয়াখালী জেলার নানা অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যায় কম হলেও ধন-দৌলতে, জমিদারী, মহাজনী, চাকুরী ও ওকালতিতে শতকরা আশি জন মুসলমান অধিবাসীকে একেবারে পদানত করে রেখেছিল। তাই কলকাতা-পলাতক কয়েকজন শ্রমিকের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে রামগঞ্জ থানার খিলপাড়া গ্রামের মুসলমানেরা এক হিন্দু জমিদারের বাড়ী লুটতরাজ করে। দু'পক্ষের সংঘর্ষের ফলে দু'চার জনের প্রাণ হানিও ঘটে। এরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা জেলার আরও কয়েক স্থানে সংঘটিত হয় এবং তাতে কিছু সংখ্যক হিন্দু নিহত হয়।

একের দোষে অন্যকে শাস্তি দেয়ার বর্বর নীতি কোন ধর্মভীরু মুসলমান মেনে নিতে পারে না। তদুপরি তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ ম্যাকিনার্নী। তিনি সারা জীবন হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টান মিশনারীদের কার্য্যে সাহায্য করে এসেছেন এবং তার এ সক্রিয় সাহায্যের দ্বারাই বহু হিন্দু খৃষ্টান হয়েছে। তিনি অতি সত্বর দৃঢ় হস্তে এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করেন এবং তার মুখে আমি শুনেছি এ দাঙ্গায় হিন্দু নিহতদের সংখ্যা সত্তর হতে একশ জনের মধ্যেই ছিল। যেদিন আমি এ দাঙ্গার কথা শুনি, সেদিন আমার সমস্ত অন্তর হায় হায় করে উঠেছিল। আমার আশঙ্কা হল' এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম মাইনরিটি প্রদেশ সমূহে অত্যন্ত ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠবে। ফলতঃ হলও তাই।

পাটনা শহরকে কেন্দ্র করে বিহার শরীফ ও অন্যান্য অঞ্চলে অতি অল্প দিনের মধ্যে এক নারকীয় দৃশ্য পৃথিবীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল। দশ সহস্র নরনারী, যাদের বেশীর ভাগ ছিল রমণী ও শিশু - নৃশংস ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাল। এদের শাণিত অস্ত্রে ছিন্নমস্তা, ছিন্ন-স্তন্যা ও ক্ষত-যোণী, কত কুমারী-কন্যাও পাশবিক অত্যাচারে প্রাণ হারাল তার কোন হিসেব নেই। স্থানীয় কূয়া সমূহের অন্ধকার বুকে কত জন ঝাঁপিয়ে পড়ে ইজ্জত রক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল, তারও কোন লেখাজোকা নেই। রাজস্থানের কল্প-কাহিনীর জহরব্রত ও অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি এ ঐতিহাসিক নৃশংসতার পাশে ম্লান হয়ে যায়। ১৯১৪ ইংরেজীতে এ প্রদেশেরই 'আরা' জিলায় গো-কোরবাণী নিয়ে যে মুসলিম নিধনযজ্ঞের সূত্রপাত হয়, ১৯৪৬ এর প্রদেশব্যাপী হত্যাকাণ্ডে তার সমাপ্তি ঘটে।

উত্তর প্রদেশ ও বিহারে মুসলমান সংখ্যালঘু হয়েও সমাজে, ব্যবসা বাণিজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠদের চেয়েও অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে পাকিস্তানের জন্মের পূর্বেই বিহার হতে মুসলিম প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল। গভীর আতঙ্কে ও হতাশায় সেখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর হাজার হাজার লোক এক বস্ত্রে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় জন্মভূমির মায়া চিরতরে ত্যাগ করে বাংলায় এবং পরে পূর্ব বাংলায়

---

[১০৬]. জসীম উদদীন/ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়।[পলাশ প্রকাশনী - জুলাই, ১৯৬৮। পৃ. ২৬-২৯]

হিজরতের দ্বারা আত্মরক্ষা করেছিল। তাই পাকিস্তান হবার পরে এ প্রদেশের দু-এক জায়গায় যে সামান্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অগ্নিশিখা দেখা দিয়েছিল, তাতে গৃহ বিতাড়িত, অত্যাচারিত বিহারীদের অন্তর্দাহের হল্কা ছিল। তারা তাদের অশেষ দুর্গতির ইতিহাস এখনও ভুলতে পারছে না।

ভারতের তথা বাঙলার অধিকাংশ পত্রিকা হিন্দুদের হাতে ছিল। ইংরেজের পত্রিকাসমূহের সংবাদ দাতারাও ছিল অধিকাংশ হিন্দু। সুতরাং কলকাতার দাঙ্গা হতে শুরু করে নোয়াখালী ও বিহারের দাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেয়ার অবিরাম প্রচারণা চলতে লাগল। এরূপ প্রচারণার ফলে নোয়াখালীর দাঙ্গার-বিন্দু কলকাতা ও বিহারের রক্ত-সিন্ধুর চেয়েও ভয়াবহ আকারে হিন্দু ভারতের সহানুভূতির সাগরে তরঙ্গের হিল্লোল তুলল। এ তরঙ্গের দোলায় গান্ধীজির মত সত্যাগ্রহী লোকও নোয়াখালীর চর-ভূমিতে ভেসে আসেন এবং চাটখিলের এক হিন্দু জমিদার বাড়ীতে আস্তা গেড়ে, হেঁটে হেঁটে চরবাসিদের তুষার-স্তূপে শীতল বারি সিঞ্চনে মাসের পর মাস কাটালেন। কিন্তু বিহারে মুসলিম ধ্বংসের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভাপ্রবাহ মহাত্মাকে নোয়াখালীর নারিকেল ও সুপারী বৃক্ষের সুশীতল ছায়া থেকে শ্বাসরোধী দগ্ধ আবহাওয়ায় নিয়ে যেতে পারল না। এ সময় হতে মহাত্মার বিমল-চরিত্রে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের চোখে কালিমার গাঢ় ছায়া ধরা পড়ে। তৎপর তিনি যখন আসামের প্রধান মন্ত্রী বরদলৈর কংগ্রেস গৃহীত কেবিনেট মিশন প্লেনের চিহ্নিত গ্রুপগুলির অঙ্গ বিশেষের রুক্ষ হতেই গ্রুপ তাদের স্বাধীনতার দাবীকে নোয়াখালীতে বসে সজোরে সমর্থন করে বসলেন, তখন তার নির্মল চরিত্রে সে কালো-ছায়া ঘোরতর কৃষ্ণঃ বর্ণ ধারণ করে। তখন হতে মুসলমানের মনে হিন্দু বিভীষিকার প্রচণ্ড স্বরও মূর্ত হয়ে উঠে। হয়তঃ এ গোপন পাপের দুষ্ট কীট নষ্ট করে তার নির্মল শুভ্র পবিত্রতাকে অমিন মহাত্মে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাকে নাথুরামের গুলিতে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। কারণ দিল্লীর মুসলিম নিধন যজ্ঞের হোমানলে তার জল সিঞ্চন প্রচেষ্টা বিহার ও আসামের মুসলমানদের প্রতি অকরুন মনোভাবের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তরূপে পরম ও চরম সত্যের মানদণ্ডে যথেষ্ট বিবেচিত হয় নি।

...হিন্দুরা কেন যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় জেলা থেকে চলে গিয়েছে তার কারণ অনেক অনুসন্ধান করার পরও আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। তবে দু'টি অতি সাধারণ ও সামান্য কারণ অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে ভেবে দেখতে বলেন। এর মধ্যে একটি হল, উঁচু স্তরের হিন্দুদের আজন্ম পোষিত মুসলিম বিদ্বেষ এবং এ বিদ্বেষবশতঃ এক জোটে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে একে বিকল করে দেবার সংকল্প। অন্য কারণটি হল, একই বিদ্বেষগ্রস্ত ভারতীয়দের সাদর আহ্বান ও সম্মানজনক পুনর্বাসনের অজস্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। কাজ কারবারে, চাষাবাদে, জমির ভোগ দখলে, চাকুরী সংস্থানে মুসলমানে মুসলমানে, এমন কি ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ঝগড়া ফ্যাসাদ ও খুনাখুনি হয়, এসব ব্যাপার নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও তেমনটি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এসব দৈনন্দিন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক জুলুমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেশ বিদেশে ভারতীয় হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশের ফলে দু সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত শিথিল হতে থাকে। এ সব মিথ্যা প্রচারণার ফলে ভারতীয় হিন্দু মহলে সাম্প্রদায়িকতার আগুণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ বিপন্ন করে রেখেছে এবং যখন ইচ্ছা তখনই সুপরিকল্পিত উপায়ে তাদের ধ্বংস করে চলেছে।

এখানে অন্নদাশঙ্করের উনসত্তর ইংরেজীর লিখা ও ভারতীয় 'উল্টো রথ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাইশ বছর আগে' নামক প্রবন্ধের কিছুটা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না :

'...দেশ ভাগ হয়ে যাবার আগে আমি জানতে পাই যে আমাকে হাওড়ায় বদলী করা হয়েছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ায় সারকিট হাউসে আমার জন্যে জায়গা রাখার টেলিগ্রাম করি। টেলিগ্রামের জবাব টেলিগ্রামেই পাওয়া দরকার, কারণ ময়মনসিং থেকে আমি বেরোতে পারলেই বাঁচি। পাকিস্তানের নিশানকে আমি সেলাম করতে পারতুম না। তা ছাড়া আমার আর কোন প্রেজুডিস ছিল না। বিস্তর মুসলমান আমার বন্ধু। তাদের সুখে আমি সুখী।

কিন্তু টেলিগ্রামের জবাব আর আসেই না। এদিকে ময়মনসিং ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অনেক লটবহর। আমরা স্বামী স্ত্রী। আমাদের চারটি ছেলেমেয়ে। চাকরবাকর লোকজন জেলা জজের যেমন থাকে। তাদের মধ্যে বাবুর্চিটি মুসলমান। তাকে নিয়েই ভাবনা। তাকে দেখলে হিন্দু বলেই অথচ ভ্রম হয়। সে আমাদের সঙ্গে আসতে ও সেবা করতেও উৎসুক। বেচারাকে সঙ্গী করতে আমি নিজেই অনিচ্ছুক। কোথায় কে কখন টের পাবে যে সে মুসলমান, অমনি বুকে বা পিঠে ছোরা বসিয়ে দেবে। কলকাতার হাল-চাল কানে আসছিল তো আমার। আমি কেমন করে একজনের জান বাঁচানোর দায়িত্ব নিই? ওই গোলমালের সময়।

সবচেয়ে কষ্ট হয় মুসলিম বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। এর পরে তারা বনে যাবে পাকিস্তানী। করবেন পাকিস্তান সরকারের চাকরি। তাদের সঙ্গে আমার আর কোনদিন এক ষ্টেশনে কাজ করা সম্ভব হবে না। এই শেষ। তবে দেখা সাক্ষাৎ হবে না কেন? দুই রাষ্ট্রের পথঘাট তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। দুই বাংলার যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে নিশ্চয়। তখন ভাবতেই পারিনি যে কলকাতা থেকে বরং লন্ডন প্যারিস যাত্রাপথ আরও সুগম হবে, কিন্তু কলকাতা থেকে ঢাকা ময়মনসিং যাত্রাপথ অরও দুর্গম। পূর্ব্ব বঙ্গের খবর পেতে হলে আমেরিকায় চিঠি লিখতে হবে, আর খবর দিতে হলে পশ্চিম জার্মানীতে।

কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি সে সময় হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও এমন অস্বাভাবিক হয়নি। কেন যে এ রকম হল সে অনেক কথা। দোষ একপক্ষের নয়। এক হাতে তালি বাজে না। ময়মনসিং থেকে চলে আসার কিছুদিন আগে আমার এক পুরাতন মুসলমান বন্ধু দেখা করতে আসেন। তিনি বলেন, এখন আমি বুঝতে পারছি যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা ধর্মের বিরোধ নয়। এটা জমিদারের সঙ্গে প্রজার। এটা শ্রেণী বিরোধ। এ বিরোধ থাকবে না।

হ্যাঁ, জমিদারেরা ছিলেন প্রথমতঃ হিন্দু, আর প্রজারা প্রধানতঃ মুসলমান। যেমন ক্যাপিটালিষ্টরা প্রধানতঃ ইংরেজ, আর শোষিতরা প্রধানতঃ ভারতীয়। শোষণ বন্ধ হয়ে গেলে সম্পর্কের উন্নতি হবে এটা সত্য। তবে এটাই একমাত্র সত্য নয়। হিন্দুর জাত্যহঙ্কার একান্ত প্রবল। এতে মানুষকে পর করে দেয়। সত্য দূরে সরিয়ে রাখে। আর মুসলমান যদি গোমাংসটা না খেত তাহলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া এমন দুষ্কর হত না।

ময়মনসিং থেকে বিদায়ের পূর্ব্বে একদিন কুমিল্লা থেকে কামিনী কুমার দত্ত মহাশয় আসেন। কুমিল্লায় যখন ছিলুম তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল। প্র্যাকটিস কখন করতেন জানিনে, রাজনীতি নিয়েই থাকতেন, তাও কৃষক প্রজার রাজনীতি। মুসলমান মহলে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, একটা কথা আমি জানতে চাই। নোয়াখালীতে সত্যি কি হয়েছিল?'

এ কামিনী বাবু একটু হেসে বলেন, 'এমন কিছু হয়নি'।

তারপর তিনি যে বিবরণ দেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে খবরের কাগজের বিবরণ ঘোরতর অতিরঞ্জিত। নোয়াখালীর জন্যই আমাদের মন ভেঙ্গে যায় বলেই আমরা পার্টিশন দাবী করি। অথচ এই আমরাই এক কালে তার বিপরীতটাই দাবী করেছিলুম। কিন্তু যে তথ্যের উপরে সে দাবী সে তথ্যই অতিরঞ্জনে ভরা।

কেন তা হলে আমরা এই সোনার দেশ ফেলে চলে যাচ্ছি? কিসের ভয়ে বা কিসের প্রলোভনে? পশ্চিমবঙ্গ কী দিতে পারে দেড় কোটি পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুকে? কামিনী বাবু আমার মনে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দেন তা আজো অনির্বাণ। যদিও কামিনী বাবুর নির্বাণ হয়েছে। তিনি তার স্বস্থান ছাড়েননি। মুসলমানকে তিনি ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। আর তার ধন-সম্পদও ত মুসলমানের আস্থাভাজন উকিলরূপে।

ময়মনসিং এ থাকতে একটা ভয়াবহ নৌকাডুবি হয়ে যায়, ফেরী ঘাটের অদূরে। অতিরিক্ত যাত্রী সংখ্যা ও মালের ওজনে ফেরী নৌকা ডুবে যায়। লোকে যদি যুক্তি শুনত তা হলে বহু অমূল্য প্রাণ রক্ষা পেত।

আমাকে যখন বিদায় দেয়া হয় তখন উকিলদের সেই বিদায় সভায় আমি বলি, 'সবাই যদি পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে ভিড় করে তা হলে পশ্চিম ওই ফেরী নৌকার মত ডুববে। তখন কেউ বাঁচবে না। না পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু। না পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দু। আর এক দল ইহুদীর সৃষ্টি হবে — ভ্রাম্যমান ইহুদী।'

যাক, আমার ত পূর্ব্ব বঙ্গে বাড়ী নয়, থাকবারও জো ছিল না। একদিন সত্যি সত্যি আমরা ষ্টেশনে যাই ট্রেন ধরতে। ষ্টেশনে তখন বোমা ফাটছে। ওটা নাকি কামান দেগে ষ্টেশন মাষ্টারকে স্যালিউট জানানো, একুশ বার স্যালিউট। কখনও এমন কাণ্ড দেখিনি বা শুনিনি। জানতে চাই কেন এত সম্মান। উত্তর পাই, উনিই এ ষ্টেশনের প্রথম মুসলমান ষ্টেশন মাষ্টার। এতদিন যারা ছিলেন তারা সবাই হিন্দু। শুধু হিন্দু নন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। জমি দেবার সময় মহারাজা নিয়ম করেছিলেন যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ ষ্টেশন মাষ্টার হতে পারবেন না। ওটা ত তবু উনবিংশ শতাব্দির - এক জমিদারের স্বজাতিপ্রীতি। কিন্তু আমি থাকতেই দুর্গাপুর মুন্সেফিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন মুন্সেফ পাঠানো চলত না। মুনসেফের জন্যে যে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল তার বাড়িওয়ালার শর্ত ছিল যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন অফিসার সে বাড়ীতে থাকতে পারবেন না। তাই আমরা মুসলমান অফিসার পাঠিয়েই তাকে ফেরত নিয়েছি। আবার মজা এই যে ব্রাহ্মণ অফিসারও সেখানে থাকতে চান না। দুর্গম স্থান।

দুর্গাপুর থেকে ফিরতি পথে এক মুসলমান গাইয়ের সঙ্গে আলাপ। লোকটির মধ্যে সরল আন্তরিকতা ছিল। তখনও পার্টিশনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি। আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে গাইয়ে বললেন, 'পাকিস্তান না হলে আমরা বাঁচব না।' ওটা যে একটা জীবন মরণ প্রশ্ন আগে আমার তা মনে হয়নি। বিশিষ্ট লীগ নেতারা কিন্তু আমাকে তেমন কথা বলেননি। তাদের বিশ্বাস ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হবে। কোয়ালিশন হলেই তারা সুখী হতেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পরেও তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা ছিল।।"[১০৭]

তিন

'...বিরাশি বছরের বৃদ্ধ আমি এখন সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে বন্দী হয়ে আছি। চোখে ভালো দেখি না বলে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পড়তে বিরক্তি ধরে যায়। এই অসহায় অবস্থায় শুনছি কাজী নজরুল ইসলামের নাকি নব মূল্যায়ন হবে। তার স্কুল জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নাকি আবার তাকে ধর্মের আবরণে মুড়িয়ে দিতে চাইছেন। নজরুল যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ওপর নির্ভর না করে যোগাভ্যাস করতে গেল তখন তার সাহিত্যিক বন্ধুরা ধন্য ধন্য করেছিলেন। কিন্তু এই ভুলের জন্যে নজরুলের মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্যে অকেজো হয়ে গেল। এখন বাকি আছে শুধু তার দেহটা। এতেও তার সাহিত্যিক বন্ধুদের আশ মেটেনি। শৈলজানন্দ ধর্মাবরণ নিয়ে আবার ছোটাছুটি আরম্ভ করেছেন। নজরুলের গান ও সুর কেন ডুবে গেল, কেন গ্রামোফোন কোম্পানি কোনো কপি না রেখে নজরুলের সমস্ত গানের রেকর্ড নষ্ট করে দিলেন, কেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে নজরুলের গান গাওয়া (ডক্টর কেসকারের মন্ত্রিত্বের সময়ে?) বছরের পর বছর বন্ধ থাকল, এসবের সন্ধান করতে তারা প্রস্তুত নন।

রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তার ক্ষুদ্রনাটিকা 'বসন্ত' উৎসর্গ করেছিলেন। তার উল্লেখ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে আছে কিনা সে খোঁজ নিয়েছে তারা? যদি উল্লেখ না থাকে তবে কেন নেই? নজরুলের এক জন্মদিনে মস্কো রেডিও হঠাৎ তার গান গেয়ে উঠেছিল। তারপরে সে গান কেন আর হলো না তার কারণ কেউ কি ডক্টর বিনয় রায়কে জিজ্ঞাসা করেছে?"[১০৮]

---

১০৭. আবদুর রহমান/যতটুকু মনে পড়ে। [রহমানসন্স পাব্লিকেশান্স - নভেম্বর, ১৯৭২। পৃ. ৩২৫-৩২৭/৫৬৫-৫৬৬]

১০৮. মুজফফর আহমদ/নির্বাচিত প্রবন্ধ। [ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (কলকাতা) - আগস্ট, ২০১১। পৃ. ৩২৮-৩২৯]

চার

'...এমনি ভাবে যে দিন নজরুলের প্রতিভা দিক দিগন্ত নিয়ে প্রসারিত, তাঁর রচিত গান, গজল ও ইসলামী বিশ্বের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে ধনী দরিদ্রের বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গার স্বপ্ন নিয়ে লেখা ইসলামী রেনেসাঁর এই নূতন যুগে যখন মুসলিম যুবকের প্রাণে ও মনে জাগরণের নূতন শিহরণ সঞ্চরিত, তেমনি এক দিনে ১৯২৯ সালে রাজশাহীতে এক সন্ধ্যেয় অধ্যাপক ওমদাতুল ইসলাম সাহেবের বাসায় এক বৈঠকে একজন মুসলিম আইনজীবী অভিযোগ করলেন যে তিনি নিয়মিত রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরীর একজন পাঠক হওয়া সত্ত্বেও তাকে একখন্ড 'গ্রেটওয়ার' এর বই দেয়া হলোনা, কারণ গ্রন্থটি মূল্যবান হেতু কোন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের সম্মতি স্বাক্ষর লাগবে। উল্লেখ্য পাঠাগারের সদস্যগণ সেদিন সবাই হিন্দু রাজা বা অনুরূপ অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

কথাটা নিয়ে আলোচনা হলো এবং রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী বা সমাজ সেবক সংঘে কোন মুসলমান পাঠকদের যে মর্যাদা দেয়া হয় না এটাও আলোচনা হলো। কথাটা নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠক বসলো, মুনসেফ ওবায়দুস সোভান, তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ এর উপস্থিতিতে টি, আই, এম, নুরুন্নবী চৌধুরী আই, সি, এস এর বাসায় শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশে সিদ্ধান্ত হলো অবিলম্বে রাজশাহীতে একটা মুসলিম পাঠাগার ও ক্লাব গঠন করতে হবে। তৎকালীন নাজির সরাফত আলী, অধ্যাপক শরফ উদ্দিন, সেরাজুল ইসলাম, ওমদাতুল ইসলাম, আবুল হামিদ মিয়া, আব্দুল হাকিম খান চৌধুরী, কসিরুদ্দিন মৃধা, আজিজুল আলম আরও অনেকে এগিয়ে এলেন। কিছু তরুণ কর্মীও এসে দাঁড়ালেন। সিদ্ধান্ত হলো নূতন ক্লাবের নামকরণ হবে 'দি রাজশাহী মুসলিম ক্লাব'। এবার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ক্লাবের স্থান নির্দিষ্ট হবে হোসেনীগঞ্জে। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, বাংলার জাগ্রত কণ্ঠ মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত, বিদ্রোহী কবিকে দিয়ে এর শুভ উদ্বোধন করতে হবে। মুসলিম ছাত্র কর্মী, সুধী সবার মধ্যেই নূতন সাড়া জাগলো। প্রস্তুতি পর্ব শুরু হলো। রাজশাহীতে কবি নজরুল আসবেন কথাটা অচিন্তনীয় না হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল নিঃসন্দেহে। তৎকালীন প্রবীণ মুসলিম নেতারাও এতে দৃঢ় সমর্থন জানালেন।'[১০৯]

পাঁচ

'...(শওকত ওসমানের) সাহিত্যিক সতীর্থ ছিল কবি আবুল হোসেন, কথাশিল্পী আবু রুশদ, কবি ফররুখ আহমদ ও গোলাম কুদ্দুস। শেষোক্তজন ছাড়া বাকি সবাই পাকিস্তান পাওয়ার পক্ষে। ১৯৪০-৪৭ পর্বে যিনি নিরাপত্তার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার জন্যে পাকিস্তান কি অজান্তেই তা হয়ে উঠেছিল?

তাঁর চিন্তা অথবা ব্যাখ্যা : 'আমাকে বেছে নিতে হবে সরকারি চাকুরি হিসেবে হিন্দুস্থান অথাবা পাকিস্তান। সেই উভয় সংকটে শেষ পর্যন্ত গ্রুপের কথায় ধরা দিতে হলো। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার কোনো মোহ ছিল না এই নতুন রাষ্ট্র সম্পর্কে।...(কিন্তু) ব্যক্তি সেখানে নিরুপায়। ব্যক্তিকে একটি গ্রুপে বা দলবলে বাস করতে হয়। সাহিত্য-জীবন যাদের সঙ্গে সমবিকশিত হচ্ছিল সকলেই পাকিস্তান যাবে। এখানে পাকিস্তান মানে পূর্ব পাকিস্তান। নিকট-সুহৃদ যে কজন ছিল তাদের কেউ হিন্দুস্থানে রইল না। কবি আবুল হোসেন খুলনার অধিবাসী অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা। তার তেমন সমস্যা ছিল না। কথাশিল্পী আবু রুশদের স্থায়ী ঠিকানা কলকাতা। কলকাতায় পৈতৃক বাড়ি। ইচ্ছা করলে থেকে যেতে পারত হিন্দুস্থানে। কিন্তু তা করল না। এভাবে যাদের সঙ্গে ওঠাবসা প্রাত্যহিক সংসর্গতায় আবদ্ধ তাদের সবাই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হতে চলল। আবু রুশদ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব নেই এমন দুনিয়ায় আমার বাস করা কঠিন। প্রাত্যহিক তো পাষাণভারে পরিণত হবে। আজাদ...মুসলিম লীগের পত্রিকা। কিন্তু আড্ডাস্থল হিসেবে আজাদ অফিস তোফা। তাছাড়া সেখানে সবাই তো মুসলিম লীগার নয়। অধিকন্তু অনেকে মুসলিম লীগপন্থী হলেও উদার মানুষ।'

---

[১০৯]. মুহম্মদ আবদুস সামাদ/সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি ‖ [উত্তরা সাহিত্য মজলিশ (রাজশাহী) - নভেম্বর, ১৯৮৭। পৃ. ১৫১-১৫২]

আরেকটি কারণেও শওকত ওসমানের পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল বলে মনে হয়। প্রত্যক্ষ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) সম্পর্কে শওকত ওসমানই লিখেছেন : 'ওদুদ সাহেব তো দেশভাগ হলেও হিন্দুস্থানেই রয়ে গেলেন। তাঁর জন্মভূমি ফরিদপুর জেলা পাকিস্তানে পড়লেও আর স্বদেশে ফিরলেন না।' কিন্তু এই উপসংহারটি খুব প্রীতিকর হয়নি। আবদুল হক লিখেছেন, 'নভেম্বরে লেখা আমার একখানা চিঠির জবাবে তিনি তিনখানা চিঠি লেখেন। সম্প্রতি ঘন ঘন কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। পোস্টকার্ডে লেখা ছোট ছোট চিঠি। এসব চিঠি থেকে তার যে মানবিক অবস্থার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা এই যে, তিনি নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ মনে করেন, কেননা অবসর জীবনে করবার কিছু নেই, প্রায় ৭৫ বছর বয়সে পরিশ্রমসাধ্য কাজ করারও ক্ষমতা নেই, মুসলমান বলে কলকাতায় প্রাপ্য সম্মান হয়তো পাচ্ছেন না হিন্দু সমাজ মুসলমান মনীষীকে আন্তরিক সম্মান করতে শেখেনি (আনুষ্ঠানিক সম্মান ব্যতীত) এবং তাঁর মতো মনীষীকে উপযুক্ত সম্মান করার মতো মুসলিম বুদ্ধিজীবী সেখানে নেই বললেই চলে।'

এছাড়া শওকত ওসমান শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতেও পূর্বেই অর্থাৎ দেশভাগের পরপর তাঁর পূর্ববাংলায় চলে আসার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল বলেই মনে হয়, 'কবি শাহাদৎ হোসেনের শেষ জীবন দুঃখ-দারিদ্র্য ব্যাধি নানা বিড়ম্বনায় কেটেছিল। একদম নির্বাসিত ছিলেন কলকাতা শহরে, সবাই যখন পূর্ব পাকিস্তানে মাইগ্রেট করে চলে গেছে। শেষে অসুস্থ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একদম বেওয়ারিশ কবির লাশ পড়েছিল মর্গে। আইনুল হক খাঁ একমাত্র যিনি খোঁজ নিতেন নিয়মিত, সেদিন যথাসময়ে না পৌঁছলে কবি শাহাদৎ হোসেনের লাশ মুদ্দফরাশরা কোথায় পুড়িয়ে ফেলত বা অন্যভাবে সৎকার করত। গোবরা মুসলিম কবরস্থানে আর দাফন হতো না।'[১১৮]

ছয়

"...তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিশেষ রাজনৈতিক উপাদান হয়েছিলো। যার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব জন্ম নেয় এবং পরবর্তীকালের ভারত বিভক্তির কারণ হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক তফাত খুব বেশি ছিলো না। তবে সর্বভারতীয় সে প্রসঙ্গ বাংলার মুসলমানদেরকেও ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। আমরা যারা সে সময়ে ছাত্র ছিলাম তাদের মধ্যেও বিষয়টি চিন্তার খোরাক হতো। এর আগে হিন্দুদের যে সব বৈশিষ্ট্য মনোযোগ দিয়ে দেখিনি স্বাতন্ত্রবাদের প্রভাবে তখন তা আমরা খুব বড় করে দেখতে থাকি। তাই জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কোথাও কোনো হিন্দুয়ানির ছাপ থাকলে আমাদেরকে তখন তা বিশেষভাবে আলোড়িত করতো।

এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম 'শ্রীপদ্ম' এবং 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের কাছে অস্বস্তিকর বিষয় ছিলো। সমকালীন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদেরকেও তা ভাবিয়েছে। বিষয় দুটো ছিলো হিন্দু মিথোলোজিক্যাল।

১৯৩৪ সালেই আমরা 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রীপদ্ম' মনোগ্রামের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি এবং এ নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলি। এ আন্দোলন চলার সময়ে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা আমাদের সংগঠনের নাম কিছু পরিবর্তন করে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ বা All Bengal Muslim Student's League রাখি। সংগঠনের নাম মুসলিম ছাত্রলীগ হওয়ায় মুসলীম লীগের মতো আমরাও সমকালের বঙ্গীয় মুসলমানের বিরাট অংশের সহমর্মিতা লাভে সমর্থ হই।

---

১১৮. শান্তনু কায়সার/শওকত ওসমান। [বাংলা একাডেমী - জুন, ২০১৩। পৃ. ৩০-৩১]

...আমাদের নবগঠিত এই ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে সহসভাপতি হিসেবে প্রথমে ও পরে সহসভাপতি হিসেবে আবদুল ওয়াসেক বাংলার বহু জেলা শহরে ভ্রমণ করেছেন। তার এই ভ্রমণের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিলো — প্রথমত, ছাত্রলীগের শাখা সংগঠন গঠন করা; এবং দ্বিতীয়ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। অন্যদিকে আমি আমার ছাত্র লীগ সহকর্মীদের নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও মুসলিম ছাত্রনিবাসগুলোতে আমাদের আদর্শ প্রচার করতে থাকি। হিন্দু ছাত্রবন্ধুদের নিকটেও আমরা আমাদের প্রচারণা অব্যাহত রাখি এবং তাদেরকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত; বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্বলতা থাকলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়তে পারে।'

আমাদের এ যুক্তি সে সময়ে বেশ কাজে লেগেছিলো। এভাবে আবদুল ওয়াসেকের গ্রামবাংলা-ভিত্তিক ব্যাপক কর্মতৎপরতা এবং আমি ও আমার বন্ধুদের কলকাতাভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং 'শ্রীপদ্ম' ও 'বন্দে মাতরম' নামক দুটো প্রতীককেই প্রত্যাহার করা হয়। বস্তুত এটাই ছিলো নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের অর্জিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের 'শ্রীপদ্ম-বন্দে মাতরম' আন্দোলনে সে সময়ের বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বন্ধুদের নিকট থেকে উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

...এ সময়ে বাংলাদেশের প্রাদেশিক পরিষদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের সময়ে সরকার এয়ার রেট প্রিকশান (এ আর পি) নামে একটি সরকারি সংস্থা খোলে, যে সংস্থার সদস্যগণের দায়িত্ব ছিলো বোমা হামলার আগে জনসাধারণকে সতর্ক করা ও পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া এবং বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন করা। এ সময়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন সন্তোষকুমার বসু। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, তিনি সচেতনভাবেই মুসলমান এবং কমিউনিস্টদেরকে এই সংস্থা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিলেন। অনুমান করি, সর্বাধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক কলাকৌশ সম্পর্কে মুসলমান যুবকগণ ব্যাপকভাবে অবহিত থাকুক, মন্ত্রী তা চাননি; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কমিউনিস্টদেরকে এসব সংস্থা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, সে সময়ের মার্ক্সিস্টগণ মহাযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন, যা বাংলার ক্ষমতাসীন সরকারের বিশ্বাসের পরিপন্থী।

আমরা কলকাতার মুসলিম তরুণগণ বিশেষভাবে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্যগণ মন্ত্রণালয়ের এ জাতীয় আচরণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বাংলার মফস্বল অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করছিলেন, বক্তৃতার মাধ্যমে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এ আর পি প্রসঙ্গে আমরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি এ বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া প্রস্তাব করেন যে, ফরিদপুরেই এ সমস্যার ওপর একটা সম্মেলন হোক। মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে অবশেষে ১৯৪২ সালের শেষ দিকে ফরিদপুরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন মোহন মিয়া। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের এ সম্মেলনে সক্রিয় সহযোগিতা করে। ইউসুফ আলী ছিলেন তখনকার মুসলিম লীগের ফরিদপুর জেলার সভাপতি। তিনি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাও আমাদের এ সম্মেলনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে ভাষণ দিয়েছিলেন। এ জাতীয় আন্দোলন তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী সাহেব ফরিদপুরের এ সম্মেলনে আসেননি। আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম: 'বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তা সত্ত্বেও এ আর পি-তে তাদের অলিখিতভাবে যে না-নেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক নীতির খেলাপ। আসুন আমরা এ জাতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি।'

আমাদের এ জাতীয় আন্দোলন ও চাপের মুখে অবশেষে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা তাদের নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।"[১১১]

সাত

'...অদ্য ইদল ফেতর। ফেতরা ৫ আনা করিয়া দেওয়া গেল। অদ্য শ্রীমান চরু মিঞা, মজিব মিঞা (ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে), সোনা মিঞা (ক্লাস টেন পড়ে), মুতি মিঞা (Matriculation দিয়াছে), খশরু মিঞা (মাদ্রাসায় পড়ে) নামাজের পর বৈকালে আমাদের বাড়ী আসিল, আমি সর্বান্তকরণে তাদের উন্নতি কামনা করি। তাদের একতা, সরলতা ছাত্রগুণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সর্বোপরি তাদের নির্মল চরিত্র আমি বড়ই পছন্দ করি। যদি ভাবী জীবনেও এমন স্বভাব ও একতা তাহারা অব্যাহত রাখিতে পারে তবে তাদের জীবন সুখময় হইবে আশাকরি। গ্রামে যে কয়টি মোসলমান ছেলে পড়িতেছে কি চাকুরী করিতেছে তাদের মধ্যে, সার্বজনীন একতা আমি সর্বান্ত:করণে কামনা করি। তাহারা একটা সমিতি গঠন করিয়া যদি জাতীয় একতা ও স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা না করে তবে গ্রামে মোসলমানের প্রাধান্য দিন দিন লোপ পাইবে। অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুগণ গ্রামে মোসলমানের উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিবে। তাহারা বর্তমান সময়ে ধনে, মানে ও বিদ্যায় মোসলমানকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে - মোসলমানগণ যদি তাদের সঙ্গে চলিতে না পারে তবে আমি হিন্দুর সহিত মোসলমানগণকে বিবাদ করিতে বলিনা প্রতিযোগিতা করিতে বলি...। [৬ মে, ১৯২৪ইং]

...এখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট অনেকেই বাঙ্গালী দেখা যায়। হিন্দু অনেক বেশী, মোসলমান অনেক কম। নিম্নশ্রেণীর আমলার মধ্যে হিন্দু-মোসলমানের অনুপাত ৭০:৩০ হইবে। যেখানে হিন্দু জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেট তথায় মোসলমান উপযুক্ত লোক পাইলেও জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মচারী নিযুক্ত না করিয়া বেশীরভাগ হিন্দুই নিযুক্ত হয়। হিন্দুর মোসলমান বিদ্বেষ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। বিচার ক্ষেত্রেও এ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। অনেক স্থানেই দেখা যায় মোসলমানকে বিদ্বেষ করা হিন্দুর ধর্মকার্য্যে পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দু ছেলেগুলির মোসলমান বিদ্বেষপুষ্ট ভাবধারা দিন দিনই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। হিন্দু পিতা-মাতা হইতেই সে ভাব সহজাত হইতেছে। পিতা-মাতা নিজ নিজ পারিবারিক শিক্ষার দ্বারা সে ভাব দূর না করিয়া - বিদ্বেষভাব বরং বাড়াইয়া দিয়া চলিয়াছে। তাহারা ভাবে না একই দেশে বাস করিয়া ইহার পরিণাম কি হইবে। [১ এপ্রিল, ১৯৩৮ইং]

...রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন অনেক ঘটিয়াছে। বঙ্গে গভর্নমেন্ট সমর্থক লীগ মন্ত্রীমন্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীমন্ডলী গঠনের জন্য বিশেষত: বর্ণ হিন্দু আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেসের মূল নীতির সহিত মোসলমানের কোন বিরোধ না থাকলেও বর্তমান কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মুসলিম স্বার্থ পদদলীত করিয়াছেন - মোসলমানকে তাহার নায্য প্রাপ্য অংশ দিতে এই হেতু মুসলিম লীগের পুন: সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া মোসলমান জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিতে ও উদ্ধার করিতে চায়। হিন্দুগণ তাহাতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর, কাজেই বিরোধ। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু কংগ্রেসীদের চালবাজি ব্যর্থ হইতেছে। কংগ্রেস নীতি হিসাবে দিন দিন নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে। কংগ্রেস দেশবন্ধুর কার্য্যক্রম বজায় রাখিলে মোসলমানের সহিত তাহার বিরোধের কোনও কারণই থাকিত না। পক্ষান্তরে মোসলমান সাধারণত: তাহাতে অবিচলিত চিত্তে যোগদান করিয়া দেশোদ্ধারব্রতকে সহজ করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু কতকগুলি সংকীর্ণমনা নেতার আত্মম্ভরী ব্যবহারে সে আশা সুদূর পরাহত হইয়াছে। যাহা হউক সে আশা আপাতত: করা না গেলেও ওকালে সম্ভব হইতে পারে।

গত বৎসর হিন্দু মোসলমানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই। কংগ্রেসী গবর্নমেন্ট শাসিত প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন হইতেছে শুনা যাইতেছে। [সালতামামী, ১৩৪৪ বাং, ১৯৩৮-'৩৯ইং]

---

[১১১]. মাহমুদ নূরুল হুদা/আমার জীবনস্মৃতি। [বাংলা একাডেমী - জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃ. ৬৯/৭৫-৭৬/৯১-৯২]

...১৩৪৫ বাং সন গত হইয়াছে। পূর্ব্ব নিয়মমত সেই সনের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক অবস্থা আলোচনা করা গেল।

দেশের লোকের মনে আত্মনিয়ন্ত্রণ স্পৃহা ক্রমেই বাড়িতেছে। অশিক্ষা হেতু সাধারণত: সে ইচ্ছা কারো ফলবতী হইতেছে না। নেতার অভাবে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণের ...বিকাশ ও কেন্দ্রীভূত হওয়ার পক্ষে অনেক বাধার সৃষ্টি হইতেছে। বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে তাহাই উপলব্ধি হইতেছে। কংগ্রেস আর আগের কংগ্রেস নাই। কংগ্রেস মূল নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করিয়া তাদের ন্যায়ত: ধর্মত: অবহেলা করিয়া তাদের আস্থা হারাইয়াছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণই কংগ্রেসের বিধাতা পুরুষ। তাহারাই কংগ্রেসের নিয়ন্তা। নিম্নবর্ণের ও মোসলমানের তাহাতে কোনই আপত্তি নাই। এদের স্বার্থ কংগ্রেস আদৌ দেখে নাই। অতীতে যেসকল মোসলমান নেতৃস্থানীয় লোক কংগ্রেসের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহারা কংগ্রেসের এক চকো ভাব অবলোকন করিয়া ক্রমেই উহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল মৌলানা আজাদ ও আব্দুল গফুর সাহেবের মত কয়জন নেতা কংগ্রেসকে আজিও আকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। হিন্দু মনে করে জাতীর চেয়ে দেশ বড়। মোসলমান মনে করে দেশের চেয়ে জাতি বড়। এখানে সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান জন্যই মোসলমান জাতি দেশে All India Moslem League-এর পুন: প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মোসলেম লীগ চায় জাতীয় গৌরব ও স্বার্থরক্ষা করিতে। কংগ্রেস হিন্দু জাতির বিশেষত: বর্ণ হিন্দুর স্বার্থরক্ষার্থে সতত: তৎপর - সেহেতু লীগ মোসলমান জাতির বৈশিষ্ট্য ও ন্যায়ত: স্বার্থলাভের জন্য সঙ্গতভাবে সচেষ্ট হইয়া মি: মহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। হিন্দু অগ্রগামী ও মোসলমান পশ্চাদপদ ছিল। এখন মোসলমান ক্রমেই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবী করিতেছে। ইহাকেই বর্ত্তমান হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব আখ্যা দান করিয়াছেন। স্ব স্ব স্বার্থ নিয়া উভয় জাতির মধ্যে কলহ, কোন্দল, মন কষাকষি বেশ চলিয়াছে। দেশের সত্যকার ইস্ট লাভের দিকে কারো দৃষ্টি নাই।

হিন্দু মোসলমানের মধ্যে একতার বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কয়েকজন হিন্দু মহাসভার হিন্দু নেতা মোসলমানকে হিন্দুর প্রভাবাধীন হইয়া না থাকিলে পদাঘাতে শিয়াল কুকুরের মত এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে মোসলমান জাতি ক্ষুব্ধ হইয়াছে। শত শত বক্তা যুগ যুগ ধরিয়া একতার বাণী প্রচার করিয়াও জাতিকে তেমন সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইত না। হিন্দু মহাসভার তথাকথিত নেতাগণকে ধন্যবাদ। মি. গান্ধিজীর অহিংস নীতি ও অসহযোগ নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের হিন্দুকে ভীষণ হিংসা করে। বেদে, মন্দিরে, শাস্ত্র পাঠে শুদ্রের অধিকার আজিও স্বীকৃত হয় নাই। দেবমন্দিরে পাঠা বলি, মহিষবলি কমে নাই। বৃটিশ গভমেন্টের কঠোরতার সামনে হিন্দু যুবক কর্তৃক অতর্কিতভাবে গুপ্ত হত্যা নিবারিত হইয়াছে। ইহা গান্ধিজীর অহিংস নীতি প্রচারের ফলে হয় নাই।

চুরি ডাকাতি, নরহত্যা কতক পরিমাণে কমিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিবাদ বঙ্গদেশে গত বৎসর কোথাও ঘটে নাই। কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ লাগিয়াই আছে। কংগ্রেসী শাসন-কুশাসনের অপযশে কলঙ্কিত হইয়াছে। তথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতেছে। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে।

হক মন্ত্রীমন্ডলী হিন্দু জাতির চোখের বালি হইয়াছে। তাহারা ভাল হউক, মন্দ হউক তাহার সর্ব্বকার্য্যে বাধাদান, বিরুদ্ধ সমালোচনা তাদের নিত্যকার্য্যে দাড়াইয়াছে। তাহারা আদাজল খাইয়া তাদের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। ভাল কাজ করিলেও কংগ্রেসীরা বলিতেছেন মন্ত্রী মন্ডলী স্বেচ্ছায় তাহা করেন নাই। আমাদের গুতোর চোটে তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরজন্য বাহবা পাওয়ার অধিকারী মন্ত্রীমন্ডলী নহে আমরা। মন্ত্রীমন্ডলী ৩টি মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউনিসিপ্যালিটির আইনের রদবদল ও চাকুরী ক্ষেত্রে মোসলমানের ন্যায্য অধিকার বিস্তার ও দাবী রক্ষা। আশা করা যায় অতি সত্বরই সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহারা ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। [সালতামামী, ১৩৪৬ বাং, ১৯৩৯-'৪০ইং]

...ভারতবঙ্গের ২টি প্রতিদ্বন্দ্বীদল ছিল - কংগ্রেস, মুসলিমলীগ কিন্তু অধুনা হিন্দু মহাসভা, আজাদ মুসলিম প্রভৃতি অনেক দল রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসের প্রাধান্য দেশের অভ্যন্তরে অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। মুসলিম লীগ মোসলমান জাতির মধ্যে ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী শাসন জয়যুক্ত না হওয়াতে নানা অঞ্চলের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে লীগ শাসিত প্রদেশগুলিতে নানা দিকে প্রজার সুখ সুবিধা বাড়িয়াছে। জওহার লালের গণ-সংযোগ ও সুভাষ বসুর Forward Block কার্য্যকরী হয় নাই। কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলার হক মন্ত্রী মন্ডলীর চেষ্টায় নজরে আইনী আবওয়াব রহিত হইয়াছে। কলিকাতা Corporation Act মোসলমানের অনুকূলে গঠিত হইয়াছে। হক মন্ত্রীমন্ডলী কৃষক প্রজার সর্বদিক হিতের জন্য ব্রতি হইয়াছে। পাটের জমি গত মাঘ মাসে যে রেজিস্ট্রারী হইয়াছে তাহা বাতিল ক্রমে পুন: সঠিকভাবে রেজিস্ট্রারী হইতেছে। পাটের নিম্নদর বান্ধিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে।

মোসলমান নিজের নায্য অধিকার দাবী করিলে হিন্দু তাহাকে কঠোর সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিতেছে। জমিদার প্রভৃতি মধ্য স্বত্ত্বাধিকারীর স্বত্ত লোপের জন্য ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করিয়াছে। হিন্দু-মোসলমানের একতা অনাবিল ও সুদৃঢ় করার জন্য লীগের অবিসম্বাদিত নেতা মি. জিন্নাহর সহিত অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু নিজ কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করিতে নরাজ। তাই আলোচনা কোন ফল হয় নাই।

হিন্দু মোসলমান একতার ভাব উন্নতি লাভ করে নাই। মূলে Divide and Rule নীতিই বলবৎ আছে। হিন্দু মোসলমানকে এদেশ হইতে আর 'তাড়াইবার' আস্ফালন করে না। সাম্প্রদায়িক বিবাদ কতক কমিয়াছে। গত বৎসর কম হইয়াছে। চুরী ডাকাতি মোটের উপর কমিয়াছে। নরহত্যা বাড়িয়াছে। শিক্ষার দিক দিয়া মোসলমান অগ্রগামী হইতেছে। স্ত্রী শিক্ষা দেশে ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে।

...হক মন্ত্রী মন্ডলী কৃষক প্রজার অসীম হিত করিয়াছে। কিন্তু পক্ষান্তরে তাহারাই হিন্দু জাতির বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। হিন্দুর কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। তাই তাহারা এত বিচলিত হইয়াছে এবং মন্ত্রী-মন্ডলীর নিন্দা প্রচার। কিন্তু ইহাতে মন্ত্রী মন্ডলীর হিতই করা হইতেছে। অযথা ও মিথ্যা প্রচার দ্বারা এক মন্ত্রী মন্ডলীর কার্যে নানাভাবে দোষারোপ করার প্রতিবাদে তাদের ন্যায়সঙ্গত কার্য্যকলাপ দেশময় প্রচারিত হইতেছে এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা দৃঢ়তর হইতেছে। অগ্নিকে ছাই দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায় না। [সালতামামী, ১৩৪৭ বাং, ১৯৪০-'৪১ইং]

...হিন্দু মোসলমানের প্রীতির ভাব বাড়ে নাই। কতকগুলি হিন্দু নেতার স্পর্ধিত ব্যবহার উভয়পক্ষের জনসাধারণ মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দু মহাসভার সহকারী ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রধান। এই ভদ্রলোকটি যেখানে যাইতেছেন সেখানেই সাম্প্রদায়িক কলহের বীজ অতি নিপুনভাবে বপন করিয়া আসেন তাহা অঙ্কুরিত হইতে বেশী দিন লাগে না। খুলনা ও ঢাকা Riot তাহার প্রমাণ। অথচ তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না।"[১১১] [সালতামামী, ১৩৪৮ বাং, ১৯৪২-'৪৩ইং]

আট

'...মধ্য প্রদেশের খান্দার বেরার জেলার চান্দপুর বিশওয়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলে জনাব এ. কে. ফজলুল হক মার্চ মাসে (১৯৩৯) মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিম্নোক্ত পত্রখানি লেখেন। এ পত্রে তিনি ভারতের মুসলমানদের করুণ দু:খের কথা এবং গণতন্ত্রের নামে হতভাগ্য সংখ্যালঘুদের ওপর হিন্দুদের আচরণের কথা খুলে বলেন। চিঠিতে হক সাহেব লেখেন :

---

১১১. মো: বশারত আলীর ডায়েরি (১৯২৩-৪৩) : কুমিল্লা জেলার এক জোতদার পরিবারের ইতিহাস ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা/সম্পা. ড. মো. মাহবুবর রহমান। [বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি - এপ্রিল, ২০১১। পৃ. ১০৯-১১০/২৮৬-২৮৮/৩০৬-৩০৮/৩১৬-৩১৮/৩২২-৩২৩]

মহাত্মাজী,

আদালতের রায়ের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আপনাদের লেখার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত আপনি একথা বুঝবেন যে, বিচারকের এ রায় কত ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। দায়িত্বশীল হিন্দু, কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী এবং এমন কি এমন একজন লোক যিনি একটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী, যার ওপর গণতন্ত্র এবং সকলের জীবন রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তিনিও সবাইকে সমানভাবে দাঙ্গাকারী মনে করেছেন। তারা মুসলমানদের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অপরাধী এবং নির্মম হত্যাকারী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। তদন্তের নামে এক প্রহসন করা হয় এবং বিচার আরম্ভ হলে নিজেদের বানানো সাক্ষীর মুখ দিয়ে বিচারকের সামনে একটি কমিক অভিনয় করানো হয়। সাক্ষীর বাক্স থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বের হতে থাকে। হিন্দু সাক্ষীরা কে কত মুসলমানকে হিন্দু হত্যার দায়ে দায়ী করতে পারে এ বিষয়ে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কল্পনা করুন, আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের দু:খ ও ঝামেলার কথা। উক্ত হতভাগ্যদের আন্দামান পাঠানো ও ফাঁসী থেকে বাঁচানোর জন্য আইনজীবী ও টাকা সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। যদি হাইকোর্টে আপীল করার কোনো ব্যবস্থা না হতো তাহলে ৬ জন নির্দোষ মুসলিম ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলত এবং ২৪ জনকে যাবজ্জীবন জেলে আবদ্ধ থাকতে হতো। এ কথা একবার ভাবুন।

এজন্য কি বহুল প্রচারিত কংগ্রেসকে জনগণ ক্ষমতায় বসিয়েছে যে, তারা গণতন্ত্রের নামে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করবে? এভাবেই মুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার উঠে গেছে। তবুও আপনি গণতন্ত্র ও ন্যায়ের কথা বলছেন এবং আপনাদের এরূপ গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রদর্শনের জন্য বৃটিশ আপনাদের ক্ষমতা দিচ্ছে না বলে দোষারোপ করছেন।

আপনি বলতে পারেন যে, এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাদের এই মনোভাবের ফলে অন্যান্য কয়েকটি কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবন বিনষ্ট হয়েছে, ধন-সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং তারা অবর্ণনীয় দু:খ-কষ্টে নিপতিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: যারা নির্দোষ মুসলমানদের ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলানোর ষড়যন্ত্র করেছে তাদের নিন্দা করে সারা ভারতে কোনো একজন হিন্দুও একটা কথা বলেছে? যারা ন্যায় বিচারের ফলে মৃত্যুর চোয়াল থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে তাদের সহানুভূতিতে একটা হিন্দু সংবাদপত্রও কি কিছু লিখেছে? বা ঐ সমস্ত হিন্দুদের নিন্দা করেছে যারা নির্দোষ মুসলমানদের ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলানোর ষড়যন্ত্র করেছিল? এটা কি মনে হচ্ছে না যে, মুসলমানদের হাইকোর্টের আপীলের ফল দেখে সাধারণ হিন্দুরা বলতে গেলে নিরাশ হয়েছে অথবা হিন্দু মন্ত্রীরা বা অন্যান্যরা যেভাবে সাক্ষী সংগ্রহ করে নির্দোষ মুসলমানদের ফাঁসী দেয়ার ব্যবস্থা করেছে তাতে তারা কোনো অন্যায় দেখছে না? বরং মহাত্মাজী, আপনি নিজেও এ ব্যাপারে কি করেছেন? আপনি নিশ্চয়ই এসব ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ নন। আপনার সত্য, আপনার অহিংসা, আপনার ন্যায়, আপনার সততার ধারণা কি ঐ সমস্ত কিছু লোকের যারা কংগ্রেসী? আপনার সম্প্রদায়ভুক্তদের ঘৃণ্য কাজ দ্বারা আপনি ক্রোধ দীপ্ত হচ্ছেন না কেন? আপনি নোয়াখালির মতো একটি জেলার সামান্য ঘটনাকে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন যার ফলে হিন্দুদেরকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসার পথ বেছে নেয়ার নির্দেশসহ আপনার হরিজন পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপতে পারল।

আসলে নোয়াখালিতে কোনোই অন্যায় করা হয়নি। শুধু একজন মুসলিম ছাত্র একবার একটি অসঙ্গত বক্তৃতা করেছিল। কিন্তু চান্দপুর বিশওয়ারের বেদনাদায়ক ঘটনা, সেখানকার নির্দোষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংকীর্ণ ষড়যন্ত্রের করুণ কাহিনী আপনাকে বিচলিত করতে পারেনি। অন্যদিকে মুসলমানদের জীবন বিনষ্ট করার জন্য যে হিন্দুদের উল্লসিত প্রতিযোগিতা, তার বিরুদ্ধে আপনার মুখ থেকে একটি কথা, আপনার কলম থেকে একটি শব্দও বেরুল না।

আপনার এ নীরবতা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এ সকল ঘটনা কি নি:সন্দেহে প্রমাণ করে না যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুটি ভিন্ন জাতি? কাজেই নিছক সংখ্যাধিক্যের শাসন এ অর্থে গণতন্ত্রকে মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হিন্দুদের কাছ থেকে কোনো ন্যায় বিচারের আশাও তারা করতে পারে না।

এমতাবস্থায় মুসলমানরা যদি মনে করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এ অর্থে গণতন্ত্র ভারতে সম্পূর্ণরূপেই অকেজো - আপনি তাদের দোষ দিতে পারেন? এমতাবস্থায় মুসলমানরা যদি বিশ্বাস করে যে, তাদের যে মানসিকতা চান্দপুর বিশওয়ারের ব্যাপারে প্রকাশ পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে যদি হিন্দুরা ক্ষমতা দখল করে তাহলে তারা মুসলমানদের প্রতি সামান্যতম ন্যায় বিচারও করতে পারবে না - আপনি কি সততার সাথে মনে করেন যে এ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত নয়?

আপনি এবং অন্যান্য হিন্দুরা মাননীয় সরকারের এ ঘোষণাকে মানতে পারছেন না। সরকার বলছে তারা ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য তাদের বর্তমান ক্ষমতা এমন কোনো সরকারী কাঠামোর কাছে হস্তান্তর করার কথা চিন্তা করছে না যারা ভারতের জাতীয় জীবনের একটি শক্তিশালী অংশ কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না অথবা কাউকে জোর করে কোনো শাসন ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করবে না।

ওপরে বর্ণিত অবস্থার আলোকে আপনি কি ন্যায়ত: মনে করেন না যে, মাননীয় সরকার সংখ্যালঘুদের ঐরূপ নিশ্চয়তা দিয়ে নিছক ন্যায়পরায়ণতার নজির দেখাননি? আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, মধ্য প্রদেশের চান্দপুর বিশওয়ারের সমস্ত জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধি হিন্দু সরকারের কাজের ফলে ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে না? যারা হিন্দু রাজনৈতিকদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করেছে তারা ঐ সময়ে সরকারেও ছিলেন। কাজেই ভারতীয় সমাজ জীবনের যে বৃহৎ এবং শক্তিশালী অংশ মুসলমান, তারা কি পারে এমন একটা সরকারের কাছে নতি স্বীকার করতে? মাননীয় সরকার তখন ঘোষনা করেছিলেন যে, তারা এ ধরনের লোকদের কাছে মুসলমানদেরকে আত্মসমর্পণের জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে না। কারন ঐ গণতান্ত্রিক আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বক্তারা ঘটনার কোন তদন্ত বা কোনো বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালের রায় ছাড়াই নিরীহ মুসলমানদেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে।

সারা ভারতে সন্ত্রাসের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এবং মধ্য প্রদেশ ও বেরারে প্রাদেশিক লীগের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী যখন মাত্র একজন হিন্দু দাঙ্গায় নিহত হযেছে তখন কংগ্রেস ওই অঞ্চলের সমগ্র মুসলমানদের ওপর জঘণ্য প্রতিহিংসামূলক কাজ চালিযে যাচ্ছে।

এ সম্বন্ধে নাগপুর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হলে রায় দান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতিও ঘটনাকে অত্যন্ত দু:খজনক বলে মন্তব্য করেছেন। ব্যাপার হলো যে, যখন ৪৩ জন লোক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো তখন একে একে মিথ্যা বানানো সাক্ষীগণ একের পর এক দাঁড়িয়ে আরো একজন নির্দোষ লোককে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা পাকা করছে। (চিঠি অসমাপ্ত)।'[১১০]

নয়

'...বিবিসি ক্লাব। সংস্কৃতিমনা বাংলাদেশী কেউ লন্ডনে গেলে একবার বিবিসি'র বুশ হাউসে যাবেই। রাজনীতিবিদরাও এর থেকে বাদ পড়েন না। সাধারণত ওখানকার আড্ডার এক বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। মুফতে দেশ বিদেশের খবর ইথারে যাওয়ার আগেই যাবে আপনার কানে।

...গ্লাস হাতে একটা টেবিলে বসতে না বসতেই এসে গেলেন মানসী বড়ুয়া, গোলাম কাদের, গোলাম মোর্শিদ। জমজমাট আড্ডা। এর মধ্যে ধীর মন্থর গতিতে দরজা দিয়ে মঞ্চে প্রবেশের কায়দায় ঢুকলেন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় একজন। গেটম্যান তাকে বেশ সমীহ করে বললো, গুড আফটারনুন। তিনি হাসিমুখে তার প্রত্যুত্তর দিয়ে আমাদের টেবিলের কাছে আসতে না আসতেই কোরাসে সবাই বলে উঠলো, নাজির ভাই অনেক দিন পর এলেন। কিন্তু আপনার এ্যাবসেন্স আমরা খুব ফিল করেছি। সবাই নাজির আহমেদকে দেখলাম খুব সমীহ করে কথা বলছেন। এই সেই নাজির আহমদ। মনে মনে বললাম, জলদ গম্ভীর স্বরের অধিকারী নাট্যশিল্পী, সংবাদ পাঠক ও রেডিও'র ঘোষক, যাঁর কণ্ঠস্বর শুনতাম স্কুল কলেজে পড়ার সময়।

---

১১০. বাংলার জীবন্ত ইতিহাস শেরে বাঙলা/সম্পা. আনু মাহমুদ। [এশিয়া পাবলিকেশনস - ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ১৯০-১৯২]

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক দিকপালের সাথে আজ প্রথম দেখা। এরমধ্যে নাজির ভাই'র বন্ধু সংবাদ পাঠক নুরুল ইসলাম, তার নিউজ শেষ করে নিয়মিত আড্ডায় হাজির। নাজির ভাইকে দেখে মহাখুশি। বেশ কিছুদিন দেখা নেই দু'বন্ধুর। কথায় কথায় ফতেহ লোহানীর কথা উঠলো। নাজির ভাই বললেন, লোহানী হঠাৎ চলে গেলো, ফজলে লোহানীও নেই। তাঁর কথায় হতাশার ভাব। বললেন, ওদের স্মৃতি আমাদের কাছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর যাচ্ছেই বা বলি কেন, অলরেডী গেছে।

এ আড্ডায় আমি নতুন আমদানি। বিলেতের এটিকেট রপ্ত করতে সময় লাগবে। মাঝে মধ্যে শফিক রেহমানের কাছে তালিম নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। ওর ড্যাম কেয়ার ভাব। এখানে শেখার কি আছে! শুধু দেখে যাও, আর লিখে রাখো — আজ না পারো একদিন তো ছাপতে পারবে, ওর উপদেশ। শফিক ও তালেয়া দু'জনই ক্যাজুয়েল নিউজ রিডার। নিউজটা আমার মনে হতো, লক্ষ্য নয়, ওটা উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য নির্ভেজাল আড্ডাটা।

বিবিসি থেকে সাম্প্রতিক প্রচারিত কোন এক বিশ্ববরেণ্য লেখকের এক লেখার নাট্যরূপ ও তার প্রচার নিয়ে কথা হচ্ছিল। নাজির ভাই প্রধান বক্তা। অন্যরা আগ্রহী শ্রোতা। অদ্ভুত বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং প্রচুর পড়াশোনাপ্রসূত তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্যে কথা বলছে না কেউ। তাঁর আলোচনা শেষ হওয়ার পর, সিরাজ ভাই বললেন, মলিয়রের এক লেখার নাট্যরূপ দিচ্ছেন তিনি। নাজির ভাইকে বললেন, তিনি যেন নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন। এক কথায় উত্তর না দিয়ে নাজির ভাই বললেন, দেখো ছাপার কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি, তাছাড়া শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে, যদি সময় করতে পারি অবশ্য করবো।

অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চললো। নীরবে নাজির ভাইর কথা শুনে গেলাম। তাঁর মুখ থেকে তাঁদের সময়কার সাংস্কৃতিক জগতের অনেক অজানা কাহিনী জানার অদম্য ইচ্ছা প্রকাশ না করে পারলাম না। বিনয়ের সাথে বললাম অতীত না জানলে, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জেনারেশন অন্ধকারে থেকে যাবে। আর কিছু না হোক, নিজের জীবনীটা লিখুন না, অনেকটা দাবি ও আবদার মিশিয়ে নিবেদন করলাম। মঞ্চের নায়কের মতো স্মিত হেসে বললেন, লেখার তো অনেক কিছু আছে, তবে সব কি লেখা যায়! না কি লিখলে সবাই খুশি হবে?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আপনার লেখা সবাইকে খুশি নাও করতে পারে, তবে সত্যিকারের লেখক শিল্পী তো কারও মুখ দেখে লেখে না, অভিনয় করে না, বললাম আমি। মনে হলো নাজির ভাই'র মনে কোথায় যেন বিরাট একটা ক্ষত রয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক নাজির আহমেদ যে সময়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পদার্পণ করেন তখন ও জায়গাটা ছিল মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা। তাই ওবায়দুল হককে হিমাদ্রী চৌধুরী হতে হয়েছিল, তাঁরই পরিচালিত ছবি 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' রিলিজ করতে। ঐ ছবির নায়ক ফতেহ লোহানীকে রূপান্তরিত হতে হয়েছিল কিরণ কুমারে। ইসমাইল হোসেন উদয়ন চৌধুরী ও কাজী খালেক স্বপন কুমার হয়েও কল্কে পাননি কলকাতার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে।

একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক ওবায়দুল হক তাঁর জীবনের সব সঞ্চয় এবং প্রজ্ঞা দিয়ে যে ছবিটি করেছিলেন সে ছবিটি শেষ পর্যন্ত দিনের আলো দেখেনি। টালিগঞ্জের কোন গুদামঘরে বন্দী অবস্থায় হয় ওর নির্বান। স্বাধীনতার পর কলকাতার পুরোনো অনেক লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে হক সাহেব তাঁর জীবনের একটি কীর্তির কোন সন্ধান পাননি। অত্যন্ত চাপা স্বভাবের জনাব ওবায়দুল হককে যাঁরা খু-উ-ব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা শুধু বুঝবেন জীবনে কতবড় দুঃখ তিনি পেয়েছেন। ওবায়দুল হক সাহেবের অধীনে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সুবাদে তাঁকে জেনেছি। ছবি করতে তাঁর হিন্দু 'শুভাকাংক্ষী' বন্ধুরা কিভাবে তাঁকে ডিস্কারেজ করতেন। নীতিবান ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী জনাব ওবায়দুল হক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যে করেই হোক তিনি ছবি করবেন। অনেক নায়িকা মুসলমান পরিচালকের ছবিতে কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সদ্য প্রয়াত আবদুল আহাদকে হক সাহেব তাঁর ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে মনোনীত করেন। ছবি শেষ। হক সাহেবের বিশ্বস্ত ম্যানেজার (নাম বলেছেন, মনে নেই) জানালেন, মুসলমান পরিচালকের বই চালাতে 'হল' মালিকরা রাজি নয়। এটা ভারত ভাগের কিছুদিন আগের অবস্থা। ম্যানেজার বাবু দুটি অপশন দিলেন, হয় ছবি বাক্সবন্দি করে রেখে দিন নতুবা পরিচালক অর্থাৎ আপনার নাম পাল্টান। এত ত্যাগ তিতিক্ষা অর্থ ব্যয় পরিশ্রম সবই কি পণ্ডশ্রম! গভীর মর্মযাতনায় ভুগলেন সুন্দর মনের সুদর্শন লোকটি। শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে যাদের কারবার তাদের উদার হওয়ারই কথা, এ ছিল হক সাহেবের বিশ্বাস। যা হোক, বাকরুদ্ধ ওবায়দুল হক দুদিন চিন্তা করে দ্বিতীয় অপশনটি গ্রহণ করলেন। নাম যদি বদলাতেই হয় বড় নামই নিই, ভাবলেন জনাব হক। ওবায়দুল হকের গোত্রান্তর হলো হিমাদ্রী চৌধুরীতে। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হলো না। দিনের আলো দেখলো না তাঁর ছবি। সেই কায়াহীন ছবির মায়া এখনও জীবন সায়াহ্নে ওবায়দুল হক সাহেবকে আনমনা করে তোলে। একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুর চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক যন্ত্রণা সারা জীবন বয়ে বেড়াচ্ছেন এমন একজন মানবতাবাদী মানুষ যাঁর কলম সব সময় সোচ্চার ছিল এবং এখনও আছে আসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে।

নাজির ভাই'র কথা বলছিলাম। মানুষকে মুগ্ধ করার মতো তাঁর ব্যবহার। বাচনভঙ্গি চমৎকার। কথা বলার সময় মনে হলো নাটকের সংলাপ বলছেন। মেলা ভক্ত তাঁর লন্ডনে। এবং বয়স্করাই তাঁকে চেনে বেশি। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অনেকের কাছে তাঁর নামটিও অজানা। সাহস করে বললাম, নাজির ভাই ভবিষ্যৎ বংশধররা উপকৃত হবে যদি আপনাদের সময়কার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু লিখে যান। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন যেন, বললেন, লিখবার ইচ্ছে আছে, সময় করে উঠতে পারছি না। তবে এমন অনেক কথা আছে যা শুনলে তোমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে।

বাঙালি মুসলমানরা শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করবে তা চল্লিশ দশকে চিন্তা করা যেতো না। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে জানালেন, ঢাকায় প্রথম বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর এক নাটকে নিজের অসাধারণ প্রতিভার বলে নায়ক নির্বাচিত হন। নাটকের রিহার্সেল চলছে। হঠাৎ নায়িকা বিনা নোটিশে অনুপস্থিত। বেতার কর্তাদের মধ্যে গুঞ্জন, কিছু একটা যেন তাঁর কাছ থেকে লুকানো হচ্ছে। অবশেষে ব্যাপারটা তাঁকে বলা হলো। নায়িকার পিতা কি এক ভট্টাচার্য আপত্তি তুলেছেন, মুসলমান ছেলের বিপরীতে তার মেয়ে অভিনয় করবে না। নাজির ভাইও দমবার পাত্র নন। ঢাকার ছেলে তিনি। তাদের পরিবারের আলাদা কৌলীন্য রয়েছে। সিনেমা ব্যবসার সাথে তাদের পরিবার জড়িত। নায়িকা থাকে নারায়ণগঞ্জ। খবর দেয়া হলো নায়িকার পিতাকে, তিনি যেন কন্যাকে নিয়ে একবার নাজিমুদ্দিন রোডে বেতার ভবনে আসেন। যথা সময়ে কন্যাকে নিয়ে পিতা হাজির। নায়িকার পিতার এক কথা, তার অবস্থানে তিনি অনড়। ভবিষ্যতে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে, তার একটা কলঙ্ক হোক কোন পিতা তা চান না, ভদ্রলোকের সাফ জবাব। পিতার পরিচয় নিয়ে জানা গেল, তিনি এক সিনেমা হলের ম্যানেজার, আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই সিনেমা হলটি নাজির সাহেবদের পরিবারের। নায়িকার পিতা নাজির ভাই'র পরিচয় পেয়ে, তার মত পরিবর্তন করতে বেশি দেরি করেননি।

আর একটি ঘটনার কথা বললেন নাজির ভাই। তা হলো চল্লিশ দশকে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে বোখারী ভাইরা নিজেদের যোগ্যতা বলে বিশেষ স্থান দখল করায় তাঁদের বহু রকম কটাক্ষ শুনতে হয়েছে সভ্য ভদ্র সংস্কৃতির ধারক বাহকদের কাছ থেকে। বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টিকারী দৃষ্টিপাতের স্রষ্টা যাযাবর তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিওকে ইন্ডিয়ান বিবিসি বলে ঠাট্টা করেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থে। বিবিসি মানে বোখারী ব্রাদারস কর্পোরেশন।

এক বোখারী এলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে, দেখতে চাইলেন শিল্পীদের লিষ্ট। অনেক কষ্টে আব্বাসউদ্দিনসহ দু'তিনজন মুসলমান শিল্পীর নাম পাওয়া গেল। কে. মল্লিকও এদের অন্যতম, তবে তিনি যে কাশেম মল্লিক তা ঢেকে রেখে তবেই তাঁকে প্রোগ্রাম দেয়া হতো, তাও কালেভদ্রে। নাজির ভাই বললেন, বোখারী সাহেব এ অবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে মুসলমান শিল্পীদের প্রোগ্রাম আরও বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এর প্রতিক্রিয়া হলো ত্বরিৎ। পঙ্কজ মল্লিকসহ বহু তথাকথিত হিন্দু অসাম্প্রদায়িক শিল্পীরা অনুষ্ঠান বয়কট করলেন বেশ কয়েকদিন, পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে জানালেন নাজির ভাই। কিন্তু বোখারী সাহেব তাঁর নির্দেশ পালন করতে সবাইকে বাধ্য করেন। আরও অনেক ইতিহাস আছে যদি কখনো লিখি তবে জানতে পাবে, আমরা সাংস্কৃতি অঙ্গনে কি করে টিকে ছিলাম, বললেন নাজির ভাই। তাঁর কথাগুলো শুনছি। আর ভাবছি এই মহান ব্যক্তিত্বের কাছে আমাদের অনেক কিছু জানার শেখার আছে। গায়ে পড়ে বললাম, আপনি সময় দিতে পারলে শুধু বলে যাবেন, আমি ডিকটেশন নেবো। তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, একটা বই প্রিন্টিংয়ের ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় যাচ্ছি, ফিরে এসে এ ব্যাপারে কথা বলবো।

এরপর কয়েক মাস পার হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন বিবিসি থেকে পরিচিত একজন খবর দিলেন নাজির ভাই গতরাতে মারা গেছেন লন্ডনের এক হাসপাতালে। একটি যুগের অবসান, একটি মহীরুহের পতন হলো। নাজির ভাই'র কাহিনী রয়ে গেছে অলিখিত। তাঁর অনুজ বিখ্যাত নাট্যকার সৈয়দ আহমেদ সাহেব নাজির ভাই'র কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করে কিছু লিখলে সমাজ উপকৃত হবে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এক বিরাট স্বাক্ষর শহীদ মিনারের স্থপতি নাজির ভাই'র আর এক অনুজ প্রয়াত হামিদুর রহমান। নাজির ভাই'র মরদেহ ঢাকায় পাঠাবার ব্যাপারে সামান্য কিছু করতে পেরে কিঞ্চিত শান্তি পেলাম।

বিবিসি ক্লাবে ভারতের বিখ্যাত লেখক শঙ্কর ওরফে মনি শঙ্কর রায়ের সাথে দেখা আর একদিন। এক গুণগ্রাহী ড্রিংকস অফার করলেন শঙ্কর বাবুকে। শঙ্কর বাবু বললেন, না ধন্যবাদ, আমার প্রয়াত পিতৃদেব আমার কোটা শেষ করে গেছেন। অতএব, আমার চলবে না, তবে একটা সফট ড্রিংক নিতে পারি, বিনীতভাবে বললেন জনগণনন্দিত মানবতাবাদী সাহিত্যিক। শঙ্কর বাবু শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করে লেখেন। হাতে সব সময় রয়েছে একটা নোট বই। অত্যন্ত সাদাসিধে চলন বলন। আমার সহকর্মী কূটনীতিক জালালের সাথে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ। জালাল সাহেব এতবড় সাহিত্যিকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। শঙ্কর বাবুর লেখার প্রশংসা করতে গিয়ে বললাম, আসুন না একবার বাংলাদেশে, দেখে যান আমরা কেমন আছি, প্রবাসে দেখা অনেক বাংলাদেশী স্থান পেয়েছে আপনার লেখায়। নিজ দেশে সেই লোকগুলো কেমন আছে তা দেখে তাঁদের সম্বন্ধে লিখুন, বললাম। বললেন, ইচ্ছা আছে বাংলাদেশের পটভূমি নিয়ে লিখবো, সময় করতে পারলেই যাবো। তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলাম, আসুন দেখে যান উত্তর বঙ্গের মানুষ প্রয়োজনের সময় পানির অভাবে কেমনভাবে দিন যাপন করছে।

কিছু দিন আগে কথা হচ্ছিল শফিক রেহমানের সাথে ফোনে। শঙ্কর এসেছিল জানো, শফিক বললো। বললাম, না, শুনিনি তাঁর আসার কথা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ অনেক বাঙালি সাহিত্যিক প্রায়শঃই বাংলাদেশ পরিদর্শনে আসেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র কি তাদের লেখায় স্থান পেতে পারে না? তারা কি পারেন না দু'টি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান বিতর্কিত বিষয়গুলোর সমাধানের ব্যাপারে অবদান রাখতে?"[১১৪]

---

১১৪. আবদুর রহিম (সাংবাদিক)/সুপ্রভাত বাংলাদেশ। [ননী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। পৃ. ১০৭-১১০]

দ্বিতীয় পর্ব

আজাদীর স্বপ্ন

এক

মুসলিম জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি

"...বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন সেন, ডি.এল রায়, সুরেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষা-বীজ, যাহা প্রথমে উষর ক্ষেত্রে উপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নধর শ্যাম তরুতে পরিণত হইয়াছে। আশা করা যায়, অচিরে তাহা ফল প্রসব করিবে। এক কালে নগণ্য জাপানের ন্যায় আজ বাঙ্গালী হিন্দু জগতের সম্মুখে বড়ো হইতে চলিয়াছে। তাহার সুরেশ ব্রাজিল দেশে যশোবৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছেন। তাহার জগদীশ ইউরোপ আমেরিকায় কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র রূপে জগতের জয়মাল্য পাইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমান। যদি তুমি জড়জগতের ন্যায় বসিয়া থাক, তবে বাঙ্গালার বক্ষে তোমার স্থান নাই। জান না কি যোগ্যতমের রক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম? তোমাকে বড়ো হইতে হইবে। তোমাকে তোমার অগ্রজের সমান হইতে হইবে।

আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে। বড়ো হইতে হইলে আমাদের সাহিত্য চাই। রোমের ইতিহাস পড়, গ্রীসের ইতিহাস পড়, আরবের ইতিহাস পড়, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়, জর্মানীর ইতিহাস পড় দেখিবে - জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি কেমন একতারে বাঁধা।

প্রথমে চাই মুসলমান বালকবালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক। কি পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম, শ্যাম, গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড়ো ভালো ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লাহ কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখন হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ উপ্ত হইল। তারপর সে তাহার পাঠ্য পুস্তকে রাম-লক্ষণের কথা, কৃষ্ণার্জুনের কথা, সীতা-সাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। স্বভাবতঃ তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোটো জাতি, আমাদের মধ্যে বড়লোক নাই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে মুসলমানত্বহীন করা হয়। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহ নয়। মুসলমানের নিতান্ত ছোটো 'জাত'। তাহাদের মধ্যে ভালো লোক জন্মিতে পারে না। এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। আমি বলি না, মুসলমান বালক-বালিকার হিন্দুমহারাজদিগের জীবনী জানিয়া কাজ নাই। আমি কেবল বলিতে চাই, আগে নিজের ঘরের খবর জান, পরে পরের ঘরের খবর জানিও।

একথা ঠিক, বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে যতটা জানে, বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান সম্বন্ধে তাহার এক আনা জানে কি না সন্দেহ। কাজেই মুসলমানগণ পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অধিক কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। মক্তবে ও মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদিগের শিশুদিগকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, এতদপেক্ষা আর কি কলঙ্কের কথা আছে। আমরা কি এতই মূর্খ যে, তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতে পারি না?

রাজসিংহ ও চন্দ্রশেখরের লেখককে খালি গালি দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক সার্চ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্ধ-সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালী মুসলমান, তাহা করিয়াছ কি? দেখ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তোমার কার্য্য করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালী মুসলমান, তোমার মুখের চুন কালি মুছিতেছেন হিন্দু। তুমি কি এত অক্ষম?

জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে, কতগুলি আদর্শ খাড়া করিতে হইবে। উপন্যাস ও নাটকে যেমন লোক চরিত্র অঙ্কন করা যায়, আর কিছুতেই সেরূপ সম্ভব না। আমাদিগকে উপন্যাস ও নাটক দ্বারা দেখাইতে হইবে মুসলমানের কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের পারিবারিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের সামাজিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের রাষ্ট্রীয় জীবন কিরূপ হওয়া উচিত। খালি প্রেম কাহিনি লিখিয়া কোন ফল নাই। মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকের ভিতর একটি মুসলমানি ছাপ থাকা চাই। নচেৎ জাতীয় জীবনের জন্য সে উপন্যাস, সে নাটক বৃথা। কাব্য ও খণ্ড কবিতায়ও ইসলামিক ভাব থাকা চাই। কাব্য এমন হইবে, কবিতা এমন হইবে, যাহা পাঠে মুসলমান খাঁটি মুসলমান হইতে পারে। তাহাতে মুসলমান জীবনের আদর্শ থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ তা সে যতই সুন্দর হউক, তদপেক্ষা ইসলামিক ভাবপূর্ণ মাঝারি ধরণের কাব্য ও কবিতা আমাদের এক্ষণে প্রার্থনীয়।

শত সহস্র সভা সমিতির দ্বারা যে কাজ হয়, এক সাহিত্যের দ্বারা তাহার হাজার গুণ কাজ হয়। জাতীয় জীবন গঠনের জন্য সাহিত্য অপরিহার্য্য। বাঙ্গালী হিন্দু বৌদ্ধ জাপানীর ন্যায় আজ বড়ো হইতে চলিয়াছে। আমাদিগকে ছোটো থাকিলে চলিবে না। এই আগে চলার দিনে আমাদিগকেও আগে চলিতে হইবে। নচেৎ আমাদিগকে ব্যক্তিত্ব হারাইয়া হয় জীবনে মরণে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে, নয় বাঙ্গালা হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইতে হইবে। আমাদিগকে বড়ো হইতেই হইবে। বড়ো গাছের তলায় ছোটো গাছের মত যদি আমরা শুকাইয়া মরিতে না চাই, তবে আমাদিগকে বড়ো হইতেই হইবে। এই বড়ো হইবার জন্য সাহিত্য চাই। শুধু অলস বেকার সময় কাটাইবার জন্য নহে, শুধু কল্পনার খেলা দেখাইবার জন্য নহে, বড়ো হইবার জন্য সাহিত্য চাই।

রুসো-ভলতেয়ার এবং বিশ্বকোষকারগণের রচনাদ্বারা নব্য ফরাসী জীবন গঠিত হইয়াছে। বিসমার্ক, নিটশে প্রভৃতির লেখনীদ্বারা নব্য জর্ম্মান জীবন অনুপ্রাণিত হইয়াছে। টলস্টয় প্রমুখ রুসীয় লেখকগণ দ্বারা রুসের রাষ্ট্রীয় জীবন নতুন পথে চলিয়াছে। দূরের দৃষ্টান্তের কি প্রয়োজন? বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, মনোমোহন, ডি,এল রায়, গিরিষ ঘোষ, নবীন সেন, বিবেকানন্দ, ব্রম্মঃবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে কি নুতন আশা, নূতন প্রেরণা, নুতন উন্মাদনার সৃষ্টি হয় নাই? হে মুসলমান সাহিত্যিক, তোমাকে তোমার অতীত গৌরব গাঁথা গাহিতে হইবে শুধু গর্ব করিবার জন্য নয়, আত্মসম্মান জাগাইবার জন্য। তোমাকে তোমার ইসলামের মাহাত্ম্য, ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্য ঘোষণা করিতে হইবে, হিন্দুকে ঘৃণা করিবার জন্য নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য। তোমাকে কাব্যসঙ্গীত রচিতে হইবে - শুধু কানের তৃপ্তির জন্য নয়, প্রাণে নব উন্মাদনা, উচ্চ চিন্তা, তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য। তোমাকে আদর্শ মুসলমান চরিত্র আঁকিতে হইবে - শুধু আত্ম প্রশংসা করিবার জন্য নয়, অনুকরণ করিবার জন্য। তোমাকে দর্শন বিজ্ঞানে আলোচনা করিতে হইবে, শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, তোমার প্রতিভায় জগৎকে মুগ্ধ করিবার জন্য।

আসিবে কি সে দিন যে দিন বাঙ্গলার মুসলমান তাহার স্পেনীয় মুর বা আরবীয় সারাসেন বা ইরানী ভ্রাতৃগণের ন্যায় ধর্মে মহীয়ান, জ্ঞানে গরীয়ান হইয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাহারও নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারিবে? যে দিন সে শুভ দিন দেখিতে পাইব, সে দিন আমার জীবন সফল হইবে, আমার মরণ ধন্য হইবে।"[১১৫]

---

১১৫. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ/ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ। [বাংলা একাডেমী - জুলাই, ১৯৮৫। পৃ. ২৯০-২৯১]

দুই
ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা

"...ঘোর অন্ধকারে নিপতিত পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সহসা আলোকশিখা দেখিলে তাহার নিরাশ ও ব্যাকুল প্রাণে যেমন আশার সঞ্চার হয়, হিমসম্পাত সঙ্কুচিত অবসাদগ্রস্ত তরুলতা বসন্তের মলয় হাওয়ার নব জীবনপ্রদ স্পর্শে যেমন সর্বাঙ্গে নব পুলক ও নব জাগরণের স্ফূর্তি অনুভব করে, ভূপতিতা আশ্রয়বিহীনা লতা সহসা একটা বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয় পাইলে সে যেমন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠে, অধঃপতিত, আশ্রয়বিহীন, সহস্র দুর্দশাগ্রস্ত জাতিও তেমনি অতীত যুগের প্রাণময়ী গৌরব-কাহিনি পাঠ ও আলোচনা করিয়া হতাশ, নিরাশ ও অবসন্ন প্রাণে নব আনন্দ ও নব আবেগ লাভ করে।

পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার, অপূর্ব অধ্যবসায়, অসাধারণ স্বজাতি-প্রেমিকতা, উন্নতির অদমনীয় স্পৃহা, লোকচমকিত শৌর্য-বীর্য, অটল আত্মবিশ্বাস, অবিচল আত্মসম্মান প্রভৃতি মনুষ্যত্ব, প্রভুত্ব, উন্নতি ও মর্যাদার বিভিন্ন গুণের বিশদ কাহিনি পাঠ করিয়া আড়ষ্ট ও দুর্বল, ভীত এবং সঙ্কুচিত প্রাণের মধ্যেও একটা দুর্জয় বৈদ্যুতিক শক্তির বিক্রম লাভ করে। যে কূপের সহিত প্রাকৃতিক উৎসের সংযোগ আছে, তাহার পানি কমিতে পারে বটে, কিন্তু কিছুতেই শুষ্ক হইতে পারে না; ঠিক সেইরূপ যে জাতির ইতিহাস অতীতের সহস্র গৌরব-কাহিনিতে পরিপূর্ণ সে জাতির যদি ইতিহাসের সহিত পরিচয় থাকে, সে জাতিও অধঃপতিত এবং পরপ্রত্যাশী হইতে পারে বটে, কিন্তু সে জাতি কখনও মরিতে পারে না। তাহার জাতীয় প্রাণ হইতে মনুষ্যত্ব ও প্রভুত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারে সম্পূর্ণভাবে কখনও তিরোহিত হইতে পারে না।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আত্মবিশ্বাস একমাত্র উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভের কারণ, জাতিগত জীবনেও তেমনি আত্মবিশ্বাসই জাতিকে অধঃপতন ও শোচনীয়তার গভীর গহবর হইতে কল্যাণ ও আনন্দের উন্নত ও আলোকপ্রদীপ্ত স্ফূর্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। জাতীয় গৌরবের ইতিহাস এই আত্মবিশ্বাস জন্মাইবার এবং আত্মা আকিঞ্চন-জ্ঞান দূর করিবার পক্ষে অমোঘ ঔষধ।

মুসলমানদের যেমন ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস যেমন বিরাট ও বিপুল এবং তাহাতে গৌরবের কথা, জ্ঞান-গরিমার ও প্রতিভা-গরিমার বাণী, বীরত্বের জ্বলন্ত কাহিনি যে পরিমাণে বিদ্যমান আছে, পৃথিবীর আর কোনও জাতির তাহা নাই। মুসলমান কোনও স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ নহে বলিয়া জগতের সমস্ত মুসলমানের গৌরব ও যশঃ জগতের প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রাপ্য ও ভোগ্য।

আরবীয় মুসলমানের গৌরব যেমন চীন ও ভারতীয় মুসলমানের ভোগ্য ও প্রাপ্য, ভারত ও চীনের মুসলমানের গৌরবও তেমনি আরবীয় মুসলমানের প্রাপ্য ও ভোগ্য। গঙ্গার পানিরাশি নানা দেশ-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বহমান হইলেও উহা যেমন সর্বত্র একই গঙ্গার পানি, প্রয়াগের গঙ্গার পানি এবং শান্তিপুরের গঙ্গার পানি যেমন পরস্পরকে পৃথক বলিয়া কখনই মনে করিতে পারে না, তেমনি ভাষা, বর্ণ, আকৃতি ও জন্মস্থানের পার্থক্য থাকিলেও পূর্বের মুসলমান পশ্চিমের মুসলমান হইতে, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ হইতে, গোলাম বাদশাহ হইতে কখনই নিজকে পৃথক মনে করিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহারা ভাবের রাজ্যে, ধর্মের রাজ্যে, কর্তব্য ও কর্মের রাজ্যে পরস্পর এক। শিকলের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, সমস্ত জগতের মুসলমানগণও তেমনি পরস্পর একক সম্বন্ধযুক্ত।

এই জন্য আফ্রিকা বা আমেরিকার কোনও মুসলমানের মৃত্যু হইলে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালার মুসলমানের কণ্ঠ হইতে 'ইন্নালিল্লাহ ...' আপনা আপনি বাজিয়া ওঠে। এই জন্যই বাদশাহ গোলামকে কন্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। মসজিদে সম্রাট গোলামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার পদসম্মুখে মস্তক রাখিয়া আল্লাহকে ছেজদা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই মহা ঐক্যের বন্ধনের জন্যই নিখিল জগতের সমস্ত দেশের, সমস্ত বর্ণের ও সমস্ত বংশের মুসলমানের গৌরব, উন্নতি বা কল্যাণের সৌরভ, পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন বর্ণের মুসলমানেরই উপভোগ্য। এই জন্যই মুসলমানের

ইতিহাস বিপুল, বিরাট ও বিশাল হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই অনন্ত ইতিহাসের পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে গৌরবের ছটা বিকীর্ণ হইতেছে। যে জাতির এমন বিপুল গৌরব কাহিনির অসীম আলোক-ভাণ্ডার আছে, তাহাদের সম্মুখে যদি সেই ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া একবার আলোকের রাজ্য প্রদর্শন করিতে পার, তবে তাহাদিগকে কেহই অন্ধকারে রাখিতে পারিবে না।

তবে মুসলমান এমন গভীর অন্ধকারে পড়িয়া আছে কেন? ইতিহাস ত তাহার খুবই আছে। কথা হইতেছে, ইতিহাস থাকিলে কি হইবে? ইতিহাসের সহিত পরিচয় আছে কয়জনের? গৃহে লক্ষ লক্ষ মণ ইস্পাত থাকিলেই শত্রু জয় করা যায় না। সেই ইস্পাত দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা চাই এবং যথারীতি তাহার ব্যবহার করিলে তবে ত যুদ্ধে জয়লাভ হয়। ইতিহাসের এই অনন্ত গৌরব-কাহিনিকে যদি রসের মত, আনন্দের মত, পানির মত, হাওয়ার মত সমস্তটা জাতি ভোগ করিতে পারে, তবেই মুসলমানের পক্ষে এই মৃত্যু-সমাধি হইতে, অন্ধকার গোর হইতে, 'খাবে গাফলাতে'র মোহ হইতে নূতন জগতের, নূতন জীবনের, নূতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে ধাবিত হওয়া সম্ভবপর।

প্রত্যেক জাতির বালকেরাই সেই জাতির ভবিষ্যনিয়ন্তা। বালকের কোমল হৃদয়ে মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃঅঙ্কে, মাতৃঅঞ্চলে, পল্লীর পাঠশালে এবং শহরের স্কুল-কলেজে, মকতব ও মাদরাসায় পুস্তক ও প্রবন্ধে স্বজাজাতির যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ ও পাঠ করে; স্বজাতির যেরূপ মূর্তি ইতিহাসে, উপন্যাসে, কাব্য ও আখ্যানে দেখিতে পায়, তাহারা সেইরূপভাবেই আপনাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে সমর্থ হয়। শৈশবকাল হইতে সন্তানদিগের প্রাণে জাতীয় উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ ভাব প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারিলে, শত শিক্ষা দ্বারা কখনও জাতীয় উন্নতি সাধন বা অধঃপতনের গতিরোধ হইতে পারে না! অন্তরের মধ্যে বাল্যকাল হইতে যে ভাব ও কল্পনা বা চিন্তা জমাট বাঁধিয়া যায়, কার্যক্ষেত্রেও মানুষের জীবন তদনুরূপ অভিব্যক্ত ও ক্ষমতাশালী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষার মূলে এই জাতীয়তার উচ্চ আদর্শের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সন্তানদিগের প্রাণে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য সহস্রবিধ আয়োজন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই তাহাদের সন্তানেরা শিক্ষা পায় যে, 'পৃথিবীতে তাহারা বড়ো হইবার জন্য, শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।' প্রমাণস্বরূপ গৌরবান্বিত বৃটিশ জাতির 'রুল ব্রিটানিয়া' সঙ্গীতটি মনে করুন :

'Rule Britania! Britania rule the waves,
The Britons never shall be slaves.'
'শাসক ব্রিটনগণ! উর্মিরাশি সমুদ্রের,
ব্রিটন হবে না কভু পরাধীন অপরের।'

শৈশবকাল হইতে যে জাতির শিশুরা এইরূপ সর্বভীতিনাশক বরাভয়প্রদ তেজ:সঞ্চারণী বাণীর অমৃতধারা পান করিয়াছে, তাহারা যে অখণ্ড জগতের উপরে আপনাদের প্রভুত্বের সিংহাসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য কি? তারপর তাহাদের জাতীয় বীরপুরুষদিগের, কর্মীদিগের 'শহীদ'দিগের শৌর্য-বীর্য-প্রভুত্ব-পরাক্রম এবং গৌরব ও প্রতাপের কথা সহস্র বর্ণে, সহস্রভাবে রঞ্জিত এবং উজ্জল করিয়া কবিতার ছন্দে, কাব্যের চিত্রে, ইতিহাসের বর্ণনায়, উপন্যাসের রস বিন্যাসে মর্মে মর্মে, প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে একেবারে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়। ফলত: আজকাল সকল দেশেই-বাল্যকাল হইতেই স্বদেশের স্বজাতির গৌরব-কাহিনি, ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ ও বীর্য-শৌর্যের স্মৃতি দ্বারা বালক-বালিকাদিগের হৃদয়কে মহিমাস্পৃহ, সবল ও তেজঃপূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে।

আমার ইউরোপ-প্রবাসকালীন তুর্কীদিগের শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগের গৃহশিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদিগের অপেক্ষা কত উন্নত, মার্জিত, সবল এবং তীক্ষ্ণ, তাহা আমি পুস্তকাকারে বর্ণনা করিয়াছি। এখানে মাত্র তাহাদিগের ইতিহাস শিক্ষা-প্রণালীর উল্লেখ করিতেছি।

তুর্কী-বালকদিগকে নিম্নশ্রেণি হইতেই তুর্কীজাতির ইতিহাস ভালরূপে শিখান হয়; বাল্যপাঠ্য ইতিহাসে গৌরবের কথাই বিশেষরূপে বর্ণিত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ তুর্কী জাতি, সুলতান, বীর পুরুষ, জ্ঞানাচার্য ও ধর্মবীরদিগের গৌরবের কথা, দিগ্বিজয়ের গাথা, জ্ঞানচর্চার কাহিনি ও মহিমার বাণী মুখে মুখে বিশেষ করিয়া গল্পের আকারে শুনাইয়া দেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের কলঙ্ক ও অগৌরবের কথা যতদূর সম্ভব ছাত্রদিগের নিকট উল্লিখিত হয় না। পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল এই পদ্ধতিতেই সভ্যদেশ সমূহে ছাত্রদিগকে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমাদের দেশেও ক্রমশঃ ছোটো ছেলেদিগকে নিম্নশ্রেণীতে মুখে মুখে ইতিহাস শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সুফল মুসলমান ছাত্রগণ কতটা ভোগ করিতেছে, তাহা কেহ খবর রাখেন কি? আমাদের সন্তানেরা প্রায়শঃ মুসলমান-বিদ্বেষী বিজাতীয় লেখকদিগের লিখিত ইতিহাস মুসলমানদ্বেষী শিক্ষকদিগের নিকট পাঠ করিয়া থাকে। এই সমস্ত ইতিহাসের যে কোনও খানি খুলিয়া পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত মুসলিম আমলদারীর অংশ হইতে গৌরবের কাহিনি চিহ্নিত, মুছিয়া একেবারে ধুইয়া ফেলা হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যবান, প্রজাপালক ও কীর্তিমান বাদশাহদিগকেও যতদূর নাই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, পিশাচ প্রকৃতি, আলস্যপরায়ণ ও ইন্দ্রিয় দাসরূপে সাজান হইয়াছে; গৌরবের কথা, সুশাসনের কথা যেখানে একেবারে উল্লেখ না করিলেই নয়, সেখানেও এমন কৌশলে, এত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ছাত্রদের দৃষ্টি ও মনোযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক।

ফলতঃ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পাঠে, মুসলমান ছাত্রদিগের হিতের পরিবর্তে নিদারুণ বিপরীত ফলই লাভ হইতেছে। বাল্যকাল হইতেই কোমলমতি বালকগণ জাতীয় সম্মান জাতীয় গৌরববোধের স্থলে স্বজাতির প্রতি দারুণ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপর তাহারা হিন্দুদিগের রচিত অন্যান্য বহি-পুস্তকে এবং নাটকে-নভেলে মুসলমানের যে চিত্র দেখে, তাহা আরও বীভৎস ও পৈশাচিক রূপেতে মুসলমানের যে মূর্তি দেখে তাহাতে কিছুমাত্র আত্মসম্মান-বোধ বিশিষ্ট ছাত্রের পক্ষেও মৃত্যু কামনা করাই স্বাভাবিক। হায়! যে জাতির সুকুমারমতি বালকগণ জীবনের প্রথম হইতেই স্বজাতি সম্বন্ধে এইরূপ অতি নীচ ও জঘন্য ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হয় ও শিক্ষা পায়, সে জাতির বালকদিগের উত্তর জীবনে মনুষ্যত্ব, জাতীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানের বিকাশ হওয়া কি নিতান্তই আকাশ কুসুম নহে? ফলেও কি আমরা তাহাই দেখিতেছি না?

আবার অন্যদিকে আমাদের স্বদেশীয় প্রতিবেশিদের কাণ্ড-কারখানা, কৌশল ও অধ্যবসায়ের প্রতি দৃকপাত করুন। একমাত্র কাশ্মীরের 'রাজ তরঙ্গিণী' খানা ব্যতীত হিন্দুর ইতিহাস বলিতে আর একখানি বহিও নাই। তাহাও পৌরাণিক গালগল্প হইতে মুক্ত নহে। অথচ গোটা হিন্দুজাতিটাই আজকাল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে নানা শ্রেণীর অলীক, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য গল্প এবং কেচ্ছাকাহিনিগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া কৃত্রিম ঐতিহাসিক আকার দান করতঃ সহস্রধা বিচ্ছিন্ন এবং সহস্র সহস্র বৎসরের পতিত হিন্দুজাতির বালক বালিকার মনে আত্মসম্মান, স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির ধারণা দৃঢ় বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য কি বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতেছে!

রাজনীতি ক্ষেত্রে চিরপ্রতিষ্ঠাহীন ও চির প্রভুত্বশূন্য হিন্দুকে প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই আর্যজাতির কড়াক্রান্তি পরিমিত গৌরবকেও এমন করিয়া বিপুল ও বিরাটভাবে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা হইতেছে যে, তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়!

দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাসের' যে বৃহৎ বৃহৎ কয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথম দুই খণ্ড বিরাট বহিতে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের গৌরবকাহিনিকে ফেনাইতে যাইয়া মুসলমানের জ্ঞানগৌরবের প্রতি কঠোর আঘাত করা হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়! আমাদের কতিপয় রাজান্য তথাকথিত নবাব এই কেতাবের তারিফ করিতে যাইয়া বেশ 'জবান দারাজী' শেখাইয়াছেন। এ অধম কয়েক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের কতিপয় মারাত্মক মিথ্যা রচনা ও অপবাদ অপহ্নুতির যে প্রতিবাদ করিয়াছিল,

আজও কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ এই সময় 'গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল' নবাবপুত্রদিগের হিন্দু আমলারা ইতিহাসের যে প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছে, তাহারা চক্ষু মুদিয়া তাহাতেই নাম দস্তখত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। মুসলমানের জন্য যে 'লানতের তওফ' রচিত হইয়াছে, এই সমস্ত মহাত্মারা তাহার গৌরব ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। খোদাতায়ালা ইহাদের প্রভাব সংস্রব হইতে মুসলমানকে রক্ষা করুন। ফলতঃ মুসলমানের অতুলনীয় বিপুল ও বিশাল বীর্য-শৌর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অভ্রভেদী স্তম্ভকেও কেমন করিয়া হিন্দু লেখকেরা কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য কি কূটকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে যুগপৎ দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

যাবতীয় দিগ্‌বিজয়ী মহাবীরদিগের দিগ্‌বিজয়ের কাহিনির মধ্যে বঙ্গবিজয়ের কাহিনি মুসলমানের পক্ষে যেমন গৌরবের হিন্দুর পক্ষে উহা তেমনি কলঙ্কের কারণ। সপ্তদশ জন অশ্বারোহী মাত্র সম্বল করিয়া বাঙ্গালার ন্যায় বিশাল রাজ্য অধিকারের কাহিনি দুনিয়ার ইতিহাসে আর দুটি নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে বিনাযুদ্ধে রাজ্যত্যাগ করতঃ খিড়কিদ্বার দিয়া রাজার পলায়নের এমন কাপুরুষতা ব্যঞ্জক কাহিনিও পৃথিবীতে আর দু'টি নাই। জাতীয় অভ্যুত্থানের খেয়ালের পথে হিন্দুর পক্ষে এই ঘটনা তীব্র কন্টকস্বরূপ। তাই আজ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা বাকজাল বিস্তার করিয়াছেন। উপযুক্ত জবাব দিবার লোক মুসলিম-সমাজে নাই মনে করিয়াই বোধহয় তিনি প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা কাজী মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ জারজানী মহোদয়কে মিথ্যাবাদী বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। শূন্য ময়দানে জয়-পতাকা উড়াইয়া দিবার মত এমন সুযোগ ও সুবিধা আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একজন মুসলমান ছাত্রকে একজন বীর পুরুষের নাম করিতে বলুন। সে নিশ্চয়ই অম্লানবদনে নেলসন, নেপোলিয়ান, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন এবং ভীম-অর্জ্জুনের কথা এমন কি দস্যুদলপতি শিবাজীর কথা পর্যন্ত বলিয়া ফেলিবে। কিন্তু হায়! সে ভ্রমেও ওমর, আলী, খালেদ-এবনে-আলিদ, আর্ম, শুরহাবিল, সাআদ, আবু ওবায়দা, জেরার, মোসন্না, হাঞ্জালা, সুলতান ছালাহউদ্দীন, ওকবা, মুছা, আয়াজ, তারেক প্রভৃতি বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বদেশের অক্লান্ততেজঃ, দৃপ্তবীর্য মহাবীর আকবর, আওরঙ্গজেব, শেরশাহ, আলাউদ্দীন, নিজাম-উল-মূলক, হায়দার আলী (সিন্ধু-প্রদেশের শেষ অধিপতি), চাঁদ সুলতানা, রাজিয়া সুলতানা, আলীবর্দী, তাকীখান, আবুল ফজল, শুজা উদ্দৌলা, ফিরোজশাহ বাহমনি প্রভৃতি শত শত মহা তেজস্বী ও রাজ্যবিজয়ী বীরপুরুষদিগের নামও সে উচ্চারণ করিতে পারবে না। সে হয়ত ইহাদের কাহারও কাহারও নাম জানিতে পারে বটে; কিন্তু তাহারা যে পরাক্রান্ত বীর ছিলেন, সে বিষয়ে সে কিছুই জানে না। তাহাকে যাহা বুঝান হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে গৌরবের ধারা খুঁজিয়া বাহির করিবার কোনও সূত্র দেওয়া হয় নাই। যে দিগ্‌বিজয়ের জন্য বালকের হৃদয়ে গৌরবের ভাব উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল, তৎপরিবর্তে এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বীরত্ব কাহিনিকে নৃশংস, নিষ্ঠুর, দানবীয় ও পৈশাচিক কার্যরূপে বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি অভক্তি ও বিরক্তির ভাবকে সজাগ করিয়া তোলা হইয়াছে।

ভারতের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস অনন্ত গৌরবের ভাণ্ডার। তাহা হইতে মুসলমানের অনন্ত মহিমা ও গরিমার জ্যোতি নির্গত হইতেছে। কোন্ দেশে শেরশাহ, আকবর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব, ফিরোজ, জালালউদ্দিন, আলাউদ্দিন, হুমায়ুন প্রভৃতির ন্যায় মহাবীর ভূ-পালগণ এত অধিক সংখ্যক আবির্ভূত হইয়াছিলেন? কোন্ দেশে নাছিরউদ্দিন তুগলক, বোলবন এবং আওরঙ্গজেবের ন্যায় ঋষিপ্রতিম সম্রাট এত অধিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যে দিল্লীর বাদশাহী হারেম অনন্ত নারী-প্রতিভা এবং নারীজ্ঞানের অনন্ত মহিমার আকর, আজ তাহা আর্কফলাধারী 'ক্ষৌরিতচিকুর' চট্টোপাধ্যায় হইতে নথকৃন্তিকাধারী শীলের লেখনী চালনায় পাপের আকর এবং শয়তানী ও দানবীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

অবশ্য এ সকল অলীক ও কল্পিত কলঙ্ককাহিনি মূলে সূত্রপাত করিয়াছেন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন প্রভৃতি। ইংরেজি বিদ্যার অধিকারী প্রতিবেশিগণ সে সকল চর্বিতচর্বণ বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অলিতে-গলিতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে উদ্দেশ্যে এ সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

দম্ভের সহিত বলিতে পারি, দিল্লীর হারেম যত মনস্বিনী ও প্রতিষ্ঠাশালিনী, যত ব্রহ্মবাদিনী ও তপস্বিনীর জন্মদান করিয়াছে, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভাতেও তাহার তুলনা নাই। নূরজাহান, মমতাজ মহল, রোকাইয়া বেগম, গুলবদন বেগম, দৌলতুন্নেচ্ছা, জাহানারা, জেবুন্নেছা, রওশন আরা কুদসিয়া, রাজিয়া সুলতানা, হামিদা বেগমের ন্যায় এমন নারী-রত্নহার আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। রাজনৈতিক প্রতিভায় এক নূরজাহানই সারাজাহানের নূর। রাজিয়া সুলতানারই বা তুলনা কোথায়? এমন বিশাল সাম্রাজ্য, কোন্ দেশে আর কোন্ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা এমনভাবে সুশাসিত এবং সুরক্ষিত হইয়াছিল? বাগদাদের মহামতি খলিফা হারুণের বিবি জোবেদা খাতুন এবং মামুনের স্ত্রী খেদিজা বা বুরান বিদুষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন; স্পেনের সম্রাট তৃতীয় আবদুর রহমানের স্ত্রী জোহরাও বিদুষী ও জ্ঞানবতী ছিলেন বটে; কিন্তু নূরজাহান ও রাজিয়ার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না।

কিন্তু সে নূরজাহান ও রাজিয়ার জন্য আমরা কতটুকু গৌরব অনুভব করি? জাহানারা ও জেবুন্নেসার ন্যায় আজন্ম তপস্বিনী, আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, আজন্ম জ্ঞানচর্চানুরাগিনী, স্পেনের খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহের কন্যা 'ওয়ালেদা খাতুন' এবং জগদ্বিজয়ী 'সাহেবকেস্কন' তৈমুর লঙ্গের রাজ্ঞী বিবি খানমের ন্যায় কয়জন ধর্মশীল, গৌরবময়ী, প্রতিভাশালিনী দেখিতে পাই? হায়! আজি সেই, দিল্লীর বেগম মহলের প্রতি মোশরেক বা বেদ্বীন লেখকগণ যেরূপ ভাবে কলঙ্কের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা স্মরণেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক নরসুন্দর সন্তান, পুণ্যবতী ও যশস্বিনী মমতাজ মহলকে বাঙ্গালী হিন্দু-কন্যারূপে পরিচিত করিবার জন্যও বিরাট গ্রন্থ লিখিতে কসুর করেন নাই। ইহাপেক্ষা অসহ্য ধৃষ্টতা এবং জাতীয় অবমাননার কথা আর কি হইতে পারে?

হায়! যে জাতির ধুতি-চাদর মাত্র পরিধেয় ব্যতীত কোনও পোশাক ছিল না — আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যাহারা আজও সভ্যসমাজে যাইতে বাধ্য হন, আমাদের আদব-কায়দা ব্যতীত যাহাদের নিজস্ব বলিতে কোনও আদব-কায়দাই নাই, আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁহাদের লেখকেরা শত সহস্র পুস্তকে লিখিতেছেন যে, 'মুসলমানেরা অসভ্য, অর্ধ সভ্য ছিল, ভারতে আসিয়া হিন্দুদের নিকট সভ্যতা শিখিয়াছে।' আর এই সমস্ত পুস্তক আমাদের সন্তানেরা পাঠ করিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছে। বিরাট সমাজে এই মহা সর্বনাশকর স্রোত রোধ করার জন্য কাহারও কণ্ঠে কোনও চিৎকার শ্রুত হইতেছে না। সমস্ত মুসলমান-গৌরবকে কুক্ষিগত করিয়া লইবার জন্য কিরূপ প্রবঞ্চনা ও বাগজাল বিস্তার করা হইতেছে, তাহার একটা সত্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

গৌড়ের অধিকাংশ মসজিদই এনামেল বা 'মিনা' দ্বারা মণ্ডিত ছিল। মুসলমানেরাই যে এনামেলের আবিষ্কর্তা, হিন্দুর চক্ষে এ গৌরব অসহ্য। একজন তথাকথিত ঐতিহাসিক হিন্দু পণ্ডিত উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের এক মহতী সভায় এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি একখানি মিনামণ্ডিত ইষ্টক দেখাইয়া বলিলেন—'এনামেল বা মিনার কার্য যে মুসলমানেরা ভারতে প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তাহার প্রমাণ এই ইষ্টকখণ্ড। ইহা মালদহের অমুক শেঠের পুকুরে পাওয়া গিয়াছে।' অমনি অসংখ্য হিন্দুশ্রোতা হাততালি দিয়া Hear, Hear বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি ত যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত! দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম যে, ঐ ইষ্টকখণ্ড লোষ্ট্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। সুতরাং উহা যে লোটন মসজিদ বা তাঁতি পাড়ার মসজিদের ইট, রাখালদের দ্বারা লোষ্ট্ররূপে পুকুরে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? আর ঐ পুকুর কি মুসলমান আগমনের পূর্বে খনিত? পুকুরের তলায় কত ইট পাওয়া গিয়াছে? আর সব চেয়ে বড়ো কথা হইতেছে যে, 'মিনা' যদি হিন্দুদিগের আবির্ভূত হইত, তবে তাহার সংস্কৃত নাম কি? বক্তার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন যে, এ অধম সেখানে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, তিনি আর কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী গৌড়ের ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। উহার পত্রে পত্রে মুসলিম-কলঙ্ক কাহিনি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু রাজা কংসের মুসলমানদিগের প্রতি ভীষণ ও নৃশংস হত্যা ও অত্যাচার কাহিনি একেবারেই গোপন করা হইয়াছে। অথচ এই বইখানি জনৈক মুসলমান ভ্রাতা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়নগরী একদিন সুরম্য সৌধমালা, বিরাটাকার মসজিদসমূহ, অসংখ্য উদ্যান এবং বেশুমার তালাবের জন্য দিল্লীর গৌরব-স্পর্দ্ধিনী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দুর্গ ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহার বিরাট জামে মসজিদ (যাহাকে হিন্দুরা অনর্থক বারদুয়ারী নাম দিয়াছেন) দিল্লির শাহজাহান নির্মিত মসজিদ অপেক্ষা কোন অংশেই ক্ষুদ্র নহে। আমরা স্বচক্ষে গৌড়ের বিশালায়তন এবং কীর্তিকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সুতরাং গৌড়ের এই গৌরবের কিয়দংশ চুরি-চামারী বা যেমন করিয়া হউক, হিন্দুর প্রাপ্য কহিতেই হইবে। সুতরাং চন্দ্র মহাশয় আর কিছু লিখিতে না পারিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে লিখিয়াছেন যে, 'আরবদেশ মরুভূমিতে পূর্ণ; সেখানে দীঘি-পুস্করিণী নাই। সুতরাং মুসলমানেরা তাহার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। অতএব গৌড়ের সমস্ত দীঘি-পুস্করিণী মুসলমানদের নহে, হিন্দুর খনিত।' বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা, এমন চমৎকার যুক্তি আর কখনও শুনিয়াছেন কি?

ডন পাসক্যাল, লেনপুল, ডোজী প্রভৃতি খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ বলেন - আরবেরা মরুবাসী ছিলেন বলিয়াই তাহারা উদ্যান, দীঘি, পুকুর এবং নহর ও উৎসের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যই ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা সমস্ত আরব রাজধানী ও আরব নগরে উদ্যান, তালাব ও নহরের প্রাচুর্য দেখা যাইত। আর সাধারণ জ্ঞানে একজন আহমকও বুঝিতে পারে যে, যাহার যে বিষয়ে অভাব থাকে সে সেই অভাব পূরণের দিকেই বেশি দৃষ্টি করে। অথচ চন্দ্র মহাশয়ের বুদ্ধি ইহার বিপরীত। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গৌড়ের সুলতানদিগের মধ্যে কেহ আরব হইতে আসেন নাই। সুলতান ও আমীরগণ সকলেই ভারতবর্ষীয় ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ আফগানিস্তান এবং তুর্কীস্তানের শ্যামল উপত্যকা ও পর্বত পরিপূর্ণ সুজলা সুফলা দেশ হইতেই আসিয়াছিলেন, আরবের মরুভূমির সহিত তাঁহাদের সংশ্রব ত কিছুই ছিল না। এমত অবস্থায় আরবের মরুভূমির কথা উল্লেখ করা নিতান্তই গাঁজাখুরী নহে কি? তারপর আরবের সর্বত্রই যে মরুভূমি ইহাই বা কে বলিল? আরবের ইরাক, ইয়েমেন ও তায়েফের ন্যায় এমন শস্যশ্যামলা, পুষ্পকুন্তলা, সুজলা-সুফলা ভূমি আর কয়টি আছে? দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দার ইয়েমেনের অত্যুৎকৃষ্ট জলবায়ু, চিত্তবিনোদক প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং প্রচুর ফল-শস্যের জন্যই তাঁহার দিগন্তবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী ইয়েমেনেই স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অকালমৃত্যু তাহাকে এই বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় নাই।

সুতরাং পাঠক পাঠিকা, দেখিতেছেন, চন্দ্র মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা কয় ক্রান্তি, কয় ধূল? এই শ্রেণীর যুক্তি কেবল যে চন্দ্র মহাশয়ই প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কেহ মনে করবেন না। মুসলিম গৌরব, মুসলমান-মহিমা এবং মুসলিম বীর্য-শৌর্যে ধূলি নিক্ষেপের জন্য, একমাত্র পারসী ভাষাভিজ্ঞ বাবু যদুনাথ সরকার ব্যতীত আর সকল লেখক, ঐতিহাসিক(?) ও আলোচনাকারীদিগের যুক্তিতর্ক এবং গবেষণা চন্দ্র মহাশয়ের পদানুসারী। অথচ এই সমস্ত লেখকগণ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন। আর এই সমস্ত অস্পৃশ্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের বালক ও যুবকগণ 'সর্বনাশের পথে' যাইতেছে। অথচ ৩/৪ জন লেখক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই এই সমস্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের মিথ্যাবাদিতার কাচের কেল্লা সত্যের দুই এক কষাঘাতে একেবারে চুরমার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়! আমাদের লেখকগণ ও গোটা সমাজটাই এখনও যে খাব গাফলতের কবরে শায়িত রহিয়াছে!

আরও দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করব। পাণ্ডুয়ার মহামতি সেকেন্দার শাহ নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত আদিনা মসজিদ অতি বিরাট ও বিশাল। প্রাঙ্গণ শুদ্ধ ইহার ভিতরে অর্ধলক্ষ লোক নামাজ পড়িতে পারে। শাহী আমলে প্রবাদ ছিল–

'আগে দেখ আদিনা
পরে যাও মদিনা।'

আদিনার ন্যায় বিরাট ৩৬০ গম্বুজ বিশিষ্ট মহাগ্রন্থ কোরআনের সমস্ত রচনাবলী উৎকীর্ণ বিরাট মসজিদ পৃথিবীতে আর মাত্র দুইটি প্রস্তুত হইয়াছিল। একটি কর্ডোভার জামে মসজিদ, ইহা খলিফা আবদুর রহমানের দ্বারা নির্মিত এবং ক্রমাগত যাবতীয় সুলতান এবং আমীরদিগের দ্বারা সজ্জিত ও বর্ধিত হয়; অপরটি দিগ্‌বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের দ্বারা নির্মিত সমরকন্দের জামে মসজিদ। কর্ডোভার মসজিদ এক্ষণে খৃস্টানদিগের গির্জায় পরিণত। আর সমরকন্দের মসজিদে আজও জুমা-জামাত হয়। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্যশালী এই বিরাটকায় মজিদের অধিকাংশই ১৮৭৬ খৃ. রুশ সেনাপতি জেনারেল স্কোবেলাফ কর্তৃক কামানের গোলায় ভগ্ন ও বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। কনস্টান্টিনোপলের মহা মসজিদ 'জামে-আয়া-ছোফিয়া'ও আদিনার নিকট দাড়াইবার উপযুক্ত নহে। আমি জামে-আয়া-ছোফিয়া দেখিয়া আনন্দিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আদিনা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। আদিনা যদি আজ অক্ষুন্ন কলেবরে বজায় থাকিত তবে পৃথিবীর চারিকোণ হইতে দলে দলে লোক ইহার সোপান তলে সমাগত হইত। তাজমহল ভাস্কর্যের সুন্দর কীর্তি; কিন্তু আদিনা, ভাস্কর্যের বিপুল ও বিরাট কীর্তি। কিন্তু হায়! বাঙ্গালার কয়টি নব্যশিক্ষিত মুসলিম যুবক আদিনার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছেন? মুসলমান যুবকেরা দেখেন নাই; কিন্তু হিন্দুরা দেখিতেছেন। এই মহাকীর্তি যে দেশের মাটিতে এখনও দাড়াইয়া আছে, সে দেশের মুসলমানেরা ইহার সন্ধান পাইলে আত্মগৌরব দৃপ্ত হইয়া উঠিবে তাই হিন্দু লেখকগণ লেখনী ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে আদিনাকে হিন্দুর মন্দির বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন।

আদিনার বহি:প্রাচীরের পাদমূলে কতিপয় হিন্দু দেবতার মূর্তি আছে। মূর্তিগুলির অকিঞ্চনতা এবং জড়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া সাধারণ হিন্দুদিগের মূর্তির ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা দূর করিবার জন্যই প্রাচীরের পাদমূলে হীনস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। একটি গণেশ মূর্তি বিশিষ্ট দ্বারের চৌকাঠের উপরের খণ্ড মহিলাদিগের উপরের তলায় উপাসনা মঞ্চে প্রবেশ দ্বারের উপরে লাগান আছে। মূর্তিটি নাক, কান কাটা। রাজ অন্তঃপুরে এবং আমীরদিগের গৃহে ইসলামে নবদীক্ষিতা অনেক হিন্দু মহিলা ছিলেন। কারণ তৎকালে উচ্চশ্রেণির জমিদার ও করদ-রাজগণ সুন্দরী কন্যা বাদশাহ ও আমীরদিগকে উপহার স্বরূপ দান করিতেন। এইরূপে মহামতি সিরাজ উদ্দৌলাকে নিজের ভগ্নী ফৈজীকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বীরপুরুষ ও রাজদিগকে কন্যাদান করা ভারতের অতীব প্রাচীন প্রথা; মহাভারতেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গণেশ হিন্দুদিগের নিত্য নমস্য দেবতা, গণেশ সর্বসিদ্ধিদাতা। অন্য দেবতার আগে গণেশের পূজা করিতে হয়। সুতরাং গণেশের প্রভাব ও গণেশের প্রতি ভক্তি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মনে অপরিসীম। ইসলামে নবদীক্ষিতা হিন্দুবংশজাত মহিলাদিগের মন হইতে গণেশের প্রতি এই অহেতুক ভক্তি ও শ্রদ্ধা দূর করিবার জন্য দরজার উপরে নাক, কান কাঁঠ গণেশমূর্তি রক্ষিত হইয়াছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার! এই মূর্তির যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আদিনা মসজিদকে হিন্দুর মন্দির রূপে প্রমাণ করিবার জন্য অক্ষয় বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ তাজমহলও হিন্দু কারিগরদিগের মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া ঘোষণা ও দাবী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ৩/৪ বৎসর পূর্বে জনৈক হিন্দু লেখক এ বিষয়ে খুব জোরেশোরে 'প্রবাসী' পাত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অবশ্য এ অধম তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আশা করি, 'মোহাম্মদীর' পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। ফলতঃ বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহস্র লেখনী এরূপভাবে রচনা জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহার ফলে মুসলিম-ভারতের আকাশস্পর্শী মিনার, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে।

কোনও কোনও হিন্দু লেখক এইরূপে দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত কুতুব মিনারকেও পৃথ্বিরাজ কন্যার সূর্য দর্শনের স্তম্ভ বলিয়া রটনা করিতে কালি-কলমের ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু উক্ত মিনার যে সুলতান কুতুবউদ্দীন কর্তৃক ভারত-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নির্মিত 'কুওত-অল-ইসলাম' মসজিদের মিনারযুগলের অন্যতম, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছি। উহার সঙ্গে উত্তরদিকস্থ মিনারটি প্রায় একতলা পর্যন্ত গ্রথিত হইয়াছিল। কুতুবউদ্দীন এই মসজিদ ও মিনার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই পরলোকগমন করেন।

আজও উহা সেইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পতিত রহিয়াছে। এইরূপে আরও ভাস্কর্য-গৌরবের বহু মুসলিম-কীর্তিকে হিন্দু লেখকগণ কল্পনাবলে নিতান্ত অন্যায়ভাবে আপনাদের কুক্ষিগত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মুসলমান পক্ষ হইতে কিছু মাত্র বাধা না পাওয়ায় প্রতিবাদ না হওয়ায় তাহাদের দুঃসাহস ও স্পর্ধা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অন্যদিকে 'পার্বত্য মুষিক' শিবাজী এবং রাণা প্রতাপ সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা কংস, রঘু ডাকাত, তাঁতিয়া ভীল, সুরেশ বিশ্বাস এমন কি হারু নাপিত ও রমা কৈবর্তের পর্যন্ত জীবনী বাহির হইতেছে। সেই সমস্ত জীবনীর পাতায় পাতায় হিন্দু গৌরব, হিন্দু বীর্য-শৌর্যের কাহিনি বেশ করিয়া কল্পনার আঁচে ফুটাইয়া তোলা হইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের কাপুরুষতা, অকর্মণ্যতা এবং হীনতার চিত্র যতদূর সম্ভব জাঁকাল করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। ইহার ফলে হিন্দুজাতীয় বালকদের মনে ক্রমশঃ তেজঃ সাহস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে, আর মুসলমান বালকদের মন নীচতা ও হীনতার অবসাদে দমিয়া যাইতেছে।

আমাদের ছেলেদের হাতে দিবার জন্য এ পর্যন্ত কয়খানি মহাপুরুষ-জীবনী আমরা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি? বগুড়ার গৌরব স্তম্ভ, অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী সুলেখক মৌলভী হামিদ আলী মরহুম সাহেব এ বিষয়ে 'মোহসেন চরিত' এবং 'মুসলিম কর্মবীর চরিতমালা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সেই পুস্তক দুইখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিবার লোকও বগুড়ায় নাই। বগুড়ার মুসলমানেরা সেই মহাপ্রাণ পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার পর্যন্ত চেষ্টা করেন নাই। এমন সমাজ যদি দিন দিন 'গোল্লায়' না যায়, তবে আর কে যাইবে?

হিন্দুরা শিবাজীর ন্যায় দস্যুপতি মারাঠির সম্বন্ধে গণ্ডায় গণ্ডায় বহি লিখিয়া এবং চিত্র বাহির করিয়া হিন্দু বালকদিগের প্রাণে বীরত্ব ও সাহস সঞ্চারের জন্য কি বিপুল চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! এই বাঙ্গালাদেশে কত মুসলমান বীরের জন্ম হইয়াছিল, মুসলমান সমাজ তাহার সংবাদও রাখেন না।

উত্তরবঙ্গ বিজয়ী মহাবীর গাজী ইসমাইল, ত্রিপুরা বিজয়ী শমশের গাজী, নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জ বিজয়ী কালুগাজী, হুগলী-পাণ্ডুয়া বিজয়ী শাহ সুলতান, শাহজাদপুর ও পাবনা বিজয়ী শাহ মখদুম ইয়েমেনী, বগুড়া বিজয়ী শাহ সুলতান মাহী সওয়ার, শ্রীহট্ট বিজয়ী শাহ জালাল, ত্রিহুত বিজয়ী নছরত শাহ, কামরূপ বিজয়ী হোসেন শাহ, চট্টগ্রাম বিজয়ী গাজী ইসলাম খাঁ ও পরাগল খাঁ, কামরূপ বিজয়ী হোসেন শাহ, আসাম বিজয়ী মীরজুমলা, বিক্রমপুর তথা সমতট বিজয়ী বাবা আদম প্রভৃতি বীরপুরুষ, গাজী, দরবেশ ও শহীদ দিগের কয়খানি জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে? আমাদের সন্তানদের মধ্যে কয়জনই বা এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদিগের নাম ও কীর্তিকলাপ অবগত আছে? আর আমরাই বা কয়জন স্বজাতি ও স্বদেশের ইতিবৃত্ত লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি? আমরা যদি বাঙ্গালার অতীত গৌরবের কাহিনি এবং স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় কর্মী ও বীরপুরুষদিগের জীবনের গৌরবজনক ঘটনার গল্প ও আলোচনা করিতাম, তাহা হইলে আজ এই ভীষণ আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও জাতীয় জীবনের ভাবি কল্যাণ ও মঙ্গলের সহস্র বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিতে পাইতাম।

প্রাতঃস্মরণীয় কাজী সিরাজউদ্দীনের ন্যায় এমন নির্ভীক এবং কঠোর ন্যায়বিচারক যে বাঙ্গালার বিচারকদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আজ সেই বাঙ্গালার মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলি কথায় কথায় সেই কাজীর বিচারকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না! আর সর্বাপেক্ষা গভীর দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই উপহাস ও বিদ্রূপের বাক্যবাণে আমাদের মর্মের আত্মগৌরবের ভাবটি কিছুমাত্র বিদ্ধ হয় না। আর সুলতান গিয়াসউদ্দিনের ন্যায় এমন ন্যায়পরায়ণ নরপতিই বা পৃথিবীতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? পৃথিবীর আর কোনও দেশে শায়েস্তা খাঁর ন্যায় শাসনকর্তা আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? যিনি খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য সম্পাদনের জন্য ভবিষ্যৎ শাসনকর্তাদের কর্তব্যবোধকে উদ্বুদ্ধকরণার্থ এমন তোরণ নির্মাণ করিয়াছেন, প্রায় আড়াইশত বৎসর গত হইতে চলিল, কিন্তু হায়! আজও সে দ্বার কাহারও খুলিবার মুরোদ হইল না। প্রজা হিতৈষণার ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কিছু আছে কি? শায়েস্তা খাঁর এই ক্ষুদ্র তোরণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় কীর্তি হীন ও নগণ্য।

কিন্তু হায়! আমরা সে গৌরব কতটা অনুভব করি? আমরা যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে এই নিরন্ন ও নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে শায়েস্তা খাঁর জন্মোৎসব সম্পন্ন হইত। শায়েস্তা খাঁ যদি হিন্দু হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে আজ তাঁহার পূজা হইত।

ব্যভিচার দোষের জন্য একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিতে যে মহামতি নবাব মোরশেদ কুলি খাঁ কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না, তাহার এই পুণ্য-কথা আমরা কয়জন মনে করিয়া থাকি? মহাবীর আলীবর্দী খাঁ যেরূপ অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্জয় বিক্রমে, অক্লান্ত পরিশ্রমে বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ, বিপুল মহারাষ্ট্র দস্যুদিগের করাল কবল হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহা লইয়া আমরা কতটুকু আলোচনা করিয়া থাকি? পাষণ্ড রাজা কংসের অত্যাচার হইতে স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, যে মহাতপাঃ দরবেশ শেখ নূর কুতুবুল আলম নিজ পুত্রকেও আধ্যাত্মিকভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, সে আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের কথা আমরা কখনও আলোচনা করি কি? বাঙ্গালার যে দ্বাদশ ভৌমিকের স্বাধীনতা ও প্রতাপের কথায় বাঙ্গালার ইতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দ্বাদশ ভৌমিক বা বার ভুঞার মধ্যে তিনজন মাত্র হিন্দু এবং নয়জন মুসলমান ছিলেন। হিন্দুরা তাহাদের এই তিন ভৌমিকের সম্বন্ধে কতই না কবিতা, গাথা, জীবনী, উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছেন, আর ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে। কিন্তু হায়! আমাদের নয়জন মুসলমান ভুঞার স্বাধীনতা ও অদ্ভুত কীর্তিকলাপের বিষয় আমাদের সন্তানদিগকে অবগত করাইবার জন্য, একটি অক্ষরও রচিত হইয়াছে কি?

বাঙ্গালী মুসলমানের অতীত গৌরবের কথা কত বলিব? বার ভুঞার দলপতি ঈসা খাঁ মসনদ আলী প্রবলপ্রতাপ সেনাপতি মানসিংহের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধের সময় মানসিংহের তরবারী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় মানসিংহ প্রাণভয়ে আকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু মহাবীর ঈসা খাঁ স্বকীয় অলোকসামান্য মহানুভবতা প্রভাবে নিজের উৎকৃষ্ট তরবারী মানসিংহকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অসামান্য মহানুভবতার দৃষ্টান্ত আর কয়টি আছে? হায়! পৃথিবীর কোন বিজয়ী জাতি, বিজিত ও বিধর্মীকে এত অধিক জায়গীর, জমিদারী ও উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন? বিজিত হিন্দুর চৌধুরী, মুস্তফী, বখশী, মজুমদার, রায়, খাঁ, সরকার, খাস্তগীর, মহলানবিস প্রভৃতি অসংখ্য গৌরবসূচক উপাধিতে মুসলমানের বদান্যতার ও উদারতার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই কি প্রদর্শিত হইতেছে না? হায়! তথাপি তাহারা হিন্দুভায়াদের কর্তৃক অত্যাচারী, অবিচারী, ম্লেচ্ছ ও যবন বলিয়া অভিহিত! ইহা তাঁহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ ও কৃতঘ্নতা নহে কি?

হায় অধঃপতন! তুমি কি এমন করিয়াই আত্মবিস্মৃত জাতির অতীত গৌরবের আলোকচ্ছটাকেও কালিমাময় ও কলঙ্কিত করিয়া তোল? হায় আত্মবিস্মৃতি! তুমি কেমন করিয়া সিংহকে শৃগাল, বীরপুরুষকে ভীরু, মহিমান্বিতকে কলঙ্কিত, তেজদৃপ্তকে মলিন, অগ্নিকে ভস্ম, সমুদ্রকে গোস্পদ এবং পর্বতকে বল্মীকস্তূপে পরিণত কর, বাঙ্গালার মুসলমানই তাহার চরম দৃষ্টান্ত। যে বাঙ্গালার ঢাকা, সপ্তগ্রাম, গৌড়, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, দেবকোট (ঘোড়াঘাট), মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, সোনার গাঁ প্রভৃতি বিপুল কীর্তিশালিনী মহানগরীসমূহের অসংখ্য মসজিদ, মিনার, প্রাসাদ, দুর্গ, বিদ্যালয়, পান্থশালা এবং দীঘি-পুষ্করিণী মুসলিম গৌরবের অনন্ত কাহিনি আজিও ঘোষণা করিতেছে হায়! সে দেশের বিরাট সমাজদেহের ভিতরে একটি আত্মাও কি জাতীয়তার মহিমাময়ী স্মৃতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতেছে? হায় বাঙ্গালা! হায় মুসলমান! তোমার গাঁথা গাহিবার জন্য একটি হৃদয়তন্ত্রীও কি বাজিয়া উঠিবে না?

মুসলমান যদিও দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে, তথাপি 'আগে ঘরের কথা, পরে পরের কথা' এই নীতি অনুসারে প্রথমে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মহাজনদিগের জীবনকাহিনি এবং কীর্তিকলাপের গৌরবগাথার পুলকপ্রদ স্পর্শে ভাবী আশার স্থল সন্তানদিগের কোমল হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে। অতীত গৌরব ও মহত্ত্বের স্মৃতিরূপ শরণির সাহায্যেই ভবিষ্যৎ আলোকরাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতে হইবে।

আজকাল হিন্দু লেখকদিগের চেষ্টায় বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জেলার ইতিহাস বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। যেগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা সমস্তই পাঠ করিয়াছি। তাহাতে মুসলমানের কথা যতটা থাকা উচিত ছিল, তাহার কিছুই নাই, আর থাকিতেও পারে না। বিজিত জাতি বিজয়ী জাতির ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা কখনও প্রাণ খুলিয়া লিখিতে পারে না। তাহাতে যে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে। বিশেষতঃ শৃগালের হস্তে সিংহের চিত্র অঙ্কিত করিতে দিলে সে সিংহ শৃগালের তুলিকায়ই চিত্রিত হইবে। এ জন্য বঙ্গীয় মুসলমানদিগের একটি সাহিত্য সভা ও কতিপয় উপযুক্ত লাইব্রেরী বা কুতুবখানা গঠিত হওয়া আবশ্যক। আর সেই সাহিত্য-সভা হইতে একটি ঐতিহাসিক মন্ডলী নির্বাচন করিয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গদেশের মুসলমানদের বহুখণ্ড বিশিষ্ট একখানি বিরাট ইতিহাস লিখিত হইবে। প্রত্যেক জেলা, পরগণা, মহকুমা ও প্রাচীন পল্লী হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই মালমশলার সহিত 'সিয়ের-উল-মুতআখখেরিন', 'রিয়াজ উছ-ছালাতিন', 'ফেরেস্তা', 'আইন-ই-আকবরী', 'খোরশেদ-ই-জাহানামা', 'তাবাকাত-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', 'তবকাতে নাসিরী' এবং 'তারিখে-বাঙ্গালা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইষ্টকাদি পাইয়া বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক বিরাট ও মনোহর ইতিহাসের তাজমহল গড়িতে হইবে। সেই ইতিহাসের তাজমহলই বঙ্গীয় মুসলমান সন্তানদের মনে আত্মগৌরব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব প্রাণের ভিতরে জাগাইয়া তুলিবে।

নিজের সুবৃহৎ প্রাসাদ ও উদ্যানের খবর নিজে না লইলে, নিজে না দেখিলে, অন্যের দ্বারা কখনও সম্যক পর্যবেক্ষিত হইতে পারে না। তেমনি নিজের ইতিহাস অন্যের হাতে সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে কখনও গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই কি হিন্দু, কি ইংরাজ, সকলের লিখিত ইতিহাসেই রাশি রাশি ভুল দৃষ্ট হয়। সমস্ত ভুল দেখাইতে হইলে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। আমরা একটি গুরুতর ও অতি প্রকাণ্ড ভুলের দৃষ্টান্ত মাত্র এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিতেছি। ভারতের যাবতীয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইতিহাসে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্রাটগণকে পাঠান ও মোগল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভারতের সম্রাটগণ কেহই পাঠান ছিলেন না। সকলেই মোগল। ভারতের প্রথম সম্রাট কুতুব উদ্দিন আইবেক তুর্কী ছিলেন। এইরূপ বিখ্যাত গজনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীনও তুর্কী ছিলেন। লোদী, খিলজী ও শূর উপাধিধারী ভারতীয় বাদশাহগণও মূলতঃ তুর্কী অর্থাৎ মোগল ছিলেন। আলপ্তগীনের সময় হইতে দলে দলে তুর্কী আসিয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করিতে থাকে। আফগানিস্তানের মূল অধিবাসীদিগের যথার্থ উপাধি আফগান। তুর্কী অধিবাসীরও উপাধি খান, বেগ; তুর্কীগণ প্রধানত: দুই শাখায় বিভক্ত - সেলজুক ও চাগতাই।

সেলজুকদিগের উপাধি সাধারণতঃ বেগ। আর চাগাতাই দিগের উপাধিও খান। আফগানিস্তনের আদিম অধিবাসী আফগানগণ ইহুদী বা ইস্রায়েল বংশীয়। আসিরিয়ার পরাক্রান্ত রাজা নেবুকাদনাজার (বখত নাছার) জেরুজালেম দখল করিয়া ৭০ হাজার ইহুদীকে আফগানিস্তানে নির্ব্বাসিত এবং বলপূর্বক তাহাদিগকে জরথুস্তের ধর্মে অর্থাৎ অগ্নিপূজায় দীক্ষিত করেন। ইহারাই হইতেছে যথার্থ পাঠান। ফারসী 'আফগান' শব্দ পশতু ভাষায় 'পাঠান' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই পাঠানদিগের আকৃতি গঠন আজও ইহুদিদিগের সহিত অভিন্ন।

আর যাহাদিগকে মোগল বলা হয়, তাহারা 'চাগতাই' বংশজ বিশুদ্ধ তুর্কী। বর্তমান ওসমানলী তুর্কীরাও (Ottoman Turks) এই 'চাগতাই' বংশজ। তুর্কীদিগের আদিম বাসস্থান তুর্কীস্তান। তথা হইতে দিগ্‌বিজয় ও রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ভারত, আফগানিস্তান, পারস্য ও তুরস্কে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তুর্কীভাষায় ইহাদিগের খাস নাম 'তুরুক'। আর ইহাদিগের কথিত ভাষার নাম 'তুরুকচা'। ইহাদের প্রাচীন ভাষার নামও ইহাদের নাম অনুসারে 'চাখতাই' ছিল। তাহার অক্ষরও ভিন্ন ছিল। বর্তমানে ইহা আরবীয় অক্ষরে লিখিত হয়। তুর্কীরা ককেশিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের গঠন সুন্দর, সুশ্রী ও বলিষ্ঠ; নাসিকা উন্নত। তুর্কীরা শ্মশ্রুবহুল এবং রক্তাভ শ্বেতবর্ণ; চক্ষু দীর্ঘাকৃতি ও বিস্ফারিত। প্রাচীন পারস্য সাহিত্যে এবং শাহনামায় ইহারা 'তুরাণী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারত এবং রঘুবংশেও ইহারা 'তুরানী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

ইহারা দীর্ঘকাল হইতেই সভ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন পারস্যের সহিত প্রাচীন তুরান বহু শতাব্দী পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ছিল। আসল কথা, ভারতীয় মুসলিম সম্রাটগণ সকলেই তুর্কী অর্থাৎ মোগল। পাঠান কেহই নহেন। অথচ তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ খামাখা তাঁহাদের এক দলকে পাঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথচ এই বিষম ভুল শিশুকাল হইতেই আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা শিখিয়া আসিতেছে। এই জন্যই আবার বলিতেছি, আমাদের নিজের ঘরের খবর নিজে না লইলে কিছুতেই কল্যাণ নাই।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মুসলমানদিগকে তাহাদের জাতীয় ইতিহাস আলোচনার দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। প্রতিবেশি হিন্দুজাতির প্রতি আক্রমণ করা লেখকের আদৌ অভিপ্রেত নহে। যখন হিন্দু-মুসলমানের একতা-সম্প্রীতির কথা উভয় জাতির গড়া সমাজে নিতান্তই আপত্তিজনক বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল: প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগে হিন্দুদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী মুসলমানদিগকে গোঁড়া মুসলমানগণ কাফের ও হিন্দুর ফেনচাটা উপাধিতে ভূষিত করিতেন - অধম লেখক ও 'ছোলতানে'র অন্যতম পরিচালক বন্ধুবর মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব আমরা সে যুগ হইতে হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্প্রীতির পরম ভক্ত ও অনুরক্ত এবং বাঙ্গালার বিশাল মুসলমান জনসমাজের মতের বিরুদ্ধে আমরা স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূলে এবং রাজনীতিক আন্দোলনে ও কংগ্রেসক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার নীতি বরাবরই সমর্থন ও কার্যতঃ আমল করিয়া আসিতেছি।

হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ হিংসাবিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, আমরা ইহা আদৌ অনুমোদন করি না। তবে ইহাও সত্য যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে কেবল মৌখিক সখ্যতার পক্ষপাতী নহি। অনেক লোক আছেন মনে গরল, মুখে মধু এই নীতির অনুসরণে সভা-সমিতিতে ও খবরের কাগজে গলাবাজী এবং লেখনী সঞ্চালন-কালীন একতার দোহাই দিয়া থাকেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমস্ত বিপরীত কাজ করেন। কিন্তু আমরা ঐ রূপ কৃত্রিম বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সমর্থন করি না। উভয় জাতির অন্তর পরিষ্কার করিতে হইলে ভিতরের গরল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। এক জাতির অন্তরে অন্য জাতির পক্ষে যে সকল আঘাত লাগিয়াছে সে সকল ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলনের বিশেষ অন্তরায়ের মধ্যে হিন্দু রচিত মুসলমান-বিদ্বেষপূর্ণ ইতিহাস ও নভেল-নাটক অন্যতম। হিন্দু লেখকগণের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া তাহাদের মুসলিম বিদ্বেষজনিত দোষের অংশগুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া না দিলে সে সকল সংশোধিত হওয়ার কোন উপায় নাই। মুখে সে সকল ধামাচাপা দিয়া রাখিলে চলিবে না।

শরীরের বাগী-ফোঁড়া অস্ত্রাঘাতে কাটিয়া চিড়িয়া তাহার ভিতরের দূষিত রক্তপুঁজ বহির্গত করিয়া ফেলিতে না পারিলে দেহ সুস্থ হইবে না। এরূপে আলোচনা সমালোচনার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাতে হিন্দু রচিত মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ এবং মুসলিম রচিত হিন্দু বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তকাদির আপত্তিজনক অংশগুলি সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তবেই সেই খাঁটি একতা ও সম্প্রীতিজনিত বন্ধুত্বের ভিত্তির উপর স্বরাজ-প্রাসাদ নির্মিত হইতে পারিবে। এই প্রবন্ধে স্থানে স্থানে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু লেখকগণের প্রতি যে কর্কশ ভাষা ও বিশেষণ প্রয়োজিত হইয়াছে, তজ্জন্য লেখক দুঃখিত। কিন্তু উপায়ন্তর ছিল না। সংশোধনের আশাতেই এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। আশা করি, একতাপ্রিয় হিন্দুভ্রাতৃগণ লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।"[১১৬]

---

১১৬. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী/সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা : ৪ই মাঘ, ১৩৩০ (১৬ জানুয়ারি ১৯২৪ইং) তথ্যসূত্র : প্রবন্ধ সমগ্র/সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (সম্পা : হোসেন মাহমুদ)। [জ্ঞান বিতরণী - ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ২৫৪-২৭১]

তিন

ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানদের কর্তব্য

"...দূর আকাশের কোণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত শান্ত-স্নিগ্ধ ভারত-গগনে প্রলয়-ঝঞ্ঝার সঞ্চার হইতেছে। আশ্চর্য ব্যাপার! মুসলিম-বাঙ্গালা আজও এই ভীষণ প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার দিকে দৃকপাত করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

পাঞ্জাবের আর্য সমাজের অশুদ্ধি-আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজেও এক মহা-সংগঠন ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে উহার প্রভাব মুসলিম-বঙ্গে হিন্দুদিগের মধ্যেও চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কংগ্রেস কনফারেন্স ছাড়িয়া নূতন করিয়া হিন্দু মহাসভার পত্তন করিতেছেন। মালব্যজী ইতিমধ্যেই উত্তর পশ্চিম দেশের হিন্দুকুস্তি ও লাঠি খেলার মহা ধুম লাগাইয়া দিয়াছেন। এবার এলাহাবাদ, পানিপথ ও বেরিলী প্রভৃতি স্থানে গো-কোরবাণী উপলক্ষে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুরাই সর্বত্র আক্রমণকারী, মুসলমানেরাই খুন-জখম বেশি হইয়াছে; আজমীরের মত হিন্দু-মুসলমানের সম্মানিত তীর্থস্থানেও এবার হিন্দু ভ্রাতারা মসজিদ ও দর্গার সম্মুখে বাজনা বাজাইতে সাহসী হইয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপার মহাঝটিকার পূর্ব লক্ষণ মাত্র।

মহাসভার উদ্দেশ্যই হইতেছে মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুদিগের শারীরিক বল বিধান করা এবং হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্রভাবে ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। যাহারা এতদিন হিন্দু-মুসলমানের একতা বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, তাহাদের অনেকের মুখে এখন শুধু যাবতীয় হিন্দুদিগকে ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথাই শুনা যাইতেছে। হিন্দুদিগের পরিচালিত হিন্দী, উর্দু এমন কি বাঙ্গালা 'আনন্দ বাজার', 'বসুমতী', ইংরাজি 'অমৃত বাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা যদিও সাবধানতা এবং চালাকির সঙ্গে লেখা হইতেছে, তবুও তাহার অনেক স্থলেই মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে। ভারতবর্ষে মুসলমান অভ্যুদয় চূর্ণ করিবার জন্যই যে এই ভীষণ আন্দোলনের সূত্রপাত করা হইয়াছে তাহা খুলিয়া না বলিলেও নানা ভাবে ও ছন্দে-গন্ধে উহা তীব্রভাবেই প্রকাশ পাইতেছে।

এতদিন ধরিয়া ভারতীয় হিন্দু-সাহিত্যের ভিতর দিয়া হিন্দুদিগকে একটি জাতীয় মহাভাবে মাতাইয়া তোলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুর একজাতিত্ব বোধ কিছুতেই তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; কিন্তু মহাবীর গাজী মোস্তফা কামাল পাশার অসাধারণ বিজয় লাভ, বাড়ির নিকট আফগানিস্তানের মহা জাগরণ, তুর্কী, আফগান, ইরান, আজারবাইজান ও বোখারার সম্মিলন, ভারতীয় মুসলমানদিগের কর্ম প্রবণতা ও নবজীবনের খর চাঞ্চল্য দর্শনে হিন্দু ভ্রাতাদিগের মধ্যে এক মহাচাঞ্চল্য ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। পাছে ভারতীয় মুসলমানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আফগান ও তুর্কী যোগ দিয়া ভারতে মুসলমান রাজত্ব ও মুসলিম-প্রভুত্ব স্থাপন করে, পাছে মুসলিম-প্রাধান্যের ফলে হিন্দু লুপ্ত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় এক দল হিন্দু প্রকাশ্যেই এবং আর এক দল অপ্রকাশ্যেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা স্থির হইতে পারিতেছেন না।

সত্য কথা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি যে, ভারতের মুসলিম রাজত্বের অধিকাংশ হিন্দু ভারতের পূর্ণ-স্বরাজের বিরোধী। আসল কথা হিন্দুরা অধিকাংশই মুসলমানদিগকে হিন্দু জাতি তথা ভারতের শনি বলিয়া মনে করেন। এই জন্য ভারতের যে সমস্ত জাতীয় বা গৌরব-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাতে অতীব সাবধানে মুসলমানদিগকে খাস করিয়া মুসলমান গৌরবকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কবি হেমচন্দ্র তাহার বীরবাহু কাব্যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'আনন্দ মঠে', এবং রঙ্গলাল তাহার 'পদ্মিনীতে' মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার বা নির্মূল করিয়া দিবার যে উদ্বোধন ও উত্তেজনা হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা পত্র সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, থিয়েটারে শতধারে এমনি ব্যাপক করিয়া, গভীর করিয়া, তুমুল করিয়া হিন্দু-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করান হইয়াছে যে, তাহার আদর্শ অনুকরণে ও অনুসরণে হিন্দু-সাহিত্যে মুসলমান-হিংসার বান ডাকিয়াছে।

কথায় বলে 'আসল অপেক্ষা কলমের গাছ শীঘ্র ফলে' ইহা খুবই সত্য। বাঙ্গলা ভাষার ভিতর দিয়াই বাঙ্গালায় সর্বপ্রথমে মুসলিম-হিংসার সূত্রপাত হয়। কিন্তু হিন্দী-সাহিত্যে উহার জোয়ার বহিতেছে। হিন্দী ভাষায় দশ আনা আলফাজ বা শব্দই হইতেছে আরবী, ফারসী বা তুর্কী। ফলতঃ হিন্দী ও উর্দু ভাষা কেবল লেখার অক্ষরেই বিভিন্ন ছিল। হিন্দী সংস্কৃতমূলক অক্ষরে, আর উর্দু আরবীমূলক অক্ষরে লেখা হইত। কিন্তু কিন্তু স্বরাজ আন্দোলনের পর হইতে হিন্দীভাষা হইতে অতি সাবধানে আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দ সমূলে বিতাড়িত করিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিতাড়নের ফলে নূতন হিন্দী সাধারণের নিকট নিতান্ত দুর্বোধ্য হইলেও লেখক ও সম্পাদকগণ জোর করিয়া তাহাই চালাইতেছেন এবং সাধারণের অসুবিধা হইলেও তাহারা তাহা সমর্থন করিতেছেন না। হিন্দী ভাষা হইতে মুসলমানী শব্দ নির্বাসন করিবার প্রবৃত্তি যেমন তীব্র, নানা প্রমাণসহকারে এবং জেলখানায় জাতীয় দলের (National Party) সঙ্গে অবস্থান সময়ে নানাসূত্রে অবগত যে একদল হিন্দুও তেমনি হিন্দুস্থান হইতে মুসলমানগণকে নির্মূল করিবার কাল্পনিক চেষ্টায় সদা উৎকণ্ঠিত। 'মুসলমান থাকিতে ভারতের কল্যাণ নাই' এমন কথাও অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুর মুখে শুনিয়াছি। এখানে একটি রহস্যের প্রকটন করিতেছি।

ঢাকার 'অনুশীলন-সমিতির' নাম অনেকেই অবগত আছেন। বাবু পুলিন চন্দ্র দাসের নাম এই সমিতির জন্যই রটিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালার বোমা-বিভ্রাটের বহু পূর্ব হইতেই ব্যায়াম-চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন, লাঠি খেলায় এবং অস্ত্র চালনায় ইহাদের বেশ খ্যাতি ছিল। আমি যখন প্রথম ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বক্তৃতা করিতে যাই, তখন এই অনুশীলন সমিতির কথা বিশেষ করিয়া জানিতে পারি। অনুসন্ধানে জানিলাম এই সমিতির সমস্ত মেম্বরই হিন্দু। মুসলমান একজনও নাই। আমি চিরকালই ব্যায়াম-চর্চার পক্ষে। বাহুবলের উপরে আর কোনও বল নাই, ইহাই ছোটবেলা হইতে আমার হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল। আমি একদিন সভায় চলমান ছাত্রদিগকে ব্যায়াম চর্চার সুবিধার জন্য অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিতে অনুরোধ ও আদেশ করি। আমার উপদেশে দুইটি বলিষ্ঠ পাঠান যুবক মাতিয়া উঠে। তাহারা অনুশীলন সমিতিতে ভর্তি হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই। আমি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। লাঠি-ব্যায়াম চর্চার সমিতিতে মুসলমান যুবক কেন ভর্তি হইতে পারিবে না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা আমাদের নিকট অনেক দিন প্রহেলিকার মত থাকিয়া যায়। পরে ইহার রহস্য উদঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে ঘটনাক্রমে ঐ সমিতির জনৈক সভ্য আমার নিকটে কোনও বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হওয়ায় আমার নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা স্বীকার করে এবং আমি সেই সুযোগে সমিতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের রহস্যের জন্য তাহাকে ধরিয়া বসি। তাহাতে তাহার কাছে জানিতে পারিলাম দরকার হইলে উহার শক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত হইবে, সেই জন্যই মুসলমানকে সভ্য করা একেবারেই নিষিদ্ধ। বঙ্গ-বিভাগের সময় কলিকাতা ও ঢাকায় কৃত্রিম-যুদ্ধ (mock-fight) শিক্ষার সময়েও মুসলমানকে দলে লওয়া হইয়াছিল না।

আসল কথা এই যে, মদন মোহন মালবীয়ার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানকে জব্দ করা বা নির্মূল করা, নতুবা 'হিন্দু-সংগঠনে' অস্ত্র-চর্চা ও বল বিন্যাসের কোনও আবশ্যকতা নাই। আর যদি ভারতীয় জনসাধারণের শারীরিক বল বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মুসলমানকে বাদ দিবার কারণ কি? বরং বীরজাতি মুসলমানকে শৌর্যে মাতাইয়া তোলাই ছিল আবশ্যক। ফলতঃ হিন্দু সংগঠনের সমস্ত কাণ্ডকারখানা এবং হাবভাব দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে যে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :

১. লাঠির জোরে গো-হত্যা বন্ধ করা।
২. মুসলমানদিগকে নানা কায়দা, অসুবিধা ও নির্যাতনে ফেলিয়া হিন্দু করা বা নির্জীব করা।
৩. স্বরাজ লাভ করিলেও মুসলমানদিগকে পদানত করিয়া রাখা।
৪. আফগান, তুর্কী যাহাতে ভারতবর্ষে আসিয়া ইসলাম প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারে, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া।

৫. মুসলমানদিগের সহিত কালে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কুমারিল ভট্টের সময়ে যেমন সাত কোটি বৌদ্ধকে মারিয়া, পোড়াইয়া এবং তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে নির্মূল করা হইয়াছিল তাহার পুনরাভিনয় করা। হিন্দুদিগের দ্বারা যে এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে, তাহা যাহারা আরা-শাহাবাদের ঘটনা ও কাটারপুরের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড অবগত আছেন, তাহারা সহজেই বিশ্বাস করিবেন।

৬. কেহ কেহ বলিতে পারেন যে: হিন্দুরা কি এতই প্রবল হইবে যে, মুসলমানদিগের উপর ভবিষ্যতে অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা দলবদ্ধভাবে বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে সর্বত্রই বল প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ এই সমস্ত প্রদেশ ব্যতীত মুসলমানের সংখ্যা সর্বত্রই মুষ্টিমেয়। মুসলমান সংখ্যা কোন কোন স্থানে শতকরা ৬ জন, বিহার ও উড়িষ্যায় মুসলমান সংখ্যা ৯ জন। যুক্তপ্রদেশে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ২৫ জন মাত্র। আরা, শাহবাদ ও কাঁটারপুরে হিন্দুরা যে নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্তমান যুগে বর্বর গ্রীকদিগের দ্বারাই শুধু সম্ভবপর। বাঙ্গালা ব্যতীত হিন্দুদিগের নিম্নশ্রেণির লোকেরা প্রায় সর্বত্রই অসভ্য প্রকৃতির। তাহারা উন্নত ও পরিমার্জিত নহে। তৎপর হিন্দুসমাজের মধ্যে নরবলি, বামাচার, তান্ত্রিকতা ও শবসাধনা প্রভৃতির বিধি থাকায় তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিলে ভীষণতম ও নৃশংসতম অত্যাচার পর্যন্ত খুবই করিতে পারে। বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিবার পর তাহাদের মাথা পর্যন্ত হিন্দু-রমণীরা ঢেঁকিতে কুটিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল। যাহাদের উপাস্য কালিকা-মূর্তি নরমুণ্ডমালা-ধারিণী, তাহাদের রমণীদিগের পক্ষে এরূপ নৃশংস কাণ্ড করা কদাপি অসম্ভব নহে।

এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কি? ইহাই ভারতীয় মুসলমানদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়। বিপদ আসিবার পূর্বে যাহারা সাবধান হয়, তাহারা বিপদগ্রস্ত হয় না। হইলেও সে বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বিপদ যখন ঘাড়ে হুড়মুড় করিয়া চাপিয়া পড়ে, তখন তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব। মুসলমান ভ্রাতারা যাহারা আমার কথায় হাস্য বা উপেক্ষা করিতে চাহেন তাহারা যেন দয়া করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশ, স্পেন-পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ, অস্ট্রাখান ও কাজানের মুসলমানদের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখেন। যাহা এক জায়গায় ঘটিতে পারে তাহা অন্য জায়গায়ও ঘটিতে পারে। সুতরাং দিন থাকিতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

প্রতিকারের উপায়

১. প্রত্যেক মুসলমান বালক-বালিকাকে লাঠিখেলা, অস্ত্রচালনা ও ব্যায়াম চর্চায় বাধ্য করা। এই উদ্দেশ্যে মহররম উৎসবের 'শেরক-বেদআৎ' অংশ বাদ দিয়া তাহার লাকড়ির খেলায় জোর দেওয়া।

২. মুসলমানদিগকে বিশেষভাবে সাইকেল, নৌকা বাইচ দেওয়া, ঘোড়দৌড়, দৌড়াইয়া চলা ও আত্মরক্ষার অন্যান্য কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া।

৩. আফগানিস্তান, তুরস্ক ও পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন দেশ ভ্রমণ পূর্বক স্বাধীন জাতির আচার-ব্যবহার পরিদর্শন পূর্বক তাহাদের আদর্শ দৃষ্টান্তসমূহের অনুকরণ চেষ্টা।

৪. যেখানে মুসলমান সংখ্যা কম সেখানে নানা উপায়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা।

৫. যে সমস্ত ব্যবসা বা শিল্পকর্ম আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই, সে সমস্ত শিক্ষা করা। প্রত্যেক স্থানের মুসলমানেরা যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ করা। বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকস্থলেই স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, ময়রা, গোয়ালা, ছুতার, নাপিত, ধোপা, বারুই, মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর লোক নাই, এজন্য এই সমস্ত শিল্পী ও ব্যবসায় সংগঠন করা।

৬. মুসলমান যাহাতে অ-মুসলমানকে একটা পয়সাও সুদ না দেয়, তাহার জন্য তুমুল আন্দোলন করিতে হইবে। সর্বত্র মুসলমানদের জাতীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করতে হইবে। হিন্দু-সংগঠনের একটি বড়ো উদ্দেশ্য হইতেছে দরিদ্রতা দূর করা। মুসলমানদের দরিদ্রতা হিন্দুদিগের তিনগুণ বেশি। সুতরাং মুসলমানেরা যাহাতে মুসলমানদের নিকট হইতে টাকা কার্জ পায় সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চিম-অঞ্চলে আর্যহিন্দুগণ সুদী কর্জ দিয়াই মালেকানা রাজপুতদিগকে হিন্দু করিবার কায়দা করিয়াছে।

বাঙ্গালাদেশেও বিপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। বাঙ্গালায় বিশেষতঃ মধ্য ও উত্তর-বঙ্গের হিন্দু জাত মুসলমানদিগের মধ্যে এক কারিগর শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মুসলমানদিগের মধ্যেই হিন্দুয়ানী প্রভাব নিতান্ত কম নহে। অনেক স্থলে কাজী কালীর কাছে মুসলমানেরা মানত করিয়া থাকে। লক্ষ্মীপূজার দিনে বহু মুসলমান বাড়িতে মূর্তি ব্যতীত লক্ষ্মীপূজার সমস্ত আয়োজনই হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের হিন্দুয়ানী আচার-ব্যবহার খুবই বেশি। তৎপর নদীয়া, যশোহর এবং পাবনা জেলার নানা স্থানে 'নেড়ার' দল বলিয়া যে সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা কর্তাভজা ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাদের এক দল তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বামাচারী দলভুক্ত। ইহাদের ধর্মমত ও কার্যকলাপ, ইসলামের ঘোর বিরোধী। ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুরা যদি এক্ষণে ইহাদিগকে জাতিতে তুলিয়া লয় এবং ইহাদের সহিত আহার-বিহার ও আদান-প্রদান করে, তবে ইহাদের হিন্দু হইতে একদিনও দেরী লাগিবে না। ইহার মধ্যেই ইহারা কোনও কোনও হিন্দুদিগের হরিসঙ্কীর্তনে পূর্ণভাবে যোগ দিয়াছে। আমাদের 'নায়েবে নবী' আলেম ও প্রচারকগণ এই ভীষণ অধঃপাতেও বেহুশ রহিয়াছেন। তৎপর বহুস্থানে হিন্দুজাত মুসলমানগণ যেরূপভাবে হিন্দুয়ানী সংস্কারের বশীভূত এবং হিন্দু মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত, তাহাতে হিন্দুরা যদি সুদ মাফ দিয়া তাহাদিগকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়, তাহা হইলে অন্ততঃ মধ্য বঙ্গে মহামারী কাণ্ড আরম্ভ হইবে। অর্থের প্রলোভন বিষম প্রলোভন। পাদরীদিগের নিজস্ব সামান্য অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া শত শত হিন্দু ও মুসলমান যখন খৃস্টান হইয়াছে, তখন ঋণ হইতে মুক্তি পাওয়া এবং অন্যান্য অনেক সাহায্যের প্রলোভন পাইলে এবং তাঁহাদের ধারণানুযায়ী হিন্দুর ন্যায় উন্নত ও ভদ্রজাতির সহিত সমশ্রেণিভুক্ত হইবার প্রলোভন পাইলে দলে দলে মুসলমান যে হিন্দু হইয়া যাইবে, এ সত্য গোপন করা কর্তব্য নহে।

মুসলমানদের দরিদ্রতা মুসলমানের সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি যেরূপ ভাবে বিনষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা ভাবিবার লোক আমাদিগের মধ্যে নিতান্ত বিরল। তারপর যাহারা ঢাকা-কলিকাতায় বাস করেন, তাহারা মফস্বলের অবস্থা কিছুই জ্ঞাত নহেন। আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি একবার ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার কোন সভায় বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া যাই। মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ রাজা জগৎ কিশোর আচার্য মহাশয় তাহার নিজের জুড়িগাড়ি আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আমি রেলস্টেশনে নামিয়া সেই গাড়িতে উঠি। মুসলমান সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া আমার যাইবার পথে দুই ধারে জনতা সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্রুতগতির মধ্যেও আমি মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতেছিলাম 'আরে! রাজার গাড়িতে মুসলমান!' এরূপ হইবে না কেন? অতবড় টাউনে কোনও মুসলমানের বেড়াইবার জন্য একখানি গাড়িও নাই। আর একটি ঘটনা বলিতেছি। আমি একবার বঙ্গ বিচ্ছেদের সময়ে টাঙ্গাইল যাই। সন্তোষের রাণী বিন্দুবাসিনীর ম্যানেজার যোগেশ বাবু আমাকে টাঙ্গাইল হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া হাতীতে করিয়া সযত্নে সন্তোষে লইয়া যান। রাজবাড়িতে জামাতাদিগের বসিবার জন্য একটি সজ্জিত ঘর ছিল; আমাকে সেইখানেই বাসা দেওয়া হয়। যোগেশ বাবু নিজে বিশেষভাবে আমার তত্ত্বাবধান করেন। মুসলমানেরা আমাকে দেখিতে আসিয়া এমন বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছিল যে, আমাদের বাড়িতে জায়গীর থাকিয়া সিরাজগঞ্জ মদ্রাসায় কিছুদিন লেখাপড়া শিখিয়া সেখানে যে একটা লোক মুন্সী হইয়াছিল, সে পর্যন্ত আমি হাত বাড়াইলেও ভয় ও বিস্ময়ে মোছাফা করিবার জন্য হাত বাড়াইতে পারিতেছিল না। দুঃখে আমার যারপর নাই মর্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমানদের মূর্খতা ও দরিদ্রতার জন্য, পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের ধনাঢ্যতা, নাগরিকতা ও শিক্ষার প্রাচুর্যের জন্য মুসলমানের মান-ইজ্জত বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থলেই একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে।

দরিদ্রতা ও মূর্খতা মুসলমানদিগকে এতদূর আত্মসম্মানবিহীন করিয়াছে যে, অনেক স্থলে ভদ্রলোক বলিলে কেবল হিন্দুকেই বুঝায়। বিগত ফাল্গুন মাসে একজন এম, এ পাশ ব্রাহ্মণ গভর্নমেন্টের অডিটর, স্টীমারে আমার সম্মুখেই মুসলমানদিগকে 'পাতিনেড়ে' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ এবং আরও নানাপ্রকার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া আমাকে এরূপ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, আমি তাহাকে মারিয়া দরিয়াতে ফেলিয়া দিবার জন্য উপস্থিত মুসলমানদিগকে আদেশ করিতে বাধ্য হই। পরে অন্যান্য হিন্দুরা আসিয়া বিনয় স্বীকার করিলে

আমি তাহাকে ক্ষমা করি। কিছুদিন পূর্বে পাবনা জেলার একজন কোনও মদ্রাসার হেড মৌলভী সাহেব এক হিন্দু-জমিদারের নিকট পত্রসহ উপস্থিত হন। মহাশয় মৌলভী সাহেবের পত্রখানি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন। পাঠান্তে মৌলভী সাহেবের সাক্ষাতেই দুই হাত ধুইয়া ফেলেন। ইহাতেও মৌলভী সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। আমার কাছে সংবাদ আসিলে আমি যখন ইহার প্রতিকারকল্পে কিছু আন্দোলন করিতে চাই, তখন মৌলভী সাহেব জমিদার কর্তৃক আরও অনিষ্টের ভয়ে আমাকে নিরস্ত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এমনকি তাহার পীড়াপীড়ির জন্য কাগজে পর্যন্ত সংবাদ প্রদান করা হয় না। এখানে মুসলমানের নির্জীবতা এবং হিন্দু-ভ্রাতাদিগের মুসলমান-বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষয় চিন্তা করিলে মনের অবস্থা কতদূর বিষন্ন, অথচ রুদ্র হইয়া উঠে, তাহা চিন্তার বিষয়।

অনেক মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, 'অমুক সভায় বা অমুক গানের মজলিসে কত লোক হইয়াছিল?' তাহা হইলে তাহার জবাবে শুনিবেন যে, এত ভদ্রলোক আর এত মুসলমান হইয়াছিল। মুসলমানের এই আত্মসম্মান-বিশ্বাসের আর একটি প্রধানতম কারণ হইতেছে মুসলমান রাজকর্মচারীর অভাব। চাকরি করাকে তুমি আমি যতই জঘণ্য মনে করি না কেন, জনসাধারণের কাছে উহার গৌরব ও প্রভাব অপরিসীম। মফস্বলে সাধারণের নিকট একজন চাকরি করাকে তুমি আমি যতই জঘণ্য মনে করি না কেন, জনসাধারণের কাছে উহার গৌরব ও প্রভাব অপরিসীম। মফস্বলের সাধারণের নিকট একজন দারোগার যে সম্মান ও গৌরব আছে, একজন জমিদার বা আলেমেরও সেই সম্মান নাই। ৩০ টাকা বেতনের একজন স্টেশন মাস্টারের যে প্রভাব বা প্রতিপত্তি, ৩ হাজার টাকা আয়ের জোতদারের সে সম্মান নাই। ফল কথা, আতরাফ শ্রেণীর মুসলমানদিগের আত্মসম্মান যেরূপ হীন এবং পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের প্রতি তাহারা যেরূপ সম্ভ্রমশীল, তাহাতে হিন্দুরা উদারতা ও সাম্যের পরিচয় দিলে, বিশেষত: টাকা খরচ করিলে তাহাদিগের পক্ষে হিন্দু হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

এক্ষণে ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি? বাঙ্গালায় শুদ্ধি আন্দোলন প্রচলনের পূর্বেই ইসলাম প্রচারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা। অন্যদিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে ইসলামের সভ্যতা, নির্মলতা ও সরলতা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে দলে দলে মুসলমান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। তজ্জন্য 'জমিয়তে ওলামা'র ফান্ডে যথেষ্ট অর্থ চাই। প্রচারক গঠন করিবার জন্য মিশন কলেজও চাই। মিশন কলেজ ব্যতীত উপযুক্ত প্রচারক গঠন করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর নহে। আমরা চট্টগ্রামে যে জাতীয় মহাবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহিতেছি, উপযুক্ত মিশনারী বা প্রচারক গঠন করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মুসলমানেরা অনেকে ভাবিতে পারেন যে, ইংরাজ-রাজত্ব থাকিতে হিন্দুদিগের পক্ষে এইরূপ বৃহ্যবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ এবং ভারতবর্ষে এক জাতীয়ত্বের বিধান কিছুতেই বিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা ভুল। খোদার রাজত্ব ব্যতীত আর কাহারও রাজত্ব যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন ইংরাজ-রাজত্ব লোপ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। মুসলমান রাজত্বের মধ্যন্দিন সময়ে বাদশাহকুল আফতাব শাহানশাহ আওরঙ্গজেবের সময়ই শিবাজীর ন্যায় নগণ্য জায়গীরদার পুত্রের নেতৃত্বে মারাঠীদিগের অভ্যুত্থান হয়। কালে এই মারাঠীরা প্রবল প্রতাপশালী হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা ৫০ বৎসর পূর্বে দিল্লীর দরবারে স্থান পাইবার আশাও করিত না তাহারা দিল্লী পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। ভাগ্যে মহাবীর আহমদ শাহ আবদালী দোররাণী আসিয়া পানিপথের ৩য় যুদ্ধে মারাঠাদিগকে চূর্ণ করিয়া দেন, নতুবা সমগ্র ভারতবর্ষ মারাঠীর পদতলে এতদিন চূর্ণিত ও লুণ্ঠিত হইত। ইসলামের যে কি দুর্দশা হইত তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তেগ বাহাদুরের অধিনায়কত্বে মুষ্টিমেয় দুর্বল প্রকৃতি শিখ শক্তি লাভ করিয়া রণজিৎ সিংহের সময়ে মুসলিম-রক্তে পাঞ্জাব প্রদেশ অভিষিক্ত করিয়াছিল। ইংরাজের বলের নিকট রণজিতের বল পরাস্ত না হইলে পাঞ্জাবে আজ মুসলমান থাকিত কি না, কে বলিবে।

আর এবার সমস্ত হিন্দুজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। আসমুদ্রহিমাচল জুড়িয়া ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। ২২/২৩ কোটি হিন্দু যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে এবং নব্য যুবকদিগের মনে সামরিক স্পৃহা ও মুসলিম হিংসা রুদ্রভাবে জগাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মুসলমানের মহাবিপদ অনিবার্য। আফগান কিম্বা তুর্কী পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও ভারতীয় মুসলমানদিগকে বিষম বেগ পাইতে হইবে। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ রূপ দুরাকাঙ্ক্ষার বিকাশ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যাহারা শক্তি মাতোয়ারা জাতির উন্মাদনা ও বিজয়-বাসনার সংবাদ অবগত আছেন, তাহারা কদাপি অসম্ভব মনে করিবেন না। স্পেনীয় মুসলমানেরা এবং তুর্কীদিগের পূর্বপুরুষেরা, স্পেনীয় ও বল্কানী খৃস্টানদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। সেই ধারণার ফলেই ইউরোপের মুসলিম গুলেস্তান স্পেন আজি মুসলমানের মহাসমাধিতে পরিণত হইয়াছে। হাঙ্গেরী ও বল্কান রাজ্যগুলি আজ সম্পূর্ণরূপে তুর্কীশূন্য হইয়াছে।

ভারতের মুসলমানদিগের বড়ই দুঃসময় উপস্থিত। স্বরাজ-সংগ্রামে হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ কিরূপভাবে গঠন করিবেন তাহা ভাবিবার বিষয়। হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষ এতই বেশি হইয়াছে যে - এখন যদি ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য কোনও বিপ্লব উপস্থিত হয়, আর ভারতের স্বাধীনতার সহায়তাকল্পে আফগানিস্তান সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেও বৃটিশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও হিন্দুভ্রাতারা সকলেই সেই মুহূর্তেই ইংরাজের পতাকাতলে সম্মিলিত হইবেন, আমার অনেক হিন্দু বন্ধু মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ ভারতবর্ষ যে তাহার নিজ শক্তি বলে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পরিবে সে আশাও তাঁহারা করেন না। তৎপর ভারতবর্ষ যদি হিন্দু-মুসলমানের সমবেত শক্তিতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করে, তাহা হইলেও উদীয়মান হিন্দু সঙ্ঘের ফলে মুসলমানকে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু মুসলমান সেরূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবার পাত্র নহে। তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ভারতীয় মুসলমানেরা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আত্মরক্ষার জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। ফলতঃ বর্তমান শুদ্ধি-আন্দোলন এবং হিন্দু-সংগঠনের প্রভাবে ভারতের স্ব সাধনার পথ নিতান্ত জটিল, কুটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়া স্বরাজ সাধনায় কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা সকলেরই ধীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভ করা যেমন গৌরবজনক, তেমনি স্বাধীনতা লাভ করিতে যাইয়া স্বজাতির ও ইসলামের সর্বনাশ করা ঘোরতর অগৌরব ও অকল্যাণজনক। দুই দিক রক্ষা করিতে হইলে অতি সাবধানে অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া পদবিক্ষেপ করা আবশ্যক। কঠিন সাধনার আবশ্যক।

হিন্দু-সঙ্ঘ ও অশুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাব যেমন দ্রুতবেগে গড়িয়া উঠিতেছে এবং এই সঙ্ঘ যেমন করিয়া শিখ এবং বৌদ্ধদিগকে পর্যন্ত দলে টানিয়া হিন্দু অভ্যুত্থানের সূচনা করিতেছে, তাহাতে মুসলমানদিগকে এই মুহূর্তেই আত্ম উপায় অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে স্বরাজের পথ কন্টকিত না হয়, মুক্তির পথ আত্মকলহের কন্টকে অবরুদ্ধ হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমি এই অন্ধতমসার মধ্যে মুসলিমের ভাবী বিজয়-সৌভাগ্যের তরুণ অরুণেরই সমুদয় লক্ষণ দেখিতেছি। ভারতের এই হিন্দু সংগঠনের বিক্ষোভ আফগান হইতে তুর্কী পর্যন্ত অনুভূত হইতেছে। এই অনুভূতিই আমাদের চির আশার আলোক। ইউরোপের দানবীয় ও বিশ্বগ্রাসী কবল হইতে ইসলাম যদি আত্মরক্ষা করিয়া আবার বীরদর্পে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় মুসলিমগণও বিপক্ষের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুক্তি ও কল্যাণের পথে নিশ্চয়ই ছুটিতে পারিবে। কিন্তু চাই সাধনা, চাই পুরুষকার এবং চাই অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার। মুষ্টিমেয় মুসলমান যদি ভারত জয় করিয়া দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ ভারতের আট কোটি মুসলমান হিন্দু ও আর্য ষড়যন্ত্র ও কৌশল-কুহেলিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মহাসূর্যের ন্যায় আবার ভারত গগনে স্বরাজের প্রভাব কিরণ নিশ্চয়ই বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে, 'হিম্মত মর্দান, মদদে খোদা'।

বিশেষ কথা– আমার নিজের মত এই যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রভাবেই ভারতের স্বরাজ সাধন করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সঞ্চার করাই হইতেছে আমাদের প্রাণের সুখ ও আনন্দময়ী কামনা। বিগত ৩০ বৎসর কাল হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালার সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য শত শত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছি, এখনও করিতেছি এবং আরও করিব। আমরা হিন্দুদিগকে বাদ দিয়া, নির্যাতন বা লাঞ্ছনা করিয়া ভারতে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করিব, অতএব প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত করব ইহা কখনও কল্পনা করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছি তখনও হিন্দুদিগকে লইয়াই বাদশাহী করিয়াছি। মন্ত্রী, সেনাপতি ও শাসনকর্তার পদে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। ব্রাহ্মণের সম্মান আমাদের রাজত্বে অক্ষুন্ন ছিল। হিন্দু আইনকেও অগ্রাহ্য করি নাই। আমাদের বিচারালয়ে হিন্দুদিগের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিচারের জন্য হিন্দু-আইন ও দায়ভাগের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুপণ্ডিত পর্যন্ত নিযুক্ত থাকিতেন। আমরা ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দিতেও কিছু মাত্র কার্পণ্য করি নাই। এমন কি হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেও কলঙ্ক ও অগৌরব বোধ করি নাই।

ফলতঃ ভারতীয় মুসলমানদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, উহা হিন্দু এবং মুসলমানদিগের সম্মিলিত রাজত্ব ছিল। বাদশাহদের হেরেমের ভিতরে পর্যন্ত হিন্দুরাণীর পূজার সুবিধার জন্য মন্দির গঠন করিয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করি নাই। হিন্দুর ধর্ম রক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের বহু বাদশাহ ও নবাব গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়ী জাতির পক্ষে বিজিত জাতির প্রতি সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সাহচর্যের ইহা অপেক্ষা গৌরবজনক দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। অতীতের ব্যাপার যখন এই, তখন বর্তমানে ভারতীয় মুসলমান যখন সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া গিয়াছেন এবং তাহারা হিন্দুদিগের সহিত বাহুতে বাহু মিলিত করিয়া সমভাবে যখন স্বরাজ সাধনায় দণ্ডায়মান হইতে চাহিতেছেন, তখন তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস স্থাপন করাও যে যারপর নাই অগৌরব ও মহাপাপ জনক ব্যাপার; তাহা কি হিন্দুভ্রাতাদিগের মধ্যে বুঝিবার লোক একজনও নাই? এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ভারতের স্বরাজ সাধনার পক্ষে মহা অকল্যাণ সাধন করিবে। কারণ এক পক্ষের সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ফলে অন্য পক্ষও সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাব প্রবলভাবে বাড়াইয়া তুলিবে।

সুতরাং আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যে সমস্ত হিন্দুভ্রাতা যথার্থভাবে ভারত উদ্ধারের কল্পনা করেন; তাহারা এই অশুদ্ধি আন্দোলন এবং হিন্দু সংগঠন বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করুন। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া এক ধর্ম এবং এক জাতিতে পরিণত হউন, তাহারা অস্পৃশ্যতা দূর করুন, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই; বরং যথেষ্ট আনন্দ এবং অনুরাগ আছে। তজ্জন্য তাঁহাদের ভারত মহামণ্ডল সভাই যথেষ্ট। আর যদি ব্যায়াম চর্চা ও দারিদ্র সমস্যা নিবারণকল্পে এই মহাসভা স্থাপন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া এই সভা গড়িবার কি উদ্দেশ্য? আমরা এই সভার উদ্যোগীদিগের নিকট ইহার স্পষ্ট জবাব চাই।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবর্তিত, অশুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের মর্মপীড়ন ও গুরুতর আপত্তির কারণ এই যে, যে রাজপুতনা, আগ্রা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য; সেই প্রদেশটা মুসলমান শূন্য করিবার জন্য তাহাদের উদ্যম ও জেদ কেন? মুসলমানের প্রতি তাঁহাদের যদি বিন্দুমাত্র প্রীতির ভাব থাকিত; তাহা হইলে মুষ্টিমেয় মুসলমানের বিলোপ সাধন করিবার তাহারা কখনও বদ্ধপরিকর হইতেন না।

আজ আমরা যদি উত্তর বা পূর্ববঙ্গ বা সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মুষ্টিমেয় হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগি, তাহা হইলে হিন্দু ভ্রাতাদের মনের ভাব আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবে, তাহা কি তাহারা কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ভারতে মুসলমানের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানের সংখ্যাও যদি হিন্দু ভ্রাতাদের চোখে অসহ্য হইয়া উঠে এবং তাহাদিগকে হিন্দু করিবার জন্য হিন্দু ভ্রাতারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, তাহা হইলে আমরা যদি আমাদের গৌরব ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ, ব্যূহবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইবার জন্য মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করি এবং ভাবী অনর্থ

এবং ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিহিত উপায়সমূহ অবলম্বনের দিকে হস্ত প্রসারণ করি, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? এই সমস্ত কুটিল ও কঠোর বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য ভারতবর্ষে কি কোন বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ শক্তিশালী হিন্দু নাই? দীর্ঘকালের অধ:পতনের পরে হিন্দু জাতির মধ্যে নবজাগরণের স্ফূরণ হইতেছে, ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ললাটে যখন উষার আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে, মুসলমানদিগের মধ্যেও যখন পৃথিবীব্যাপী নবজীবনের স্পন্দন জাগিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এই নিদারুণ ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদকর আন্দোলন, এই ভীষণ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যকে আরও বিদ্র করিবার উদ্যোগ করা কোন বুদ্ধি ও প্রতিভার লক্ষণ? হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুন যে, মুসলমানদিগকে অবিশ্বাস করিলে এবং তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া দুর্বল করিবার চেষ্টা করিলে, হিন্দুদিগেরও মহা সর্বনাশ সাধিত হইবে। আমরা ভরসা করি অতঃপর বুদ্ধিমান ও ভারত হিতৈষী ভ্রাতৃবর্গ ভারতের সাক্ষাৎ অমঙ্গলরূপী স্বরাজ সাধনার যুগলশনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং স্বামী মালব্যজীর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র ও মহা-আন্দোলনের সূত্রপাত করিবেন।

ইহা যদি না হয় তাহা হইলে আমরাও বাধ্য হইয়া কঠোর আন্দোলন করিতে এবং রাজনৈতিক চক্র চালিতে বাধ্য হইব। আশা করি তেমন কোন কুদিন যেন ভারতবর্ষে কখনও না আসে। আমরা সর্বতোভাবে প্রার্থনা করি যে ভারতের হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া যুগল হস্তে পতাকা বহন করুক। আমরা চাই, ভারত মাতার হিন্দু-মুসলমানের উভয় চরণ মুক্তি শৈলের তুঙ্গশৃঙ্গে ছুটিয়া চলুক। ধর্ম সংঘ ব্যতীত রাজনৈতিক, শারীরিক বলবিধানের বা অর্থনৈতিক সমস্ত সংঘ ও সভা-সমিতি এক হইয়া যাক।"[১১৭]

চার

কায়েদে আজমের দৃষ্টিতে পাকিস্তানে বাংলার কল্যাণ

"...আজ থেকে ২৪ বছর আগের কথা।

১৯৪৬ সনের কোন এক সন্ধ্যায় কোলকাতার হ্যারিংটন স্ট্রীটে জনাব ইস্পাহানীর বাসভবনের সবুজ-ঘেরা উদ্যানে বসে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এক পর্যায়ে আলাপের সূত্র ধরে কোন এক কর্মী তাকে প্রশ্ন করলেন - জনাব, ওরা যে বলে, পাকিস্তান হবে ধনীদের দেশ, গরিবদের সেখানে কোন পাত্তা থাকবে না, কথাটা কি ঠিক?

দূর আকাশের দিকে নজরটা বিছিয়ে দিয়ে কায়েদে আজম সেদিন বলেছিলেন : 'আজ থেকে ৯ বছর আগে, ১৯৩৭ সালে আমি একবার বাংলায় আসি। সেবার বাংলার গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সুযোগে গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের চেহারায়-ছুরতে দেখেছিলাম কেবল নিদারুণ দারিদ্র্যের ছাপ। দেখেছিলাম, হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও নিষ্পেষণের যাঁতাকলে দলিত মথিত হয়ে জীবন সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খোদার দেওয়া জমিনে তারা ফলিয়েছে সোনালী আঁশ আর মাড়োয়ারী ও ইংরেজ বেনিয়ারা তা পানির দামে খরিদ করে চালান দিচ্ছে কোলকাতায়; আর সেই পাটের বিনিময়েই নিজেদের জন্য গড়ে তুলেছে তারা মুনাফার পাহাড়। অথচ, যে মুসলমানরা বছরের পর বছর সে সোনার ফসল ফলিয়ে আসছে, শরীরে তাদের দেখিনি এক টুকরো বস্ত্রের লেশ। সন্তান-সন্ততির মুখে জোটেনি দু'মুঠো অন্ন। অনাহারে-অনশনে জীর্ণ-শীর্ণ, রোগ-পাণ্ডুর মলিন চেহারায় তাদের ছিলনা কোন জীবনের স্বাক্ষর। সেদিন আমার সেই গরিব ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণটা আমার ডুকরে কেঁদে উঠেছে। সেই থেকে কেবলই ভেবেছি, আর ভেবে ভেবেই হয়রান হয়েছি যে, কি করে তাদের এ চেহারা বদলিয়ে মুখে তাদের হাসি ফুটান যায়। মনে মনে শেষে আমি এই সিদ্ধান্তেই এসেছি যে,

---

১১৭. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী/সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা : ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ (৭ই মে ১৯২৩) তথ্যসূত্র : প্রবন্ধ সমগ্র/সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (সম্পা: হোসেন মাহমুদ)। [জ্ঞান বিতরণী - ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ১৯৭-২০৯]

এই এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি আমরা হাতে নিতে না পারি, তা হলে কিছুই আর করা সম্ভব নয়। বৃটিশরা যদি ভারত ছেড়ে চলে যায়, আর এই এলাকা যদি পাকিস্তান না হয় তা হলে হিন্দুরা কোন ক্রমেই আমাদের এমন কোন আইন তৈরী করতে দেবেনা; যার বলে নিষ্ঠুর জমিদার-কুলের হাত থেকে মুসলমানদের আমরা মুক্ত করতে পারব। অতএব, পাকিস্তান আমাদের চাই-ই চাই।'

এই ছিলো জাতির পিতা কায়েদে আজমের দৃষ্টিতে পাকিস্তানে বাংলার কল্যাণ ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশ। কয়েক মাসের মধ্যেই তার সে স্বপ্ন সফল হয়েছিল, আর মুসলমানদের নবার্জিত আবাসভূমি পাকিস্তানের মানচিত্রে আপন শ্যামলিমার স্বাক্ষরে উদ্ভাসিত হয়ে স্থান পেল খন্ডিত বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত বৃহত্তর অংশ - পূর্ববাংলা। লাহোর প্রস্তাবের আবেদন ও কায়েদে আজমের প্রতিশ্রুতির নির্ঘোষ তখনো অনাগত দিনের স্বপ্নসাধের সুরধ্বনির মতো অনুরণিত হচ্ছিল বাংলার অযুত সংগ্রামী মানুষের শ্রুতিপটে।"[১১৮]

---

১১৮. সিরাজুদ্দীন হোসেন (শহীদ বুদ্ধিজীবী/বার্তা সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক)/ইতিহাস কথা কয়। [খোশরোজ কিতাব মহল - আগস্ট, ১৯৭৪। পৃ. ১-২]

তৃতীয় পর্ব

আজাদী আন্দোলনের দলিলপত্র

এক

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ভাষণ

"...স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ভাষণ ও লেখা থেকে উদ্ধৃত :

...১৮৮২ সালে লুধিয়ানার এক ছাত্রসমাবেশে তিনি বলেন :

'মনে রেখো, প্রকৃত অর্থে জাতি না হলে, সে জাতি জাতিই নয়। ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ সকল ব্যক্তি একত্রে মুসলিম জাতি গঠন করে। যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের প্রিয় ধর্মের অনুসরণ ও অনুশীলন করে ততদিন তারা একটি জাতি। মনে রেখো, ইসলামের মধ্যেই তোমাদের বাঁচতে হবে এবং মরতে হবে। ইসলামকে রক্ষা করতে পারলেই আমাদের জাতি জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রিয় সন্তানেরা, কেউ যদি আকাশের তারকা হয়ে যায়, কিন্তু সে আর মুসলমান থাকে না, তাহলে আমাদের কাছে সে কি? সে আমাদের জাতির কোনো সদস্য নয়। তাই ইসলামকে সমুন্নত রেখে উন্নতি সাধন করতে পারলেই তার অর্থ হবে জাতীয় কল্যাণ।'

...১৮৮৩ সালে রাজকীয় আইন পরিষদে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মন্তব্য করেন :

'নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামত ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব। যেসব দেশে এক জাতি ও এক ধর্ম দিয়ে জনগোষ্ঠী গঠিত সেখানে এই পদ্ধতি সন্দেহাতীতভাবে সর্বোত্তম। কিন্তু জনাব, ভারতের মত দেশে যেখানে বিভিন্ন জাতির (race) সমন্বিত কোন প্রকাশ নেই, যেখানে ধর্মভিত্তিক বিভেদ এখনো প্রবল, যেখানে বর্ণগত ভেদাভেদ এখনো বিস্তৃত হচ্ছে, যেখানে জনগণের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক অর্থে শিক্ষা সমান বা আনুপাতিক হারে কোনো উন্নতি ঘটাতে পারছে না, সেখানে আমি নিশ্চিত যে, স্থানীয় পরিষদ ও জেলা পরিষদের বিভিন্ন স্বার্থভোগী মহলের প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু করা হলে তার যে কুফল হবে সেটার প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই দেখা দেবে না, অন্যত্রও হবে। যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভেদ এবং একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণগত বৈষম্য ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্ব লাভ করতে থাকবে এবং জনকল্যাণ ও প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে জনগণকে প্রভাবিত করবে ততদিন পর্যন্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কোন অমঙ্গল সৃষ্টি না করে প্রয়োগ করা যাবে না। বৃহত্তর সম্প্রদায় ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ের স্বার্থ পুরোপুরি উপেক্ষা করবে, আর যে ব্যবস্থা জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য আগের চেয়েও প্রকট করবে এমন একটা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য জনগণ সরকারকেই দায়ি করবে।'

...স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৮৭ সালে এক জোরালো বক্তৃতায় মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন, কারণ হিসেবে তিনি বলেন :

'যখন আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা বা বাঙালি বন্ধুরা কোন আন্দোলন করার ইচ্ছা করেন যা আমাদের ক্ষতি করে এবং আমাদের জাতির অপমান করে, তখন আমরা আর বন্ধুভাবাপন্ন থাকতে পারি না। আমাদের জাতির জন্য ক্ষতিকর হিন্দু ও বাঙালিদের এইসব আক্রমণ থেকে আমাদের জাতিকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে আমাদের কর্তব্য।'

...প্রথমেই 'প্রতিনিধি' শব্দটার প্রতি আমার আপত্তি। আমি আমার বন্ধুকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে আমাদের প্রদেশ ও অযোধ্যা থেকে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা 'প্রতিনিধি' পদবাচ্য হতে পারেন না ...। যেসব মুসলমান ওখানে গিয়েছিলেন তারা দশজন মুসলমানের দ্বারাই নির্বাচিত হন নি। কংগ্রেস সম্মেলনে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেই সেটা জাতীয় কংগ্রেস হয়ে যায় না। কংগ্রেস নামক কোন একটি দল তখনই জাতীয় চরিত্র পরিগ্রহ করতে পারে যখন, যে জাতির প্রতিনিধিত্ব দলটি করে সে জাতির সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ঐ দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অভিন্ন থাকে। আমার সম্মানিত বন্ধু স্বীকার করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের কিছু কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্নধর্মী এবং পরস্পর বিরোধী। তাহলে আমাদের যেসব ভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে সেগুলো অর্জনের জন্য কি আমরা মুসলমানরা আলাদা একটা কংগ্রেস দল গঠন করব? দুই কংগ্রেস দলের পরস্পর বিরোধী ও বৈরিতামূলক লক্ষ্যের কারণে দুটি দল কি পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে - এমনকি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে? আমার বন্ধুরা নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিন্নতা থাকলেও যেখানে এরকম জাতিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিপরীত সেখানে কি একটি জাতীয় কংগ্রেস দল গঠন করা সম্ভব? এটা যথার্থ হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে কোন মুসলমানই - সে একজন মুচিই হোক আর অভিজাতই হোক, এমন কোন অবস্থা মেনে নিতে রাজি হবে না যেখানে মুসলমানদের মর্যাদা এমন স্তরে নেমে যাবে যেখানে তারা অন্য একটি প্রতিবেশি জাতির ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যাবে, যদিও সময় মুসলমানদেরকে একটা নিম্ন অবস্থানে নিয়ে এসেছে এবং এ অবস্থান আরো নিচের দিকে যেতে থাকবে।'

...১৮৯৩ সালে তিনি বলেন :

'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - ইতিহাস ও আজকের দিনের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচিত। তারা বিবেচনা করে না যে, ভারতে বিভিন্ন জাতীয়তাবোধসম্পন্ন জাতি বসবাস করে। তারা ধরে নিয়েছে যে, মারাঠা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, শিখ, বাঙালি, মাদ্রাজি, পেশোয়ারি সবার মত মুসলমানদের সাথেও একইরূপ আচরণ করা যাবে এবং সবাই মিলে এক জাতি। কংগ্রেস মনে করে যে, তারা একই ধর্মের অনুসারী। তারা একই ভাষায় কথা বলে, তাদের জীবনযাপন ও সামাজিক প্রথা পদ্ধতি একই রকম। ইতিহাসের প্রতি তাদের মনোভাবও একই ধরনের এবং একই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ওপর তাদের ভিত্তি।

...কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো সে দেশের জন্য সম্পূর্ণই অনুপযোগী যে দেশে দুইটি পৃথক জাতির বাস। ধরে নেওয়া যাক ইংরেজরা ভারত থেকে চলে গেল ...তাহলে কারা ভারত শাসন করবে? এটা কি সম্ভব যে এরূপ পরিস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমান একই সিংহাসনে বসবে এবং ক্ষমতায় সমান থাকবে? পুরোপুরি নিশ্চিতভাবেই তা হবে না। তখন এটা প্রয়োজন হয়ে পড়বে যে তাদের একদল অন্যদের পদানত করবে এবং নিচে ফেলে দেবে। উভয়েই সমান থাকবে এরকম আশা করার অর্থ হল যা অসম্ভব এবং ধারণার অতীত সেটা লাভ করার ইচ্ছা করা।"[১১৯]

---

[১১৯]. তথ্যসূত্র : পাকিস্তান আন্দোলন : ঐতিহাসিক দলিলপত্র/জি অ্যালানা (অনু : কে এম ফিরোজ খান)। [খান ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ১৭-১৯]

দুই

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক

"...লাহোরের ঐতিহাসিক মুসলিম লীগ অধিবেশন ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়।

এই অধিবেশনের সময় শহীদগঞ্জ মসজিদের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আল্লামা মাশরেকীর খাকসার দল সিকান্দার হায়াত খানের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লাহোরে ভীষণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা স্যার সেকান্দার হায়াত খান ছিলেন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী। সে সময়ে শিখেরা শহীদগঞ্জের মসজিদকে তাদের গুরুদ্বার বলে দাবী করে এবং মার্চ মাসে হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিল যথাক্রমে শিখদের পক্ষে রায় প্রদান করে।

আল্লামা মাশরেকীর খাকছার দলের প্রতিবাদে যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদের প্রাণ দিয়ে শিখদের হাত থেকে মসজিদ রক্ষা করার জন্য মসজিদ ঘিরে রাখতে জমায়েত করতে থাকে। সেকেন্দার সরকার মসজিদ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মসজিদের চতুর্দিকে অবস্থান করতে থাকে। প্রথমে পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার ও লাঠি চার্জ করেও মসজিদ এলাকা থেকে মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে লীগ নেতা সৈন্য বাহিনী তলব করেন। সৈন্য বাহিনী দ্বারা দু'তিন শত মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে সারা শহরে সান্ধ্য আইন ঘোষণা করে। এ ঘটনা ঘটে ২৩শে মার্চের তিন চার দিন পূর্বে।

ফজলুল হক যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রায় চারশত প্রতিনিধির একটি দল লইয়া লাহোর রেলস্টেশন পৌছেন তখন খাকসার বাহিনী 'ফজলুল হক ফিরে যাও' প্রভৃতি ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে বিরূপ অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ফজলুল হক স্বীয় বুদ্ধি বলে ও সহানুভূতি দ্বারা খাকসারদের হৃদয় জয় করেন। তখন তাহারা তাঁহাকে মিয়া আবদুল আজিজের বাড়িতে লইয়া যায়।

অধিবেশনে যোগ দিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে জনতা ফজলুল হককে 'শের-এ-বাঙলা জিন্দাবাদ' ধ্বনি করিয়া স্বাগত জানায়। যখন তিনি মঞ্চস্থলে পৌছেন তখন সভার সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া 'শের-এ-বাঙলা জিন্দাবাদ' ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সময় জিন্নাহ সভাপতির অভিভাষণ দিতেছিলেন। শেরেবাংলা জিন্দাবাদ ধ্বনির দরুন জিন্নাহকে অভিভাষণ বন্ধ করিতে হয় এবং তিনি এই বলিয়া বসিয়া পড়েন যে, 'যখন সিংহ উপস্থিত হয় তখন মেষ-শাবককে পথ হইতে সরিয়া পড়িতে হয়।' জনতা শেরেবাংলার বক্তৃতা শুনিতে চায়। নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখিবার অনুরোধ করিয়া ফজলুল হক তাহাদেরকে শান্ত করেন। ইহার পর জিন্নাহ অসমাপ্ত অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।

...২৩শে মার্চ (১৯৪০) মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় তিনি মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, 'যাহারা বিষয় কমিটিতে প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া একটি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, আমরা ১৯৩৭ সালে মুসলমান ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা প্রায় দুই শতাব্দী পরে আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের লোকদের জন্য কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমরা কোনমতেই আমাদের এই ক্ষমতা ও সুযোগ কোন কাল্পনিক ও অজানা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমরা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকু প্রবর্তিত হইতে বাধা দিয়াছি এবং এইভাবে আমরা সাফল্যের সহিত আমাদের উপর হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দূর করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতেও যদি আমাদের উপর হিন্দু প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হয় তাহাও আমরা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিব।'

ইহার পরে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ফজলুল হক বলেন, 'আমি কয়েক মাস পূর্বে পাটনায় যাহা বলিয়াছিলাম মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে আমার বন্ধুদেরকে আমি পুনর্বার বলিতেছি। আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে এবং কংগ্রেস সরকারগুলিকে জানাইবার জন্য আমি আমার আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। যদিও বাংলাদেশে আমি যুক্ত মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করিতেছি তবু আমি প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙ্গালী। ১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হইয়াছিল; এখন বাংলাদেশের নেতা হিসাবে সেই মুসলিম লীগের মঞ্চ হইতে আমি মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অধিকার পাইয়াছি।'

ফজলুল হক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধি ইহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি প্রকাশ্য অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত এবং পরে ইহা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলিয়া পরিচিত হয়। এই প্রস্তাবের দ্বারা মুসলিম লীগ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে এবং দ্বি-জাতির ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য দাবী জানায়। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয় :-

'...২৭ আগস্ট, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২২ অক্টোবর, ১৯৩৯ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০ তারিখে সাংবিধানিক ইস্যুতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করে সেগুলোর আলোকে গৃহীত সকল পদক্ষেপ অনুমোদন করে আজকের এই অধিবেশন জোর দিয়েই একথা পুনরায় ব্যক্ত করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে ফেডারেশনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে সেটা এদেশের বিশেষ অবস্থার বিচারে সম্পূর্ণ অনুপোযোগী ও অকার্যকর এবং মুসলিম-ভারতের কাছে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।

এই অধিবেশন দৃঢ়তার সাথে একথাও ব্যক্ত করছে যে, ১৮ অক্টোবর মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভাইসরয় মহোদয় যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা আমাদের আশ্বস্ত করছে এ কারণে যে এতে বলা হয়েছে, যে-নীতি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়েছে সেগুলো ভারতের বিভিন্ন দল, সম্প্রদায় ও স্বার্থভোগীদের সাথে আলোচনা করে পুনর্বিবেচনা করা হবে। তবে যদি পুরো সাংবিধানিক পরিকল্পনাটি নূতন করে বিবেচনা না করা হয় তাহলে মুসলিম-ভারত সন্তুষ্ট হবে না এবং মুসলমানদের সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া কোন সংশোধিত পরিকল্পনাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রস্তাব করা হল যে, এটা সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সুবিবেচিত অভিমত যে, এই দেশে কোন পরিকল্পনা কার্যকর হবে না কিংবা মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সেটা নিম্নোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত না হয়। সেগুলো হল- ভৌগোলিক দিক দিয়ে পাশাপাশি ইউনিটগুলোকে চিহ্নিত করে অঞ্চলে পরিণত করতে হবে এবং সীমানা সংক্রান্ত পুনর্বিন্যাস যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু করে এগুলো এমন ভাবে গঠন করতে হবে যাতে যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল - সেগুলো একই দলভুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে পারে যেখানে গঠনকারি প্রতিটি ইউনিট হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

এইসব ইউনিটের সংখ্যালঘুদের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে ঐসব অঞ্চলে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থসমূহ রক্ষিত হয় এবং সেটা করতে হবে তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে। ভারতের অন্যান্য যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাদের জন্য ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থসমূহ রক্ষা করা যায়। সেটা করতে হবে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে।

এই সব মূলনীতি অনুসারে একটি সংবিধান পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কর্তৃত্ব ও এই অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে অর্পণ করছে। এই সংবিধান পরিকল্পনায় এ রকম বিধান থাকবে যাতে প্রতিটি অঞ্চল নিজ নিজ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

প্রস্তাবক :

মাননীয় মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথম সমর্থক :

চৌধুরী খালেকুজ্জামান সাহেব, এম. এল. এ. (ইউপি)।

পরবর্তী সমর্থক বৃন্দ :

মৌলানা জাফর আলী খান সাহেব, এম.এল.এ.(মধ্যপ্রদেশ)।

সরদার আওরঙ্গজেব খান সাহেব, এম.এল.এ. (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)।

হাজী স্যার আবদুল্লা হারুণ এম.এল.এ. (মধ্যপ্রদেশ)।

কে. বি. নওয়াব ইসমাইল খান সাহেব, এম.এল.সি. (বিহার)।

কাজী মোহাম্মদ ইসা খান সাহেব, (বেলুচিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি)।

আবদুল হামমেদ খান সাহেব, এম. এল. এ. (মাদ্রাজ)।

আই. আই. চুন্দ্রিগড় সাহেব, এম.এল.এ. (বোম্বাই)।

সৈয়দ আবদুর রউফ শাহ সাহেব, এম.এল.এ. (সি.পি.)।

ড. মোহাম্মদ আলম, এম-এল-এ (পাঞ্জাব)।

সৈয়দ জাকির আলী সাহেব, (ইউ.পি)।

বেগম সাহেবা মওলানা মোহাম্মদ আলী।

মওলানা আবদুল হামিদ সাহেব কাদেরী (ইউ.পি.)।

...কেহ কেহ মনে করেন যে, সিকান্দর হায়াত খান লাহোর প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। লাহোর প্রস্তাবের কয়েক বৎসর পর সিকান্দর হায়াত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবের খসড়া আমূল সংশোধন করা হইয়াছিল এবং তিনি যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। আবদুল্লাহ হারুন দাবী করিয়াছেন যে, তিনি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিন্নাহকে একটি প্রস্তাবের খসড়া দিয়াছিলেন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া লাহোর প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল। আলীগড়ের জনৈক ছাত্রের নিকট ১৯৪৫ সালের ১৪ই অক্টোবর লিখিত এক পত্রে ফজলুল হক দাবী করিয়াছিলেন যে, তিনি লাহোর প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যে প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং যে প্রস্তাব মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং যে প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান দাবী গড়িয়া উঠিয়াছে সে প্রস্তাবের প্রতি আমার আস্থা আছে।'

লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিয়াছিল। এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের আশা-আকাজ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছিল। সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হক লাহোর অধিবেশনে তাঁহাদের বক্তৃতায় বাঙ্গালী মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবীর প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। প্রস্তাবের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান ও ছাত্র সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়ে। স্বাধীন আবাসভূমি স্থাপনের প্রত্যাশায় তাহাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা অত্যধিক বাড়িয়া যায় এবং ছাত্রেরা ইহার আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিতে জীবনপণ করে।

কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'যদি আমরা শ্রী জিন্নাহর অভিমত গ্রহণ করি, তাহা হইলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা দুইটি স্বতন্ত্র ও পৃথক জাতি হইয়া পড়ে।' ভারত বিভাগ করাকে পাপ বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, লাহোর প্রস্তাব করিয়া মুসলিম লীগ ভারতে ইয়ুরোপের বলকান অঞ্চলের মত বহু রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিয়াছে। কলিকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলি লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে এবং ইহাকে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে আখ্যায়িত করে। হিন্দুগণ মনে করে যে বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু নেতৃবৃন্দ পূর্বে বাঙ্গালী জাতীয়তার প্রবক্তা ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের সহিত বাংলাদেশে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে যখন ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন বর্ণ হিন্দুগণ বাংলাদেশে তাহাদের প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে। তাহারা ভয় করে যে, যদি লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তাহা হইলে এই রাষ্ট্রে মুসলমানদের শাসন স্থায়ী হইবে এবং তাঁহাদের জমিদারী, মহাজনী ইত্যাদি রহিত হইবে। এই জন্য বাংলাদেশের হিন্দু নেতাগণ সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্রে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের পক্ষপাতি হইয়া পড়েন।"১২০

তিন

নিখিল ভারত জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলামের ঐতিহাসিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁ

"...১৯৪৫ সালের ২৬-২৯ অক্টোবর কোলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলামের এক ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে একটি প্যান্ডেল নির্মিত হয়। সম্মেলনের অধিবেশনকালে বাইরের পার্কে ও রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়ে রেডিওযোগে তাদের ওলামায়ে দ্বীনের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বাংলা, আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হতে বহু বিশিষ্ট আলিম, ফাজিল এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এইরূপ সাফল্যমণ্ডিত সম্মেলন এবং বিপুল জনসমাবেশ কোলকাতাবাসিগণ বহুদিন দেখে নি। এ ছাড়া সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলিম মনীষীদের একত্রে সমাবেশ ছিল অভূতপূর্ব।

...১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম সংরক্ষিত আসনগুলির নির্বাচনী প্রচারণায় ভারতের আলেম সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উপর্যুক্ত নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারত বিভক্তি তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্বভারতীয় স্তরে আলেমগণ বিভক্ত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সর্বভারতীয় আলেমদের সংগঠন ছিল জমিয়ত-ই-উলামা-ই-হিন্দ। জমিয়ত-ই-উলামা-ই-হিন্দ এ সংগঠনটি ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য এবং ভারতীয় আলেমদেরকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে অমৃতসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের উলেমাগণ পাকিস্তান দাবির বিপক্ষে এবং অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয় — ইসলামের উম্মা বা সমাজ আন্তর্জাতিক। তাছাড়া তারা আরো মনে করতেন যে, ভারত বিভক্তি হলে মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হবে এবং বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবে।

অন্যদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ও বিভক্ত ভারতের সমর্থক আলেমদের মতে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও মুসলিম জাতি হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারত বিভক্তি ও মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমি

---

১২০. (১) ডক্টর মুহাম্মদ আবদুর রহিম/বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)। [আহমদ পাবলিশিং হাউস - জানুয়ারি, ১৯৭৬। পৃ. ২১৭-২২০] (২) বাঙলার জীবন্ত ইতিহাস : শেরে বাঙলা/সম্পা: আনু মাহমুদ। [এশিয়া পাবলিকেশন্স - ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ২৩৩-২৩৪] (৩) জি আলানা/পাকিস্তান আন্দোলন : ঐতিহাসিক দলিলপত্র (অনু: কে. এম. ফিরোজ খান)। খান ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ১৪৭-১৪৮]

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এ মতের আলেমরা ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা জাফর আহমদ থানবীর সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন আহ্বান করে জমিয়ত-ই-উলামা-ই-হিন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম নামে সর্বভারতীয় স্তরে উলেমাদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন : যথাক্রমে মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী ও মওলানা মোহাম্মদ কোরাইশী শামসী। এ ছাড়া বাংলা থেকে যারা এর সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন : মওলানা আকরম খাঁ, শর্ষিণার পীরজাদা মওলানা আবু মোজাফফর মোহাম্মদ সালেহ, মওলানা রাগিব আহসান, মওলানা কাজী সৈয়দ মোহাম্মদ গোফরান বরকতি, মওলানা এম. এ. হামিদ এবং আল-আমিন পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আবদুজ জাহের। এ সংগঠনের আলেমগণ মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা এবং গণসংগঠন হিসেবে স্বীকার করে। উপর্যুক্ত সংগঠনের উলেমারা আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করার জন্য বাংলার মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানান।

জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম -এর সভাপতি ও দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানি (১৮৮৭-১৯৪৯) ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে আহুত কলকাতার উলেমা সম্মেলনে এক লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, 'এ সময়ে পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য মুসলিম লীগকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা দরকার। কারণ লীগ এ নির্বাচনে পরাজিত হলে সুদীর্ঘ কালের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় মুসলিম লীগকে আসন্ন নির্বাচনে জয়যুক্ত করা সকল মুসলমানদের কর্তব্য।'

যদিও মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানি নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে তার মত প্রকাশ করেন, কিন্তু দেওবন্দ মাদ্রাসার অধিকাংশ আলেম নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে। মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বে অখন্ড ভারত তথা কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনে কাজ করে।

সর্বভারতীয় জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম গঠিত হওয়ার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার আলেমগণ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণার কাজে লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলার সর্বত্র সফর করেন এবং এ সফরগুলোতে আলেমরা লীগের পাকিস্তান দাবি ও নির্বাচনে লীগকে ভোট দেওয়ার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তাছাড়া বঙ্গীয় লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলমান ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার জন্য আলেমদের মাধ্যমে ফতোয়া প্রদান করেন। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ কাজল ওসমানী ভাগপুর (বিহার) থেকে একটি ফতোয়া জারি করে বলেন যে, 'পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দেওয়া জরুরি এবং শরিয়ত মোতাবেক ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) এবং কেবল মাত্র লীগ প্রার্থীকে ভোট দেওয়া একান্ত কর্তব্য।' শর্শিনার পীর মওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ (১৮৭১-১৯৫২) স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে নির্বাচনে লীগকে সমর্থন করে বলেন : 'বিগত ২৮শে অক্টোবর (১৯৪৫) কলিকাতা ওলামায়ে এছলাম কনফারেন্সে আমার খোৎবায়ে ছাদারাতে মোছলেম লীগের প্রতি আমার সমর্থন উহার এছলামের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। বর্তমানেও আমি মোছলেম লীগকে মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইহার লক্ষ্য মুসলমানদের পাকিস্তান লাভের পন্থা হিসাবে স্বীকার করিতেছি। আমি সমগ্র মুসলমান ভ্রাতাকে এই জেহাদে একযোগে কাজ করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।' তাছাড়া, জৈনপুরের পীর মওলানা কারামত আলীর পৌত্র মওলানা আবদুছ ছালাম, ফুরফুরা শরীফের পীর মওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিক প্রমুখ আলেম নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

পাকিস্তানপন্থী আলেমদের সংগঠন জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলামের বঙ্গীয় শাখা আসন্ন নির্বাচনে বঙ্গীয় লীগকে সাহায্য করার জন্য একটি পরামর্শ বোর্ড গঠন করে। এ বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে সঠিক প্রার্থী বাছাই-এর ক্ষেত্রে লীগকে পরামর্শ দান করা। উক্ত পরামর্শ বোর্ড লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যদেরকে অনুরোধ জানান যে, তারা যেন যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন দান করেন,

যা তাদের নির্বাচনে জয়লাভের পথকে সুগম করবে। জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলামের নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগকে সমর্থন করলেও তাদের নিজেদের সংগঠনের কোন প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ করাননি।

...উক্ত ঐতিহাসিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

"...বেরাদরানে মিল্লাত! আজ আপনারা একটি বিপথগামী জমিয়তে ওলামা নিস্তনাবুদ করিয়া তাহার ধ্বংসস্তুপের উপর আর একটি নূতন জমিয়ত গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং আপনারা সাফল্যমন্ডিত হইয়াছেন - ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। নূতন জামানার নূতন এমারত গড়িয়া তোলার দায়িত্ব যখন আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া ঘুণে ধরা পুরাতন জমিয়তকে ধ্বংস করিতে হইবে, কেননা ধ্বংস ব্যতীত নূতন এমারত তয়ার কঠিন ব্যাপার।

আমাদের মিল্লাতের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, আমরা অন্য জাতির সহিত সদ্ব্যবহার করিতে জানি। বিশেষ করিয়া প্রতিবেশির সহিত সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাদের ধর্মে বহু নির্দেশ রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা অন্যান্য জাতির সহির মিশ্রিত হইয়া একেবারে লোপ পাইতে পারি না। আমাদের জাতীয় শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ আমাদিগকে অন্যান্য জাতি হইতে আলাদা করিয়া রাখে। যদি কোন জাতি আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাদের দাসত্ববরন করিতে বলে, তবে তাহা আমরা কিছুতেই বরদাশত করিব না, করিতে পারি না। আমাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদিগকে সর্বপ্রথমে প্রতিবেশির সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু তাহারা যদি আমাদের উপর জুলুম আরম্ভ করিয়া দেয়, অন্যায়ভাবে আমাদিগকে যদি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে, তখনও কি আমাদিগকে কাপুরুষের মত বসিয়া থাকিতে হইবে? কোরআন মজীদের শিক্ষানুযায়ী তখন আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া দাড়াইতে হইবে। জুলুম ও অন্যায় অবিচারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তখন আমাদিগকে জেহাদ করিতে হইবে।

ইংরেজ একদিন এই দেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ চলিয়া যাওয়ার পর কংগ্রেস এই দেশে হিন্দু রাজত্ব কায়েম করিয়া আমাদিগকে দাস জাতে পরিণত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে। তখন এই দেশে এই দুই জাতির মধ্যে অবাঞ্ছিত রক্তারক্তির অনুষ্ঠান হইতে পারে। দেশকে সেই দুর্দিনের হাত হইতে রেহাই দেওয়ার জন্যই মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী করিয়াছেন। এই দাবী ভারতবর্ষের ভবিষ্যতকে সুন্দর ও সুখময় করার জন্যই করা হইয়াছে। দেশের হিতসাধনই রহিয়াছে এই দাবীর মূলে। আমরা পাকিস্তান দাবী করিয়া অন্যায় কি করিলাম? আমরা আমাদের একান্ত কাম্য প্রাপ্যটুকু চাহিয়াছি। আমরা পাকিস্তান চাহিয়া যদি গোটা ভারতবর্ষের দাবী করিতাম, তবেই অন্যায় হইত। কাহারও প্রতি অবিচার করার দুরভিসন্ধি এবং সম্ভাবনা যদি থাকিত, তবেই উহাকে জবরদস্তি বলা চলিত। আমরা একান্ত স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিয়াছি। পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে যাহারা ক্ষেপিয়া উঠিতেছেন, তাহাদের মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? আমার মনে হয়, এই বিরুদ্ধাচরণ দূরভিসন্ধিমূলক এবং উহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই নাই। আপনারা বিশ্বাস করিবেন, দশ কোটি মুসলমান কখনও মরিতে পারে না, মরিবে না। তাহাদের ন্যায্য দাবী কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। আজ মুসলিম জাহানে বিরাট বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এই বিপ্লবের প্রতিফলস্বরূপ মুসলিম জগত নিশ্চয়ই নূতন রূপ ধারণ করিবে। আর সেই ইনকেলাবের ভিতর আমরা ইনশাআল্লাহ পাকিস্তান লাভ করিব।"[১২১]

---

[১২১]. (১) বিশ শতকের বাংলা/সম্পা: মো: মাহবুবুর রহমান। [ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (রা:বি:) - মার্চ, ২০১০। পৃ. ৩৭-৩৯] (২) ড: আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ/বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান। [বাংলা একাডেমী - জুন, ২০০৯। পৃ. ৩৪৯-৩৫০]

চার

১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক দিল্লি সম্মেলন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী

ক.

[১৯৪৬ সাল। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচনী যুদ্ধ শেষ করে সারা ভারতের আইনসভার সদ্য নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশন বসেছে নয়াদিল্লিতে। সভাপতির আসনে স্বয়ং কায়েদে আজম। মুসলিম-ভারতের ভাগ্য কোন পথে নির্ধারিত হবে তার ওপর তুমুল বিতর্কের ঝড় বইছে। কায়েদে আজমের ধমকে অনেকেই অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়েছেন। বাংলার নির্বাচন যুদ্ধজয়ী 'বীর মুজাহিদ' হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উঠলেন মূল প্রস্তাব পেশ করতে। কণ্ঠবিদারী উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়ল সব জনতা। সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা করলেন। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। কেবল মাঝে মধ্যে তুমুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল তার ঘোষণাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে আবার ছুটে চলল দিকে দিকে। দিল্লির সেদিনের সে সম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা জানেন, তুমুল বিতর্কের মাঝে সেদিন সোহরাওয়ার্দীর কণ্ঠই ছিল সর্বোচ্চ।]

'...সারা ভারতের আইনসভাসমূহের নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের এ সমাবেশে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপনের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত এবং গৌরবান্বিত। সবচেয়ে বড়ো কথা, মুসলিম জাতির যে প্রতিনিধিরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন তাদের সবাইকেই ভারতের মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচিত করেছেন।

ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে আজ আমাদের এই কনভেনশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। ভারত ও ব্রিটেন দু'দেশই আজ উভয় সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এমন অবস্থায় বাতিল, পঙ্গু ও পুরনো কাঠামোর ওপর আবার যদি বিকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হয় তাহলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে - যার পরিণতিতে ভারতের ভবিষ্যৎ শান্তি ও সমৃদ্ধি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ব্রিটেন আজ ভারতীয়দের হাতে তাদের হৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন এখন এ দেশে এসেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি নিরূপণ করতে। ক্যাবিনেট মিশনের আগমন এ কথাই প্রমাণ করছে যে, ব্রিটিশ সরকার অন্তত এবার ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে সদিচ্ছাশীল। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে এগিয়ে এসেছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করবে? কংগ্রেস চেষ্টা করছে ক্ষমতা এককভাবে নিজেই দখল করতে, যাতে তারা মুসলমান ও দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। কংগ্রেস বলছে, সরকার বাহাদুর ক্ষমতা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা সব বিরোধিতা শেষ করে দেব। মুসলমানদের আমরা পিষে ফেলব। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোকে পরাভূত করব। আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। কংগ্রেস বলছে, পুলিশ বাহিনীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে দাও, তাহলে তারা পারবে অখণ্ড ভারত কায়েমের নামে সারাদেশে কাটাকাটি, খুনোখুনি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ ও নরহত্যার বাজার সরগরম করে তুলতে। কিন্তু আমি বলব, কংগ্রেসের এত চিৎকার, পত্রিকার শোরগোল - সবই শেয়ালের ভাওতা, সবই নিছক পাগলামি আর ক্ষমতা লাভের অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন।

ব্রিটেন যদি এ রক্তলোলুপ গোত্রের হাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্য ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তা হবে তার চরম অন্ধত্ব ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

আমি বলব, এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আর পাকিস্তান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্যও নেই তাদের সামনে। সিন্ধু বা পাঞ্জাবে যদি কেউ 'গাদ্দার' বনে থাকে

সে কথা অবশ্য আলাদা: কিন্তু তারাও তো পাকিস্তানের বিরোধী নয়। এমনকি সীমান্তের কংগ্রেস মুসলমানরাও পাকিস্তানের বিরোধী নয়। বরং তারা নিজেদের প্রদেশে সম্ভবত ইতিমধ্যেই পাকিস্তান কায়েম করে বসেছে। এ দেশে আজ এমন কোনো মুসলমানের স্থান নেই, যিনি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী নন: মালিক খিজির হায়াত খানও কি এ কথা বলেননি যে, তিনি পাকিস্তানের আদর্শে আস্থাবান? আমি তাকে বলব, কওমের একজন খাদেম হিসেবে আপনি এখন মুসলিম লীগে শামিল হউন। মান-ইজ্জতের জন্য এতই যদি তিনি আগ্রহী হন তবে নিজ কওমের কাছেই তিনি তা দাবি করেন না কেন? দুনিয়ায় আজ আর এমন কোনো শক্তি নেই যা দশ কোটি মুসলমানের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং বিকাশের ধারায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। হিন্দু বলে যে ৩০ কোটি মানুষকে শনাক্ত করা হয় তাদের বরং এক জাতি বলা ভুল। তারা কিছুতেই এক জাতি নয়। অচ্ছ্যুৎ, অনুন্নত এবং আদিবাসীদের মধ্যেও আজ জাগরণ এসেছে। তারাও সবাই এই উপমহাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভের দাবিদার।

এখন প্রশ্ন হলো, পাকিস্তান কি আমাদের সর্বশেষ দাবি? আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে যাব না। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলব যে, পাকিস্তান আমাদের হাল আমলের প্রধান দাবি। গোড়ার দিকে হিন্দু মানসিকতা এমন ছিল যে, তারা মুসলমানদের বলত, এ দেশের সঙ্গে তোমাদের কোনো নাড়ির যোগ নেই। জবাবে আমরা বলেছি, ভারতবর্ষ যেমন তোমাদের, ঠিক তেমনি আমাদেরও। কংগ্রেসকে এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কয়েক বছর ধরে আমরা সব রকমে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করেছি। ন্যায্য পাওনার চেয়ে আমরা তখন অনেক কমই দাবি করেছি। একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে আমরা হিন্দুদের সংখ্যাভিত্তিক অধিকার মেনে নিতেও এতদিন প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু বরাবরই তারা আমাদের সে একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিও প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আমাদের একটা কথাতেও তারা কর্ণপাত করেনি, নিজেদের জিদই তারা অক্ষুন্ন রেখে এসেছে।

আজ স্বাধীনতা ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের লগ্ন সমুপস্থিত। তাই সময় বুঝে কংগ্রেস এবং হিন্দুরা এখন বলছে, ভাই মুসলমান! তোমরা আমাদের সঙ্গী, তোমরা আর আমরা দুয়ে মিলে এক জাতি। কংগ্রেসের এই দাবির মুখে আমাদের সামনে আজ আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। তাই আমরা স্বাতন্ত্র্য ও বিভাগের দাবি তুলেছি। আমাদের এই দাবি সঙ্গত, ন্যায্য এবং সুবিচারের ভিত্তিতেই উত্থাপিত হয়েছে।

আমরা ভারতের মুসলমানরা আজ গোটা দেশের মধ্যে মাত্র সামান্য দুটি অংশ দাবি করছি। এই দাবির ভিত্তিতে একমাত্র কায়েদে আজমের নেতৃত্বে ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ - সমগ্র কওমের লক্ষ্য এবং আদর্শ আজ এক ও অভিন্ন। এ জন্য খোদাতায়ালার দরবারে হাজার শোকর। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে কোনো চেষ্টা, যে কোনো ষড়যন্ত্র আমরা মুসলমানরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করব, প্রতিরোধ করব। মুসলমান আজ আর মুর্দা কওম নয়, তাদের প্রতিরোধ শক্তি আজ কেবল দুর্বল কণ্ঠের চিৎকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে কংগ্রেসের আজ কর্তব্য হলো পাকিস্তানের দাবি সসম্মানে স্বীকার করে নেয়া।

আমরা ভারতের দশ কোটি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। একটি জীবন্ত ও দায়িত্বশীল জাতি হিসাবে বিশ্বে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদেরও আজ যথাযোগ্য অংশ নিতে হবে। তাই আজ আমরা এ বিরাট উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুটি এলাকা পেতে চাই। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশিয় ভাইয়েরা যদি পাকিস্তান দাবি মেনে না নেন, লড়াইয়ের জন্যই যদি তারা আয়োজন করতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে বলতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি? এ সম্পর্কে কায়েদে আজম বলেছেন, আমাদের সম্মতি না নিয়ে কোনো শাসনতন্ত্র আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে সর্বশক্তিতে আমরা তা প্রতিরোধ করব, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

মুসলিম জাতি আজ সজাগ, তারা আজ সচেতন। তাদের মতামতে আমল না দিয়ে কোনো ব্যবস্থা চালু করা হলে তারা তার মোকাবেলা করতে ওয়াদাবদ্ধ। মুসলিম লীগ মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে, বিশ্বাসকে করে তুলেছে দুর্জয়। মুসলিম লীগ তাদের নবজীবন দান করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচন প্রমাণ করেছে মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগ কি! দুর্বল, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ এবং অসুস্থ মুসলমানরাও মাইলের পর মাইল হেঁটে নির্বাচন কেন্দ্রে এসে মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা উপলব্ধি এবং অনুভব করেছে যে, একমাত্র মুসলিম লীগের শক্তি ও সংগঠনের মধ্যেই মুসলমান তথা ইসলামের সাফল্য নিহিত। মুসলিম লীগই তাদের চূড়ান্ত জয়ের পতাকাবাহী। যে জাতি ঈমান ও বিশ্বাসে বলীয়ান, স্বকীয় শক্তির রূপে আস্থাবান সে জাতিকে কখনো পরাভূত করা যায় না। মকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছার জন্য গৃহযুদ্ধের ইচ্ছা আমাদের নেই। আপসে-রফা এবং শান্তির সঙ্গে বসবাস করাই আমাদের কাম্য। সেই সঙ্গে আমরা মান-ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচতে চাই। নিজেদের জন্য আজ আমরা এমন একটু জায়গা চাই যেখানে আমরা নিরাপদ এবং শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব হিন্দু জনসাধারণের ওপর মোটেই নেই। কংগ্রেস শুধু বিত্তবান, শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা যোগ্য বটে, কিন্তু বাক্সর্বস্ব পাঁচালিবিশারদ। একদিকে তারা ধমক দিচ্ছেন, হুমকির সাথে বিবৃতি দিচ্ছেন। অন্যদিকে তারা শ্বেতকপোতের মতো নিষ্কলঙ্ক সাজছেন, ভেজা-বিড়ালের মতো নির্জীব বনছেন। দেশে এমন অনেক হিন্দু আছেন যারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার হিসেবে পাকিস্তানই একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন। বর্ণ হিন্দুদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এখন অন্যান্য হিন্দু ও অস্পৃশ্যরা আজ তাদের কাছ থেকে আলাদাই থাকতে চায়। বাংলাদেশে আড়াই কোটি অধিবাসী ও অস্পৃশ্য রয়েছেন যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাকিস্তান কায়েম হলে তাদের দারিদ্র্য এবং বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাদের মনে এখন আর কংগ্রেসের ওপর আস্থা মোটেই নেই। এমনো অনেক হিন্দু আছেন যারা মুসলিম লীগকেই মুক্তিলাভের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে ভাবছেন। পাকিস্তানকে তারা মজলুম, সর্বস্বান্ত, পর্যুদস্ত মানুষের জান্নাত বলে ভাবছেন (বিপুল করতালি)।

পাকিস্তান দাবির মূলে এমন কি আছে যাকে যুক্তি সীমারেখার বাইরে বলে আখ্যা দেওয়া সম্ভব। মুসলমানরা দেশের দুই প্রান্তের দুটি ছোট্ট এলাকাই মাত্র চাইছে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমান কওম একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।

আজ প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং হিন্দু কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে মর্যাদার সঙ্গে পাকিস্তান মেনে নিতে রাজি আছে কি-না। আমি এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। অনুধাবন করতে চেষ্টাও করেছি যে, মুসলমানরা পাকিস্তান হাসিলের জন্য লড়তে প্রস্তুত আছে কি-না। আজ আমি পূর্ণ ঈমানদারী ও সততার সঙ্গে ঘোষণা করছি, বাংলার প্রতিটি মুসলমান আজ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আমরা পাকিস্তান চাই - এ প্রশ্নে কোনো অবস্থাতেই আপস নেই। এ পথে যে-ই বাধা দিতে আসবে, মুসলিম জনতাই তাকে সরিয়ে দেবে। পাকিস্তানের জন্য তারা জান কবুল করতেও প্রস্তুত।

বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত আসার পথে এমন কতকগুলো প্রদেশ অতিক্রম করতে হয়েছে যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। আমি তাদের মধ্যেও আজাদীর প্রাণচাঞ্চল্য দেখেছি। তারা আমাকে বলেছেন, তোমরা আমাদের ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দাও। তবু নিজ এলাকায় তোমরা পাকিস্তান কায়েম করো। আমাদের ভাইয়েরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করবে, একটি আজাদ দেশের বাসিন্দা হবে এতেই আমাদের গৌরব। সত্য বলতে কি, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরাই আজ আমাদের আজাদীর পথ দেখিয়েছে, আজাদীর পথে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাদের এই সুদৃঢ় সংকল্পের প্রতি আমাদের অভিনন্দন।

এ তো গেল সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা। কিন্তু যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা পাকিস্তান সংগ্রামে নিজেদের জানমাল সব কিছুই কোরবানি দিতে, সব রকম দুর্যোগ-বিপদ হাসিমুখে বরদাশত করতে আজ প্রস্তুত হয়েছেন।

পূর্ণ ঈমানদারী আর সততার সঙ্গেই আজ আমি ঘোষণা করছি, বাংলার প্রতিটি মুসলমান আজ প্রস্তুত। আমাদের আজকের একমাত্র দাবি, একমাত্র কাম্য পাকিস্তান। এ প্রশ্নে কারো সঙ্গে আমাদের আপস নেই। আমাদের পথের প্রতিবন্ধক মুসলিম জনতাই সরিয়ে দেবে। আমরা আজ জান কোরবানে প্রস্তুত।

কায়েদে আজম, আপনি আমাদের পরীক্ষা নিন। আমরা বাংলার মুসলমান পাকিস্তান হাসিলের জন্য, অভিষ্ট লাভের জন্য আপনার নির্দেশ মোতাবেক যে কোনো ধরনের কোরবানির জন্য আজ প্রস্তুত।

দেশরক্ষার ব্যাপারে আমি বলব, আমেরিকা হোক বা ব্রিটেনই হোক, কোনো দেশই এককভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়। তবে এ কথা আমি বলি না যে, পাকিস্তান লাভের পরই আমরা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে দেব বা অস্ত্র সংগ্রহ ও নিজেদের সশস্ত্র করে তোলার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করব। তবে হিন্দুস্থানের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে আমি কেবল এ কথাই বলতে চাই, আমাদের একা ছেড়ে দিন। আমরাই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নেব।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ!"

খ.

দিল্লি কনভেনশনে উত্থাপিত ও গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব

"... ১৯৪৬ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল দিল্লির অ্যাংলো-অ্যারাবিক কলেজে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৪৭০ জন মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশনে সোহরাওয়ার্দী যে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার পূর্ণ বিবরণ :

যেহেতু এই বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে কোটি কোটি মুসলমান এমন একটা ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী যা তাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গন (শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) নিয়ন্ত্রণ করে; যেটার বিধান কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, মতবাদ, আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ নয় এবং যেগুলো সেইসব হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের পুরোপুরি বিপরীত; যেগুলো হাজার হাজার বছর ধরে একটা কঠোর জাতিভেদ প্রথা লালন করছে ও চালিয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে ৬ কোটি মানুষকে অস্পৃশ্য রেখে মানুষ ও মানুষের মাঝে অস্বাভাবিক দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে এবং এ দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছে এবং যেটা মুসলমান, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে।

যেহেতু হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা জাতীয়তাবাদ, সাম্য, গণতন্ত্র এবং সেইসব আদর্শের পরিপন্থী যেগুলো ইসলাম ধর্মের প্রতীক।

যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটা অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব করে - যেটার মধ্যে থাকবে একইরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ এবং যেখানে শত শত বছর পরে তারা এখনো আলাদা দুটি বড় বড় জাতি।

যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনভিত্তিক পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধাঁচে, ভারতে এমন একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার যে ব্রিটিশ নীতি যার অর্থ একটা জাতি বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছা অন্য একটা জাতি বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে যেটা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে গঠিত প্রদেশসমূহে আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসনে দেখা গিয়েছে, যখন মুসলমানরা বর্ণনাতীত হয়রানি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়; যার ফলে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে যে, সংবিধানে যেসব তথাকথিত রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে এবং গভর্নরের জারিকৃত নির্দেশনামায় (Instrument of Instructions) যা দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিষ্ফল ও অকার্যকর।

যার ফলে তারা এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যদি কোন সংযুক্ত ভারতীয় ফেডারেশন স্থাপিত হয় তাহলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহেও তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না এবং কেন্দ্রে চিরস্থায়ী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে তাদের অধিকার ও স্বার্থাদি পর্যাপ্তভাবে রক্ষিত হবে না।

যেহেতু মুসলমানরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে হিন্দুদের আধিপত্য থেকে মুসলমানদের ভারতকে রক্ষা করতে হলে এবং তাদের নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী নিজেদের উন্নতি সাধন করার পূর্ণ সুযোগ তাদের দিতে হলে, একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা দরকার যার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে থাকবে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থাকবে সিন্ধু ও বেলুচিস্তান।

ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের এই কনভেনশন যত্ন বিবেচনার পর ঘোষণা করছে যে, সংযুক্ত ভারতের জন্য কোন সংবিধানই মুসলিম জাতি মেনে নেবে না এবং এই উদ্দেশ্যে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কোন সংস্থায়ই অংশগ্রহণ করবে না, এবং ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এমন কোন ফর্মুলা প্রণয়ন করে যেটা ভারতীয় সমস্যার সমাধান ও অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ন্যায় ও সমতাভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহলেও মুসলিম ভারতের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পাকিস্তান অঞ্চল :

প্রথমত, বাংলা ও আসাম নিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ পাকিস্তান অঞ্চলের যেখানে মুসলমানরাই সুস্পষ্টরূপেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চল নিয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হোক এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য দ্ব্যর্থহীন একটা অঙ্গীকার অবিলম্বে প্রদান করা হোক।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক তাদের নিজেদের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে দুইটি পৃথক পৃথক সংবিধান প্রণয়ন পরিষদ গঠিত হোক।

তৃতীয়ত, ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হোক।

চতুর্থত, কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুসলিম লীগের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা পেতে হলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়া ও তার বাস্তবায়ন নিতান্তই অপরিহার্য।

এই কনভেনশন জোরের সাথে একথাও ঘোষণা করছে যে, মুসলিম লীগের দাবির বিপরীতে কেন্দ্রে কোন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বা সংযুক্ত ভারতভিত্তিক কোন সংবিধান জোর করে চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করা হলে, মুসলমানদের বেঁচে থাকা ও জাতীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে এর প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না।

প্রস্তাবক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাংলার প্রধানমন্ত্রী।

সমর্থক — মালিক ফিরোজ খান নূন, রাজা গজনফর আলী খান, বেগম শাহনেওয়াজ, আবুল হাসেম এবং আবদুল হামিদ।"[১২২]

---

১২২. তথ্যসূত্র : গণতন্ত্রের মানসপুত্র : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী/আবু মাহমুদ। [আকাশ প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ১১৩-১১৭]

গ.

"...হঠাৎ খবর আসল, জিন্নাহ সাহেব ৭, ৮, ৯ এপ্রিল দিল্লিতে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলিম লীগপন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন ডেকেছেন। বিগত নির্বাচনে বাংলাদেশ ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ একচেটিয়াভাবে জয়লাভ করেছে। তবে অধিকাংশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে নাই। তাই শুধুমাত্র বাংলাদেশে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন হয়েছে। পাঞ্জাবে খিজির হায়াত খান তেওয়ানার নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট সরকার, সীমান্তে ডা. খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার, সিন্ধুতে জনাব আল্লাহ বক্সের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বিরোধী সরকার গঠিত হয়েছে। চারটা মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশের মধ্যে মাত্র বাংলাদেশেই এককভাবে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করেছে। অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম লীগবিরোধী দল হিসাবে আসন গ্রহণ করেছে। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন এগারটা প্রদেশ ছিল।

শহীদ সাহেব স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করতে হুকুম দিলেন। বাংলা ও আসামের মুসলিম লীগ এমএলএ ও কর্মীরা এই ট্রেনে দিল্লি যাবেন। ট্রেনের নাম দেওয়া হল 'পূর্ব পাকিস্তান স্পেশাল'। হাওড়া থেকে ছাড়বে। আমরাও বাংলাদেশ থেকে দশ-পনেরজন ছাত্রকর্মী কনভেনশনে যোগদান করব। এ ব্যাপারে শহীদ সাহেবের অনুমতি পেলাম। সমস্ত ট্রেনটাকে সাজিয়ে ফেলা হল মুসলিম লীগ পতাকা ও ফুল দিয়ে। দুইটা ইন্টারক্লাস বগি আমাদের জন্য ঠিক করে ফেললাম। ছাত্ররা দুষ্টামি করে বগির সামনে লিখে দিল, 'শেখ মুজিবর ও পার্টির জন্য রিজার্ভড;' এ লেখার উদ্দেশ্য হল, আর কেউ এই ট্রেনে যেন না ওঠে। আর আমার কথা শুনলে শহীদ সাহেব কিছুই বলবেন না, এই ছিল ছাত্রদের ধারণা। যদিও ছাত্রদের নেতা ছিল নূরুদ্দিন। তাকেই আমরা মানতাম।

শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের কামরায় দুইটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেওয়া হল। হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত প্রায় সমস্ত স্টেশনেই শহীদ সাহেব ও তাঁর দলবলকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের জয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। জহিরুদ্দিনকে হাশিম সাহেবের কামরার কাছেই থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কারণ, তাকে সমস্ত পথে উর্দুতে বক্তৃতা করতে হবে। সেই একমাত্র বক্তা যে উর্দু, বাংলা ও ইংরেজিতে সমানে বক্তৃতা করতে পারত। কলকাতার কোনো মহল্লায় সভা হলে জহির উর্দু ও আমি বাংলায় বক্তৃতা করতাম। নূরুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, নূরুল আলম, শরফুদ্দিন, কিউ. জে. আজমিরী, আনোয়ার হোসেন (এখন ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানির বড়ো কর্মকর্তা), শামসুল হক সাহেব, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও অনেক লীগ কর্মীর মধ্যে মুর্শিদাবাদের কাজী আবু নাছের, আমার মামা শেখ জাফর সাদেক আরও অনেকে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন, দিল্লি যাবার অনুমতিও পেয়েছিলেন। এছাড়া যে সকল ছাত্র আমাদের হাওড়া স্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিল, তারাও স্পেশাল ট্রেনে ভাড়া লাগবে না শুনে এক কাপড়েই ট্রেনে চেপে বসল। প্রায় আট-দশজন হবে, তাদের না' বলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তারা ভালো কর্মী। 'নারায়ে তকবির', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জিন্দাবাদ', 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল।

সমস্ত ট্রেনে মাইক্রোফোনের হর্ন লাগানো ছিল। জহির, আজমিরী ও আমি বেশি শ্লোগান দিতাম মাইক্রোফোন থেকে। প্রত্যেক স্টেশনে আমাদের গাড়ি থামাতে হত - যদিও সব জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাবার কথা ছিল না। হাজার হাজার লোক শহীদ সাহেবকে ও বাংলার মুসলিম লীগকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছিল। সকালে যখন পাটনায় পৌছালাম তখন দেখি সমস্ত পাটনা স্টেশন লোকে লোকেরণ্য। তারা 'বাংলাকা মুসলমান জিন্দাবাদ', 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', এই রকম নানা স্লোগান দিতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে বিহার মুসলিম লীগ এবং প্রত্যেককে একটা করে ফুলের মালা উপহার দিয়েছে।

আমাদের ট্রেন যে সময় মত দিল্লিতে পৌছাতে পারবে না এটা আমরা বুঝতে পারলাম। অনেক দেরি হবে। আমরাও যেখানেই কিছু লোক স্লোগান দেয়, সেখানেই ট্রেন থামিয়ে দেই। এজন্য শহীদ সাহেব রাগ করলে আমি বললাম, কয়েক ঘণ্টা ধরে লোকগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আপনাকে দেখার জন্য কত দূর দূর থেকে এরা এসেছে! আর আমরা এক মিনিটের জন্য ট্রেন না থামালে কত বড়ো অন্যায় হবে। যাহোক, এমনি করে সারা রাত জনসাধারণ ছোটো ছোটো স্টেশনেও জমা হয়ে আছে। আমাদের ট্রেন দেখলেই তারা বুঝতে পারত। এলাহাবাদ স্টেশনে আমাদের সমস্ত ট্রেনটাকে নতুন করে ফুল দিয়ে তারা সাজিয়ে দিয়েছিল। পথে পথে বিহার ও ইউপি থেকে অনেক ছাত্র আমাদের ট্রেনে উঠে পড়েছিল। তাদের অনেকের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, পাকিস্তান হওয়ার পরেও আমাদের বন্ধুত্ব বজায় ছিল। এদের অনেকে পাকিস্তানে চলে এসেছে।

দিল্লি যখন পৌছালাম তখন দেখা গেল, যেখানে সকালে আমরা পৌছাব সেখানে বিকালে পৌছলাম। আট ঘণ্টা দেরি হয়েছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কনভেনশন বন্ধ করে রেখেছেন আমাদের জন্য। সকাল ন'টায় শুরু হবার কথা ছিল, আমাদের ট্রেন থেকে সোজা সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হল। দিল্লির লীগ কর্মীরা আমাদের মালপত্রের ভার নিলেন। আমরা বাংলায় স্লোগান দিতে দিতে সভায় উপস্থিত হলাম। সমস্ত সদস্য জায়গা থেকে উঠে সম্বর্ধনা জানাল। জিন্নাহ সাহেব যেখানে বসেছেন, তার কাছেই আমাদের স্থান। যখন উর্দু স্লোগান উঠত, আমরাও তখন বাংলা স্লোগান শুরু করতাম।

জিন্নাহ সাহেব বক্তৃতা করলেন, সমস্ত সভা নীরবে ও শান্তভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনল। মনে হচ্ছিল সকলের মনেই একই কথা, পাকিস্তান কায়েম করতে হবে। তার বক্তৃতার পরে সাবজেক্ট কমিটি গঠন হল। আট তারিখে সাবজেক্ট কমিটির সভা হল। প্রস্তাব লেখা হল, সেই প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব থেকে আপাতদৃষ্টিতে ছোটো কিন্তু মৌলিক একটা রদবদল করা হল। একমাত্র হাশিম সাহেব আর সামান্য কয়েকজন যেখানে পূর্বে 'স্টেটস' লেখা ছিল, সেখানে 'স্টেট' লেখা হয় তার প্রতিবাদ করলেন; তবুও তা পাস হয়ে গেল। ১৯৪০ সালে লাহোরে যে প্রস্তাব কাউন্সিল পাস করে সে প্রস্তাব আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে পরিবর্তন করতে পারে কি না এবং সেটা করার অধিকার আছে কি না এটা চিন্তাবিদরা ভেবে দেখবেন। কাউন্সিলই মুসলিম লীগের সুপ্রিম ক্ষমতার মালিক। পরে আমাদের বলা হল, এটা কনভেনশনের প্রস্তাব, লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয় নাই। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ঐ প্রস্তাব পেশ করতে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অনুরোধ করলেন, কারণ তিনিই বাংলার এবং তখন একমাত্র মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী।

...জনাব সোরাওয়ার্দীর বক্তৃতার পরে প্রায় বিশ-পঁচিশজন নেতা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বক্তৃতা করেন এবং প্রস্তাবটা সমর্থন করেন। জনাব আবুল হাশিম সাহেবও চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হওয়ার পরে জনাব লিয়াকত আলী খান একটা শপথনামা পেশ করেন এবং সমস্ত প্রদেশের আইনসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা এতে দস্তখত করেন।"[১২৩]

পাঁচ

শুরু হোক সংগ্রাম

[১৯৪৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ-এর পক্ষ থেকে জনাব আবুল হাশিম 'Let Us Go To War' শিরোনামে ইংরেজিতে এই প্রচারপত্র রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৪৬-এর যে সাধারণ নির্বাচনকে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের ওপর ভারতের মুসলমানদের গণভোট স্বরূপ ঘোষণা করেছিলেন, এই প্রচারপত্র তার ভাষায় 'আসাম এবং বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের পথনির্দেশক' হয়েছিল।]

---

১২৩. শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী। [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ৫০-৫৪]

"...কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইনসভার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের উপর ভারতীয় মুসলমানদের গণভোট হিসাবে গ্রহণ করা হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১৯৪৫ সালের ১লা আগস্টের সভায় এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মেজর এটলীর সরকার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।

আমরা দাবি করি যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন এবং লাহোরে ১৯৪০ সালের অধিবেশনে গৃহীত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধুনা প্রখ্যাত প্রস্তাব যেটা সাধারণভাবে "পাকিস্তান পরিকল্পনা" নামে পরিচিত, মুসলিম ভারতের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা সুস্পষ্টভাবে কখনও এটাকে মেনে নিতে পারেনি এবং ভারতে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি তীব্রভাবে আমাদের দাবির বিরোধিতা করেছে। তারা মনে করেন, মুসলিম লীগ ছাড়াও ভারতে আহরার, খাকসার, জমিয়তুল ওলামা ইত্যাদির মতো ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকশো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পাকিস্তান পরিকল্পনা প্রথম দিকে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁর কিছুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধবদেরই অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। গান্ধী তাঁর এক চিঠিতে জিন্নাহকে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। পরিশেষে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে, মুসলিম ভারতের কিছু অংশের, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম ভারতের সেই অংশেরই সাম্প্রদায়িক দাবি হিসাবে বর্ণনা করে যাদের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম লীগ। কিন্তু ভারতে লীগ প্রতিষ্ঠানের অসাধারণ বিকাশলাভ, তার সভাসমিতি, বিক্ষোভ ইত্যাদি এবং সর্বোপরি গত আট বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার উপনির্বাচনে তার শতকরা একশো ভাগ সাফল্য, ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিতদের একথা মেনে নিতে সাহায্য করেছিল যে, মুসলিম ভারতের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র মুসলিম লীগই দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সমগ্র অংশের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিপস প্রস্তাব যা গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল এবং রাজা গোপাল আচারীর পরিকল্পনা যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল তা মূল পাকিস্তান নীতি এবং মুসলিম লীগের দাবিকে পরোক্ষভাবে গ্রহণ করার কথাই ব্যক্ত করে। যদিও রাজাজী এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস উভয়েই নিজেদের মতো করে তাদের পরিকল্পনায় পাকিস্তানবিরোধী উপাদান আমদানি করে লাহোর প্রস্তাব নস্যাৎ করার জন্য সুচতুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর খুবই দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে এবং বাস্তব সত্যতাকে অস্বীকার করে তার পুরাতন মনোভাব অবলম্বন করল। তারা লীগের এবং পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাদের একই পুরাতন প্রচারকার্য শুরু করল। তারা এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অন্যায়ভাবে ভারতের নেতৃত্বের জন্য নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লীগকে এবং তার দাবিকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিদেশে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যাতে করে স্তালিন, এটলী ও ট্রুম্যানকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে পটসডাম থেকে তারা নিজেদের পক্ষে রায় পেতে পারে।

বর্তমান কালে একমাত্র ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই সম্ভব নির্ভুলভাবে জনমত যাচাই করা। সুতরাং মুসলিম লীগ, সহজসরল মুসলমান, যারা ছলচাতুরীতে অনভ্যস্ত, তাদেরই সংগঠন হিসাবে সোজাসুজিভাবে ভারতে সাধারণ নির্বাচন দাবি করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে তারা এই নির্বাচনকে পাকিস্তানের উপর গণভোট হিসাবে ও সারা ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবির উপর গণভোট হিসাবে গ্রহণ করবে। মহামান্য সম্রাটের সরকার পরবর্তী শীত মরসুমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। যেহেতু সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে পাকিস্তানের জন্য মুসলিম ভারতের শত্রুদের সঙ্গে প্রথম খণ্ডযুদ্ধ।

এই সংগ্রামের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এই সংগ্রামে বিজয়লাভের জন্য আমাদের সম্পদকে সংগঠিত করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বর্তমান হিসাবে এর দশ লক্ষেরও অধিক সদস্য রয়েছে। এরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এটা স্বাভাবিক যে এর নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে। আমি সকলের নিকট আন্তরিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের এই সাধারণ সংগ্রাম অব্যাহত থাকাকালে তাদের সকল মতপার্থক্যকে পুঁটলি পাকিয়ে রেখে, প্রয়োজন হলে সেগুলোকে হিমাগারে আবদ্ধ রাখুন। এই সন্ধিক্ষণে ক্ষমতার জন্য, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং অন্য কিছুর জন্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হবে আত্মঘাতী। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনবে এবং কিছুকালের জন্য এর দ্বারা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

কংগ্রেস নিজেদের ব্যাপারে যাই চিন্তা করুন না কেন অথবা অন্যকে সে বিষয়ে যাই চিন্তাভাবনা করার প্রয়াসী হন না কেন, মধ্যদিনের সূর্যের মতো একথা পরিষ্কারভাবে সত্য যে তারা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কিছুসংখ্যক মুসলমান হয়তবা তাদের বদ্ধমূল রক্ষণশীলতার জন্য যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের তাল মিলিয়ে চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, অথবা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত রেখেছেন, তাদের কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা নেই। কেননা, তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও প্রতিনিধিত্ব করেন না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলা চলে যে, তার কংগ্রেস সভাপতির পদটি হচ্ছে যারা ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত নন তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করারই একটি কৌশল মাত্র।

গান্ধী জিন্নাহ আলোচনার অব্যবহিত পরই বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে কায়েদে আজম ঘোষণা করেন যে, আমাদের পাকিস্তান সংগ্রাম কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, বরং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার অব্যবহিত পরই ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিও আবেদন জানান। কিন্তু কংগ্রেস যথোপযুক্ত সাড়া প্রদানের তোয়াক্কা করল না। ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উন্মাদনায় বিভোর ব্যক্তিদের যে অবস্থা হয়ে থাকে, কংগ্রেস নেতৃবর্গ কায়েদে আজমের এরূপ ইঙ্গিতকে দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে মনে করল এবং ভারতের গ্রীষ্মাবকাশের রাজধানী (সিমলা) থেকে লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিলো। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম হবে আত্মরক্ষামূলক, যদিও আমাদের পাকিস্তান সংগ্রাম মূলত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। কংগ্রেস তাদের নিজেদের চিন্তা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে আমাদের বাধ্য করেছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল লীগ এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের ব্যাপারে বিতর্কের চির অবসান ঘটাবে।

আদর্শগত অথবা ব্যক্তিগত, বৈধ অথবা অন্য কিছু, সব রকম মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমাদের দলের মধ্যে সম্ভাব্য সব রকমের বিশৃঙ্খলা পরিহার করার নিমিত্তে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৩৫ সালের ২৭শে আগস্ট এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগ, জেলা, মহকুমা এবং ইউনিয়ন পুনর্গঠনের জন্য সর্বপ্রকার নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। আমি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহবান করি। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ যে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, সেটা উপলব্ধির জন্য বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এখন থেকে কাউন্সিলের ভদ্রমহোদয়দের সাবধান করে দিচ্ছি তারা যেন তাদের স্বদেশপ্রেমের চেতনাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হতে না দেন।

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ চান আমরা যেন আইনসভায় প্রথম শ্রেণীর একটি দল প্রেরণ করি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিগত আট বৎসরে অযোগ্য ও অনির্ভরশীল দলের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র ভালো ধরনের নির্বাচন করতে পারি। যদি আমরা একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করতে সক্ষম হই যেটি প্রার্থী মনোনয়নের সময় সততা, যোগ্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতা ব্যতিরেকে অন্য কিছু বিবেচনা করবে না। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যদের এমন হতে হবে যাতে তারা জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেন।

চতুর্দিক থেকে আমরা খবর পাচ্ছি যে, আইনসভার ভাবী প্রার্থীরা তাদের জন্য ভোট প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁদের সম্ভাব্য বিরোধী পক্ষকে ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্তে এই মর্মে গুজব রটাচ্ছেন যে, তাদের নিজেদের নির্বাচনী এলাকার জন্য ইতিমধ্যে লীগ তাদের মনোনীত করেছেন। এ ধরনের প্রচারণার জন্য যেসব ব্যক্তি দায়ী তারা যদি এ কাজ অব্যাহত রাখেন তবে তারা লীগের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হিসাবে বিবেচিত হবেন। মুসলিম লীগ জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যাতে তারা লীগের আদর্শ ও দাবির পক্ষেই নিজেদের ভোট প্রদান করেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নয়।

পার্লামেন্টারি বোর্ড যদি সততার সঙ্গে গঠিত হয় তাহলে তারা প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে স্থানীয় মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন। বহু বছর ধরে আমরা উচ্চগলায় চিৎকার করে আসছি মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান এবং কায়েদে আজম জিন্দাবাদ। এখন লীগের মূল নীতির প্রতি, পাকিস্তান এবং তার নেতা কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে সত্য যাচাইয়ের সময় ও সুযোগ এসেছে। সুতরাং আমাদের উচিত স্বদেশপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করা।

আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মুসলিম বাংলা একযোগে, এক ব্যক্তি রূপে, তার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এবং একজন মুসলিম মুজাহিদের চেতনা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করবে। একজন গাজীর সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন যে, মুসলিম লীগ নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করবে এবং শতকরা একশো ভাগ সাফল্য অর্জন করবে। আল্লাহতায়ালার আশীর্বাদে আমরা তাই আশা করি, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আসুন, আমরা বিনম্রভাবে আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর আশীর্বাদ লাভের যোগ্যতার জন্য আসুন আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। এটাই হচ্ছে চিন্তা ও কোনো কাজ করার প্রকৃষ্ট মুসলিম রীতিনীতি।

পাকিস্তান বলতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বোঝায়। তাঁরা হচ্ছেন মুর্খ, কল্পনাবিলাসী অথবা কপট যারা মনে করেন যে, চরম ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়াই পাকিস্তান অর্জন করা সম্ভব। পাকিস্তানের প্রতিটি সৈনিকের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে, পাকিস্তান অর্জনের পথ ক্যালভ্যারির পথ থেকেও অনেক দুরূহ।

আমাদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও কারিগর, ছাত্র ও যুবক, কৃষক ও ভূস্বামী, উলেমা ও অপেশাদারি ব্যক্তির উচিত মুসলিম ভারতের মহান নেতার তূর্যধ্বনির আহবানে সাড়া দেওয়া, সমস্ত মতপার্থক্যের অবসান ঘটানো, অতীতকে ভুলে যাওয়া এবং শীতকালীন সংগ্রাম, আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের জন্য নিজেদের সকল সম্পদকে কাজে লাগানো। মুসলমান হিসেবে আমাদের ব্যক্তিসত্তা ও সম্পত্তি সবই আল্লাহতায়ালার এবং আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যখন যেমন প্রয়োজন হবে সেইমতো আমাদের সকল সম্পদ আল্লাহতায়ালার পথে নিয়োজিত রাখতে হবে। যাদের অর্থ আছে তারা প্রয়োজনমতো যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হজরত আবুবকর মু'তার যুদ্ধের জন্য রসুলের নিকট তার বিষয়-সম্পত্তি দান করেছিলেন সেইভাবে মুসলিম লীগের নিকট তা নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য সমর্পণ করবেন। যাদের লেখনীশক্তি রয়েছে তাঁর লেখা দিয়ে, যাদের বাচনশক্তি আছে তাঁরা তাদের বাগ্মীতার দ্বারা সাহায্য করবেন। ছাত্র এবং যুবকেরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম কাজে লাগাবেন।

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী তার সাম্প্রতিক প্রেস বিবৃতিতে ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবেদন জানিয়েছেন। আসুন, আমরা তাঁর আহ্বানে যথাযোগ্য সাড়া প্রদান করি। মুসলিম লীগের মতো একটি মহান প্রতিষ্ঠানের কারও প্রতি প্রতিহিংসা অথবা বিদ্বেষ থাকতে পারে না এবং সৎ ও সরল উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যারা যোগ দিতে চান তাদের লীগ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মুসলিম লীগের বাইরে এখনো যারা রয়েছেন তাদের উচিত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং অনতিবিলম্বে লীগে যোগদান করা।

কংগ্রেস নিজেদের অহেতুক এবং অনর্থকভাবে লীগের সঙ্গে দ্বন্দে জড়িয়ে ফেলেছে। আসুন, আমরা সাহসের সঙ্গে এর মোকাবেলা করি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সাম্প্রতিক প্রেস বিবৃতিতে রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন ও অনুগ্রহপূর্বক প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পেশ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি খুবই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের যতটা বোকা বলে মনে করেন তারা ততটা বোকা নন। আল্লাহর করুণায় এখন তারা আসল ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

পাকিস্তান সূত্রটি খুবই সোজা এবং ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাকিস্তানের মূলসূত্র হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও সমতা। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ, যা কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের ভিত্তি, তার বিরোধিতা।

স্বাধীন ভারত কখনও এক দেশ ছিল না। স্বাধীন ভারতীয়রা কখনও এক জাতি ছিল না। অতীতে মোগল ও মৌর্য আধিপত্যে ভারত ছিল অখণ্ড এবং বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্যে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকে আল্লাহতায়ালা যেমন সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে হতে হবে একটি উপমহাদেশ যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য তারা যতই সুযোগ সৃষ্টি করুন, প্রতিটি ভারতীয় মুসলিম, ভারতে কংগ্রেস কর্তৃক যে কোনো চক্র, গ্রুপ অথবা সংগঠনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে প্রতিরোধ করবে। পাকিস্তান বলতে হিন্দু ও মুসলমান সকলের স্বাধীনতা বোঝায়, ভারতীয় মুসলমানরা প্রয়োজন হলে রক্তস্নানের মাধ্যমে তা অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কংগ্রেসের এ কথা বোঝা উচিত যে, যখন আমরা মুসলমানরা স্বাধীনতার কথা বলে থাকি তখন সেটি সত্যিভাবেই বলি এবং ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ অথবা ভারতীয় সব রকমের আধিপত্য ও শোষণের বিরোধী। পাকিস্তানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগ-সুবিধার ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা থাকবে। শরিয়াত অনুযায়ী তাদের সমাজকে শাসন করার অধিকার ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগের সংরক্ষণ রাখা মুসলমানদের চিন্তার মধ্যে নেই। এটা বললে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক হয় যে, পাকিস্তান বলতে মুসলমানদের আধিপত্য এবং অন্যান্যদের শোষণ করার সুযোগ-সুবিধা বোঝায়।

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন, 'পাকিস্তান সরকারের প্রতি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের সমর্থন থাকবে এবং পাকিস্তান সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের সকল জনগণের ইচ্ছে অনুযায়ী ও অনুমতি নিয়ে পরিচালিত হবে।' (৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩)

মুসলমানদের লীগে যোগদানের এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের আবেদন জানাতে গিয়ে তাদের সাবধান করে দিতে চাই, তারা যেন দিল্লি ও লন্ডনের আপাত উদাসীন সাম্রাজ্যবাদীদের ভুলে না যান। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদের উপর পাকিস্তান অর্জন নির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসে ক্ষমতার লোভের আভাস পেয়েছে এবং তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে জড়ানোর জন্য সাবধানে ফাঁদ পেতেছে। সিমলায় উর্দি পরিহিত ভৃত্য কর্মচারী

এবং মার্শাল ওয়াভেলের সুমধুর কথাবার্তা সাফল্যের সঙ্গে কংগ্রেসকে ফাঁদে আকর্ষণ করেছে। কংগ্রেস মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য সৈনিক ভাইসরয়কে তাদের মিত্র হিসাবে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কায়েদে আজমকে ধন্যবাদ, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে মাথা উঁচু করে সিমলা ত্যাগ করেছিলেন এবং একজন সৎ নেতার সাহস নিয়ে সাধারণ নির্বাচন দাবি করেছেন। সুতরাং লীগ আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নিকট নয়, জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমরা পাকিস্তান অর্জন করব আমাদের নিজেদের জনগণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা, ব্রিটিশদের সৌজন্য ও বদান্যতার মাধ্যমে নয়। যেহেতু আমরা সমদর্শিতা, ন্যায়বিচার ও ন্যায্য ব্যবহারের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের নীতি নির্ধারণ করেছি, যেহেতু আধিপত্য ও শোষণ নয়, স্বাধীনতা ও মুক্তিই হলো আমাদের প্রেরণার উৎস, তাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের জয় হবেই।

বাংলা সফরকালে আমি দেখেছি, জনগণের বুদ্ধি ও হৃদয় খুবই সুস্থ এবং উপরতলার নেতারা যদি তাদের নেতৃত্ব অর্জনের ব্যগ্রতায় জনগণের হৃদয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন তাহলে তারা কোনো রকম ভুল করবেন না। সুতরাং এই একটি ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও যাতে আমরা বিস্মৃত না হই যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তান এবং ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অধীনে মন্ত্রিত্ব শুধু একটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। নেতৃবর্গের মধ্যে যারা ভাবী বিধানসভায় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের অবস্থান বজায় রাখার প্রবণতা প্রদর্শন করবেন তাদেরকে ভালোভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং মুসলিম বাংলা তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবে না।

সাধারণ নির্বাচন আমাদের সংগ্রামের সূত্রপাত। ভোটকেন্দ্রে পাকিস্তানের স্বপক্ষে আমাদের ভোট প্রদানের পর, কংগ্রেসের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবিকে নিশ্চিহ্ন করে গণভোটে বিজয়লাভের পর মুহূর্তেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং পাকিস্তানের ভিত্তিতে ভারতের জনগণের কাছে আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করব। আমাদের সংগ্রাম সকলের মুক্তির সংগ্রাম, আমরা বিশ্বাস ও আশা করি প্রত্যেক মুক্তিকামী নারী ও পুরুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে চলেছি কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা খুব একটা খুশি নই। কেন না কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা অথবা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জনগণের কোনো অংশ অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংগ্রামে আমরা কখনও শক্তির অপচয় করতে চাইনি। আমাদের সংগ্রাম শতকরা একশো ভাগ আত্মরক্ষামূলক। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাইনি, তারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের ন্যায় অন্যায় ও অশোভনভাবে জোরপূর্বক আমাদের সংগ্রামে নামতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বিদ্বেষ ও প্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রত্যয় নিয়ে অন্তর দিয়ে এবং আল্লাহতায়ালার প্রতি আস্থা রেখে শুরু হোক আমাদের সংগ্রাম।'[১২৪]

ছয়

উর্দু ভাষা আন্দোলন

ক

"...১৮৬৭ উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা আর টিকে রইলো না। এখান থেকেই ভারতে, বিশেষত: শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ফণা বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এখানেই দ্বিজাতি তত্ত্বের সূচনা হয়।

[১২৪]. তথ্যসূত্র : আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি (মূল : In Retrospection)/আবুল হাশিম (অনু: শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী)। [এ্যাডর্ন পাবলিকেশন - জুন, ২০১২। পৃ: ১৪১-১৪৬]

হিন্দুদের এই উর্দু-বিরোধিতা লক্ষ্য করে ফরাসী প্রাচ্য ভাষাবিদ গারসিঁ-ডি-ট্যাসী বলেছিলেন : '...শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য মূলত উর্দু-হিন্দি বিবাদেরই অপর নাম।' তিনি হিন্দি আন্দোলনের নায়ক বাবু শিব প্রসাদের উর্দু-বিরোধিতাকে হীনমন্যতা বলে অভিহিত করেন।

১৮৬৭ সালে বেনারসের কমিশনার মিঃ সেক্সপীয়ারের সাথে মুসলমানদের শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন :

'...এখন আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, দুই জাতি (হিন্দু-মুসলিম) কোন কাজে আন্তরিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। এখন তো বিরোধ কমই দেখছেন। দিনদিন তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের (হিন্দুদের) ব্যবহারে এ বিরোধিতা ও শত্রুতা আরো বাড়তেই থাকবে। যাঁরা বেঁচে থাকবেন, দেখতে পাবেন।'

সেক্সপীয়ার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন : 'যদি আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়, তবে তা হবে নিতান্ত দুঃখজনক ব্যাপার।' তখন স্যার সৈয়দ বলেছিলেন : 'আমিও এর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত।'

স্যার সৈয়দ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পর্কে 'আলীগড় শিক্ষাসার্ভে রিপোর্টে' আরো বলেন :

'...ত্রিশ বছর ধরে আমি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে আসছি। উভয় জাতি মিলিতভাবে উভয়ের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হোক - এটাই ছিল আমার নিত্য কামনা। কিন্তু যখন থেকে হিন্দু বাবুরা উর্দু ভাষা ও ফার্সী অক্ষরকে ভারতীয় মুসলিম শাসনের প্রতীক মনে ক'রে এর বিলুপ্তি সাধনের মতলব আঁটিলেন, তখন থেকেই আমার নিশ্চিত ধারণা হলো যে, হিন্দু ও মুসলমান একযোগে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকল্পে আর কোন কাজ করতে পারবে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কপটতা বিরাজ করছে, উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলেই তার সূচনা হয়েছে।'

'বাবায়ে উর্দু' ডক্টর আবদুল হক দ্বিজাতি তত্ত্বের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের উৎপত্তি হয় উর্দু-হিন্দি বিবাদ থেকে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্মও হয় এখানে। তিনি আরো বলেন, সাধারণত বলা হয় যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ একটি রাজনৈতিক ইস্যু এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' প্রতি স্যার সৈয়দের বিরোধিতার ফলেই এই ইস্যুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বস্তুত হিন্দুরা যখন উর্দুর বিলুপ্তি সাধনে উঠেপড়ে লাগলো, তখন থেকেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে।"[১২৫]

খ.

"...স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিলেও তাহা যখন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বিরত করিতে পারে না, তখন ইংরাজের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের এক বিরাট শক্তিশালী অংশ উর্দু ভাষার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা প্রচলনের দাবী করে এবং দেখা যায় ১৯০০ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে উক্ত প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচলন সরকারি সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মুসলমান ইহার বিরোধিতা করে। এই ভাষা প্রচলন করিবার আন্দোলন দীর্ঘ দিন চলে।

---

[১২৫]. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ/স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন - জুন, ১৯৮২। পৃঃ ৩৮৭ - ৩৮৮।

ইংরাজ শাসন আমলে উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিবর্তে সরকারি দপ্তর ও আদালতে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তন করিলে মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা বয়কট করে কিন্তু তাহার পর তাহারা যখন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে তখন ইংরাজীর পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহা যে কেবল মুসলমান সমাজ ও যুবকদের আরও দীর্ঘদিন ভারতের রাজনীতি হইতে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার বিরুদ্ধে ছাত্রীর নবাব মহসীন-উল-মুলক্ আলীগড়ে এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নবাব সাহেব তখন আলীগড় কলেজ পরিচালনা সমিতির কার্যসচিব। এই সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্বয়ং আলীগড় কলেজ পরিদর্শন করিতে যান এবং ট্রাস্টিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'নবাব সাহেব হয় উর্দু কনফারেন্সের সভাপতি থাকিবেন নতুবা কলেজের কার্যসচিবের কার্য করিবেন, যে কোন একটি পদ বাছিয়া লইতে হইবে।' ট্রাস্টিগণের চাপে এবং অনুরোধে ইংরাজ বিরাগভাজন নবাব সাহেবকে উর্দু কনফারেন্সের সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ কনফারেন্সকে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। 'খণ্ডিত ভারতে' ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, 'কেবলমাত্র কলেজের কর্ম সচিব স্যার সৈয়দ আহমদ নহেন, অধ্যক্ষ মিঃ বেক পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস, লবণশুল্ক প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবীর বিরোধিতা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা দেখাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু নবাব মহসিন-উল-মুলকের বেলায় উর্দু সভায় সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়।'

১৯০১ সালে নবাব মহসীন-উল-মুলক্ 'মহামেডান পলিটিক্যাল অরগেনাইজেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাহাতে তিনি কর্মচারী রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ অক্ষুন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকার এইরূপ সংস্থানের অননুমোদন দেন নাই। ইহার ফলে নবাব সাহেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।"[১২৬]

গ.

"...১৯০০ সালের ১৮ আগস্ট তারিখে লক্ষ্ণৌতে উর্দু প্রতিরক্ষা সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাষণ দানকালে নবাব মহসিন-উল-মূলক বলেন :

'যদিও আমরা কলম চালাই না এবং আমাদের কলম শক্তিশালীও নয় - যার জন্য অফিসেও আমাদের খুব কমই দেখা যায়, তবুও আমাদের তলোয়ার চালানোর শক্তি আছে এবং মহারানির জন্য আমাদের হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। ...এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ভাবতে পারি না যে সরকার আমাদের পরিত্যাগ করবে বা উপেক্ষা করবে, যেসব জিনিসের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে সেগুলোর ব্যাপারে এমন কিছু ঘটতে দেবে যাতে আমাদের জীবন শোকাবহ হয়ে উঠে। আমি বিশ্বাস করি না যে সরকার আমাদের ভাষাকে মরে যেতে দেবে। সরকার তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ওটা কখনো মরবে না। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, আমাদের ভাষাকে হত্যা করার জন্য অপর পক্ষ যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যেকোন সময় ওটা বাধার সম্মুখীন হবে। এইসব ভয়ের কারণেই আমরা আমাদের ভাষাকে জীবন্ত রাখার প্রয়াসে কিংবা ওটা না পারলেও এর মরদেহটাও না হলে সাফল্যের সাথে বয়ে নিয়ে যাবার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। যখন কিছু কিছু সমস্যার কারণে সমগ্র জাতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তখন কোন আন্দোলন গড়ে তোলা বা জনগণকে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হল জনমতকে একটি সহনীয় স্তরে নিয়ে আসা এবং মানুষের মন থেকে সরকারের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা থাকলে তা দূর করা।'

[১২৬]. আবদুল ওয়াহিদ/উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩। পৃ. ৫৬-৫৭]

...১৮ অক্টোবর, ১৯৩৭ তারিখে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে উর্দু সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব :

'যেহেতু উর্দু ছিল মূলত একটি ভারতীয় ভাষা এবং সেটার উৎপত্তি হয় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং এদেশের জনগণের একটা বড়ো অংশ এই ভাষায় কথা বলত, তাই একটা অখণ্ড জাতীয়তা গঠনে তা সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়, তাই এর স্থলে যেটা হিন্দুস্থানি ভাষা নামেও অভিহিত সেই হিন্দিকে প্রতিস্থাপন করলে উর্দু তাবার আঙ্গিক ভিত্তিটাই তা উল্টিয়ে দেবে আর এই সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ভারতের সকল উর্দুভাষী মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি সকল ক্ষেত্রে তাদের ভাষার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে এবং যেখানেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষা উর্দু সেখানেই সেই ভাষার ব্যবহার ও উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং যেসব এলাকায় সেটা প্রধান ভাষা নয় সেখানে ওটাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো এবং সকল সরকারি অফিস, আদালত, আইনসভা, রেলওয়ে ও ডাকবিভাগে এই ভাষার ব্যবহারের বিধান রাখা উচিত বলে মুসলিম লীগ মনে করে। উর্দুকে যাতে ভারতে সার্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে চেষ্টাও করা উচিত।

প্রস্তাবক:
রাজা আমির আহমদ খান সাহেব (রাজা সাহেব মাহমুদাবাদ, ইউপি)

সমর্থকবৃন্দ:
মওলানা করিমুর রাজা খান সাহেব, ইউপি।

হাসান রিয়াজ সাহেব, ইউপি।

গোলাম হাসান সাহেব, বেরার।

এস. এম. হাসান খান সাহেব, বোম্বাই।'[১২৭]

সাত

মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল

ক

"...১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বরের আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে ভারতীয় জনগণের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সেই সব ঘটনাবলির একটা বিপুল-জটিল রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মকেন্দ্রিক পাঠ রয়েছে। সেই পাঠ অনুসরণ করলে বোঝা যায় হিন্দু-মুসলমান মিলে একটি মিলিত অভিযাত্রা গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এবং বিচ্ছিন্নভাবে অভিযাত্রার পথ রচনার সম্ভাবনাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতার সতর্ক যুক্তিপথ রচনার কাজ করে চলেছিল মুসলিম সমাজ মানসে অত্যন্ত সতর্কভাবে। এর একটা সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক রূপ গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছিল।

স্যার মুহাম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের ২৫তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এলাহাবাদে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি হিসেবে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে তা সে ভাষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

---

১২৭. তথ্যসূত্র : পাকিস্তান আন্দোলন : ঐতিহাসিক দলিলপত্র/জি অ্যালানা (অনু : কে এম ফিরোজ খান)। [খান ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ১৯/১৩১-১৩২]

মুদ্রিত আকারে ভাষণটি প্রকাশের সময় সেটিকে দশটি প্রধান প্যারাগ্রাফে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্যারাগ্রাফের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। প্যারাগ্রাফসমূহ একাধিক উপ-প্যারাগ্রাফে বিভক্ত হয়েছে। প্যারাগ্রাফ শিরোনামসমূহ হচ্ছে : ১. Islam and Nationalism : ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, ২. The Unity of an Indian Nation : ভারতে জাতীয় ঐক্য, ৩. Muslim India Within India : ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত, ৪. Federal States : ফেডারেল স্টেটসমূহ, ৫. Federation as understood in the Simon Report : সাইমন রিপোর্টে ফেডারেশন ব্যাপারটিকে যেভাবে বোঝানো হলো, ৬. Federal Scheme as Discussed in the Round Table Conference : ফেডারেল স্কিম নিয়ে আলোচনা করা হলো, ৭. The Problem of Defence : প্রতিরক্ষা সমস্যা, ৮. The Round Table Conference : গোল টেবিল বৈঠক, ৯. The Alternative : বিকল্প এবং ১০. The Conclusion : উপসংহার। মূল বক্তব্য শুরু করার আগে ইকবাল একটি ছোট্ট ভূমিকা করেন। তিনি বলেন :

'...ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার ও তাদের কর্মপরিকল্পনার ইতিহাসে বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লিগের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে আমি আপনাদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার কোনো সংশয় নেই যে, এই মহান অধিবেশনে এমন অনেকে আছেন যাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্যে আমি যাদের গভীর শ্রদ্ধা করি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এই অধিবেশনকে আমি দিকনির্দেশনা দেব সে খুব মানানসই হয় না। আমি কোনো দলের নেতৃত্ব দিই না। আমি কোনো নেতাকে অনুসরণ করি না। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কালে আমি ইসলাম ধর্ম, এর আইন ও পোলিটি, এর সংস্কৃতি, এর ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি ও জানবার চেষ্টা করেছি। ইসলামের মূল চেতনার সঙ্গে আমার নিত্য যোগাযোগ একটি বিশ্ব বিষয় হিসেবে ইসলামের গুরুত্ব অনুধাবনের ব্যাপারে আমাকে এক রকমের অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে। ভারতের মুসলমানগণ যখন ইসলামের চেতনার প্রতি যথার্থভাবে অনুগত থাকতে চাইছে তখন এই অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আমি যে আপনাদের পরিচালিত করতে চাই তা নয়। আমি শুধু আপনাদের চেতনাকে আমার অন্তর্দৃষ্টির আলোকে শাণিত করতে চাই যেন তা আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে সাধারণভাবে সহায়তা করতে পারে।

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

এই বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতে মুসলমানদের জীবন ইতিহাস গঠনের প্রধান উপায় হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। ইসলামকে নৈতিকতার আদর্শ হিসেবে বিবেচনার করা হয়। এটি এক রকমের পোলিটি - পোলিটি বলতে আমি বোঝাচ্ছি আইনি ব্যবস্থা ও নৈতিক আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সমাজ কাঠামো। ইসলামের প্রভাবে মুসলিম জনগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তি ও দল থেকে একটি মৌলিক আবেগ ও নৈতিক আনুগত্য সম্পন্ন একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা তাদের স্বকীয় জাতীয় নৈতিক চেতনার অধিকারী হয়েছে। একথা বলা মোটেই বাড়িয়ে বলা নয় যে, ভারত হচ্ছে পৃথিবীতে এক মাত্র দেশ যেখানে ইসলাম জন সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য স্থানের মতো ভারতেও নীতিবোধে উদ্দীপিত সাংস্কৃতিক ভাবনার কার্যকর পটভূমিতে ইসলামি সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে। আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হচ্ছে, মুসলমান সমাজ যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঐক্যবোধে উৎসাহিত ও আন্তরিক ঐক্যবোধে মিলিত, তার কারণ হচ্ছে অভিন্ন আইন ও প্রতিষ্ঠানের সমর্থন যার সঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

ভারতে জাতীয় ঐক্য

বহুজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সাম্য ও সহযোগিতার মধ্যে ভারতের জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করতে হবে। যারা যথার্থই রাজনীতিবিদ তারা কখনোই সত্যিকার ঘটনাকে অস্বীকার করেন না, করতে পারেন না, সে অপ্রীতিকর হলেও না। যে ঘটনার আদৌ অস্তিত্ব নেই তা আছে বলে কল্পনা করে নেওয়া

কোনো যুক্তিসংগত ব্যাপার নয়। সত্য যেমন তাকে তেমন করে স্বীকার করা উচিত, তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার মানসিকতা পোষণ করা উচিত নয়। এবং এই অতি যথার্থ পথে ভারতীয় ঐক্যকে আবিষ্কার করার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ তথা এশিয়ার ভবিষ্যৎ। ভারত এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র অবয়ব। তার জনগণের একাংশ পূর্ব অঞ্চলের জাতিসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য অনুভব করে। এবং জনগণের একাংশ সাংস্কৃতিক ঐক্য অনুভব করে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার জাতিসমূহের সঙ্গে। যদি ভারতীয় জনগণের জন্য একটি কার্যকর সহযোগিতার সূত্র আবিষ্কার করা যায়, তাহলে এই প্রাচীন ভূমিতে শান্তি ও পারস্পরিক সম্ভাবনার বাতাবরণ গড়ে উঠবে। এই দেশ অনেক দুর্ভোগ সহ্য করেছে। এমন ঘটেছে এখানকার জনগণের অক্ষমতার জন্যে নয়, বরং ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই দেশের অবস্থানের জন্যে। এই দেশের সমস্যা সমাধানের ওপর এশিয়ার সমস্যা সমাধান নির্ভর করবে।

অত্যন্ত কষ্টের বিষয় যে, এখনো পর্যন্ত একটি অভ্যন্তরীণ মানব সম্পর্ক সাম্য আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে কেন? ব্যর্থ হয়েছে এ জন্যে যে, সম্ভবত আমরা একে অন্যের অভিপ্রায় সম্পর্কে সংশয় পোষণ করি এবং ভেতরে ভেতরে একে অন্যের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাই। পারস্পরিক সহযোগিতার উচ্চতর স্বার্থে পরিস্থিতিক্রমে আমরা যেসব একচেটিয়া অধিকার পেয়েছি, সেগুলোকে ভাগ করে নিতে চাই না। জাতীয়তাবাদের অন্তরালে আমরা আমাদের অহংকারবুদ্ধিকে লুকিয়ে রাখি, বাইরে বাইরে উদার দেশপ্রেমের ভাব দেখাই, ভেতরে ভেতরে সংকীর্ণ বিবেচনাকে প্রশ্রয় দিই। সম্ভবত আমরা একথা স্বীকার করতে আগ্রহী নই যে, প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আত্মবিকাশের স্বাধীনতা আছে। আমাদের অসফল হওয়ার কারণ যাই হোক, আমি এখনো আশা রাখি, কোনো না কোনো একটা অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সাম্য অর্জন করা সম্ভব হবে। ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম মানসকে আমি যতোটুকু অনুধাবন করতে পারি, একথা ঘোষণা করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, মুসলমানরা যদি বুঝতে পারে যে, তারা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ভারতে স্বাধীন আত্মবিকাশের স্বাধীন ও উন্মুক্ত সুযোগ পাবে এবং সেটিই হবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনের স্থায়ী ভিত্তি, তাহলে তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

যদি এই নীতি মানা হয় যে, প্রতিটি সম্প্রদায় তার নিজের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য অনুযায়ী স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশ করতে পারবে তাহলে বলা যাবে যে, এই নীতি কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়নি। যদি কোনো একটি সম্প্রদায় অপর একটি সম্প্রদায়ের অকল্যাণকর কোনো ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহলে সেই সম্প্রদায়কে নীচ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হবে। আমি নিজে অন্য সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করি। পবিত্র কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়োজনে এমন কি তাদের আরাধনালয় সংরক্ষণ করা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তবে আমি আমার সম্প্রদায়কে ভালোবাসি। সে আমার জীবন ও আচার আচরণের উৎস, ধর্ম দিয়ে, সাহিত্য দিয়ে, দর্শন দিয়ে, সংস্কৃতি দিয়ে এখন আমি যা, তেমন করে আমাকে গড়ে তুলেছে। আমার বর্তমান চৈতন্যপটে সমগ্র অতীতকে একটি চলিষ্ণু সাম্প্রতিক বিষয় হিসেবে চালনা করছে। নেহরু রিপোর্টেও সাম্প্রদায়িকতার এই উচ্চতর দিকটির মূলকে স্বীকার করা হয়েছে।

ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত

ভারতের মতো একটি দেশে বসবাসরত সকল মানুষের মিলিত সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সাম্প্রদায়িকতার উচ্চতর দিকসমূহকে স্বীকার করতেই হবে। ভারতীয় সমাজের সাংগঠনিক ইউনিটসমূহ ইউরোপীয় দেশসমূহের মতো ভূসীমার ইউনিট নয়। ভারত হচ্ছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত মহাদেশ। জনগোষ্ঠীসমূহ নানা জাতিসত্তায় বিভক্ত। তারা পৃথক পৃথক ভাষায় কথা বলে, পৃথক পৃথক ধর্ম পালন করে। তাদের আচার আচরণ অভিন্ন জাতিসত্তাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

এমন কি হিন্দু বলতেও একটি অভিন্ন অখন্ড জনগোষ্ঠীকে বোঝায় না। সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীকে স্বিকার না করে নিয়ে ইউরোপীয় আদর্শে গণতন্ত্র চালু করলে ভারতে তা চলবে না। ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারতকে স্বীকার করে নেওয়ার যে মুসলিম দাবি, সেজন্যে, অত্যন্ত যুক্তিসংগত। আমার ধারণা যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন এই মহান আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিল। সেখানে সব কিছুকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা না করে সম্পর্ক সাম্যমূলক সমগ্রকেই বিবেচনা করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে মুসলিম দাবির প্রতি বর্তমান অধিবেশন জোরদার সমর্থন প্রদান করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি সে দাবি অতিক্রম করে কথা বলব। আমি দেখতে চাই যে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি রাজ্য গঠন করা হোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে সেটি একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হতে পারে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেও হতে পারে। উত্তর পশ্চিম ভারতে এই সমন্বিত মুসলিম রাজ্য সংগঠন, আমার ধারণায়, ভারতের মুসলমানদের, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের চূড়ান্ত অভীষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। নেহরু কমিটির কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। কমিটি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এ বলে যে, এমন রাজ্য গঠিত হলে সে এক বেসামাল ব্যাপার হবে। সে রাজ্যের আয়তনের ব্যাপারে এই ধারণা যথার্থ হতে পারে, তবে জনসংখ্যার বিবেচনায় ভারতের কোনো কোনো প্রদেশের চেয়ে এ রাজ্যের জনসংখ্যা বেশি হবে না। আম্বালা বিভাগ ও কতিপয় অমুসলিম জনসংখ্যা প্রধান জেলা ছেড়ে দিলে এলাকা ছোটো হয়ে আসবে ও মুসলিম জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়বে। এর ফলে রাজ্যের সংহতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। এই ধারণায় হিন্দুদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই, ব্রিটিশদেরও ভয়ের কিছু নেই এখানে। ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। একটি নির্দিষ্ট ভূমিসীমার মধ্যে ইসলামের সাংস্কৃতিক শক্তিকে কেন্দ্রিত করার মধ্যে এই শক্তির গৌরব নির্ভর করবে। ভারতে মুসলিম শক্তির এই আদর্শ সম্মত কেন্দ্রীয়করণ পরিণামে ভারতের সমস্যা সমাধান করবে, তাতে এশিয়ার সমস্যার সমাধান হবে। এর ফলে মুসলমানদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের দেশপ্রেম শাণিত হবে।

এইভাবে ভারতের বডি পোলিটিকের মধ্যে থেকে উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানগণ যদি আত্মবিকাশের সুযোগ পায় তাহলে তারা যাবতীয় আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারবেন, সে আক্রমণ ভাবের হতে পারে, বেয়নেটের হতে পারে। পাঞ্জাবি জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ মুসলমান। ভারতের সেনাবাহিনীর শতকরা ৫৪ ভাগ যোদ্ধাসদস্য পাঞ্জাবের অধিবাসী। নেপাল থেকে রিক্রুট করা ১৯০০০ গুর্খা সেনাসদস্য বাদ দিলে সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর শতকরা ৬২ ভাগ সদস্য পাঞ্জাব কনটিনজেন্ট থেকে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান থেকে যে ৬০০০ যোদ্ধাকে রিক্রুট করা হয় সে হিসেব এখানে ধরা হয়নি। সে থেকেই বোঝা যায় ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। সম্মানিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মনে করেন যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম রাজ্য সংস্থাপনের যে দাবি মুসলমানরা উত্থাপন করছে তার সঙ্গে সংকটকালে তাদের দ্বারা ভারত সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের সম্পর্ক আছে। আমি অত্যন্ত সহজভাবে তাকে বলতে চাই যে, এমন কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা মুসলিম দাবি প্ররোচিত নয়। মুসলমানগণ স্বাধীন আত্মবিকাশের সুযোগ চায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরা যে ধরনের ইউনিটারি সরকার চাইছেন, তাতে তেমন আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতে স্থায়ী সাম্প্রদায়িক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।

ভারতে স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হলে সেখানে ধর্মীয় শাসন চালু হবে, হিন্দুদের এমন ভয় পাওয়া উচিত নয়। ইসলামে ধর্ম বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আমি আপনাদের অবহিত করেছি। সে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রুশোরও অনেক আগে, যেখানে নাগরিকের সঙ্গ চুক্তি-সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এমন একটি ন্যায়বোধ সেখানে কাজ করে যা দ্বারা মানুষকে শুধু পৃথিবীবদ্ধ জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, শুধু পৃথিবীর নিয়ম দ্বারাই তাদের ব্যাখ্যা করা চলে না, তারা মূলত আধ্যাত্মিক জীব, সামাজিকতা দ্বারা, সামাজিক নিয়মকানুন দ্বারা তাদের চলিষ্ণু জীবনকে পরিমাপ করা যায় যদিও।

আমি জোর দাবি জানাই যে, ভারতে একটি সুসংহত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপন ইসলামের সর্বোচ্চ স্বার্থে ও ভারতের স্বার্থে করা প্রয়োজন। সে যদি হয় তাহলে ভারতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি সুদৃঢ় হবে, ইসলামের পক্ষেও আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের স্ট্যাম্প বাদ দিয়ে আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সব বিষয়কে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অনুবর্তী করা সম্ভব হবে এবং তা হলে সেসব আধুনিক সময়েরও অনুবর্তী হবে।

ফেডারেল রাষ্ট্রসমূহ

একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সাংবিধানিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে ভারতের মতো আবহাওয়াগত, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্যগত দেশে ভাষাগত ঐক্য, জাতিগত ঐক্য, ইতিহাসগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য এবং আর্থিক স্বার্থের ঐক্যের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দুরা মনে করে যে, পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি (হিন্দু-মুসলমানে) যথার্থ জাতীয়তাবাদের অনুকূল নয়। কারণ তারা জাতি বলতে বোঝে এমন একটা সর্বজনীন মিলনের অবস্থা যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু কার্যত এমন ব্যাপার কখনো ঘটে না। এমন ঘটুক তা অভিপ্রেতও নয়। ভারত হচ্ছে জাতিগত ও ধর্মগত বৈচিত্র্যের দেশ। এর সঙ্গে মুসলমানদের তুলনামূলক সাধারণ দারিদ্র্যের বিষয়টি যোগ করুন। তাদের ঘাড়ে অনেক ঋণের বোঝা, অন্তত পাঞ্জাবে। কিছু প্রদেশকে এখন যেভাবে গঠন করা হয়েছে, তাতে মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা রয়েছে। এসব বিবেচনা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন পৃথক নির্বাচনের জন্যে আমরা এতটা উদগ্রীব কেন। এমন একটি দেশে এবং এমন একটি পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নির্বাচন প্রয়োজনীয় সকল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। যদি তেমন ঘটে তাহলে গোষ্ঠীশাসন চালু হতে বাধ্য। যদি ভারতের প্রদেশসমূহের সীমানা এমনভাবে পুনর্গঠন করা হয় যে সম্প্রদায়সমূহের ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের ঐক্য তুলনামূলকভাবে সুরক্ষা পায়, তাহলে মুসলমানগণ আঞ্চলিক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনেও আপত্তি করবে না।

সাইমন রিপোর্টে ফেডারেশন ব্যাপারটিকে যেভাবে বোঝানো হলো

কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা কী হবে সে বিষয়ে ভারতের পণ্ডিত ও ইংল্যান্ডের পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ভারতের পণ্ডিতগণ কেন্দ্রের ক্ষমতা এখন যেমন আছে সে থেকে খর্ব করতে চান না, যা তারা চান সে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা যেন সম্পূর্ণ বজায় থাকে। যেহেতু নমিনেটেড প্রতিনিধি থাকছে না, তাদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা গরিষ্ঠতা আরো জোরদার হচ্ছে। ইংল্যান্ডের পণ্ডিতগণ অপরদিকে গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা কেন্দ্র থেকে রাজ্যের দিকে স্থানান্তরিত করার পক্ষে, যেহেতু তারা মনে করেন অধিকতর ক্ষমতা পেয়ে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে নাও পারে। সংশয় নেই যে তাঁরা চাইছেন ফেডারেল ধারণা প্রবর্তিত হোক, সে ব্যাপারে কতিপয় প্রস্তাবও রাখছেন, কিন্তু তারা যেসব নীতি এই ফেডারেশন ধারণাকে সচল রাখবে বলে ভাবছেন, মুসলিম ভারত সেসব নীতি প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করছে। মুসলমানগণ ফেডারেশন চাইছে এ জন্যে যে, এই পদ্ধতিতে ভারতের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু রয়েল কমিশনারগণ যে নীতির কথা বলছেন তাকে আপাত মজবুত মনে হলেও ফেডারেল স্টেট-এর জন্য দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ব্যাপারে কিছু করছে বলে মনে হয় না। মনে হয় যে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তারা একটা কিছু করছেন। তারা সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বিবেচনা করছেন না, এ সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল।

সুতরাং এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সত্যিকার ফেডারেশন বলতে যা বোঝায় সাইমন রিপোর্টে তার মর্মার্থকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দু গরিষ্ঠতা আছে। এই জেনে নেহরু রিপোর্টে ইউনিটারি ধরনের সরকারের কথা বলা হয়েছে। ফলে সারা ভারতে হিন্দু আধিপত্য নিশ্চিত হবে।

সাইমন কমিশন ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষেও কাজ করছে এজন্যে যে, যেহেতু ভারতে আন্তঃসম্প্রদায় বোঝাপড়া নেই, কাজেই ইংরেজরা তাদের হাতকে শক্তিশালী করে রাখতেই পারে। আমার ধারণায় স্বশাসিত ভারতে ইউনিটারি রীতির সরকার চলতে পারে না। অঙ্গরাজ্যসমূহ সম্পূর্ণ স্বশাসিত হবে এবং ফেডারেল কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে যেগুলো ফেডারেল রাজ্য তাকে প্রদান করতে সম্মত হবে। আমি ভারতের মুসলমানদের পরামর্শ দেব, যে ব্যবস্থা তাদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে স্বীকার করে না, তাতে তারা যেন কখনো সম্মতি না জানায়, সে ব্রিটিশ বা ভারত, যে উৎস থেকেই উত্থাপিত হোক।

গোল টেবিল বৈঠকে ফেডারেল স্কিম নিয়ে যে আলোচনা করা হলো

কেন্দ্রীয় সরকার সংগঠনে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল আগে থেকেই। সেজন্যেই পরিবর্তন আনতে এই ব্রিটিশ উদ্যোগ। সেজন্যেই শেষ মুহূর্তে ভারতীয় দেশিয় রাজন্যবর্গ গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হন। ভারতের জনগণ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগণ আশ্চর্য হয় এ দেখে যে, দেশিয় রাজপুরুষরা গোল টেবিল বৈঠকে নয় শুধু, সর্ব ভারতীয় ফেডারেশনেও যোগ দিতে আগ্রহী। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী হিন্দু ডেলিগেটরা ইউনিটারি ধরণের সরকারের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও নীরবে ফেডারেল সরকার ধারণাকে সমর্থন দান করেন। এমন কি মি. শাস্ত্রী, যিনি কয়েক দিন আগেও ভারতের জন্যে ফেডারেল ধরনের সরকার অনুমোদনের জন্যে স্যার জন সাইমনের ঘোরতর সমালোচনা করেন, তিনি অকস্মাৎ ফেডারেল সরকার প্রবর্তনের পক্ষে মত পরিবর্তন করেন এবং প্লেনারি সেশনে তা স্বীকারও করেন। ব্রিটিশ যখন চাইছে ভারতের দেশিয় রাজাদের অংশগ্রহণ থাকুক এবং হিন্দুরা নির্দ্বিধায় চাইছে যে সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠিত হোক, তখন এই সব ঘটনার একটা ভিন্ন অর্থ আছে। এর ভেতরের সত্যি হচ্ছে ভারতীয় দেশিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অল্প কয়েক জন মাত্র মুসলমান যারা গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে মতামত দিতে পারেন, ফলে ফেডারেশন গঠিত হলে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একদিকে ব্রিটিশ রাজত্ব যেমন আছে তেমন করে বজায় রাখা যায়, অন্যদিকে সর্বভারতীয় ফেডারেল অ্যাসেম্বলীতে হিন্দুদের বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করা চলে।

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা দেশিয় রাজন্যবর্গের মঞ্চের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে হিন্দু-মুসলমান মতভেদকে কাজে লাগাতে চাইছেন। রাজারাও ভাবছেন যে ঘটনাবলি এমন হলে তাদের রাজত্ব স্থায়ী হয়। মুসলমানরা যদি নীরবে এই ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দেয় তাহলে ভারতে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। যদি এভাবে ভারতের ফেডারেল সরকার গঠিত হয় তাহলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে হিন্দু রাজন্যবর্গ, কেননা তারাই কেন্দ্রীয় ফেডারেল অ্যাসেমব্লিতে সর্ববৃহৎ গ্রুপ গঠন করবে। এই গ্রুপ একদিকে ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করবে, অন্যদিকে হিন্দুদের প্রাধান্য বজায় রাখতে ও জোরদার করতে সাহায্য করবে। মনে হচ্ছে এই ব্যবস্থা হিন্দু ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া রচনা করতে চাইছে, যার মর্ম হচ্ছে, তুমি আমার ভারত শাসন ক্ষমতা স্থায়ী করতে চেষ্টা কর, প্রতিদানে আমি তোমার জন্যে হিন্দু গোষ্ঠীশাসন নিশ্চিত করছি, যেন তুমি ভারতের অন্য সকল সম্প্রদায়কে তোমার অধীনস্থ করে রাখতে পার।

বিকল্প

আমি সংক্ষেপে চেষ্টা করেছি একথা বলতে যে, আমার ধারণায় ভারতের সাংবিধানিক সমস্যাগুলোকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কীভাবে বিবেচনা করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন চাই, এটিই প্রধান মুসলিম দাবি। যদি মুসলিম দাবি অনুযায়ী এই ভৌগলিক মীমাংসায় না আসা যায় তাহলে আমি সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ ও সর্বভারতীয় মুসলিম কনফারেন্সের দাবির প্রতি জোর সমর্থন জানাব। ভারতে এমন কোন সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রতি

মুসলমানগণ সমর্থন জানাতে পারে না যাতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার খর্ব হয়। পাঞ্জাবে ও বাংলায় পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকার অর্জন করতে হবে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় শতকরা তেত্রিশ ভাগ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ভারতের মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা দুটি ভুলের আবর্তে পড়েছেন। একটি হচ্ছে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট। এই প্যাক্টে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা দেওয়া হয় সেটি সত্যি নয়। তাতে মুসলমানগণ ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, তেমন আশা তিরোহিত হয়। দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে ইসলামি সুসংহতির প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হওয়া, যার ফলে পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হতে বসেছে। মুসলিম লিগের দায়িত্ব হচ্ছে দুটি ভুলেরই প্রতিবাদ করা।

সাইমন রিপোর্টে মুসলমানদের প্রতি মহা অবিচার করা হয়েছে। পাঞ্জাবে ও বাংলায় তাদের বিধিবদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠতা স্বীকার করা হয়নি। মুসলমানদের এখন হয় লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুসরণ করতে হবে, নয়তো যুক্ত নির্বাচনের কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। সরকারি তথ্য বিবরণীতে দেখা যায় যে, সাইমন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে রিপোর্টে বর্ণিত কোনো বিকল্প প্রস্তাবে সম্মতি জানানো হয়নি। সরকারি বিবৃতিতেও স্বীকার করা হচ্ছে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠতার প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তা সঠিক হয়নি। তবে সাইমন কমিশন রিপোর্টে মুসলমানদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিবিধান করার জন্যেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। পাঞ্জাবের কথা বলতে গেলে, সেখানে সতর্ক ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ পাঞ্জাবে সরকারি কর্মকর্তাগণ হিন্দু-শিখ মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুই ওপরে রয়েছে, কিন্তু আইনসভায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়েছে শতকরা ৪৯ ভাগ। আইনসভায় স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া পাঞ্জাবের মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হতে পারেনা। আমি বুঝতে পারি না ভারত সরকার একদিকে বলছেন মুসলমানদের অসন্তোষ ন্যায়সংগত, আবার পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুমোদন করছে না।

গোল টেবিল বৈঠক

এখন গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত বলে মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ফলাফল সম্পর্কে আমি মোটেই আশাবাদী নই। আশা করা গিয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দৃশ্য থেকে বহু দূরে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সুপরামর্শের ভিত্তিতে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়-পক্ষের মধ্যে বিরাজমান বিবাদের যথার্থ মীমাংসা হবে ও ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে। কার্যত যা ঘটল তা সে আশার বিপরীত। লন্ডনে ভারতে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা হয় তাতে দুই মহান সংস্কৃতির মধ্যেকার সামঞ্জস্যের অভাব নিয়ে যত প্রাণ খোলা আলোচনা হয়েছে, তেমন এর আগে কখনো হয়নি। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে এই সমস্যা ভারতের জাতীয় সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা নয়। তিনি বলেছেন বলে বলা হয় যে, তাঁর সরকার পার্লামেন্টের কাছে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে না, কেননা ব্রিটিশ মডেলের গণতন্ত্র চেতনার দিক থেকে যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক। তিনি বুঝতেই পারছেন না যে ব্রিটিশ গণতন্ত্র বহুজাতিক দেশে কার্যকর হতে পারে না, এবং পৃথক নির্বাচনই বিরাজমান সমস্যার একমাত্র সমাধান।

সংখ্যালঘুদের জন্যে গঠিত সাব কমিটিও কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না। সমগ্র সমস্যাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত হতে হবে। সূক্ষ্মদর্শী ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা যদি আপাত ঘটনার অন্তরালবর্তী শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক উপাদানগুলো শনাক্ত করতে পারেন, তাহলেই ভারতের মতো একটি দেশে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যদি এক ভাবাদর্শ প্রণোদিত ভারতের ভিত্তিতে অথবা ব্রিটিশ মডেলের গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তাহলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আমি যতোদূর দেখতে পাচ্ছি, ভারতে বসবাসরত সকল জাতিসত্তার মানুষ আধুনিক পরিবেশে স্বাধীন আত্মবিকাশের কোনো সুযোগ না পেলে ভারতে কোনো শান্তি সংস্থাপিত হবে না। তাদের অতীত থেকে আকস্মিকভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা উচিত হবে না।

আমি আনন্দিত এ কথা বলতে পেরে যে, আমি যাকে ভারতীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা বলি, তার যথার্থ সমাধানের গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমান ডেলিগেটগণ অত্যন্ত সচেতন। তাঁরা অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্ব গ্রহণের সমস্যা সমাধানের পূর্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। ভারতে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের আলোকে যে অপপ্রচার চলছে ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজে যেভাবে বিষয়টিকে অবলোকন করছেন সে সম্পর্কে মুসলমান রাজনীতিবিদদের সচেতন থাকতে হবে ও তাকে মোকাবিলা করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে ওই অর্থে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বুঝলে চলবে না। তেমন সাম্প্রদায়িকতা ভারতে নেই। আমরা ৭০ মিলিয়ন মুসলমান। ভারতের অন্যকোনো জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে আমরা অনেক একতাবদ্ধ। সত্যি বলতে কি, ভারতে মুসলমানগণই একটি জনগোষ্ঠী যাদের আধুনিক অর্থে জাতি বলা যায়। হিন্দুরা সব দিক থেকেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে সত্যি, কিন্তু তারা আমাদের মতো এমন একতাবদ্ধতা অর্জন করতে পারেনি, যেন তারা একটি জাতি হয়ে উঠতে পারে। ইসলাম আপনাদের জাতিত্ব উপহার হিসেবে দিয়েছে। হিন্দুরা একটি জাতি হয়ে উঠতে চাইছে, সে তাদের জন্যে এক কঠিন পরীক্ষা, হিন্দুভারতে জাতি হয়ে উঠতে চাইলে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে।

উপসংহার

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বক্তৃতা শেষ। আমি বলতে চাই যে ভারতের ইতিহাসে যে সংকট এখন চলছে, তার সমাধানের জন্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও উদ্দেশ্য বোধের ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম স্বার্থ ও দেশ হিসেবে ভারতের স্বার্থ উভয়ের জন্যেই মুসলিম ঐক্য প্রয়োজন। ভারতের পরাধীনতা সমগ্র এশিয়ার দুঃখের কারণ। পরাধীনতা প্রাচ্য চেতনাকে অবদমিত করেছে, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার আনন্দকে খর্ব করেছে। অথচ আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার শক্তিতে এ দেশ এক সময় মহান গৌরবজনক সংস্কৃতি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে, কেননা আমরা এই দেশে জন্মেছি, এবং এই দেশেই আমরা মৃত্যুবরণ করব। এশিয়া বিশেষ করে মুসলিম এশিয়ার প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। একটি মাত্র দেশে ৭০ মিলিয়ন মুসলমানের বসবাস ইসলামের মূল্যবান সম্পদ, এ সম্পদ মুসলিম এশিয়ার সকল দেশের মিলিত মুসলিম জনশক্তির চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। ভারতের যে বর্তমান সমস্যা তাকে আমরা শুধু মুসলিম সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করব না, ভারতীয় মুসলিম সমস্যা হিসেবেও বিবেচনা করব। এশিয়ার প্রতি, ভারতের প্রতি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারব না, যদি না আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সুসংহত ও উদ্দেশ্যবোধকে একাগ্র না করি। ভারতে অন্য অনেক রাজনৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের স্বার্থে আমাদের এই প্রস্তুতি গ্রহণ করতেই হবে।

রাজনৈতিক ইস্যুতে মুসলমানদের অসংহত অবস্থান এর মধ্যেই কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আন্ত:সম্প্রদায় সমঝোতা হবে না আমি তেমন বলছি না, কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে এই ভাবনা কিছুতেই গোপন করতে পারি না যে, বর্তমান সংকট মোকাবিলা করার জন্যেও মুসলমানদের স্বাধীন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হতে পারে। যে সংকট এখন চলছে, তাতে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মপন্থা তারাই করতে পারে যাদের সংকল্প প্রবল, লক্ষ্য এক ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল। আপনারা কি তেমন উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ কার্যসূচিতে উদ্দীপিত হতে পারবেন? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারবেন। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের ওপরে উঠুন এবং ব্যক্তিগত ও সামূহিক কর্মপন্থার মূল্য নিরূপণ করে চলুন। আপনাদের আদর্শের আলোকে বিবেচনা করুন। আপনারা বস্তু থেকে চৈতন্যে পৌছুন। বস্তু বৈচিত্র্যময়, চৈতন্য হচ্ছে আলো, জীবন ও একত্ব।

মুসলমানদের ইতিহাস থেকে আমি একটি শিক্ষা পেয়েছি। At critical moments in their history it is Islam that has saved Muslims and not vice versa. If today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever-vitalising idea embodied in it, you will be only

reassembling your scattered forces, regaining your lost integrity, and thereby saving yourself from total destruction - মুসলমানদের ইতিহাসের সংকটকালে ইসলাম মুসলমানদের রক্ষা করেছে, মুসলমানদের ইসলাম রক্ষা করতে হয়নি। আজ যদি আপনারা আপনাদের লক্ষ্য ইসলামের ওপর স্থির রাখুন ও ইসলামের সঞ্জীবনী ধারণাসমূহের ওপর নির্ভরশীল হন, তাহলে আপনারা আপনাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করতে পারবেন, আপনাদের অন্তঃশক্তিকে সংগঠিত করতে পারবেন এবং বিনাশ থেকে নিজেরাই আপনাদের অবশ্যই রক্ষা করতে পারবেন।'

১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের এলাহাবাদ অধিবেশনে কবি মুহম্মদ ইকবাল সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখান থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো। দীর্ঘ ভাষণ। সেখানে ভারতীয় রাজনীতি, বিশ্বরাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পেয়েছে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম প্রসঙ্গ। এই জটিল মুসলিম রাজনীতি প্রসঙ্গে একটা সমাধানের কথা বলছেন ইকবাল। সে হচ্ছে ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত। ভারতে তিনি জাতিসত্তাগত দুটি অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন প্রধানত। একটি হচ্ছে মুসলিম অস্তিত্ব এবং অপরটি হচ্ছে হিন্দুজাতিসত্তার সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বী জাতিসত্তার মিলিত অস্তিত্ব। তিনি ভারতে বসবাসরত ৭০ মিলিয়ন মুসলমানের জন্যে পৃথক নির্বাচন চাইছেন, কেন্দ্রীয় আইনসভায় পৃথক আসন বণ্টন চাইছেন এবং সর্বোপরি মুসলমানদের জন্যে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত স্টেট বা রাজ্য দাবি করছেন ব্রিটিশ ভারতের ভেতরে হোক বা বাইরে হোক। অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতশাসন পরিত্যাগ করলে স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনতায় পর্যবসিত হবে, সে বোঝাই যায়। ইকবাল চাইছেন যে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে একটি মুসলিম রাজ্য হোক। আম্বালা বিভাগসহ পাঞ্জাবের কয়েকটি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাকে এই মুসলিম রাজ্যের বাইরে রাখলে ভালো। এই উত্তর-পশ্চিম মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের বাইরে যেসব রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যার সুস্পষ্ট ঘনত্ব আছে, সেসব স্থানে তিনি আঞ্চলিক পুনর্গঠন দাবি করেন। অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা চিহ্নিত করে তাদের তিনি মুসলিম ভারতের অংশ করতে প্রস্তাব করেন। বাংলা যেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে তো মুসলিম ভারত ধারণারই অর্ন্তভুক্ত হবে।

ইকবালের এই ভাষণকে পাকিস্তান ধারণার একটি মৌলিক দলিল মনে করা হয়। এই অর্থে যে, এই ভাষণে অত্যন্ত জোরদারভাবে, ধর্ম ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বলা হচ্ছে যে, জাতিসত্তাগত বিকাশে ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের গন্তব্য এক নয়, সে গন্তব্য পৃথক। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অস্তিত্ব থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম অস্তিত্বকে পৃথক হতে হবে। পৃথক মুসলিম রাজ্য বা রাষ্ট্র সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের আকাঙ্খিত বিকাশ নিশ্চিত করবে।"[১২৮]

খ

"...Sir Muhammad Iqbal's 1930 Presidential Address to the 25th Session of the All-India Muslim League Allahabad, 29 December 1930. Some extremely long paragraphs have been broken into shorter ones; small errors of punctuation, etc., have been corrected.

'...Gentlemen, I am deeply grateful to you for the honour you have conferred upon me in inviting me to preside over the deliberations of the All-India Muslim League at one of the most critical moments in the history of Muslim political thought and activity in India. I have no doubt that in this great assembly there are men whose political experience is far more extensive than mine, and for whose knowledge of affairs I have the highest respect. It will, therefore, be presumptuous on my part to claim to guide an assembly of such men in the political decisions which they are called upon to make today. I lead no party;

১২৮. ড. করুণাময় গোস্বামী/রবীন্দ্রনাথ, হান্টিংটন ও ভারতভাগ। [অনুপম প্রকাশনী - জুন, ২০১৫। পৃ. ৯০-১০৩]

I follow no leader. I have given the best part of my life to a careful study of Islam, its law and polity, its culture, its history and its literature. This constant contact with the spirit of Islam, as it unfolds itself in time, has, I think, given me a kind of insight into its significance as a world fact. It is in the light of this insight, whatever its value, that, while assuming that the Muslims of India are determined to remain true to the spirit of Islam, I propose not to guide you in your decisions, but to attempt the humbler task of bringing clearly to your consciousness the main principle which, in my opinion, should determine the general character of these decisions.

Islam and Nationalism

It cannot be denied that Islam, regarded as an ethical ideal plus a certain kind of polity – by which expression I mean a social structure regulated by a legal system and animated by a specific ethical ideal – has been the chief formative factor in the life-history of the Muslims of India. It has furnished those basic emotions and loyalties which gradually unify scattered individuals and groups, and finally transform them into a well-defined people, possessing a moral consciousness of their own. Indeed it is not an exaggeration to say that India is perhaps the only country in the world where Islam, as a people-building force, has worked at its best. In India, as elsewhere, the structure of Islam as a society is almost entirely due to the working of Islam as a culture inspired by a specific ethical ideal. What I mean to say is that Muslim society, with its remarkable homogeneity and inner unity, has grown to be what it is, under the pressure of the laws and institutions associated with the culture of Islam.

The ideas set free by European political thinking, however, are now rapidly changing the outlook of the present generation of Muslims both in India and outside India. Our younger men, inspired by these ideas, are anxious to see them as living forces in their own countries, without any critical appreciation of the facts which have determined their evolution in Europe. In Europe Christianity was understood to be a purely monastic order which gradually developed into a vast church organisation. The protest of Luther was directed against this church organisation, not against any system of polity of a secular nature, for the obvious reason that there was no such polity associated with Christianity. And Luther was perfectly justified in rising in revolt against this organisation; though, I think, he did not realise that in the peculiar conditions which obtained in Europe, his revolt would eventually mean the complete displacement of [the] universal ethics of Jesus by the growth of a plurality of national and hence narrower systems of ethics.

Thus the upshot of the intellectual movement initiated by such men as Rousseau and Luther was the break-up of the one into [the] mutually ill-adjusted many, the transformation of a human into a national outlook, requiring a more realistic foundation, such as the notion of country, and finding expression through varying systems of polity evolved on national lines, i.e. on lines which recognise territory as the only principle of political solidarity. If you begin with the conception of religion as complete other-worldliness, then what has happened to Christianity in Europe is perfectly natural. The universal ethics of Jesus is displaced by national systems of ethics and polity. The conclusion to which Europe is consequently driven is that religion is a private affair of the individual and has nothing to do with what is called man's temporal life.

Islam does not bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and matter. In Islam God and the universe, spirit and matter, Church and State, are organic to each other. Man is not the citizen of a profane world to be renounced in the interest of a world of spirit situated elsewhere. To Islam, matter is spirit realising itself in space and time.

Europe uncritically accepted the duality of spirit and matter, probably from Manichaean thought. Her best thinkers are realising this initial mistake today, but her statesmen are indirectly forcing the world to accept it as an unquestionable dogma. It is, then, this mistaken separation of spiritual and temporal which has largely in uenced European religious and political thought and has resulted practically in the total exclusion of Christianity from the life of European States. The result is a set of mutually ill-adjusted States dominated by interests not human but national. And these mutually ill-adjusted States, after trampling over the moral and religious convictions of Christianity, are today feeling the need of a federated Europe, i.e. the need of a unity which the Christian church organisation originally gave them, but which, instead of reconstructing it in the light of Christ's vision of human brotherhood, they considered fit to destroy under the inspirati on of Luther.

A Luther in the world of Islam, however, is an impossible phenomenon; for here there is no church organisation similar to that of Christianity in the Middle Ages, inviting a destroyer. In the world of Islam we have a universal polity whose fundamentals are believed to have been revealed but whose structure, owing to our legists' [legal theorists'] want of contact with the modern world, today stands in need of renewed power by fresh adjustments. I do not know what will be the final fate of the national idea in the world of Islam. Whether Islam will assimilate and transform it, as it has before assimilated and transformed many ideas expressive of a different spirit, or allow a radical transformation of its own structure by the force of this idea, is hard to predict. Professor Wensinck of Leiden (Holland) wrote to me the other day: 'It seems to me that Islam is entering upon a crisis through which Christianity has been passing for more than a century. The great difficulty is how to save the foundations of religion when many antiquated notions have to be given up. It seems to me scarcely possible to state what the outcome will be for Christianity, still less what it will be for Islam.' At the present moment the national idea is racialising the outlook of Muslims, and thus materially counteracting the humanizing work of Islam. And the growth of racial consciousness may mean the growth of standards different [from] and even opposed to the standards of Islam.

I hope you will pardon me for this apparently academic discussion. To address this session of the All-India Muslim League you have selected a man who is [has] not despaired of Islam as a living force for freeing the outlook of man from its geographical limitations, who believes that religion is a power of the utmost importance in the life of individuals as well as States, and finally who believes that Islam is itself Destiny and will not suffer a destiny. Such a man cannot but look at matters from his own point of view. Do not think that the problem I am indicating is a purely theoretical one. It is a very living and practical problem calculated to affect the very fabric of Islam as a system of life and conduct. On a proper solution of it alone depends your future as a distinct cultural unit in India. Never in our history has Islam had to stand a greater trial than the one which confronts it today. It is open to a people to modify, reinterpret or reject the foundational principles of their social structure; but it is absolutely necessary for them to see clearly what they are doing before they undertake to try a fresh experiment. Nor should the way in which I am approaching this important problem lead anybody to think that I intend to quarrel with those who happen to think differently. You are a Muslim assembly and, I suppose, anxious to remain true to the spirit and ideals of Islam. My sole desire, therefore, is to tell you frankly what I honestly believe to be the truth about the present situation. In this way alone it is possible for me to illuminate, according to my light, the avenues of your political action.

The Unity of an Indian Nation

What, then, is the problem and its implications? Is religion a private affair? Would you like to see Islam as a moral and political ideal, meeting the same fate in the world of Islam as Christianity has already met in Europe? Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and to reject it as a polity, in favor of national polities in which [the] religious attitude is not permitted to play any part? This question becomes of special importance in India, where the Muslims happen to be a minority. The proposition that religion is a private individual experience is not surprising on the lips of a European. In Europe the conception of Christianity as a monastic order, renouncing the world of matter and fixing its gaze entirely on the world of spirit, led, by a logical process of thought, to the view embodied in this proposition. The nature of the Prophet's religious experience, as disclosed in the Quran, however, is wholly different. It is not mere experience in the sense of a purely biological event, happening inside the experient and necessitating no reactions on its social environment. It is individual experience creative of a social order. Its immediate outcome is the fundamentals of a polity with implicit legal concepts whose civic significance cannot be belittled merely because their origin is revelational.

The religious ideal of Islam, therefore, is organically related to the social order which it has created. The rejection of the one will eventually involve the rejection of the other. Therefore the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable to a Muslim. This is a matter which at the present moment directly concerns the Muslims of India. 'Man,' says Renan, 'is enslaved neither by his race, nor by his religion, nor by the course of rivers, nor by the direction of mountain ranges. A great aggregation of men, sane of mind and warm of heart, creates a moral consciousness which is called a nation.' Such a formation is quite possible, though it involves the long and arduous process of practically remaking men and furnishing them with a fresh emotional equipment. It might have been a fact in India if the teaching of Kabir and the Divine Faith of Akbar had seized the imagination of the masses of this country. Experience, however, shows that the various caste units and religious units in India have shown no inclination to sink their respective individualities in a larger whole. Each group is intensely jealous of its collective existence. The formation of the kind of moral consciousness which constitutes the essence of a nation in Renan's sense demands a price which the peoples of India are not prepared to pay.

The unity of an Indian nation, therefore, must be sought not in the negation, but in the mutual harmony and cooperation, of the many. True statesmanship cannot ignore facts, however unpleasant they may be. The only practical course is not to assume the existence of a state of things which does not exist, but to recognise facts as they are, and to exploit them to our greatest advantage. And it is on the discovery of Indian unity in this direction that the fate of India as well as of Asia really depends. India is Asia in miniature. Part of her people have cultural affinities with nations of the east, and part with nations in the middle and west of Asia. If an effective principle of cooperation is discovered in India, it will bring peace and mutual goodwill to this ancient land which has suffered so long, more because of her situation in historic space than because of any inherent incapacity of her people. And it will at the same time solve the entire political problem of Asia.

It is, however, painful to observe that our attempts to discover such a principle of internal harmony have so far failed. Why have they failed? Perhaps we suspect each other's intentions and inwardly aim at dominating each other. Perhaps, in the higher interests of mutual cooperation, we cannot afford to part with the monopolies which circumstances have placed in our hands, and [thus we] conceal our egoism under the cloak of nationalism,

outwardly simulating a large-hearted patriotism, but inwardly as narrow-minded as a caste or tribe. Perhaps we are unwilling to recognise that each group has a right to free development according to its own cultural traditions. But whatever may be the causes of our failure, I still feel hopeful. Events seem to be tending in the direction of some sort of internal harmony. And as far as I have been able to read the Muslim mind, I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian home-lands is recognized as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake his all for the freedom of India.

The principle that each group is entitled to its free development on its own lines is not inspired by any feeling of narrow communalism. There are communalisms and communalisms. A community which is inspired by feelings of ill-will towards other communities is low and ignoble. I entertain the highest respect for the customs, laws, religious and social institutions of other communities. Nay, it is my duty, according to the teaching of the Quran, even to defend their places of worship, if need be. Yet I love the communal group which is the source of my life and behaviour; and which has formed me what I am by giving me its religion, its literature, its thought, its culture, and thereby recreating its whole past as a living operative factor, in my present consciousness. Even the authors of the Nehru Report recognise the value of this higher aspect of communalism. While discussing the separation of Sind they say, 'To say from the larger viewpoint of nationalism that no communal provinces should be created, is, in a way, equivalent to saying from the still wider international viewpoint that there should be no separate nations. Both these statements have a measure of truth in them. But the staunchest internationalist recognises that without the fullest national autonomy it is extraordinarily difficult to create the international State. So also without the fullest cultural autonomy – and communalism in its better aspect is culture – it will be difficult to create a harmonious nation.'

Muslim India Within India

Communalism in its higher aspect, then, is indispensable to the formation of a harmonious whole in a country like India. The units of Indian society are not territorial as in European countries. India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages, and professing different religions. Their behaviour is not at all determined by a common race-consciousness. Even the Hindus do not form a homogeneous group. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognising the fact of communal groups. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is, therefore, perfectly justified. The resolution of the All-Parties Muslim Conference at Delhi is, to my mind, wholly inspired by this noble ideal of a harmonious whole which, instead of stifling the respective individualities of its component wholes, affords them chances of fully working out the possibilities that may be latent in them. And I have no doubt that this House will emphatically endorse the Muslim demands embodied in this resolution.

Personally, I would go farther than the demands embodied in it. I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single State. Self-government within the British Empire, or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. The proposal was put forward before the Nehru Committee. They rejected it on the ground that, if carried into effect, it would give a very unwieldy State. This is true in so far as the area is concerned; in point of population, the State contemplated by the proposal would be much less than some of the present Indian provinces. The exclusion of Ambala Division, and perhaps of some districts

where non-Muslims predominate, will make it less extensive and more Muslim in population – so that the exclusion suggested will enable this consolidated State to give a more effective protection to non-Muslim minorities within its area. The idea need not alarm the Hindus or the British. India is the greatest Muslim country in the world. The life of Islam as a cultural force in the country very largely depends on its centralisation in a specified territory. This centralisation of the most living portion of the Muslims of India, whose military and police service has, notwithstanding unfair treatment from the British, made the British rule possible in this country, will eventually solve the problem of India as well as of Asia. It will intensify their sense of responsibility and deepen their patriotic feeling.

Thus, possessing full opportunity of development within the body politic of India, the North-West Indian Muslims will prove the best defenders of India against a foreign invasion, be that invasion one of ideas or of bayonets. The Punjab with 56 percent Muslim population supplies 54 percent of the total combatant troops in the Indian Army, and if the 19,000 Gurkhas recruited from the independent State of Nepal are excluded, the Punjab contingent amounts to 62 percent of the whole Indian Army. This percentage does not take into account nearly 6,000 combatants supplied to the Indian Army by the North-West Frontier Province and Baluchistan. From this you can easily calculate the possibilities of North-West Indian Muslims in regard to the defence of India against foreign aggression. The Right Hon'ble Mr. Srinivasa Sastri thinks that the Muslim demand for the creation of autonomous Muslim states along the north-west border is actuated by a desire 'to acquire means of exerting pressure in emergencies on the Government of India.' I may frankly tell him that the Muslim demand is not actuated by the kind of motive he imputes to us; it is actuated by a genuine desire for free development which is practically impossible under the type of unitary government contemplated by the nationalist Hindu politicians with a view to secure permanent communal dominance in the whole of India.

Nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim states will mean the introduction of a kind of religious rule in such states. I have already indicated to you the meaning of the word religion, as applied to Islam. The truth is that Islam is not a Church. It is a State conceived as a contractual organism long before Rousseau ever thought of such a thing, and animated by an ethical ideal which regards man not as an earth-rooted creature, defined by this or that portion of the earth, but as a spiritual being understood in terms of a social mechanism, and possessing rights and duties as a living factor in that mechanism. The character of a Muslim State can be judged from what the Times of India pointed out some time ago in a leader [front-page article] on the Indian Banking Inquiry Committee. 'In ancient India,' the paper points out, 'the State framed laws regulating the rates of interest; but in Muslim times, although Islam clearly forbids the realisation of interest on money loaned, Indian Muslim States imposed no restrictions on such rates.' I therefore demand the formation of a consolidated Muslim State in the best interests of India and Islam. For India, it means security and peace resulting from an internal balance of power; for Islam, an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian Imperialism was forced to give it, to mobilise its law, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of modern times.

Federal States

Thus it is clear that in view of India's infinite variety in climates, races, languages, creeds and social systems, the creation of autonomous States, based on the unity of language, race, history, religion and identity of economic interests, is the only possible way to secure a stable constitutional structure in India. The conception of federation underlying the Simon Report necessitates the abolition of the Central Legislative Assembly as a popular assembly.

and makes it an assembly of the representatives of federal States. It further demands a redistribution of territory on the lines which I have indicated. And the Report does recommend both. I give my wholehearted support to this view of the matter, and venture to suggest that the redistribution recommended in the Simon Report must fulfill two conditions. It must precede the introduction of the new constitution, and must be so devised as to finally solve the communal problem. Proper redistribution will make the question of joint and separate electorates automatically disappear from the constitutional controversy of India. It is the present structure of the provinces that is largely responsible for this controversy.

The Hindu thinks that separate electorates are contrary to the spirit of true nationalism, because he understands the word nation to mean a kind of universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a state of things, however, does not exist. Nor is it desirable that it should exist. India is a land of racial and religious variety. Add to this the general economic inferiority of the Muslims, their enormous debt, especially in the Punjab, and their insufficient majorities in some of the provinces as at present constituted, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorates. In such a country and in such circumstances territorial electorates cannot secure adequate representation of all interests, and must inevitably lead to the creation of an oligarchy. The Muslims of India can have no objection to purely territorial electorates if provinces are demarcated so as to secure comparatively homogeneous communities possessing linguistic, racial, cultural and religious unity.

Federation As Understood in the Simon Report

But in so far as the question of the powers of the Central Federal State is concerned, there is a subtle difference of motive in the constitutions proposed by the pundits of India and the pundits of England. The pundits of India do not disturb the Central authority as it stands at present. All that they desire is that this authority should become fully responsible to the Central Legislature which they maintain intact and where their majority will become further reinforced on the nominated element ceasing to exist. The pundits of England, on the other hand, realising that democracy in the Centre tends to work contrary to their interests and is likely to absorb the whole power now in their hands, in case a further advance is made towards responsible government, have shifted the experience of democracy from the Centre to the provinces. No doubt, they introduce the principle of Federation and appear to have made a beginning by making certain proposals; yet their evaluation of this principle is determined by considerations wholly different to those which determine its value in the eyes of Muslim India. The Muslims demand federation because it is pre-eminently a solution of India's most difficult problem, i.e. the communal problem. The Royal Commissioners' view of federation, though sound in principle, does not seem to aim at responsible government for federal States. Indeed it does not go beyond providing means of escape from the situation which the introduction of democracy in India has created for the British, and wholly disregards the communal problem by leaving it where it was.

Thus it is clear that, in so far as real federation is concerned, the Simon Report virtually negatives the principle of federation in its true significance. The Nehru Report, realising [a] Hindu majority in the Central Assembly, reaches a unitary form of government because such an institution secures Hindu dominance throughout India; the Simon Report retains the present British dominance behind the thin veneer of an unreal federation, partly because the British are naturally unwilling to part with the power they have so long wielded and partly because it is possible for them, in the absence of an inter-communal understanding in India, to make out a plausible case for the retention of that power in their own hands. To my mind a unitary form of government is simply unthinkable in a self-governing India.

What is called 'residuary powers' must be left entirely to self-governing States, the Central Federal State exercising only those powers which are expressly vested in it by the free consent of federal States. I would never advise the Muslims of India to agree to a system, whether of British or of Indian origin, which virtually negatives the principle of true federation, or fails to recognise them as a distinct political entity.

Federal Scheme As Discussed in the Round Table Conference

The necessity for a structural change in the Central Government was seen probably long before the British discovered the most effective means for introducing this change. That is why at rather a late stage it was announced that the participation of the Indian Princes in the Round Table Conference was essential. It was a kind of surprise to the people of India, particularly the minorities, to see the Indian Princes dramatically expressing their willingness at the Round Table Conference to join an all-India federation and, as a result of their declaration, Hindu delegates – uncompromising advocates of a unitary form of government – quietly agreeing to the evolution of a federal scheme. Even Mr. Sastri who only a few days before had severely criticised Sir John Simon for recommending a federal scheme for India, suddenly became a convert and admitted his conversion in the plenary session of the Conference – thus offering the Prime Minister of England an occasion for one of his wittiest observations in his concluding speech. All this has a meaning both for the British who have sought the participation of the Indian Princes, and for the Hindus who have unhesitatingly accepted the evolution of an all-India federation. The truth is that the participation of the Indian Princes, among whom only a few are Muslims, in a federation scheme serves a double purpose. On the one hand, it serves as an all-important factor in maintaining the British power in India practically as it is; on the other hand, it gives [an] overwhelming majority to the Hindus in an All-India Federal Assembly.

It appears to me that the Hindu-Muslim differences regarding the ultimate form of the Central Government are being cleverly exploited by British politicians through the agency of the Princes who see in the scheme prospects of better security for their despotic rule. If the Muslims silently agree to any such scheme, it will simply hasten their end as a political entity in India. The policy of the Indian federation thus created, will be practically controlled by [the] Hindu Princes forming the largest group in the Central Federal Assembly. They will always lend their support to the Crown in matters of Imperial concern; and in so far as internal administration of the country is concerned, they will help in maintaining and strengthening the supremacy of the Hindus. In other words, the scheme appears to be aiming at a kind of understanding between Hindu India and British Imperialism – you perpetuate me in India, and I in return give you a Hindu oligarchy to keep all other Indian communities in perpetual subjection. If, therefore, the British Indian provinces are not transformed into really autonomous States, the Princes' participation in a scheme of Indian federation will be interpreted only as a dexterous move on the part of British politicians to satisfy, without parting with any real power, all parties concerned – Muslims with the word federation; Hindus with a majority in the Centre; the British Imperialists – with the substance of real power.

The number of Hindu States in India is far greater than Muslim States; and it remains to be seen how the Muslim demand for 33 percent [of the] seats in the Central Federal Assembly is to be met within a House or Houses constituted of representatives taken from British India as well as Indian States. I hope the Muslim delegates are fully aware of the implications of the federal scheme as discussed in the Round Table Conference. The question of Muslim representation in the proposed all-India federation has not yet been discussed. 'The interim report,' says Reuters' summary, 'contemplates two chambers in the Federal Legislature, each containing representatives both of British India and States.

the proportion of which will be a matter of subsequent consideration under the heads which have not yet been referred to the Sub-Committee.' In my opinion the question of proportion is of the utmost importance and ought to have been considered simultaneously with the main question of the structure of the Assembly.

The best course, I think, would have been to start with a British Indian Federation only. A federal scheme born of an unholy union between democracy and despotism cannot but keep British India in the same vicious circle of a unitary Central Government. Such a unitary form may be of the greatest advantage to the British, to the majority community in British India, and to the Indian Princes; it can be of no advantage to the Muslims, unless they get majority rights in five out of eleven Indian provinces with full residuary powers, and one-third share of seats in the total House of the Federal Assembly. In so far as the attainment of sovereign powers by the British Indian provinces is concerned, the position of His Highness the Ruler of Bhopal, Sir Akbar Hydari, and Mr. Jinnah is unassailable. In view, however, of the participation of the Princes in the Indian Federation, we must now see our demand for representation in the British Indian Assembly in a new light. The questions is not one of [the] Muslim share in a British Indian Assembly, but one which relates to representation of British Indian Muslims in an All-India Federal Assembly. Our demand for 33 per cent must now be taken as a demand for the same proportion in the All-India Federal Assembly, exclusive of the share allotted to the Muslim states entering the Federation.

The Problem of Defence

The other difficult problem which confronts the successful working of a federal system in India is the problem of India's defence. In their discussion of this problem the Royal Commissioners have marshalled all the deficiencies of India in order to make out a case for Imperial administration of the Army. 'India and Britain,' say the Commissioners, 'are so related that India's defence cannot, now or in any future which is within sight, be regarded as a matter of purely Indian concern. The control and direction of such an army must rest in the hands of agents of Imperial Government.' Now, does it [not] necessarily follow from this that further progress towards the realisation of responsible government in British India is barred until the work of defence can be adequately discharged without the help of British officers and British troops? As things are, there is a block on the line of constitutional advance. All hopes of evolution in the Central Government towards the ultimate goal prescribed in the declaration of 20th August 1917, are in danger of being indefinitely frustrated, if the attitude illustrated by the Nehru Report is maintained, that any future change involves the putting of the administration of the army under the authority of an elected Indian Legislature. Further to fortify their argument they emphasize the fact of competing religions and rival races of widely different capacity, and try to make the problem look insoluble by remarking that 'the obvious fact that India is not, in the ordinary and natural sense, a single nation is nowhere made more plain than in considering the difference between the martial races of India and the rest.' These features of the question have been emphasised in order to demonstrate that the British are not only keeping India secure from foreign menace but are also the 'neutral guardians' of internal security.

However, in federated India, as I understand federation, the problem will have only one aspect, i.e. external defence. Apart from provincial armies necessary for maintaining internal peace, the Indian Federal Congress can maintain, on the north-west frontier, a strong Indian Frontier Army, composed of units recruited from all provinces and officered by efficient and experienced military men taken from all communities. I know that India is not in possession of efficient military officers, and this fact is exploited by the Royal Commissioners in the interest of an argument for Imperial administration. On this point

I cannot but quote another passage from the Report which, to my mind, furnishes the best argument against the position taken up by the Commissioners. 'At the present moment,' says the Report, 'no Indian holding the King's Commission is of higher army rank than a captain. There are, we believe, 39 captains of whom 25 are in ordinary regimental employ. Some of them are of an age which would prevent their attaining much higher rank, even if they passed the necessary examination before retirement. Most of these have not been through Sandhurst, but got their Commissions during the Great War.' Now, however genuine may be the desire, and however earnest the endeavour to work for this transformation, overriding conditions have been so forcibly expressed by the Skeen Committee (whose members, apart from the Chairman and the Army Secretary, were Indian gentlemen) in these words: Progress...must be contingent upon success being secured at each stage and upon military efficiency being maintained, though it must in any case render such development measured and slow. A higher command cannot be evolved at short notice out of existing cadres of Indian officers, all of junior rank and limited experience. Not until the slender trickle of suitable Indian recruits for the officer class – and we earnestly desire an increase in their numbers – ows in much greater volume, not until sufficient Indians have attained the experience and training requisite to provide all the officers for, at any rate, some Indian regiments, not until such units have stood the only test which can possibly determine their efficiency, and not until Indian officers have qualified by a successful army career for the high command, will it be possible to develop the policy of Indianisation to a point which will bring a completely Indianised army within sight. Even then years must elapse before the process could be completed.'

Now I venture to ask: who is responsible for the present state of things? Is it due to some inherent incapacity of our martial races, or to the slowness of the process of military training? The military capacity of our martial races is undeniable. The process of military training may be slow as compared to other processes of human training. I am no military expert to judge this matter. But as a layman I feel that the argument, as stated, assumes the process to be practically endless. This means perpetual bondage for India, and makes it all the more necessary that the Frontier Army, as suggested by the Nehru Report, be entrusted to the charge of a committee of defence, the personnel of which may be settled by mutual understanding.

Again, it is significant that the Simon Report has given extraordinary importance to the question of India's land frontier, but has made only passing references to its naval position. India has doubtless had to face invasions from her land frontier; but it is obvious that her present masters took possession of her on account of her defenceless sea coast. A self-governing and free India will, in these days, have to take greater care of her sea coast than [of her] land frontiers.

I have no doubt that if a Federal Government is established, Muslim federal States will willingly agree, for purposes of India's defence, to the creation of neutral Indian military and naval forces. Such a neutral military force for the defence of India was a reality in the days of Mughal rule. Indeed in the time of Akbar the Indian frontier was, on the whole, defended by armies officered by Hindu generals. I am perfectly sure that the scheme for a neutral Indian army, based on a federated India, will intensify Muslim patriotic feeling, and finally set at rest the suspicion, if any, of Indian Muslims joining Muslims from beyond the frontier in the event of an invasion.

The Alternative

I have thus tried brie y to indicate the way in which the Muslims of India ought, in my opinion, to look at the two most important constitutional problems of India. A redistribution of British India, calculated to secure a permanent solution of the communal problem, is the main demand of the Muslims of India. If, however, the Muslim demand of a territorial solution of the communal problem is ignored, then I support, as emphatically as possible, the Muslim demands repeatedly urged by the All-India Muslim League and the All-India Muslim Conference. The Muslims of India cannot agree to any constitutional changes which affect their majority rights, to be secured by separate electorates in the Punjab and Bengal, or [which] fail to guarantee them 33 percent representation in any Central Legislature. There were two pitfalls into which Muslim political leaders fell. The first was the repudiated Lucknow Pact, which originated in a false view of Indian nationalism and deprived the Muslims of India of chances of acquiring any political power in India. The second is the narrow-visioned sacrifice of Islamic solidarity, in the interests of what may be called Punjab ruralism, resulting in a proposal which virtually reduces the Punjab Muslims to a position of minority. It is the duty of the League to condemn both the Pact and the proposal.

The Simon Report does great injustice to the Muslims in not recommending a statutory majority for the Punjab and Bengal. It would make the Muslims either stick to the Lucknow Pact or agree to a scheme of joint electorates. The despatch of the Government of India on the Simon Report admits that since the publication of that document the Muslim community has not expressed its willingness to accept any of the alternatives proposed by the Report. The despatch recognises that it may be a legitimate grievance to deprive the Muslims in the Punjab and Bengal of representation in the councils in proportion to their population merely because of weightage allowed to Muslim minorities elsewhere. But the despatch of the Government of India fails to correct the injustice of the Simon Report. In so far as the Punjab is concerned – and this is the most crucial point – it endorses the so-called Ôcarefully balanced schemeÕ worked out by the official members of the Punjab Government which gives the Punjab Muslims a majority of two over Hindus and Sikhs combined, and a proportion of 49 percent of the House as a whole. It is obvious that the Punjab Muslims cannot be satisfied with less than a clear majority in the total House. However, Lord Irwin and his Government do recognise that the justification for communal electorates for majority communities would not cease unless and until by the extension of franchise their voting strength more correctly re ects their population; and further unless a two-thirds majority of the Muslim members in a provincial Council unanimously agree to surrender the right of separate representation. I cannot, however, understand why the Government of India, having recognised the legitimacy of the Muslim grievances, have not had the courage to recommend a statutory majority for the Muslims in the Punjab and Bengal.

Nor can the Muslims of India agree to any such changes which fail to create at least Sind as a separate province and treat the North-West Frontier Province as a province of inferior political status. I see no reason why Sind should not be united with Baluchistan and turned into a separate province. It has nothing in common with Bombay Presidency. In point of life and civilization the Royal Commissioners find it more akin to Mesopotamia and Arabia than India. The Muslim geographer Mas'udi noticed this kinship long ago when he said: 'Sind is a country nearer to the dominions of Islam.' The first Omayyad ruler is reported to have said of Egypt: 'Egypt has her back towards Africa and face towards Arabia.' With necessary alterations the same remark describes the exact situation of Sind. She has her back towards India and face towards Central Asia. Considering further the nature of her agricultural problems which can invoke no sympathy from the Bombay Government, and her infinite commercial possibilities, dependent on the inevitable growth of Karachi into

a second metropolis of India, it is unwise to keep her attached to a Presidency which, though friendly today, is likely to become a rival at no distant period. Financial difficulties, we are told, stand in the way of separation. I do not know of any definite authoritative pronouncement on the matter. But assuming there are any such difficulties, I see no reason why the Government of India should not give temporary financial help to a promising province in her struggle for independent progress.

As to the North-West Frontier Province, it is painful to note that the Royal Commissioners have practically denied that the people of this province have any right to reform. They fall far short of the Bray Committee, and the Council recommended by them is merely a screen to hide the autocracy of the Chief Commissioner. The inherent right of the Afghan to light a cigarette is curtailed merely because he happens to be living in a powder house. The Royal Commissioners' epigrammatic argument is pleasant enough, but far from convincing. Political reform is light, not fire; and to light every human being is entitled, whether he happens to live in a powder house or a coal mine. Brave, shrewd, and determined to suffer for his legitimate aspirations, the Afghan is sure to resent any attempt to deprive him of opportunities of full self-development. To keep such a people contented is in the best interest of both England and India. What has recently happened in that unfortunate province is the result of a step-motherly treatment shown to the people since the introduction of the principle of self-government in the rest of India. I only hope that British statesmanship will not obscure its view of the situation by hoodwinking itself into the belief that the present unrest in the province is due to any extraneous causes.

The recommendation for the introduction of a measure of reform in the North-West Frontier Province made in the Government of India's despatch is also unsatisfactory. No doubt, the despatch goes farther than the Simon Report in recommending a sort of representative Council and a semi-representative cabinet, but it fails to treat this important Muslim province on [an] equal footing with other Indian provinces. Indeed the Afghan is, by instinct, more fitted for democratic institutions than any other people in India.

The Round Table Conference

I think I am now called upon to make a few observations on the Round Table Conference. Personally I do not feel optimistic as to the results of this Conference. It was hoped that away from the actual scene of communal strife and in a changed atmosphere, better counsels would prevail and a genuine settlement of the differences between the two major communities of India would bring India's freedom within sight. Actual events, however, tell a different tale. Indeed, the discussion of the communal question in London has demonstrated more clearly than ever the essential disparity between the two great cultural units of India. Yet the Prime Minister of England apparently refuses to see that the problem of India is international and not national. He is reported to have said that 'his government would find it difficult to submit to Parliament proposals for the maintenance of separate electorates, since joint electorates were much more in accordance with British democratic sentiments.' Obviously he does not see that the model of British democracy cannot be of any use in a land of many nations; and that a system of separate electorates is only a poor substitute for a territorial solution of the problem. Nor is the Minorities Sub-Committee likely to reach a satisfactory settlement. The whole question will have to go before the British Parliament; and we can only hope that the keen-sighted representatives of [the] British nation, unlike most of our Indian politicians, will be able to pierce through the surface of things and see clearly the true fundamentals of peace and security in a country like India. To base a constitution on the concept of a homogeneous India, or to apply to India principles dictated by British democratic sentiments, is unwittingly to prepare her

for a civil war. As far as I can see, there will be no peace in the country until the various peoples that constitute India are given opportunities of free self-development on modern lines without abruptly breaking with their past.

I am glad to be able to say that our Muslim delegates fully realise the importance of a proper solution of what I call [the] Indian international problem. They are perfectly justified in pressing for a solution of the communal question before the question of responsibility in the Central Government is finally settled. No Muslim politician should be sensitive to the taunt embodied in that propaganda word – communalism – expressly devised to exploit what the Prime Minister calls British democratic sentiments, and to mislead England into assuming a state of things which does not really exist in India. Great interests are at stake. We are 70 millions, and far more homogeneous than any other people in India. Indeed the Muslims of India are the only Indian people who can fitly be described as a nation in the modern sense of the word. The Hindus, though ahead of us in almost all respects, have not yet been able to achieve the kind of homogeneity which is necessary for a nation, and which Islam has given you as a free gift. No doubt they are anxious to become a nation, but the process of becoming a nation is kind of travail, and in the case of Hindu India involves a complete overhauling of her social structure.

Nor should the Muslim leaders and politicians allow themselves to be carried away by the subtle but fallacious argument that Turkey and Persia and other Muslim countries are progressing on national, i.e. territorial, lines. The Muslims of India are differently situated. The countries of Islam outside India are practically wholly Muslim in population. The minorities there belong, in the language of the Quran, to the 'people of the Book'. There are no social barriers between Muslims and the 'people of the Book'. A Jew or a Christian or a Zoroastrian does not pollute the food of a Muslim by touching it, and the law of Islam allows intermarriage with the 'people of the Book'. Indeed the first practical step that Islam took towards the realisation of a final combination of humanity was to call upon peoples possessing practically the same ethical ideal to come forward and combind. The Quran declares: 'O people of the Book! Come, let us join together on the 'word' (Unity of God), that is common to us all.' The wars of Islam and Christianity, and later, European aggression in its various forms, could not allow the infinite meaning of this verse to work itself out in the world of Islam. Today it is being gradually realised in the countries of Islam in the shape of what is called Muslim Nationalism.

It is hardly necessary for me to add that the sole test of the success of our delegates is the extent to which they are able to get the non-Muslim delegates of the Conference to agree to our demands as embodied in the Delhi Resolution. If these demands are not agreed to, then a question of a very great and far-reaching importance will arise for the community. Then will arrive the moment for independent and concerted political action by the Muslims of India. If you are at all serious about your ideals and aspirations, you must be ready for such an action. Our leading men have done a good deal of political thinking, and their thought has certainly made us, more or less, sensitive to the forces which are now shaping the destinies of peoples in India and outside India. But, I ask, has this thinking prepared us for the kind of action demanded by the situation which may arise in the near future?

Let me tell you frankly that, at the present moment, the Muslims of India are suffering from two evils. The first is the want of personalities. Sir Malcolm Hailey and Lord Irwin were perfectly correct in their diagnosis when they told the Aligarh University that the community had failed to produce leaders. By leaders I mean men who, by Divine gift or experience, possess a keen perception of the spirit and destiny of Islam, along with an equally keen perception of the trend of modern history. Such men are really the driving forces of a people, but they are God's gift and cannot be made to order.

The second evil from which the Muslims of India are suffering is that the community is fast losing what is called the herd instinct. This [loss] makes it possible for individuals and groups to start independent careers without contributing to the general thought and activity of the community. We are doing today in the domain of politics what we have been doing for centuries in the domain of religion. But sectional bickerings in religion do not do much harm to our solidarity. They at least indicate an interest in what makes the sole principle of our structure as a people. Moreover, the principle is so broadly conceived that it is almost impossible for a group to become rebellious to the extent of wholly detaching itself from the general body of Islam. But diversity in political action, at a moment when concerted action is needed in the best interests of the very life of our people, may prove fatal.

How shall we, then, remedy these two evils? The remedy of the first evil is not in our hands. As to the second evil, I think it is possible to discover a remedy. I have got definite views on the subject; but I think it is proper to postpone their expression till the apprehended situation actually arises. In case it does arise, leading Muslims of all shades of opinion will have to meet together, not to pass resolutions, but finally to determine the Muslim attitude and to show the path to tangible achievement. In this address I mention this alternative only because I wish that you may keep it in mind and give some serious thought to it in the meantime.

The Conclusion

Gentlemen, I have finished. In conclusion I cannot but impress upon you that the present crisis in the history of India demands complete organisation and unity of will and purpose in the Muslim community, both in your own interest as a community, and in the interest of India as a whole. The political bondage of India has been and is a source of infinite misery to the whole of Asia. It has suppressed the spirit of the East and wholly deprived her of that joy of self-expression which once made her the creator of a great and glorious culture. We have a duty towards India where we are destined to live and die. We have a duty towards Asia, especially Muslim Asia. And since 70 millions of Muslims in a single country constitute a far more valuable asset to Islam than all the countries of Muslim Asia put together, we must look at the Indian problem not only from the Muslim point of view, but also from the standpoint of the Indian Muslim as such. Our duty towards Asia and India cannot be loyally performed without an organised will fixed on a definite purpose. In your own interest, as a political entity among other political entities of India, such an equipment is an absolute necessity.

Our disorganised condition has already confused political issues vital to the life of the community. I am not hopeless of an intercommunal understanding, but I cannot conceal from you the feeling that in the near future our community may be called upon to adopt an independent line of action to cope with the present crisis. And an independent line of political action, in such a crisis, is possible only to a determined people, possessing a will focalised by a single purpose. Is it possible for you to achieve the organic wholeness of a unified will? Yes, it is. Rise above sectional interests and private ambitions, and learn to determine the value of your individual and collective action, however directed on material ends, in the light of the ideal which you are supposed to represent. Pass from matter to spirit. Matter is diversity; spirit is light, life and unity.

One lesson I have learnt from the history of Muslims. At critical moments in their history it is Islam that has saved Muslims and not vice versa. If today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever-vitalising idea embodied in it, you will be only reassembling your scattered forces, regaining your lost integrity, and thereby saving yourself from total destruction. One of the profoundest verses in the Holy Quran teaches us that the birth and rebirth of the whole of humanity is like the birth and rebirth of a single individual. Why cannot you who, as a people, can well claim to be the first practical

exponents of this superb conception of humanity, live and move and have your being as a single individual? I do not wish to mystify anybody when I say that things in India are not what they appear to be. The meaning of this, however, will dawn upon you only when you have achieved a real collective ego to look at them.

In the words of the Quran, 'Hold fast to yourself; no one who erreth can hurt you, provided you are well guided."' (5:104).[১২৯]

আট

চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান

"...স্যার মুহম্মদ ইকবালের ভাষণ দানের তারিখ ছিল ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর। সে থেকে দুই বছর পর চৌধুরী রহমত আলী আবেদন আকারে একটি প্যাম্ফলেট প্রকাশ করেন। তিনি প্যাম্ফলেটের নাম দেন 'Now or Never' - এখনই অথবা কখনো নয়। পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চৌধুরী রহমত আলী এই প্যাম্ফলেট প্রকাশ করেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ দলিলে এই প্রথম 'পাকিস্তান' নামটি পাওয়া যায়।

৩ হাম্বারস্টোন রোড ক্যামব্রিজ, ইংল্যান্ড ২৮ শে জানুয়ারি, ১৯৩৩ ইং

PAKISTAN-এর ত্রিশ মিলিয়ন মুসলমানের পক্ষে আমি এই সঙ্গে যুক্ত আবেদনটি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করছি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের Punjab, North-West Frontier (Afghan) Province, Kashmir, Sind ও Baluchistan - এই পাঁচটি ইউনিটে বর্ণিত মুসলমানগণের বসবাস। আমার আবেদনে তাদের জাতীয় পরিচয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিচয় ভারতের অন্য অধিবাসীদের পরিচয় থেকে পৃথক। ধর্ম, সমাজ এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের একটি পৃথক ফেডারেল সাংবিধানিক অবস্থানকে স্বীকার করে নিলেই মুসলমানদের পৃথক পরিচয় স্বীকার করা হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব ভারতে বিদ্যমান বিপুল হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান বিষয়ে আমার প্রস্তাবিত সমাধান সম্পর্কে আপনারা যদি আপনাদের সুচিন্তিত মূল্যবান মতামত আমাকে অবহিত করেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা নিজেরাও যেহেতু এই বিপুল-জটিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান চান, আমার আবেদনে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ আপনাদের পূর্ণ অনুমোদন ও সক্রিয় সমর্থন পাবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত, রহমত আলী (চৌধুরী) (প্রতিষ্ঠাতা, পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলন) প্রথম ইস্যু করা হয় ১৯৩৩ সালে, পুনরায় ইস্যু করা হয় ১৯৩৪ সালে।

এখনই অথবা কখনো নয় আমরা কি বাঁচব নাকি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাব?

ভারতের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, যখন ব্রিটিশ ও ভারতীয় ডেলিগেটগণ উপমহাদেশের জন্যে ফেডারেল সংবিধানের ভিত্তি রচনা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তখন আমরা আপনাদের কাছে এই আবেদন রাখছি, আমাদের সাধারণ ঐতিহ্যের নামে, এবং ত্রিশ মিলিয়ন মুসলমান ভাইয়ের নামে যারা PAKISTAN-এ বাস করেন। PAKISTAN বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ভারতের পাঁচটি উত্তরাঞ্চলীয় ইউনিট, অর্থাৎ Punjab, North-West Frontier Province (Afghan Province), Kashmir, Sind এবং Baluchistan। আমরা কঠোর সংগ্রাম করছি রাজনৈতিকভাবে আমাদের যে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বা জাতিগতভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে আমরা আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থন প্রত্যাশা করি।

---

১২৯. Source : Speeches, Writings, and Statements of Iqbal/Latif Ahmed Sherwani| [Iqbal Academy (Lahore) - 1977| p. 3-26|

আমাদের সাহসী কিন্তু অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের হিন্দু জাতীয়তাবাদের বেদিতে শুধু অমুসলমান বলি দিচ্ছে না, লজ্জার কথা আমাদের কিছু তথাকথিত নেতাও সে কাজ করছেন। তারা আমাদের প্রতি বা ইতিহাসের সতর্কবাণী সম্পর্কে পরোয়া করছেন না।

গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমান ডেলিগেটগণ অমার্জনীয় ভুল ও অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে মুসলমানদের চিরঅধীনতায় আবদ্ধ করেছেন। তারা কোনো প্রতিবাদ না নির্বিবাদে সর্বভারতীয় ফেডারেশন মেনে নিয়েছেন। এমন স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ও তার মুসলমানদের মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর করার চেয়ে কম কিছু নয়।

তাদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করার জন্যে তারা তথাকথিত মিল্লাতের মত গ্রহণের কথা বলে থাকেন। কি তারা ভুলে যান যে এই আত্মঘাতী ম্যানডেট কখনো তারা নিজ হাতে প্রণয়ন করেনি। এটা ভার মুসলমানদের ম্যানডেট নয়। জাতি কখনো তার প্রতিনিধিদের এই ম্যানডেট দেয়নি যে তারা তার আ বিনিময় করে দেবে। বিবেকবান মানুষ কখনো এই আত্মঘাতী ম্যানডেট স্বীকার করবে না। এমন ম্যান প্রদত্ত হলেও তারা তা বাস্তবায়িত করবেন না। এই কঠিন সময়ে ও এই সংকটকালে রাজনীতিবিদদের প থেকে ন্যায়সংগত ও নির্ভয় নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন। গেল ৭৫ বছরে আমাদের সহযোগী ৮০ মিলিয় অমুসলিম ভারতীয়দের সামনে এমন নেতৃত্ব কখনো উপস্থাপিত করা হয়নি। কার্যত দীর্ঘ সময়ে আম মিথ্যা ইস্যু, হারানো সুযোগ নিয়ে কাজ করেছি, অতি জরুরি মুসলিম স্বার্থের প্রতি চোখ বুজে রয়েছি। এম ঘটেছে, কেননা, নেতারা সব সময়ই ছিলেন পরাভববাদী, কর্মক্ষমতাহীন, স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ব্যর্থ তারা অসততা, ভয় ও সংশয়ে পঙ্গু, এবং বহু উপলক্ষে সুবিধাবাদ ও ক্যারিয়ার গড়ে তোলার লো নিজেদের রাজনৈতিক ন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়েছেন। বলতে কি এই কঠিন মুহূর্তেও তারা প্রবঞ্চনার নী অনুসরণ করেছেন। এই বিয়োগান্ত সত্যকে যদি আমরা দেখতে না পাই তাহলে সে আমাদের জন্যে ভয়ং হবে। আমরা যদি এখন চোখ বন্ধ করে থাকি, তা হলে কঠোরতর সত্য আমাদের আঘাত করবে।

এই সংকটময় সময়ে যখন এই বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটছে, তখন আমরা আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে আবেদন করছি আপনারা আমাদের প্রতি কার্যকর সহানুভূতি ও সমর্থন দান করুন যেন আমরা একটি পৃথক মুসলিম ফেডারেশন গঠন করতে পারি। সেটি হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের জীবন-মরণ প্রশ্ন। নিচে এই ফেডারেশন গঠনের রূপরেখা বর্ণনা করছি।

ভারতকে এখন যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি সে কোনো একটি দেশের নাম নয়। কোনো একটি জাতির বাসস্থানও নয়। ভারতকে নিয়ে ব্রিটিশ এই প্রথম একটি রাষ্ট্র গঠন করল। এই ভারতরাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণ ইতিহাসের কোনো পর্বেই এক জাতি ছিল না। অপর দিকে ইতিহাসের সূচনা থেকে ব্রিটিশের আগমন পর্যন্ত নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয়তায় বিভক্ত ছিল।

আমাদের মুসলিম জাতি তাদের অন্যতম। ভারতের পাঁচটি উত্তরাঞ্চলীয় ৪০ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৩০ মিলিয়ন মুসলমান। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ ব্যবস্থা ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলের বসবাসরত অন্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। যেসব আদর্শ আমাদের জনগণকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করে তা হিন্দুদের আদর্শ থেকে একান্তই পৃথক। এই পার্থক্যগুলো শুধু মৌলিক সাধারণ নীতিমাত্র নয়। সেসব আমাদের জীবনের অনুপুঙ্খ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মের সঙ্গে যুক্ত। আমরা একে অন্যে মিলে ভোজন করি না, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের রীতি নাই। আমাদের জাতীয় আচরণরীতি, ঘটনাসূচি, এমন কি আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পৃথক।

মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যেকার পার্থক্যকে অনেকে অগ্রহণযোগ্যভাবে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যেকার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয়েই অভিন্ন ধর্মব্যবস্থা খ্রিস্টধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মব্যবস্থার অনুসারী। খ্রিস্টানদের কাছে

ধর্মবিষয়টি ব্যক্তিগত মতের ব্যাপার, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই ধর্ম ব্যক্তিগত মতের বিষয় নয়। বরং এরা হচ্ছে সামাজিক ধর্ম, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মের বিধি বিধান পালন করতে হয়।

যদি আমাদের, পাকিস্তানের মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পৃথক জাতীয়তা থাকা সত্ত্বেও শত্রু বা বন্ধু যে কারো দ্বারা প্রস্তাবিত ভারতীয় ফেডারেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আমরা অতি সংখ্যালঘু হয়ে যাই। আমাদের সংখ্যানুপাত হয় দশে এক। সংখ্যায় এমনহ্রাস পাওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের পাকিস্তানি জাতির মৃত্যুঘণ্টা বাজা। এই আসন্ন বিপর্যয়ের গুরুত্ব বুঝবার জন্যে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ৩০ মিলিয়ন মুসলমান বিশ্ব মুসলমান জনসংখ্যার দশ ভাগের এক। পাকিস্তানের পাঁচটি অংশের একত্রে যে ভূমি-বিস্তৃতি তা ইতালির চারগুণ, জার্মানির তিনগুণ, ফ্রান্সের তিনগুণ। সেখানকার জনসংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সাতগুণ, কানাডার জনসংখ্যার চারগুণ, স্পেনের জনসংখ্যার দ্বিগুণ, ফ্রান্স ও ইতালির মিলিত জনসংখ্যার সমান।

এসব হচ্ছে ঘটনা, কঠিন ঘটনা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে-কাউকে চ্যালেঞ্জ করি, পারলে যুক্তি খণ্ডন করুন। এই সব ঘটনা ও বাস্তবতার পটভূমিতে কোনো প্রকার যুক্তি খণ্ডনের ভয় অগ্রাহ্য করে আমরা নির্ভয়ে বলতে চাই যে, আমরা পাকিস্তানের মুসলমানরা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয়তা ধারণ করি, যা হিন্দুদের জাতীয়তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুরা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বসবাস করে। তারা হিন্দু জাতি। নিশ্চয়ই তাদেরও বাঁচার অধিকার আছে। ভারতের অবশিষ্ট অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পাকিস্তানের ফেডারেল সাংবিধানিক অধিকার স্বীকার করে পাকিস্তানি জাতীয় অবস্থানকে স্বীকার করে নেওয়া হোক।

আমরা আপনাদের কাছে এবং ভারতের সকল মুসলমানের কাছে এই আবেদন রাখছি। এবং আবেদন রাখছি অপর দুই দল - ব্রিটিশ ও হিন্দু, যারা ভূমিকা রাখবে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্যে। তাদের বুঝতে হবে যে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সঙ্গে আমাদের আত্মা ও দেহের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের থাকা এবং ভালো থাকা এর ওপর নির্ভর করে। শুধু আমাদের কেন ভারতের সকল জাতির ভালো থাকা এর ওপর নির্ভর করে। কাজেই ভবিষ্যৎ সমস্যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে, সকলের জন্যে ন্যায় হতে হবে। ইচ্ছে করলেই তারা এমন সমাধানে উপনীত হতে পারে।

এই ধারণা এই বিশেষভাবে সত্যি এমন সময়ে যখন তারা এই স্বার্থপর সমাধান প্রস্তাব উত্থাপন করছে এবং যখন যুক্তিসংগত বিকল্প প্রস্তাব রয়েছে। এই বিকল্প প্রস্তাব সমগ্র উপমহাদেশের জন্যে শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্মাণের পটভূমি গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে সকলের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের এবং কাউকে কারো ওপর নির্ভরশীল না করে। একটি পৃথক মুসলিম ফেডারেশন সংস্থাপন হচ্ছে এই বিকল্প প্রস্তাব। কমপক্ষে আমাদের পাঁচটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিট নিয়ে এই মুসলিম ফেডারেশন গঠিত হবে। ইউনিটসমূহ হচ্ছে - Punjab, North-West Frontier Province (Afghan Province), Kashmir, Sind and Baluchistan।

ডক্টর স্যার মুহম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে যে দাবি উত্থাপন করেছিলেন আমাদের বর্তমান দাবি সে থেকে মূলত পৃথক। প্রস্তাবিত পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে চারটি প্রদেশ নিয়ে তিনি একটি রাজ্য গঠনের দাবি করেছিলেন। সে ধারণামতো এই রাজ্য হবে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের একটি ইউনিট। আমাদের প্রস্তাব যে এই পাঁচটি প্রদেশ মিলে ভারত ফেডারেশনের বাইরে একটি পৃথক ফেডারেশন গঠিত হবে। আমরা নিশ্চিত যে হিন্দু প্রভাবিত ফেডারেশনে মুসলমানদের ঢুকিয়ে নিলে ভারতের শান্তি সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব নয়। আমাদের হতে হবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা ও আমাদের আত্মার সারথি।

রক্ষাকবচ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কনফারেন্সে আমাদের জন্যে রক্ষাকবচ নিয়ে যে প্রস্তাব করা হচ্ছে সে কি সত্যি সত্যি আমাদের ভাবনা অনুযায়ী আমাদের পরিত্রাণ করতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে নৈরাশ্যের মুখোমুখী হব কোনো রক্ষাকবচ সে থেকে আমাদের পরিত্রাণ করতে পারবে? আমাদের যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয় পরিচয় তা যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আমাদের যে জাগ্রত জাতীয় চেতনা, তার ক্ষতি কে পূরণ করবে? কেননা শাখা ও বিভাগসমূহ যেমন প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, ডাক ও তার, অর্থ, ট্যাক্স ও কাস্টমস, - এসব থাকবে না, সেগুলো থাকবে ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সে সরকার দুর্দান্তভাবে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আমরা মুসলমানরা কী আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব, যখন সেসব লক্ষ্য হিন্দু লক্ষ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে আসবে? আর কথা হচ্ছে আদর্শের সংঘর্ষতো হবেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গেল শতাব্দী আমাদের জন্যে সাবধান-সংকেতে ভরা। আপনারা সেসব পড়ে দেখতে পারেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রক্ষাকবচ বা নিশ্চয়তা যাই থাকুক না কেন অতীতে, আমাদের যে জাতীয় ভাষা উর্দু, যা কি না ভারতের লিংগুয়া ফ্রাংকা এখনো পর্যন্ত, তাকে ভারতীয় ভাষাসমূহের তালিকায় রাখা হয়নি। সর্বশেষ আদমশুমারি রিপোর্ট পড়ে দেখুন। সে এক বিয়োগান্ত পতন। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্যে যে বিপুল বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, তার মধ্যে এই ভাষা বিষয়টি অতি ক্ষুদ্র। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ জাতি হিসেবে আমাদের আত্মপ্রকাশের জন্যে যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা রয়েছে, উর্দুর সমস্যা ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই সব অবিসংবাদিত ঘটনার মুখোমুখী হয়ে আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে পারি, আমরা যে আমাদের জাতীয়তা বিসর্জন দিতে যাচ্ছি এবং আমাদের ও আমাদের উত্তর প্রজন্মকে অমুসলমানদের আধিপত্য স্বীকার করাতে যাচ্ছি, সে কিসের জন্যে? আমরা বিষয়টি বুঝতে পারছি না। তাদের মুখ রক্ষার জন্যে আমাদের ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে? এই মিথ্যে ধারণা প্রমাণ করার জন্যে যে, ভারত এক জাতির দেশ? ইসলাম ও মুসলমানের কী লাভ হবে ভারতীয় ফেডারেশনে যোগ দিলে? যেকোনো মূল্যে সহমর্মিতা হতেই হবে? অথবা এই ভয়ানক বিভ্রমকে সমর্থন করতে হবে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের স্বার্থে কাজ করতে পারে? এমন প্রকৃতির ও এমন ব্যাপক মতিভ্রম ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। অতীতে নির্বিবাদে আমরা নিগৃহীত হয়েছি, নির্বিবাদে আমরা বিপদের মোকাবিলা করেছি। কিন্তু আমাদের দম আটকে মারার কৌশলকে আমরা কখনো মেনে নেব না। হিন্দু জাতীয়তাবাদের বেদিতে আমরা কখনো আত্মবিসর্জন দেব না।

ফেডারেল সংবিধান যারা সমর্থন করছেন তাঁরা মুসলমান, ব্রিটিশ, হিন্দু যেই হোন, আমরা কি তাদের জিজ্ঞেস করতে পারি, ভারতের জাতিত্বকে এক রাখার জন্যে আমাদের পক্ষ থেকে জাতীয়তা বিসর্জন দেওয়া কি যুক্তিসম্মত? এই ত্যাগ দ্বারা মানবতা কি উপকৃত হবে? আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আমাদের জাতির মধ্যে ইসলামের প্রাচীন আগুন এখনো জ্বলছে এবং এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, জ্বালিয়ে রাখতে পারলে এই আগুন মানুষের ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করবে। তাঁরা কি বুঝতে পারেন না যে রাশিয়া বাদ দিলে ইউরোপে, যার আয়তন ভারতের সমান, যার জনসংখ্যাও ভারতের জনসংখ্যার মতোই, ২৬টি জাতি আছে, তাদের ধর্ম এক সভ্যতা এক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে মৌলিকভাবে পৃথক দুটি জাতি, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশি হিসেবে বসবাস করুক সে আমরা চাই। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের নেতারা সাহস করে সেই সত্যের পক্ষে তাদের অবস্থান নিচ্ছেন না। আমরা আমাদের জাতীয় মুক্তির জন্যে সর্বনিম্ন সুযোগ অর্জন করতে পারছি না।

সে যা হোক আমরা একটা গুরুতর সংকটের মধ্যে রয়েছি, ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন সংকট কখনো দেখা দেয়নি। এটা কোনো একটি সম্প্রদায়ের হীনবল হয়ে পড়ার ঘটনা নয়, এটা ৮০ মিলিয়ন মুসলমানের সমগ্র ভবিষ্যতের সংকট, যারা বিগত দিনে ছিলেন ভারতে ইসলামের গৌরবের ধারক ও বাহক এবং ভারতের সীমান্তের প্রতিরক্ষকও।

এমনি হচ্ছে এই সংকটের প্রকৃতি। এ সংকট ভয়াবহ, তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব ও উৎকৃষ্টতর ভবিষ্যতের দিকে যেতে পারব, যদি আমরা এই আবেদনে মুসলমান সুলভ সাড়া দিতে পারি, ভারতীয় ফেডারেশনের বিরোধিতা করতে পারি এবং পাকিস্তান ফেডারেশনকে সমর্থন করতে পারি। এবং এক্ষুণি করতে পারি।

আমরা যেন এ বিষয়ে ভুল না করি। ব্যাপার হচ্ছে এক্ষুণি, নইলে কখনো নয়। হয় আমরা বাঁচব, নইলে আমরা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাব। ভবিষ্যৎ আমাদেরই, যদি আমরা আমাদের ধর্মবিশ্বাস মতো বাঁচি। ভবিষ্যৎ দেবতাদের কোলে নয়, সে রয়েছে আমাদের হাতে। আমরা সেটি অর্জন করতে পারি, বিনাশও করতে পারি। গত শতাব্দীর ইতিহাস আমাদের জন্যে সাবধান সংকেতে পরিপূর্ণ। অনেক জাতিকেই এমন সাবধান সংকেত প্রদান করা হয়েছে। আমরা সাবধান সতর্কতা উপেক্ষা করেছি, আমাদের প্রাচীন জাতীত্ববাদকে উপেক্ষা করে ভারতীয় ফেডারেশনে যোগ দিয়েছি। এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামি ঐতিহ্যকে ধ্বংস হতে দিয়েছি, এমন কথা কি ভবিষ্যতে উচ্চারিত হওয়া সমীচীন হবে?"[১০০]

---

১০০. রহমত আলী (চৌধুরী) মোহাম্মদ আসলাম খান (খাটক) শেখ মোহাম্মদ সাদিক (সাহিবজাদা) ইনায়েত উল্লাহ খান (চরসাদ্দাহ)।
তথ্যসূত্র : ড. করুণাময় গোস্বামী/রবীন্দ্রনাথ হান্টিংটন ও ভারতভাগ। [অনুপম প্রকাশনী - জুন, ২০১৫। পৃ. ১০৫-১১০]

চতুর্থ পর্ব

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাব

এক

"... লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের মার্চের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। নির্বাচনের অব্যবহিত পরই বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সে অনুসারে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ মুসলিম রাজনীতিবিদগণ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার কথা চিন্তা করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট 'শহীদ' ছদ্মনামে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় তার একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'কোনো মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রক্তপাত এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে বৈকি। মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো কিছু এত প্রিয় কিংবা মহৎ নয়।'

...১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানগণ প্রশাসন যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভায় হিন্দু মন্ত্রী থাকলেও তারা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কংগ্রেস কোনো সময়ই কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে রাজি হয় নি। সুতরাং প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গ ভঙ্গ দাবি এবং পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অধীন একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন আরম্ভ করে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল এ.সি চ্যাটার্জি বাংলাকে ভাগ করার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এই ফৌজের অন্যান্য জেনারেলগণ এ.সি চ্যাটার্জির এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা না করায় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও বাংলা ভাগ করার আকাঙ্খা দানা বাধে।

অপরদিকে ২২ ফেব্রুয়ারি হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিক বারোজের সাথে সাক্ষাৎ করে পরের দিনের পত্রপত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবী তোলেন। কেননা, বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কংগ্রেস সভাপতি আচার্যকৃপালনী বাংলা বিভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মিলিতভাবে বঙ্গভঙ্গের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

সর্দার প্যাটেল ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ কান্তিদ্বারকা দাসকে যে চিঠি লেখেন সেই চিঠিতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান ও অখন্ড বাংলার দাবী সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের মনোভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ চিঠিতে সর্দার প্যাটেল লেখেন, 'মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তান পাওয়ার জন্য জেদাজেদি করে তাহলে তার একমাত্র বিকল্প (Alternative) হলো বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি - তারা কখনও পুরো পাঞ্জাব ও পুরো বাংলা পেতে পারে না।'

বাংলার প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের আলোকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দাবি করেন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল হুগলী জেলার তারকেশ্বরে হিন্দু মেলায় মহাসভার অন্যতম নেতা জেনারেল এ.সি চাটার্জি ঘোষণা করেন 'বঙ্গ বিভাগের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের একটি মাতৃভূমি চাই।'

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব আনলেন - '২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণা অনুসারে ব্রিটিশ সরকার যদি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, তাহলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে থাকতে ইচ্ছুক তাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। বাংলার গঠনতন্ত্র রচনায় যদি সার্বজনীন ভোটের অধিকার, সংযুক্ত নির্বাচন আর সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হয় তাহলে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে দুটো প্রদেশ গঠন করতে হবে। বাংলার যে অংশ এই নীতি অনুসারে গঠনতন্ত্র রচনা করতে ইচ্ছুক তাকে সে অধিকার দিতে হবে।'

৫ এপ্রিল ১৯৪৭ তারকেশ্বরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার যে সম্মেলন হয় তাতে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য ড. মুখার্জী একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ভার গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে ভি, আর, সাভারকরের বাণী বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ :

'To frustrate the vivisection of Akhand Hindustan, the Hindus must first vivisect Pakistan. The first immediate step was the creation of a Hindu Province in West Bengal, the second the expulsion of Muslim trespassers from Assam at any cost so as to sandwich and smother East Pakistan between two Hindu Provinces, the third creation of a Hindu-Sikh Province of East Punjab.'

এরপর থেকে বঙ্গভঙ্গ একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠলো। যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ একদা বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হবে এই যুক্তিতে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) রদের জন্য দেশময় তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তারাই সময়ের ব্যবধানে সেই বাংলাকে বিভক্ত করার জন্য নতুন আন্দোলন শুরু করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। কারণ পশ্চিমবাংলার কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে তখন সমগ্র ভারতের অবাঙালি হিন্দু পুঁজিপতিদের বিরাট অংকের পুঁজি নিয়োজিত ছিল। তাদের স্বার্থ বিপন্ন হবে বলে বিভক্ত বাংলার পশ্চিমাংশ যাতে ভারতের সংগে যুক্ত হয় তার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলেন। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী এমনও ঘোষণা করেন ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ করতে হবে।

মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি করলেও বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রথমে অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করে। মুসলিম লীগের নেতা মওলানা আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিন বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা দাবি করেন। তাঁরা অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন।

হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতাদের বঙ্গভঙ্গের দাবির প্রেক্ষিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার দাবি উত্থাপন করেন।

সোহরাওয়ার্দী বঙ্গভঙ্গ দাবীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন - 'I speak for Bengal. I am visualising an independent undivided sovereign Bengal in divided India.'

তিনি আরো বলেন - আমি বরাবরি যুক্ত বাংলা ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে। আমি যথাসময়ে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে একটি বিবৃতি দেব এবং তাতে প্রমাণ করব যে বঙ্গ বিভাগ বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-তফসিলি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য আত্মহত্যারই শামিল হবে। আমি জানি যে, যারা এ জিগির তুলেছেন তারা মতলবি প্রচারণায় সিদ্ধহস্ত। তারা আন্দোলন গড়ে তুলতে, সে আন্দোলনে

গতিবেগ সঞ্চার করতে, এমন কি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে সে আন্দোলনে তাদের সমর্থন আদায় করতেও কোন কসুর করবেন না। তবে আমি এখনো আশা করি একদিন-না-একদিন শুভবুদ্ধির জয় হবেই, তাই আমি আশা করব, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করার আগে তারা অবশ্যই একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হবার চেষ্টা করবেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাকে একটি মহান দেশ এবং বাঙালিদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন।

...হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লী গমন করেন এবং মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে আলোচনা করেন। জিন্নাহর সম্মতি লাভের পর সোহরাওয়ার্দী লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ ও মাউন্টব্যাটেনের সাথে সন্তোষজনক আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যায় দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী ডোমিনিয়ন মর্যাদায় স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবি করে বিবৃতি দেন। তিনি স্বাধীন বাংলার পক্ষে বিস্তারিত তথ্য পরিসংখ্যানসহ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, 'I have visualised all along, Bengal as an independent state and not part of any Union of India.' এই ভাষণ অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় ঐ দিনের প্রথম খবর হিসেবে ছাপা হয়।

২৭ এপ্রিল তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী প্রদত্ত বিবৃতি :

'...বাংলার সমৃদ্ধি ও কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই এটা লক্ষ্য করে মর্মাহত হবেন যে, বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কিছুসংখ্যক হিন্দুর চরম হতাশা ও তজ্জনিত ধৈর্যচ্যুতি, কারণ প্রদেশে তাদের সম্প্রদায় জনবহুল, তাদের সম্পদ, প্রভাব, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচারণা ও প্রশাসনযন্ত্রে তাদের প্রাধান্য এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সত্ত্বেও বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় তারা যথোপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

এই নৈরাশ্যের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ যে ধরনের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে বলে আমি আশা করছি সে ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে বর্তমান অবস্থায় অব্যাহত থাকতে পারে না, সেটা তারা বুঝতে পারছেন না। আমরা আজ ভারতে এমন একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি, যে সংগ্রামে অখিল ভারত পরিধিতে কয়েকটি বিরোধীয় শক্তি একের ওপর অন্যের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়ার মরণপণ চেষ্টায় লিপ্ত, কিন্তু প্রত্যেক পক্ষই নতি স্বীকারের জন্য এমন মূল্য দাবি করছে, যা প্রতিপক্ষ দিতে প্রস্তুত নয়।

তাদের বিরোধসমূহে সকল প্রদেশের রাজনীতিই গভীরভাবে প্রভাবিত এবং সেই ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির সমস্যাবলীও সমষ্টিগতভাবেই বিবেচ্য। কিন্তু যখন প্রত্যেকটি প্রদেশকেই এককভাবে নিজের সমস্যাবলীর মোকাবেলা করতে হবে, এবং প্রত্যেকটি প্রদেশই পূর্ণত্ব না হলেও কার্যত স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন অবশ্যই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে, এবং বাংলার জনগণকে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হবে।

এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে এই রকম একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলায় এমন একটি মন্ত্রীসভা টিকে থাকতে পারবে যে মন্ত্রীসভা বাংলার সকল প্রধান সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে না কিংবা যা হবে একটি মাত্র সাম্প্রদায়িক দলের সমন্বয়ে গঠিত কিংবা যাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান অপেক্ষা উন্নততর হবে না। আমার মনে হয় না যে, মুসলমানেরা তাদের সামান্য সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু মন্ত্রীসভায় কিঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করলে হিন্দুরা তাতে ক্ষুন্ন হবেন, কেননা বাংলার বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা অনিবার্য বলে তাঁরা ইতিপূর্বেই মেনে নিয়েছেন।

এমতাবস্থায়, বাংলার জনসাধারণের একটি অংশ, যথা মুসলিম সম্প্রদায়, অপর একটি যথা হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর জুলুমশাহি কায়েম করতে পারবে বলে সত্যি কি কেউ কল্পনা করতে পারেন? এই রকম জুলুমশাহির অসম্ভাব্যতা ও অবিশ্বাস্যতার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত ধরা যাক হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ শক্তির কথা।

এই শক্তির সুবাদে তারা যে কোনো জালেম সরকারকে পঙ্গু করে ফেলতে পারেন। প্রশাসন ব্যবস্থার সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদেই তারা অধিষ্ঠিত রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীতে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেক্রেটারিয়েটে ক্ষমতার রজ্জুটি তাদেরই হাতে ধরা। সরকারের সবচাইতে প্রভাবশালী ও ঝানু আমলাদের সবাই হিন্দু। তাদের পদমর্যাদা ও প্রভাব উপেক্ষা করা যাবে, কল্পনা করাও অবাস্তব।

এছাড়াও বাংলার সীমান্তে থাকবে ২০ কোটি হিন্দুর অধিবাস। এই প্রদেশে তাদের স্বধর্মীদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে কি না, সেদিকে তারা নিশ্চয়ই নজর রাখবে। বাংলার হিন্দুদের প্রতি কোনোরকম জুলুম-অবিচার করা কোনো মুসলিম সরকারের পক্ষে আহাম্মকি বৈ কিছু হবে না এবং তেমন আহাম্মকি হবে আত্মহত্যারই শামিল।

বাংলার হিন্দুসমাজের প্রতি সরকারের তথাকথিত অসদাচরণ সম্পর্কে চরম বিরোদগারে ভরা অভিযোগ পড়েছি। এসব অভিযোগ খুবই নাজুক ও কাল্পনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এ-কথা কোনোক্রমেই স্বীকার করবো না যে, বঙ্গ বিভাগের দাবি, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু সমর্থন করেন, সমগ্র বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুর কথা ছেড়েই দিন। বাংলার অঞ্চল নির্বিশেষে হিন্দুদের সংস্কৃতি ও নাড়ির সম্পর্ক এত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যে, এমন কি অঞ্চলবিশেষে ক্ষমতা দখলের আশাতেও এই সম্পর্কচ্ছেদ করা তারা তাদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করবেন না।

বস্তুত, অনুরূপ কারণেই বঙ্গ বিভাগ প্রশ্নে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, তফসিলি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, কেবল তা হলেই বাংলাকে ভাগ করা যাবে। অর্থনৈতিক অখণ্ডতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও বাংলার ক্ষেত্রে এইসব মৌলিক কারণের জন্যই ভারত বিভাগের মুসলিম দাবি থেকে বঙ্গ ভাগের প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে।

বঙ্গ বিভাগের দাবিতে হিন্দু মহাসভা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা আশা করছে যে, বঙ্গ বিভাগের দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুললে, বাংলা সরকারের পতন ঘটিয়ে ৯৩ ধারা জারির পর একাধিক আঞ্চলিক মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মোন্মত্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তারা হিন্দুসমাজের আনুকূল্য লাভ ও সেই সুবাদে কংগ্রেসের প্রভাব নির্মূল করতে পারবে। হিন্দু মহাসভা পুনরায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের অভিলাষী। তেমনি অভিলাষী রয়েছেন আরো অনেক রাজনীতিক, যারা এ-যাবৎ রাজনীতিক্ষেত্রে ইপ্সিত পরিমাণ ঠাঁই করে নিতেও অসমর্থ হয়েছেন।

হিন্দুসমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই আন্দোলনের হোতা। এ-কথা সত্যি যে তাদের পেছনে রয়েছে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা মহলের সমর্থন এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা অদ্বিতীয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের অণুমাত্র সমর্থন নেই তাদের আন্দোলনের পেছনে। গত নির্বাচন সংশয়াতীতরূপে সপ্রমাণ করেছে যে, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস দলের মধ্যে কোনোটিই তফসিলি সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করে না। যুক্ত নির্বাচনে সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন প্রার্থীরা পরাজিত হলেও প্রাথমিক নির্বাচনে তারা কংগ্রেস মনোনীত তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের চাইতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন।

এ ছাড়া, বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে, বর্ণহিন্দু বলে চিহ্নিত হলেও কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভার অনুসারী নয়। অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন অপেক্ষা সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলেই এরা বেশি সুখী হবে। কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভার পরিচালিত সরকার যে বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থেই পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কেও এরা অবহিত, কারণ সেই শ্রেণীগুলো হচ্ছে এসব দলের শক্তির আসল উৎস।

কাজেই বঙ্গ বিভাগের দাবিটি হিন্দুদের মধ্যে তত ব্যাপক ও সার্বজনীন নয় যতটা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও প্রচারণার ঢাক্কা-নিনাদে এর উল্টোটাই প্রতিপন্ন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বঙ্গভঙ্গের দাবি সমগ্র বাংলায় - কিংবা, এমন কি শুধু পশ্চিমবঙ্গে - প্রকৃত প্রস্তাবে কতখানি জনসমর্থনপুষ্ট হতে পারে।

তবে তার আগে বঙ্গভঙ্গ দাবির গ্রাহ্যতার প্রশ্নটি আরেকবার পরখ করে দেখা যেতে পারে। বাঙালি হিন্দুরা কেন একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করতে যাবেন?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে দাবিটি শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন বর্ণহিন্দুর নয়, বরং নির্বিশেষে সকল বর্ণহিন্দু তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ও অঘোষিত বর্ণহিন্দুদের বর্তমান প্রশাসনের অধীনে তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি: তাহলে কী করে তারা ভাবতে পারেন যে, ভবিষ্যতে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে তারা দুর্গত হবেন এবং তাঁদের জীবন, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তার জন্য একটি ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের পত্তন অপরিহার্য? আমার তো মনে হয় হিন্দুদের নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই দাবির প্রতিষ্ঠা আত্মঘাতী হবে। এমন কি যদি এমন একটি কল্পনাতীত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেখানে বাংলার সমগ্র শাসন ক্ষমতা পুরোপুরি মুসলমানদের কব্জাগত হয়ে যায় এবং সে কারণে গোটা হিন্দু সমাজ একটি নিরেট বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অনুরূপ একটি মুসলিম সরকার কি তাদের নীতি কার্যকর করতে পারেন - সরকারী চাকুরেদের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও? শিল্প, বাণিজ্য ও সকল পেশাও তাদের হস্তগত। তাদের যুবশ্রেণিও অগ্রসর, অধিকার সচেতন ও দাবি আদায়ে সক্ষম। কাজেই, বঙ্গভঙ্গের দাবিতে সূচিত মনোবৃত্তি ও শুধু অধৈর্য, নৈরাশ্য ও অদূরদর্শিতাপ্রসূত নয়, এটি এমন একটি গভীর পরাজয়বাদী মনোভাবের দ্যোতক, যা বাংলার মহান হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কেউ আশা করতে পারেন না।

অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামোতে কি পরিণাম আশা করা যেতে পারে তার নির্দেশক হিসেবে প্রায়ই নোয়াখালীর ঘটনার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আগেই বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ভূত কোনো ঘটনার নিরিখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের প্রয়াস হাস্যকর হবে। তবুও ঘটনাটি বিচার করে দেখা যাক। নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে কি ভবিষ্যতের মানদণ্ড ও পূর্বগামিনী ছায়া বলে বিবেচনা করা যায়? আরো কি অগণিত জেলা নেই যেখানে মুসলমানরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ? সেসব জেলায় কি শান্তি অব্যাহতরূপে বিরাজমান নেই এবং হিন্দুরা পূর্বের মতোই নিজেদের অধিকার ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নেই?

এবার আসুন তবে দেখি বাংলা অবিভক্ত থাকলে তার অবস্থান কি হবে। বাংলা হবে একটি মহান দেশ, ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও ঋদ্ধিশীল রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র তার অঙ্কে লালিত জনগণকে দিতে পারবে এক সমুন্নত জীবনযাত্রার মান, যেখানে এক মহান জাতি তার বিকাশের উন্নততম সোপানে আরোহণ করতে পারবে, এবং সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্যে ভরা হবে যে দেশ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে হবে সমৃদ্ধিশালী, এবং কালের আবর্তনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দেশ। বাংলা যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে তার এই ভবিষ্যৎ কল্পরূপ শুধু স্বপ্ন-বিলাস বা আকাশ কুসুম চিন্তা মাত্রে পর্যবসিত হবে না। বাংলার অন্তর্নিহিত সম্পদ ও তার উন্নয়নের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, এই হবে ভবিষ্যতের বাংলার রূপ, যদি না তার আগেই আমরা স্বখাতসলিলে ডুবে মরি।

আমি বরাবরই বাংলার ভবিষ্যৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করে এসেছি, কোনোরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের অংশ হিসেবে নয়। অনুরূপ কোনো রাষ্ট্র একবার সংস্থাপিত হলে, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার ওপরেই। আমি কখনোই ভুলতে পারব না ভারত সরকারের কত দীর্ঘদিন লেগেছিল ১৯৪৩ সালের বাংলার মনন্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে, কীভাবে বাংলার চরম দুর্দিনে প্রতিবেশি বিহার প্রদেশ তাকে খাদ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছিল, কীভাবে ভারতের আর সব কয়টি প্রদেশ বাংলার প্রতি তাদের দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে ও বাংলাকে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে চলেছে, কীভাবে ভারতের দরবারকক্ষে বাংলাকে ঠেলে দেওয়া হয় মর্যাদার-আলোক-বঞ্চিত এক অখ্যাত কোণে আর অন্য প্রদেশগুলো তাদের আসন দখল করে বসে দোর্দণ্ড প্রতাপে।

বাংলা যদি মহান হতে চায়, তবে সে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তা হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বাংলার ওপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ করতে হবে, ভারতের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেওয়া আর চলবে না। শেষ পর্যায়ে বিরোধ বাধবে কলকাতা ও তার অব্যবহিত পরিপার্শ্বকে ঘিরে। কারণ, প্রধানত অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত লোকদের অবদানেই গড়ে উঠেছে কলকাতা; বাংলার মাটিতে তাদের কোনো শেকড় নেই, তারা এখানে এসেছিল শুধু জীবিকার্জন করতে, কিংবা, অন্য দৃষ্টিতে, বাংলাকে শোষণ করতে। কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা, ওপরে আলোচিত পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে, এই যদি হয় বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য, তা হলে এই আন্দোলন শুধু এই উদ্দেশ্যের স্থির বিন্দুতেই সীমিত থাকবে না, অচিরে এই বিভাগের ক্রম থেকেই জন্ম নেবে এমন বৈরিতা ও জিঘাংসা, যার শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কেউ তা জানে না। কাজেই হিন্দু সমাজের যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এত হাল্কাভাবে বাংলাকে ভাগ করার কথা বলে, তাদের কাছে আমাদের আবেদন: অশেষ ক্ষতি ও দুর্ভোগের ধাত্রী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করুন। আমরা সকলে একাত্ম হয়ে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসন-প্রকল্প উদ্ভাবন করতে পারব, যা জনগণের সকল অংশের সম্মান লাভে সমর্থ হবে ও বাংলার সমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারবে।'

...শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে কায়েদে আজম ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার পর ২৮ এপ্রিল (১৯৪৭) কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই দিনই ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সহিত যোগাযোগ করে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী ছাড়াও খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম ও ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকে শরৎচন্দ্র বসু বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েক দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

...৩০ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন যে, ভারত ভাগ হলে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হতে হবে। ঐ দিনই মি. জিন্নাহ প্রদেশ ভাগের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ভারত ভাগ হতে হবে এবং ৬টি ইউনিট হবে - বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অখণ্ড বাংলার বিরুদ্ধে ছিলেন সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তিনি সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছে বলে বেড়াতেন সর্বত্র অখণ্ডতার বিরুদ্ধে। তিনি এপ্রিল মাসেই এক বিবৃতিতে বলেন যে বাংলায় বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা বেশি।

তফশিলি সম্প্রদায় যুক্তবাংলার বিষয়ে অদমনীয় ছিলেন। তাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এমন দলিল নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন অখণ্ড বাংলার বিরোধিতা করছিলেন বৈকি কিন্তু সম্প্রদায়গতভাবে শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, পশ্চিমবঙ্গেও তফশিলি সম্প্রদায় অখণ্ড বাংলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিল। তফশিলি সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ডক্টর মুখার্জির এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান সাথে সাথেই। বিবৃতির মূল অংশটুকু এখানে দেওয়া হলো :

'১৯৩১ ও ১৯৪১ সনের লোক গণনার হিসাব পর্যালোচনা করিলে ডঃ মুখার্জির উক্তি অসত্য প্রতিপন্ন হইবে। ১৯৩১ সালে বাংলার মোট ২,১৫,৭৩,৪১৭ জন হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্তদের সংখ্যা ছিল ৯১,২৪,৯২৫ কিন্তু ১৯৪১ সালের সেন্সাসে মোট ২,৬৯,৪৮,৪১৩ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে তফশিলিদের সংখ্যা জানাইয়াছেন ৭০,৭৮,৮৯৭ অর্থাৎ পূর্ব হইতে ১৬ লক্ষ কম, কলিকাতার লোক সংখ্যায়ও তফশিলিদের সংখ্যা এরূপ অস্বাভাবিক হ্রাস দেখানো হইয়াছে। ১৯৩১ সালে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ। ১৯৪১ সালে ২১ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ ৮১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমতাবস্থায় তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৮১ ভাগ বৃদ্ধি না পাইয়া ৪০ ভাগেরও অধিক হ্রাস পাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কলিকাতা কর্পোরেশনে একমাত্র ধাঙ্গর মেথরদের সংখ্যাই ৩০ হাজারের অধিক ইহা কি ডঃ মুখার্জি জানেন? ১৯৪১ সালের সেন্সাসে যেখানে বলা হইয়াছিল

যে বাংলায় সাধারণভাবে শতকরা ২৩.৩ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তদানুসারে তফশিলিদের জনসংখ্যা অন্তত ১ কোটি ১৩ লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় তফশিলি জনসংখ্যা শতকরা ২৩ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।' (দৈনিক আজাদ শনিবার মে ৩, ১৯৪৭)।

মন্ডলের বিবৃতির ফলে অবশ্যই একটা ভিন্নতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বাংলার বর্ণহিন্দু ও তফশিলিদের মধ্যে। নিগৃহীত বঞ্চিত তফশিলি হিন্দুরা যখন বর্ণহিন্দুদের দখল থেকে নিজেদের উজ্জীবিত করে তুলছিলেন এবং মুসলিম লীগ সরকারের সহায়তায় নিজেদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করে তুলছিলেন তখনই হিন্দু মহাসভা থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪১ সালে আদমশুমারির সময় তারা বন্ধুর মতো তফশিলিদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি দিতে থাকেন যে, তারা যেন কোনোক্রমেই নামের সাথে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ না করেন। অনেকেই বর্ণহিন্দুদের সমাজে সম্মানজনক স্থান পাবার স্বপ্নে তাই করেন। এতে বর্ণহিন্দুগণ - তা তারা হিন্দু মহাসভারই হোক আর কংগ্রেসেরই হোক - লাভবান হলেন। এই সংখ্যা বেশি দেখানোর কারণ ছিল হিন্দু ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তখন অবশ্য যুদ্ধের পর বৃটিশরাজ ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে এ রকম রটনা ছিল। আর পাকিস্তান দাবিও তখন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেশ ভাগের সময় হিন্দু বেশি দেখিয়ে বেশি দখলের আকাঙ্ক্ষাও হয়তো এর পেছনে কাজ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালের সে মাসে বর্ণহিন্দুগণ যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলার সাথে বর্ণহিন্দুদের মামলা মকদ্দমাও হয়।

...কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অবিভক্ত বাংলা দাবি করলেও তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ১৯৪৭ সালের ৩ মে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, তাঁরা অবিভক্ত ভারতে বৃহত্তর বাংলা দাবি করেন। মুসলিম লীগ বৃহত্তর বাংলার প্রশ্নে দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাবক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অন্যদিকে খাজা নাজিমুদ্দিন ও মওলানা আকরম খাঁ প্রথমে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবি করলেও তাঁরা পরে মূল দাবি থেকে দূরে সরে যান। খাজা নাজিমুদ্দিন বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। ৫ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের মুসলমানেরা একটি মাত্র সুসংহত জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের সমবায়ে একটি মাত্র সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।...যারা হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাঙালি জনতার কথা বলেন এবং সেই ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সার্বভৌম বাংলার আওয়াজ তোলেন, তারা নিজেদেরকে আমাদের সেইসব শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত করেছেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দু প্রদেশের মাঝখানে ফেলে মুসলিম বাংলাকে পিষে মারার কথা খোলাখুলি বলছে।'

এদিকে কলকাতার আনন্দবাজার, অমৃতবাজার ও দৈনিক হিন্দুস্তান পত্রিকা সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে।

...এ সময় বাংলার যাদব সম্প্রদায়ও অগ্রসর হন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। আলে বাংলার অনেকেই ছিলেন ধাঁধার মধ্যে। সুস্পষ্ট রূপরেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনেক বাঙ্গালি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক যাদব সম্প্রদায়ের যুগ্ম সম্পাদক মাখনলাল ঘোষ যাদব, উপেন্দ্রঘোষ যাদব, অবনীনাথ ঘোষ যাদব প্রমুখ এক বিবৃতিতে বলেন যে 'আমরা বর্ণহিন্দুদের দর্শনে বিশ্বাস করি না। আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। বর্ণহিন্দুরা যেমন তাদের স্বার্থ বিচার করে আমরাও আমাদের স্বার্থ বিবেচনা করি।' (অমৃতবাজার মে ৯, ১৯৪৭)।

পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দ্রুত জনমত গড়ে উঠছিল। হাটে-মাঠে তর্ক-বিতর্ক ও কংগ্রেসের মধ্যেও দু'দল। পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুরা চিন্তিত আরো বেশি, যদি বাংলা ভাগ হয়ে যায় তাহলে পূর্ববঙ্গে যে তারা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এমনকি তফশিলি সম্প্রদায়ও তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না হিন্দু ভাই বলে। বছরের মধ্যে এত ধন-সম্পত্তি কলকাতায় সরিয়ে নেয়াও তো একটা মুশকিলের বিষয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ৮ মে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খানের কাছে এক পত্রে লেখেন, 'যদি বাংলা বিভক্ত হয় তবে উভয় অংশ দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। বেশি হবে আমাদের অংশ, যদিও এর লোকসংখ্যা অনেক বেশি। খাদ্য ঘাটতি এত বেশি যে কোনো প্রকার নিবিড় চাষ ও প্রয়োজনীয় উৎপাদন করতে পারবে না। আমি কোনো প্রকারে উপলব্ধি করতে পারি না যে, একটি দুর্বল পূর্ব বাংলা মুসলমানের জন্য কি উপকারে আসবে অথবা মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি করবে অথবা সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানের সাহায্য করবে।'

...১৬ মে মাউন্টব্যাটেন বাংলার গভর্নর ব্যারোজকে এক পত্রে জানান যে, হিন্দু-মুসলমান নেতারা একমত হয়ে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারলে তিনি লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলবেন এবং শেষ ঘোষণায় বাংলা বিভক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে না। বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে কোনো শর্ত আরোপ না করে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলেন। তিনি ১৯ মে লন্ডনে এক তারবার্তায় জানান যে, 'সম্প্রতি বাংলায় দুটি প্রধান দল যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হয়েছে। ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি পৃথক গণপরিষদ নির্বাচিত হবে।'

২০ মে তারিখ অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া কমিটির সভায় মাউন্টব্যাটেন বলেন, বাংলার গভর্নর বাংলাকে একত্রিত রাখার ব্যাপারে সফলভাবে অগ্রসর হচ্ছেন। বাংলা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তৃতীয় ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি ২ জুন তারিখের সভায় স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা অনুমোদন করে, তাহলে ভারত বিভাগ পরিকল্পনা সংশোধনের ক্ষমতা ভাইসরয়কে প্রদান করা হবে। ইতিপূর্বে সাক্ষাতের সময় মাউন্টব্যাটেন সোহরাওয়ার্দীকে বলেন যে, ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। তবে কংগ্রেস ও লীগ সম্মত হলে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

অবশেষে ২০ মে শরৎবসুর বাড়িতে কংগ্রেস-লীগ যুক্তকমিটির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। ঐদিন শরৎ বসু তাঁর বাসভবনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক সম্মেলন আহবান করেন এবং সম্মেলনের সদস্যদের রাত্রিতে তাদের এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। সম্মেলনে মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, আবুল হাশিম এবং এম.এ. মালিক। অন্যদিকে হিন্দু নেতাদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় এবং সত্যরঞ্জন বখশী। সভায় আলোচনা শেষে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাবিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির সারমর্ম নিম্নরূপ :

১. বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। স্বাধীনভাবে এই রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারতের সংগে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।
২. গঠনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের যে আইন পরিষদ গঠিত হবে তা যুক্ত নির্বাচন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে।
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে এবং ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে বর্তমান মন্ত্রীসভা বিলুপ্ত হবে এবং এর স্থলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। এতে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের সদস্য সংখ্যা সমান সমান হবে। মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকবেন একজন হিন্দু।
৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলমান ও হিন্দুদেরকে (তফসিলি সম্প্রদায়সহ) সরকারি চাকরিতে সমান অংশ দান করবেন।
৫. ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।
৬. রাষ্ট্রের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক ৩০ জন সদস্য সম্বলিত একটি কমিটি গঠন করা হবে। এতে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলেও উদ্ধৃত সূত্রগুলোর কিছুটা পরিবর্তন সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরকারীগণ মে মাসের ২০ তারিখের পরেও আলোচনা চালিয়ে যান।

সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর নিকট চুক্তির একটি কপি প্রেরণ করেন। এই পরিকল্পনাটি জিন্নাহর আশির্বাদ লাভ করে। লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রকাশ্যে কোনোসময় সোহরাওয়ার্দীকে স্বাধীন বাংলার দাবি পরিত্যাগ করতে বলেন নি। অধিকন্তু সোহরাওয়ার্দী সবসময় তাঁর দাবির অগ্রগতি সম্পর্কে জিন্নাহকে অবহিত করতেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রথমে তাঁর দাবিকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছে এবং কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেছে। মুসলিম লীগ ভেবেছিল স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা গঠিত হলে এক সময় তা পাকিস্তানে যোগ দেবে। জিন্নাহ নিজে বলতেন, কলকাতাকে বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলা চলতে পারে না। জিন্নাহ শরৎ-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতি দেন নি।

সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহর মনোভাব সম্পর্কে শেখ মুজিবের লেখা থেকেও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন : 'এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আজমেরও আশীর্বাদ ছিল, কিন্তু বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী কংগ্রেস মহল এবং মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে দেয় নাই।' (দ্রষ্টব্য : 'নেতাকে যেমন দেখিয়াছি', শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃঃ-১৪৬)

তৎকালীন আসাম উচ্চ পরিষদের সদস্য দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন : 'তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিকট বোস-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি সম্পর্কে জিন্নাহর অভিমত জানতে চাইলে সোহরাওয়ার্দী তাঁকে জানান, জিন্নাহ সাহেব তাঁকে ফেরৎ টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, যদি বাংলার মুসলমানদের সুবিধা হয় তবে স্বাধীন সার্বভৌম ও সমাজতান্ত্রিক বাংলা গ্রহণ করতে তার কোন আপত্তি নেই।'

তপন রায় চৌধুরী কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২ জুলাই ২০০৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'বাঙালনামা' প্রবন্ধে বলেন, 'শরৎ বোস, সুরাবর্দি, কিরণ শঙ্কর এই তিনজন পরামর্শ করে সার্বভৌম বঙ্গের পরিকল্পনা করেন। জিন্না সাহেব এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ সম্ভবত: তার বরাবরই দুই পাকিস্তান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কতদূর কার্যকরী হবে এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। অপর পক্ষে কারও কারও ধারণা যে মুসলমান প্রধান স্বাধীন বঙ্গদেশ কালে কালে পাকিস্তানেই যোগ দেবে - ওঁর এই ভরসা ছিল। কংগ্রেস এ প্রস্তাবে কখনওই রাজি হয়নি। বলা হয় কলকাতাবাসী অবাঙালি গোষ্ঠী বিশেষের প্রবল আপত্তিই তার কারণ।'

৩রা জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে হাডসনের 'The Great Divide' গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এ বইয়ে হডসন বলেছেন, জিন্নাহ সাহেব বাংলা বিভাগ এড়ানোর জন্য হিন্দুদের অনেক ছাড় (Concession) দিতে রাজী ছিলেন। এমনকি বাংলাকে পাকিস্তানে না রাখার শর্তে বাংলাকে অখন্ড রাখতে চেয়েছিলেন। এতে যে তিনি খুশী হবেন তাও বিনাদ্বিধায় বলেছিলেন।

জিন্নাহ সাহেব আরো বলেছিলেন, কলকাতা ছাড়া বাংলার কি মূল্য আছে? তারা অর্থাৎ বাঙালিরা স্বাধীন ও অখন্ড থাকলেই বরং ভালো। আমি নিশ্চিত যে তারা পাকিস্তানের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। হডসন আরো বলেন, শুরুতে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বাংলাকে একটি স্বাধীন ইউনিট হিসেবে থাকার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু বাংলার এই অধিকারকে বাধা দিয়েছিলেন। তাই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বাংলার স্বাধীন ইউনিট হওয়ার অধিকারকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার সাথে সাথে বাংলার মুসলিম লীগ শাখা ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও বাংলা মুসলিম লীগ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার পর সোহরাওয়ার্দীকে স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে বলেন।

...১৯৪৭ সালের ২১ মে জিন্নাহ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলা পর্যন্ত করিডোর দাবি করেন। কংগ্রেস তাঁর দাবির সমালোচনা করে। ২১ মে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কিরণশঙ্কর রায়কে একটি কড়া চিঠি দেন। তিনি তাতে লেখেন, 'যুক্ত স্বাধীন বাংলা একটি চালমাত্র। হিন্দুরা যদি বাঁচতে চায় তাহলে বাংলাকে ভাগ করতে হবে।' তিনি কিরণশঙ্কর রায়কে কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে চলতে বলেন। তারপর থেকে কিরণশঙ্কর রায় স্বাধীন বাংলা আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান।

১৯৪৭ সালের ৩১ মে নয়াদিল্লীতে এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে শ্রী শরৎবসু বলেন যে, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংগে আলোচনা করেছেন। শ্রী বসু আশা প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যদি তাঁর পরিকল্পনা মেনে নেন, তাহলে কার্যতঃ তাঁর পরিকল্পনার অনুরূপ সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পনা স্বীকার করে নিতে লীগ হাই কমাণ্ডকে রাজী করানো সম্ভব হবে।

শ্রী বসু বলেন, 'আমার পরিকল্পনায় আমার আস্থা আছে এবং শেষ পর্যন্ত আমি এতে অনড় থাকবো। আমি অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করবো। এবং বাংলা বিভাগের সম্ভাবনা রোধ করার সকল উপায় চেষ্টা করে দেখবো। আমার বক্তব্য কেবলমাত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রই ভারতের অবশিষ্টাংশের সংগে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

...অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২ জুন দিল্লীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'বিগ সেভেন' নামে অভিহিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, বলদেব সিংহ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুর রব নিশতার উপস্থিত ছিলেন। লর্ড ইজমে এবং স্যার এরিক মায়াভিলও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। একজন ভারতীয় ক্যামেরাম্যান ছাড়া আর কারো এখানে ঢোকার অনুমতি ছিল না। এই বৈঠকে কোন সাংবাদিক প্রবেশের অনুমতি না দেয়ায় ভাইসরয় ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন।

এই বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন আগাগোড়াই পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। বৈঠকে ভিপি মেনন রচিত ও বৃটিশ সরকার অনুমোদিত ৩রা জুনের পরিকল্পনা হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নেতাদের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা বা আলোচনার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাইসরয়ের বক্তব্য ছিল, 'হয় একে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে। তবে লীগ এ পরিকল্পনা বর্জন করলে তাদের পরিণতি শুভ হবে না'। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের হাতেই সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। এ বৈঠকেই ৩ জুনের পরিকল্পনা বা দেশভাগের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলা ও পাঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে মি. জিন্নাহ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে রীতিমত তর্ক-বিতর্ক করেন। মাউন্টব্যাটেন নিজেই বলেছেন : While Jinnah who demanded the partition of India, would not agree to the principle of partition of provinces. অর্থাৎ জিন্নাহ সাহেব তখনও প্রদেশ বা বাংলা ভাগ নীতিগতভাবে স্বীকার করেননি।

তবে আপোষ ফর্মুলারূপে বৃটিশের ৩ জুনের পরিকল্পনায় অন্য সকল পক্ষের মত জিন্নাহও সম্মত হয়েছিলেন। কারণ, ঘটনা প্রবাহের সেই পর্যায়ে কারও পক্ষেই অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না।

এখানে উল্লেখ যে, বড়লাটের রিফর্ম কমিশনার ও প্রধান উপদেষ্টা ভিপি মেনন এই পরিকল্পনাটি রচনা করেন। মাউন্টব্যাটেন ১১ মে নেহেরুকে এটা দেখতে দেন। নেহেরু অনুমোদন করলে ১৮ মে বড়লাট এ খসড়া নিয়ে লন্ডন যান। এটলী সরকারের অনুমোদন নিয়ে ৩১ মে বড়লাট এই নতুন পরিকল্পনাসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৩ জুন এ পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনার মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

(ক) এই উপমহাদেশে দুটি ডোমিনিয়ন-ভারত প্রজাতন্ত্র ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দার প্রেক্ষিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির পরিষদ সদস্যরা আলাদা ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন।

(গ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৩ জুন অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষণ দেন। বেতারে মাউন্টব্যাটেন প্রথমে তার ভারত ভাগ করার খসড়া প্রস্তাব ঘোষণা করেন। নেহেরু বললেন, যদিও এ প্রস্তাব আমি আপনাদের গ্রহণ করতে বলছি, কিন্তু আমার হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছে। জিন্নাহর ভাষণটি ছিল খুব সংক্ষিপ্ত এবং ভাবাবেগ বর্জিত। তিনি বলেন, বৃটিশ সরকারের এই পরিকল্পনাটিকে আমাদের আপোষ পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করবো, না সমাধান হিসেবে, সেটা আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

ঐদিন সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে নিয়ে মিসৌরিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ তাদেরকে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ বাংলা সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি দেন।

৮ জুন গান্ধী শরৎচন্দ্র বসুকে লেখেন, 'তোমার খসড়া পড়লাম। আমি এখন পরিকল্পনাটি নিয়ে মোটামুটিভাবে পণ্ডিত নেহরু এবং সরদারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দুজনেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনড় এবং তাঁরা মনে করেন এটা কেবল তফসিলি সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু নেতাদের দ্বিধাবিভক্ত করার ফন্দী।'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও প্যাটেল অভিযোগ করেন যে, যুক্ত বাঙলার পক্ষে তফসিলিদের ভোট সংগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। গান্ধী তাকে অবহিত করেন যে, ভারতের দু'অংশের বাইরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই গান্ধী শরৎ বসুকে বাংলার অখণ্ডতার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করতে বলেন। গান্ধীজীর এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে শরৎ বসু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি বলেন, 'ভারত বিভাগ একটি পাপ কিন্তু বাংলা মায়ের দ্বিখণ্ডিকরণ আরও মহাপাপ।'

১০ই জুন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তৃতীয় ও চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ৩ জুনের ঘোষণা সমর্থন করে। জিন্নাহ তাঁর জীবদ্দশায় পাকিস্তান দেখতে চান। এই কথা বলেই তিনি কাউন্সিলারদের প্রতি বৃটিশ প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে ভোট গ্রহণের আগে অবশ্য প্রস্তাবের ভাল-মন্দ দুটি দিকই তুলে ধরেছিলেন। কতটা লাভবান এবং কতটা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তাও তিনি বলেন। তিনি জানান সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে কাউন্সিলারদের উপর।

কাউন্সিলের ৪০০ জন সদস্য পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। কিন্তু ১১ জন সদস্য ভোট দেন এর বিপক্ষে।

জিন্নাহ যখন চূড়ান্তভাবে বললেন আমাদেরকে বৃটিশ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে (পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগসহ) মেনে নিতে হবে অথবা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করতে হবে। হাত তুলে ভোট দেবার আহ্বান জানালেন তিনি। সোহরাওয়ার্দী হাত গুনে রায় দিলেন বৃটিশ প্রস্তাবের পক্ষেই সকল হাত এবং মাত্র ১১টি হাত বিপক্ষে।

১৪ জুন শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীকে পত্র লিখে জানান যে, 'জওহরলাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেলের অভিযোগ বা সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বৃহত্তর বাংলা গঠন একটি চক্রান্ত' - এ অভিযোগ শরৎচন্দ্র বসু অস্বীকার করে বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাংলার অখণ্ডতার জন্য কাজ করে যাবার অভিপ্রায় পোষণ করি। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যে প্রচন্ড উত্তেজনামূলক প্রচারাভিযান চলছে এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। যদি গণভোট দেওয়া হতো তাহলে বাংলার হিন্দুরা বংগভঙ্গের বিপক্ষে অধিক সংখ্যায়

ভোট প্রদান করতেন। বাঙলার কণ্ঠকে কিছু কালের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে সে নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রকাশ করবে।' তিনি কংগ্রেস নেতাদের বাংলা-বিরোধী কার্যাবলী দেখে কংগ্রেসকে হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিযুক্ত করেন।

সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে মওলানা আজাদের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে পরিস্কার বোঝা যায় যে, ৩ জুন, ১৯৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার অনেক আগে এপ্রিলের শুরুতেই কংগ্রেসের এই তিন মহামানব ভারত বিভাগের পরিকল্পনাকে মেনে নিয়েছিলেন। এই তিনজনের প্রভাবেই ভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি ৩ জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C) সহজে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব মেনে নেয়নি। এ. আই. সি. সি'র প্রথম দিনের অধিবেশনে আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশ উষ্মা দেখা যায়। সর্দার প্যাটেল ও গোবিন্দ বল্লভ পন্থের চেষ্টায়ও A.I.C.C সদস্যদের দ্বারা ৩ জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এবার গান্ধীজী মাঠে নামলেন। ভারত বিভাগের দাবী তার লাশের ওপর দিয়ে কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে হলোনা। সশরীরে সজ্ঞানে এবং জীবন্ত অবস্থায় গান্ধীজী এ.আই.সি.সি'র সদস্যদের অনুরোধ করলেন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে অবশেষে এ.আই.সি.সি ভারতকে বিভক্ত করতে রাজি হলো।

যে নিখিল ভারত কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছিল তারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগে সম্মত হলো। মওলানা আজাদ আরো লিখেছেন, সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সদস্যদের দলে টানার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হলো।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিরোধী হিন্দু সদস্যদের বোঝানো হলো যে, পাকিস্তানে যদি হিন্দুরা অসুবিধায় পড়ে অথবা অসম্মান বোধ করে তাহলে ভারত এর জন্য তার মুসলিম নাগরিকদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। খোলাখুলিভাবে আরো বলা হলো যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ তাদের ওপর যদি অত্যাচার হয় তাহলে ভারতের সাড়ে চার কোটি মুসলমানদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে। (India Wins Freedom by Maulana Abul kalam Azad)

এতো প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার ও মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও যখন ভারত বিভাগের প্রস্তাব এ আই সি সি সদস্যদের কাছে ভোটে দেওয়া হলো তখনো এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য গান্ধীজীর অনুরোধ এ.আই. সি.সি সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেননি এবং এ.আই.সি.সি'র ১৫ জন সদস্য ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ জুন ২৯ ভোটের সমর্থনে এবং ১৫ ভোটের বিরোধিতায় এ.আই.সি.সি মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

অতঃপর ২০ জুন বাংলাকে ভাগ করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয় ৩ জুনের পরিকল্পনা মোতাবেক। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগ দলীয় ব্যবস্থাপক সদস্যদের নিকট এই মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ভোট প্রদান করেন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডও বাংলার সকল হিন্দু পরিষদ সদস্যদের নিকট এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন বাংলা বিভাগের পক্ষে ভোট দান করেন।

বৃটিশ সরকারের ৩ জুনের ঘোষণার ভিত্তিতে ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের বিধায়কদের এক যুক্ত অধিবেশন বিকেল ৩টায় স্পিকার নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে দুটি গণপরিষদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিধায়কদের মধ্যে ভোটাভুটি হয়। পরিষদের ১২৬ জন সদস্য প্রস্তাবিত পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। ১২৬ জনের মধ্যে ১২০ জন ছিলেন মুসলিম লীগ সদস্য, ৫জন ছিলেন তফসিলী ফেডারেশনের সদস্য এবং ১ জন ছিলেন ভারতীয় খ্রীষ্টান।

অপরদিকে ৯০ জন সদস্য ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। ঐ ৯০ জনের মধ্যে ৮২ জন ছিলেন কংগ্রেস সদস্য, ৪ জন এংলো ইন্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মাহতাব।

অধিবেশনে এ. কে. ফজলুল হক অনুপস্থিত ছিলেন। তিনজন কম্যুনিষ্ট সদস্য জ্যোতি বসু, রতন লাল ব্রাহ্মণ এবং রূপনারায়ণ ভোট প্রদানে বিরত থাকেন। মিঃ তোফাজ্জল আলী বিলম্বে আসায় ভোট দান করতে পারেন নি।

বঙ্গীয় আইন পরিষদের যে অংশ বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, সে অংশের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার নূরুল আমিন। পরিষদ পূর্ব বাংলার বিধায়কগণের ১০৬-৩৫ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে বাংলা বিভাগ করা চলবে না। বাংলাদেশকে ভাগ করার পক্ষে পূর্ব বাংলার যে ৩৫ জন সদস্য (বিধায়ক) ভোট দিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কেউ বাংলা-বিভক্তির পক্ষে ভোট দেন নি। তবে ৪ জন হিন্দু বাঙালি ও একজন খ্রিষ্টান বাঙালি অখন্ড বাংলাদেশের পক্ষ ভোট দেন।

বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মাহতাব-এর সভাপতিত্বে অমুসলিম সংখ্যাগুরু (পশ্চিম বাংলা) অংশ ৫৮-২১ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, বাংলা বিভাগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে ৫৮ জন বাংলাদেশ ভাগ করার পক্ষে ভোট দেন তাদের ৪৮ জন কংগ্রেস সদস্য, চারজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, একজন ভারতীয় খৃষ্টান, দুজন কম্যুনিষ্ট সদস্য, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মাহতাব। বাংলাদেশকে ভাগ না করার পক্ষে ভোট দেন ২১ জন। এদের সবাই মুসলিম বাঙালি।

এভাবে তৎকালীন মুসলিম লীগের মতের বিরুদ্ধে স্রেফ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মতের ভিত্তিতেই বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। ফলে বৃটিশ ও কংগ্রেস-এর কারসাজিতে স্বাধীন বাংলা গঠনের উদ্যোগ বাতিল হয়ে যায়।

হিন্দু নেতৃবৃন্দ, একদিন যারা বংগ-ভঙ্গকে 'মায়ের ব্যবচ্ছেদ' বলে বলেছিলেন, তারাই ১৯৪৭ সালে অখন্ড বাংলাকে সমর্থন করেন নি। এর কারণ, তারা দেখছিলেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সমর্থন করে তাদের লাভ নেই। বরং খন্ডিত বাংলা নিয়ে ভারতের সংগে থাকাই তারা যুক্তিসংগত মনে করেছিলেন। এ কারণেই জ্যোতি বসুর মত বামপন্থী নেতাও বাংলাদেশকে ভাগ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

...বাংলার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ৩০ জুলাই মাউন্টব্যাটেন কলকাতায় আগমন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে মাউন্টব্যাটেনের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনকে রাজি করানোর জন্য তিনি শেষ প্রচেষ্টা চালালে ভাইসরয় তাঁর পরিকল্পনা নাচক করে দেন।

একথা বললে ভুল হবে যে, কেবল ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দুনেতারা এবং কিছু বাঙালি নেতাই স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা মেনে নেয়ার পূর্বশর্ত ছিল ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলিম লীগের এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন। ১৯৪৭ সালের ৬ অক্টোবর লন্ডনের রয়াল এমপায়ার সোসাইটিতে এক ভাষণে মাউন্টব্যাটেন তার এ ঘৃণ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। এ বক্তৃতায় তিনি বলেন, বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্তির বিরুদ্ধে জিন্নাহ সাহেব খুব জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ প্রদেশ দুটির জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে এবং এদের বিভক্তি হবে খুব সর্বনাশা। আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমি মনে করি ভারত বিভক্তির বিরুদ্ধে ঐ একই যুক্তি প্রয়োজন।

জিন্নাহ সাহেব আমার কথা পছন্দ করেন নি এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কেন ভারতকে বিভক্ত করতে হবে। অবশেষে জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি অবিভক্ত বাংলা ও পাঞ্জাব চাইলে তাকে অবিভক্ত ভারতকে মেনে নিতে হবে অথবা তাকে মানতে হবে বিভক্ত ভারতের সাথে বিভক্ত বাংলা ও বিভক্ত পাঞ্জাব। তিনি এ শেষোক্ত সমাধানটাই মেনে নিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য যে, মাউন্টব্যাটেন ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির ব্যাপারে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের যুক্তি হুবহু গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির পক্ষে ভারতীয় কংগ্রেস ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অনমনীয় মনোভাবই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বাধ্য করেছিল বিভক্ত বাংলা ও বিভক্ত পাঞ্জাবকে নিয়ে কীটদুষ্ট ও পোকায় খাওয়া পাকিস্তানকে মেনে নিতে। এজন্যই ভারতীয় মুসলিম লীগ তার ১০ জুন ১৯৪৭ তারিখের কাউন্সিল মিটিংয়ে ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি মেনে নেয়।"[১৩১]

দুই

"...When the partition plan was accepted, Shaheed Suhrawardy fought against the partition of Bengal on the grounds that it was a Muslim majority province. Suhrawardy declared that the partition of India was inevitable, but Bengal should remain indivisible. Jinnah also asserted that on no account would he accept 'a truncated, moth-eaten Pakistan'. Partition of Bengal meant the loss of Calcutta, built mainly on the resources of East Bengal. The alternative to partition was an independent Bengal. Suhrawardy is both accused of and credited with the sponsoring of the sovereign, or, what is also known as, the Greater Bengal Scheme. There is a full document on this scheme published by Maulana Raghib Ahsan, a member of the All India Muslim League (AIML) Working Committee.

The British decision to partition Bengal was finalized in mid-May with Mountbatten, in close consultation with V P Menon, the only Indian on the Viceroy's staff and Congress leaders, especially Pandit Nehru and Sirdar Patel. However, the Mountbatten plan, partitioning Bengal with Calcutta in West Bengal, was already known to the AIML High Command by April. When the Muslim League government of Bengal refused to accept the plan, Jinnah asked Suhrawardy to work for a sovereign, independent Bengal. Suhrawardy immediately started negotiations with the Congress leaders of Bengal for a mutually agreed scheme to ward off the dangers of the partition of Bengal.

The Muslim League leaders of Bengal had, for sometime now, been discussing the issue. It was during the Jinnah-Gandhi Bombay talks in 1944 that Jinnah himself had first asked the Bengal Provincial Muslim League (BPML) to express its views on the future form, shape and boundaries of East Pakistan. The members of the BPML Working Committee held several secret meetings in mid-August at Suhrawardy's private residence in Calcutta and emerged with three alternate proposals :

a. Raghib Ahsan's confederation or federation of Bengal, Assam and Jharkhand of the Chotonagpur adivasis.

b. Fazlur Rahman's proposal for the formation of East Pakistan composed of Bengal and the Surma valley of Assam on the Curzon partition line, to ensure Muslim majority; and

c. Hamidul Huq Choudhury's plan for a United Bengal and Assam as a unit of Pakistan.

The BPML Working Committee forwarded the three proposals to Jinnah at Bombay through a special messenger. What Jinnah's reaction was is not known, but members of the AIML Working Committee, including Abdul Matin Choudhury of Assam, definitely demanded the inclusion of the whole of Bengal and Assam into East Pakistan.

---

১৩১. মুহাম্মদ আসাদ/বাংলা যেভাবে ভাগ হলো। [কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০১। পৃ. ২৮-৪০ : ৭৯-৮১]

In 1942, with the threat of the Japanese invasion of Bengal the Cripps Plan had offered Indian union, giving provinces the right to secede. Two years later Rajagopalachari offered self-determination for Muslims of the Muslim majority provinces. Then, in 1946, the Cabinet Mission refused to hand over power to two entirely sovereign states, where the two halves of Pakistan would be dependent on the goodwill of India and recommended a Union of India, divided into three sections, with the provinces having the right to secede. During the last days of Lord Wavell's Viceroyship news reached the Muslim League leaders that His Majesty's government might transfer power to the existing provincial governments. On the basis of this prognostication, in the last week of February 1947, Abul Hashim and Sarat Chandra Bose discussed the plan for a sovereign, independent Bengal comprised of the Bengali-speaking people of eastern India from Purnea in Bihar to Assam in the furthest-east. When the scheme was divulged, the Hindu Mahasabha demanded the partition of Bengal. In March, the then Congress President Acharya Kripalani too demanded the partition of Bengal. Gandhi, in reply to this, remarked that if Bengal was partitioned the communal problem would be a lasting feature of eastern India. This stand encouraged the Bengali leaders to work out an agreed scheme of a Sovereign United Bengal.

Prime Minister Suhrawardy first openly proposed the scheme of a Sovereign United Bengal at a press conference on 27 April 1947 in Delhi. Following discussion between Lord Mountbatten and Jinnah on 28 April, he returned to Calcutta and the same day met Sarat Chandra Bose of the Forward Bloc. Besides Suhrawardy, Khwaja Nazimuddin, Abul Hashim and Fazlur Rahman were also present. The Muslim League formed a subcommittee consisting of Suhrawardy, Habibullah Bahar, Hamidul Huq Choudhury and Fazlur Rahman, with Nurul Amin as the convener, to negotiate with the Hindu leaders, especially Congress chief Surendra Mohan Ghose, Congress Parliamentary leader Kiron Shankar Roy and Forward Bloc leader Sarat Chandra Bose. A two-man delegation composed of Abul Hashim and Sarat Chandra Bose also met Gandhi on 12 May to discuss the Sovereign United Bengal scheme and received his blessing.

The East Bengal Hindus, commanding an overwhelming majority amongst the leaders of both Bengals in the Bengal Congress, the Bengal Legislative Assembly and the Bengal intelligentsia, were also against the partition of Bengal. They questioned the wisdom of Hindu Mahasabha chief Mukherjee's arguments for partition. Seeing this reaction Suhrawardy at first offered the Hindus joint electorate, without reservation of seats for any community. Later he modified the offer to include reservation of seats on a population basis for the Muslims, the high and the scheduled caste Hindus and other religious minorities. This offer was based on the Mohammad Ali formula, that is, a combination of joint and separate electorates. The offer also included the electoral principle that no candidate would be declared elected unless he polled at least 33 percent of the votes of his own community.

Finally, the members of the Congress-League joint committee formally signed a tentative agreement on 20 May for a Sovereign United Bengal. Suhrawardy forwarded the outline to Jinnah and Sarat Chandra Bose to Gandhi. Bose assured Mahatma Gandhi that both the Congress and the Muslim League parties in Bengal would ratify the tentative agreement, probably with some modifications.

Surprisingly however, in reply to Bose's letter of 23 May forwarding the agreed outline, Gandhi advised him to give up the struggle for the unity of Bengal and to refrain from disrupting the atmosphere already created for the partition of Bengal. Gandhi shifted from his stand after discussions with Nehru and Sirdar Patel who were both against the proposal, alleging it to be a trick designed to divide the caste and the scheduled caste Hindu leaders.

Bose was shocked. He declared that if the partition of India was a sin, the vivisection of Mother Bengal would be a greater sin. He reminded the Hindus of the great sacrifices they had once made in undoing the 1905 partition of Bengal and the ill-treatment C R Das and Netajee Subash Chandra Bose, his brother, had received from North Indian leaders. They had been forced to leave Congress and respectively form the Swaraj Party and the Forward Bloc. But Bose received no support from the powerful Hindu press and thus the demand for partition became stronger.

Sarat Chandra Bose and Kiron Shankar Roy also met Sirdar Patel at Dehradun. When the scheme was placed before Patel he rejected it outright as a trick by Suhrawardy for Bengal to join Pakistan. He believed after this happened there would be no alternative for Assam but to join Pakistan. Patel, as the Home and States Minister of India, had by this time become all powerful in the Congress High Command and his opposition to the scheme meant a Congress veto. Later Patel, disclosing his secret deal with Viceroy Mountbatten, said that he had agreed to accept the partition of India and the creation of Pakistan on condition that Bengal was partitioned with Calcutta remaining in a West Bengal that belonged to India. The wiley Mountbatten circumscribed the Sovereign United Bengal scheme, laying as a primary condition, the total agreement to it by both the Congress and the Muslim League. When the Congress ultimately rejected it, Jinnah agreed to the partition of Bengal."[১৩২]

তিন

"...There is substantial documentation on the making of decisions in the three Provinces the future of which was principally at issue. In each case there were particular features and problems. In Bengal various possibilities had been canvassed, autonomy or independence of the Province as a whole; partition with Calcutta as a free city or partition tout simple. The Viceroy, on 1 June, took the view that the Congress 'were determined to oppose any move towards an independent but united Bengal' : the Governor that it was too late (2 June) to declare Calcutta a free City or a City under Joint Control, a possibility which Jinnah at one time was reported as favouring and one that had also been canvassed by the Premier (and others) in the event of a partition of the Province.[133]

5 June 1947

I got back from London late on the night of Friday the 30th May, but decided I would not see any leader, formally, before the meeting on Monday. It was essential, however, to find out the latest position about Bengal, so I arranged for Mieville to see Suhrawardy and bring him into me (so that the interview would not appear in the Court Circular). I was distressed to learn from Suhrawardy that Kiran Shankar Roy had been unable to persuade the Congress High Command to allow Bengal to vote for independence. Suhrawardy pleaded for Calcutta to be allowed to be a free city during the period of partition, since he felt that in this period communal bitterness would thus be relaxed and sufficient confidence might be re-established for the Congress eventually to decide to leave it a free city. Otherwise he feared that nothing he could do would prevent riots and great damage in the City before partition. I sent V. P. Menon to see Patel to obtain his agreement to six months joint control of Calcutta. Patel's reply was very firm: 'Not even for six hours'.

...Jinnah tackled me on the need for a referendum on the question of Bengal or at least Calcutta, to give the Scheduled Castes the chance of expressing their dissatisfaction with Caste Hindus. I refused to be drawn.

---

১৩২. Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy/Ed.: Mohammad H R Talukdar[[UPL - 1987] p. 27-30]

১৩৩. Viceroy's Personal Report No. 8 : LIPO/6/123:ff 114-21PERSONAL AND TOP SECRET

··· Since Gandhi returned to Delhi on the 24th May, he has been carrying out an intense propaganda against the new plan, and although I have always been lead to understand he was the man who got Congress to turn down the Cabinet Mission plan a year ago he was now busy trying to force the Cabinet Mission plan on the country. He may be a saint but he seems also to be a disciple of Trotsky."[১৩৪]

চার

"...১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হল ভারতবর্ষ ভাগ হবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভাগ করতে রাজি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা এবং তার আশপাশের জেলাগুলিও ভারতবর্ষে থাকবে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও মুসলিম লীগ নেতারা বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বর্ধমান ডিভিশন আমরা না-ও পেতে পারি। কলকাতা কেন পাব না? কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে বলে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমরাও বাংলাদেশ ভাগ হতে দেব না, এর জন্য সভা করতে শুরু করলাম। আমরা কর্মীরা কি জানতাম যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে এই ভাগের ফর্মুলা? বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা। আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্র আসামের এক জেলা - তাও যদি গণভোটে জয়লাভ করতে পারি। আর বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলি কেটে হিন্দুস্থানে দেওয়া হবে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। কলকাতার কর্মীরা ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা এসে আমাদের বলত, তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আমাদের কপালে কি হবে খোদাই জানে! সত্যই দুঃখ হতে লাগল ওদের জন্য। গোপনে গোপনে কলকাতার মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল, যা হয় হবে, কলকাতা ছাড়া হবে না। শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা আমাদের রাজধানী থাকবে। দিল্লি বসে অনেক পূর্বেই যে কলকাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একথা তো আমরা জানতামও না, আর বুঝতামও না।

এই সময় শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের তরফ থেকে এবং শরৎ বসু ও কিরণশংকর রায় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক আলোচনা সভা করেন। তাদের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ভাগ না করে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না? শহীদ সাহেব দিল্লিতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার অনুমতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক ফর্মুলা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। যতদূর আমার মনে আছে, তাতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। জনসাধারণের ভোটে একটা গণপরিষদ হবে। সেই গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলাদেশ হিন্দুস্থান না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি স্বাধীন থাকবে। যদি দেখা যায় যে, গণপরিষদের বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি পাকিস্তানে যোগদানে পক্ষপাতী, তবে বাংলাদেশ পুরাপুরিভাবে পাকিস্তানে যোগদান করবে। আর যদি দেখা যায় বেশি সংখ্যক লোক ভারতবর্ষে থাকতে চায়, তবে বাংলাদেশ ভারতবর্ষে যোগ দেবে। যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাও থাকতে পারবে। এই ফর্মুলা নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু দিল্লিতে জিন্নাহ ও গান্ধীর সাথে দেখা করতে যান। শরৎ বসু নিজে লিখে গেছেন যে জিন্নাহ তাঁকে বলেছিলেন, মুসলিম লীগের কোনো আপত্তি নাই, যদি কংগ্রেস রাজি হয়। ব্রিটিশ সরকার বলে দিয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত না হলে তারা নতুন কোনো ফর্মুলা মানতে পারবেন না। শরৎ বাবু কংগ্রেসের নেতাদের সাথে দেখা করতে যেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছিলেন, 'শরৎ বাবু পাগলামি ছাড়েন,

---

[১৩৪]. The Transfer of Power (1942-7) – Vol.XI/Nicholas Mansergh (Editor-in-Chief)| [Her Majesety's Stationery Office (London) – 1982| P. XVIIV/20/158-160]

কলকাতা আমাদের চাই।' মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু কোন কিছুই না বলে শরৎ বাবুকে সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিস্টার প্যাটেল শরৎ বাবুকে খুব কঠিন কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসে শরৎ বসু খবরের কাগজে বিবৃতির মাধ্যমে একথা বলেছিলেন এবং জিন্নাহ যে রাজি হয়েছিলেন একথা স্বীকার করেছিলেন।

যুক্ত বাংলার সমর্থক বলে শহীদ সাহেব ও আমাদের অনেক বদনাম দেবার চেষ্টা করেছেন অনেক নেতা। যদিও এই সমস্ত নেতারা অনেকেই তখন বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই ফর্মুলা গ্রহণ করেছিলেন। জিন্নাহর জীবদ্দশায় তিনি কোনোদিন শহীদ সাহেবকে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তাঁর বিনা সম্মতিতে কোনো কিছুই তখন করা হয় নাই। যখন বাংলা ও আসাম দুইটা প্রদেশই পাকিস্তানে যোগদান করুক, এর জন্যই আমাদের আন্দোলন ছিল, তখন সমস্ত বাংলা পাকিস্তানে আসলে ক্ষতি কি হত তা আজও বুঝতে কষ্ট হয়! যখন বাংলাদেশ ভাগ হবে এবং যতটুকু পাকিস্তানে আসে তাই গ্রহণ করা হবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে তখন সে প্রশ্ন আজ রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা বদনাম দেবার জন্যই ব্যবহার করা হয়। বেশি চাইতে বা বেশি পেতে চেষ্টা করায় কোন অন্যায় হতে পারে না। যা পেয়েছি তা নিয়েই আমরা খুশি হতে পারি। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন, 'যুক্ত বাংলা হলে হিন্দু মুসলমানের মঙ্গলই হবে'। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার রক্তের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না। সমস্ত বাংলাদেশই পাকিস্তানে যাবে।' এই ভাষা না হলেও কথাগুলির অর্থ এই ছিল। আজাদ কাগজ আজও আছে। ১৯৪৭ সালের কাগজ বের করলেই দেখা যাবে।

এই সময় বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন তলে তলে কংগ্রেসকে সাহায্য করছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল তিনি ভারত ও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল একসাথেই থাকবেন। জিন্নাহ রাজি হলেন না, নিজেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন। মাউন্টব্যাটেন সম্বন্ধে বোধহয় তার ধারণা ভালো ছিল না। মাউন্টব্যাটেন ক্ষেপে গিয়ে পাকিস্তানের সর্বনাশ করার চেষ্টা করলেন। যদিও র‍্যাডক্লিফকে তার দেওয়া হল সীমানা নির্ধারণ করতে, তথাপি তিনি নিজেই গোপনে কংগ্রেসের সাথে পরামর্শ করে একটা ম্যাপ রেখা তৈরি করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হোক, এটা আমরা যুবকরা মোটেও চাই নাই। তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হবেন, পরে প্রেসিডেন্ট হবেন, এটাই আমরা আশা করেছিলাম। লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের বড়লাট থাকলে এতখানি অন্যায় করতে পারতেন কি না সন্দেহ ছিল! এটা আমার ব্যক্তিগত মত। জিন্নাহ অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন আমাদের চেয়ে, কি উদ্দেশ্যে নিজেই গভর্নর হয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন।"[১৩৮]

পাঁচ

"...কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রিসার্চের সময় কলকাতার অনেক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিকে প্রশ্ন করেছি, 'তখন ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলা আলাদা হলে আপনাদের কি ক্ষতি হতো?' সঙ্গে এ-ও বলেছি '১৯৪৫ সালে সেই আপনারাই বঙ্গভঙ্গের পক্ষ নিয়েছিলেন।' যখন প্রশ্ন করলাম, 'সোহরাওয়ার্দী-শরৎবোস বাংলাকে অবিভক্ত রেখে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠন করতে চেয়েছিলেন। তখন কেন কলকাতা-কেন্দ্রিক নেতৃবৃন্দের জোর সমর্থন মেলেনি?' এর কোনো সদুত্তর পাইনি। আসলে কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের অবিভক্ত বাংলায় আধিপত্য বজায় রাখা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এর আরও প্রমাণ পাই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। মনে হয় তারা চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্যও যেন আমরা কলকাতানির্ভর থাকি। সে জন্য ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের তখনকার কলকাতাবিরোধী মনোভাবের জন্য দোষ দেওয়া যায় না।"[১৩৯]

---

১৩৮. শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী। [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ৭৩-৭৫]
১৩৯. শফিক সিদ্দিক (বঙ্গবন্ধুর জামাতা)/নকশাল বাকশাল টাকশাল। [শিখা প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০০। পৃ. ৫৪]

পঞ্চম পর্ব

স্মৃতিতে সিলেট গণভোট : পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির লড়াই

এক

"...সিলেটের গণভোট ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল বৃহত্তর ফরিদপুর থেকে একটি মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড দল সিলেটে যাবে। ঐ ন্যাশনাল গার্ড দলে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমার সাথে আর কে কে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের সবার নাম আজ সম্পূর্ণ মনে নেই। তবে আমার চাচাতো ভাই ইসহাক আলী মণ্ডল যে অন্যতম ছিলেন তা বেশ মনে আছে। আমি তার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। এই ইসহাক আলীর সাথে ছোটকালে একই মক্তবে পড়াশোনা করেছি। এমন এক আপন লোক বিদেশ বিভূইয়ে সেই সুদূর সিলেটে বিপদে-আপদে আমার পাশে থাকবেন এ ছিল আমার আশা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা শেষ পর্যন্ত পুরা হতে পারেনি। তবে সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

সিলেট বাংলাভাষী এবং মুসলিম-প্রধান এলাকা হলেও জেলাটি তখন ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। আসামের বাংলাদেশ সংলগ্ন গোয়ালপাড়াও ছিল বাংলাভাষী এবং মুসলিম প্রধান। কাছাড়, শিলচর প্রভৃতি এলাকারও ছিল একই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অন্যান্য সব এলাকা বাদ দিয়ে বৃটিশ-কংগ্রেস চক্রান্তের মাধ্যমে শুধু সিলেট জেলায় গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। সিলেটের জনগণ পাকিস্তানে যোগ দেয়ার পক্ষপাতী কিনা তা যাচাই করতে। আসাম যেমন মুসলিম প্রধান প্রদেশ ছিল না, তেমনি হিন্দু প্রধানও ছিল না। আসামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ছিল উপজাতি - না হিন্দু, না মুসলমান। তবে প্রশাসনিক, বহু বিষয়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিক্ষার ব্যাপারে আসাম ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। স্বাভাবিক কারণে গোটা আসাম ও বাংলাকেই লাহোর প্রস্তাবের পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাতেও এ কারণেই আসামকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। আসামের উন্নয়নের ব্যাপারে কলিকাতা বা দিল্লী কেন্দ্রিক প্রশাসনের পরিবর্তে ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনই যে অধিক অনুকূল ছিল তা বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী ১৯০৫ থেকে ১৯১১ আমলেও প্রমাণিত হয়েছিল। সেই আসামকে বাংলা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় নেহরু-মাউন্ট ব্যাটেন আঁতাতসৃষ্ট ৩ জুন পরিকল্পনার মাধ্যমে। তবুও আসামের যেটুকু পারা যায় বাংলার সাথে সংযুক্ত রাখার আকাঙ্খাই এ গণভোটকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছিল। সিলেটের গণভোটে বাংলাদেশের অধিকাংশ লীগ নেতাই অংশগ্রহণ করেন। সিলেটে অনেক আগে থেকেই কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বিরাট প্রভাব ছিল বলে এই প্রভাব কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে পাকিস্তান সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে অনেক আলেম পীর মাশায়েখ সিলেট গণভোটে অংশগ্রহণ করেন। শর্ষিনার তদানীন্তন পীরজাদা মওলানা আবু জাফর সালেহের নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি কাফেলা এ উপলক্ষে সিলেট গমন করে। এই কাফেলার সিপাহসালার ছিলেন 'কায়েদ সাহেব হুজুর' নামে খ্যাত বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী।

সিলেট গণভোট উপলক্ষে ছাত্র ও তরুণ সমাজের মধ্যেও বিরাট সাড়া পড়ে যায়। মুসলিম ছাত্র নেতৃবৃন্দ, যেমন নূরুদ্দীন আহমদ, শাহ আজিজুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, সুলতান হোসেন খান, মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামরুজ্জামান, আবু নাসের প্রমুখ সিলেট গণভোট উপলক্ষে রাত-দিন কাজ করেন।

সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই। আমরা বেশ কয়েকদিন আগেই সিলেটে পৌঁছে যাই। ফরিদপুর থেকে তখন সিলেট যেতে হত গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেনে যেয়ে সেখান থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারে, অতঃপর চাঁদপুর থেকে ট্রেনে লাকসাম ও আখাউড়া হয়ে সিলেট। সেকালে (অবিভক্ত) বাংলাদেশে যেসব রেলপথ চালু ছিল সেগুলোর নাম ছিল ইআইআর (ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে), বিএনআর (বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে), ইবিআর (ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে) এবং এবিআর (আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে)। প্রথম দু'টিতে ট্রেন চলাচল করত হাওড়া রেল স্টেশন থেকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে। চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসামের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রেলপথের নাম ছিল এবিআর। বাংলাদেশের অন্যান্য বিরাট অংশ জুড়ে যে রেলপথ ছিল সেটা ছিল ইবিআর। এগুলোর বাইরে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পাহাড়ে চলাচলের উপযোগী বিশেষ ধরনের ছোট্ট রেলপথ ছিল, যার নাম 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে'– সংক্ষেপে ডিএইচআর।

চাঁদপুর থেকে এবিআর-এর ট্রেনযোগে আমরা সিলেট গিয়েছিলাম। পথে লাকসাম ও আখাউড়ায় গাড়ী বদল করেছিলাম কি-না তা এতদিন পর মনে নেই। তবে আমরা বিরাট দল ছিলাম বলে একটা ট্রেন বগির প্রায় সবটাই আমাদের দখলে ছিল। হৈ-হুল্লোড়ে সময় কাটছিল বেশ ভালই। মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে পাকিস্তান আন্দোলনের গান গাইছিলাম। আর থেকে থেকে 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর', 'চলো চলো সিলেট চলো, পাকিস্তান কায়েম করো' প্রভৃতি নানা রকম শ্লোগান দিয়ে জানান দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা কারা, কোথায় যাচ্ছি।

ট্রেন আসামের অভ্যন্তরে সিলেট জেলার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতেই দলপতি জানিয়ে দিলেন সেকথা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আসাম প্রদেশে তখন কংগ্রেসী শাসন চলছে। গোপীনাথ বরদলুইয়ের কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দুর্নাম অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের বাইরে অপর একটি প্রদেশে এ প্রথম সফর আমার মনে একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতির পাশাপাশি এক অজানা আশংকার ভাবও সৃষ্টি করেছিল। তবুও সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে ট্রেনের জানোলা দিয়ে দেখে চলছিলাম দু'পাশের বিভিন্ন দৃশ্য। মাঝে মাঝে ছোট-খাট পাহাড় বা জঙ্গল, আবার থেকে থেকে কৃষি ক্ষেত ও গ্রাম্য জনপদ। বেশ ভালই লাগছিল এসব দেখতে। এরই মধ্যে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবার বেশ পর ট্রেন প্রবেশ করল দু'পাশের অনুচ্চ পাহাড় কেটে তৈরী করা পথে। দু'পাশে জঙ্গলের জন্য বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দলপতি হুকুম দিলেন সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে এবং কোন শ্লোগান না দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনের বন্ধ বগির গায়ে শক্ত কিছু নিক্ষিপ্ত হবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেশ ক'বারই এ রকম হলো। কিছুটা ভয়ই লাগছিল।

ভয় পাবার মত ব্যাপারই ছিল বটে। মনে হল, কে বা কারা আক্রমণ চালাচ্ছে। দলপতির কাছেই পরে জেনেছিলাম আসল রহস্য। সিলেট বাংলাদেশে যোগ দেবে কি-না এ প্রশ্নেই গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সিলেটের বাংলাদেশে যোগ দেয়ার বিরুদ্ধে যেসব দল কাজ করছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল কংগ্রেস। এরা কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে এ ধরনের প্রচারণা চালিয়েছিল যে, যারা 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর' বা পাকিস্তানের শ্লোগান দেয়, তারা তোমাদের মারতে চায়। এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত কিছু উপজাতি এর আগেও নাকি চলন্ত ট্রেনের মুসলিম লীগ কর্মীদের কামরায় তীর ধনুক দিয়ে আক্রমণ চালায়।

সিলেটে যেয়ে দেখলাম, হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। গণভোট উপলক্ষে সমগ্র সিলেটে মুসলমানদের মধ্যে যেন এক বিরাট সাড়া পড়ে গেছে। সিলেটের মুসলমানরা যেন মুক্তির আশায় এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে।

গণভোটের মাধ্যমে তারা জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির জন্য প্রহর গুনছে। গণভোটে যাতে তারা বাংলাদেশে যোগদানের পক্ষে সঠিকভাবে ভোট দিতে পারে - এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় তারা। সিলেট তথা আসাম তখনও গোপীনাথ বরদলুইয়ের কংগ্রেসী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। বৈরী প্রশাসনের মোকাবিলায় সিলেটের মুসলমানদের এ মুক্তি প্রয়াসে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্র লীগ, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা আমরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দেখে তারা আমাদের প্রতি দারুন খুশী ও কৃতজ্ঞ।

সিলেটে গণভোটের ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমন্বয়কারীর ভূমিকায় ছিলেন সুসাহিত্যিক জনাব হাবীবুল্লাহ বাহার, যিনি পরবর্তীকালে পূর্ব বঙ্গ প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ঢাকার স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্বে ছিলেন ১৫০ মোগলটুলীস্থ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের নেতা, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক।

গণভোটের ব্যাপারে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের উপর দায়িত্ব পড়েছিল মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংস্থার কর্মী এবং সমর্থকদের নিরাপত্তা বিধান করা। এ জন্য যে তাদের কোথাও যুদ্ধ বা সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছে তা নয়। ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরিহিত সদস্যরা কোথাও মার্চ করে হাজির হলেই হামলাকারীরা হাওয়া হয়ে যেত। আমরা সিলেটে পৌঁছার এক বা দু'দিন পরই বোধ হয় হবে, আমরা দুপুর বেলা হোটেলে কেবল খেতে বসেছি, এমন সময় খবর এল, মুসলিম লীগ কর্মীদের উপর কংগ্রেসীরা কোথায় হামলা চালিয়েছে। আহার অসমাপ্ত রেখেই তৎক্ষণাৎ আমাদের রওনা হতে হল।

সেদিনটির কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে দু'লাইনে মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে যাওয়া ন্যাশনাল গার্ডদের এভারেজের তুলনায় আমরা যারা একটু বেশি লম্বা ছিলাম, এমন দু'জন ছিলাম লাইনের সামনে। পতাকা বহনের দায়িত্বও ছিল আমাদের দু'জনের উপর। মুসলিম লীগের সবুজের উপর সাদা চাঁদ-তারা খচিত পতাকা। পতাকা হাতে যখন হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত সিলেটের রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলছিলাম, মনে হচ্ছিল, আমি যেন মুসলিম লীগের নয়, ইসলামের পতাকাই বহন করে চলেছি। মনে মনে কিছু ভয়ও যে লাগেনি তা নয়। কারণ, প্রতিপক্ষ আক্রমণ চালালে তার প্রথম শিকার হতে হবে আমাদের দু'জনকেই। যদি আক্রান্তই হই, তখন কি করবো? একদিকে পৈত্রিক প্রাণ, অন্যদিকে 'ইসলামের পতাকা'র মর্যাদা! ভেতর থেকে এক অদম্য আবেগাপ্লুত সংকল্প বলে দিল, ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রয়োজনে শহীদ হব!

না, শেষ পর্যন্ত আমাকে শহীদ হতে হয়নি। আমরা দ্রুত মার্চ করে অকুস্থলে পৌছবার আগেই হামলাকারীরা উধাও। সুতরাং পুনরায় আমরা বিজয়ীর বেশে মার্চ করতে করতে হোটেলে ফিরে এসে অসমাপ্ত আহার সমাপ্ত করলাম।

বাইরে থেকে আগত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও ন্যাশনাল গার্ডের কোন দল কোথায় যাবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের অন্যতম দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক-রাজনীতিক নেতা হাবীবুল্লাহ বাহার। মাথায় টাক, সদা হাস্যময় বাহার সাহেব জানালেন, করিমগঞ্জ মহকুমার উপজাতি-অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি চৌকষ ন্যাশনাল গার্ড দল পাঠাতে হবে। সেখানে মুসলমানদের উপর নানাভাবে উৎপাত চালানো হচ্ছে। মুসলমানরা হুমকির মুখে আছে। বাহার সাহেব আরও জানালেন, সেখানে যাবে পাঞ্জাব থেকে আগত ন্যাশনাল গার্ড। তবে যেহেতু পাঞ্জাব ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা অত্যন্ত কম, বাংলাদেশ থেকে আগত ন্যাশনাল গার্ডদের মধ্যে যারা বেশ লম্বা, তাদেরও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিপজ্জনক এলাকার কথা শুনে আমাদের অনেকের মনেই তখন ভয় ঢুকে গেছে। আমার চাচাতো ভাই ইসহাক আলী মণ্ডল বেঁটে ছিলেন বলে বেঁচে গেলেও আমি ফেসে গেলাম। হাই মাদ্রাসার ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি নিজেও খুব বেঁটে ছিলাম।

এজন্য মনে মনে আফসোসের অন্ত ছিল না। কলেজে দু'বছর অধ্যয়নকালে আমি এতারেজ বাঙ্গালীর তুলনায়ও দীর্ঘদেহী হয়ে উঠাতে আনন্দই পেতাম। কিন্তু এখন মনে হল, বেঁটে থেকে গেলে এই বিদেশ বিভূইয়ে চাচাত ভাইয়ের সাথে আমার এভাবে আজ ছাড়াছাড়ি হত না।

আসাম প্রদেশে মুসলমানরা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল। সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের পর উপজাতি, তারপর ছিল হিন্দুদের অবস্থান। আসামে মুসলমানদের মেজরিটিই ছিল বাঙালী। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের সুযোগ-সুবিধা এই স্থল বেষ্টিত (Land-locked) জনপদটির জন্য ছিল অপরিহার্য। তাছাড়া আর্য বংশোদ্ভূত হিন্দু-নিয়ন্ত্রিত ভারতের সাথে নৃতাত্ত্বিক কারণেও মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত আদি অহমীয় ও উপজাতি জনগোষ্ঠী কখনও একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। ফলে আহমীয় ও উপজাতিদের অনেকেই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সাথে অধিকতর নৈকট্য অনুভব করত। এসব কারণেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তথা বাংলাদেশের সাথে আসামের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছিল লাহোর প্রস্তাব ও ১৯৪৭ সালের সার্বভৌম বাংলা আন্দোলনে।

আমরা যখন গণভোট উপলক্ষে সিলেট যাই, তখন অবশ্য এসব বিবেচনা আপাত-অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের একটানা মুসলিমবিরোধী নির্যাতন ও প্রচারের ফলে তখন সিলেটের মুসলমানরা ত্যক্ত-বিরক্ত। তারা যে কোন মূল্যে পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে যোগ দিতে শুধু ব্যগ্রই নয়, সংকল্পবদ্ধও। কংগ্রেসের মুসলিমবিরোধী রাজনীতির কারণে আসামে মুসলমানরা কম নির্যাতন ভোগ করেনি। লাইন প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে আসামে যে লাখ লাখ বাঙালী কৃষক তাদের বসতবাটি ও জমিজিরাত থেকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ হয় তাদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। আসামে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে সিলেটের থানা থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে সেখানে চাঁদ-তারা খচিত মুসলিম লীগ পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে কংগ্রেস সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন শহীদ আলকাস।

বরদলুই সরকারের মুসলিমবিরোধী জুলুমবাজির সব সীমা-সরহদ্দ ছাড়িয়ে যায় যখন মুসলমানদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠে সরকার নামাজরত মুসলমানদের উপর গুলি চালিয়ে শত শত মুসল্লী হত্যার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এই অমানুষিক শোকাবহ ঘটনার স্মরণেই সিলেট রেফারেন্ডামের অন্যতম শ্লোগান ছিল : 'আসামে আর থাকব না, গুলি খেয়ে মরব না', 'আসাম সরকার জুলুম করে, নামাজের উপর গুলি করে'। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশে যোগদানের বিরুদ্ধে শ্লোগান তৈরি করা হয়েছিল। 'বাংলাদেশে যাব না, না খেয়ে মরব না'। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে বৃটিশ সরকার-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষেরই ইঙ্গিত ছিল এতে।

সিলেটের গণভোটে আরও অনেক মজার মজার শ্লোগান ব্যবহৃত হয়েছিল। গণভোটের প্রাক্কালে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যজনিত যে দৃঢ় আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছিল যে শ্লোগানটিতে, সেটি ছিল : 'সিলেটের গণভোটে কংগ্রেসের পরাজয়, নিশ্চয় নিশ্চয়'। সিলেটের জনগণের 'ক'-এর উচ্চারণ প্রায় 'খ'-এর কাছাকাছি। ফলে শ্লোগানের সময় 'কংগ্রেসের' শব্দটা আমাদের অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল 'খংগ্রেসের'। গণভোট শুরু হবার আগের দিন অর্থাৎ ৫ জুলাই মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের পক্ষ থেকেই নিজ নিজ ভোটারদের ভোটের তারিখ মনে করিয়ে দিতে একটা সাধারণ শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল : 'ভোটের তারিখ কাল-পরশু'। সিলেটের আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে আমাদের কানে এ শ্লোগানটাও মনে হয়েছিল : 'ভুটের তারিখ খাল-পরশু'।

যে ট্রেনে আমরা সিলেট থেকে করিমগঞ্জ গিয়েছিলাম, সেটি কুলাউড়া জংশনে অনেকক্ষণ থামে। যতক্ষণ ট্রেনটি স্টেশনে দাঁড়ানো ছিল, আমরা শ্লোগানে শ্লোগানে প্লাটফর্ম মুখরিত রেখেছিলাম। অবশেষে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলে আমরা যখন আমাদের নির্দিষ্ট বগিতে উঠেছি, তখন কোত্থেকে একটি ছোট্ট মিছিল এসে আমাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করে। সাথে সাথে আমরাও ঝটপট ট্রেন থেকে নেমে পড়ে পাল্টা শ্লোগান দিতে শুরু করলাম। আমরা এভাবে নেমে পড়ব, তা তারা ভাবতেও পারেনি। আমরা প্লাটফর্মে নামার সাথে সাথেই তারা ভেগে গেল। এরপর করিমগঞ্জ পর্যন্ত আমরা কখনও আর শ্লোগান বিরতি দেইনি।

আগেই বলা হয়েছে, গণভোট কালে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল গার্ডের দলটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সকলেই পাঞ্জাবী ছিল না, তার মধ্যে আমার মত দীর্ঘদেহী অনেক বাঙালীও ছিল। অর্থাৎ দলটি পাঞ্জাবী বলে পরিচিত হলেও এতে আমার মত বহু নকল পাঞ্জাবীও ছিল।

দৈর্ঘ্য দিয়ে এভাবে না হয় দৈহিক পার্থক্যটা কিছুটা গোপন করা গেল, কিন্তু ভাষা? ওরা উর্দুতে কথা বলে, আমরা তো উর্দুতে কথা বলতে পারি না। কথা বলতে গেলেই তো আমরা যে বাঙালী তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমাদের প্রতি এজন্য উপদেশ ছিল, আমরা যেন বাইরের লোকদের সামনে কম কথা বলি এবং যখন কথা বলি তখন বাংলা ক্রিয়াপদের সাথে খাওঙ্গা, করোঙ্গা, যাওঙ্গা ধরনের কিছু উর্দু ধারা মিশেল দিয়ে কথা বলে আমাদের বাঙালীত্ব গোপন রাখতে চেষ্টা করি। এ কৌশলের কারণ ছিল, প্রতিপক্ষ বাঙালীদের তুলনায় পাঞ্জাবীদের অনেক বেশি, প্রায় যমের মত, ভয় করত।

সিলেট জেলার শেষ সীমায় যে রেল স্টেশনটিতে আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলাম, তার নাম আজ আর মনে নেই। স্টেশন থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে আমাদের ক্যাম্প। বেশ কয়েকটা গাড়ী ও জীপে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তার সর্বাঙ্গে অযত্নের ছাপ ছিল স্পষ্ট। ফলে ভ্রমণটা তেমন আরামদায়ক হবার কথা ছিল না। তবুও অজানা নতুন একটা পাহাড়ী জনপদে আসতে পেরে আমার বেশ ভালই লাগছিল। দূরে ছোটো ছোটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তবে আমরা যাচ্ছিলাম সমতল ভূমি দিয়েই। নানারকম লোকই দেখছিলাম রাস্তা দিয়ে চলতে। কোন কোন পথযাত্রী আমাদের গাইডের বেশ পরিচিত মনে হল। জীপ থামিয়ে তাদের সাথে সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় করলেন তিনি।

এরই মধ্যে দেখলাম চার-পাঁচজন উপজাতি পথ চলছে এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে বড়ো বড়ো দা। আমাদের গাড়ীর দিকে তারা কেমনভাবে তাকাচ্ছে এবং নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে। আমরা একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। গাইড একটু দূরে গাড়ী থামিয়ে নিজে তাদের সাথে কথা বলতে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে হাসি মুখে জানালেন, এরা খুবই নিরীহ ও অরাজনৈতিক উপজাতি। এরা যাচ্ছে পাহাড়ে কাঠ কাটতে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

গণভোট দু'দিন ধরে চললেও আমাদের ঐ ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল মাত্র একদিন একরাত। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা জানালেন, 'গোপন সূত্রে আমরা জেনেছি গণভোটের দ্বিতীয় দিনে ওরা আপনাদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আমরা এ এলাকার আমাদের সব ভোটারদের প্রথম দিনেই ভোটদান শেষ করবার কথা বলে দিয়েছি। আপনাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কোন সাহায্য করবে না। ভিতরে ভিতরে বরং প্রতিপক্ষকেই সহায়তা দিবে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আপনারা কোন বড়ো মুসিবতে পড়েন, তা আমরা চাই না।

আমাদের ক্যাম্পের স্থানটি ছিল, মনে হয়, লোকাল বা ইউনিয়ন বোর্ডের কোন ডাকবাংলো। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে একটি ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা প্রায় ভুতুড়ে এ বাড়িতেই কাটল আমাদের ৬ জুলাই সারা দিন ও দিবাগত রাত। আমরা যারা ন্যাশনাল গার্ড হিসেবে গিয়েছিলাম তারা মুসলিম লীগ, ছাত্র লীগ কর্মী বা অন্যদের মত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনা, ভোট দেয়ানো প্রভৃতি কাজে অংশ নেইনি। আমাদের প্রধান কাজ ছিল নিরাপত্তার পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা। সারাদিন আমাদের কাজ ছিল কিছুক্ষণ পরপর রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলা, যাতে করে আমাদের কর্মী ও ভোটারদের উপর প্রতিপক্ষ কোন হামলা চালানোর সাহস না পায় এবং আমাদের লোকদের মনোবল অক্ষুন্ন থাকে।

অন্যদের সামনে ঐ একদিন আমরা কথা খুব কমই বলেছি। যখন বলেছি, তখনও বলেছি সংক্ষেপে, ইংরেজী বা ভাঙ্গা উর্দুতে। রাতে আমরা ঘুমিয়েছিলাম পালা করে। রাতের প্রথমার্ধে যাদের ঘুমাতে দেওয়া হল, তারা শেষার্ধে রাত জেগে ক্যাম্প পাহারা দিল। অনুরূপভাবে যারা প্রথমার্ধে ঘুম কামাই করে ক্যাম্প পাহারা দিল,

তাদেরকে রাতের শেষার্ধে ঘুমাতে দেওয়া হল। আমার অবশ্য জেগে থেকে ক্যাম্প পাহারা দেয়ার সময়ে তো নয়ই, এমনকি ঘুমের পালায়ও ঘুমানো হয়ে ওঠেনি। নতুন জায়গায় এমনিতেই আমার ঘুম আসে না, তার উপর টেনশন থাকলে তো কথাই নেই।

৭ জুলাই ভোরেই আমরা ঐ উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমরা যে রেলপথে ঐ এলাকায় যাওয়া-আসা করেছিলাম, তার অধিকাংশ স্টেশনের নাম আজ আর মনে নেই। তবে দু'টি স্টেশনের নাম বেশ মনে আছেঃ একটি বদরপুর, অন্যটি ভাঙ্গা। বিশেষ করে শেষোক্তটি মনে থাকার পেছনে ছিল ছোট্ট একটি ঘটনা। ভাঙ্গায় একজন কংগ্রেস কর্মী জাল ভোট দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। বিদ্যুৎগতিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে করিমগঞ্জসহ সমগ্র সিলেট জেলায়। সাথে সাথে মুসলিম লীগ কর্মীদের শ্লোগান - 'সিলেটের গণভোটে কংগ্রেসের পরাজয়, নিশ্চয় নিশ্চয়, -এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে একটি নতুন শ্লোগান –'ধরা পড়েছে কংগ্রেসী চোর, কোথায়? ভাঙ্গায়'।

সিলেটের গণভোটে মুসলিম লীগের যেমনটি আশা ছিল, ঠিক তেমনটিই ঘটল। কংগ্রেসের সাংগঠনিক কলাকৌশল ও নীল নকশার ষড়যন্ত্র, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের দীর্ঘদিনের প্রভাবকে উপেক্ষা করে সিলেটের মুসলমানরা একচেটিয়া ভোট দিল মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী তথা বাংলাদেশে যোগ দেয়ার পক্ষে। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক সিলেট বিজয়ের পর তাঁর স্মৃতিধন্য পুণ্যভূমি সিলেটের জনগণের মুসলিম উম্মাহর সাথে সংহতি ঘোষণার এ যেন ছিল আরেক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তানের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক ভোটদানের পরও যে অশুভ খড়গাঘাতে পাকিস্তান আন্দোলনের সে বিজয়কে অনেকটাই ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেই একই খড়গাঘাতে সিলেট গণভোটে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বিজয়কেও ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়।

উপমহাদেশের ইতিহাসের এ অশুভ খড়গটির নাম র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ। ১৭৫৭ সালের পলাশী ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঐতিহ্যবাহী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ক্রুর চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল তারই সর্বশেষ মসিলিপ্ত পর্ব ছিল এই র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ।"[১০৭]

দুই

"...হঠাৎ মাউন্ট ব্যাটেনের রোয়েদাদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মুক্তির আদেশ আসে। পেইন সাহেব আমাদের তিনজনকেই দশ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে থেকে এক মাস ছয় দিন কারাকক্ষে থাকার পর মুক্তি পেলাম। তার আগেই সিলেটের রেফারেন্ডাম ঘোষিত হয়েছে। ঠিক করলাম আপাতত তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বো।

শিলচর থেকে আমি আর মরহুম আব্দুল বারী চৌধুরী চললাম সিলেটের পথে, আর আব্দুল হাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা বদরপুর জংশন হয়ে গোহাটী যাবে বলে সিদ্ধান্ত করলো। মাউন্ট ব্যাটনের রোয়েদাদ আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো, আব্দুল হাই দীর্ঘশ্বাসে ফেলে বললো - এই হয়তো তোমাদের সঙ্গে চিরজনমের ছাড়াছাড়ি। তার ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে সফল হয়েছিলো। ভারত বিভাগের পর বেচারী মাত্র একবার সিলেটে এসেছিলো।

শিলচর থেকে তখনকার দিনে চালু টু ডাউনে চড়ে আমরা দু'জন চললাম সিলেটে। লাতু স্টেশন থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে আমার ছোটো বোনের শ্বশুর বাড়ি, বাহাদুরপুরে। তাই এখানেই আমি নেমে পড়লাম। ওদের তখন ভীষণ সংকটাবস্থা। একদিকে ভারত বিভাগের জন্য ওরা মুসলিম লীগ গড়ে তুলেছেন, অপরদিকে প্রফুল্ল ভট্টাচার্য বলে এক ভদ্রলোকের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট আন্দোলন ভীষণ দানা বাঁধছে।

---

১০৭. আবদুল গফুর/আমার কালের কথা। [বিসিবিএস - ফেব্রুয়ারি, ২০০০। পৃ. ২৭৩-২৮১]

বাহাদুরপুরের সকল চৌধুরীই নানকার প্রজার দল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। চৌধুরীদের ধারণা ব্যক্তিগত কারণ থেকেই এই আন্দোলনের উৎপত্তি। নানকার তথা কম্যুনিস্টদের বিদ্রোহের নেতা প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্যের এক বোনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এবং এক মুসলিম চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হওয়াও নাকি এ বিদ্রোহের কারণ ছিলো। এ ভট্টাচার্যের বোনের প্রথমে বিয়ে হয়েছিলো কুমিল্লা জিলার কোনো এক ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে। তবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না। তাই স্বামী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। বিধবা ব্রাহ্মণী পরে বাহাদুরপুরের এক চৌধুরীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে পতিত্বে বরণ করলে লাউতা বাহাদুরপুরের হিন্দু সমাজে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যা হোক ভট্টাচার্য তখন নানকার লোকদের অবিংসাবাদী নেতা। ওরা তাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। তার উপর মাঝে মাঝে চৌধুরীদের উপর হামলা করতেও ত্রুটি করে নি। তাই স্টেশন থেকে নেমে আমি খুব ভয়ে ভয়ে চললাম, বোনের বাড়ির অভিমুখে লাউতা বাহাদুরপুরে।

নৌকা করে যেতে হবে ছ'মাইল পথ। মাঝিদের সঙ্গে দরকষাকষি নিয়ে বোঝাপড়া করতে খুব বেশি সময় নষ্ট হলো না। বুঝতে পারলাম চুক্তি করে নানকারীদের আবার সে-দাসেই পরিণত করা হয়। ওরা সব সময়েই ছিল মানবের মুখোপেক্ষী। তিনি খেয়াল খুশি মতো তাদের বসবাস করবার অধিকার দিলেই তারা থাকতে পারতো। আবার হুকুম করা মাত্রই উঠে যেতো। যাক নানকার আন্দোলনের ফলেই হোক অথবা পাকিস্তান সরকারের সুবুদ্ধির ফলেই হোক নানকার প্রথা রহিত হয়েছে।

অনেকদিন পর ছোটো বোনের বাড়িতে গিয়েছি। ওদের আদর আপ্যায়নের আর সীমা নেই। বাহাদুরপুরে তিন ঘর চৌধুরীদের সকলেই আমাদের আত্মীয় ও কুটুম্ব।

বাহাদুরপুর থেকে ছোটো বোনটিকে নিয়ে বাড়িতে রওয়ানা হলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তিল ধারণেরও স্থান নেই। একদিকে যেমন ইংরেজ চলেছেন তার গন্তব্যস্থানে, তেমনি হিন্দু মুসলিম সকলেই চলেছে তাদের নিজ নিজ পথে। পথ আবার একই বিষয়কে কেন্দ্র করে। হিন্দুরা চায় সিলেট ভারতে থাকবে, আর মুসলিমেরা চায় সিলেট পাকিস্তানে যাবে।

কুলাউড়াতে গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর', 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগানের গগণভেদী শোরগোলে একেবারে হকচাকিয়ে গেলাম। আমি সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউই পূর্বে জেলে যান নি। তাই কুলাউড়াতে মুসলিম লীগের কর্মীরা আমাকে আটকে দিতে চাইলো। আমার সঙ্গে আমার ভগিনী থাকার অজুহাতে ওদের অভ্যর্থনা থেকে মুক্তি পেলেও ফুলের মালার ভারে আমার গলদেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সিলেটে পৌছোনোর পরেও আমার অভ্যর্থনার আর অন্ত নেই। আমি যেন রাতারাতি মস্তবড়ো নেতায় পরিণত হয়েছি।

তবে সময়টা ঠিক অভ্যর্থনার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। আমাদের সামনে রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। কংগ্রেস ও জামিয়তপন্থী মাওলানাদের সংঘবদ্ধ প্রচারণা থেকে আগলে রেখে সিলেটের জনমত পাকিস্তানের অনুকূলেই নিতে হবে। তাড়াতাড়ি মুসলিম লীগ অফিস যেয়ে কাগজপত্র নিয়ে আমাকে যেতে হবে ছাতকে। সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের নিয়ে যেতে হবে নিজ গ্রাম পানাইলে।

সিলেটের মহিলাদের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেছে। বেগম জোবেয়দা খাতুন, বেগম সিরাজুন্নেসা দু'জনেই বেরিয়ে পড়েছেন নারীদের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। বেগম জোবেয়দা খাতুন পূর্বে কংগ্রেস কর্মীরূপে খুবই খেটেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাধবার বহু আগেই তিনি পর্দা প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বেগম সিরাজুন্নেসা পর্দা প্রথার শৃঙ্খল থেকে বিমুক্ত হলেও সভা সমিতিতে এর আগে আর যোগদান করেন নি। হঠাৎ যেন যাদুর কাঠির স্পর্শে তিনি বিপ্লববাদীতে পরিণত হলেন। মা-বোনদের এতো সাড়া ইতোপূর্বে আর দেখিনি। ওদের এ জাগরণ দেখে মনে অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হলো।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টিমারে আরোহন করে গেলাম সুনামগঞ্জে। সুনামগঞ্জবাসী মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা আর কোনোদিনই দেখিনি। আতুর, খোঁড়া, কানা, অন্ধ, বিকলাঙ্গও সেদিন এগিয়ে এসেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে। এমনি তারা আমাদের ছাড়বে না, সারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে তবেই না ছাড়বে। ওদের আদরের অত্যাচার সহ্য করে দু'একদিন সুনামগঞ্জে বাস করে, বাড়িতে এসে মাত্র একদিন না দু'দিন আরামের সঙ্গে ভাত খেয়ে ছাতকে রওয়ানা হলাম।

ছাতকে এক এলাহি কাণ্ড! গোলাম কিবরিয়া আজাদ বলে এক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী মিছিলের পুরো ভাগে গান করে চলছে এবং সকলেই তার সঙ্গে সঙ্গত রেখে তার গানের পদগুলোর প্রতিধ্বনি তুলছে। গানটি স্বরচিত :

ভাই মুসলমানেরে - ভোট দিয়ে কায়েম করো পাকিস্তানরে! মাওলানা মহুলের বাণী কোরান প্রবল জ্ঞান দিয়ে গঠন কর সাধের পাকিস্তান।

দশ হাজার লোকের মিছিল। ওদের হাতে আবার লাঠি সড়কি। জান কোরবান করতেই ওরা এসেছে। এদের প্রধান আক্রোশে ছিল ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার উপর। তিনি নাকি তাদের হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের অনুকূলে ভোট দিলে তাদের চেনাবেন। তাই ওরা থানা আক্রমণ করতে চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে সিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সেদিন ওদের প্রতিহত করতে যেয়ে কি বেগ পেতে হয়েছিলো।

হাতজোড় করে ওদের প্রতিহত করবার জন্য অনুরোধ করলে, ওরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মত হলো। ওদিকে কম্যুনিস্ট ভায়ারা আবার মুসলিম লীগের সঙ্গে কিছুদিন পূর্বের মিতালি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শ্লোগান তুলেছেন :

পূর্ব বঙ্গে যাবো না পানি খেয়ে মরবো না, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই চলো দু'য়ে মিলে ভারতে যাই।

মুসলিম লীগ কর্মীরা পাল্টা শ্লোগান তুললো :

হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই চলো দুয়ে মিলে গরু খাই।

গরু অবশ্য খেতে কোনো হিন্দুই রাজি হলো না। তবে সকল হিন্দু মিলে মস্তবড়ো ভোজ চড়িয়ে সার্বজনীন খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করলো। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণও তার পৈতা খোলা রেখে এগিয়ে এলো অস্পৃশ্য তফসিলীদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সর্বসাধারণের বিপদই হচ্ছে সকল দেশকে এক স্তরে দাড় করানোর শক্তিশালী কারণ, সেদিন সাধারণের বিপদ দেখা না দিলেও হিন্দু জনসাধারণ একপাত্রে ভোজন করার জন্য বাধ্য হয়েছিলো।

তবে তাদের এ ছুৎমার্গের ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাতে বাধ সাধলেন অবিভক্ত বাঙলার তফসিলী সম্প্রদায়ের মন্ত্রী মি. বারোড়ী। তিনি ছুটে এসেছেন কোলকাতা থেকে, আপাত বাধ্যতামূলক ঐক্য থেকে তার সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে। তিনি ডাকবাংলোর সামনে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'তোমরা এ খিচুড়ি খেয়ো না-এ খিচুড়ি নয়, বিষ।' যেমনি বলা, অমনি হাজার হাজার তফসিলী তাঁর কথায় সায় দিয়েই বলে –হ্যাঁ এটি বিষ বই আর কিছুই নয়।

যাক নিশ্চিন্ত হয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা পনেরোজন ছেলে সহ নিজ গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদের পরগনার গণভোটের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র ছিল দূর্গাপুরে। মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও হাজির হলাম সে-কেন্দ্রে। একে ত বৃষ্টিপাতের দরুন স্যাতসেঁতে সুনামগঞ্জ মহকুমা একেবারে নাজেহাল। তার উপর উভয় পক্ষের ভোটারদের যাতায়াতের ফলে কাদার ছোড়াছুড়ির আর অন্ত নেই। দু'জন অধ্যাপক আমাদের এ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে সাহায্য করতে এসেছেন। একজন মুরারী চাঁদ কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, অপরজন সিলেট আলিয়া মদ্রাসার অধ্যাপক মাওলানা সাহেব। সঙ্গীনধারী গুর্খা পাহারাওয়ালা খটখট শব্দ তুলে দূর্গাপুর পাঠশালার কেন্দ্রে সগৌরবে আনাগোনা করছে।

ভোটও নেওয়া হচ্ছে সুযোগ ও সুবিধামতো। যেসব গ্রামে হিন্দু তথা কংগ্রেসীদের সংখ্যা অধিক সেগুলোই আগে রেকর্ড করা হচ্ছে। মুসলিম সংখ্যাবহুল গ্রামগুলোকে রেখে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীকালে নেওয়ার জন্য। এ দূরভিসন্ধি বুঝতে অবুঝ গ্রামবাসীদেরও দেরি হলো না। তাই তারা এসে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ করে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুকধারী গুর্খা একজনকে অহেতুক কষ্ট দেওয়ার পাশবিক বাসনায় একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বসে। আর যায় কোথায়! ওরা তাকে ধরে টেনে দু'টুকরো করবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গুর্খা আমার দিকে চাইল বড়ো করুণভাবে। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকও বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, জয় তো আপনাদের অবধারিত। অনর্থক একটা বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে লাভ কি?

তাই ওরা যেমন গুর্খার দুই হাত চেপে ধরে তেমনি আমিও ওদের দুই হাত চেপে ধরলাম। অনেক টানাটানির পর গুর্খাকে ওদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আনলাম।

ভোটের পর্ব শেষ হয়ে গেলো। বিজয়ের উল্লাসে মুসলিম জনসাধারণ কেবল 'আল্লাহু আকবর', 'আল্লাহু আকবর' রবে দিগন্ত কম্পিত করে তুলল।

আসামে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছে। সিলেট গণভোটের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে - ইত্যাকার বহু কথা জনশ্রুতির সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবে সিলেটের সঙ্গে কোন যোগ নেই। আমার চাচাতো ভাই আহবাব সাহেব ও আমি নৌকাযোগে রওয়ানা হলাম সিলেটের উদ্দেশ্যে।

নৌকা তো চলছে সিলেটের অভিমুখে। পথে পথে আল্লাহু আকবর ধ্বনি শুনতে পেয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আল্লাহর পথের মোজাহিদেরই জয় হয়েছে।"[১৩৮]

তিন

"...যেখানে সমগ্র বাংলাদেশের মুসলিম লীগ এমএলএরা সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ সাহেবকে নেতা বানিয়েছিলেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন — এই অবস্থার মধ্যে দিল্লি থেকে হুকুম আসল আবার নেতা নির্বাচন হবে। শহীদ সাহেব শাসন চালাবেন, মুসলমানদের রক্ষা করবেন, না ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন! সিলেটের গণভোটেও শহীদ সাহেবকে যেতে হল। আমাদের মত হাজার হাজার কর্মীকে সিলেটে তিনি পাঠালেন। টাকা বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল তাকেই বেশি। এস. এম. ইস্পাহানী সাহেব বেঙ্গল মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বহু টাকা দিয়েছিলেন, আমার জানা আছে। কারণ, শহীদ সাহেব তার সাথে যখন আলোচনা করেন ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমরা যখন সিলেটে পৌঁছালাম এবং কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন শহীদ সাহেব সিলেটে আসেন। আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় করিমগঞ্জ মহকুমায় এক বিরাট জনসভায়। আমিও সেই সভায় বক্তৃতা করেছিলাম।

মওলানা তর্কবাগীশ, মানিক ভাই (ইত্তেফাকের সম্পাদক), ফজলুল হক ও আমি পাঁচশত কর্মী নিয়ে একদিন সিলেটে পৌঁছি। আমাদের জন্য সিলেটের গণভোট কমিটির কিছুই করতে হয় নাই - শুধু কোন এলাকায় কাজ করতে হবে, আমাদের সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে হয়েছে। যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা শহীদ সাহেব করে দিয়েছিলেন। কারো মুখাপেক্ষী আমাদের হতে হবে না। শামসুল হক সাহেব ঢাকা থেকেও বহু কর্মী নিয়ে সেখানে পৌঁছে ছিলেন। শহীদ সাহেবের অনুরোধে দানবীর রায়বাহাদুর আর. পি. সাহা হিন্দু হয়েও কয়েকখানা লঞ্চ সিলেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই লঞ্চগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল মুসলিম লীগ কর্মী এবং পাকিস্তানের পক্ষে। কারণ, যানবাহন খুবই প্রয়োজন ছিল। শহীদ সাহেবের বন্ধু ছিলেন রায়বাহাদুর, তাঁর কথা তিনি ফেলতে পারেন নাই। রায়বাহাদুর আজও পাকিস্তানী। মির্জাপুর হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস গার্লস হাইস্কুল, কুমুদিনী কলেজ তারই দানে টিকে আছে।

সিলেট গণভোটে জয়লাভ করে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম।"[১৩৯]

---

[১৩৮]. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ/আত্মজীবনী। [উৎস প্রকাশন - আগস্ট, ২০০৭। পৃ. ১২২-১২৬]

[১৩৯]. শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী। [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ৭৫-৭৬]

চার

"...উপমহাদেশের স্বাধীনতা ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (১৯০৬) চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দুই দশকে ভারতের জন্য দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নিকট গ্রহণযোগ্য সংযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনার নানাবিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগ লাহোর সম্মেলনে বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আসামকে নিয়ে মুসলমানদের জন্য এক পৃথক আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে, যা পরবর্তীতে পাকিস্তান নামে খ্যাত হয়। বিভিন্ন টানাপোড়নের পর বৃটিশ সরকার ৩রা জুন ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা প্রদান করে। সিলেট ভারতের অধীনে থাকবে, না পাকিস্তানে থাকবে এজন্য গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণভোটে তৎকালীন পাকিস্তানের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে গণভোটের প্রচার অভিযান তদারকী করেন এবং সিলেটকে পাকিস্তানের পক্ষে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালান তারা হলেন : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মৌলানা আকরম খাঁ, নুরুল আমিন, জননেতা ভাসানী, মৌলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

বাংলায় তখন জনপ্রিয় স্লোগান ছিল : 'চালো চলো সিলেট চলো'। জমিয়তে ওলামা হিন্দের নেতা মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানী ভারতের সাথে সিলেট অন্তর্ভুক্ত রাখার পক্ষে প্রচারণা চালান। রেফারেন্ডাম পরিচালনার জন্য আসামের আইন সচিব মিঃ ষ্টর্ককে কমিশনার নিয়োগ করা হয়। মিঃ ডান ব্রেক ছিলেন তখন সিলেটের ডেপুটি কমিশনার। ১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৩১,১৬,৬০২ জন জনসংখ্যার ১৮,৯২,১১৭ জন মুসলমান ভোটার থাকায় সিলেট অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ছিল। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ই জুলাই তারিখে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের পক্ষে প্রতীক ছিল কুড়াল আর ভারতের পক্ষে ছিল কুড়ে ঘর।

গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে জনপ্রিয় স্লোগান ছিল–'হাত মে বিড়ি মুখ মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'–'আসামে থাকবো না, গুলী খেয়ে মরবো না', 'কংগ্রেস সরকার জুলুম করে, নামাজেতে গুলী করে– ভূতের ঘরে কুড়াল মারে', 'এই কুড়াল কার? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর' ইত্যাদি। গণভোটে দেওয়ান আঃ বাছিতের অবদান অপরিসীম। তিনি ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে রাজনগরের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বিরোধ তুঙ্গে ছিল। ১৯৪৭ সালের ৭ই এপ্রিল রাজনগর পোর্টিয়াস হাইস্কুলে কংগ্রেস বনাম মুসলিম দাঙ্গা প্রকাশ্যে রূপ নেয়। ভারতীয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গয়গড় গ্রামের সুউচ্চ বাঁশের মঞ্চ থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে বক্তৃতা দেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌলানা খলিলুর রহমান। খলিলুর রহমান জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নামক রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। উক্ত দল অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিল। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু রাজনগরে পদার্পণের পরের দিনই রাজনগর গোবিন্দবাটির বাজারস্থ কুমুদ রঞ্জন দাসের দোকানের ঘরের উচ্চ বারিন্দায় বক্তৃতা করেন সর্ব ভারতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও লিয়াকত আলী খান। তাঁদের ঝটিকা সফর মৌলভীবাজারে গণভোটের জোয়ারের পক্ষে বিপক্ষে তুমুল সচেতনার সৃষ্টি করে। গণভোটের দিন কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে। তাতে উভয় পক্ষ কিছু সংখ্যক কর্মী হতাহত হয়। গণভোটের ফলাফল ১২ই জুলাই টেলিগ্রাফযোগে দিল্লীতে পাঠানো হয়। সিলেট বিভাগে পাকিস্তানের পক্ষে ২,৩৯,৬১৯ আর বিপক্ষে ১,৮৪,০৪১টি ভোট পড়ে। ৫৫,৫৭৮টি বেশি ভোটে সিলেটকে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রীকরণের প্রস্তাবটি জয়ী হয়। মোট ভোটদাতাদের মধ্যে বৈধ ভোট ছিল ৭৭.৩৩%।

গণভোটের একটি গান নিম্নে প্রদত্ত হল :

আমরাতো আর আসাম থাকবো না ঘরবাড়ি কত ভাঙ্গিল পুড়িয়া ছাই করিল গো ...না খাইয়া মানুষ মরিল, দুঃখে পরাণ বাঁচে না। জুম্মা মসজিদের কথা শুনলে লাগে প্রাণে ব্যাথা গো ...বাংলো মসজিদ হাতি দিয়া, মসজিদের চিহ্ন রাখলো না। সিলটে আলকাছ মরিল গুলীতে শহীদ হইল গো ...শহীদি দরজা পাইল, পাইল সে বেহেশত খানা।

তেজপুরে গুলী করিয়া চৌদ্দজন মানুষ মারিয়া গো ...দিল রক্তে স্রোত বহাইয়া, নামাজ পড়তে দিল না। এমন জুলুম হয় যেখানে আমরা থাকবো না সেখানে গো ...আমরা থাকবো পাকিস্তানে, জালিম দেশে রইবো না। সবার কাছে এই মিনতি মুসলমান ভাই যত দূর্গতি, তোমরা কি তা বুঝ না। হবিব পাগলা কয়া কাঁইন্দ্যা কুড়াল বাক্সে ভোট দিয়া গো ...পাকিস্তান তোল গড়িয়া নইলে পাবে লাঞ্ছনা।

উল্লেখ্য যে, সিলেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ করিমগঞ্জ মহকুমার করিমগঞ্জ, বদরপুর, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি ও কাছাড়ের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ মহকুমা হাইলাকান্দি বৃটিশ চক্রান্তের মাধ্যমে ভারতকে দেওয়া হয়। অবশেষে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সিলেট বিভাগে পাকিস্তানের পতাকা উড়ে।"[১৪০]

পাঁচ

"...১৯৩৮ সালে সিলেটে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। শহরের কুদরতউল্লাহ্ মসজিদের সামনে নামাজের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিয়ে হয় এর সূত্রপাত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ১৯২২ সালে এই মসজিদ থেকেই ছিন্ন কোরআন শরীফ নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম যৌথ প্রতিবাদ ফেটে পড়ে এবং সেখানকে কেন্দ্র করেই ১৯৩৮-এর দাঙ্গা লাগে। এই দাঙ্গা বেশি বিস্তৃত হবার সুযোগ পায় নি ক্বিত্তা ও আকালির মুসলমানদের মুসলিম নেতৃবৃন্দ শহর আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করেন। এই দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আবদুল হামিদ (মন্ত্রী) আরশাদ আলী (মটু মিয়া) এবং তাদের সাথে আব্বা সবিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫০ সালে দাঙ্গা নিবৃত্তিতে মাহমুদ আলী ও যুবশক্তি প্রধান ভূমিকা রাখেন। আমরা সে সময় স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছি। রাতে এলাকা পাহারা দিয়েছি। আব্বাও মাঝে মাঝে নৈশ চক্করে বেরুতেন। ১৯৩৮ এর দাঙ্গা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গরু জবাই নিয়ে দাঙ্গা হচ্ছে, ঈদ উপলক্ষে দাঙ্গা হচ্ছে, হোলি উৎসবের সময় দাঙ্গা হচ্ছে, এমন কি ঘুড়ি উড়ানো নিয়েও দাঙ্গা হচ্ছে। কংগ্রেস শাসনে মুসলমানরা নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত এবং সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। নিখিল ভারতীয় পরিবেশের প্রভাবে আসামে তখন জোরে শোরে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক উদ্যোগ বেড়ে যায়। এই সময়ে আব্বা হন মুসলিম লীগের বড়ো সংগঠক এবং আমাদের ধোপাদিঘীর পারের বাসাখানি হয় একটি রাজনৈতিক আড্ডাখানা। ১৯৩৮ এর দাঙ্গার মানসিকতার ফসল হয় ১৯৩৯-এ মুরারীচাঁদ কলেজে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ। কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন বাতিল করে দেওয়া হয় এবং অতঃপর দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন পুণর্বহাল হয়।

আসাম মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন সম্ভবত: ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে এবং পরে ছাত্রনেতারা সমবেত হতেন দিগনির্দেশনা নিতে, কৌশল নির্ধারণ করতে ও প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। তৎকালীন ছাত্র নেতা যারা আমাদের বাসায় মজলিশ জমাতেন তাদের অনেকের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি উজ্জ্বল, তবে আরো অনেকের স্মৃতি বেশ আবছা। যাদের বেশ মনে আছে তারা হলেন এম এ হক (পুলিশের বড়কর্তা এবং একসময় মন্ত্রী), আবদুল নুর চৌধুরী (পরবর্তীতে কোঅপারেটিভ বিভাগে বড়কর্তা), তসাদ্দুক আহমদ এম.বি.ই (বিলেতে প্রসিদ্ধ জননেতা), আবদুস সামাদ আজাদ (বর্তমানে মন্ত্রী), ড. আখলাকুর রহমান (পরে তিনি আলিগড় যান ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ), আখলাকুর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার), মুবারউদ্দিন চৌধুরী (প্রয়াত বিচার বিভাগের বড়ো কর্মকর্তা), ডি এ রশীদ (তার পরবর্তী খবর সবিশেষ অবগত নই), ডা. এমদাদুর রহমান চৌধুরী (সামরিক ডাক্তার), আব্দুস সালাম (প্রয়াত ব্যবসায়ী এবং তেল কোম্পানিখ্যাত), পীর হাবিবুর রহমান (সিলেটের নিবেদিত নেতা ও এক সময় সংসদ সদস্য), দেওয়ান ফরিদ গাজী (সিলেটের জননেতা ও এক সময়ে মন্ত্রী), এ. ও. রাজিউর রহমান (এক সময় যুগ ভেরী সম্পাদক ও উর্দু সমর্থক), আবদুল হক (পরবর্তীতে কৃষি আয়কর কমিশনার), কাজী মুহিবুর রহমান (প্রয়াত ছাত্রনেতা), মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী (তিনি প্রধানত কলিকাতায় থাকতেন বর্তমানে চা-কর) মহিউদ্দিন আহমদ (পরবর্তীতে আলিগড়ে ও প্রধান প্রকৌশলী),

[১৪০]. ড. মোহাম্মদ মুমিনুল হক/সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত।[গতিধারা - সেপ্টেম্বর - ২০০১। পৃ. ১৭৪-১৭৭]

আছাব্দর আলী (প্রয়াত বামপন্থী ছাত্রনেতা)। আর একজন ছাত্র সব সময় এই সব আসরে উপস্থিত থাকতেন, আব্বার ব্যক্তিগত উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতেন। তিনি হলেন আমার মামা সৈয়দ শাহাদত হোসেন (এক সময় আজাদ সম্পাদক)। তিনি আমাদের বাসায়ই থাকতেন এবং এই সব মজলিশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আর তেমন ছিল না।

চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগ ছিল যেন আব্বার সার্বক্ষণিক নেশা। সভা সমিতির যেন শেষ নেই। সলা পরামর্শের বিরাম নেই। এবং কথার কচকচিতে বিরতি নেই। সম্ভবত জেলা লীগের তিনি সম্পাদক নম পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধোপাদিঘীর পার ছিল শহরের কেন্দ্র স্থলে, বন্দর বাজারের সন্নিকটে। কিছুটা সেই কারণে সব আসর জমতো আমাদের বাসায়।

১৯৪৪ সালে করিমপুর চা বাগানে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। চা বাগান কর্তৃপক্ষের গাফলতিতে ৩০৪ জন লোক তাতে মারা যান। দেওয়ান আবদুল বাসিত (পরবর্তীতে মন্ত্রী) এই দুর্ঘটনার তদন্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে প্রাদেশিক নেতৃত্বের আসনে তার দাবি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছর আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি আর সাধারণ সম্পাদক হন দেওয়ান বাসিত। স্যার সাদুল্লা-মোদাব্বির হোসেন জুটি ঐ সময়ই এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। করিমপুর তদন্তের মাসাধিককাল অধিবেশন আমাদের বাসায় চলে। জেলা জজ এম. এ. ইসপাহানি (পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি) ছিলেন মামলার দায়িত্বে। তার কমিশনে সাক্ষ্য সংগ্রহ হয় আমাদের বাসায়। দেওয়ান বাসিতকে তখন দেখেছি। একজন নিবেদিত ও বুদ্ধিদীপ্ত জনসেবক হিসেবে বাসিত সাহেব দেখতে শুনতেও খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তার ব্যবহারে অমায়িকতা ছিল তার বৈশিষ্ট্য।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের যে মজলিশ আমাদের বাসায় শুরু হয় তারই পরবর্তী পর্যায় ছিল গণভোটের কর্মব্যস্ততা এবং বিভাগোত্তর কালে তা বছর দুয়েক বজায় থাকে। মুসলিম লীগের যারা প্রায় সব সময় অর্থাৎ সব বিকেলে হাজির থাকতেন তাদের মধ্যে যাদেরকে আমার মনে আছে তাদের ফর্দ খুব ছোটো হবে না। প্রথমেই মনে পড়ে সব সময় যিনি আব্বার মুরুব্বির মত ব্যবহার করতেন সেই মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীকে (মন্ত্রী ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত), সদাসাহসী এবং যুদ্ধং দেহি আজমল আলী চৌধুরী (পরবর্তীতে মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ বিরোধী), দেওয়ান আবদুর রব চৌধুরী (এক সময় পৌর চেয়ারম্যান ও মন্ত্রী), দেওয়ান তৈমুর রেজা চৌধুরী (এক সময় মন্ত্রী), দেওয়ান ওহিদুর রেজা, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক), মৌলবীবাজারের মুইনুদ্দিন চৌধুরী (কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা), তার্তখোলার মনির উদ্দিন, সরেকওম এ জেড আবদুল্লাহ, আজমল খান (ব্যাংক সংশ্লিষ্ট) ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান, আশরাফ আলী (বীমা খ্যাত) প্রমুখ সর্বদা হাজির থাকতেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকেও প্রতিনিধিত্ব কম ছিল না; যেমন হাজী মোহাম্মদ ওসমান, আবদুল মইন (খান সাহেব আবদুল কাহেরের পুত্র), হাজী আবদুর রহমান (দুদু মিয়া), তার ভাই হাজী আবদুস সালাম (ন্যাশনাল গার্ড খ্যাত), মোহাম্মদ ইউসুফ (অসি মিয়া), আমিনউদ্দিন (ভাষা আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয়), বারুদখানার ময়না মিয়া (তার আসল নাম ভুলে গেছি), টুকের বাজারের হাজী ইরফানুল্লাহ, জৈন্তার হাজী আবদুল করিম এবং তার জামাতা উকিল হাবিবুর রহমান, রায়নগরের আবদুল বারি লাল বা খাটো বারি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ প্রমুখ। মওলানা সাখাওয়ালুল আম্বিয়া, ডা. আবদুল মজিদ, চারা দিঘীর পারের পি. এম শাহাবুদ্দিন এবং আবদুল বারি (ধলা), মতসির আলী (শ্রমিক নেতা), বসু মিয়া এদের মুখে কথার খই ফুটতো। নয়াসড়কের আবদুল বারি (কালা) সাধারণত কথা কম বলতেন তবে কাজের দায়িত্ব ভালভাবে সম্পন্ন করতেন।

উকিল ও মোক্তার বারের সদস্য যারা তখন মুসলিম লীগে খুবই সক্রিয় ছিলেন তাদের হিসাব দেওয়া মুশকিল। আব্বার অনেক বন্ধুরা সব সময় বসতেন যদিও বা তারা তত সক্রিয় ছিলেন না। যেমন জমশেদ আলী চৌধুরী, আবদুস সোবহান চৌধুরী। যাদের সক্রিয় বলে আমার ধারণা ছিল তাদের অন্যতম ছিলেন আবদুল মতিন (তিনি খুব কথা বলতেন ও সুপুরুষ ছিলেন), আবদুস সালাম (পরবর্তীতে মন্ত্রী), শহিদ আলী,

জসীমুদ্দিন আহমদ, দবীরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ মানির উদ্দিন আহমদ (দেশ বিভাগের আগে আগে এই মজলিশে আসতে শুরু করেন)। আব্বার দুজন সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন তারা বৃদ্ধ বয়সেও সেই সম্পর্ক বজায় রাখেন তারা ছিলেন আবদুল হামিদ (হাজী ওসমানের ছেলে) ও তার চাচাতো ভাই আবদুল লতিফ।

তিনজন প্রাদেশিক নেতা সম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে। আবদুল মতিন চৌধুরী প্রায়ই আসতেন এবং চুপ করে এক কোনে বসে শুনতেন। তিনিই কিন্তু আব্বাকে রাজনীতিতে সক্রিয় করেন এবং ছিলেন তার উপদেষ্টা ও মুরুব্বি। আগেই বলেছি তিনি শিলং অথবা ভাদেশ্বরে থাকতেন। তবে প্রায়ই সভাসমিতিতে আসতেন। মাহমুদ আলী ছাত্রনেতা থেকে ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তাকে বিভাগপূর্বকালে খুব কমই দেখেছি। তিনি সাদাসিধা কাপড় চোপড়ে খুবই দুরন্ত থাকতেন। আবদুল হামিদ চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে কলিকাতায় চলে যান এবং ১৯৪৫-এ প্রত্যাবর্তনের পর সব সময়ই আব্বার উপদেষ্টা ও মুরুব্বি হিসেবে ভূমিকা রাখতেন।

সিলেটে মুসলিম মহিলাদের রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ছিলেন বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী। বাল্যকালে তিনি ছিলেন ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী (১৯০৬)। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তার সব সময় অব্যাহত থাকে। ১৯২৮ সালে মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে তিনি মুসলিম সমাজের প্রথম মহিলা হিসেবে বোরখা পরিত্যাগ করেন। তার বোন শাহিদা চৌধুরী (অধ্যক্ষ আবদুল মুনিম চৌধুরীর স্ত্রী) এতে তাকে সঙ্গ দেন। এই সভায় মঞ্চে উপবিষ্ঠ ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা ফজলুল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লা এবং তার পিতা খান বাহাদুর শরাফত আলী। এই মহিলা ১৯৩০ সালে মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। তখন সারা ভারতে একটিই মহিলা কংগ্রেস শাখা ছিল। ১৯৩১-৩৪ এর আইন অমান্য আন্দোলনে তার নেতৃত্বে সিলেটে সর্বপ্রথম মহিলা শোভাযাত্রা বের হয় এবং তিনি কারাবরণও করেন। ১৯৩৮-৩৯ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯৪৫ সালে সিলেট মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন মাত্র বারো জন সদস্য নিয়ে। তার উদ্যোগে আব্বা ছিলেন প্রধান সংগঠক ও উপদেষ্টা। এই সমিতির সহ-সভাপতি হন আমার আম্মা সৈয়দ শাহার বানু চৌধুরী। মহিলা সমিতিরও অন্যতম আড্ডাখানা হয় আমাদের বাসা এবং তারও প্রধান কারণ ছিল আব্বার আগ্রহ ও সহযোগিতা। তাই একদিকে মুসলিম লীগ ও ছাত্রগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে মহিলা দল ও সংগঠনে আব্বা ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। মহিলাদের মধ্যে অন্যান্য যারা সক্রিয় ছিলেন তারা হলেন বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী (পরবর্তীতে সংসদ সদস্য), সৈয়দা লুতফুন্নেসা যিনি ছিলেন সমিতির সম্পাদক এবং সৈয়দ নজিবুন্নেসা (শেখ ঘাটের এহিয়া বাড়ির গৃহবধূ)। এরা গণভোট ও ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তখন তাদের দলও অনেক বাড়ে। সরকারি কর্মকর্তা খায়রুন্নেসা বেগম, শামসী খানম ও পরবর্তীতে রাবেয়া আলী এবং অতিরিক্ত জেলা হাকিমের স্ত্রী বেগম এহিয়া চৌধুরী এই সমিতির নানা উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন।

যুদ্ধাবসানে ১৯৪৫ সালে সিলেটে তথা সারা ভারতবর্ষে রাজনীতি খুব জমে ওঠে। ১৯৪৬ সালের শুরুতে হয় সাধারণ নির্বাচন। এর প্রস্তুতি পর্বে ১৯৪৫ সালে নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিলেটে ঘনঘন আসতে থাকেন। নওয়াব ইসমাইল, ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড়, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, রাজা গজনফর আলী, চৌধুরী খলিকুজ্জামান এরা আসেন। ১৯৪৫ সালের সর্বশেষ আগন্তক ছিলেন পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। এই সব নেতাদের আগমনে সুদৃশ্য তোরণ বানানো হতো। গোবিন্দ পার্ক অথবা ঈদগাহ ময়দানে সভা হতো, পৌর সভায় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হতো এবং সোনালি কালিতে মানপত্র ছাপিয়ে পাঠ করা হতো। এতে আব্বার ভূমিকা থাকতো বলে আমি কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের নামে একটি মানপত্র নিয়ে হাজির হতাম। সময়াভাবে সব সময় পাঠ করতে পারতাম না। শুধু অর্পণ করে তৃপ্ত হতাম। ১৯৪৬ সালের দোসরা মার্চে আসলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ঈদগাহ ময়দানে তিনি তিন অথবা দুইটি সভা করলেন। ছাত্রদের সভা পরিচালনা করলেন আসাম মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি চৌধুরী এ. টি মাসুদ, পরবর্তীতে বিচারপতি। জনসভা এবং সম্ভবত মহিলা সভায় সভাপতিত্ব করলেন আবদুল হামিদ।

এই সভায় আমি আমার মানপত্র পাঠ না করে এম.এইচ ইস্পাহানির হাতে তুলে দিলাম। আগন্তুকদের মধ্যে আর এক গোষ্ঠী ছিলেন ধর্মনেতা এবং সুবক্তা। মওলানা আজাদ সুবহানি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করেন গোবিন্দ পার্কে। আবদুল্লাহিল বাকী ও কাফি ভ্রাতৃদ্বয়ও কম যান নি। তবে আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেন লুংগি পরিহিত ও বাঁশের টুপীতে সাদাসিধা আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি। যেমন তার আওয়াজ তেমন তার বক্তৃতার বিষয়। ১৯৪৬ সালের শুরুতে নির্বাচন হলো এবং মুসলিম লীগ এবার বিপুল ভোটে জয়ী হলো। ফেব্রুয়ারি মাসে আসলো কেবিনেট মিশন।

এদিকে আসামে কংগ্রেস সরকারের লাইন প্রথা নীতি মুসলমানদের বেশ বিপর্যস্থ করে। আসামকে ক্রমাগত আবাদ করে চলেছিল মূলত বাঙালি মুসলমান। মোমেনশিং, রংপুর, পাবনা এই সব এলাকার গরিব কিন্তু সাহসী চাষী। আসামীরা বাঙ্গালীদের এই বসতি স্থাপন মানতে পারল না। তারা বলে দিল যে একটি সীমানার (লাইনের) ওপারে কোন বসতি স্থাপন করা যাবে না এবং যারা ইতিমধ্যে ওখানে আছে তাদের উচ্ছেদ করা হবে। এই নীতির বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ তিরিশের দশক থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৪৬ এর জুলাই মাসে ক্যাবিনেট মিশনের ভারতীয় কনফেডারেশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন। আগস্ট ষোল তারিখে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল। কলিকাতা, বিহার, নোয়াখালি, পাঞ্জাব সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠলো। ১৯৪৭ সালের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠালো। ১৯৪৭ এর তেসরা জুন ভাইসরয় ঘোষণা দিলেন যে আগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। ভারত হবে দ্বিখণ্ডিত এবং বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশেরও বিভাগ হবে। সিলেটের ভাগ্য নির্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে। গণভোটের তারিখ নির্ধারিত হলো ৬ ও ৭ জুলাই।

মুসলিম লীগের তখন বেশ বিপদ। আসামে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং সরকার তার মোকাবেলায় ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। সভাপতি মৌলানা ভাসানি, সম্পাদক মাহমুদ আলী কারাবন্দি। আরো অনেক নেতৃবৃন্দ - নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী (পরবর্তীতে ভারতে মন্ত্রী), সিলেটের আজমল আলী চৌধুরী, দেওয়ান আজরফ, দেওয়ান ওহিদুর রেজা, প্রচুর কর্মী ও ছাত্র সবাই জেলে। সিলেটের পরিবেশও উত্তপ্ত। এপ্রিলে অসহযোগ আন্দোলনে শহীদ হয়েছে তরুণ আলকাস। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক তেমন মধুর নয়। আসামে কংগ্রেস সরকার এবং গভর্নর স্যার আকবর হায়দরী খুব কংগ্রেস ঘেঁষা। সুতরাং নিরপেক্ষ গণভোট নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তদপুরি গণভোটের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকর্তা লীগে নিয়ামবেনসার স্টর্ক এবং সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে আছেন শিখ অফিসার লে. কর্নেল মহিন্দর সিং। সরকারি সমর্থন ছাড়াও কংগ্রেসের আছে অর্থবল। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে আছে কংগ্রেস সমর্থক জমিয়ত এ উলামা এ হিন্দ। তাদের বিখ্যাত নেতা হোসেন আহমদ মাদানি কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে তৎপর।

এই দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে সিলেটের প্রবীণ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কালক্ষেপণ না করে গণভোটের প্রস্তুতিতে নামলেন। সময় মাত্র এক মাস। আবদুল মতিন চৌধুরী, আবদুল হামিদ, মোদাব্বির হুসেইন চৌধুরী, খান বাহাদুর আবদুল হাই চৌধুরী (অবসর প্রাপ্ত আবগারি কমিশনার), হাজী মোহাম্মদ ওসমান, হাজী আবদুর রহমান, মোহাম্মদ ইউসুফ, আবদুল মইন, আবদুল বারি (লাল), মনির উদ্দিন, হাজী ইরফান উল্লাহ, শহীদ আলী, আবদুল হাফিজ এরা সবাই মিলে মুসলিম লীগ রেফারেন্ডাম বোর্ড গঠন করলেন।

আব্বা ভালো সংগঠক এবং পরিশ্রমী নেতা হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। বোর্ডের সভাপতি হলেন আবদুল মতিন চৌধুরী আর সম্পাদক নির্বাচিত হলেন আব্বা। তিনি তার সহযোগী হিসেবে নিলেন শহীদ আলী এবং তার ভ্রাতা আবদুল গনিকে। প্রতিটি মহকুমায় একটি কমিটি হলো এবং তাদের আহবায়ক হলেন সুনামগঞ্জের মফিজ চৌধুরী (পরিষদ সদস্য), হবিগঞ্জে সৈয়দ আবুল বশর, মাহমুদ হোসেন (পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি),

মৌলবীবাজারে দেওয়ান আবদুল বাসিত এবং করিমগঞ্জে নুরুল হোসেন (পরিষদ সদস্য ও পরবর্তীতে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী)। সিলেটের লালদিঘীর পারে হাজী ওসমানের একটি আড়ত খালি করে স্থাপিত হলো বোর্ডের সদর দফতর আর আমাদের ধোপাদিঘীর পারে হলো অন্য দফতর। ভোটার লিস্ট ও ভোটার সংযোগের দায়িত্ব হলো এই দফতরের।

গণভোটের জন্য প্রচারণা, নির্বাচনী অভিযানে আগন্তুকদের দেখাশোনা, তহবিল সংগ্রহ, সরকারের সঙ্গে দেন দরবার, ভোট প্রদান ও ভোটার সমাবেশ সমুদয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বর্তে আব্বার উপর। তাছাড়াও ছিল আর এক সমস্যা কংগ্রেসের উগ্রপন্থীরা ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত হামলা ও দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছেন, সুতরাং নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুতর আকার ধারণ করে। গণভোটে প্রচারণায় আসলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বাংলার মুখ্যমন্ত্রী), নুরুল আমিন (পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী), মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খান ও সম্পাদক আবুল হাশেম, সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দিন হোসেন (মন্ত্রী), পীর বাদশা মিয়া, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ন্যাশনেল গার্ড নেতা হাবিবুল্লাহ বাহার, জিন্নাহ সাহেবের সহচর এ.এইচ ইসপাহানি, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ (পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ নেতা), মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী প্রমুখ। আরো আসলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে আসলেন শেখ মুজিবুর রহমান (পরবর্তীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু), ফজলুল কাদের চৌধুরী (পাকিস্তানের স্পীকার), শাহ আজিজুর রহমান (পরবর্তীতে প্রধান মন্ত্রী), মোল্লা জালালুদ্দিন (পরবর্তীতে মন্ত্রী) প্রমুখ। অল্প সংখ্যক মহিলা নেতা কর্মীরাও আসলেন যাদের মধ্যে কলিকাতা থেকে আগত বেগম জেরিনা রশীদ (সচিব আবদুর রশীদের স্ত্রী) ৬ জুলাই বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে কংগ্রেসী হামলার শিকার হন। ভোট বাক্সে প্রতীক সরকার নির্ধারণ করে দিল ভারতভুক্তির জন্য ঘর এবং পাকিস্তানভুক্তির জন্য কুড়াল।

হোসেন আহমদ মাদানির গোড়া শিষ্যরা বেশ কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করলো। তারা শ্লোগান তুললো "ঘরের ছেলে ঘরে থাকো, ঘরের বাক্সে ভোট দাও।' মওলানা সহুল ওসমান ছিলেন আর এক প্রভাবশালী ধর্মনেতা। তিনি সিলেট আলিয়া মদ্রাসায় অনেক দিন ছিলেন এবং তার অনুসারীও ছিলেন প্রচুর। তিনি তখন বিহারে এবং বয়সে প্রায় অশীতিপর। তাকে অনুরোধ করে নিয়ে আসা হলো এবং তিনি ফতোয়া দিলেন যে কুড়ালের জন্য ভোট দান বায়তুল ইসলামের জন্য ভোট। তিনি জেলার এক প্রান্ত থেকে এই বয়সে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়ালেন। তার খলিফা মওলানা তফজ্জুল হোসেন এবং আমি ছিলাম তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আবদুল মইন সাহেবের গাড়ি ছিল তার জন্য নির্দিষ্ট। তার নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের ছিল গভীর মাথাব্যথা। মন্ত্রী যোগেন্দ্র মন্ডল নিয়েও ছিল তেমনি পেরেশানি।

নির্বাচনী প্রচারনা ছাড়া যে বিষয় আব্বা ও মতিন সাহেবকে খুব চিন্তিত ও শঙ্কিত রাখে তা ছিল সরকারের পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা। এজন্য তারা কষ্ট করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দেন দরবার করে চলেন। সেখানেও তাদের বাধা বিপত্তি ছিল প্রচুর, সিলেট থেকে তার বার্তা পাঠানো ছিল প্রায় অসম্ভব। দেওয়ান ফরিদ গাজীকে একবার যেতে হয় আখাউড়ায় এই রকম তারবার্তা প্রেরণের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তেমন সাহায্য মিলল না, শুধু কিছু অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হলো। তবে সিলেটের জেলা প্রশাসক ডামব্রেক এবং পুলিশের ডিআইজি রিড গণভোট অনুষ্ঠানে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মহৎ প্রচেষ্টা নেন এবং এখানে সেখানে কিছু ঘটনা ছাড়া মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট সমাপ্ত হয়।

মাসাধিককাল গণভোটের জন্য আব্বার সংসার বস্তুত চুলোয় যায় এবং গণভোটে কর্মতৎপরতা ছিল আমাদের সারা পরিবারের। আব্বা ছাড়াও আম্মা ও বড়ো বোন ছিলেন মহিলাদের সংগঠিত করতে ব্যস্ত। আমি ছিলাম প্রচারণায় এবং আমার আরো দুই ভাই-ছিলেন ভোটার লিষ্ট নিয়ে ব্যস্ত।

১৪ জুলাই গণভোটের ফলাফলে প্রায় ৫৬০০০ ভোটে পাকিস্তানভুক্তি জয়যুক্ত হয়। এই বিরাট দায়িত্বটি আব্বা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন এবং পরিশেষে এই উদ্যোগের জন্য গৃহীত উদ্ধৃত্ত অর্থ মুসলিম হল নির্মাণে প্রদান করেন। এই মুসলিম হলই হলো এক সময়ের জিন্নাহ হল এবং বর্তমানের সুলেমান হল।

গণভোটের বিষয়ে আব্বা ছিলেন সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ। সম্ভবত সেজন্য গণভোটের ইতিহাস রচনায় তার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার ভাই মোমেন এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করে যে সদুত্তর পায় তার উদ্ধৃতি যথাযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন :

'আমার উপর দায়িত্ব পড়েছিল মহান ও বিরাট। একটি জীবন মরণের বিষয়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এবং হাজারো নেতাকর্মীর অক্লান্ত শ্রম ও বুদ্ধির প্রয়োগে আমরা প্রায় ৫৬০০০ ভোটে জয় লাভ করি। আমার মুরুব্বিরা কলা মিয়া (আবদুল মতিন চৌধুরী), বড়ো মামু (আবদুল হামিদ), মেজ মামু (আরশাদ আলী মটু মিয়া), মোদাব্বের সাহেব, উসমান মিয়া, দুদু ভাই, আমার সহকর্মীবৃন্দ, মনির মিয়া (ভার্তখোলা), সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, আবদুস সালাম, দেওয়ান রব, তৈমুর রাজা, আজমল আলী, মাহবুব আলী, হাবিব মিয়া, লতিফ মিয়া, অসি মিয়া, শহিদ আলী, মইন মামু, তোর চাচা শাহী, বসু মিয়া, মন্তনা মিয়া, ধলা বারি, কালা বারি, লাল বারি, চুনু মিয়া, লালো মিয়া, মুসী সাহেব (আবদুর রাজ্জাক), আমার ছাত্র ভাইয়েরা মোয়াজ্জেম চৌধুরী, তসনু, ফরিদ গাজী, মইনুল হক, এটি মাসুদ, আবদুস সামাদ, আবদুল হক, আখলাক, নুরুদ্দিন, মোশতাক এরা যেভাবে খেটেছেন, শ্রম দিয়েছেন, সংগঠন করেছেন, ঝুকি নিয়েছেন তা উপলব্ধির বিষয়, বিবৃতির নয়। আমাদের মহিলারা যা করেছেন, বেগম রহিম, তোর মা, খায়রুন্নেসা, বেগম রশীদ, শামসি খানম, কলিকাতার জেরিনা রশীদ অসাধারণ সাহস ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। বাইরে থেকে আগত অতিথিদের আমরা মোটেই খেয়াল করি নি, তারা নিজেরা নিজেদের কাজ ঠিক করে মাঠে ছড়িয়ে পড়েছেন। এক মাসে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। আমরা পাকিস্তান হাসিল করলাম।'

গণভোটের ফলাফল বেরুবার পরেই র‍্যাডক্লিফ সীমানা কমিশনের বৈঠক শুরু হলো ১৬ জুলাই এবং ৬ আগস্টে শুনানি সম্পন্ন হলো। ১২ আগস্টে তারা তাদের রায় ভাইসরয়ের কাছে দেন। তবে তা ঘোষণা করা হয় ১৮ আগস্টে। কমিশনের সদস্য বিচারপতি আবু সালেহ আকরম ও বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাদের ভিন্ন মতামত স্বতন্ত্রভাবে দেন এবং স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ তখন তার নিজস্ব বিবেচনায় চূড়ান্ত রোয়েদাদ প্রনয়ন করেন। র‍্যাডক্লিফ কমিশনের জন্য আসাম মুসলিম লীগ একটি দল ঠিক করে। কিন্তু গণভোট বোর্ড আব্বাকে কমিশনে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেয়। আব্বার তখন কলিকাতা গিয়ে আরো তিন সপ্তাহ কাটাবার সামর্থ নেই। কিন্তু বোর্ডের চাপে এবং বিশেষ করে আবদুল মতিন চৌধুরী এবং আবদুল হাই চৌধুরীর পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতা যান। সেখানে সিলেটের তরফ থেকে মুসলিম লীগের মনোনীত কৌসুলী মোহাম্মদ ওয়াসিম ও হামিদুল হক চৌধুরী ছাড়া একমাত্র তিনিই কমিশনের সওয়াল জবাবে অংশ নেন। সীমানা কমিশনের সামনে হাজিরা দিতে তিনি শেষবারের মত কলিকাতা যান। তার সিলেট থেকে এবং আইন পেশা থেকে দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতিকালে খান বাহাদুর আবদুল হাই সাহেব আমাদের দেখাশোনা করেন। এই বিষয়টি আবদুল হাই সাহেবের ছেলেমেয়েরাও অবহিত নয় বলে আমার ধারণা। সিলেটের গণভোটের কাহিনি বস্তুত আবু আহমদ আবদুল হাফিজের অডিসি।"'[১৪১]

ছয়

"...১৯৪৬ সালের ৩ জুন সিলেটে গণভোটের কথা ঘোষণা করা হয়। গণভোটের সময় প্রিসাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসারের কাজের জন্য আসামভেলী থেকে অনেক অফিসার ও কেরানিকে সিলেটে পাঠাতে হয়েছিল। আসামের গভর্নর স্যার আকবর হায়দারী ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে গৌহাটি থেকে যেন যথেষ্ট সরকারি কর্মচারী সিলেটে যায়। জুনিয়ার অফিসাররাই প্রিসাইডিং অফিসারের কাজ করতে সিলেট যান। আমি সিলেট গণভোটের সময় উপস্থিত থাকা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মনস্থ করলাম। গৌহাটি থেকে যেসব অসমীয়া অফিসার ও কেরানিকে সিলেট যেতে বলা হয়েছিল তারা ইতস্তত করছিলেন। কারণ সিলেট জেলা ষাট বছরের উর্ধ্বকাল আসামের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও সুরমাভেলী (সিলেট ও কাছাড় জেলা) ও আসামভেলীর মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না।

---

১৪১. আবুল মাল আবদুল মুহিত/স্মৃতির মণিকোঠায়। [সময় প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। পৃ. ৪৩-৫৩]

আজাদী লাভের মাত্র দশ-বারো বছর আগে সিলেট-শিলঙ রাস্তা খোলা হওয়ার পর প্রদেশের এই দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রীগণ, এমএল এ-রা ছাড়া খুব কমসংখ্যক অসমীয়ার সিলেট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল। গৌহাটি কালেক্টরেটের কেরানিরা সিলেটে আসতে ভয় করছিল। কেউ কেউ মনে করেছিল হয়তো গণভোটের সময় শান্তিভঙ্গ হতে পারে। আমি তাদের ডেকে বললাম, 'আমি তোমাদের সঙ্গে সিলেট যাচ্ছি। বিপদে-আপদে তোমরা আমার সহায়তা পাবে।' কেরানিদের দরাজ হাতে অগ্রিম রাহা খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। তখন অনেক কেরানি উৎসাহের সাথে সিলেট যেতে রাজি হলো।

গণভোটের প্রায় এক সপ্তাহ আগে আমি সপরিবারে সিলেট পৌছি। তখন সমগ্র জেলা জুড়ে অভূতপূর্ব উত্তেজনা। আসামে তখন কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসীন। তাই বাংলাদেশের মুসলিম লীগের অনেক গণ্যমান্য নেতা গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করতে সিলেট আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তমিজউদ্দীন খান, নূরুল আমিন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন প্রমুখ। ভাসানীর মওলানা, আব্দুল মতিন চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল হামিদ, মাহমুদ আলী প্রমুখ আসাম মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আসাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও প্রচারণা করা হয়। বসন্ত কুমার দাস, বৈদ্যনাথ মুখার্জী প্রমুখ মন্ত্রীরা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এদিকে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে সিলেটের পাকিস্তান ভুক্তির বিরোধিতা করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর অনেক সমর্থক সিলেটে ছিলেন। মওলানা হোসেন আহমদ প্রত্যেক বছর সমগ্র রমজান মাস সিলেটে কাটাতেন। সিলেট জেলায় তার অনেক মুরিদ ছিলেন। এদের প্রচারণা মুসলিম লীগের সমর্থকদের ভাবিত করে।

এ সময় সিলেটের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জে. ডামব্রেক, আইসি এস এ ডি এম ছিলেন সিলেটের অধিবাসী রায়বাহাদুর পবিত্রনাথ দাস ও দক্ষিণ ভারতের বালচন্দ্রন, আইসিএস।

সিলেটে পৌছার পর আমি প্রত্যহ কয়েকঘণ্টা ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় কাটাতাম। বসন্ত কুমার দাস, বৈদ্যনাথ মুখার্জী বা সিলেট কংগ্রেসের কোনো কোনো নেতা ডেপুটি কমিশনারের কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করতে এসে আমাকে উপস্থিত দেখে হ'কচকিয়ে যেতেন। তারা যাতে ডেপুটি কমিশনারকে ভুল খবর দিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারেন সে বিষয়ে আমি চেষ্টিত ছিলাম। ডেপুটি কমিশনার পক্ষপাতশূন্যভাবে তাঁর গুরু-দায়িত্ব পালন করেন।

ভারত গভর্নমেন্ট তৎকালীন আসাম সরকারের আইন বিভাগীয় সেক্রেটারি এইচ স্টর্ক, আইসিএস-কে গণভোটের পরিচালক নিযুক্ত করেন। তার চাকরি সাময়িকভাবে ভারত সরকারের অধীনে চলে যায়। গণভোট পরিচালককে সাহায্য করে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করেন।

জুলাই মাসের পাঁচ ও ছয় তারিখে গণভোট গ্রহণ করা হয়। গণভোটের দুই দিনই আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ ছিল। সমস্ত দিন অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হয়েছিল। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু সিলেট জেলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এই দুর্যোগ উপেক্ষা করে ভোট দিতে বেরিয়ে পড়েন। আসামের অন্যান্য জেলা থেকে অনেক সিলেটবাসী ভোট দিতে আসেন। এঁদের কেউ কেউ বৃদ্ধ বা পীড়িত থাকা সত্ত্বেও এই সংকট সময় দেশের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করবার জন্য ব্যক্তিগত অসুবিধা বা অর্থব্যয় অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসেন।

আমি গৌহাটি থেকে সরকারি গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। গণভোটের দুই দিনই আমি বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে ভোট গ্রহণ তদারকে অংশগ্রহণ করি। গণভোট পর্ব শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। শুধু প্রথম দিন সিলেট শহরের মহিলাদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল। এই কেন্দ্র ছিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই হিন্দু ছিলেন। পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে ইচ্ছুক মহিলারা উপযুক্ত সুযোগ পান নি এই কারণে মুসলিম লীগ গণভোট পরিচালনা কমিটি এই কেন্দ্রে শেষ বেলায় ভোট দিতে বিরত থাকেন। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার এডিএম বালচন্দ্রনকে প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করলে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়।

ভোট গ্রহণ পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। এরপর ভোট গণনার পালা। সিলেটে তখন শাসন বিভাগে কোনো প্রথম শ্রেণীর মুসলমান অফিসার ছিলেন না। আব্দুল মতিন চৌধুরী, আব্দুল হামিদ প্রমুখ সিলেটের মুসলিম লীগ নেতারা মি. স্টর্কের কাছে প্রার্থনা করলেন আমাকে যেন ভোটগণনায় সাহায্য করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। আগে কথা ছিল ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হলে আমি আমার কর্মস্থলে গৌহাটি ফিরে যাবো। লীগ নেতাদের অনুরোধে মি. স্টর্ক আমাকে ভোট গণনা পর্যন্ত সিলেটে থাকতে আদেশ দেন।

ভোট গণনা ছিল বিরাট ব্যাপার। যাতে এই ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা হয় তার জন্য ভোটগণনাকার্য ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে সম্পন্ন করা হয়। ডেপুটি কমিশনার অবিবাহিত ছিল। তিনি তার শয়নকক্ষ ছাড়া সমস্ত বাংলো গণনাকারীদের হাতে ছেড়ে দিলেন। ভোট গণনা কার্যে ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য রায়বাহাদুর পবিত্রনাথ দাস ও আমাকে নিযুক্ত করা হয়।

গণনা কাজ সকাল আটটা থেকে শুরু করে রাত্র সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত চলত। দুপুরে একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত গণনাকার্য স্থগিত থাকত। বিকালে এই কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাকিস্তান ও ভারতের পক্ষে ভোট পৃথক করে প্রত্যেক পঁচিশটি ভোট দিয়ে একটি তাড়া তৈরি করা হতো। অবশ্য কোনো কোনো গণনাকারী সে যে দলের সমর্থক তাদের চব্বিশ ভোটে এক তাড়া ও বিপক্ষ দলের ছাব্বিশ ভোটে এক তাড়া করার চেষ্টা করেছিল। এই সকল অসাধু কর্মচারীকে এই কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় সপ্তাহকাল ভোটগণনা কার্য চলে। সিলেটের আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী আকুল আগ্রহে ভোট গণনা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেছিল। গণনা শুরু হওয়ার দু'একদিনের মধ্যে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে, পাকিস্তানের পক্ষেই বেশি ভোট পড়েছে। রায় বাহাদুর পবিত্রনাথ দাস হাল ছেড়ে দেন। প্রথম বা দ্বিতীয় দিনের পর তিনি গণনাকার্যে কোনো উৎসাহ দেখাননি।

গণনা শেষ হলে মি. স্টর্ক ফলাফল গোপনে তার যোগে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেন। হঠাৎ বেতারে গণভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হলো। পাকিস্তানের পক্ষে ৫২,৭০০ ভোট বেশি পড়েছিল। এই সংবাদে সিলেটের মুসলমানদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। কংগ্রেস শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করে তারা হাফ ছেড়ে বাঁচল।

জনরব এই যে ভোট গণনার ফলাফল অনুমান করে সিলেটের কয়েকজন হিন্দু নেতা দিল্লী গিয়ে তৎকালীন হোম মিনিস্টার বল্লভভাই পেটেলের কাছে ধর্ণা দেন। তারা অভিযোগ করেন ভোট গ্রহণ ব্যাপারে অনেক অনাচার হয়েছে ও নতুনভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক। এটা ছিল তাদের শ্মশান চিকিৎসা। পেটেল নাকি কুপিত হয়ে বলেন, 'রোগী মারা যাওয়ার পর তোমরা চিকিৎসক খুঁজে বেড়াচ্ছ। সময়মতো অনাচারের অভিযোগ করে আসাম সরকার মারফত আপত্তি জানিয়ে তোমাদের নতুন গণভোটের প্রার্থনা করা উচিত ছিল। এখন আমি কি করতে পারি?' সিলেটের কংগ্রেসী নেতাগণ পেটেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বেতার গণভোটের রায় শুনতে পেলেন। তাঁরা আর উচ্চবাচ্য না করে ক্ষুণ্ন মনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন।

গণভোটের সময় আমার সিলেটে উপস্থিতি ও কার্যক্রম সিলেটের কংগ্রেস নেতাদের মনঃপূত হয় নি। ইংরেজ ডেপুটি কমিশনারের কাছে নানা কাল্পনিক অভিযোগ নিয়ে এসে আমাকে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে বসা দেখে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হন। এদের কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে আসাম সরকারের কাছে নালিশ করেন।

গৌহাটি ফিরে এসে জানলাম আসাম সরকারের মহামান্য চীফ সেক্রেটারি স্যার হেরল্ড জর্জ ডেনেহী আমার প্রতি এক তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করেছেন। ইতিমধ্যে আমি পাকিস্তানে 'অপসন' দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্তি পত্রের অপেক্ষা করছি। কাজেই এই ভিন্দিপাল আমাকে বিচলিত করে নি।"[১৪২]

সাত

সিলেট গণভোট : কংগ্রেসী চোখে

ক.

'...অনেকে হয়তো জানেন না মি. জিন্নাকে কায়েদে আজম উপাধিতে কে ভূষিত করেছিলেন — গান্ধীজি। বহু চেষ্টা করেও নির্বাচনে মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। সিন্ধু প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী খান বাহাদুর আললা বক্সের হত্যার পরও সেখানে অসুবিধা রয়ে গেল। বেঙ্গল মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলো বটে, কিন্তু শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও তার দলকে বাদ দিয়ে।

১৯৪৪ ইংরাজির পর থেকে দিনের পর দিন যেভাবে হিন্দুদের ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগপন্থীরা বিষোদগার করে আসছিলেন এবং লীগের পত্র পত্রিকায় যেভাবে প্রচারণা চালানো হয়েছিল তাতে একটা বিষয় প্রায় স্থির-নিশ্চয় হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমান সমাজের এক বিরাট অংশ হিন্দু সমাজ ও হিন্দুদের ক্রিয়াকান্ডের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করছে।

মন্ত্রী মিশনের গ্রোপিং প্ল্যানটি বানচাল করলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী গোপীনাথ বড়দলই। এতে সাহায্য করলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। ইংরাজ তখন এ দেশ ছেড়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প। তাঁরা দেশ বিভাগের অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবী মেনে নিলেন। এর পিছনে সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা সামান্য ছিল না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে।

উভয়-পক্ষে মন কষাকষি চলতে চলতে বৃটিশ সরকারের চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রস্তুত হলো। সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং পাঞ্জাবের এক অংশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং বেঙ্গলের পূর্বাঞ্চল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হবে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রী সভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই প্রদেশ পাকিস্তানে যাবে, না ভারতে থাকবে– তা গণভোটে স্থিরীকৃত হবে।

অবস্থা বিবেচনায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতারা এই প্রস্তাবের উপর এক বিকল্প প্রস্তাব দাবী করলেন। তা হলো এই প্রদেশ স্বাধীন থাকতে চায় কি না তা-ও গণভোটে দ্বারা যাচাই করতে হবে। কিন্তু, মুসলিম লীগ নেতাদের প্রচণ্ড দাবীর দাপটে এ প্রস্তাব তলিয়ে গেল।

বৃটিশ গভর্নমেন্টের খসড়া প্রস্তাবে সিলেটের কোন উল্লেখ-ই ছিল না। এর অর্থ– সিলেট আসামে অর্থাৎ ভারতে থেকে যাবে। কিন্তু সিলেটের কট্টর উর্ধ্বতন মুসলিম লীগপন্থীরা মি. জিন্নার নিকট গিয়ে দাবী জানালেন জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা হোক। শুনেছি মি. জিন্না ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা পঁচিশ বছর আসামে থাকুন, তারপর আসামসহ পাকিস্তানে আসবেন।'

সিলেটি নেতৃবৃন্দ হালে পানি না পেয়ে মি. আব্দুল মতিন চৌধুরীকে ধরলেন।

মি. আব্দুল মতিন চৌধুরী সিলেটের অন্যতম কংগ্রেস নেতা ছিলেন। কংগ্রেসী হিসাবে জেলও খেটেছেন। আমাদের আত্মীয়। তাঁর মনমানসিকতা জানতাম। তিনি মি. জিন্নার অনুরক্ত পার্শ্বচর ছিলেন। একদা মি. জিন্না রাগ করে এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েলেন, তখন মি. আব্দুল মতিন চৌধুরী-ই ছিলেন তার দেশের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। মি. চৌধুরী-ই পরবর্তীকালে তাঁকে এদেশে ফিরিয়ে আনেন।

---

১৪২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী/আমাদের কালের কথা। উৎস প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ২২২-২২৬।

স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের চাপে তিনি মি. জিন্নার নিকট গিয়ে সিলেটের প্রশ্ন তুললেন। মি. জিন্না তাঁকে যুক্তি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করলেন শেষ পর্যন্ত বললেন, এ বিষয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে, আর কিছু করা যাবে না। মি. আব্দুল মতিন চৌধুরী প্রত্যয়ের সঙ্গে অনুরোধ রাখলেন- 'If you try, I am sure, your eloquence shall not fail.' মি. জিন্না অতঃপর প্রতিশ্রুত হলেন– সিলেটের দাবি আদায় করার চেষ্টা নেওয়া হবে।

শেষ মুহূর্তে মি. জিন্না সিলেটের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবি উত্থাপন করলেন। সিলেটে মুসলমানেরা সংখ্যাধিক। বিগত নির্বাচনে দুটি ছাড়া সব আসনে মুসলিম লীগ জয়ী হয়েছে। সুতরাং সিলেট জেলাকে পাকিস্তানভুক্ত করতে হবে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হলো যে, মুসলিম লীগপন্থীরা আসন বেশি দখল করলেও তাদের বিপক্ষে যত মুসলমান ভোট দিয়েছিলেন সেগুলির যোগফল দেখলে বুঝা যাবে সিলেট জেলার মুসলমান ভোটের সংখ্যা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে-ই বেশি গিয়েছিল কিন্তু মুসলিম লীগ প্রার্থীকে জয়ী করেছে। ভোটের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম লীগ সর্বাধিক ভোট পান নাই।

এই সময়ে, বাকবিতণ্ডার মধ্যে আমার পিতৃবন্ধু কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দাস বলে বসলেন তা হলে গণভোট হয়ে যাক।'

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও তখন গণভোটের তোড়জোড় চলছিল। মি. জিন্না বসন্ত বাবুর প্রস্তাবের জুড়ি ধরে সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতএব সিলেট জেলা ভারতে থাকবে না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এই ইস্যুর উপর গণভোটে স্থিরীকৃত হলো।

এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের বৃটিশ সরকারের ঘোষণার মধ্যে ইহাও লিপিবদ্ধ হলো যে, যদি বেঙ্গল বিভক্ত হয় তবে সিলেট জেলা আসামে থাকবে, না পাকিস্তানে যাবে গণভোটে সাব্যস্ত হবে।

বাঙলা বিভক্ত হলো। সমগ্র সিলেট জেলায় ৫ই ও ৬ই জুলাই গণভোট ঘোষিত হলো।

কাছাড়ের জননেতাদের আহ্বানে শ্রীহট্ট গৌরব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী চললেন শিলচরে প্রবক্তিক পরামর্শের জন্যে। আমাকে বলা হলো তাঁর সঙ্গে যেতে। আমরা অতিথি হলাম কাছাড়ের অন্যতম কংগ্রেসী জননেতা সতীন্দ্র মোহন দেবের। সেখানে অনেক জল্পনা কল্পনা এবং শেষ পর্যন্ত রেফারেন্ডাম কমিটি গঠিত হলো।

এখানে সিলেট-কাছাড়ের সম্পর্কের কথা প্রাসঙ্গিক।

কাছাড় ইংরাজরাজ্য ভুক্তির পর হতেই মোটামুটি সিলেট কাছাড়ের সম্পর্ক বেশ গভীর হয়ে যায়। সিলেট-কাছাড় জেলা দুটি এবং তৎসঙ্গে পার্বত্য জেলাগুলি নিয়ে গঠিত প্রশাসন বিভাগ, ভ্যালী এন্ড হিল ডিস্ট্রিক্ট নামে পরিচিত ছিল। এই ডিভিশনের ডিভিশনাল কমিশনারের দপ্তর ও স্থিতিস্থান ছিল শিলচর সহরে। সুরমা ভ্যালী বলতে সিলেট কাছাড়কে বুঝাতো। সিলেটে গণভোটের ব্যাপারে কাছাড়বাসীর উৎকণ্ঠা ও দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তাই সুরমা ভ্যালীভিত্তিক শিলচরে একটি কমিটি গঠিত হলো। সভাপতি মনোনীত হলেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।

দিন তিনেক পরে একদিন ভোরের বেলা শ্রীঅনঙ্গ কুমার রায় আমার সামনে এসে হাজির। চোখ দুটি লাল, ঘুম হয়নি, দাড়ি খোচা খোচা। আমাকে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। শ্রীঅনঙ্গ দাম ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রীর নিকট থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এনে মেরে দিয়েছেন।'

আমি তো হতভম্ব। একটু বেলা হতেই পার্শ্ববর্তী অফিস রুমে গিয়ে শুনলাম- ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনঙ্গ বাবুকে (শ্রী অনঙ্গ কুমার রায়কে) পাঠিয়ে টাকা আনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে– এই খবর কেন্দ্রমে

জানতে পেরে শ্রীঅনঙ্গ কুমার দাম, এক-ই নামের সুযোগে আমার কাছ থেকে গাড়ি পেট্রোলের কুপন ও দাম নিয়ে আগরতলা থেকে টাকা নিয়ে ফিরে আসেন। শ্রী অনঙ্গ কুমার রায় গিয়ে দেখেন- পাখি উড়ে গেছে। বহুকষ্টে দামের নিকট থেকে পরে পনের হাজার টাকা উশুল করা হয়েছিল। দশ হাজার টাকার আর কোন পাত্তা হয়নি। এই পনের হাজারও পাওয়া যেত না যদি আমাদের যুবক কর্মীরা পিস্তল প্রদর্শন না করতো।

রেফারেন্ডাম কমিটি অব অ্যাকশনের সাধারণ সম্পাদক বীরেন-দা (শ্রী বীরেন্দ্র নাথ দাস) এসে আমাকে বললেন যে, দিল্লী থেকে জমিয়তে উলেমা এ হিন্দের কয়েকজন মওলানা সাহেবান আসবেন। তাদের অভ্যর্থনার ভার আমার উপর থাকবে। তাদের দু'একজন আমার আতিথ্যও গ্রহণ করতে পারেন। এরোপ্লেন পৌছার সম্ভাব্য টাইমও আমাকে দেওয়া হলো। সে সময় সিলেটে নিয়মিত কোন বিমান সার্ভিস ছিল না। আমি আমার অধীন এক ড্রাইভারকে বলে রাখলাম কোন এরোপ্লেনের শব্দ শুনলে যেন তৎক্ষনাৎ এসে জানায়। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় এসে খবর দিল-প্ল্যান একখানার শব্দ শুনা যায়।

আমি তন্মুহূর্তে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা দিলাম। সেখানে পৌছে দেখি একটা চার মিটার এরোপ্লেন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো দেখি প্লেনের কাছেই পায়চারি করছেন বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী মি. সৈয়দ মোয়াজ্জম উদ্দিন হোসেন ও তার অল্প বয়স্ক ছেলে।

আমাকে দেখেই তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ও আপনি এসছেন? বড় ভালো হয়েছে। আমরা তো কয়েক মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি।'

বুঝলাম, তিনি মুসলিম লীগের তরফ থেকে এসেছেন। আমাকে তার দলের লোক ভাবছেন। আমার পরিচয় দিলাম। রাজনৈতিক ছাপ-টা বাদ দিলাম না। আরো উল্লেখ করলাম- এককালে আমার বাবার বন্ধু ছিলেন এবং আমাকেও চিনতেন।

তিনি বললেন- দেখুন, আমাদের দলের লোক হলেও পরিচয় না থাকলে আমি কারো সঙ্গে যেতাম না। আপনাকে চিনি, আপনার সাথে-ই যাবো। আমার সঙ্গে আড়াই লাখ টাকা আছে। আপনাকে সে বিশ্বাস করতে পারি, অন্য কাউকে নয়।

অতএব, মুসলিম লীগের নেতাকে আমার গাড়িতে করে শহরে নিয়ে এলাম। আমার বাড়ির নিকটে এসে দেখলাম বেশ কয়েকজন লোকসহ মি. মোঃ আব্দুল্লাহ তখন মুসলিম লীগের নেতা। তাঁদের গাড়ি থামিয়ে মি. মোয়াজ্জম উদ্দিন হোসেনকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মি. আব্দুল্লাহ বললেন-'এরকম কাজ সিলেটে একমাত্র তুমি-ই করতে পার।'

অফিসে ফিরে এলাম। আবার এরোপ্লেনের শব্দ শুনে এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাদের মাননীয় অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করলাম। তারা ছিলেন এলাহাবাদের মওলানা শহীদ ফকরী, কলকাতার দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক, নাম বোধহয় মওলানা মুজম্মেল আলী, জলন্ধরের মুফতি, নাম ভুলে গেছি, আরো ২/৩ জন। উনাদেরে নিয়ে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় অনিল-দা, শান্তি নিকেতনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী অনিল কুমার চন্দ্র। পরবর্তীকালে ভারতের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মুসলিম লীগপন্থীরা উনাদের সভায় গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে বেশ কয়টি সভা পণ্ড করে দিয়েছিলেন। এলাহাবাদের মওলানা শহীদ ফকরীর মত মানুষকে শিখ বলে অপ-পরিচয় দিয়ে লীগপন্থীরা নানা উৎপাত সৃষ্টি করেছিলেন। এ রেফারেন্ডামের কাজে যানবাহন ও পেট্রোল জোগাড় করা ছাড়াও আমার উপর আরো দায়িত্ব ছিল। সংবাদপত্র প্রচারপত্র ও পোস্টার ইত্যাদি লিখে দেওয়া। কয়েকটি কার্টুনও আমার পরিকল্পনায় আঁকা হয়েছিল।

রেফারেন্ডাম অফিসে কাজের ভীষণ অসুবিধা অনেকে ঘটাতেন। খামাখা চেয়ার দখল করে বসে থাকতেন। কেউ কেউ কিছুক্ষণ পর পর চা-মিষ্টির দাবীও করতেন। টু পাইস রোজগার করা যায় কি না তেমন চিন্তা চেষ্টাও কাহারো কাহারো ছিল। অমুক জায়গায় পাঁচশ সলিড ভোট, তমুক জায়গায় দু হাজার সাপোর্টার জোগাড় করা যেতে পারে। শুধু একখানা গাড়ি ও শ'কয়েক টাকার প্রয়োজন। পারম্পর্য ছিল এই ভাবের।

দেখতে দেখতে জুলাই মাসের (১৯৪৭ ইং) ৬/৭ তারিখ এসে গেলো। তখন দেখা গেল সবচেয়ে বেশী ভিড় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের বিপরীত দিকে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের, বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের সামনে। ঐ সময়ে আমাদের অফিসের উপর আক্রমণে প্রায় গা সহা হয়ে গেছে। একটা উদাহরণ দেই -

রেফারেন্ডামের প্রথম দিনে প্রায় ১২টার সময় একদল তরুণ আমাদের অফিস আক্রমণ করলেন। তাঁদের কথা– আপনারা এখানে বসে কি করছেন? গার্লস স্কুলে জোবেদা খাতুন (এক সময়ের শ্রদ্ধেয়া কংগ্রেস কর্মী, মিসেস জোবেদা খাতুন চৌধুরী), বসন্ত বাবুর স্ত্রীকে লাথি মেরেছেন। বিশ্বাস হলো না। তিনি আর যা-ই করুন না নিজে সর্বজন শ্রদ্ধেয়া হয়ে বসন্ত বাবুর স্ত্রীর ন্যায় সর্বজন-শ্রদ্ধেয়াকে লাথি বা অপমানজনক আচরণ করবেন না, এঁরা এই শ্রেণীর নহেন। উনাদেরে ভালো করে জানি।

ওদের কথা বিশ্বাস না করায় একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলো। এরূপ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করে টেবিলের উপর রেখে বলতে হলো– আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন, না এ বস্তুর ব্যবহার করতে হবে?

এরপর ওরা সটকে পড়লো। খবর নিয়ে জানা গেল– বসন্ত বাবুর স্ত্রী কিম্বা মিসেস জোবেদা খাতুন চৌধুরী কেউ-ই বালিকা বিদ্যালয়ের ভিতরে যাননি।

সে-দিন-ই এলেন আরো একজন। সংখ্যায় শ খানেক। একটি গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে। তাদের অভিযোগ– কোন এক গ্রাম হতে মুসলিম লীগের সবুজ ইউনিফরম্ পরা দু'জন স্বেচ্ছাসেবক নাকি তাদের গ্রামে গিয়ে বলেছেন–'কোন দিকে কে ভোট দেবেন তা জানতে চাই না। ভোট দিতে গেলে ফিরে এসে আর বাড়িঘর পাবেন না। সব পুড়িয়ে দেয়া হবে, পরিবার পরিজন অত্যাচারিত হবেন।

উত্তর দিলাম দুটি লোক গিয়ে আপনাদেরে এমন ধমক দিল — আপনারা বিশ্বাস করে গ্রাম ছেড়ে এত দূর শহরে এসে জান বাঁচালেন। বর্ষার দিন, ঐ দুটো লোককে ডোবায় পুঁতে রেখে দিলেন না কেন? আপনারা তো সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন, এখন যদি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়?

তারা বোকার হাসি হেসে উত্তর দিলো– আপনি এসব বুঝবেন না।'

রেফারেন্ডামে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে হাজির হলেন ডাঃ ভূপান বসু আরো একজন ডাক্তার, নাম মনে পড়ছে না। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচুর কলেরা বসন্তের প্রতিষেধক ঔষধ দিতে আরম্ভ করলেন। তারা মুসলিম লীগ দলের কাছেও উপস্থিত হয়েছিলেন এই সেবা ব্রত নিয়ে। অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন।

ডাঃ ভূপাল বসু প্রখ্যাত চিকিৎসক, বিপ্লবীও। কলকাতা ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায় ধরা পড়ে যান। মামলায় চাই হিসাবে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তদুপরি এককালীন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সেরা ছাত্র ডাঃ বসুর ডাক্তারীর সনদ প্রত্যাহার করা হলো।

ডাঃ বসু ও সঙ্গীয় ডাক্তার যে কয়দিন সিলেটে ছিলেন, অক্লান্ত শ্রম করেছেন।

কলকাতা থেকে মিলিটারী ইউনিফরম পরা, ইয়াগোঁফ, দুইজন হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবকও আসেন। সব সময় ইউনিফরমের ক্রিজ দুরস্ত রাখার চেষ্টায়-ই সময় গোজরান করেন।

সিলেট শহরের বহু খ্যাত ও অখ্যাত মুসলমান, দিনে যারা মুসলিম লীগ করতেন সন্ধ্যার পরে আসতেন তাদের ব্যালোট বিক্রির ধাঁধায়। ব্যালোট পেপার ব্যবসায়ে, কেনা বা বেচায়, আমার যে উৎসাহ ছিল না তা কারো অজানা ছিল না। তাই তারা অফিসের অন্যান্যদের কাছে ধর্ণা দিতেন। আমার জানামতে আমাদের অফিস হতে কোন ব্যালোট কেনা হয়নি।

রেফারেন্ডামের দ্বিতীয় দিনে শেষের দিকে, সুরমা নদীর দক্ষিণপারে, টেকনিক্যাল স্কুলের নিকটে সোপশহর গ্রামে আমাদের কর্মীদের উপর এক আক্রমণ হয়। এতে ব্যায়ামবীর পূর্ণেন্দু পাল, আরো একজন এবং একটি স্থানীয় শিখ কর্মীকে ছোরা মেরে সুরমা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। সিলেটের মীরাবাজার মহল্লায় একটি ছোট শিখ পল্লী ছিল। আহতরা কোনক্রমে মেডিক্যাল হসপিটালে চিকিৎসারত হয়ে বাড়ি ফিরেন। পূর্ণেন্দু পালের জখম সর্বাধিক ছিল। তাঁর বেঁচে যাওয়া একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। অবস্থা দেখে আমরা রেফারেন্ডামের ফল সম্পর্কে প্রায় নিঃসংশয় হয়ে যাই।

১৯৪৭ সালের ৬ই ও ৭ই জুলাই সিলেট ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রায় আশি হাজার শ্রমিককে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। কারণ, তারা নাকি বাইরের লোক যদিও তারা কয়েক পুরুষ ধরে সিলেট জেলায় বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের অন্যত্র হতে আগত সবুজ ইউনিফরর্মধারী মুসলিম লীগ ন্যাশনেল গার্ডদের দৌরাত্মে বহু বহু নিরীহ ভোটার ভোট দেওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। সিলেটের মুসলমান মহিলাদের মধ্য থেকে অনেকে বোরখা পরে অপরের স্ত্রী সেজে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেন। তদুপরি আসাম গভর্ণমেন্ট প্রেস থেকে ছাপা করা বাক্স ভর্তি অননুমোদিত ব্যালট পেপার এনে পকেটে বা গাড়ির নিচে করে ব্যালটগুলি ভোটের বাক্সে পুরে দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন মুসলিম লীগ কর্মীরা। ফল যা হবার তা-ই হলো।

১৪ই জুলাই ভোটের ফল গণনা করা হলো। পাকিস্তানের পক্ষে দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয় শত উনিশ ভোট। ভারতের পক্ষে এক লক্ষ চুরাশি হাজার তিন শত এক চল্লিশ। পঞ্চান্ন হাজার আটান্ন ভোটে সিলেটবাসীরা পাকিস্তান হাসিল করলেন।

আসামের মূখ্যমন্ত্রী মি. গোপীনাথ বড়দলইর বিরুদ্ধতায়, মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সমর্থিত হওয়ায় ক্যাবিনেট মিশনের অবলুপ্তি ঘটে। ফলে দেশবিভাগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর বিকল্প নাকি আর ছিল না। অথচ মহাত্মা গান্ধীই প্রথমে বলেছিলেন, আমার মৃত দেহের উপর দিয়ে দেশ বিভাগ হতে পারে।'[১৪৩]

খ.

'...২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ এটলি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যেই ব্রিটিশরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাবে। মুসলিম লীগ দাবি তোলে 'আসাম'কে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও জমিয়ত সেটার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তাদের দাবি হচ্ছে আসামে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কম (১,০২,০৪,৭৩৩-এর মধ্যে মুসলমান মাত্র ৩৪,৪২,৪৭৯)। কিন্তু সিলেট জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় শেষ পর্যন্ত সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলে মুসলিম লীগ। পরিশেষে ঠিক হয় সিলেট অঞ্চল আসাম অর্থাৎ ভারতের সাথে থাকবে না পাকিস্তানের সাথে থাকবে তা স্থির করার জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৬ ও ৭ জুলাই ১৯৪৭ সিলেটে গণভোটের তারিখ নির্ধারিত হয়। আমাদের মতো রাজনৈতিক কর্মীদের কেউ চায় নি এভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হোক। কারণ সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পেলে মানবতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ লাভ কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমান হিসেবে রাজনীতিতে আমরা যাই নি; গিয়েছি ব্রিটিশ তাড়িয়ে এ দেশের স্বশাসন আনতে।

---

১৪৩. আমীনূর রশীদ চৌধুরী/সত্য ও তথ্য : অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী। [সাহিত্য প্রকাশ– ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ৯৫-১০২]

গণভোটকে সামনে রেখে শুরু হয় নানা প্রচারণা। মূলত তাতে হিন্দু-মুসলমান ভিত্তিক চরিত্র প্রাধান্য পায়। বুঝেছিলাম এই প্রচারণায় যে ক্ষতি হবে তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। নোয়াখালি থেকে ফেরার পরই আমি গণভোটের কাজে নেমে পড়ি। প্রবল প্রচারণার জোয়ার বইতে থাকে গ্রামে। মনে হয়েছিল যে, গ্রামে এই প্রথম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সাড়া পড়েছে ভাঙ্গবে গ্রাম সমাজের ঐক্য। এই গণভোটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের প্রচার কাজে এসেছিলেন। উভয় পক্ষে নানা প্রচারপুস্তিকাও বের হয়। কংগ্রেস কর্মীরা শ্লোগান দিত 'পাটের দেশে যাব না, ভাতের মাড় খাব না, অনাহারে মরব না।' যুক্তি হলো বাংলায় পরপর দুর্ভিক্ষে, অনাহারী লোকেরা সিলেটে আসতেই থাকে সেখানে গেলে দুর্ভিক্ষ আরো বাড়বে এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে যাবে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের যুক্তি থাকতো হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানদের ধর্ম থাকবে না, বিভিন্ন অসুবিধা হবে। তাদের এক প্রচারপত্রে বলা হয়, 'আপনারা চিরজীবনের জন্য দারুল ইসলাম চাহেন না দারুল হরব চাহেন, ইসলামীস্তান চাহেন না কুফরীস্তান চাহেন, পাকিস্তান চাহেন না হিন্দুস্থান চাহেন এবারের ভোটে তাহা চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে। আপনাদের নিকট ইসলাম ও ইসলামের ইজ্জত বড় না আপনাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ বড় এবারের ভোটে ইমানের সেই কঠিন পরীক্ষা আসিয়াছে...।'

জমিয়তে উলামা কংগ্রেসের সাথে কাজ করেছিল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডসহ স্বেচ্ছাসেবীদের আগমনে উদ্ভূত পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে সেই নিয়ে আমরা চিন্তা করি। কংগ্রেসের 'কুঁড়েঘর' এবং মুসলিম লীগের 'কুড়াল' অর্থাৎ ভারত আসামের পক্ষে 'কুঁড়েঘর', বাংলার পক্ষে 'কুড়াল' ছিল।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হলেও চা শ্রমিকরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ সিলেট অঞ্চলের চা বাগানে কয়েক লক্ষ চা শ্রমিক ছিল। কংগ্রেস থেকে জোর দাবি তোলা হলো চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার দেয়া হোক। কেননা তারা প্রায় শো-দেড়শো বছর পূর্বে সিলেটের চা বাগানে স্থায়ীভাবে চলে আসে এবং আসাম এসেম্বলি সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠায়। মুসলিম লীগ ও সরকার সেটাকে Floating population বলে অভিহিত করে। শুরু হলো চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ২৮ মার্চ খাদিম নগর চা বাগান, ২৯ মার্চ গুলমি চা বাগান, ১১ এপ্রিল শমসেরনগর চা বাগানে শ্রমিকদের ভোটাধিকারের জন্য মিটিং করি। নিকুঞ্জদা, জীবন সাঁওতাল প্রমুখ পূর্ব থেকেই চা শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। ২৯.৬.১৯৪৭ তারিখ কয়েক হাজার চা শ্রমিক নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামীর নেতৃত্বে মৌলভীবাজার এস.ডি.ও. অফিস ঘেরাও করে। আমিও কর্মসূচিতে অংশ নেই। ফুলতলা, জুড়ি, শ্রীমঙ্গল থেকে শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে এসেছিল। তবুও মুসলিম লীগের আপত্তিতে সরকার এ সময় তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রশ্নে কংগ্রেসও তেমন সাংগঠনিকভাবে কাজ করে নি।

গণভোটকে সামনে রেখে আমরা গ্রাম সেবাদল গঠন করতে থাকি। আমি দক্ষিণ শ্রীহট্টে কাজ করি এবং সেখানকার বহু গ্রামে যাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে। হিঙ্গাজিয়া, চাটুরা, চুনঘর, শমসেরনগর, ভানুগাছ, শ্রীমঙ্গল টাউন, বরমচাল, কটারকোণা, জয়চণ্ডী, নর্তন, মৌলভীবাজার টাউন, জগন্নাথপুর, দুলালী, খলাগ্রাম, মলাল, মহাসহস্র, পাঁচগাঁওসহ কত গ্রাম ও অঞ্চলে যে দিনরাত ঘুরেছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২২ জুন গণভোট প্রচার কাজে বৈদ্যনাথ মুখার্জি ও বিষ্ণু মেধী কুলাউড়া এসেছিলেন। তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা কাজ করলেও তারা যোগেন্দ্র মণ্ডলের প্রতি বেশি অনুরক্ত থাকায় সেখানে আবেদন অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। মুসলিম লীগ যোগেন্দ্র মণ্ডলকে বুঝিয়েছিল যে, পাকিস্তান হলে তিনি বড় মন্ত্রী হবেন, আবার তফসিলিদের কাছ বর্ণহিন্দুরা দূরে থাকার কারণেও তারা সেদিন তেমন সাড়া দেয় নি বলে মনে হয়েছে।

৬ ও ৭ জুলাই গণভোট হলো। কয়েকটি ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখলাম কোথাও বড় ধরনের সংঘাত হয়নি, শুধু মৌলভীবাজার শহরের পশ্চিম দিকে সম্ভবত আমতৈল কেন্দ্রে একজন মুসলিম লীগ কর্মী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। ১৪ জুন আমরা ভোটের ফলাফল পেলাম ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে সিলেট পূর্ববাংলার সাথে থাকার পক্ষে রায় হয় (পক্ষে ২,৩৯,৬১৯, বিপক্ষে ১,৮৪,০৪১)। ফল প্রকাশের পরই মুসলিম লীগের বিজয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসে অনেকেই ভাবলেন হয়তো অনিশ্চিত পরিণতির কথা। কংগ্রেসীরা সম্প্রীতি রক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ভলান্টিয়ার কমিটি গঠন করলেও বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর এলো হিন্দুরা সিলেট ত্যাগ করছে। দেশ বিভাগের ক্রান্তিলগ্নে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছিল। বারবার মনে হলো, আমাদের পূর্বসূরি বিপ্লবীরা বা স্বদেশ সেবকরা যেখানে একত্র হয়ে আন্দোলন করেছিলেন; আজ সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক মাথায় নিয়ে 'হিন্দু মুসলমান' যার যার ধর্মের পরিচয়ে পৃথক হচ্ছি, যা সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করবে একটা আদর্শ গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে। একটা অবিশ্বাস নিয়ে দুই ধর্মের লোক বিপজ্জনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। মানসিক অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিজয়ী মনোভাব, অপরদিকে হিন্দুদের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি যেন ফুটে ওঠে। গ্রাম থেকে ভয়াবহ খবরে শহরের লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি ছাড়তে হিন্দুরা দ্বিধাবোধ করে নি। তদ্রুপ আসাম থেকে দু চার মুসলমান পরিবারও পূর্ব বাংলায় আসতে থাকে। স্বপল্লী ছাড়ার বেদনা ও মর্মপীড়া ভুক্তভোগীরাই বুঝেছিল। মনে মনে ভাবলাম শুরুতেই অবিশ্বাস নিয়ে লোকজন ছোটাছুটি করছে ভবিষ্যৎ অন্ধকারই থাকবে। মানুষের জীবন ছারখার হয়ে গেল মুহূর্তেই। স্বাধীনতার পরিণতি যে এই হবে তা আমরা কখনো চিন্তা করি নি। এক অনিশ্চিত আতঙ্কের মধ্যে সিলেট শহরের হিন্দুরা দিন কাটালেও ভেতরে ভেতরে বেশির ভাগ লোক নবগঠিত পাকিস্তানে না থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।"[১৪৪]

গ.

'...মৌলভীবাজারে আমার শৈশবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেশবিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে এই উপমহাদেশে দেশবিভাগ ছিল একটা বড় মাইলফলক।

বাংলা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে যখন ভর্তি হই তখনই যাকে বলে একেবারে আকাশে-বাতাসে হিল্লোল তুলে চলছিল পাকিস্তান-হিন্দুস্থান আন্দোলন। একমাত্র সিলেট জেলায় ১৯৪৭ সালে গণভোট হল। মুসলমান অধ্যুষিত বৃহত্তর সিলেটের প্রায় সবটুকুই যোগ দিল পাকিস্তানে।

আতিকের সেজো ভাই নূরুল হোসেন খান, তাদের চাচাতো ভাই আমাদের পাশের বাসার ইয়াজদানী খান সাহেবের ছেলে মোস্তফা ভাই, মহবুবউদ্দিন সাহেবের ছেলে ফারুক ভাই, এরা একদিন আমাদের স্কুলে এসে আমাদেরকে টেনে-টুনে ক্লাস থেকে বের করে নিয়ে গেলেন মিছিলে। তারপর শ্লোগান শিখলাম : 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' 'ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'ভোট দেবেন কিসে, কুড়াল মার্কা বাক্সে', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ কায়েদ আযম জিন্দাবাদ' ইত্যাদি।

দু'চারদিন বাসেও চড়েছি দিলারা আপা, মনোয়ারা আপা, সালমা আপা গং মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে। ভূমিকা : শ্লোগানে গলা দেয়া।

আমাদের ওপর বড়োদের কড়া নির্দেশ ছিল কংগ্রেসের কর্মীদের ডাকে ক্লাস থেকে না বেরোতে। কংগ্রেসের মার্কা ছিল ঘর। আর মুসলিম লীগের কুড়াল। আমরা অবশ্য ওই বয়সে মার্কা কী, ভোট কী, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানই বা কী অতসব বুঝতাম না। আমরা শুধু বুঝতাম, বড়রা বলেছেন, মিছিলে যাও, শ্লোগান দাও,

---

১৪৪. সুহাসিনী দাস/সেকালের সিলেট ‖ [সাহিত্য প্রকাশ– জুন, ২০০৫। পৃ. ৪৯-৫১]

অতএব যেতে হবে, দিতে হবে। মিছিল-শ্লোগান ইত্যাদির চোটে প্রায়দিনই গলা বসে যেত। নেতারা তখন হাতে একটা করে 'পেপ'-এর বড়ি ধরিয়ে দিতেন গলা সারাবার জন্যে। আমরা ওটাকেই লেবেনচুষের মত চুষে খুশি হয়ে যেতাম।

গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ এর ৬ এবং ৭ জুলাই। অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) মাসখানেক আগে। গণভোটের কাজে আব্বা গিয়েছিলেন শহরের নিকটেই মহলাল গ্রামের একটি স্কুলে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে। আব্বা ফিরেছিলেন বেশ রাত করে। আমরা অর্থাৎ ছোটরা ব্যতীত আর সবাই তখনও জেগে। আব্বা বাসায় ফিরে বোধ হয় ইতিবাচক কোন কথা বলে থাকবেন। ফলে সারা বাসায় ওই গভীর রাতেই শুরু হল হৈ চৈ। আমরা দুই ভাই ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে রীতিমত লাফালাফি জুড়ে দিলাম খাটের ওপর।

তবে আসল হুলস্থূল হল ১৫ এবং ১৬ আগস্ট। সারা শহরে তখন কুল্লে দু'তিনটা ঢাউস ঢাউস ব্যাটারিচালিত রেডিও সেট। তার একটা আবার আমাদের পাশের বাসার মোস্তফা ভাইদের। তাতেই ১৫ তারিখে সারা শহরে খবর রটে গেল পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

পরদিন নূরুল ভাই, কমরু চাচা, ফারুক ভাইয়েরা মিলে পার্কে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার আয়োজন করলেন। ওতে তিন পায়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি ও আতিক ফার্স্ট হয়ে এক কৌটা করে পাউডার পুরস্কার পেলাম। আরেকটা ফার্স্ট প্রাইজ পেলাম একটা রেক্সোনা সাবান। ওটা ছিল একজনকে পিঠে নিয়ে দৌড়ানো। ওটাতেও আতিক আমার পার্টনার। তবে আমার পিঠে নয়, দুবলা-পাতলা ছোটখাটো গড়নের ছিলাম বলে আতিকের পিঠে চড়েছিলাম আমি। আতিকের পিঠে আমি লটকে ছিলাম বড়োজোর মিনিটখানেক। তারপরই নেমে গিয়েছিলাম 'রেস' শেষ হওয়ার পর। কিন্তু আমাদের পিঠ থেকে সিন্দাবাদের দৈত্য পাকিস্তানকে নামাতে লেগেছিল ঝাড়া ২৪ বছর। তাও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে।"[১৫৫]

---

১৫৫. মোফাজ্জল করিম/সোনালি সকাল দুরন্ত দুপুর ॥ [অনন্যা- ফেব্রুয়ারি, ২০১১। পৃ. ৪৭-৪৮]

ষষ্ঠ পর্ব

র‍্যাডক্লিফের ছুরি : বাউন্ডারি কমিশন

এক

"...বাংলায় যেসব জেলা মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব জেলা পূর্ব পাকিস্তানে এবং যেসব
সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব জেলা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব ও প
মধ্যকার সঠিক সীমানা নির্ধারণ করার জন্য একটি বাউন্ডারি কমিশন গঠন অপরিহার্য হয়ে প
সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ সীমান
স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড মাউন্টব্যা
দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নীতি প্রণয়নে
নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৮ জুন ১৯৪৭ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ অন্যান্য মুস
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। জিন্নাহ সাহেব বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের বাউন্ডারি কমিশনের
প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির তিনজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু
বয়সে ভারতবর্ষের গরম সহ্য করতে পারবেন না - এই অজুহাতে মাউন্টব্যাটেন উক্ত প্রস্তাব না
দেন। তখন জিন্নাহ সাহেব বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রতি কমিশনে তিনজন
ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কমিশন গঠন সময়সাপেক্ষ
এবং যেহেতু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পূর্বেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে, তাই
দ্বিতীয় প্রস্তাবও নাকচ করা হয়।

১০ জুন ১৯৪৭ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।
নেতৃবৃন্দ প্রতি কমিশনে ২ জন মুসলিম লীগ ও ২ জন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং উভয় কমিশনের
একজন নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিরপেক্ষ চেয়ারম
নাম প্রস্তাব করবে। কমিশনের সদস্যবৃন্দ হবেন বিচার বিভাগীয়।

১২ জুন নেহেরু কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স' কী হওয়া উচিত তার খসড়া গভর্নর জেনারে
প্রদান করা হয়। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উক্ত খসড়ায় নেহেরুর প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলার দুই অংশের সীমানা মুসলমান ও অমুসলমানগণ যে সকল সংলগ্ন এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ণয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে সীমানা নির্ধারণ করার সময় অন্যান্য বিষয়ও (Ot factors) বিবেচনায় রাখতে হবে।
২. সিলেটে গণভোটের ফলাফল যদি উক্ত জেলার পূর্ববাংলার সংযুক্তির পক্ষে হয় তাহলে বাংলা বাউন্ডারি কমিশনই সিলেটের ও সিলেট সংলগ্ন জেলাসমূহের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করবেন।

১৩ জুন ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা আহবান করেন। নেহেরু, প্যাটেল, কৃপালিনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার ও বলদেব সিং উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে উভয় দল একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১. একজন নিরপেক্ষ সভাপতি এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে বাউন্ডারি কমিশন গঠিত হবে।

২. সদস্যবৃন্দ বিচার বিভাগীয় হবেন।

৩. জিন্নাহ ও নেহেরু স্ব স্ব দলের প্রতিনিধিদের নাম গভর্নর জেনারেলের নিকট জমা দিবেন।

৪. প্রতি বাউন্ডারি কমিশনের সদস্যবৃন্দ বৈঠকে বসে একজন নিরপেক্ষ সভাপতির নাম সুপারিশ করবেন। তারা এ কাজে ব্যর্থ হলে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যৌথ বৈঠকে তা ঠিক করবেন।

৫. টার্মস অব রেফারেন্স সংক্রান্ত ইতিপূর্বে পেশকৃত নেহেরুর খসড়া রিপোর্টটি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিবেচনা করে তাদের মতামত গভর্নর জেনারেলকে অবহিত করবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রসঙ্গে জিন্নাহ ২৩ জুন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একজন ব্রিটিশ বিচারক বাংলা ও পাঞ্জাব এই উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারেন এবং তিনি Arbitration Tribunal এরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেতে পারেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে অবহিত করেন যে, Arbitration Tribunal-এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ভারত সচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। জিন্নাহও পরদিন র‍্যাডক্লিফকেই বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণের জন্য মুসলিম লীগের সম্মতির কথা গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে দেন। গভর্নর জেনারেল ২৬ ও ২৭ জুন অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাবিনেট সভার বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জিন্নাহর সুপারিশ অবহিত করেন। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ র‍্যাডক্লিফকে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে জিন্নাহ এবং নেহেরু কমিশনের স্বীয় দলের সদস্য-প্রতিনিধির নাম ভাইসরয়ের নিকট জমা দেন। মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন :

১. কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরম এবং

২. পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এ. রহমান।

কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন :

১. বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস এবং

২. বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জি। উভয়ই কলকাতা হাইকোর্টের।

এসময় আসামের গভর্ণর সিলেটের পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম বাউন্ডারি কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু বাংলা বাউন্ডারি কমিশনই আসাম-সিলেট অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করবেন - ইতিপূর্বে গৃহীত কংগ্রেস-লীগের এই সিদ্ধান্তের আলোকে আসাম গভর্নরের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৩০ জুন ১৯৪৭ তারিখে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের সদস্যদের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা কমিশন পূর্ববাংলা ও আসামের সীমানা চিহ্নিত করবেন। ৪ জুলাই ভাইসরয় বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ঘোষণা করেন।

স্যার র‍্যাডক্লিফ ৮ জুলাই দিল্লী পৌঁছেন এবং অনতিবিলম্বে ভাইসরয়, কমান্ডার ইন চিফ, এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এই ধারণা পান যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করতে হবে। ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় র‍্যা এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নেন যে, সীমানা চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে কমিশনের চেয়া হিসেবে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় লীগ ও কংগ্রেস নেতৃ উপস্থিতিতে র‍্যাডক্লিফ আরো পাশ করিয়ে নেন যে, তার কোনো সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না কমিশন যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে লীগ ও কংগ্রেস তা হুবহু মেনে নেবে। ফলতঃ কমিশনের চেয়ার হন সর্বেসর্বা। প্রকৃতপক্ষে সদস্যদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ দিল্লীতে বসেই সীমানা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুধু একবার কলক সফর করে যান। কমিশনের সদস্যগণ কলকাতা ও লাহোর থেকে প্রত্যহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিকট দিল্লীতে প্রেরণ করবেন বলে তিনি নিয়ম করেন। সেখানে দলকে সীমানা সংক্রান্ত দাবিনামা পে করার আহ্বান জানান। জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বাংলা কমিশন ১৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলা আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস, বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের প থেকে বিভিন্ন দাবিনামা পেশ করা হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ থেকে ৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোট অনুযায়ী সিলেট জেলা পূর্ববাংলার সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার সীমানা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কমিশন ৪ থেকে ৬ আগস্ট কলকাতায় এক বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে আসাম সরকার ও পূর্ববাংলা সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিবর্গ এবং পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ ও সিলেট জেলা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে দাবিনামা পেশ করা হয় তাতে বাংলার মোট ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪০,১৩৭ বর্গমাইল দাবি করা হয়। দাবিকৃত এলাকার জনসংখ্যা ছিল অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৫%, তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩২%, এবং বাকিরা অমুসলমান। কংগ্রেস যে-সমস্ত এলাকা দাবি করে সেগুলো হচ্ছে গোটা বর্ধমান বিভাগ, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলাসমূহের সামান্য অংশ বাদে গোটা প্রেসিডেন্সি বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, রংপুর জেলা থেকে ডিমলা ও হাতিবান্ধা থানা, দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ এবং নবাবগঞ্জ মহকুমা বাদে মালদহ জেলা, ঢাকা বিভাগের বরিশাল জেলা থেকে গৌরনদী, নজীপুর, স্বরূপকাঠি এবং ঝালকাঠি থানাসমূহ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজৈর থানা। ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে আসামের রেল-যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস রংপুর জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ভুরুঙ্গামারীও দাবি করে বসে। কংগ্রেস কলকাতা শহর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পেশ করে। তাদের দাবির সপক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, ১৯৪১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী কলকাতা শহরে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ২৩.৫৯% (মোট ২,১০৮,৮৯১ এর মধ্যে ৪,৯৭,৫৩৫), কর প্রদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১৪.৮% (৬৮,৫৬৭ এর মধ্যে ১০,১৪৯) এবং কলকাতা শহরের ৮১,১৫৯টি বাড়ির মধ্যে মুসলমান বাড়ির সংখ্যা মাত্র ৬,৮৬৩ (৮.৪৫%)। কংগ্রেস আরো উল্লেখ করে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বেসরকারি সাহায্যের মধ্যে মুসলমানদের দান মাত্র ১% (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের মধ্যে মাত্র ১ লাখ)। কংগ্রেস আরো যুক্তি দেখায় যে, কলকাতার আশেপাশে যে ১১৪টি পাটকল আছে তার সবগুলির মালিক অমুসলমান ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত করলে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কলকাতা শহর ও এর অধিবাসীদের প্রয়োজনে (রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে, নদী, সড়ক ও রেল যোগাযোগ নির্বিঘ্ন রাখতে, প্রভৃতি) মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, যশোর জেলাসমূহ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জেলাগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অপরপক্ষে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগের বেশিরভাগ অংশ এবং বর্ধমান জেলাসমূহ, হুগলি ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা হয়। মুসলিম লীগের দাবিতে বলা হয় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে এবং পূর্ববাংলার অর্থনীতির প্রয়োজনে এই জেলাগুলি পূর্ববাংলাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে নদী ও এর শাখা নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ নদীগুলি জলপাইগুড়ির তিস্তা দিয়ে প্রবাহিত। তাছাড়া পূর্ববাংলার রেলপথ সংরক্ষণের একমাত্র উৎস হচ্ছে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ অবস্থিত পাহাড়ের পাথর। পূর্ববাংলার কাঠের চাহিদা মেটানো হত জলপাইগুড়ি জেলার বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ থেকে। সুতরাং মুসলিম লীগ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয় পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি পেশ করে। পূর্ববাংলায় ভবিষ্যতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর অধিকার আবশ্যক। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয়।

মুসলিম লীগ কলকাতা শহর পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবি পেশ করে। মুসলিম লীগ যুক্তি পেশ করে যে, কলকাতা শহরটি গড়ে উঠেছে মূলত পূর্ববাংলার সম্পদ দিয়ে। পৃথিবীর ৮০% পাট পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হয় এবং ঐ পাট দিয়েই কলকাতার আশেপাশের পাটকল চলে। তাছাড়া কলকাতা ছিল বাংলার একমাত্র সমুদ্র বন্দর। উক্ত বন্দরে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী, নাবিকরা মূলতঃ পূর্ববাংলার লোক। অতএব কলকাতা পূর্ববাংলারই প্রাপ্য।

এইভাবে কংগ্রেস ও লীগের দাবিদাওয়ার মীমাংসা করা কমিশনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ব্যক্তিগতভাবে এ সব দাবিদাওয়া সম্পর্কে কোনো পক্ষকে সাক্ষাৎকার দেননি। তিনি বুঝতে পারেন যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি নিজের ইচ্ছেমত সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। সীমানা চিহ্নিত সংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভাবন করেন, যেমন :

ক. বাংলার কোন অংশকে কলকাতা শহর প্রদান করা উচিত? এই শহরকে দ্বিখণ্ডিত করে উভয় অংশকে খুশি করা কি সম্ভব?

খ. সমগ্র কলকাতার সঙ্গে কোনো একটি অংশকে প্রদান করার পিছনে নদীয়া কিংবা কুলটি নদীকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কি না।

গ. টার্মস অব রেফারেন্সে উল্লেখিত 'সম্প্রদায়গত সংলগ্ন এলাকার' নীতিকে উপেক্ষা করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা যশোর ও নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যথার্থ হবে কি না।

ঘ. মালদহ ও দিনাজপুর জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কিছু অংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা কি পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে?

ঙ. দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু জেলাদ্বয়ের মুসলিম জনসংখ্যা অত্যন্ত কম (১৯৪১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী দার্জিলিং-এ মাত্র ২.৪২% ও জলপাইগুড়িতে ২৩.০৮%।) সুতরাং এই জেলাদ্বয় কোন অংশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত?

চ. পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ৩% হলেও জেলাটি চট্টগ্রাম জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এই জেলাটি কোন ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে?

মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনায় যদিও 'সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং এলাকার সংলগ্নতা' (Majority and Contiguity Principles)-এর ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফ উক্ত নীতি এবং লীগ-কংগ্রেস-এর সমঝোতা নীতিকে উপেক্ষা করে নিজের বিচারবুদ্ধিমতো সীমানা চিহ্নিত করেন। জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সীমানা নির্ধারণ করলে অন্তত কয়েকমাস সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ তার দিল্লী অফিসে বসে টেবিলের উপর ভারতবর্ষের মানচিত্র রেখে মাত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের সীমানা চূড়ান্ত করেন। এই কাজ করতে তিনি মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫০ সালে কলকাতার এক জনসভায় উল্লেখ 'আমরা ভারত বিভাগে রাজি হওয়ার পূর্বশর্তস্বরূপ কলকাতা শহর যেন ভারতভুক্ত থাকে তার চেয়েছিলাম। আমাদেরকে সে নিশ্চয়তা দেওয়া হলে আমরা ভারত বিভক্তিতে সম্মত হই'। মাউ যেভাবেই হোক কলকাতা ভারতকে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। সম্ভবত সেজন্যেই তিনি কমিশনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য কিংবা জাতিসংঘের মনোনীত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা সমর্থন যাহোক, র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করা হয়।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত জেলাগুলো পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে:
১. ঢাকা ২. ময়মনসিংহ ৩. ফরিদপুর ৪. বাখেরগঞ্জ (বরিশাল) ৫. চট্টগ্রাম ৬. ত্রিপুরা ৭. নোয়া পাবনা ৯. বগুড়া ১০. রংপুর ১১. রাজশাহী।

নদীয়া, দিনাজপুর এবং মালদহ জেলা পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো

নদীয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬১% মুসলমান) জেলা হওয়া সত্ত্বেও এর দুই তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়। বাকি অংশ চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়া মহকুমা পূর্ববাংলার ভাগে

অবিভক্ত দিনাজপুরের ৩০টি থানার মধ্যে সম্পূর্ণ এলাকাসহ ৯টি থানা ও একটি থানার অংশ পশ্চিমবঙ্গের ভাগে দেওয়া হয়। অপর পক্ষে ২০টি থানা সম্পূর্ণভাবে, ১টি থানা আংশিকভাবে (পূর্ববাংলাকে দেওয়া হয়।

মালদহ জেলার (৫৭% মুসলমান) চাপাই নওয়াবগঞ্জ মহকুমা পূর্ববাংলাকে দেওয়া হয়। বাকি (মালদহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা থেকে ৪টি থানা যথা- দেবীগঞ্জ, বোদা, তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় পূর্ববাংলার ভাগে প

সম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলা (৫৬.৬% মুসলমান) পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয়।

যশোহর জেলার বনগাঁও (৫৩% মুসলমান) ও গাইঘাটা থানা বাদে গোটা যশোহর জেলা পূর্ববাংলা দেওয়া হলো।

খুলনা (৪৯.৩৬% মুসলমান) জেলাকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে খুলনা জেলা তিনদিন ভারতীয় পতাকা উড্ডীন ছিল। কোলকাতার বেলভেডিয়ার হাউজে সীমান্ত নির্ধারণী মামলা এ.কে. ফজলুল হক স্যার র‍্যাডক্লিফের নিকট ওকালতি করে খুলনা জেলাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে জানা গেল মুর্শিদাবাদ জেলার বদলে খুলনাকে পূর্ব বাংলার ভাগে দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান অধ্যুষিত মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকা ভারতকে প্রদানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলাকে দেওয়া হয়। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রহণের ব্যাপারে কংগ্রেসের ততটা আগ্রহ ছিল না।

কমিশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মুসলমান সদস্যরা দাবি করেন যে, পূর্ববাংলার সংলগ্ন আসামের সকল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে হিন্দু-সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের ক্ষমতা কেবল সিলেট জেলা সংলগ্ন আসামের সীমানা নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কমিশনের চেয়ারম্যান হিন্দু-সদস্যদের মত সমর্থন করেন।

সিলেট জেলার ৩৫টি থানার মধ্যে মাত্র ৮টি থানায় অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তার মধ্যে ২টি থানা সুল্লা ও আজমিরীগঞ্জ - চারিদিকে মুসলমান থানা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বাকি ৬টি থানা সিলেটের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে একটানা অবস্থিত ছিল - তবে মূল সিলেটের সঙ্গে থানাগুলির কোনো সংযোগ ছিল না।

অপরদিকে কাচার জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তা সিলেটের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বদরপুর ও করিমগঞ্জের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এই এলাকা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের দক্ষিণের ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার সঙ্গে আসামের কোনো সংযোগ থাকে না, আবার ৬টি থানাই আসামের অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের সঙ্গে পূর্ববাংলার রেল - যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কমিশনের চেয়ারম্যান মনে করেন যে, কিছু মুসলমান এলাকা ও হাইলাকান্দি মহকুমা অবশ্যই আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং দক্ষিণ সিলেটের ও করিমগঞ্জ মহকুমার ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করে তার বিনিময়ে পাথরকান্দি, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর - এই চারটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ৪টি থানাকে পূর্ববাংলায় রাখার জন্য আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বাউন্ডারী কমিশনের নিকট স্মারক লিপি পেশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে তার সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। কোলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছে। স্মারকলিপি পেশ করার জন্য তারা যে গাড়িতে ওঠেন তার শিখ ড্রাইভার তাদেরকে নিয়ে বলি দেবার জন্য কালিঘাট অভিমুখে রওনা দেয়। শারীরিক শক্তি প্রয়োগে ড্রাইভার কে তারা সে চেষ্টা নিবৃত্ত করেন এবং ভেলভেডিয়ারে গিয়ে তারা কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

যদিও ১৫ আগস্টের পূর্বেই সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের কথা ছিল কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের কোনো কর্মসূচি যাতে সীমানা সংক্রান্ত ক্ষোভের কারণে ব্যহত না হয় সেজন্য মাউন্টব্যাটেন তা ১৬ আগস্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। যথারীতি ১৬ আগস্ট বিকেল পাঁচটায় ভাইসরয়ের বাড়িতে পার্টিশন কাউন্সিলের সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় পাকিস্তানের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যথাক্রমে লিয়াকত আলী খান ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরদার বলদেব সিং, আবদুর রব নিশতার, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ভি.পি. মেনন উপস্থিত হন। সভা শুরুর তিন ঘন্টা পূর্বে সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই রিপোর্ট কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ প্রতিনিধিদের কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দুই ঘন্টা ধরে সভায় হট্টগোল এবং বাদ-প্রতিবাদ চলে। তবে শেষ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেন যে, যেহেতু সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে কেউই খুশি হতে পারেননি, তার অর্থ প্রত্যেক পক্ষ কোথাও-না-কোথাও কিছু সুবিধা লাভ করেছে যা অন্য পক্ষকে অসন্তুষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষ সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হয় এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার ঐকমত্য ঘোষণা করে।

বাংলা বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার মোট আয়তনের ৬৩.৮০% এবং মোট জনসংখ্যার ৬৪.৮৬% লাভ করে। বৃহত্তর বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ৮৩.৯৪% এবং অমুসলমান জনসংখ্যার ৪১.৭৮% পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ৭০.৮৩ : ২৯.১৭। নগগঠিত পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ২৫.০১% : ৭৪.৯৯%।

বাংলার বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মুসলমানদেরকে অবাক ও বিস্মিত করে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকার মুসলমানগণ ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করে, অথচ পরবর্তীতে তারা জানতে পারে যে, তারা ভারতভুক্ত হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত না করে দিল্লীর অফিস কক্ষে বসে মানচিত্রের উপর সীমানা চিহ্নিত করায় সীমানা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করে, কোথাও তা বাড়ির আঙিনার মাঝখান দিয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো ঘরের দরজা পড়েছে পাকিস্তানে, জানালা পড়েছে ভারতে।

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাময়িক ক্ষোভ সৃষ্টি করলেও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ চাপা পড়ে যায় দেশত্যাগ, দাঙ্গা ও লুটপাটের ঘটনার যাঁতাকলে।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে সমগ্র বাংলা বিভক্ত হলো। একটি পূর্ববাংলা অপরটি পশ্চিম ব… পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হলো। অপরদিকে পশ্চিম বঙ্গ হলো ভারতের এ… প্রদেশ। পাকিস্তান হলো মুসলমানদের দেশ।"[১৮৫]

দুই

"…পরের দিন যথাসময়ে কুমারপাড়া প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সাব্যস্ত হলো আমা… বাউন্ডারি কমিশনের মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হিসেবে কোলকাতা যেয়ে কাজ করতে হবে।

বাউন্ডারি কমিশনের ফাইনান্স কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন পৃথিমপাশার জমিদার জনাব আ… হায়দার খান। সকলে মিলে ঠিক করা হলো বাউন্ডারি কমিশনের অধিবেশনের পূর্বেই আমি ও সভাপ… আব্দুল মতিন চৌধুরী মরহুম (তিনি বিভাগ পূর্ব যুগে আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় ম… ছিলেন। তিনি বিভাগের পূর্বে ভারতের লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য ছিলেন) কোলকাতাতে উপস্থি… হয়ে পূর্বেই সিলেটের বাউন্ডারি সম্বন্ধে আমাদের পক্ষের উকিলদের অবহিত করব। আমার পক্ষে এ… গুরুভার একা বহন করা সম্ভব নয়, গতিকে আমাকে সাহায্য করার জন্য মরহুম মুহম্মদ আব্দুল্লা বি এ… আমার সঙ্গে দেওয়া হবে। আব্দুল্লা সাহেব ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় খালাতো ভাই। বয়সে আমার চেয়ে তেরো-চৌদ্দ বছরের বড়ো। তাকে আমি আমার প্রয়োজন মতো সব জায়গায় চালিয়ে নিতে পারবে না বলে, আমার আপন খালাতো ভাই দেওয়ান অহিদুর রেজাকেও সঙ্গে নিতে মনস্থ করলাম।

তখন রমজান মাস। কাজেই দিনের বেলায় আমরা কোনো কিছু খেতে পারবো না বলে, আমাদের রাতে খেতে হবে প্রচুর পয়সা খরচ করে। ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আলী হায়দার সাহেব তখন সিলেটের ডাকবাংলোয় ছিলেন খোদ উপস্থিত। অহিদুর রেজাকে নিয়ে গেলাম তার হুজুরের কাছে। তিনি বললেন, 'টাকাতো এখনও উসুল হয় নি, এখনও আপনি আপনার হাত থেকেই খরচ করেন, আমি পরে টাকা নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছি।' তার কথাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে, নির্দিষ্ট দিনে অহিদুর রেজা ও আব্দুল্লা ভাইসহ কোলকাতার পথে রওয়ানা দিলুম।

…ভোররাত্রে সুরমা মেইল শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছলে বুঝতে পারলুম, মুসলিম জনসাধারণ একেবারে হকচকিয়ে গেছে। ওদের মুখে সে দীপ্তি আর নেই। তখনও কোলকাতায় খুন জখম চলছে। আচকান পায়জামা পরিহিত মুসলমান ভদ্রলোকের জানখানা যেতে আর কতো সময়ই বা লাগতে পারে? তিনজনেই একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি করে ১০৫ নং বিলটিমোর হোটেল পার্কস্ট্রীট কোলকাতার অভিমুখে চললুম। হোটেলের মালিক ছিলেন শামসউদ্দিন চৌধুরী বলে ফরিদপুরের এক ভদ্রলোক। তিনি তখন অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য। আমরা তিনজনেই জায়গা পেলুম।

…একদিকে টাকার অনটন, অপরদিকে হোটেলে বসে স্বস্তিতে স্মারকলিপি তৈরি করাও মুশকিল। তাই আমি ও অহিদুর রেজা মরহুম খান বাহাদুর মাহমুদ সাহেবের অনুরোধে ৫০ নম্বর রিপন স্ট্রীট তাঁর বাড়িতে উঠে গেলাম।

আমাদের কাজ হলো প্রথমে আসাম মুসলিম লীগের তরফ থেকে স্মারকলিপি তৈরি করা। সে স্মারকলিপি মর্ম মতে আমাদের পক্ষের কৌশলি জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ফজলুল হক ও জনাব ওয়াসিমকে প্রস্তুত করা।

স্মারকলিপি খসড়া তৈরি করার ভার নিলেন জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ। অপরাপর স্মারক লিপিগুলো ঠিক করার ভার নিলাম আমি। ঠিক হলো সবগুলো স্মারকলিপির টাইপ করানো হবে ঝাউতলায়।

---

১৮৫. মুহাম্মদ আসাদ/বাংলা যেভাবে ভাগ হলো। [কুঁড়েঘর প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ৮২-৯১]

হামিদুল হক চৌধুরী তখন থাকতেন ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটে। আবার ওয়াসিম সাহেব থাকতেন পার্ক সার্কাসে লক্ষ্ণৌর এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন জনাব ফজলুর রহমান। তিনি তখন অবিভক্ত বাংলার রাজস্ব বিভাগের উজির। আমাদের সভা বসত আকরাম খান সাহেবের বাড়িতে। আমাদের যাতায়াত তখন খুব সীমাবদ্ধ। লোয়ার সারকুলার রোড, পার্কসার্কাস, পার্কস্ট্রীট প্রভৃতি মুসলিম প্রধান অঞ্চলেই আমাদের আগামীদিনের কর্মসূচি তৈরি করছি, অমনি দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলো। পরে শুনতে পেলাম পাঁচজন মুসলিম শহীদ হয়েছেন, কোনো অপরাধ করে নয়, 'মুসলিম' বলে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায়।

হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবকে অতি সহজেই সিলেটের মানচিত্র বোঝানো গেল। তবে মুশকিল হলো জনাব ওয়াসিমকে নিয়ে। তিনি সুরমাকে বলেন কুশিয়ারা আর কুশিয়ারাকে বলেন সুরমা, হাতা ভাঙ্গাকে বলেন হাতভাঙা, আর বিয়ানীবাজারকে বলেন বিহানীবাজার। বাংলাদেশ তথা সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থান বোঝাতে বোঝাতেই আমাদের জান হয়রান। আমাদের বাউন্ডারি কমিশনে সাহায্য করতে এসেছিলেন মরহুম জনাব আবু আল মজিদ জিয়াউশ শামস, আমাদের প্রাক্তন এমএলএ। ওয়াসিম সাহেবের কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করা কালে তার হার্টফেল হওয়ার উপক্রম। অতঃপর আমরা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আমাদের সব সময়ই কোট-প্যান্ট-টাই পরিহিত থাকতে হতো। কোনো কারণে মুসলিম বলে টের পেলে অমুসলিম প্রধান এলাকায় গেলেই হয়তো পৈত্রিক প্রাণখানা সেখানেই রেখে আসতে হবে। ঘটনাক্রমে আমাকে কাগজ কিনতে কলেজ স্কোয়ারে যেতে হলো, কাগজ কিনলাম ও মূল্যও চুকিয়ে দিলাম। তবে রিকশাতে উঠতেই দোকানদার হেসে ফেললে। খুব সম্ভব বুঝতে পেরেছিলো আমি মুসলমান। চেহারায় মুসলমানি বা হিন্দুয়ানির কোনো ছাপ থাকে নাকি? মাঝে মাঝে আবার বিপদ দেখা দেয় অন্যদিকে। আমাদের মেমোরেন্ডাম ছ' কপি করে টাইপ করানো হচ্ছে বাউতলায়, এ সময় হঠাৎ প্রয়োজন পড়লো ফজলুর রহমান সাহেবের বাড়ি থেকে একটা প্রয়োজনীয় কাগজ আনতে হবে। আমাকেই যেতে হলো। তাঁর বাড়িতে যেয়ে দেখি তিনি বাড়িতে নেই। তাঁর বিবির সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। তাকেই-বা আমার কথা জানাই কি করে?

এ ত্রিশংকু অবস্থার মধ্যে তাঁর একটি ছেলে এসে দোভাষীর কাজ করে আমাকে উদ্ধার করলো। কাগজ নিয়ে চলে এলাম। স্মারকলিপিগুলো তৈরি হলো। নির্দিষ্ট তারিখে দাখিল করার জন্য প্রস্তুতও হলাম, তবে সমস্যা দেখা দিলো বাহন নিয়ে। কোলকাতায় তখন মুসলিমদের হাতে ট্যাক্সির সংখ্যা খুব কম। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে হলে অনেক সময় লাগে। অথচ দূরত্ব খুব কম নয়। বিলটমোর হোটেল থেকে যেতে হবে আলীপুরের বেলভেডিয়ারে। বিলটমোর হোটেলের মূল দরজার সামনে অহিদুর রেজাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটার পর আরও একটা ট্যাক্সি আসে নিয়ে যাবার জন্য। যদিও আমরা কোট-প্যান্ট পরিহিত হলেও মনের কোণে ভয় শ্রাবণ মেঘের আকারে দেখা দিলো। ওদিকে আবার বারোটার ভিতরেই সবগুলো স্মারকলিপি দাখিল করা চাই-ই চাই।

নিরুপায় হয়ে এক শিখ নরপুঙ্গবের গাড়িতেই উঠে বসলুম। পার্কস্ট্রিট থেকে এক দমে সে গাড়িকে নিয়ে তুললে চৌরঙ্গীতে। চৌরঙ্গীতে একেবারে সোজা দৌড়িয়ে ভবানীপুর অভিমুখে। তার হাবভাবে বোঝা গেল যেন কোথায়ও নিয়ে যেয়ে কৃপাণখানা সটান ঢুকিয়ে দেবে কলিজায়। ওর হাত চেপে ধরে অহিদুর রেজা বললে, 'বেলভেডিয়ার লেকে চলো - ভবানীপুর যানে কা তো কোই জরুরত নেহি হ্যায়।' নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অবশেষে বাধ্য হয়েই আমাদের নিয়ে গেলো বেলভেডিয়ারে। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে অগণিত গোরা সৈন্য। আগস্ট মাসের কোলকাতার রোদ সহ্য করতে না পেরে খালি গায়ে পায়চারি করছে। আসামের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রী রোহিনী কুমার চৌধুরীকে আটকে দিলো। তার অপরাধ আর কিছুই নয় - মাথার চুলগুলো উসকো খুসকো, দেখতে পাগলাটে মনে হয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নানা লোকের সাক্ষাই হাজির করে তবেই না তিনি রেহাই পান। ভয় ভয় করে দু'জনেই ওপর তলায় উঠে গেলাম।

বাউন্ডারি কমিশনের অপর সেক্রেটারি খান বাহাদুর জনাব মহবুব উদ্দিন উদভ্রান্তের মতোই পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখে তেড়ে এসে বললেন, আপনাদের কি সময় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই? অপরাধীর মতো তার হাতে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্মারকলিপিগুলো তুলে দিতেই চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন। এখন ফিরতে হবে। আবার সেই যান বাহনের সমস্যা। উভয়ে ঠিক করলুম বাকি বেলাটুকু চিড়িয়াখানা দেখে সাঁঝের আঁধারে এসপ্লেনেডে চলে যাবো। তখন হয়তো আমাদের এক কলেমার শরীফ ছ্যাকড়া গাড়িও পাওয়া যাবে।

চিড়িয়াখানার সঙ্গে আরও কতবার পরিচয় হয়েছে। তবু ইনিয়ে বিনিয়ে বার বার সব কিছু দেখে আবার আল্লাহর নাম নিয়েই দু'জনে রওয়ানা দিলুম। পথিমধ্যে গোয়ালা জাতীয় লোকদের দুশমনের মতো চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। তবে পরিধানে ইউরোপীয় পোশাক দেখেই হোক অথবা তাদের নিরীহ প্রবৃত্তির জন্যই হোক আক্রমণ করে নি। নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেলাম প্রথমে বিলটমোরে, তারপর পায়ে হেঁটে গেলাম রিপন স্ট্রীটে। খান বাহাদুর মাহমুদ সাহেবের বিবি আমার চাচাতো বোন। তিনি তখনও উদভ্রান্তের মতো পায়চারি করছিলেন আমাদের বিপদের আশঙ্কায়।

বাউন্ডারি কমিশনের জজ ছিলেন দু'জন হিন্দু ও দু'জন মুসলিম। হিন্দুদের দু'জন হচ্ছেন ডক্টর (স্যার) বিজন বিহারী মুখোপাধ্যায় ও জাস্টিস সি সি বিশ্বাস (চারুচন্দ্র বিশ্বাস)। মুসলিমদের একজন জাস্টিস মুহম্মদ আকরম ও অপরজন জাস্টিস ফজলুর রহমান। ওরা চারজনেই একাধারে জজ ও উকিলও বটে। হিন্দু জজেরা কংগ্রেসের ন্যায্য দাবি যেমন স্বীকার করেন তেমনি তার পক্ষে উকালতিও করেন। অপরদিকে জাস্টিস ফজলুর রহমান মুসলিম লীগের দাবির সমর্থন করেন। কংগ্রেসের পক্ষে আবার ঝানু এডভোকেটগণ উপস্থিত। তাদের মধ্যে রয়েছেন শ্রী সন্তোষকুমার বসু, শ্রী অতুল চন্দ্র গুপ্ত, শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি। মুসলিম লীগের পক্ষে সবেধন নীলমনি হামিদুল হক চৌধুরী। তার পশ্চাতে বসে আমি সিলেটের মানচিত্র নিয়ে সব উপকরণ সরবরাহ করাতে ছিলাম ব্যস্ত। সি সি বিশ্বাস হামিদুল হক সাহেবের বক্তব্যের প্রায়ই কদর্থ করেন। তিনি আবার হামিদুল হক চৌধুরীর 'ল' ক্লাসের শিক্ষক। ছাত্র গুরুর অত্যাচার বেমালুম হজম করে অবশেষে চটে গেলেন। উষ্মার সুরেই বলে ওঠেন - Your lordship, I like to be interpreted not interrupted.

জজ তাকে আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত্র হলেন। সেদিন হামিদুল হক চৌধুরীর বাক-চাতুর্য, বস্তুনিষ্ঠা ও বর্ণনার মাধুর্য কেবল আমার মতো আনাড়িকে নয়, ঝানু ব্যবহারজীবীদেরও স্তম্ভিত করেছিলো। কথায় বলে রামের জন্মের আগেই বাল্মিকী রামায়ণ লিখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনও বোধ হয় বাউন্ডারি কমিশনের রোয়েদাদ রেডক্লিফ কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্বেই তার মানসিক রায় দান করেছিলেন। এত লোকের এত কষ্ট ও পরিশ্রম সবই পণ্ড হয়ে গেলো। করিমগঞ্জ সদর থানার অর্ধাংশ সিলেট থেকে কেটে নিয়ে গিয়ে পার্বত্য ত্রিপুরার সঙ্গে আসামের যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ করে দেওয়া হলো। সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণভোটের আয়োজন করাকালে সিলেট জেলাকে অখণ্ড ও অবিভাজ্য ধরে নিয়ে গণভোটের ফল বের হওয়ার পর, সিলেট থেকে সাড়ে তিনকানা কেটে নেওয়ার যুক্তি আমি আজও খুঁজে পাইনে। তবে সব যুক্তির শিরোদেশে রয়েছে মানুষের মনের বাসনা। র‍্যাডক্লিফ চেয়েছিলেন ত্রিপুরা যাতে ভারত থেকে কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন না হয়।"[১৪৭]

তিন

"...What follows are the details of how this line came about and my own role in the process. While still in Delhi Jinnah asked me to take the initiative to prepare the case to be placed before the Boundary Commission as far as East Bengal was concerned. The Commission

১৪৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ/আত্মজীবনী। [উৎস প্রকাশন - আগস্ট, ২০০৭। পৃ. ১২৬-১৩২]

had four assessors to assist it - Justice Akram of Calcutta High Court and Justice S. Rahman of the Lahore High Court from the Muslim side, and Justice Bijan Mukherjee and Justice Charu Biswas from the Hindu side. Nobody was available to represent the Muslim case. I suggested to Jinnah to appoint a panel of lawyers. Jinnah could not give any advice but he recommended Advocate-General Wasim of Lucknow. Jinnah knew him and Wasim had occasion to work under him, Jinnah said that he was dependable and I could try him. In fact, Jinnah himself asked Wasim to contact me and then suggested that he should represent the Bengal Muslim case assisted by me. I selected two or three other Muslim lawyers for the purpose.

...There was considerable difficulty to be faced in collecting data and other materials. I planned to prepare a series of maps showing the Muslim majority areas in green and non-Muslim majority areas in red by district, subdivision and union boundaries. As for Assam, the only guide was the census record taken several years earlier. I located a Muslim officer in the Directorate of Bengal Land Records who could help us with whatever data was available in that office. But an insurmountable difficulty arose as the office was situated in a predominantly Hindu area in Kalighat opposite to the Alipore Central Jail. Due to prevailing communal violence, tension and riots, all the offices were closed and it was almost impossible to go there openly. However, one day very early in the morning I accompanied the officer to his office and succeeded in taking out sufficient documents to prepare our case.

Because I had taken on myself the responsibility of defending of Muslims in the riots and conducting the proceedings of the Boundary Commission, I did not receive any assistance from the Chief Minister of Bengal, Mr. Hussain Shaheed Suhrawardy. It was most unfortunate for the country that the group represented by Hussain Shaheed Suhrawardy was not on talking terms with me or my group, except in official meetings, though we belonged to the same side of the government. In my dealings during the period I tried to maintain close contact with them to share with them my responsibility in the matter of politics in Bengal. I gave my full and unqualified support to Hussain Shaheed Suhrawardy's Government all through this tumultuous period though our relationship was strained within the party. As a result, both during the riot enquiry and the defence of those concerned in the rioting and in the Boundary Commission, of both of which I was in charge, I was left entirely to my own resource without any assistance or help from the government party. Not for one single day did any member of the party of the Ministry belonging to Suhrawardy take any interest in the Boundary proceedings in Sylhet or Bengal which I undertook with the help of two or three junior officials except for once when Fazlur Rahman visited us.

Wasim came to Calcutta to hold meetings with us. He however showed signs of lack of confidence in his ability to present the case. A day after the opening of the case Wasim broke down and said, 'It is impossible for me to remember the geography, the names of the districts, rivers and so many things you want to raise. I cannot cope with it nor can I explain it to the Commission". Wasim pressed me to take up the duty. With Jinnah's approval, Wasim left after the first day of the hearing leaving me in charge. I presented the case for the Muslims of Bengal while Atul Gupta appeared for the Hindus.

I was successful in establishing that the border districts of Murshidabad, Rajshahi, Malda and Dinajpur having a majority of Muslims should be included in Pakistan district-wise as given in the National plan. That left Jalpaiguri and Darjeeling without any contiguity with West Bengal and I argued that as such these districts were to be included in Pakistan. Even the two Hindu members of the Commission found the argument irrefutable on the basis of the formula of the British Government.

As far as south Bengal was concerned, I argued that the district of 24 Parganas should be allotted to Pakistan. In Khulna where the Muslims formed 60 percent of the population except in the town of Khulna, the other factors (phrase of the declaration) primarily the river system dictated that by nature it was an integral part of East Bengal. I pressed that Calcutta had developed with the resources of both parts of Bengal and it was the only port to service both Bengals. I demanded that the river Hooghly should be the boundary between the two Bengals - the east bank going to Pakistan and the west bank to India. This was justified if all other factors taken into consideration. Alternatively Calcutta should become a free city servicing both India and Pakistan.

In the meantime Sylhet had decided by a plebiscite in favour of joining Pakistan. Dhubri subdivision in the district of Goalpara was contiguous to East Bengal and had an overwhelming Muslim population as also Hailakandi subdivision, a Muslim majority area contiguous to Sylhet. Inclusion of Hailakandi in Pakistan would leave no link between the native state of Hill Tripura with Indian Assam. Cachar district was similarly isolated from India being contiguous to Sylhet.

During the sitting of the Boundary Commission the Maharaja of Tripura came under strong pressure from Mountbatten to immediately make his dicision to opt for India. The Maharaja was hesitant and had delayed his decision though all other native states had declared their option. As I have said earlier, it is intervention of the King's representative in Delhi which eventually titled the Maharaja's decision in favour of India so that it could be used by the Radcliffe Commission as a fulcrum to establish an overland link of Tripura with India. The Radcliffe Commission accordingly severed a subdivision of Sylhet Karimganj where the Muslims outnumbered the Hindus in the ratio of 2:1 from East Bengal and Hailakandi subdivision with a big Muslim majority was also allotted to India.

This decision was contrary to the formula of the British Government and in total disregard of existing natural conditions and links. I had drawn maps of these areas particularly showing the rivers and their courses from the Himalayas through East Bengal to the Bay of Bengal. Except the Ganges and the Brahmaputra, almost all other rivers formed a physical and natural part of those districts within East Bengal.

I finally urged that the Commission should provide that all common rivers serving both India and East Pakistan (East Bengal) should remain available to both countries. But unfortunately Radcliffe did not touch the point.

He arbitrarily dismissed both the official terms of the British declaration and all logic of the situation. That there was a private link between him and Mountbatten could be inferred from the following incident. While discussing the case of Sylhet a dispute arose whether the formula of Muslim majority areas was limited to the district of Sylhet or whether any other contiguous area outside Sylhet but forming part of Assam as stated in the formula could be included in the Muslim areas of Bengal in case voters there wanted to be separated from Assam. According to my interpretation the Muslim majority areas of the district of Sylhet and Muslim majority areas contiguous to Sylhet should come to Bengal. The four Muslim and Hindu Judges stated that they would have to ask Sir Cyril for his views. The latter told them he himself could not clearly understand what was actually meant by the sentence relating 'to Sylhet and other territories of Assam' for the purpose of partition and he would have to ask Mountbatten. I immediately objected that the matter could not be referred to Mountbatten because this was a case of interpretation of the wordings in the reference itself and no other person could now add to it or subtract from it. Sir Cyril however insisted on consulting Mountbatten. I told Khwaja Nazimuddin and Suhrawardy

that one of them should go to New Delhi to inform Jinnah of what was going on and request him to speak to Mountbatten. We were clearly given the understanding that if Sylhet decided to join Pakistan the contiguous areas in Assam with a Muslim majority would be included in Pakistan as in the official declaration. This meant the whole of Sylhet as also parts of Goalpara and Cachar districts would go to Pakistan. Both Nazimuddin and Suhrawardy said that as I was fully conversant with the matter I should go myself to Jinnah. That I was deeply engaged in presenting the case did not convince them. Next morning I ew to Delhi and found myself travelling in the same plane with Sir Cyril. As I passed by his side, I saw him reading some typed papers which I could see related to the Punjab. He was going to take up the case of partition of the Punjab as he had possibly finished with the case of Bengal in one day. I saw a Viceregal limousine with a crown come on the tarmac to pick up Radcliffe.

In New Delhi I took a tonga and rushed to Jinnah's house on Aurangzeb Road. I had no previous appointment. After about five minutes Jinnah came down and I told him about the situation. I urged him to speak to Mountbatten and find out what assurances were given. Jinnah asked me to see Liaquat Ali, and himself got into the car to go to a reception given by the Muslim members of the Executive council in his honour. It was Saturday and I had no time to lose as on Monday I would address the members of the Boundary Commission. I, therefore, rushed as fast as the tonga could go to Liaquat Ali's house and found he had already left for the same reception.

I was very undecided what to do as it was the only evening available. I suddenly remembered that Jogen Mondal was a Minister from East Bengal. I phoned him from Liaquat Ali's house and luckily found him. He came and picked me up from Liaquat Ali's house and together we went to the reception where I expected to find Liaquat Ali. Mountbatten was also there. I explained the situation to Liaquat Ali and he said that he would speak to Mountbatten. I stayed the night in Delhi and next morning when I contacted Liaquat Ali he told me that he had talked to Mountbatten and the latter had said that on principle he could not and did not see or speak to Radcliffe after the latter had taken on the Boundary Commission job. This could not be true as Radcliffe was staying with Mountbatten and had clearly declared his intention to consult Mountbatten. I said this to Liaquat Ali.

Radcliffe and Mountbatten did see and consult each other as we could conclude after which Radcliffe informed the members of the Commission on Monday that only Sylhet was to be considered according to Mountbatten. This information was given in open court to the judges on the Commission. The natural conclusion is that Mountbatten had exerted himself to modify the spirit of the British Declaration on the basis of which the Muslim League had accepted the partition of the two Muslim majority regions, the centre piece in the Pakistan conception.

We had a very strong case for inclusion of all those districts that were Muslim majority areas in East Bengal. But curiously, in order to create a hinterland for protecting and safeguarding Calcutta, the Muslim majority parts of the district of 24 Parganas were given to West Bengal. The major part of the district of Nadia was also taken away from Pakistan though the whole district was a Muslim majority area. Then a part of Malda was taken away in order to provide a continuous passage through West Bengal to Darjeeling and Jalpaiguri which were non-Muslim majority areas but without any contiguity to Hindu areas. Therefore, in order to preserve contiguity, the Muslim majority areas of Malda, a subdivision of Dinajpur, the Muslim majority subdivision of 24 Parganas and a major part of Nadia district were given to West Bengal. Khulna was given to us and Murshidabad a Muslim majority district was taken away. But why were the other districts cut away? Radcliffe had no answer and gave none.

I strongly believe, as I told the Commission, that from a literal interpretation o Declaration, except for Burdwan Division all the rest of Bengal including th Nadia, two subdivisions of 24 Parganas and the whole of Murshidabad, Dinajpur, should have come to Pakistan. The whole of Sylhet district with the s of Dhubri and Hailakandi and the Tripura Hill State also should have come t This was the correct and plain meaning of the British Declaration. However th of the Declaration was subverted by Mountbatten and Radcliffe and the British G connived at the injustice. The details of the scheme were worked out by Moun close consultation with some senior British officials and his Secretary V.P. Me plan attached little importance to the survival of the new province of East Beng would lie separated from West Pakistan by 1200 miles of Indian territory.

We protested against the way the boundary was being defined. But nobody took Everyone was anxious to take office immediately. I remained occupied in Calcutta last day with the Commission when others rushed to Dacca to get into office."১৪৮

চার

"...নাজিমুদ্দীন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই ঘোষণা করলেন, ঢাকা রাজধানী হবে এবং তিনি দল ঢাকায় চলে গেলেন। একবার চিন্তাও করলেন না, পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা। এ আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র কলকাতা থেকে ভাগ করে আনব তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। যা আমাদের প্রাপ্য তাও পেলাম না। সরকারি কর্মচারীরা ঝগড়া গোলমাল করে কিছু কিছু মালপত্র সি ও ট্রেনে তুলতে পেরেছিলেন, তাই সম্বল হল। কলকাতা বসে যদি ভাগ বাটোয়ারা করা হত তা কোনো জিনিসের অভাব হত না। নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কো দাবি রইল না। এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কলকাতা নিয়ে কি করবেন? 'মি উইথ মাউন্টব্যাটেন' বইটা পড়লে সেটা দেখা যাবে। ইংরেজ তখনও ঠিক করে নাই কলকাতা পাকিস্তা আসবে, না হিন্দুস্তানে থাকবে। আর যদি কোনো উপায় না থাকে তবে একে 'ফ্রি শহর' করা যায় কি না কারণ, কলকাতার হিন্দু-মুসলমান লড়বার জন্য প্রস্তুত। যে কোন সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণ রূপ নিতে পারে। কলকাতা হিন্দুস্তানে পড়লেও শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দুরা কলকাতা পাবার জন্য আরও অনেক কিছু ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

এই বইতে আরও আছে, একজন ইংরেজ গভর্নর হয়ে ঢাকা আসতে রাজি হচ্ছিল না, কারণ ঢাকায় খুব গরম আবহাওয়া। তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোন কষ্ট হবে না। অর্থাৎ দার্জিলিংও আমরা পাব। তাও নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই ঘোষণায় শেষ হয়ে গেল। যখন গোলমালের কোনো সম্ভাবনা থাকল না, মাউন্টব্যাটেন সুযোগ পেয়ে যশোর জেলায় সংখ্যাগুরু মুসলমান অধ্যুষিত বনগাঁ জংশন অঞ্চল কেটে দিলেন। নদীয়ায় মুসলমান বেশি, তবু কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট জংশন ওদের দিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদে মুসলমান বেশি কিন্তু সমস্ত জেলাই দিয়ে দিলেন। মালদহ জেলায় মুসলমান ও হিন্দু সমান সমান তার আধা অংশ কেটে দিলেন, দিনাজপুরে মুসলমান বেশি, বালুরঘাট মহকুমা কেটে দিলেন যাতে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং হিন্দুস্তানে যায় এবং আসামের সাথে হিন্দুস্তানের সরাসরি যোগাযোগ হয়। উপরোক্ত জায়গাগুলি কিছুতেই পাকিস্তানে না এসে পারত না। এদিকে সিলেটে গণভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ করিমগঞ্জ মহকুমা ভারতবর্ষকে দিয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম, আসামের কাছাড় জেলা ও সিলেট জেলা পাকিস্তানের ভাগে না দিয়ে পারবে না।

১৪৮. - Hamidul Huq Chowdhury/Memoirs| [Associated Printers - 1989| p. 117-123]

আমার বেশি দুঃখ হয়েছিল করিমগঞ্জ নিয়ে। কারণ, করিমগঞ্জে আমি কাজ করেছিলাম গণভোটের সময়। নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল, সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। কেন্দ্রীয় লীগের কিছু কিছু লোক কলকাতা ভারতে চলে যাক এটা চেয়েছিল বলে আমার মনে হয়। অথবা পূর্বেই গোপনে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নেতা হলে তাদের অসুবিধা হত। তাই তারা শিখণ্ডী খাড়া করে কাজ হাসিল করতে চাইল। কলকাতা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের রাজধানী কলকাতায় করতে বাধ্য হত, কারণ পূর্ব বাংলার লোকেরা দাবি করত পাকিস্তানের জনসংখ্যায়ও তারা বেশি আর শহর হিসাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ইংরেজের শাসনের প্রথমদিকে কলকাতা একবার সারা ভারতবর্ষের রাজধানীও ছিল।"১৪৯

পাঁচ

"...মুরারীচাঁদ কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন কোন মতে ১৯৩৯ সালে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে নয় বরং বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চিত সংকটকাল বিবেচনা করে এবং যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডামাডোলে কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অচল হয়ে যায়। প্রায় ১০ বছর পরে ১৯৪৮ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানে পরবর্তী ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ ছাত্র সংসদের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানাবিধ জাতীয় আন্দোলনে তাদের সম্পৃক্তি সাধিত হয়। এই সময়ে ছাত্ররা সিলেটে তাদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে আমার আব্বা ছিলেন তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সেই কারণে এই সময় থেকেই ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হতে থাকে। আবদুল সাহেব সম্বন্ধে আমার প্রাথমিক স্মৃতি হলো যে, তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত ও বাকপটু নেতা গোছের ছাত্র ছিলেন।

পরবর্তীতে ভারত বিভাগকালে তার দৃঢ়তা ও সাহসের খবর ছিল বহুল প্রচারিত। তিনি তখন ছিলেন সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমায় পুলিশের বড়কর্তা (মহকুমা পুলিশ অফিসার)। ১৪ আগস্টে পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্র ভারতে জন্ম নেয়। সেইদিন বৃটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের স্থলে পাকিস্তানি পতাকা সর্বত্র উত্তোলন করা হয়। করিমগঞ্জ শহরেও তেমনটি করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে ১৮ আগস্টে র‍্যাডক্লিফ সীমানা নির্ধারণ কমিশন করিমগঞ্জকে ভারতের অংশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। তখন করিমগঞ্জে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জনাব আবদুল হক এই হুকুমটি মানলেন না। তিনি পাকিস্তানি পতাকা নামাতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। বয়োকনিষ্ঠদের কাছে এই কাহিনি হক সাহেবকে একজন বীর নায়কে পরিণত করে।"১৫০

১৪৯. - শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী। [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ৭৮-৭৯]
১৫০. - আবুল মাল আবদুল মুহিত/স্মৃতির মণিকোঠায়। [সময় প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। পৃ. ৮২-৮৩]

সপ্তম পর্ব

আজাদ ভারত-আজাদ পাকিস্তান

এক

"... আজাদীর অরুণচ্ছটায় উজ্জ্বল আজ ভারতবর্ষ। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানিমা তাহার অবলুপ্ত, স্বাধীনতার নবালোকে তাহার আকাশ-বাতাস প্রদীপ্ত। পলাশীর প্রান্তর সীমানায় গঙ্গায় একদা ডুবিয়া গিয়াছিল যে রবি, বাংলার কবির বাণীকে সার্থক করিয়া তাহাই আবার শত শত সাধকের বুকের খুনে রাঙা হইয়া জাগিয়া উঠিল। সেই রবির আলোয় ভাসিয়া উঠিল ভারতের দশ কোটি মুসলমানের স্বপ্নসাধের দেশ পাকিস্তান; অবশিষ্ট ভারতও ভারত রাষ্ট্র নামে স্বাধীন রূপ পরিগ্রহ করিল।

ইতিহাসের কোনো কালেই এই ভারতবর্ষ এক শাসনাধীনে সংহত হইতে পারে নাই। কখনও ব্যক্তিবিশেষের রাজতন্ত্রে ইহার কতক অংশ সংবদ্ধ হইয়াছে; কখনও পাঠান, মোগল, রাজপুত, মারহাট্টা বা শিখ ইহাকে শাসনাধীনে বাঁধিতে চাহিয়াছে কিন্তু কখনও সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। তারপর বিদেশি শাসনের লৌহনিগড় যেদিন আমাদিগকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিল সেদিন বাহিরের দিকে এক কৃত্রিম ঐক্য দেখা দিল সত্য; কিন্তু অন্তরের সুতীব্র বিচ্ছেদ রহিয়াই গেল। যেদিন আবার বিদেশি শাসন কালের নিয়মে শিথিল হইবে সেদিন আবার কোনো জাতির রাষ্ট্রীয় ভাবধারা অন্যদিগকে আচ্ছন্ন করিতে চাহিবে এই সম্ভাবনা থাকিয়াই গেলো। ফলে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর এবং ধনেমানে সমৃদ্ধ, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের আন্দোলন জাগিল, তখন স্যার ছৈয়দ আহমদ মুসলমানের নিজস্ব বিকাশপথ ও অধিকারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজনের উপলব্ধিতে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে পরাধীন ভারতবাসীর আত্মধিকার লাভের চেষ্টা আগাইয়া চলিয়াছে। বিদেশি শাসকের রাজদণ্ডও দেশবাসীর উপর নির্মম হইয়া আসিয়া পড়িল। জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডে দেশময় ক্ষোভের আগুন জ্বলিল; ভারতের হিন্দু-মুসলমান একযোগে গান্ধীজী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িল। কিন্তু স্বসম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভাব ও কর্ম্মধারা মুসলমানের জীবন আচ্ছন্ন করিতে চাহিতেছে ইহাও প্রকাশ পাইতে দেরী হইল না। মওলানা মোহাম্মদ আলী ইহাও বুঝিতে পারিলেন এবং পরস্পরের একটা সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া সামঞ্জস্যের কোনো উপায় ছিল না। মুসলমানের জীবন ও তমদ্দুনের স্বাতন্ত্র্যকে আল্লামা ইকবাল বাণীরূপ দিলেন। তারপর শুরু হইল মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম, জাগিয়া উঠিল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার গগনস্পর্শী নেতৃত্ব। আজ হইতে সাত বৎসর আগে মুসলমানের রাষ্ট্রীয় দাবী পাকিস্তান বাস্তবে রূপলাভ করিল। ইতিমধ্যে বিদেশি শাসন হইতে সকল শ্রেণীর দেশবাসীর সম্পতি প্রত্যাহত হইয়াছে; ভারতবাসীর আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগণিত লোক জান কবুল করিয়াছে। কিন্তু অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মোহে তখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানের জাতীয় দাবীকে মানিয়া লইতে পারিল না। ফলে স্বাধীনতা সুদূরপরাহত রহিল, দেশের চারিদিক অর্ন্তদ্বন্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

তারপর কীরূপে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত যুক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ঘটনার অনিবার্য গতি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের দাবী অনস্বীকার্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সকলেরই জানা আছে। সে আধুনিক ইতিহাস বিশেষ পর্যালোচনার প্রয়োজন নাই। শুধু মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাহারই ফলে প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই উপমহাদেশে সাত কোটি অধিবাসীর এই আজাদী অর্জন করিয়াছে আজ আমাদের তাহাদিগকেও স্মরণ করিতে হইবে। আজিকার কামিয়াবির আনন্দাশ্রুর সাথে তাহাদের স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে বেদনা মিশিয়া রহিয়াছে। আজিকার আনন্দ উল্লাসের কলরোল নহে; ধীর সংযত অনুধ্যানে এই আনন্দের উপলব্ধি। প্রগাঢ় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে হানাহানি, নরহত্যা, সম্পত্তিনাশ ও আনুষঙ্গিক বর্বরতায় গত এক বৎসর যাবৎ দেশের অধিবাসীদের জীবন মথিত হইতেছে এই আজাদীর ক্ষণও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। আজিকার দিনেও যদি কাহারও জীবন দেশবাসীর হাতে বিপন্ন হয় তবে সে ঘটনার মর্মান্তিকতার পরিমাপ কে করিবে? আজাদ পাকিস্তান ও আজাদ ভারতের সামনে আজ রাষ্ট্র গঠনের বিপুল কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি অধিবাসী যাহাতে খাইয়া পরিয়া মানুষের মতো বাঁচিতে পারে এবং নিজের জীবন অবাধভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হয় তাহারই ব্যবস্থা আজ স্বাধীন রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। যে অন্তহীন অভাব ও দুর্দশায় অধিকাংশ জনসাধারণকে এখনও কাল কাটাইতে হয় শীঘ্র তাহার প্রতিকার করিতে না পারিলে বিদেশি সম্রাজ্যবাদের অবসানে কোনো ফয়দা বুঝিতে পারা যাইবে না, জাতীয় রাষ্ট্র তাহার অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না। দুনিয়ার দরবারে আজাদ পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে; এবং প্রতিবেশিসুলভ সহযোগ ও মৈত্রী তাহাদের পারস্পরিক শক্তির ভিত্তি রচনা করিবে।

আজিকার দিন প্রতিদিনকার দিন নহে, আজিকার প্রভাত প্রতিদিনকার প্রভাত নহে। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার দীর্ঘ রজনী আজ পোহাইল; উষার আলোকে আজ শুনি আজাদীর পদধ্বনি। সাময়িক আত্মবিস্মৃতি ও এক শ্রেণীর দেশবাসীর বেঈমানীতে মুসলমান যে রাষ্ট্রীয় অধিকার হারাইয়াছিল আজ সে তাহা ফিরাইয়া পাইল। সে বাদশাহী ফিরাইয়া পায় নাই। তাহাতে দুঃখ নাই। নিজের বাসভূমিতে সে স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সকলের সমানাধিকারে রাষ্ট্রীয় জীবন নূতন করিয়া গড়িবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে ভোরের বিহগকাকলীতে আজ যেন শুনি এক বাণী : আজাদী আসিয়াছে। ভোরের বাতাসে আজ পাই নবজীবনের স্পর্শ; আজাদী আসিয়াছে। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে ভোরের আজান; তাহাতেও সেই এক রব আজাদী আসিয়াছে। ভরা হৃদয়ে জানাই খোশ আমদেদ এই আজাদীকে। পূর্ব পাকিস্তানের পথে প্রান্তরে আজাদীর পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। বিনয় নম্র চিত্তে আমরা মুক্তির এই পরম মুহূর্তটিতে গ্রহণ করিতেছি। আজাদ পাকিস্তান ও আজাদ ভারতের প্রতি অধিবাসীকে আমরা মনেপ্রাণে মোবারকবাদ জানাইতেছি।" - দৈনিক আজাদ

দুই

"... স্বাধীন ভারত ১৪ই আগস্টের নিস্তব্ধ মধ্যরাত্র, বিপুল মহাদেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের শুভলগ্ন সমাগতপ্রায়। একদিকে বৃটেনের রাজপ্রতিনিধি দুই শতাব্দীব্যাপী সম্রাজ্যের প্রত্যার্পণপত্র হাতে লইয়া দণ্ডায়মান, অপরদিকে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত। মধ্যরাত গত হইবামাত্র দেশশাসনের দায়িত্ব জাতীয় প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পিত হইবে। আকাশের অতন্দ্র চন্দ্র-তারকা সে দৃশ্য অবলোকন করিবার জন্য নির্নিমেষ নেত্রে নিম্নে চাহিয়া আছে। দণ্ডে দণ্ডে পতাকা আপনাকে আবৃত করিবার জন্য আগ্রহব্যাকুল, প্রতি দুর্গ চূড়ায় তোপ গর্জনোন্মুখ। মধ্যরাত্র অতিবাহিত হইবামাত্র বৃটেনের রাজপ্রতিনিধি শাসনশক্তির প্রত্যার্পণপত্র জাতীয় প্রতিনিধির করে অর্পণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা নৈশ আকাশে আন্দোলিত হইল, দুর্গশীর্ষে তোপ গভীর গর্জনে সে বার্তা ঘোষণা করিল দিকে দিকে, কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল স্বাধীনতার বীজমন্ত্র - বন্দে মাতরম, নব ভারতের নবীন মন্ত্র — জয় হিন্দ। কোটী কম্বু ও কোটী কণ্ঠের উদাত্ত নিঃস্বনে দীর্ঘ পরাধীনতার দুঃখরাত্রি সহসা চকিত হইয়া উঠিল,

দূর হইতে সুদূরে সে পলায়ন করিল জাতীয় পতাকার পবন-আকুল আন্দোলনের আঘাতে সহসা অর্গলমুক্ত হইল উদয়-তোরণের রুদ্ধদ্বার, ভারতের স্বাধীনতাসূর্য কনক-কিরণ সমারোহে সমুদিত হইল প্রাচীদিগন্ত সীমায়; শিহরিত বন-মর্মরে, পাখীর কাকলী গানে ও নদীর কলহাস্যে জাগিয়া উঠিল জাতির জীবনস্রোত। এ প্রভাত পুণ্য হোক, এ জাগরণ ধন্য হোক।

বৈদেশিক শাসনপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য জাতি একদা মরণপণ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল; পূরণের জন্য সে সাধনা করিয়াছে, সংগ্রাম করিয়াছে, তাই সার্থকতা আজ তাহার করতলগত। যে এই ব্রতের বেদীমূলে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, যাঁহাদের ত্যাগ ও আত্মদান জাতীয় সাধনাকে স সার্থক করিয়াছে, নব জাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্তে জাতি আজ তাহাদিগকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি আমরা জানি, জাতির চরম লক্ষ্য আজও অনুপলব্ধ, বিভক্ত দেশ ও জাতির মর্মবেদনা - তাহাও অন্তর দিয়া অনুভব করি; কিন্তু সে বেদনা বক্ষে বহিয়াও শাসনের পাষাণ চাপ বুক হইতে স্খলিত হ ফলে যে মুক্তি ও স্বস্তি জাতি আজ অনুভব করিতেছে — তাহাই তাহার পক্ষে একান্ত বাস্তব উপ আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যথা আছে, বঞ্চনা আছে; তথাপি বলিতে হইবে, জীবন প্রভাতের এই অ অনুষ্ঠান অম্লান হোক, অতাপবিদ্ধ হোক। ব্যক্তির মত জাতির জীবনেও এমন এক দিন আসে যখন আ বাতাসে মধুক্ষরে, বিশ্বভুবন মধুময় বলিয়া মনে হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ সেই শু সমাগত; এদিনটি গত হইলে দৈনন্দিন কার্যক্রমের চক্র-নেমীর নিয়মিত ঘর্ঘর শব্দ আবার বাজিয়া উঠি কিন্তু আজিকার এই আনন্দ অনুষ্ঠানের অম্লান অঙ্গনে তাহার কঠোর ও কর্কশ ধ্বনির প্রবেশাধিকার না

স্বাধীন ভারতের নব জাগরণ একান্তভাবে ভারতীয় ব্যাপারই নয়, বিশ্বের দরবারেও তাহার একটি বিশি স্থান আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণক্লান্ত পৃথিবী অঙ্গের শোণিত প্রলেপ শুষ্ক হইতে না হইতে তৃতী বিশ্বসংগ্রামের অভিমুখে অনিবার্য বেগে অগ্রসর। জার্মানী পরাজিত, জাপান পর্যুদস্ত, কিন্তু নাৎসীবাদ আজও মরে নাই; তাহার ধ্বংসধুলি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পরাজিত ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ অক্ষম ও অরক্ষিত রাষ্ট্রের বুকে জ্বলন্ত আক্রোশে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আর বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে সেই বীভৎস তাণ্ডব। পরাধীন ভারত এতদিন তাহার নৈতিক সত্তা প্রয়োগ করিয়াছে এই জঘন্য বর্বরতার বিরুদ্ধে, স্বাধীন ভারত তাহার সামগ্রিক শক্তি লইয়া যখন দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাহার হস্তক্ষেপ অবহেলাভরে উপেক্ষা করা তেমন সহজসাধ্য হইবে না। আন্তর্জাতিক শক্তির মানদণ্ডের সমতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব ভারতবর্ষের। পররাষ্ট্রলোভী কোন দেশ যখনই আন্তর্জাতিক শক্তির মানদণ্ডের মানদণ্ড বিচলিত করিবে, তাহার সমতা সংস্থাপন করিবে স্বাধীন শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্ট্র। স্বাধীন ভারতের সমুদ্ভব তাই জাতির সম্পদ, আন্তর্জাতিকতার সহায়। নবীন ভারতের জাগরণকে তাই যুগপ্রভাতের অরুণ আলোকে অভিনন্দিত করিতেছি।" - আনন্দবাজার পত্রিকা

তিন

"… স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট - আজ স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘ বৎসরের গোলামির জিঞ্জীর আজ খসিয়া পড়িল। ভারত উপ-মহাদেশের চল্লিশ কোটি মানবসন্তান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর লৌহ নিগড় ছিঁড়িয়া আজাদ হইল।

বহু ত্যাগ ও সাধনায় লব্ধ এই স্বাধীন পাকিস্তান আর স্বাধীন ভারত। বহুপ্রতীক্ষিত আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসের সুপ্রভাত। কত না দেশভক্ত বুকের রক্ত ঢালিয়া আগমনী গাহিয়াছেন আজিকার এই সুপ্রভাতের। ফাঁসির মঞ্চে দাড়াইয়া এই দিনেরই জয়গান গাহিয়াছেন কত না দেশপ্রেমিক। হাতে-পায়ে-বুকে-পিঠে শিকলে আবদ্ধ লৌহ-কারার অন্ধকারে কত বিনিদ্র রজনী জাগিয়াছেন কত না বীর সন্তান-আজিকার এই সুপ্রভাতেরই আপেক্ষায়। পলাশী হইতে স্বাধীন পাকিস্তান আর স্বাধীন ভারত দুইশত বৎসরের পথ।

কণ্টকাকীর্ণ আর ভয়াবহ এই পথ। মোড়ে মোড়ে বাধা ও বিপত্তি, বাঁকে বাঁকে ঝড় ও ঝঞ্ঝার এই পথ দুরতিক্রম্য, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সকল ঝঞ্ঝা পায়ে দলিয়া আজ ১৫ই আগষ্টের সুপ্রভাতে পাকিস্তানবাসী আর ভারতবাসী পৌছিল তাহাদের মঞ্জিলে বিজয় নিশান হাতে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের সকল বাশিন্দা আজ তাহাদের ঘরে ঘরে উড়াইয়া দিবে হাতের ঐ বিজয় নিশান - পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা: হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, তফসিলী, শিখ, খৃষ্টান আজাদ পাকিস্তানের সকল বাশিন্দা আজ প্রভাতে আজাদীর জয়গান গাহিবে, মহোৎসবে মাতিবে, স্বাধীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া উহার মান-ইজ্জত ও গৌরব রক্ষা করার জন্য যে কোন ত্যাগ বরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে স্বাধীন ভারতের সকল বাসিন্দা গাহিবে স্বাধীনতার জয়গান, ঘরে ঘরে উড়াইয়া দিবে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা আর কৃচ্ছসাধনায় লব্ধ আজাদীর আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জাতীয় পতাকার প্রতি নিবেদন করিয়া উহার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে শপথ গ্রহণ করিবে।

আজ শুভপ্রভাত হইতে আজাদ পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারতের সকল বাশিন্দা চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যাইবে অতীত দিনের কলহ-দ্বন্দ্বের কথা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সকল তিক্তস্মৃতি। আজ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অতীত পরিচয় তিরোহিত হইবে। পাকিস্তানবাসী ও ভারতবাসীরূপে পাকিস্তান ও ভারতের বাশিন্দারা নবজন্ম লাভ করবে। নিজ নিজ পরিচয়ের এই আকাঙ্খিত গৌরবকে সমগ্র জগতের সম্মুখে উচু করিয়া তুলিয়া ধরার জন্য উভয় রাষ্ট্রেরই বাসিন্দাদিগকে নিজেদের রাষ্ট্রের পতাকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে।

পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের সঙ্গে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর প্রশ্ন, হিন্দু ও মুসলমান সমস্যার জটিলতা টানিয়া আনিয়া ইহার আনন্দোৎসবকে ব্যাহত করিতে কোন দেশপ্রেমিকই পারেন না লীগ ও কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে এই স্মরণীয় দিনটি পালন করার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সকল বাশিন্দা তাহাতে যোগদান করিয়া এই বহু আকাঙ্খিত দিনটিকে যোগ্য মর্যাদার সহিত সমাদর করিবেন।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ও হাওড়ার সংখ্যালঘুদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। বিগত কয়েকদিন দুর্বৃত্তরা কলিকাতা ও হাওড়া হইতে সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করিতে অকথ্য জুলুম-সিতম চালাইয়াছে। মরণোৎসবের মাঝে দাড়াইয়া স্বাধীনতা দিবস উৎসবে যোগদান করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই কলিকাতা লীগের ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য মুসলমানদিগকে শোক দিবস পালনের নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে দুর্বৃত্তদের অনাচার অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে এবং গান্ধীজী স্বয়ং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে নিদারুণ পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল, তার এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ এহিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার মুসলমানদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, শোক-দিবস সম্পর্কে কলিকাতা লীগের গৃহীত প্রস্তাব তাহারা বাতিল করিয়া দিলেন। সুতরাং কলিকাতা ও হাওড়ার মুসলমানগণ আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসে তাহাদের হিন্দু ভাইগণের সহিত আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

সব্বশেষে আল্লার দরগাহে এই মোনাজাত করি - পাকিস্তানের ও ভারতের আজিকার স্বাধীনতা দিবসের এই উৎসব পাকিস্তানবাসী ও ভারতবাসীর মনে সেই প্রেরণা সৃষ্টি করুন - যে প্রেরণার আনন্দ-প্রবাহে মনের সকল ক্লেদ, বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও ক্ষুদ্রতা পুড়িয়া ভষ্মীভূত হয়। পাকিস্তানবাসী ও ভারতবাসীকে আজিকার এই সুন্দর ও শুভ প্রভাতে আল্লাহ সেই দৃষ্টি দান করুন যে দৃষ্টিবলে এই সত্য-উপলব্ধি মনে জাগে যে, রাষ্ট্রের উন্নতিতেই দেশের জনগণের উন্নতি, আর রাষ্ট্রের মঙ্গলেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সকলের মঙ্গল।"[১৫১] - ইত্তেহাদ

---

১৫১. তথ্যসূত্র : সংবাদপত্রে উপমহাদেশের স্বাধীনতা/আতোয়ার রহমান। [বাংলা একাডেমি - জুন, ২০০১। পৃ. ৩৩৫-৩৪০]

অষ্টম পর্ব

কায়দে আজম, দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান

এক

'...আজ এতকাল পরে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল কি সত্য ছিল এ নিয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে আলোচ চলে, ইতিহাস লেখক তার দোষ-গুণ, লাভ ক্ষতি বিশ্লেষণ করতে পারেন। রাজনীতিকরা আ হিতৈষীরা ক্ষোভ-আফসোস কিংবা যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা প্রয়োগে সাফল্য সুখ ও গৌরব গর্ব করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তীকালে মানুষ পূর্ববর্তীকালের মানুষের অবস্থা ও অবস্থান কা ব্যবধানের দরুণ কখনো ঠিক মতো পরিমাপ বা অনুভব বা যাচাই করতে অসমর্থ, সেহেতু এ সব ও সিদ্ধান্তের সর্বসম্মত মূল্যায়ন যথার্থ প্রয়োজন নিরূপন সম্ভব হয় না। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রয়ে চেতনার সঙ্গে সব সময়েই অনুভূতির একটা আবেগ জড়িত থাকেই, সে আবেগই মূলত উদ্যম ও উ রূপ অভিব্যক্তি পায়। তাই বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় আবেগ-প্ররোচিত ক্রুদ্ধ উত্তেজনার আক তীব্রতা চালিত হয়ে বাপ-ভাইকে হত্যা করে বসে এবং নিমেষেই ক্রোধমুক্ত হয়ে ভয়ে অনুশোচনায় হয়ে যায়। ব্যক্তিমানুষেরও প্রায় সব সিদ্ধান্ত লঘু-গুরু আবেগ জড়িত কিংবা প্রসূত।

ব্রিটিশ বাঙলাদেশে মুসলিমরা অধিজন হয়েও নিঃস্ব অনক্ষরদুষ্ট বলে বিত্তে বিদ্যায় উন্নত হিন্দুদের পেত। আর অর্থ-সম্পদ ও চাকরী ক্ষেত্রে ওদের আধিপত্যে ঈর্ষা ও প্রতযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজি বলে ওদের প্রতি ছিল বিদ্বিষ্ট ও বিক্ষুব্ধ। উত্তর ভারতে প্রায় বাঙলাদেশের হিন্দুর মতোই অর্থসম্পদ বিদ্যার অধিকারী ছিল নিতান্ত উণজন মুসলিমরাই, ব্রিটিশ ভারত ছাড়লে তাদের এ সম্পদ-সুখের ও প্রভাব প্রতাপের দিন অবসিত হবে আশঙ্কায় তারা খুঁজছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়। তাদের নেতৃত্বে এবং বাঙালীর সমর্থনে মুসলিম লীগ ১৯৩০ উত্তরকালে প্রবল হয় এবং পরিণামে ভারতীয় মুসলিমদের ভাগ্যবিধাতা হল।

...নররক্তরঞ্জিত পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র হল। পাকিস্তানে গোড়া থেকেই কতগুলো সমস্যা দেখা দিল। সিন্ধি-বালুচি-পশতু-সারাওকী-মুলতানী কোন ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা হবার মতো উন্নত ছিল না। বলতে গেলে লেখ্য গদ্য ভাষা হিসেবে তখন ওগুলো শৈশব অতিক্রম করেনি, ফলে উত্তরপ্রদেশের নেতা ও চাকুরে পরিচালিত পাকিস্তানে ইসলামী শাস্ত্র-তমুদ্দুন-তাহজিবগর্ভ ফারসী হরফে লেখ্য উর্দুই হল সর্বজন সমর্থিত, গ্রাহ্য ও বাঞ্ছিত ভাষা। পাকিস্তানের উন্নতমানের এবং অধিজনের ভাষা হিসেবে বাঙলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি ভিত্তিক পাকিস্তানে কেউ ভাবতে চায়নি।

কাজেই উর্দুর দাবি ছিল তর্কাতীত। তবু আঞ্চলিক স্বার্থসচেতন জনহিতৈষী কোন কোন বাঙালীর মনে বাঙলার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্থান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল কোলকাতায় ও ঢাকায়– এরা কবি ফররুখ আহমদ, আবদুল হক, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কাশেম প্রমুখ। আবদুল হকই কেবল বাঙলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন তার প্রবন্ধে। এতে প্রবল যুক্তি ছিল 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হলে ইংরেজির স্থান নেবে।

উর্দু-ইংরেজি জানা-না-জানা নিয়ে যেমন চাকরীর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়, তেমনি উর্দুর বেলায়ও করা হবে, ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাকরীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।' ফররুখ আহমদ ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার কল্পেই পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেছিলেন।

...এ সূত্রে দুটো বিষয় ভাববার রয়েছে। ভুললে চলবে না আমরা ইসলামী আদর্শে মুসলিমের স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, আহার, রুচি, সংস্কৃতি এবং সে কারণে অবাধে আত্মবিকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতা পাবার জন্যেই পৃথক বাসভূমি চেয়েছিলাম। আমাদের ধারণায় আরবী-ফারসী কেবল মুসলমানদের ভাষা, যদিও ওই দুটো ভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে অমুসলিম সমাজে। আরব মুসলিমরা শাস্ত্র অনুশাসনবশে গল্প-নাটক-উপন্যাস-কবিতার চর্চা করেনি ইদানিং পূর্ব তেরোশ বছর ধরে। সে অর্থে আরবী ভাষার সৃষ্টিমূলক [যাতে ভাষার উৎকর্ষ ঘটে] কিছুই করেনি মুসলিমরা। আর ফারসী ভাষায়ও পনেরো শতকের পরে বিশেষ কোন বিকাশ-বিস্তার ঘটেনি।

উর্দুর ভিত্তি ভারতীয় আর্যভাষা তথা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় কথ্য হিন্দুস্তানী, কেবল ফারসী শব্দবহুল ও ফারসী হরফে লিখিত। অবশ্য আরবী-ফারসীকে এবং মদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার হওয়ায় উর্দুকেও ইসলামী শাস্ত্র-তমদ্দুন-তাহজিবের বাহন রূপে জানত ও মানত। মুসলিমদের এ আবেগের সুযোগ নিয়েই বিহার-উত্তর প্রদেশ-পাঞ্জাবের নেতা চাকুরেরা উর্দুকে বিনা আলোচনায় পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা করার একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর উনিশ শতক থেকেই বাঙালীর সব প্রধান নেতাই ছিলেন উর্দুভাষী, তাদের স্বাভাবিক মমত্বই ছিল উর্দুর প্রতি। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীও ইসলাম আর পাকিস্তান প্রীতিবশে এবং হিন্দুবিদ্বেষজাত অবচেতন প্রেরণায় ছিল উর্দুর পক্ষে।

দ্বিতীয় আর একটি অদৃশ্য কিন্তু গভীরতর কারণ এই, বাঙালী শিক্ষিতরা ছিল সাধারণভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ভুঁইফোঁড় এবং স্বশ্রেণী উদ্ভূত প্রধান নেতাজনা। উচ্চবংশ ফজলুল হকও ছিলেন বিবাহসূত্রে ঘরে উর্দুভাষী এবং তা ছাড়া এ সঙ্কট সময়ে তিনি ছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্বচ্যুত নিঃসঙ্গ। পাকিস্তানের যারা শাসক ছিলেন তারা ছিলেন উচ্চবিত্তের, বিদ্যান ও সামন্ত শ্রেণীর মানুষ। তাদের মোকাবেলায় আমাদের বাঙলাভাষী নেতারা এক রকমের হীনমন্যতায় ভুগতেন আর অনুগতের মতো ওদের প্রস্তাবে ও ব্যবস্থায় সায় দিতেন। স্মরণীয় যে প্রথম Constituent Assembly-তে বাঙালীর সংখ্যাধিক্য ছিল [৪৪ জন]। তবু রাজধানী হল করাচীতে, মন্ত্রীসভায় রইল ওদেরই প্রাধান্য, শাসক-প্রশাসক আর বড় চাকুরেও ছিল ওরাই, সেনাবাহিনীর সবাইও ছিল ওই এলাকার। এসব অসমতার জন্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বগর্বী এবং পাকিস্তান অর্জনে সুখী ও আনন্দাপ্লুত হিন্দুবিদ্বেষী বাঙালীর মনে কোন ক্ষোভ জাগেনি, বরং ঈমান, জাতিসত্তা, তমদ্দুন ও তাহজিব দৃঢ় ও বিশুদ্ধ করার জন্যে যা কিছু বাঙালীর, যা কিছু হিন্দুর সঙ্গে অভিন্ন, তা-ই পরিহার পরিবর্তন পরিমার্জন করতে চেয়েছে।

...কোলকাতার ও ঢাকার ভাষার পার্থক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের হয়ে তমুদ্দুনিক তরক্কীর ও স্বাতন্ত্র্যের জন্যে জাতির ও রাষ্ট্রের স্বার্থে কথায়, কাজে ও আচরণে লড়েছেন পূর্বেকার পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির ফজলুর রহমান, মিজানুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মুজিবুর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহিম খান প্রমুখ। এরা ছাড়াও ১৯৪৭ সনে ঢাকায় গঠিত তমদ্দুন মজলিশ বিশেষ উল্লেখ্য। এক হিসেবে ১৯৪৭-৬০ সনের মধ্যেকার এদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের জন্যে এদের মোটেই দায়ী করা চলে না বরং ভাবে ও চিন্তায়, কথায় ও কাজে অঙ্গীকার অনুগ আদর্শানুসারী হিসেবে এদের বিবেচনা করতে হয়। কেননা, বিদ্যায়, বিত্তে ও সংখ্যায় অধিজন ও প্রাগসর প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর শাসন-শোষণ-বঞ্চনা ভয়েই ওরা পৃথক ধর্মমত, জীবনাচার, জীবনদর্শনের ও সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে স্থান-কাল-জাত-বর্ণ-ভাষা নিরপেক্ষ কেবল বৈশ্বিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে জীবনাচার রচনার স্বপ্ন নিয়েই পাকিস্তান বানিয়েছেন। কাজেই বিধর্মী-বিজাতি বিদ্বেষেই এ রাষ্ট্রের জন্ম।

...কথায় বলে 'দারিদ্র্যদোষ সর্বগুণ নাশক'। আগেই বলেছি ১৯৬৫ সন থেকেই বা
স্বঘোষিত কিংবা সরকার নিযুক্ত নেতা ছিলেন উর্দুভাষীরা। আমাদের বিশশতকের রাজ
[ইস্পাহানী-সিদ্দিকী-সোহরাওয়ার্দী-নাজিমুদ্দীনরা] ছিলেন উর্দুভাষী রইস ব্যক্তিরা। পা
হয়ে দেশজ মুসলিম প্রতিনিধিরা ছিলেন নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের উকিল কিংব
লোক। তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে প্রজন্মক্রমে বিদ্যাবিত্তের ও সামন্তদাপটে
নওয়াবজাদা-খানজাদা-পীরজাদা এবং উকিল-ব্যারিস্টার ও আই.সি.এস প্রভৃতি অফিসা

স্বাভাবিকভাবেই বাঙালীরা হীনমন্যতা বশে কখনো সাহসে-সংকল্পে ও যুক্তিতর্কে-দাবি
পারেননি। তাই তাদের চাওয়া-পাওয়া ত্রুটি ও ঘাটতি ছিলই। স্মরণীয়, প্রায় বছরই উন্নয়
ঢাকা থেকে ফেরৎ যেত। অথচ সব কমিটিতে-কমিশনে-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংস্থায়
ক্যাবিনেটে বাঙালী কোথাও কম ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীও কখনো কখনো বা
মননশক্তির দৈন্যজাত স্বধর্মীর জাতীয়তায় আত্যন্তিক আসক্তি, হীনমন্যতাজাত ব্যক্তিত্ব

তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, ভারতবর্ষে গান্ধীর প্রভাব ও কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর প্রমাণ হল ১৯৩৪ সালের দু'টি ঘটনা– প্রথমটি হল কংগ্রেস নেতা মাধব শ্রীহরি আনে ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে কংগ্রেসের ভেতর থেকেই উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ করে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে'র নাম পাল্টিয়ে হিন্দু জাতীয়তার ভিত্তিতে 'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয়টি হল পুনে শহরে গান্ধীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ। এটা ছিল উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা গান্ধীকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা।

যে জিন্নাহ বলেছিলেন–'আমি প্রথমে ভারতীয়, পরে মুছলমান, তিনি কংগ্রেসের ভেতরকার উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে, গান্ধীর মৃত্যুর পর স্বাধীন ভারতে তাবৎ মুছলমানদের বাস করতে হবে হিন্দুদের দয়ার ওপর। জিন্নাহর এই চিন্তা জোরদার হয় আরও অনেক কারণে, যেমন

১. ১৯৩৩ সালে হিন্দুমহাসভার আজমির অধিবেশনের সভাপতি ভাই পরমানন্দ তার ভাষণে বলেন– 'হিন্দুস্তান (ভারত) হল শুধুমাত্র হিন্দুর; আর মুছলমান, খৃস্টান ও অন্যান্য যারা হিন্দুস্তানে বসবাস করে তারা হল বহিরাগত (অতিথি)। হিন্দুস্তানে বসবাস করতে হলে তাদেরকে অনুগত হিসেবেই থাকতে হবে।' (The Jana Sangh : A Biography of an Indian Party গ্রন্থে Graig Baxar কর্তৃক উদ্ধৃত)
২. ১৯৩৮ সালে হিন্দুমহাসভার নাগপুর অধিবেশনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বলেন– 'ভারতবর্ষ হচ্ছে [redacted]

একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত
বিভ্রান্তিকর তত্ত্বও তারা প্রচার করেন। এটি তারা করেন সম্ভবতঃ একারনে যে, দ্বিজা
মূল্যায়নের প্রয়াস পান শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে, বৃটিশ ভারতের একটি নিপীড়িত বৃহ
স্বার্থসংরক্ষণের দৃষ্টিকোণে নয়।

বৃটিশ ভারতে মুছলমানরা যে আলাদা আবাসভূমির দাবী উত্থাপন করেছিল বা স্বতন্ত্র আ
উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই দাবীর বহিরাবরণ ধর্মীয় হলেও তার অন্তর্নিহিত কা
সামাজিক। শুধুমাত্র ইছলাম রক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যুক্তি সে তো ধর্মান্ধ মো
'প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা' যখন 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'কে অন্তত জিন্নাহর মতো করেও না বুঝে ধর্মা
মতো করে বুঝেন, তখন তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক ঘ

ভারতীয় বর্ণহিন্দু সামন্ত-বুর্জোয়াদের একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শোষণের জগদ্দল থে
নিজেদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্বার্থেই মুছলমানরা আলাদা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেমে
বাধ্য হয়েছিল। বৃটিশ ভারতে মুছলমানরা ছিল এমন এক বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়, যারা হিন্দু সামন্ত-বুর্জো
দীর্ঘ দুশো বছর শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে অতি নির্মমভাবে। একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বসবা
বিশাল সম্প্রদায় যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী আরেকটি সম্প্রদায়ের 'দানব'দের দ্বারা শো
ও নির্যাতিত হয়ে কীভাবে সমূহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল সে ইতিহাস নিশ্চয়ই কারো অজানা

উপমহাদেশের সমাজবিকাশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বাস্তব যে সত্যটি বেরিয়ে আসে সে
শুধু ধর্ম রক্ষা নয়, বরং নিজেদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার সমস্যাই ছি
মুছলমান সম্প্রদায়ের মূল সমস্যা। ভারতীয় মুছলমানদের এই মৌলিক সমস্যাকে 'চিরায়ত
একপেশে ছকে ফেলে কথিত 'প্রগতিবাদীরা' প্রগতির মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার ভয়ে এর ওপর
একটি 'সাম্প্রদায়িকতার' প্রলেপ লাগানোর কসরত করেন। তারা ভুলে যান যে, ভারতে বৃটি
কায়েম হবার পর ইংরেজ বেনিয়ারা তাদের কুখ্যাত 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসির মাধ্যমে পরিক
ভূ-ভারতের জনগোষ্ঠীকে ধর্মের খোলসে বিভক্ত করলেও তার মূল ভিত্তি ছিল অর্থনীতি ও সংস্কৃ
এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়ে উপমহাদেশের দুই বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-রাজনৈতি
মাঝে একশ্রেণীর 'প্রগতিবাদীরা' কারণে-অকারণে খালি সাম্প্রদায়িকতার 'ভূত' দেখেন এবং জ
সেই 'ভূতের' পাঁচ পা দেখান।

আমাদের জানা আছে, 'সাম্প্রদায়িকতার ভূতের' পাঁচ পা দেখিয়ে উপমহাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল
তাদের রাজনৈতিক ও শ্রেণীস্বার্থ হাসিলে অভাবনীয় দক্ষতা দেখিয়ে এসেছে বৃটিশ আমল থেকে
প্রগতিশীল দাবীদাররা সেই একই কাজ করেন কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তা আমাদের বোধগম্য

বৃটিশ-ভারতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের নিগ্রহে 'হতাশাগ্রস্ত হয়ে একদিকে মুছলমানরা যেমন ভা
বাঙলার মাটিতে বসে মক্কা-মদিনার স্বপ্ন দেখেছেন, তেমনি তথাকথিত (প্রগতিবাদীরা) দ্বিজাতি ত
নিছক 'সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক' আখ্যায়িত করে এবং তার পুরো দায়িত্ব মুছলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে
বিশ্লষণে উত্তরভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্ত বুর্জোয়াদের অখন্ড ভারত'- এর তত্ত্বকেই সুপ্রতি
করার প্রয়াস পান।

আমরা সবাই (প্রগতিশীল বন্ধুরাও) ঐতিহাসিক 'লাহোর রিজলিউশনের' জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করি
'লাহোর রিজলিউশনের' তাৎপর্য না বুঝেই। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাবে' ভারতের উত্তর-পশ্চিম
পূর্বাঞ্চলের মুছলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনু
পূর্ববাঙলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা '৪০-এর 'লাহোর প্রস্তাবের' কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছি
এ ইতিহাসকে মেনে নেবার পরও কি আমাদের প্রগতিশীল বন্ধুদেরকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে
যে দ্বিজাতি তত্ত্বর ভিত্তিতে '৪০-এর ঐতিহাসিক লাহোর রিজলিউশনের ধারাবাহিকতায় '৪৭-এ যে স্বত
পূর্ববাঙলার উন্মেষ ঘটেছিল, একাত্তরের 'বাংলাদেশ' হচ্ছে সেই 'দ্বিজাতি তত্ত্বর'-ই ধারাবাহিক ফসল?

সাতচল্লিশে 'যুক্তবাঙলার প্রবক্তরা যে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের চপেটাঘাতে ধরাশায়ী হয়ে শেষপর্যন্ত বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটিও কি দ্বিজাতি তত্ত্বেরই ফসল ছিল না? তা যদি না হতো, তাহলে তো একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তে 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার শ্লোগানই হওয়া উচিত ছিল পূর্ববাঙলার জনগনের মুক্তির মূলমন্ত্র। একাত্তরকে কেউ যদি আজ বলেন সাতচল্লিশের 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' তাহলে তাদের মতানুসারে বাংলাদেশের জনগণের চূড়ান্ত মুক্তির পথ অখণ্ড 'হিন্দু-ভারত' ছাড়া আর কী।

প্রসঙ্গক্রমে খানিকটা 'জ্ঞানদানের ধৃষ্টতা দেখানোর মতো হলেও, আমাদের দেশের 'অসাম্প্রদায়িক' বন্ধুদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। সেটি হচ্ছে '৪০-এর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাঙলা এবং তার ধারাবাহিকতার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে কথিত 'শ্বাশত বাঙলার' কিন্তু কোনোই মিল নেই। আমরা পূর্ববাঙলার মাটিতে দাঁড়িয়ে যে 'আবহমান বাঙলার' গান করি, সেই বাঙলায় আমাদের গৌরব যে শুধুমাত্র 'ম্লেচ্ছ-যবন-চাষা-ভূষা'র ধিকৃত গৌরব, এ সত্যের উপলব্ধি আমাদের বহু আগেই হয়েছে।'[৫৩]

তিন

'...মনিবের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখে যেমন করে গোলামের মনে অপরের মনিব হবার সাধ হয়, তেমনি ভারতীয় অনেক নেতার মনেই একটা সাম্রাজ্যবাদী খেয়াল জাগে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে রক্তহীন ভারতবাসীর মনে একটা সাধারণ ইংরাজ-বিদ্বেষ জেগেছে। বিলাতী বয়কটের দেশপ্রেমিক কর্মপন্থার সুযোগ নিয়ে দেশী কলওয়ালারা যেমন দ্বিগুণ লাভে কাপড় বেচে থাকে, তেমনি এই ইংরাজ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে এ দেশী সাম্রাজ্যবাদীরা একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিল।

অপরের কথা বলবো না; ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতীক কংগ্রেসের কথাই বলছি। কংগ্রেস আজ ভারতের চল্লিশ কোটি লোককে একজাতি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র ইংরেজ-বিদ্বেষই যদি 'জাতি'ত্বের মাপকাঠি হয় তবে গোটা ভারতবাসী নিশ্চয় একজাতি। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রবল বাসনায় 'জাতিত্বের খুঁটিনাটির দিকে ভারতবাসী এতকাল মন ফেরাতে পারেনি। তবু ১৯২৫ সালে মরহুম ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে সমস্ত কংগ্রেসী মুসলমান অবশিষ্ট-ক্ষমতাসহ প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন। মিঃজিন্নার চৌদ্দ দফার কথা তুললাম না। খোদ কংগ্রেসী মুসলমানদের দাবীর কথাই বললাম। এ দাবীর প্রতিও কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা কান দেননি। ১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্ট ভারতের জন্য এককেন্দ্রিক গবর্ণমেন্টের সুপারিশ করেন। আলী ভাই-এর মত কংগ্রেস নেতারাও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেস স্বমতে অটল থাকেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়েছে। অথচ কংগ্রেস উহা ধ্বংস করার সংকল্প করেন। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তানের' দাবী করেন। জবাবে এলাহাবাদে কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারতের' অবিভাজ্যতার কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বর্ণ-হিন্দু রাষ্ট্র নেতারা মনে মনে 'অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনাটা নীরবতার ছাই-এ চেপে রাখছিলেন। মুসলমান নেতাদের 'পাকিস্তানের' তুফানে সে চাপার ছাই উড়ে গিয়েছে। তারা আজ খোলাখুলিভাবেই বলছেন 'অখণ্ড ভারত' তাদের ধর্মের অঙ্গ।

বস্তুত: এই 'অখন্ড ভারত' ব্যাপারটা কী? প্যান-আমেরিকা, গ্রেট-ব্রিটেনিকা, গ্রেটার জার্মানীর কথা আপনারা ইতিহাসে পড়েছেন। 'অখন্ড ভারত'ও তাই। আজ যারা 'অখন্ড ভারত' বলছেন কাল 'বৃহত্তর ভারত' বলবার জন্য তারা তৈরী হয়েই আছেন। পূর্বে বার্মা, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, পশ্চিমে বেলুচিস্তান,

---

৫৩. রইসউদ্দিন আরিফ (সাবেক সম্পাদক, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি) / অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ : বাঙালী ও বাংলাদেশ [পাঠক সমাবেশ– ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। পৃ. ৭৩-৭৬]

আফগানিস্তান ও ইরান: উত্তরে নেপাল, ভূটান ও তিব্বত এবং দক্ষিণে সিংহল, আন্দামান ও নিকোবরকে 'বৃহত্তর ভারতের' 'প্রাকৃতিক অঙ্গ' বলতে এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। যারা এই 'প্রাকৃতিক' স্বাভাবিকতার প্রতিবাদ করে ঐসব দেশের স্বাধীনতা দাবী করবে, এদের মতে তারা হবে 'অবিভাজ্য মহাভারতের' 'মহান ভারতীয় জাতীয়তার' মহাশত্রু। 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহ-উন্নতির' কারবারে যোগ দেয়নি বলে চীন জাপানের হাতে যেরুপ মার খাচ্ছে, 'গ্রেটার রাইখের' 'প্রাকৃতিক' বন্দোবস্তের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর হাতে যেমন ঘুষি খাচ্ছে, 'বৃহত্তর ভারতের' বিরুদ্ধতা যারা করবে তাদেরও তেমনি মার-ঘুষি খাবার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

এইখানেই পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে বহু বামপন্থী সাম্যবাদী ছিলেন ও আছেন। তারা কেউ অখণ্ড ভারতের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাননি বা পারেননি। একমাত্র পাকিস্তানই সে সাম্রাজ্যবাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে।

এ-কাজটা বামপন্থীদের বাঞ্ছিত বা বাঞ্ছনীয় ধরনে হয়েছে, এ-কথা আমি বলতে পারছি না। শুধু তাই নয়। বিপ্লবী কারণে ও বামপন্থী উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দাবী উঠেছে, তাও বলতে পারছি না। কিন্তু তাতেই 'পাকিস্তানের' পরিবেশ ও সম্ভাব্য পরিণাম নষ্ট হয়ে যায়নি। সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি নিয়ে ইংরাজ-জার্মানীতে লড়াই বেধেছে। কিন্তু আততায়ী ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ধনিক-গণতান্ত্রিক ইংরাজকে অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়েই বামপন্থীর ভূমিকা করতে হচ্ছে। বর্তমান যুদ্ধের কারন ও ইংরাজের মনোভাব দিয়ে যেমন আমরা বর্তমান যুদ্ধকে বিচার করতে পারিনা, তেমনি 'অখন্ড ভারত' ও 'পাকিস্তানের' সংগ্রামকে আমরা আজিকার লীগ-নেতৃত্বের মতলব দিয়ে বিচার করতে পারি না।

আমরা জানি, ইউরোপ মহাদেশ থেকে ইংরাজের মুরুব্বিয়ানা ষোল আনা দূর করতে জার্মানী যদি না চাইত, যদি ইংলন্ড-জার্মানীতে শক্তি-বাঁটোয়ারার একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হতে পারত, তবে ইংরাজ হঠাৎ অতটা গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মুরুব্বি হয়ে উঠতো না। তেমনি আমরা এটাও জানি, লীগ-নেতাদের সঙ্গে শক্তি-বাঁটোয়ারায় কংগ্রেস যদি রাজী হতেন তবে লীগ নেতৃত্ব ভারতের উৎপীড়িত জনগণের স্বার্থ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য হঠাৎ এমন হাহাকার করে উঠতেন না। কিন্তু জনগণের সৌভাগ্যবশত: এবং ঐতিহাসিক কারনে যেমন ইংরাজ-জার্মানীতে আপোষ হয়নি, তেমনি ঐতিহাসিক কারণেই কংগ্রেসও লীগের সাথে রাষ্ট্র-ক্ষমতা বাঁটোয়ারা করতে রাজী হয়নি।

ইংরাজ-জার্মানীর মত দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঠোকরে যেমন করে বর্তমান বিপ্লবী যুদ্ধ বেঁধেছে, তেমনি কংগ্রেস-লীগ দুইটি ভদ্রলোক-প্রতিষ্ঠানের ঠোকরে 'অখন্ড ভারত' ও সাম্যবাদী ভারতের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। দূর্বল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছার লড়াই করতে হচ্ছে, বঞ্চিত লীগ নেতৃত্বকেও হয়তো তেমনি নিতান্ত অনিচ্ছায় ভারতের জনগণের পক্ষে লড়াই করতে হচ্ছে। দূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদী চেম্বারলেন যেমন করে আপোষের দ্বারা যুদ্ধ রুখতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় ভদ্রলোকদের দূরদর্শী প্রতিনিধি রাজা-গোপালও তেমনি আপোষের দ্বারা 'পাকিস্তান' রুখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে উভয়ের চেষ্টা বিফল হয়েছে। যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই বেধে গিয়েছে।

যুদ্ধ রুখবার উপায় নেই। বিশ্ব-বিপ্লবের আর গতিরোধ করা সম্ভব নয়। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর অভিপ্সিত মতে এ যুদ্ধের উপসংহার আর হচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদ চুরমার হয়ে গিয়েছে। ঠিক তেমনি ভারতীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে লড়াই বেধে' চুরমার হয়ে গিয়েছে। লীগ নেতারা ইচ্ছা করলেও এখন আর নিজেদের ইচ্ছামত ভারতকে জোড়াতালি দিতে পারবেন না। যে কারণে এবং যেরূপে তারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন সে কারণে এবং সেরূপে আর 'পাকিস্তান' আসছে না। 'হিন্দুস্তান' ও 'পাকিস্তান'রূপে ভারতবর্ষ আর দুইটা 'জাতীয়' দেশে বিভক্ত হচ্ছে না। এ-সংগ্রামের পরিণামে ভারতবর্ষ আত্মণিয়ন্ত্রের পূর্ণ অধিকার-ভোগী স্বাধীন সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে পরিণত হতে বাধ্য। এটাই পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা। আরেকটা কথা বললেই আমার বক্তব্য শেষ হবে। 'পাকিস্তান' কথাটাই অনেককে বিচলিত করেছে। বিপ্লবী ভাইদের কাছে আমার আরজ, শুধু নাম দেখে ভয় পাবেন না।

'কম্যুনিজম' অর্থাৎ সম্প্রদায়বাদ হল বড় ভাল জিনিস; আর 'কম্যুনালিজম' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদ হয়ে গেল, যাচ্ছে-তাই। আবার দেখুন, 'কম্যুনালিজম' যদি বা খারাপ হল, কিন্তু 'ন্যাশনালিজম' থেকে গেল অতি উচ্চাঙ্গের জিনিস। 'ব্যাকরণ' ও 'অভিধান' এ 'আর্থিক' বিপ্লব ঘটাতে পারলেন না।

তবে বিপ্লবীরা 'পাকিস্তানের' আভিধানিক অর্থ নিয়ে মাথা খারাপ করবেন কেন? তারা পাকিস্তানের বিচার করবেন আসন্ন ও পরিকল্পিত ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের হস্তুড়ী হিসেবে। এই হিসেবে পাকিস্তান শুধু ভারতীয় দশ কোটি মুসলমানের 'সাম্প্রদায়িক' দাবী নয়– এটা গোটা ধর্মিক, কৃষ্টিক ও ভৌগলিক মাইনরিটি সমবায়ের ত্রিশ কোটি ভারতীয়দের 'জাতীয়' দাবী।

'পাকিস্তান' ভারতের এই সব মুক জনসাধারণের প্রাণে আত্মবিকাশের আশা জাগিয়েছে; যুগ-যুগান্তের অবহেলা-উপেক্ষায় মুমূর্ষ যত ভারতীয় মানব-গোষ্ঠীর মনে আত্মবিকাশের উন্মেষ করেছে; দলিত ও উৎপীড়িত অগণিত আদম-সন্তানের বুকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহস দিয়েছে; শতাব্দীর নিষ্পেষণে অবরুদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠ যত জাতির মুখে আজাদীর ভাষা ফুটিয়েছে। বিপ্লবীর বিচারে এটাই 'পাকিস্তান'। 'পাকিস্তান' শুধু একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব নয়– এটা একটা ভাব-বিপ্লবও বটে।

এ বিপ্লবের পরিণাম সুন্দর হতেই হবে। হিন্দু কায়েমী স্বার্থের বড় তরফ ও মুসলিম মুর্দাবাদ ছোট তরফের ভিতরকার এই সংঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার এই 'অখণ্ড ভারত'কে খণ্ড খণ্ড হতেই হবে। তার ফলে কী হবে? বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর যেমন করে সাম্যবাদী নয়া দুনিয়ার প্রাসাদ গড়ে উঠবে, তেমনি ভারতীয় 'অখণ্ড' কায়েমী স্বার্থের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠবে আমাদের চির স্বপ্নের, চির সাধের, চির সাধনার নয়া ভারতের বিচিত্র গুল-বাগিচা। আর সে গুল-বাগিচা মুখরিত হয়ে উঠবে রঙ-বেরঙের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাহিত্যের ফুলে ও ফলে।'[১৫৪]

—আবুল মনসুর আহমদ (পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সভায় পঠিত– ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ইং)

চার

'.. The emergence of Pakistan in 1947 as the homeland of the Indian Muslims is very often attributed by superficial observers merely to the sustained and determined political agitation of the community under the leadership of the Muslim League during the second quarter of the twentieth century. Some have looked no further than the Lahore Resolution of the All India Muslim League in 1940, others to the foundation of the Muslim League in 1906. But all these have judging the ocean 'by measuring the surface wavelets of a choppy sea'. A more serious attempt is now being made, notably in the universities of Pakistan, to look beneath the surface of Muslim separatist movements of the twentieth century and it is steadily being realised that the Muslim consciousness of being a separate and backward community emerged as early as the beginning of the ninetieth century. The history of the Indian Muslims of the first half of the ninetieth century is the history of a community, aware of its former political greatness and of its gradual decay, fighting desperately an unequal battle against the very unfavorable circumstances brought about by a changed political situation in the country.'[১৫৫]

পাঁচ

'...পাকিস্তানিরা দ্বিজাতিতত্ত্বে ঠকে গেল। পাঞ্জাবের অর্ধেক, কাশ্মীর, জুনাগড়, লাক্ষাদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, কোচবিহার হারাল। যা পেল তাতে তারা চিরকালই ছিল একক নির্বিঘ্নে অধিজন।

---

১৫৪. পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য/সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম। [বাংলা একাডেমী– মার্চ, ১৯৬৮। পৃ. ৭৫-৭৯]

১৫৫. Azizur Rahman Malllick/British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856) · [Bangla Academy– 1977] p. viii]

জিন্নাহ যে ভারত বিভাগ চাননি, তার প্রমাণ তিনটে : ১। তিনি প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা চাননি– ক্রিপস প্রস্তাব অনুসারে। ২। তিনি Federal Grouping গ্রহণ করেছিলেন। ৩। যুক্তবাঙলা ও যুক্তপাঞ্জাব গঠনে তার আপত্তি ছিল না এবং পাকিস্তানে গভর্ণর হিসেবে প্রথম বক্তৃতায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষ-নাগরিকতায় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

মুসলিম লীগের অযৌক্তিক জেদে বিরক্ত রাজাগোপাল আচারিয়া, অবুঝ ও দুর্বল নগণ্য সংখ্যার কম্যুনিস্ট দল আর ৫৭ বছর বয়সের জওহরলালের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অসংহত আগ্রহই ব্রিটিশ-ভারত বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ। এর সঙ্গে জনগণের যোগ ছিল না। ১৯৯৩ সনে এমন রাজনীতিক চাল প্রতিরুদ্ধ ও ব্যর্থ হত। যদিও এ যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতে মানুষ স্বসত্তার মূল্য, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন বলেই গৌত্রিক, আঞ্চলিক, ধার্মিক, বণিক, ভাষিক, শাস্ত্রিক গোষ্ঠীর স্বাধীনতার দাবিদার। এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়ে সম ও সহস্বার্থে সমকক্ষতার ভিত্তিতে মন্ডলী (Federation) গড়ার পক্ষপাতি, তাই এ মূহূর্তে দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র বিচ্ছিন্নতার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে। এর সঙ্গে ১৯৪৭ সনের বিচ্ছিন্নতা মেলানো যাবে না, এখন যা গণদাবি, তখন তা ছিল শিক্ষিত স্বল্পজনের রাজনৈতিক দলের দাবি– তথা গণ নয়, সর্দারের দাবি ও সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। তাই ১৯৪৭ সনে গাঁয়ে-গঞ্জে দাঙ্গা বাঁধেনি, ভিটে কেড়ে উদ্বাস্তু করেনি, সবাই ভিটে ছেড়ে পালিয়েছে।

ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসামে গিয়ে এরা ওদের পাতের ভাতে ভাগ বসিয়েছে, ভিটের জমির ভাগ নিয়েছে, ব্যবসায়ে-চাকরিতে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। ফলে গোটা উপমহাদেশে দাঙ্গার আকারে, আর্থিক সামাজিক দুর্দশা-দুর্গতির আকারে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সবার জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। এমনি ঘটনা ঘটেছে গোটা উপমহাদেশে, যার জের এখনো শেষ হয়নি। পাকিস্তানে বিহারীর আধিক্যে সিন্ধে বিবাদবিরোধ-দাঙ্গা চলছে, পাঞ্জাবে-কাশ্মীরে, পূর্বে সাতবোন নামের অহমী, নাগা, মিজো প্রভৃতির স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, দার্জিলিঙে নেপালীরা স্বাধিকারপ্রমত্ত, বিজেপি ভারতে বাঙালি মুসলিম বিতাড়ণে উদ্যোগী। নতুন ঘর তৈরির জন্যে যখন পুরোনো ঘর ভাঙা হয়, তখনো দৃশ্যত বিপর্যয় দেখা দেয়, কিন্তু মনে আনন্দস্বপ্ন থাকে বলে সেদিন হয় উৎসবের দিন, কিন্তু ঝড়ে কুড়ে ঘর যেদিন আকস্মিকভাবে ভাঙে সেদিন কান্নার, বিপর্যয়ের, বেদনার ও দুর্ভাগ্যের দিন। ভারতবিভাগ মানুষের জীবনে তাই লঘুগুরু ভাবে বিপর্যয় এনে দিয়েছে।"[১৫৬] (১৮/০৬/১৯৯৩)

ছয়

'...১৯৪৭ সালে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমির পাকিস্তান চেয়েছিলো। এই ঘোষণাকে আবেগশীল পর্যবেক্ষকগণ উক্ত সম্প্রদায়ের উনিশ শতকের দ্বিতীয় চতুর্থাংশের মুসলিম লীগের ছায়াতলে স্থিরীকৃত ও সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব থেকেও দূরে যেতে রাজী নন। অন্যান্যরা মনে করেছেন, ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাই বুঝি এর মূল কারণ। কিন্তু এ সমস্ত মন্তব্য হচ্ছে সমুদ্রের উপরিভাগের বুদবুদ দ্বারা গভীর সমুদ্রের পরিমাপ করা। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আরো বিচিত্র ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেও তারা এর কারণ নির্ণয় করতে চান। কিন্তু এ কথা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলমানদের আলাদা হয়ে যাওয়ার চেতনা এবং নিজেদের অধ:পতন সম্পর্কে সচেতনতা উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই শুরু হয়েছিলো। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস হচ্ছে তাদের পূর্ব রাজনৈতিক মর্যাদা ও মহত্ত্ববোধের নৈরাশ্যজনক ইতিহাস এবং তাদের ক্রমশ: অধঃপতনে যাওয়ার ইতিহাস। এটা হচ্ছে, দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে তাদের একটি অসমান শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা।"[১৫৭]

---

[১৫৬]. আহমদ শরীফ/আহমদ শরীফের ডায়েরি : ভাব-বুদ্বুদ। |জাগৃতি প্রকাশনী– ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ২৬-২৭|

[১৫৭]. ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক/ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬)। |বাংলা একাডেমী– জুলাই, ১৯৮২। পৃ. পাঁচ|

সাত

'...পাকিস্তানের পক্ষেও বলিবার কথা আছে। সেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে ভারত ও বাংলাদেশের কোনও কোনও নেতার অবাস্তব অপব্যাখ্যা। পাঠকদের স্মরণ আছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর-পরই ভারত ও বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর এক মহলে ও সংবাদ-পত্রে উচ্চধ্বনি উঠিয়াছিল, 'ধর্ম-ভিত্তিক ভারত-বাঁটোয়ারা বাতিল হইয়া গিয়াছে'। 'পাকিস্তান-দাবি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে'। আমরা কেউ কেউ 'ইত্তেফাকে' প্রবন্ধ লিখিয়া এবং পুস্তক প্রকাশ করিয়া হুশিয়ার করিয়া দিয়াছিলাম। এমন কথার রাজনৈতিক আত্মঘাতী তাৎপর্য, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে সন্দেহ-অবিশ্বাস সৃষ্টির ও উপমহাদেশের সার্বিক স্থায়ী শান্তি স্থাপনে নিজের আশংকা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। আমাদের এই হুশিয়ারিকে কেউ কেউ প্রগতিবিরোধী আখ্যা দিয়াছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আমরা যারা 'লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক ভারত-বাঁটোয়ারার বাস্তব রুপায়ণ বলিয়াছিলাম কেউ কেউ তাদেরও তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ঐ সব রাজনৈতিক নাবালকদের কথায় বিচলিত হই নাই।

আমি প্রথম বিচলিত হই ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের আওয়ামী নেতৃত্বের একাংশের বাস্তবতা-বোধের অভাব দেখিয়া। শিমলা চুক্তির পরে বাস্তববাদী রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অসম একটা ঐতিহাসিক দলিল অনুমোদন করিতে গিয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি নিতান্ত অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিকভাবে অনুমোদন প্রস্তাবে বলিলেন, '১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বাঁটোয়ারাই অবৈধ হইয়াছিল'। আর এদিকে বাংলাদেশ সরকার রাস্তা-ঘাট, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইত্যাদি হইতে ঐ বাঁটোয়ারার জন্য দায়ী জিন্না সাহেবের নাম মুছিয়া ফেলিলেন। এমনকি 'জিন্নাটুপির' বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অভিযান চলিল। প্রমাণিত হইল, বাংলাদেশ সরকার ভারত বাঁটোয়ারার বিরোধী। সেই জন্যই জিন্নার নাম ও স্মৃতি তারা বাংলাদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চান। '৪৭ সালের বাঁটোয়ারা বাতিল হইলে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক কি হইবে, অখণ্ড, মানে 'পুনর্যুক্ত', ভারতের রাষ্ট্রীয় রুপইবা কি হইবে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কি দাঁড়াইবে ইত্যাদি মীমাংসিত প্রশ্নের পুনরুক্তির মত সুদূরপ্রসারী প্রশ্নের কথা বাদ দিয়াও শুধু পাকিস্তান সরকারের কথাটাই ধরা যাক। পাকিস্তানীদের মনে এইসব উক্তি ও কাজের কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তারই বিচার আজ করা যাক।

বাংলাদেশ-ভারত হইতে যেখানে সমস্বরে ধ্বনি উঠিয়াছে : 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানেই '৪৭ সালের ভারত-বাঁটোয়ারা বাতিল, 'পাকিস্তান দাবি ভ্রান্ত' সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া মানেই পাকিস্তানের অবলুপ্তি মানিয়া লওয়া। পাকিস্তান সরকার সেটা মানিয়া লইতে পারেন, কোনও জ্ঞানী লোক তা– ভাবিতে পারেন? কথাটা শুধু ভুল নয়, শিমলা চুক্তির ভাষা ও ভাবেরও বিরোধী। অতএব, বাংলাদেশ ও ভারতে দাঁড়াইয়া যারা হুংকার দিয়াছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানেই ভারত-বাঁটোয়ারার অবসান, তারা বাংলাদেশকে স্বীকার না করিবার জন্যই পাকিস্তানকে উস্কানি দিয়াছিলেন, এমন মনে করা কি অসংগত হইবে?

এর ফলে যা হইবার তাই হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার তাদের সুর বদলাইয়াছেন। বাংলাদেশে 'মুসলিম বাংলা' স্লোগানে উৎসাহ দিয়াছেন। যে আসগর খাঁ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ভুট্টো সরকারের তীব্র নিন্দা করিতেছিলেন, তিনিও এখন স্বীকৃতির বিরোধী হইয়াছেন। যে দওলাতানা স্বীকৃতির দাবী করিতেছিলেন, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ তাকে সভাপতিত্ব হইতে বরতরফ করিয়াছেন। স্বীকৃতির বিলম্বে আমরাও যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথা বলিয়াছি। পাকিস্তান স্বীকৃতিতে যত বেশী টালবাহানা করিতেছে, আমরা 'যুদ্ধাপরাধী বিচারে' তত জোর দিতেছি। পাকিস্তানও 'বাঙালী বিচারে' তত পাল্টা হুমকি দিতেছে। 'বিচার' ও 'পাল্টা ব্ল্যাকমেইলেরও' উদ্ভব হইয়াছে এই ভাবেই।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে আমাদের পক্ষের এমন কোনও ঘোষণা ছিল না। আত্মসমর্পণের দলিলেও বিচারের কোনও শর্ত নাই। বরঞ্চ জেনারেল সাম মানিক শাহ পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণের যে আহবান করিয়াছেন তাতে জেনেভা কনভেনশনের সকল সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিল।

তবু এটা আইনের কথা। আইনের কথার চেয়ে স্থায়ী শান্তির প্রশ্নটাই আমাদের বড় কথা। স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদের অতীত 'ফরগিভ' ও 'ফরগেট' করিতে হইবে। তার উপর আছে আমাদের পাঁচ লাখ আটক বাংগালী উদ্ধারের কথা। এদের বিচারের হুমকিকে ব্ল্যাকমেইল ধরিয়া নিলেও সেটা মানিতেই হইবে। তাতে আমাদের প্রেস্টিজ বা ন্যায়নীতির অমর্যাদা হইবে না। বিমান হাইজ্যাকাররা রোজ এমন ব্ল্যাকমেইল করিয়া কত দন্ডিত কয়েদী উদ্ধার করিতেছে। সে সব ব্ল্যাকমেইল মানিয়া লওয়ায় কোনও সরকারের অমর্যাদা হইতেছে, কেউ মনে করেন না। আটক বাংগালী ত পাঁচ লাখ। আমাদের জনপ্রিয় নেতা ও রাষ্ট্রপতি বংগবন্ধু মুক্তি না দিয়া প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যদি তার প্রাণ লইয়া আমাদের ব্ল্যাকমেইল করিতেন তবে আমরা ৯৫ ত দূরের কথা গোটা ৯৩ হাজার পাক সৈন্যকেই তাদের অস্ত্রসহ ফেরত দিয়া বংগবন্ধুর জীবন রক্ষা করিতাম। তেমন ব্ল্যাকমেইল না করায় ভুট্টো সাহেব আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। বংগবন্ধু নিজে ভুট্টো সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আমরাও দিতেছি। কারণ ব্ল্যাকমেইল আজ আর শুধু হাইজ্যাকারের হাতিয়ার নয়, ভদ্রলোক ও সভ্য জাতিরও হাতিয়ার। সমর-সজ্জাই একটা ব্ল্যাকমেইল। এটম বোমা আরও বড় ব্ল্যাকমেইল।

আসল কথা, ন্যায়বিচারও নয়, ব্ল্যাকমেইলও নয়। এ সবই উঠিয়াছে নেতারা আমাদের উপমহাদেশটার বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়া। শান্তি সবাই চাহিতেছেন। কিন্তু আমাদের এ কাজটা যে শুধু যুদ্ধ উদ্ভুত সাময়িক সমস্যা নয়, এটা যে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন, সে কথা আমরা বুঝিতেছি না। এ স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে গেলে যে শুধু অমীমাংসিত প্রশ্নগুলিরই মীমাংসা করিতে হইবে, মীমাংসিত প্রশ্নগুলির পুনরুন্মুক্তি ঘটানো চলিবে না, এ কথাটা আজ আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং অন্তরের সংগে মানিতে হইবে। শুধু তিন রাষ্ট্রের আপোষ-মীমাংসার কথা মুখে বলিলেই চলিবে না। তিনটি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা, জাতীয় স্বকীয়তার বৈধতা ও সে সবের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার যৌক্তিকতা বুঝিতে হইবে। সে সম্বন্ধে পরস্পরের শ্রদ্ধার নিশ্চয়তাও থাকিতে হইবে। এরই নাম সার্বভৌম সমতা।'[১৫৮]

আট

'...বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।' এটা সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি। অন্যান্য ক্ষতিকর বিভ্রান্তি মোটামুটি এটা হইতেই উদ্ভূত। এই বিভ্রান্তির সর্বপ্রথম ও প্রত্যক্ষ কুফল এই যে, এতে ভারত সরকারকে নাহক ও মিথ্যা বদনাম পোহাইতে হইতেছে। পাকিস্তান যদি ভাংগিয়া থাকে, তবে ভারতই ভাংগিয়াছে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাসিলে ভারত সরকার সক্রিয় ও সামরিক সাহায্য করিয়াছেন। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' যদি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে '৪৭ সালের ভারত বাঁটোয়ারার আর কোনও জাস্টিফিকশন থাকিতেছে না। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও জার্মানীর মতই ভারতেরও পুনর্যোজনের চেষ্টা চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বেলা সে কাজে বিলম্ব ঘটিলেও বাংলার ব্যাপারে বিলম্বের কোন কারণ নাই।

উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে এই ধরণের কথা ও চিন্তা যে কত মারাত্মক, 'বিদগ্ধ' পন্ডিতেরা তা না বুঝিলেও ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নায়করা তা বুঝিয়াছেন। তাই উভয় পক্ষই কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষধর সাপের মাথা ভাংগিয়া দিয়াছেন। ভারত সরকার এক মূহুর্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম প্রান্তে একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের দিকে মৈত্রীর হাত বাড়াইয়াছেন। ওদিককার দখলিত ভূমি ও যুদ্ধবন্দী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর এদিকে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বাংলাদেশের মাটি হইতে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করিয়াছেন। বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছেন। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

---

[১৫৮]. আবুল মনসুর আহমদ/বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা। [আহমদ পাবলিশিং হাউস- আগস্ট, '৭৩। পৃ. ২১০-২১৪]

এদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সুযোগেই ঘোষণা করিয়াছেন : 'বৃহত্তর বাংলা গঠনের কোনও ইচ্ছা আমাদের নাই। পশ্চিমবংগ ভারতেই থাকিবে। আমার দেশের বর্তমান টেরিটরি লইয়াই আমি সন্তুষ্ট। অন্যের এক ইঞ্চি জমিও আমি চাই না।'

বাংলাদেশ-নেতৃত্ব আরও একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। বাংগালী জাতির সংখ্যা-সীমা নির্দেশ করিয়াছেন সাড়ে সাত কোটি। এটা সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের লোক-সংখ্যা। এই ঘোষণার দরকার ছিল। আমাদের বাংগালী জাতীয়তার মূলনীতিতে ভারতের আতংকিত হইবার কারণ ছিল। ভারতে পাঁচ-ছয় কোটি নাগরিক আছেন যারা গোষ্ঠী ও ভাষায় বাংগালী। এরা এককালে ছিলেন সারা ভারতের চিন্তা নায়ক। রাজনীতিতেও তারা সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়াছেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কংগ্রেস-নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তা গ্রহণ করিবার আগেতক এরা বাংগালী জাতীয়তার, বাংগালী কৃষ্টির, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের মুখর প্রবক্তা ছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর উপলব্ধিতে সেদিনকার সে বাংগালী-ভাবাবেগের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় এবং সে রাষ্ট্রের বাংগালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে ভারতীয় বাংগালীদের মধ্যে 'যুক্ত বাংলা' ও 'বৃহত্তর-বাংলার' আকর্ষণে বিভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। এমনিতেই পূর্ব-ভারতে একটু অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। তার উপর বাংগালী জাতীয়তার আবেগের ধোঁকা লাগিতে দেওয়া উচিত হইবে না। এই কারণেই বাংগালী জাতীয়তার ব্যাপারে ভারত একটু সতর্ক। আমাদের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির এক নীতি জাতীয়তায় তাই ভারত সরকারের অনীহা। ভারত সরকারের দলিল-দস্তাবেজে, নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমাদের মূল-নীতির তিনটা উল্লেখ থাকে। জাতীয়তাবাদের উল্লেখ থাকে না। বাংলাদেশের নেতৃত্ব ভারত সরকারের ও ভারতীয় নেতৃত্বের এই ইশারা বুঝিয়াছেন। তাই ঐ সাড়ে সাত কোটি বাংগালীর উল্লেখ। বস্তুতঃ ভারতীয় বাংগালীরা আর রাজনৈতিক অর্থে নেশন নন। তারা এখন এখন ভারতীয় নেশন। বাংগালীর পলিটিকাল নেশনহুডের ওয়ারিসি এখন ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের উপর বর্তাইয়াছে।

উভয় রাষ্ট্রের এই সুস্পষ্ট দৃঢ়তার লগুড়াঘাতে বিভ্রান্তির সাপের মাথাটা গুড়া হইয়াছে সত্য। কিন্তু সাপ আজও তার লেজ নাড়িতেছে। এবং সাপের বিষ লেজে। তাই উভয় রাষ্ট্রের কোনও কোনও অরাজনৈতিক ও 'বিদগ্ধ' বুদ্ধিজীবিরা 'পাকিস্তান ভাংগার ও 'দ্বিজাতিতত্ত্বর ব্যর্থতার একাডেমিক ও থিওরেটিক্যাল 'নির্ভুলতা' আজও কপচাইয়া যাইতেছেন। এই সব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবির বুদ্ধিসহ মন-অন্তর ও কলিজা দগ্ধ হইলেও তাদের মুখটা দগ্ধ হইতে এখনও বাকী আছে।

তাই তাদের মুখে 'শাশ্বত বাংলা', 'প্রবহমান বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'হাজার বছরের বাংলা', 'গুরুদেবের বাংলা', 'বাংলার কৃষ্টি', 'বাংলার ঐতিহ্য' ইত্যাদি নিতান্ত ভাবাবেগের কবিত্বপূর্ণ কথাগুলিও রাজনৈতিক চেহারা লইয়া দেশে-বিদেশে বিষ ছড়াইতেছে। আমাদের দিক হইতেও 'বংগবন্ধু', 'জয় বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'কবিগুরুর বাংলা', 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি প্রতিধ্বনি করিয়া 'এপার-বাংলা-ওপার-বাংলার' ব্যাপারটাকে দুইটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সীমান্তরেখা মসীলিপ্ত হইতে দিতেছি। আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও অবস্থা, আমাদের বাংগালী জাতীয়তাবাদ, আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষতা, আমাদের জাতীয় সংগীত ও ভারতীয় জাতীয় সংগীত একই কবিগুরুর রচনা হওয়াটাও বিকৃতি করণের সুযোগ করিয়া দিতেছে। পাকিস্তানসহ দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যে আজও আমাদের দেশকে স্বীকৃতি দিতেছে না, আমাদের দেশবাসীসহ দুনিয়ার সব মুসলমানরা যে ভারত সরকারের প্রতি নাহক ও অন্যায় বৈরীভাব পোষণ করিতেছে, তার প্রধাণ কারণও এই বিভ্রান্তি।

অথচ প্রকৃত অবস্থাটা এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর-প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই,

শুধু 'মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি 'বাংলাদেশ'। এতে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নাই।

অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া নর্মাল অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তান-বাংলাদেশ পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়া তিন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আপোস-আলোচনার মাধ্যমে নয়া ও সাবেক সমস্ত বিবাদ-বিতর্ক মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ১০ই জানুয়ারীর বিঘোষিত উদার-নীতি কার্যকর করিবে বাংলাদেশ। আর পঁচিশ বছরের না হোক, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জায়েদাদের অংশ দিয়া বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে সাহায্য করিবে পাকিস্তান। পঁচিশ বছরের এজমালী সংসারের লেনদেনে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যে পারস্পরকতা গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ দুই সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সেই পারস্পরিকতাকে জনগণের উপকারে লাগাইতে হইবে।

লড়াই করিয়া পাকিস্তান-বাংলাদেশ পৃথক হইয়াছে বলিয়াই তাদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগীতা হইবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। মার্কিন মুল্লুক ও ইংল্যান্ড লড়াই করিয়াই পৃথক হইয়াছিল। লড়াইর সে তিক্ততা, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি, প্রতিশোধের স্পৃহা, ক্ষয়ক্ষতির ধ্বংসলীলা কোনটাই ইংগ-মার্কিন মৈত্রী ও সহযোগীতায় বাঁধা দিতে পারে নাই। যুদ্ধশেষে তারা এমন মিত্র হইয়াছে যে দুই শ বছরের সুদীর্ঘ মুদ্দতও সে মৈত্রী ও সহযোগীতায় ফাটল ধরাইতে পারে নাই। পাক-বাংলাদেশ সম্পর্কও তেমন হইতে পারে।

'যুক্ত বাংলা' স্বাধীন সার্বভৌমই হউক আর ভারত ইউনিয়নের অংগ-রাজ্যই হউক, উভয়ই সংঘাতের পথ। বাস্তবতার বিচারে ওটা অসম্ভব, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর দিক হইতে অবাঞ্ছনীয়, উপ-মহাদেশীয় শান্তির পরিপন্থী। এ সব জানিয়াও যারা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও অপর স্বাধীন রাষ্ট্রের একটা অংগ- রাজ্যকে সমমর্যাদার স্তরে আনিয়া কথা বলেন, তারা সাধারণত: উপমহাদেশীয় শান্তির বিরুদ্ধে ও বিশেষভাবে ভারত-বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন। উভয় রাষ্ট্রের শান্তিবাদী দেশপ্রেমিকেরই এটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

ইংরেজ আমলের আগের চারশ বছরের বাংলার মুসলমানের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সেখানেও তাদের রূপ বাংগালী রূপ। সে রূপেই তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার স্বাধীনতার জন্য দিল্লীর মুসলিম সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার বার ভূঁইয়া স্বাধীন বাংলা যুক্তরাষ্ট্র গঠণ করিয়াছিলেন। এই যুগ বাংলার মুসলমানদের রাষ্ট্রিক, ভাষিক, কৃষ্টিক ও সামরিক মণীষা ও বীরত্বের যুগ। সে যুগের সাধনা মুসলিম নেতৃত্বে হইলেও সেটা ছিল ছিল উদার অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু-বৌদ্ধরাও ছিল তাতে অংশীদার। এ যুগকে পরাধীন বাংলার রূপ দিবার উদ্দেশ্যে 'হাজার বছর পরে আজ বাংলা স্বাধীন হইয়াছে' বলিয়া যতই গান গাওয়া ও শ্লোগান দেওয়া হউক, তাতে বাংলাদেশের জনগণকে ভুলান যাইবে না। আর্য্য জাতির ভারত দখলকে বিদেশী শাসন বলা চলিবে না, তাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়স্থকে বিদেশী বলা যাইবে না, শুধু শেখ-সৈয়দ-মোগল-পাঠানদেরই বিদেশী বলিতে হইবে, এহেন প্রচারের দালালরা পাঞ্জাবী দালালদের চেয়ে বেশী সফল হইবে না। এটা আজ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সর্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, কৃষ্টিক স্বকীয়তাই রাষ্ট্রীয় জাতীয় স্বকীয়তার বুনিয়াদ। কাজেই নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের কৃষ্টিক স্বকীয়তার স্বীকৃতি উপমহাদেশের তিন জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌম সমতা-ভিত্তিক স্থায়ী শান্তির ভিত্তি হইবে।"[১০৯]

---

১০৯. আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। [খোশরোজ কিতাব মহল– ডিসেম্বর, ১৯৯৯। পৃ. ৬৩২-৬৩৬]

নয়

"...আর একদিনের কথা, গোপালগঞ্জ শহরের কয়েকজন গন্যমান্য ব্যক্তি আমার আব্বাকে বলেছিলেন, আপনার ছেলে যা আরম্ভ করেছে তাতে তার জেল খাটতে হবে। তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে এখনই বাধা দেন। আমার আব্বা যে উত্তর করেছিলেন তা আমি নিজে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবেনা'। অনেক সময় আব্বা আমার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। আমাকে প্রশ্ন করতেন, কেন পাকিস্তান চাই? আমি আব্বার কথার উত্তর দিতাম।

একদিনের কথা মনে আছে, আব্বা ও আমি রাত দুইটা পর্যন্ত রাজনীতির আলোচনা করি। আব্বা আমার আলোচনা শুনে খুশী হলেন। শুধু বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ না করতে। একদিন আমার মা'ও আমাকে বলেছিলেন, 'বাবা যাহাই কর, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলিও না।' শেরে বাংলা মিছামিছিই 'শেরে বাংলা' হন নাই। বাংলার মাটিও তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি। একদিন আমার মনে আছে একটা সভা করছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন? কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন? এই সমস্ত আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক যিনি আমার দাদার খুব ভক্ত, আমাদের বাড়িতে সকল সময়ই আসতেন, আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? তার নামও তো শুনি নাই। আমাদের গরীবের বন্ধু হক সাহেব।'

এ কথার পর আমি অন্যভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। সোজাসুজিভাবে আর হক সাহেবকে দোষ দিতে চেষ্টা করলাম না। কেন পাকিস্তান আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই বুঝালাম। শুধু এইটুকু না, যখন হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদের মারপিট করেছে। অনেক সময় ছাত্রদের নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধা হয়েছি, মার খেয়ে। অনেকবার মার খাওয়ার পরে আমাদের বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। পূর্বে আমার দোষ ছিল, সোজাসুজি আক্রমণ করে বক্তৃতা করতাম। তার ফল বেশী ভাল হত না। উপকার করার চয়ে অপকারই বেশি হত। জনসাধারণ দুঃখ পেতে পারে ভেবে দাবিটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতাম।

পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আর একটা 'পশ্চিম পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। অন্যটা হবে হিন্দুস্তান। ওখানেও হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু থাকবে তবে সমান নাগরিক অধিকার পাবে হিন্দুস্তানের মুসলমানরাও। আমার কাছে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ থাকত। আর হবিবুল্লাহ বাহার সাহেবের 'পাকিস্তান' বইটা এবং মুজিবুর রহমান খাঁ সাহেবও 'পাকিস্তান' নামে একটা বিস্তৃত বই লিখেছিলেন সেটা; এই দুইটা বই আমার প্রায় মুখস্তের মত ছিল। আজাদের কাটিংও আমার ব্যাগে থাকত।

সিপাহি বিদ্রোহ এবং ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাসও আমার জানা ছিল। কেমন করে ব্রিটিশরাজ মুসলমানদের কাছে থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, কি করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে হিন্দুদের সাহায্য করেছিল, মুসলমানরা ব্যবসা-বানিজ্য, জমিদারি, সিপাহির চাকরি থেকে কিভাবে বিতাড়িত হল মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের দ্বারা পূর্ণ করতে শুরু করেছিল ইংরেজরা কেন? মুসলমানরা কিছুদিন পূর্বেও দেশ শাসন করেছে তাই ইংরেজকে গ্রহন করতে পারে নাই সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ওহাবি আন্দোলন কি করে শুরু করেছে হাজার হাজার বাঙ্গালী মুজাহিদরা? বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে সীমান্ত প্রদেশে যেয়ে জেহাদে শরিক হয়েছিল। তিতুমীরের জেহাদ, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়জি আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেই আমি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস বলতাম।

ভীষণভাবে হিন্দু বেনিয়া ও জমিদারদের আক্রমণ করতাম। এর কারণও যথেষ্ট ছিল। একসাথে লেখাপড়া করতাম, একসাথে বল খেলতাম, একসাথে বেড়াতাম, বন্ধুত্ব ছিল হিন্দুদের অনেকের সাথে। আমার বংশও খুব সম্মান পেত হিন্দু মুসলমানদের কাছ থেকে। কিন্তু আমি যখন কোনো হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, আমাকে অনেক সময় তাদের ঘরের মধ্যে নিতে সাহস করত না আমার সহপাঠিরা।

...হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারেও বাংলার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে অসহযোগ করেছিল। তাদের ভাষা শিখবে না, তাদের চাকরি নেবে না, এই সকল করেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। আর হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহন করে ইংরেজকে তোষামোদ করে অনেকটা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। যখন আবার হিন্দুরা ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে মরতে দ্বিধা করে নাই। জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না। হিন্দু নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং নেতাজী সুভাষ বসু এ ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা অনেক সময় হিন্দুদের হুঁশিয়ার করেছিলেন। কবিগুরুও তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে হিন্দুদের সাবধান করেছেন। একথাও সত্য, মুসলমান জমিদার ও তালুকদাররা হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে একই রকম খারাপ ব্যবহার করত হিন্দু হিসেবে নয়, প্রজা হিসেবে। এই সময় যখনই কোনো মুসলমান নেতা মুসলমানদের জন্য ন্যায্য অধিকার দাবি করত তখনই দেখা যেত হিন্দুদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, এমনকি গুণী সম্প্রদায়ও চিৎকার করে বাধা দিতেন। মুসলমান নেতারাও 'পাকিস্তান' সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা শুরু করার পূর্বে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গালি দিয়ে শুরু করতেন।

...১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হল ভারতবর্ষ ভাগ হবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভাগ করতে রাজি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা এবং তার আশেপাশের জেলাগুলিও ভারতবর্ষ থাকবে। মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব ও মুসলিম লীগ নেতারা বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বর্ধমান ডিভিশন আমরা নাও পেতে পারি। কলকাতা কেন পাবনা?

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে বলে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমরাও বাংলাদেশ ভাগ হতে দেবনা, এর জন্য সভা করতে শুরু করলাম। আমরা কর্মীরা কি জানতাম যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে এই ভাগের ফর্মুলা? বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা। আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্র আসামের এক জেলা-তাও যদি গণভোটে জয়লাভ করতে পারি। আর বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলি কেটে হিন্দুস্থানে দেওয়া হবে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। কলকাতার কর্মীরা ও পশ্চিমবঙ্গে কর্মীরা এসে আমাদের বলত, তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আমাদের কপালে কি হবে খোদাই জানে! সত্য দুঃখ হতে লাগল ওদের জন্য। গোপনে গোপনে কলকাতার মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল, যা হয় হবে, কলকাতা ছাড়া হবে না। শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব মোহম্মদ আলী ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা আমাদের রাজধানী থাকবে। দিল্লি বসে অনেক পূর্বেই যে কলকাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একথা তো আমরা জানতামও না, বুঝতামও না।

এই সময় শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের তরফ থেকে এবং শরৎ বসু ও কিরণশংকর রায় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক আলোচনা সভা করেন। তাঁদের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ভাগ না করে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না? শহীদ সাহেব দিল্লিতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক ফর্মুলা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করে।

যেদুর আমার মনে আছে, তাতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। জনসাধারণের ভোটে একটা গণপরিষদ হবে। সেই গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলাদেশ হিন্দুস্থান না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি স্বাধীন থাকবে। যদি দেখা যায় যে, গণপরিষদের বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি পাকিস্তানে যোগদানে পক্ষপাতী, তবে বাংলাদেশ পুরাপুরিভাবে পাকিস্তানে যোগদান করবে আর যদি দেখা যায় বেশি সংখ্যক লোক ভারতবর্ষে থাকতে চায়, তবে বাংলাদেশ ভারতবর্ষে যোগ দেবে। যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাও থাকতে পারবে। এই ফর্মুলা নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু দিল্লিতে জিন্নাহ ও গান্ধীর সাথে দেখা করতে যান। শরৎ বসু নিজে লিখে গেছেন যে জিন্নাহ তাঁকে বলেছিলেন, মুসলিম লীগের কোন আপত্তি নাই, যদি কংগ্রেস রাজি হয়। ব্রিটিশ সরকার বলে দিয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত না হলে তারা নতুন কোনো ফর্মুলা মানতে পারবেন না। শরৎ বাবু কংগ্রেসের নেতাদের সাথে দেখা করতে যেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছিলেন, 'শরৎ বাবু পাগলামি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই।' মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু কোন কিছুই না বলে শরৎ বাবুকে সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিস্টার প্যাটেল শরৎ বাবুকে খুব কঠিন কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন এবং জিন্নাহ যে রাজী হয়েছিলেন একথা স্বীকার করেছিলেন।

যুক্ত বাংলার সমর্থক বলে শহীদ সাহেব ও আমাদের অনেক বদনাম দেবার চেষ্টা করেছেন অনেক নেতা। যদিও এই সমস্ত নেতারা অনেকেই তখন বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই ফর্মুলা গ্রহন করেছিলেন। জিন্নাহর জীবদ্দশায় তিনি কোনদিন শহীদ সাহেবকে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তার বিনা সম্মতিতে কোনো কিছুই তখন করা হয় নাই। যখন বাংলা ও আসাম দুইটা প্রদেশই পাকিস্তানে যোগদান করুক, এর জন্যই আমাদের আন্দোলন ছিল, তখন সমগ্র বাংলা পাকিস্তানে আসলে কি ক্ষতি হত তা আজও বুঝতে কষ্ট হয়! যখন বাংলাদেশ ভাগ হবে এবং যতটুকু পাকিস্তানে আসে তাই গ্রহন করা হবে এটা মেনে নেয়া হয়েছে তখন সে প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা বদনাম দেয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

...দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আরব দেশের লোকেরা আরবি বলে। পারস্যের লোকেরা ফার্সি বলে, তুরস্কের লোকেরা তুর্কি ভাষা বলে, ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কথা বলে, মালয়েশিয়ার লোকেরা মালয়া ভাষায় কথা বলে, চীনের মুসলমানরা চীনা ভাষায় কথা বলে। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বলা চলে। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের কথা বলে ধোঁকা দেওয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পারে নাই। যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই।

এই সময় সরকারদলীয় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুর জন্য জান মাল কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা শেষ 'তাবিজ' নিক্ষেপ করলেন। জিন্নাহকে ভুল বোঝালেন। এরা মনে করলেন, জিন্নাহকে দিয়ে উর্দুর পক্ষে বলাতে পারলেই আর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবেনা। জিন্নাহকে দলমত নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর যে কোন ন্যায়সঙ্গত কথা মানতে সকলেই বাধ্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কোন পথে, তাঁকে কেউই বলেন নাই বা বলতে সাহস পান নাই।

১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসলে হাজার হাজার লোক তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তেজগাঁ হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় হাজির হয়েছিল। আমার মনে আছে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিন আমরা সকলেই ভিজে গিয়েছিলাম, তবুও ভিজে কাপড় নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছিলাম। জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান এসে ঘোড় দৌড় মাঠে বিরাট সভায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' আমরা প্রায় চার পাঁচ শত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সেই সভায়। অনেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল, 'মানি না'। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' তখন ছাত্ররা তাঁর সামনেই চিৎকার করে বলল, 'না, না, না'।

জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয়, এই প্রথম তাঁর মুখের উপরে তাঁর কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।'[১৬০]

দশ

"...As regards his (Quaid-E-Azam's) Dacca speech, it was not an announcement but just expression of one's opinion. He might have been mislead by the then administration and the leaders of the Muslim League of East Bengal. Indeed, I was subsequently told by a reliable friend that Quaid on his return from Dacca actually rebuked the persons concerned for their misrepresentation to him that the majority of Bengalees not only wanted Urdu but themselves spoke and read Urdu at home. In the case of at least some of them, this might have been their genuine misreading the situation in view of the fact that there were innumerable Madrasas not only in cities and towns but also in mafassil of East Bengal where Urdu was not only taught and learnt, in practice, Urdu itself was their medium of instruction. This report of Quaid's subsequent reproof is further supported by the fact that after his Dacca speech Quaid never again spoke a word about state Language."[১৬১]

—Quaid-E-Azam the Democrat / Observer— December 25, 1964

এগারো

"...It was in this situation that I decided to travel to Dhaka in the first week of March. Before leaving West Pakistan, I contacted Bhutto, and told him that I was going to Dhaka and would like to meet him before seeing Mujib. I was given a time to meet him and so I traveled to Karachi. A short while after reaching Karachi I was informed, before the time of my appointment, by one of his aides that the 'Chairman' was busy and regretted that he would not be able to see me. During my week-long stay in Dhaka I had three meetings with Mujib.

In all the meetings, except for the last one, no one else was present and we had a free and friendly exchange of views. He was certain that Yahya Khan had already made up his mind not to hand over power and that he would use the army to subdue the East Pakistanis.

He said that he was a Pakistani and had played a part in the Pakistan movement, having traveled from Calcutta to Delhi with a Pakistan ag shouting 'Ban Kar Rahega Pakistan' (Come what may, Pakistan will certainly be made).

'Where were Yahya Khan and Bhutto then?' he asked in a voice choked with emotion. He said that they, 'the Bengalis, 'had never been trusted and had not been treated like human beings.' The newspapers had, a few days earlier, carried reports that Yahya had invited Mujib to visit Rawalpindi, but the latter had declined the invitation. I asked him why he had not accepted Yahya's invitation. He said that he had been busy with the draft of the constitution and, moreover, the atmosphere had been fouled so much that his people would not agree to his going there now. Although he did not say so, I feel that he and his close associates believed that he might be assassinated if he visited West Pakistan.

১৬০. শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী।। ইউপিএল– ২০১২। পৃ. ২১-২৪/৭৩-৭৪/৯৮-৯৯]

১৬১. Abul Mansur Ahmad/End of A Betrayal and Restoration of Lahore Resolution. [Khoshroz Kitab Mahal- January, 1975| P. 237-238]

Mujib also probably had in mind the attempt, in his presence, on Suhrawardy's life at Gujranwala railway station a decade and half earlier. I asked Mujib what scenario he visualized and how the stalemate could be broken. He replied that the situation was very clear. Yahya Khan would come to Dhaka first, followed by M. M. Ahmed (Head of the Planning Commission), who would be followed by Bhutto. Yahya would then order military action and that would be the end of Pakistan. About himself, he said, he hoped that he would be taken prisoner, for if he was not, he would be killed either by the Pakistan army or by his own people. It is surprising that the sequence of events was almost exactly as he had forecast."[১৬২]

বারো

"...His first very visit to Dhaka, as the Governor-General of Pakistan in 1948, sparked so much heat, that it twisted, turned and twirled not only the face of Pakistan, but changed the whole gamut of India-Pakistan-Bangladesh history.

In addressing a mammoth public rally at the Dhaka Gymkhana Race Course (Now Surwardy Uddan), Jinnah made a fateful declaration: 'urdu shall be the only state language of Pakistan.'

It is true that Jinnah ought to have waited and assessed public opinion before he made that, controversial pronouncement. His unilateral declaration on such a vital issue as state language of Pakistan, it would seem, was dictatorial in manifestation, albeit, one must also see the backdrop and history of Indian Muslims vis-à-vis Jinnah and the Muslim League.

Jinnah was the leader of Muslims of India, but he did never belong to them. He was never one of them. He took the other Muslim League leaders, not as colleagues, but as followers. He wouldn't mix with the Muslim mass, but meticulously kept a distance between himself and emaciated people whom he led. Jinnah accepted the brief of the Indian Muslims as a lawyer, hardly as a politician. Gandhi would travel in third-class railway compartment in order to be with people; Jinnah never below first class, in order to avoid his followers. Gandhi, with his loin-cloth, would identify himself as one of the mass. Jinnah would be impeccably dressed in western attire and would change his suits four times a day in order to feel fresh. Jinnah was a reluctant leader of his followers.

It was the Muslims of India who implored him to lead them; he only obliged. Jinnah would use his own judgment; any suggestion by his Muslim League working committee colleagues was only concomitant in nature. His colleagues would remain gratified with their status; never question his prudence and authority.

The Muslim leaders who would transform themselves later into critics of Jinnah, were the persons responsible, for good or bad, for preparing him into a 'supernova'- high enough not to be within their reach. Besides Jinnah's own rigid personality, it was the behavior of the people around him, that made him almost omnipotent and nearly all pervading.

As we have found earlier, Jinnah did never visit Dhaka before 1948. Before he came, the question as to what would be Pakistan's State language, was being seriously mooted everywhere. It should be relevant to remember that Urdu was not spoken any province of Pakistan. Sind, N.W.F.P., Punjab, Baluchistan and East Pakistan, had all their own different

---

১৬২. M. Asghar Khan (Commander in Chief of the Pakistan Air Force)/We've Learnt Nothing From History [UPL-2006] P. 37-38]

languages distinct from Urdu. So, how the question of Urdu as the state language arose in the first place? All speeches Jinnah ever made throughout his political career in English including the speech at Dhaka Race Course. If English was the common language throughout India, Urdu/Hindi, however, had always remained to be a common, loose lingua franca for the northern Indian people. Jinnah was led led to believe by his advisors that Urdu was a language, commonly understood by all the people of Pakistan, including Bengolees of East Pakistan. Jinnah's advisors from Bengal were, most important of all, non-bengolees and Urdu speaking. Having no knowledge about Bengal whatsoever, Jinnah had to depend entirely on those advisors. Those advisors like Nizamuddin, Surwardy, Md. Ali Bogra and, most importantly, tycoon Ispahani, Jinah's financier from Bengal, were all Urdu speaking and unequivocally advocated and advised Jinnah to make Urdu the state language of Pakistan. The rumor that Sher-E-Bangla A K Fazlul Haque also opted for Urdu, doesn't warrant credibility, since after moving the 1940 Lahore Resolution, he drifted away Jinnah's inner circle. The basis of such story rested on the fact that A K Fazlul Haque's second wife was a Urdu-speaking lady and Fazlul Haque's house-hold language was Urdu.

Beside such important and sole advisors from Bengal, Jinnah was also in possession of yet another important document. In 1946, the elite Muslim leaders of Dhaka, led by late Hakim Ertezaur-Rahman, son of late Hakim Habibur Rahman, launched a massive, vigorous campaign, and after procuring hundreds of thousands of signatures of the Muslims of Dhaka and the adjacent areas, submitted them to Jinnah. The signatories in the papers implored that All-India Radio authority in delhi must relay Urdu news bulletin to All-India Radio Dhaka- along with English and Bengolee bulletins. Such resolutions were sent to Jinnah, besides copy to All-India Muslim League Convention to be held in October 1946 at Delhi M.L. Convention, as was demanded by the Bengolee Muslims, because he himself was not sure, about the efficacy of making Urdu as the state language of futuristic-Pakistan. He could hardly think in terms of any other language other than English.

Although Jinnah had announced in 1948 about Urdu being Pakistan's state language, he did never press the matter or implemented his declaration. This was probably because of the protestations he encountered at Dhaka. Had he decided to put deaf ears to East Pakistan's demonstrations about state language, the only thing he required to do was to make a telephone call to Prime Minister Liakat Ali Khan and order him to place and pass the legislations in the Constituent Assembly making Urdu Pakistan's State Language. There was absolutely nothing in his way to deter him from doing so, had he wanted it to be done. But he refrained from doing it, which might go in his favour for a change, as inaction democratic in nature.

...At the time of partition and, before setting his foot in Karachi, the capital of Pakistan, Jinnah had bequeathed his million dollar worth of property for the benefit of Indians. His Simla Hill house, mansion at Delhi and many other valuable properties and assets were given to Indian Universities and other Indian institutions. Like Liakat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, and thousands of other Indian Muslims who migrated to Pakistan, he could have sold those properties and bring the cash to Pakistan for his personal use. But Jinnah's taste and temperament didn't travel that way.

He didn't stuff the invaluable movable items in his plane, which carried him and his sister, Miss Jinnah, from Delhi to Karachi. He even left behind his favorite Persian Carpet, on which the Mahtma, Nehru, Patel, Moulana Azad, used to sit in meetings with him. A man is better known by small manifestations, rather then big, bowling events.

We had been talking about Mr. Jinnah. A little digression took us little away.

We had seen Jinnah's unilateral declaration on language issue, the beginning of the end of Pakistan in this part of the globe.

An impression generally carried and spewed constantly these days that the state language movement meant to make Bangla as the only state language of Pakistan. This is far from the actual state of the affairs. Recalling, I can categorically jot down that the first series of posters I wrote carried chants like this:

'Urdu Bangla Bhai Bhai
Rashtra Bhasha Dui-e Chai'

which meant that Urdu and Bangla languages were brotherly and we wanted both as state languages.

If the minority West Pakistani wanted to impose their will, the East Pakistanis behaved like a responsible majority, in not trying to impose their will on the west Pakistanis merely because they were minorities. This could be clearly located, even at much later a time, in 1954, when the twenty-one-points Joint-Front election charter was given, the very first point of the charter was that the Bangla should be made one of the state languages of Pakistan. In fact it was basically a fight of rights between East and West Pakistanis and when language issue appeared as God-sent, it was grabbed with all ferocity which proved to impregnant with all kinds of history making chemistry.

Starting from 1948 and moving through 1952, had the language issue not become that fueled and fattened a history, as has been stated earlier, different maps could have been drawn in Indo-Pak subcontinent. Like Kashmir issue, language movement to acted an equal, if not more, impact on the sub-continents's history. And, in all this as if umbilical, India was a necessary party and had definite roles to play. To an ardent observer, what language movement would offer, was not only the craving for Bangla as the state language of Pakistan (Bangla, till 1953 was the tongue of 66% of the populace), but a movement for democracy and fundamental rights. Language was an issue; just as there could be any other issues for a democratic movement. Had Jinnah said, instead of language, that no one from East Pakistan would be taken in Pak military or no industry would be developed in East Pakistan. I am certain, instead of writing the posters I wrote for the State Language movement, I would have switched over to write on military or industrial issues, albeit, going to jail for whatever issue would have been as painful and as glorious.[১৬৩]

তেরো

'ব্রাহ্মণ্যবাদের আগ্রাসী অহংকার এবং ভারতবর্ষের বিভাজন'– প্রবন্ধ লেখক অশোক ঘোষ বলেন : 'কার কার বাধায় অখন্ড স্বাধীন বাঙলার জন্ম হতে পারল না? দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের জন্য দায়ী কে? মুখ্যত দায়ী কংগ্রেস– তার শীর্ষ নেতৃত্ব : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জওয়াহের লাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল। প্রমাণ? প্রমাণ ১৯৪৭ সালের ৮ জুনে শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিঠি। তার দ্বিতীয় প্রমাণ এবং তৃতীয় বাক্য দুটি এ রূপ–'আমি এখন পরিকল্পনাটি মোটামুটি ভাবে পণ্ডিত নেহরু এবং সরদারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দুজনেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনড়।'

---

১৬৩. Iqbal Ansari Khan/The Third Eye : Glimpses of the Politico. [UPL- September, 1991] P. 116-119/136-137]

আর একটি শক্তি বঙ্গদ্বিখণ্ডনের জন্য দায়ী– শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা। আরও একটি দল দায়ী– ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি। বাস্তব ঘটনার সাক্ষ্যে আমরা বলতে বাধ্য– পূর্ব এবং উত্তর বাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালির বাস্তুচ্যুতি আর দু:সহ জীবনযন্ত্রণার জন্য এককভাবে দায়ী সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন, নিষ্ঠুর নির্মম সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং হিন্দু মহাসভা।'

বাঙলার কম্যুনিস্টরা কর্তব্যচ্যুত হলেন কেন?

এই কারণে যে তাদের নেতৃত্বেও উচ্চ বর্ণহিন্দুদের প্রাধান্য।

সাতচল্লিশের ভারতবিভাগ দেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এক অতিগর্হিত অপরাধ।

এই অপরাধের যারা আসামি, তাদের কখনো ক্ষমা করা যাবেনা।

অপরাধী অনেকে–একজন ব্যক্তি বা একটি দল নয়। কংগ্রেস নেতারা অপরাধী। মুসলিম লীগের নেতারা অপরাধী। হিন্দু মহাসভার নেতারা অপরাধী। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা অপরাধী। কিন্তু সর্বপ্রধান অপরাধী কে? পহেলা আসামি কে? কংগ্রেস না মুসলিম লীগ? গান্ধী, নেহরু প্যাটেল না মোহাম্মদ আলি জিন্না? সত্য ইতিহাসের রায় কার বিরুদ্ধে? অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে হবে ১৯১৬ সাল থেকে–লক্ষ্ণৌ চুক্তি থেকে। তা হলেই আসামীকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যাবে।

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা–১৯২৯ সনে লীগের দিল্লী সম্মেলনে গৃহীত হয়।

ভারত ভেঙ্গে ভাগ করার জন্য কে প্রধান আসামি?

বাঙলা ভেঙে দু'টুকরো করার অপরাধে কে প্রধান আসামি? মোহাম্মদ আলি জিন্না? নাকি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্ব?

পাকিস্তান প্রস্তাবে বাঙলাকে ভাগ করার কথা ছিল না, পাঞ্জাবকেও না। বাঙলাকে পাঞ্জাবকে ভাগ করেছেন মাউন্ট ব্যাটেনের উস্কানিতে, না চাপাচাপিতে?– কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

যাকে হিন্দুত্ব বলা হচ্ছে, সেটা আসলে কী? ইংরেজিতে বলতে হলে বলব : Upper-caste Hindu chauvinism, বাঙলায় বলা যায়– ব্রাহ্মণ্যবাদের দম্ভ' (০৯/০৭/১৯৯৩)[১৫৪]

চোদ্দো

"...পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদী-আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) রূপে কীর্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলিম মিলনের এই মহান অগ্রদূতকেই ভারতীয় দ্বিজাতিতত্ত্বর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনকের দুর্লভ দায়ভার গ্রহণ করতে হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে এক প্রচণ্ড স্ববিরোধিতার বীজ লুকিয়ে আছে বলে মনে হলেও, ইতিহাসের পটভূমিতে এবং এই উপমহাদেশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়—হিন্দু এবং মুসলমানের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করে দেখলে কায়েদে আজমের উপরোক্ত ভূমিকার যথার্থ স্বরূপ এবং অনিবার্য আবশ্যকতার সত্যটি উপলব্ধ হবে। যেহেতু এক ঐতিহাসিক সময়-সন্ধিক্ষণে

---

১৫৪. আহমদ শরীফ/আহমদ শরীফের ডায়েরি : ভাব-বুদ্বুদ। [জাগৃতি প্রকাশনী– ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ৩০-৩১]

কায়েদে আজম 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন, এবং ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই তাকে আবার দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে হয়েছিল, সে কারণে কায়েদে আজমের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে — বিশেষ করে উপমহাদেশের আজাদী-আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে যারা এরে পর্যালোচনা এবং বিচার করে দেখেন নি, তাদের কাছে কায়েদে আজমের উপরোক্ত ভূমিকা সংকীর্ণ, অনুদার এবং সাম্প্রদায়িক বলে বিবেচিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। অধিকন্তু পাকিস্তান-আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত দাবীকে নস্যাৎ করার প্রবল বাসনায় একদা এ-উপমহাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্র 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত'কে যেসব অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন তার আড়ি-নৌকায় কায়েদে আজমের ভূমিকা বিচার করতে গেলে বিভ্রান্তি এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন

একদা হিন্দু মনীষী ও নেতৃবৃন্দ দাদাভাই নওরোজী আর গোখেলের অনুরক্ত ভক্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে Ambassador of Hindu Muslim Unity বলে স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন, তাদের আশা ছিল, কংগ্রেসের 'শো-বয়' অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতোই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য আর বৈশিষ্ট্য বিলোপকারী আত্মবিধ্বংসী পথে পা বাড়িয়ে 'অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি এগিয়ে দিবেন। কিন্তু অচিরেই হিন্দু নেতৃবৃন্দ আর কংগ্রেসী প্রচার বিশারদদের মোহভঙ্গ হল, তারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যের আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের উদগাতারূপে প্রত্যক্ষ করলেন। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম এবং অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ, মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ এবং সামগ্রিক অস্তিত্ব সংরক্ষণের ভিন্ন কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না।

'হিন্দু-মুসলিম-মিলনের অগ্রদূত' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আকস্মিক ভাবে প্রায় রাতারাতি 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' উদগাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মনোবিকাশ এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তন যারা পর্যালোচনা করবেন, তাদের কাছেই এ-সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ-উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং হিন্দু-নেতৃবৃন্দের স্বার্থান্ধ ভূমিকাই যে পরোক্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে এ-সত্য ইতিহাসের পাতা থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংকট-সন্ধিক্ষণে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলী যে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করে এসেছেন তার ধারাপ্রবাহই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ-সত্য শিখিয়েছে যে, স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ এবং সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত না হলে তাদের মুক্তি সম্ভবপর নয়। অথচ উল্লিখিত সুদীর্ঘকালের পরিধিতে উদারতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম জনসম্প্রদায় বহুক্ষেত্রেই প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিদানে তাদের ভাগ্যে বিড়ম্বনাই সার হয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক আজাদী অর্জনের মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধু যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহই 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের' সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন এমন নয়; এক্ষেত্রে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সূত্রেই এক বিশেষ মনোভঙ্গী অর্জন করেছিলেন।

পাক-ভারত উপহাদেশের আজাদী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, নিজেদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে হিন্দু-নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করে এসেছেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন ইতিহাস বস্তুতপক্ষে কংগ্রেস এবং অন্যান্য হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনগোষ্ঠীর দ্বিধাহীন সমর্থনের ইতিহাস। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এমন এক পর্যায়ে যখন তথাকথিত উদারতা,

ঐক্যবোধ আর একজাতীয়তার নামে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের সত্যকে মুছে ফেলা সম্ভবপর ছিল না। বিশেষ করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইতিহাস-সচেতনতা এক মুসলিম মানস গঠন ও মনোবিকাশের ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকরূপেই বিবেচিত হয়েছিল।

পাক-ভারতের মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের সংগ্রামের যে ভিত্তিপট একদা সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রমুখ মোজাহিদেরা রচনা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক পটভূমিতে দাড়িয়ে এ-সময়ে স্বাতন্ত্র্যের সাধনায় ব্রত হওয়া অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছিল, কারণ সেই সংগ্রামী-সাধনার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালের মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলন গোড়াতেই এমনভাবে সূচিত হয়েছিল যার ফলে এই জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের বিপরীতধর্মী ভিত্তিপট রচিত হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এ উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম জনসম্প্রদায় নিজেদের স্বতন্ত্র্যধর্মী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন; ধর্ম, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ভিন্নতা তাদের লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বলেই তাদের যাত্রাপথও হয়েছিল ভিন্ন .....'কিন্তু পুনরুজ্জীবনবাদ ভারতের জনসাধারণের জন্যে এটা অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে প্রমাণিত হয়নি। কারণ একদিকে যেমন তা পাশ্চাত্যের জবরদখলকে প্রতিহত করা এক স্থানীয় শক্তিকে স্বাধীনতা ও স্বরাজ অর্জনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে, অপরপক্ষে, তা দেশের জনসাধারণকে হিন্দু এবং মুসলমান এই দু'টো পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছে। জনসংখ্যার বিরাট অংশ ছিল হিন্দু। তারা দাবী করতো যে, যেহেতু খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে তারা এই দেশ দখল করে আছে সেহেতু তারাই ভারতের সত্যিকার উত্তরাধিকারী। তাদের আরও দাবী ছিল যে, এদেশের দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতিতে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে। কাজেই তারা সরাসরি হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্ম এবং বেদ ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবনবাদকে গ্রহণ করেছিল। তাই হিন্দু জনসাধারণের কাছে পুনরুজ্জীবনবাদের অর্থ ছিল 'বেদ-এর যুগে ফিরে যাওয়া' এবং তিন হাজার বছরের পুরনো বর্ণ-ব্যবস্থা-ভিত্তিক জীবনে ফিরে যাওয়া। এর অর্থ ছিল সমস্ত তফশীলী ও অহিন্দু জনসাধারণকে কেবলমাত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে নয় বরং তাদের দখলীকৃত এলাকার সীমানা থেকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। অবশ্য তাদের জন্য একমাত্র বিকল্প ছিল বর্ণ-হিন্দুদের দাসানুদাস হিসেবে অথবা অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ হিসেবে বেঁচে থাকা। এভাবে পুনরুজ্জীবনবাদ হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় উগ্রতার রূপ পরিগ্রহ করে, আর তাই দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছুসংখ্যক বিশুদ্ধ ধর্মীয় এবং পুনরুজ্জীবনবাদী সংস্থার উদ্ভব হয়েছে।' (Muslim League Yesterday & To-day by A. B. Rajput, P. 10-11).

অন্যপক্ষে, 'এক চতুর্থ জনসংখ্যা সম্বলিত মুসলানেরা পাশ্চাত্য আধিপত্যের অন্যায় অস্তিত্বের উচ্ছেদ সাধনের জন্য হিন্দুদের মতোই একটি প্রবল পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু তাদের পুনরুজ্জীবনবাদ 'নবীর আদর্শে ফিরে চলো' এবং 'প্রথম যুগের খেলাফতের দিকে ফিরে চলো' এইরূপ শ্লোগানের রূপ পরিগ্রহ করলো যার অর্থ হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়ার মুসলিম আধিপত্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগের দিকে ফিরে যাওয়া। মুসলমানেরা হিন্দুদের চাইতে সংখ্যালঘু হলেও তাদের সুবিধা ছিল এই যে, তাদের ছিল ভারতবর্ষে সহস্রাধিক বৎসরেরও বেশী সময়ের গৌরবময় শাসনের উজ্জ্বল ঐতিহ্য যেখানে তারা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এক মহত্তর সংস্কৃতি, উৎকৃষ্টতর মানস ও বিশুদ্ধতর ধর্মবিশ্বাস সম্বলিত একটি অত্যন্ত উন্নত শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কাজেই মুসলমান সংস্কারকগণ তাদের হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে তাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ব্যবহার অনেক ভালোভাবে করতে পেরেছেন — কেননা উপরোক্তদের সংস্কৃতি ও গৌরব প্রাচীনত্বের কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল; তাছাড়া তারা বিদেশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও স্বাধীনতা ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেনি। সুতরাং পুনরুজ্জীবনবাদ মুসলমানদের কাছে শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামী মাত্র ছিল না। সামাজিক রীতিনীতির জাল-জঞ্জাল থেকে অনৈসলামিক কার্যকলাপসহ নির্মূল করে ইসলামের পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের প্রধান প্রচেষ্টা।' (Ibid P. 10-11)

এ-থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম পুনর্জাগরণ-আন্দোলনের মূলে স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার বাসনা দুর্মর এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের প্রচেষ্টা দুর্নিবার হলেও তার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় প্রতিবেশী অমুসলিম সমাজের অস্তিত্ব বিনষ্ট করার কিংবা তার স্বকীয়তাকে টুঁটি টিপে হত্যা করার কোনরূপ ষড়যন্ত্র ওঁৎ পেতে ছিল না। মুসলিম সমাজ-নায়ক, ধর্মীয় চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যা চেয়েছিলেন তা হলো স্বসমাজের শিকড়ে অনুপ্রবিষ্ট এবং তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী কুসংস্কার এবং সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতিকে দূর করে দিয়ে নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক আদর্শের উজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যসাধনের অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-কল্পনা এবং বাস্তব-সম্ভাবনা তাদের মনে উঁকি দেয়নি, বরং প্রতিবেশী সমাজের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন রচনা করেও যাতে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করা যায়, এ প্রচেষ্টায়ই তারা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সব রকম বৈরিতা এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও 'মুসলিম নেতৃবৃন্দের' এ আশা ছিল বহুদিন পর্যন্ত দুর্মর। এমন কি ইসলামী আদর্শ, মুসলিম ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত মওলানা মোহাম্মদ আলী-শওকত আলীও যে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু নেতৃবৃন্দের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করেননি, তার মূলেও হল এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব।

ওয়াহাবী-আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যধর্মী মুসলিম আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত থেকেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম মিলন ও সম্প্রীতির আশা পরিত্যাগ করেননি। অবশ্য ইংরেজ সরকার সিপাহী-বিপ্লবের অভিজ্ঞতার পর থেকেই ধর্ম, শ্রেণী, গোত্র এবং বর্ণের বিভিন্নতর পার্থক্যকে পুঁজি করে পাক-ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জনসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে ছিলেন :

'আমাদের প্রচেষ্টা হবে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মধ্যে যে পার্থক্যের অস্তিত্ব বর্তমান তাকে সর্বশক্তি নিয়ে সমর্থন করা, তাদের একত্রীভূত করা নয়। বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন করাই হবে ভারত সরকারের নীতি।' (A despatch by Lt. Col. John Coke, the Commandant at Moradabad, just after the Sepoy Revolt.

পরবর্তীকালের ইংরেজ শাসকরাও এই মনোভাব এবং কার্যক্রম বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করে এসেছেন। অবশ্য, পাক-ভারতীয় হিন্দুপুনর্জাগরণবাদীদের সংকীর্ণ মনোভঙ্গী এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এ ব্যাপারে অনেকখানি ইন্ধন যুগিয়েছে।

হিন্দু-পুনর্জাগরণ ও মুসলিম পুনর্জাগরণের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, মুসলিম পুনর্জাগরণবাদিরা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শের বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন, অতীতের গৌরবময় দিনের পুনরুত্থান কামনা করেছেন, কিন্তু প্রতিবেশী অমুসলিম সমাজের অস্তিত্ব অস্বীকার কিংবা তার অস্তিত্ব নির্মূল করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন নি। কিন্তু অন্যপক্ষে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদিরা শুধু যে পুনরুত্থান কামনা করেছেন তাই নয়, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে ভারতের মাটি থেকে পরোক্ষে অহিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন। কারণ, তাদের ধ্যান ও ধারণায় :

'হিন্দুস্থান একমাত্র হিন্দুদেরই দেশ এবং মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতির লোক যারা এখানে বাস করছেন তারা আমাদের অতিথি। তারা যতদিন অতিথি হিসেবে থাকতে চান ততদিনই এখানে থাকতে পারেন।' (Speech by Bhai Premanand, a leader of Hindu Mahasabha).

আজাদী অর্জনের সুদীর্ঘকাল আগে ভাই প্রেমানন্দ হিন্দু ধ্যান-ধারণার যে প্রতীকী-প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক ভারতেও তার অস্তিত্বের প্রমাণ স্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে অহিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে তা উপরোক্ত মনোভঙ্গী এবং গোঁড়া ধর্মাদর্শেরই ফল। অতীতে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা গেছে যে, মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মতো নেতারাও এই সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন না।

এ-সত্য গভীরভাবে উপলব্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাক-ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখেছেন, আজাদী-আন্দোলনে তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু হিন্দু মনোভঙ্গীর সংকীর্ণতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী যখন 'মুসলিম অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল, তখন 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পক্ষেও আর অলীক স্বপ্নচারিতায় অভিভূত হয়ে থাকা সম্ভব হলো না, তিনিও বাস্তবের মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হলেন। একদা মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলীর স্বপ্ন যেভাবে বানচাল হয়ে গিয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম মিলন এবং সম্প্রীতির প্রশ্নে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও সেই স্বপ্নভঙ্গের শিকারে পরিণত হতে হল।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ইতিহাস-বোধ, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মুসলিম মানস সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা তাকে এ-শিক্ষাই দিল যে, স্বকীয়তার পথে পদক্ষেপ করা ছাড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং সর্বাঙ্গীন স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভবপর হতে পারে না। পাক-ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দ দেশের ভৌগোলিক ঐক্যের নামে এবং হিন্দু-মুসলিম একজাতীয়তার দোহাই পেড়ে বিদেশী শাসন-কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে এক 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার পথে যে পদক্ষেপ করেছেন এ-সত্যও তিনি অনুধাবন করতে পারলেন। এই সংকট-সন্ধিক্ষণেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইকবালের স্বপ্নের আলোকে এবং চৌধুরী রহমত আলী প্রমুখের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক দ্বিজাতিতত্ত্বর অমোঘ যুক্তি তুলে ধরলেন, আর সে-মুহূর্তেই এর চরম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। এতদিন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যেসব হিন্দু-নেতৃবৃন্দ এবং মনীষী ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, এক্ষণে তারাই জিন্নাহর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান-বিরোধী হিন্দুপরিচালিত সংবাদপত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে চিহ্নিত করতে লাগলেন এই বলে :

'জিন্নাহ সাহেব দাম্ভিক ...ভারতের এক নম্বরের রাজনৈতিক শত্রু ...বেলোয়াড়ী দোকানের ষাঁড় ...তিনি ভারতের এক নায়ক হওয়ার প্রয়াসী ...দাম্ভিকতম ফেরাউনের চেয়েও দাম্ভিক ...ভগবান করুন তিনি যেন চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান ...সবচেয়ে অসহ্য প্রকৃতির লোক ...ভারতের জন্য ধ্বংসাত্মক ...এমন একজন অহংকারী যিনি কোন সমকক্ষ সহ্য করেন না ...নিজের সাম্প্রদায়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ভারতকে তিনি জাহান্নামে পাঠাতেও রাজী ...নিজের গোঁড়ামীর কাছে অত্যন্ত নমনীয়... তাঁর কাছে একজন মুসলমান হাজার হিন্দুর চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান ...উগ্র-স্বভাব এবং অনমনীয় ...সত্যিকারের একজন খারাপ লোক...' (Quoted in 'My Leader' by Z. A. Suleri).

হিন্দু-সমাজের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শুভফল অচিরেই ফলতে শুরু করলো। তাদের এই প্রতিক্রিয়ার মুখে পাক-ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র স্বাতন্ত্র্যধর্মী আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার নেতৃত্বের পতাকাতলে গিয়ে সমবেত হলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বর ঐতিহাসিক ও বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যায়, তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও যুক্তিধর্মিতার প্রভাবে বিদেশী শাসন-কর্তৃপক্ষসহ স্বদেশী হিন্দু নেতৃবৃন্দও 'পাকিস্তান' দাবী মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এর জন্যে অবশ্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে, প্রবল-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সাফল্যের তোরণ-দ্বারে উপনীত হতে পেরেছেন এই জন্যে যে, তার প্রচেষ্টার পেছনে কোনরূপ সংকীর্ণতা কিংবা গোঁড়ামী ছিল না, ছিল পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ও বাস্তব ধ্যান-ধারণা এবং বোধের অন্তর্নিহিত সত্যই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

'মুসলিমগণ ভারতে আগমন করেছিলেন বিজয়ী, ব্যবসায়ী, প্রচারক এবং শিক্ষক হিসেবে এবং সঙ্গে করে এনেছিলেন নিজস্ব কৃষ্টি এবং সভ্যতা। তারা ভারতীয় উপমহাদেশের পুনর্গঠন ও পুনসংস্কার করেন। আমরা এমন একটি জাতি যাদের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় কৃষ্টি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও পরিভাষা, মূল্য ও পরিমিতি বোধ, আইন ও নৈতিকতা, আচার-প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য,

আশা ও আকাঙ্ক্ষা; সংক্ষেপে বলতে গেলে জীবন-সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের সব মাপকাঠিতেই আমরা একটা জাতি। আমরা জানি দ্বিখণ্ডিত ভারত স্বাধীন হতে পারে না এবং এটা অসম্ভব।'

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র এই বাস্তববোধ এবং ঐতিহাসিক উপলব্ধিই তাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং এরই কল্যাণে একদা 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' রূপে কীর্তিত এই অনন্য-সাধারণ নেতা পাক-ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর 'কায়েদে আজম' রূপে অভিষিক্ত হতে পেরেছেন।"[১৮২]

পনেরো

'...গুজরাতী প্রথা অনুসারে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যুক্ত করে পরিশেষে যোগ করতে হয় বংশের পদবী। যেমন গান্ধী বংশের করমচাঁদের পুত্র মোহনদাস। যেমন তাতা বংশের নাসেরবানজীর পুত্র জামশেটজী। তেমনি খোজানী বংশের ঝীণাভাইয়ের পুত্র মহম্মদালী। বড়ো হয়ে মহম্মদালী তাঁর নামটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মহম্মদ আলী। তাঁর পিতার নামকেও দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগটাকেই করেন তাঁর পদবী। দ্বিতীয় ভাগটা বর্জন করেন। বাদ যায় বংশপদবীও। বিলিতী কায়দায় বানান করতে গিয়ে ঝীণা হয়ে যায় এমন একটি শব্দ যার উচ্চারণ সাহেবদের মুখে জিনা, ভারতীয়দের মুখে জিন্না, আরবদের মুখে জিন্নাহ্। যেমন আল্লাহ্। ইংরেজদের বানানে মহারাজা শব্দটির অন্তেও এইচ জুড়ে দেওয়া হতো। বার্মার অন্তেও। হাওড়ার অন্তে এখনো হয়। জিন্না সাহেব যে সম্প্রদায়ের মুসলমান তার নাম ইসমাইলিয়া খোজা। একবার এক আইনের কেতাবে দেখেছিলাম, 'The term Hindu includes Ismailia Khoja.' আইনটা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। তাই যদি হয় তবে জিন্না সাহেব উত্তরাধিকারসূত্রে হিন্দু। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান। ধর্ম যত সহজে বদলানো যায় উত্তরাধিকার তত সহজে নয়।

জরাতী হিন্দুদের অনেকের নাম ঝীণা। তার মানে 'ছোট'। কে জানে 'ছোট' থেকে বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মুহাম্মদ আলীর অন্তরে কাজ করছিল কিনা। নিজের প্রতিভার জোরে তিনি বড়ো ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। বড়ো রাজনীতিক হওয়াও স্বাভাবিক। হলেন শেষ পর্যন্ত একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল। বেঁচে থাকলে প্রেসিডেন্টও হতে পারতেন। তাঁর মতে পাকিস্তানই নাকি বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এটা তাঁর একার সৃষ্টি। গান্ধী না থাকলেও ভারত একদিন না একদিন স্বাধীন হতো। কিন্তু জিন্না না থাকলে পাকিস্তান কি আদৌ সম্ভব হতো? ভারতকে স্বাধীন করার দাবীদার আরো একজন কি দু'জনের নাম শোনা যায়, কিন্তু পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র করার দাবীদার আর একজনও নেই। লা শরিক জিন্নাহ্। যেমন লা শরিক আল্লাহ্!

ঐতিহাসিক পুরুষরা ইতিহাসের হাতের যন্ত্র হিসাবেই কাজ করে যান। কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতসারে। তাঁরা যে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় গিয়ে শেষ করবেন তা তাঁরাও আগে থেকে জানেন না। দাবাখেলায় একপক্ষের চাল নির্ভর করে অপরপক্ষের চালের উপরে। ব্রিটিশ শাসকরা একটা চাল দিলে গান্ধীজী দিতেন তার পাল্টা চাল। আর গান্ধীজী একটা চাল দিলে জিন্না সাহেব দিতেন তার পাল্টা চাল। মনে হতো জিন্না সাহেব যেন ব্রিটিশ পক্ষের ডামি। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। তিনিও ছিলেন স্বাধীন খেলোয়াড়। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে পদ দিয়ে বা উপাধি দিয়ে কিনে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন আনপারচেজেবল। ইনকরাপটিবল। অবিকল গান্ধীজীর মতো। তবে শেষের দিকে তাঁর ধারণা জন্মেছিল তাস খেলায় ব্রিটিশ পক্ষই তাঁর ডামি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি, ক্যাবিনেট মিশনের নেতা পেথিক লরেন্স, বড়লাট ওয়েভেল বা মাউন্টব্যাটেন তাঁর খেলাই খেলবেন, তাঁদের নিজেদের খেলা নয়।

---

১৮২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ/সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা। [আহমদ পাবলিশিং হাউস- ঢাকা, ১৩৭৪। পৃ. ১০৫-১১২]

দারুণ, নিদারুণ ভ্রম। ইংরেজ আর কারো খেলা খেলে না। সে ফরাসীর কাঁধে বন্দুক রেখে জার্মানের সঙ্গে লড়ে। মুসলমানের কাঁধে বন্দুক রেখে হিন্দুর সঙ্গে লড়ে, মুসলিম লীগের কাঁধে বন্দুক রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ে। মিটমাটের সময় যখন আসে তখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন করে। মিত্রকে তেমন পাত্তা দেয় না। তবে একেবারে পথে বসায় না। জিন্না সাহেব পেলেন ঠিক ততখানি, যতখানি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেন মানে মানে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবার সময় কংগ্রেসের সম্মতি নিয়ে দিতে সক্ষম।

গান্ধীজীকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পারতেন না, সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু গান্ধীজী যদি তাঁর প্রস্তাবে বাধা দিতেন তা হলে তিনি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পরেই প্রদেশওয়ারি ভাবে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়ে যেতেন। ফলে কংগ্রেস পেত আটটি প্রদেশ, সেই আটটিকে নিয়ে কেন্দ্র গঠন করতে পারত, কিন্তু আসামে সৈন্য পাঠাতে পারত না, মাঝখানে পড়ত মুসলিমশাসিত বঙ্গ, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে সৈন্য পাঠাতে পারত না, মাঝখানে পড়ত মুসলিমশাসিত পাঞ্জাব। তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তান আরো দুটিকেও কুক্ষিগত করত। গান্ধীজী কি আরো এক দফা সত্যাগ্রহের সাহায্যে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারতেন? না, তার জন্যে আবশ্যক হতো মাউন্টব্যাটেনের মতি পরিবর্তন নয়, মুসলিম লীগের নীতি পরিবর্তন। তার জন্যে জিন্না সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশে তথা কেন্দ্রে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন। সেটার জন্যে কংগ্রেসকে তথা হিন্দু সম্প্রদায়কে এত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হতো যে কংগ্রেস তো নারাজ হতোই, হিন্দু জনমতও বিদ্রোহী হতো। গান্ধীজী আপনাকে শুন্যে পরিণত করেন। কিন্তু জাত বেনিয়া তিনি, যাচাই করে দেখেন ভারতের মুক্তি নামক মুক্তাটা সাচ্চা না ঝুটা। সেটা সাচ্চাই বটে। মাউন্টব্যাটেন ঠকাননি। ভারত সত্যিই মুক্ত, যদিও বিভক্ত।

জিন্না সাহেব যেটা পান সেটাও সাচ্চা। যা মোগল আমলে সম্ভব হয়নি, যা ব্রিটিশ আমলে সম্ভব হতো না, তাই সম্ভব হলো জিন্না-নেতৃত্বে। এই উপমহাদেশের একচতুর্থাংশ হলো 'দারুল ইসলাম'। বাকীটা থেকে গেল 'দারল হরব'। যেমন বরাবর ছিল। মুসলিম দুনিয়ার দিক থেকে কত বড়ো জয়! কৃতজ্ঞ মুসলিম নেশন জিন্নাকে বাদশাহ বানাতেও পারত। কিন্তু ন্যাশনালিস্ট হিসাবে তিনি অস্থিরমতি হলেও ডেমোক্রাট হিসাবে স্থিরমতি ছিলেন।

তার মানে তিনি ব্যালটে বিশ্বাস করতেন, বুলেটে নয়। নিতান্ত মরীয়া না হলে তিনি বলতেন না যে তাঁর হাতেও একটা পিস্তল আছে। সেই পিস্তলের নাম ডাইরেক্ট অ্যাকশন। রাশ টানার সাধ্য তাঁর ছিল না, থাকলে মহামারী ঘটে যেত না। খতিয়ে দেখলে মুসলমানই মারা পড়ল বেশী। ভারতবর্ষকে দু'ভাগে বিভক্ত করার ফলে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজও দু'ভাগে বিভক্ত হলো। চার কোটি মুসলমানকে বিপদে ফেলে তিনি পাকিস্তানে নিষ্ক্রমণ করলেন। কংগ্রেস যদি পাকিস্তানের অনুকরণে হিন্দু রাষ্ট্র পত্তন করত মুসলমানদের দশা হতো যাকে বলে 'না ঘরকা না ঘাটকা'। যেমন দশা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর পাঞ্জাবী মুসলমান ফৌজের দ্বারা পরিত্যক্ত বিহারী মুসলমানদের। বাংলাদেশ তাদের রাখতে চায় না, পাকিস্তান তাদের নিতে চায় না। কংগ্রেস স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করে তাদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের অধিকার দিয়েছে। জিন্না সাহেবের ইচ্ছা থাকলেও পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব দিয়ে যেতে পারেন নি। হয়তো দিতেন, যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন। কিন্তু যাঁদের মদদ নিয়ে তিনি তখতে বসেছিলেন সেই মোল্লারাই তাঁকে শাসিয়ে রেখেছিল। আর তাঁর আসল ক্ষমতা চলে গেল তাঁর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের হাতে।

পাকিস্তানী পার্লামেন্টের কাছে কার্যত প্রধানমন্ত্রীই দায়ী। গভর্নর জেনারেল জিন্না বিদ্যমান ভারত শাসন আইন অনুসারে তাঁর পাকিস্তানী পার্লামেন্টের কাছে তিনি দায়ী নন। তাঁর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারি অভ্ স্টেট ফর ইন্ডিয়া। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সেই কর্তৃপক্ষই বা কোথায়? গভর্নর জেনারেল অভ্ পাকিস্তান কারো কাছে দায়ী নন। অথচ নামেই সর্বক্ষমতাবান।

জিন্নাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোয়েটার কাছে এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চিকিৎসকের হেফাজতে। সেখানে নাকি তিনি তাঁর চিকিৎসককে বলেন পার্টিশন হচ্ছে তাঁর জীবনের বৃহত্তম ভুল। সেখান থেকে যখন তাঁকে করাচীতে ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে কেউ বিমানবন্দরে আসেন না। রাস্তায় শুইয়ে রাখা হয় তাঁকে। তাঁর দেহের উপর পিঁপড়েরা ঘুরে বেড়ায়। লক্ষ করেন এক বাঙালী মুসলমান বিমানবন্দর কর্মী। মিনিট দশেক পরে তাঁর মন্ত্রীরা আসেন ও তাঁকে সরানো হয়। করাচীতে জন্ম, করাচীতেই মৃত্যু। কিন্তু ভারতীয় হিসেবে নয়, পাকিস্তানী হিসাবে।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভ্য, দাদাভাই নওরোজীর রাজনৈতিক শিষ্য। ভারতীয় জাতির জাতীয় স্বার্থের প্রহরী! মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা তিনি সমর্থন করতেন না, তাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়। মুসলিম লীগের গোড়ার দিকে তিনি তার সভ্য হননি। মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হওয়ার পর মুসলিম লীগের সভ্য হন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কংগ্রেস ও লীগ দুই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হন কী মনে করে, তখন তিনি উত্তর দেন, 'আমি ভারতের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেসের সভ্য, আর মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাতিরে মুসলিম লীগের সভ্য।' তখনকার দিনে মালবীয়জী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা হিন্দু মহাসভাতেও ছিলেন। বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্রতর স্বার্থের বিরোধ ছিল না। বৃহত্তর স্বার্থ ভারতের স্বরাজ বা হোম রুল। তার প্রথম কিস্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। তাতে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ ক্ষুদ্রতর

তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন, লোকমান্য টিলকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তিনি লখনউতে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদনে অগ্রণী হন। তখন তাঁর উপর আস্থা জাগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের। সরোজিনী নায়ডু বলেন, তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাজদূত। কংগ্রেসের চেয়ে আরো এক পা এগিয়ে তিনি হোম রুল লীগের সভাপতি হন, যার জন্যে অ্যানী বেসান্ট অন্তরীণ হন। জিন্নার প্রতিপত্তি তখন তুঙ্গে। মডারেটদের চেয়ে উচ্চে। এই পর্বে ছেদ পড়ে কংগ্রেস যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে। জিন্নার নীতি ননকোঅপারেশন নয়, রেসিপ্রোকাল কোঅপারেশন। ননভায়োলেন্ট নয়, কনস্টিটিউশনাল। গান্ধী-নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারেন না নীতিগত পার্থক্যের দরুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। গান্ধীজী যখন গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে উদ্যত তখন তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বারদোলি গিয়ে রাত্রিবেলা গান্ধীজীর শিবিরে উপস্থিত হন। বলেন গভর্নমেন্ট সৈন্য আনিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে, আন্দোলন শুরু হলেই গুলী চলবে। সুতরাং আন্দোলনে ঝাঁপ দেবার আগে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই শ্রেয়। তাঁকে নিয়ে জিন্না ও মালবীয় লর্ড রেডিঙের সঙ্গে বসবেন। যদি তিনি রাজী হন। গান্ধীজী রাজী হন না। কিন্তু গণসত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করেন। যেহেতু যুক্ত প্রদেশে চৌরী চৌরা থানা আক্রমণ করে ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশকে পুড়িয়ে মেরেছে সেহেতু দেশ গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত নয়। সিদ্ধান্তটা জিন্নার পরামর্শে কিনা অনুমান সাপেক্ষ।

তৃতীয় পর্বে জিন্না কংগ্রেসের সভ্য নন, অথচ মুসলিম লীগের সভ্য থেকেও তার মডারেটদের একজন নন। তিনি তাঁর স্বকীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি গঠন করেন কেন্দ্রীয় আইনসভায়। সভ্যদের কেউ বা হিন্দু, কেউ বা পার্শী। সবাই যে মুসলমান তা নয়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতে বোঝায় সরকারের থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো বটেই, কংগ্রেসের থেকেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট। স্বরাজ পার্টির সভ্যরা ছিলেন কংগ্রেসের লোক। কংগ্রেস কেবল বিরোধিতাই করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি কখনো কংগ্রেসের পক্ষে ও সরকারের বিপক্ষে ভোট দেয়, কখনো সরকারের পক্ষে ও কংগ্রেসের বিপক্ষে। তৃতীয় পর্বে জিন্না একবার লন্ডনের এক ডিনারে পাকিস্তানের প্রবক্তা চৌধুরী রহমত আলীর দ্বারা নিমন্ত্রিত হন। তাঁকে অনুরোধ করা হয় পাকিস্তানের উদ্যোক্তা হতে। জিন্না বলেন ওটা একটা অবাস্তব স্বপ্ন। তিনি তার পক্ষপাতী নন। ঘটনাটা ১৯৩৪ সালের।

চতুর্থ পর্বে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভার মুসলিম লীগ পার্টি গঠন করেন। বাইরেও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। ভারতের জাতীয় স্বার্থের চেয়ে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থই ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর হতে থাকে। মুসলিম স্বার্থের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবী করে মুসলিম লীগ।

মুসলিম লীগ একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান হলে কংগ্রেসকে হতে হয় অমুসলিম বা হিন্দু প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগ চুক্তি যদি নতুন করে সম্পাদন করতে হয় তবে কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হয় নিছক সাম্প্রদায়িক ভূমিকা। তার কাছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হয় বৃহত্তর। কংগ্রেস কেমন করে রাজী হয়? তাই কংগ্রেস লীগ চুক্তি সম্পন্ন হয় না। কংগ্রেস একাই অধিকাংশ প্রদেশে সরকার গঠন করে। লীগকে অংশ দেয় না। তাছাড়া লীগের পলিসিও কংগ্রেসের সঙ্গে মেলে না। কংগ্রেস সব সময় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগী, লীগ সব সময় নয়। কখনো সহযোগী, কখনো অসহযোগী।

জিন্না তখন থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কংগ্রেসকে কিছুতেই কেন্দ্রীয় স্তরে একক সরকার গঠন করতে দেবেন না। করতে হবে লীগের সহযোগে ও লীগের শর্তে। নতুবা তিনি দাবী করবেন পাকিস্তান ও তার জন্যে লড়বেন কংগ্রেসের সঙ্গে। ইংরেজ যদি কংগ্রেসের পক্ষ নেয় তবে ইংরেজের সঙ্গেও। রক্তপাত হয় হবে। তার ভয়ে তিনি নিরস্ত হবেন না। কাজটা কি সংবিধানসম্মত হবে? না হলেও তিনি পেছোবেন না। তবে তার আগে পাকিস্তানের ইস্যুতে নির্বাচনে লড়বেন অন্যান্য দলের মুসলমান প্রার্থীদের সঙ্গে। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের সঙ্গে তো আলবৎ। ওরা হিন্দুর দলে ভিড়েছে। কংগ্রেসের শো বয়।

ভারতের জাতীয় স্বার্থ? সেটার কি কোনো মানে হয়? ভারত একটা ভৌগোলিক অভিধা। সেখানে দুই নেশনের বাস। হিন্দু আর মুসলমান। মুসলিম নেশনের স্বার্থে চাই স্বতন্ত্র বাসভূমি। হিন্দুস্থানের বাইরে পাকিস্তান। দুই স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর মতো দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থই মুসলিম লীগের ও তাঁর অন্বিষ্ট। তখনো তিনি জাতীয়তাবাদী, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নন। তখন তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদী। যেসব মুসলমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তারা মুসলিম স্বার্থবিরোধী। ধর্মে মুসলমান হওয়া যথেষ্ট নয়, হতে হবে মুসলিম লীগের সভ্য। তাও যথেষ্ট নয়, হতে হবে দুই নেশন তত্ত্ব বিশ্বাসী। বিশ্বাস করতে হবে যে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় নয়, দুই নেশন। যেমন ইংরেজ ও ফরাসী। ফরাসীদের দেশে ইংরেজরা বিদেশী, ইংরেজদের দেশে ফরাসীরা বিদেশী। সেই যুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে হিন্দুরা বিদেশী, হিন্দুস্থানে মুসলমানরা বিদেশী। বিদেশীদের পাইকারী হারে বিনিময় করতে হবে। যেমন গ্রীস থেকে তুরস্কে, তুরস্ক থেকে গ্রীসে। হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান তা হলে পরস্পরের মুলোচ্ছেদ করা।

জিন্না যে প্রত্যয়ে এসে পৌছেছিলেন সেটা প্রত্যক্ষ অসত্য। অসত্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হিংসা। সাত-আটশো বছর একসঙ্গে বসবাসের ইতিহাসে এমনতর মহামারীর নজীর একটাও নেই। যত দোষ নন্দ ঘোষ ইংরেজও এর জন্যে দায়ী নয়। ইতিহাসের কাঠগড়ায় জিন্নাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

তবে তাঁর দিক থেকেও বলবার আছে যুক্তিযুক্ত কিছু কথা। সরকার থাকলেই তার বিরোধীপক্ষ থাকে। সেই বিরোধী পক্ষের অভাব পূরণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেসের। অগ্রণী হয়েছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম প্রমুখ কয়েকজন ইউরোপীয় তথা ভারতীয় নেতা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান। পার্লামেন্টারি কেতা অনুসারে বিরোধী পক্ষই বিকল্প সরকার গঠনের অধিকারী। বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ পেলে কংগ্রেসই সরকারের মসনদে বসবে। সেই সুযোগটা জোটে ১৯৩৭ সালে ছয়টি প্রদেশে। পরে আরো দুটি প্রদেশে। তখন কংগ্রেস সরকারেরও বিরোধী পক্ষ দেখা দেয়। প্রধানত মুসলিম লীগ। পার্লামেন্টারি রীতি অনুসারে কংগ্রেস সরকারের বিকল্প সরকার গঠনের অধিকারী মুসলিম লীগ। কিন্তু মুসলিম লীগের যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানে সে বিকল্প সরকার গঠন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হবে কী করে? কংগ্রেস যখন মসনদ ছেড়ে জেলে চলে যায় তখন মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করতে ডাকা হয় না। সরকারী কর্মচারীরাই মন্ত্রীর পরিবর্তে পরামর্শদাতা হন। সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় মুসলিম লীগ। প্রাদেশিক স্তরেই যদি এ রকম বঞ্চনা ঘটে তবে কেন্দ্রীয় স্তরেও তো সেই রকম ঘটবে। ইংরেজ সরে গেলে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে কংগ্রেস, যেহেতু তারই পার্লামেন্টারি মেজরিটি। কংগ্রেস সরে গেলে লীগকে কি দিল্লীর সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে? সেটা সম্ভব নয়, কারণ তার পার্লামেন্টারি মেজরিটি থাকবে না, থাকা অসম্ভব। তা বলে কি সে চিরকাল বিরোধী পক্ষে থেকে যাবে?

আর কোনো বিকল্প কি নেই? এর উত্তর, আছে, যদি একটি কেন্দ্র না হয়ে দুটি কেন্দ্র হয়। দুই কেন্দ্রের খাতিরে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ইংরেজরাই সেটা সম্পন্ন করে যাক। অন্যথা গৃহযুদ্ধের দ্বারা সেটা রূপায়িত হবে। গৃহযুদ্ধে মুসলিম রেজিমেন্টগুলো যোগ দেবে। মুসলিম জনগণও। হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু ও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবে তলোয়ারের জোরে। তার চেয়ে ভালো হচ্ছে ভদ্রভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে দেওয়া। ব্রিটিশ মধ্যস্থতায়।

ব্রিটিশ মধ্যস্থতায় পাকিস্তান গান্ধীজীর মূলনীতিবিরুদ্ধ। তলোয়ারের জোরে পাকিস্তান, সেটাও তাই। কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে যদি ভারত ভাগ করত তবে তিনি বাধা দিতেন না। সেটা কিন্তু ব্রিটিশ অপসরণের পরে। আগে নয়। জিন্নার জেদ কিন্তু পরে নয়, আগে। শেষ পর্যন্ত সেটা ঘটে সেটা আগেও নয়, পরেও নয়, একই কালে। ব্রিটিশ মধ্যস্থতায়। পনেরোই আগস্ট গান্ধীজী অনশন করেন। তার কংগ্রেস করে উৎসব। সম্ভবপর হিন্দু রাজত্বের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে লীগও করে ধুমধাম।

এ ব্রিটিশ রাজের একমাত্র উত্তরাধিকারী কংগ্রেস নয়, অন্যতর উত্তরাধিকারী মুসলিম লীগ, এটাই স্বীকার করে নিল উভয় পক্ষ। ক্ষমতা ভাগ করে নয়, ভূমি ভাগ করে। যে যার ভূমিতে স্বাধীন। এই মীমাংসাই চূড়ান্ত। গান্ধীজী একে রোধ করতে পারতেন। কিন্তু উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো মীমাংসা নির্দেশ করতে পারতেন না। দুর্বলতর কেন্দ্র আর প্রবলতর প্রদেশ কোনো কাজের নয়। কেন্দ্রেও কংগ্রেস লীগের দ্বৈরাজ্য। দ্বৈরাজ্য পরিণত হতো দুই রাজ্যে। গান্ধীজী তাই নীরবে সায় দেন। মৌন সম্মতি।

কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকের তো সেইখানেই যবনিকাপতন নয়। ট্র্যাজেডির অন্তিম দৃশ্য মহাত্মনিপাত। দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু দুই সম্প্রদায়ের দুঃসহ বেদনাই তাঁকে কাতর করেছিল। ভিতরে ভিতরে তিনি মৃত্যুর জন্যে আকুল হয়েছিলেন। আর জিন্না? আমার তো মনে হয় তিনিও মৃত্যুর জন্যে অধীর হয়েছিলেন। মৃত্যুর শয্যায় কে একজন স্তাবক তাঁকে স্তোক দেন, 'কায়দে আজম, আপনি অনেক দিন বাঁচবেন।' তিনি উষ্মার সুরে বলেন, 'না।' তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তিনি ব্যবহারকর্তা নন। অত্যন্ত অহঙ্কারী পুরুষ, অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হতেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃশেষ। আয়ুও নিঃশেষ।

পাকিস্তানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। খেলায় বাজী ধরে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা কংগ্রেসেরই কৌশলে। কংগ্রেস চেয়েছিল পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ। নইলে দিল্লী নিরাপদ হতো না, কলকাতা হাত করা যেত না। কংগ্রেস চেয়েছিল দিল্লীর একাধিপত্য। সংবিধান সভায় স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি তথা ওয়েটেজ প্রথা বিলোপ। সরকারী চাকরিতে স্বতন্ত্র কোটা তথা ওয়েটেজ বর্জন। মুসলিম লীগকে দেশের ও প্রদেশের একাংশ ছেড়ে না দিলে তো লীগ এসব ছেড়ে দিত না। ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল এটাও অনেকটা সত্য। কংগ্রেস নেতারাই গান্ধীজীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাধাদানে নিবৃত্ত করেন। রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই, জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালানী। আজাদ বাদে। তিনিই এ কাব্যের উপেক্ষিত। খান আবদুল গফফর খান তো বিড়ম্বিত। আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি। ইংরেজকেও না।

গান্ধীজীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ইংরেজ থাকতে হিন্দু মুসলিম সমস্যা মিটবে না, ইংরেজ চলে গেলেই মিটবে। এটাও পূর্ণ সত্য নয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মোগল ও মারাঠার মধ্যেও ছিল। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা ছিল শিয়া রাজ্য, মোগল সম্রাটরা সুন্নী। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা সরাসরি ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখত, দিল্লীর আধিপত্য মানত না। ওদের পদানত না করে আওরংজেবের স্বস্তি ছিল না। একচ্ছত্র হতে কেউ পারেননি, অশোকও না, আকবরও না, আওরংজেবও না। এমন যে দেশ তাকে এক শাসনাধীন করা চক্রবর্তীদের সাধ্য নয় বলেই ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছিল। ব্রিটিশ অপসারণের পর আবার সাধ্যাতীত হতো। এটাই আমাদের ইতিহাসের লিখন। মোগল ও মারাঠার স্থান নেয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। ইংরেজ গেলে ওরা লড়তে লড়তে দুর্বল হতো, তখন তৃতীয় কোনো এক শক্তি গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ থামিয়ে নিজে গরুড় হতো।

মুসলমানরা সবাই স্বেচ্ছায় কংগ্রেসে যোগ দেবে এটা গান্ধীজীর মোহ। তেমনি জিন্না সাহেবের মোহ মুসলমানরা সবাই স্বেচ্ছায় মুসলিম লীগে যোগ দেবে। কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতবর্ষ এটা সত্য নয়। তেমনি লীগই হচ্ছে মুসলিম ভারত এটাও নয় সত্য। হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান মুসলমানই থাকবে, দুই জুড়ে গিয়ে এক ভারতীয় হবে এ তত্ত্ব কার্যত পরাহত হয়েছে। হিন্দুকে সেকুলার হতে হবে, মুসলমানকে সেকুলার হতে হবে, সেকুলারের সঙ্গে সেকুলার মিলে এক হবে, এর জন্যে যদি দু'তিন শতক সময় লাগে তো সেটাও এমন কিছু বেশী সময় নয় আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। ব্যক্তিগত জীবনে যে যা খুশি হোক, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাই শ্রেয়। জিন্নাও এটা জানতেন, কিন্তু তাঁর দলবলের হিন্দু ভীতি ও ইংরেজ প্রীতি তাঁকে মুখ্য স্রোত থেকে পৃথক স্রোতে চালিত করে। দেশভাগের পর চেতনা হয়, কিন্তু সেই পৃথক স্রোতের শক্তি তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে প্রবল। গান্ধীজীর কাছে যিনি হার মানলেন না, তিনি মোল্লাদের কাছে মানলেন। বেঁচে থাকলে মিলিটারির কাছেও মানতেন। পাকিস্তান পড়ে মোল্লা মিলিটারির যৌথ কবলে। পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি পায়। কিন্তু পরে তারও একই পরিণতি। মুক্তিদাতা মুজিব নিহত।

ভারতীয় মুসলমানদের শিকড় যে ভারতে, পাকিস্তানে নয়, আরবে নয়, ইরানে নয়, মধ্য এশিয়ায় নয় এটা উপলব্ধি করতেও আরো সময় লাগবে। আর হিন্দুদেরও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে ভারত আর হিন্দু একার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে প্রাচীন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেকার। অগ্রাধিকার যদি কারো থাকে তবে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের রেড ইণ্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়। হিন্দু নয়। সবাইকে হিন্দু বানাবার উদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। জিন্না প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মীয় না করে পর করে দেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবনকামী শাখা। প্যান-ইসলামিজমের মতো প্যান-হিন্দুইজম। জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগের পশ্চাতে সেটাও কাজ করছিল। ভারতীয় হতে হলে হিন্দু হতে হবে এমনতর দাবী কেউ করেনি, কিন্তু 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে, অন্তত গানের সময় উঠে দাঁড়াতে হবে, এটাও ভারতীয়তার নামে হিন্দুত্ব চাপানোর দাবী। অধিকাংশ বাঙালীর বাসভূমি আজ যার নাম বাংলাদেশ, সে দেশে 'বন্দে মাতরম' কেউ গায় না। প্রায় দশ কোটি বাঙালী তাকে অস্বীকার করেছে।

রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয়নি পাকিস্তানও তেমনি একদিনে সংস্থাপিত হয়নি। তার শিলান্যাস হয় গহপ্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে। মুসলিম দরবারীরা যখন বড়লাটের সকাশে গিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির আর্জি পেশ করেন জিন্না তখন তার বিরোধী ছিলেন। অথচ সেদিনকার সেই জিন্নাই বিশ বছর বাদে কট্টর স্বতন্ত্র নির্বাচনবাদী। সার আলী ইমাম ইতিমধ্যেই অনুতপ্ত হয়ে বলেছেন, 'এই হতভাগা হাত দিয়ে আমি সেই কাগজে সই করেছিলম।' জিন্নার মনেও দ্বিধা ছিল। তিনি বার বার প্রস্তাব করেছেন যে তিনি যৌথ নির্বাচনে রাজী হবেন, যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের আরো ওয়েটেজ দেওয়া হয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওয়েটেজ লোপ করা হয়। হিন্দুরা রাজী হবে কেন? হিন্দুদের খরচে কংগ্রেসই বা রাজী হবে কী করে? জিন্না নিজেই ১৯১৬ সালে যে চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করেছিলেন এটা সেই চুক্তির খেলাপ। তবে এর একটা ভালো দিক ছিল। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হলে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর-নির্ভর হতো। মুসলিম লীগ হয়তো ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অবিভক্ত বঙ্গে জয়লাভ করত না। ফলে বঙ্গভঙ্গ হতো না। এটা সম্ভব হলো ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর রোয়েদাদে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রেখে বাঙালী হিন্দুদের ওয়েটেজ রদ করায়। শুধু তাই নয়, তাদের আসনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়ায়। বাঙালী হিন্দুরা ওয়েটেজও হারাল, যৌথ নির্বাচনও পেল না।

পার্টিশনের প্রবাহে বঙ্গকে অবিভক্ত রেখে ভারতের তথা পাকিস্তানের বাইরে রাখার একটা প্রস্তাবও উঠেছিল। হিন্দুরা মুসলিম মেজরিটি মেনে নিত, ওয়েটেজ চাইত না, যদি লীগপন্থী মুসলমানরা যৌথ নির্বাচনে রাজী হতো। তারা নারাজ, তাই কথাবার্তা ভেস্তে যায়। জিন্না স্বতন্ত্র বঙ্গে রাজী ছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন ছাড়তে নারাজ। তা হলে কি স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব? বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচন, স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। আবার বঙ্গভঙ্গ। মাঝখানে চল্লিশ বছর।"[১৬৬] —অন্নদাশঙ্কর রায়

---

১৬৬. শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়/জিন্না, পাকিস্তান, নতুন ভাবনা। [মিত্র ও ঘোষ (কলিকাতা)– ১৩৯৬ বাং। পৃ. ভূমিকা]

ষোলো

"...Never was there a nature whose outer qualities provided so complete an antithesis of its inner worth. Tall and stately, but thin to the point of emaciation, languid and luxurious of habit, Mohammad Ali Jinnah's attenuated form is the deceptive sheath of a spirit of exceptional vitality and endurance."[১৬৭] –Sarojini Naidu

সতেরো

"...গান্ধী আমার জীবনের ধ্রুবতারা। জিন্না রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন তাঁর প্রতিপক্ষই ছিলেন না, জীবনচর্যার দিক থেকেও এক ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। তবুও কেন যে আমি পাকিস্তানের জনক কায়েদে-এ-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার সম্বন্ধে আলোচনা করতে মনস্থ করেছি, তার কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

এর কারণ গান্ধীর শিক্ষাতেই নিহিত। তিনি ছিলেন সত্য-সাধক। সত্যের সন্ধানে নিজের জীবনের গোপনতম দুর্বলতাসমূহকেও লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরতে তিনি বিধাবোধ করেন নি। তাঁর আত্মকথার পাঠক সত্যের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন। জননেতা — বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মী নিজের চাল কার্যকলাপকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেন। নচেৎ তাঁর জনপ্রিয়তা কুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা। আর জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনই তো রাজনৈতিক নেতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। গান্ধী বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি পরবর্তী কালে নয় — নিজের প্রবর্তিত আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বলতে পারেন যে তাঁর ঐ কার্য 'হিমালয় সদৃশ ভ্রান্তি'র দ্যোতক। গান্ধীর জীবন ও উক্তি থেকে এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান লেখকের রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আশেপাশে। মুসলিম লীগ এবং তার নেতা জিন্না তখন স্বাধীনতাপ্রেমী দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাদের জাতীয়কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত। তার ছাপ অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরও পড়েছিল। ধীরে ধীরে মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে জিন্না মানেই সাম্প্রদায়িক এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত, তাদেরই স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র। প্রত্যুত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান লেখক যখন যথাসাধ্য আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, মুসলিম লীগের তখনকার ভূমিকার জন্য তার নেতা জিন্নাকে দেশদ্রোহী মনে হত। তারপর ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের কর্মী এবং দেশে যখন এক মহা নাটকের বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তখন তো আরও অনেক দেশবাসীর মত নেতিবাদী জিন্নাকে এর খল নায়ক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি নি।

প্রায় ঐ সময়েই আমি অবশ্য জিন্না সম্বন্ধে জওহরলালজীর নিম্নোক্ত মন্তব্য পড়ার সুযোগ পাই:

'যাই হোক, কিছু কিছু পুরাতন নেতা কলকাতা কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং তাঁদের মধ্যে জিন্না ছিলেন এক জনপ্রিয় ও বিখ্যাত ব্যক্তি। সরোজিনী নাইডু তাঁকে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' আখ্যা দিয়েছিলেন। অতীতে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার কৃতিত্ব বহুলাংশে ছিল তাঁরই।'

কিন্তু জওহরলালজীর পূর্বোক্ত স্বীকৃতির তাৎপর্য তখন আমি অনুধাবন করতে পারিনি। সম্ভবত সেই চল্লিশের দশকের আবেগমণ্ডিত পরিস্থিতিই ছিল এর কারণ। সুতরাং আমার কাছে জিন্না প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদীই রয়ে গেলেন।

---

১৬৭. Source : Matlubul Hasan Saiyid/Mohammad Ali Jinnah : A political Study | Sh. Muhammad Ashraf (Lahore)- 1962| p. 51|

মনের বদ্ধ অর্গলে প্রথম আঘাত পড়ল পঞ্চাশের দশকে। আচার্য কৃপালনী প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী 'ভিজিল' পত্রিকায় হাসু কেবলরমানীর 'পাকিস্তান একসরেইড' প্রবন্ধমালায় ১১ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানদের উত্তাল ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার চতুর্থ দিনে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের সামনে জিন্নার প্রথম বক্তৃতার অংশবিশেষ পড়লাম। পরে ঐ বক্তৃতা জিন্নার এক জীবনীতেও উদ্ধৃত হয়। তিনি বলেছিলেনঃ

'আপনারা স্বাধীন। এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে আপনাদের ইচ্ছামত মন্দির মসজিদ অথবা অপর যে কোন উপাসনাস্থলে যাবার অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে এই মূল নীতির কোন সম্পর্ক নেই যে আমরা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী। আমার মতে এই নীতিকে আমাদের আদর্শ রূপে সদাজাগরূক রাখা কর্তব্য। তাহলে আপনারা দেখবেন যে কালক্রমে হিন্দুরা আর হিন্দু এবং মুসলমানরা আর মুসলমান থাকবে না ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে নয়, কারণ সেটা হল প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন এ হল রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।'

আমি যেন জিন্নাকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। জিন্নার বক্তৃতার ঐ অংশ আমি অন্ততঃ যেসব বহুল প্রচারিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র পড়তাম তাতে প্রকাশিত হয় নি। আর হলেও আমার নজরে পড়েনি। তাই হাসু কেবলরমানীর রচনায় ঐ উদ্ধৃতি পড়ে চমকিত হলাম। এ তো কোন সাম্প্রদায়িকতাবাদীর উক্তি হতে পারে না।

ঐ পর্যায়ের অপর একটি প্রবন্ধে হাসু কেবলরমানী জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার কিছুদিনের মধ্যেই জিন্না সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফর খাঁর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারণ নবসৃষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধান হবার পর তিনি যাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্যে জিন্না স্বস্তিবোধ করছিলেন না। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং তার পরিণতিতে ১১ই সেপ্টেম্বরে তাঁর মৃত্যু জিন্নার এই ইচ্ছার পরিপূর্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মস্মৃতি 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থটি পড়ার পর ভারত বিভাজনের দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার খোরাক পেলাম। মৌলানা লিখেছেন যে উত্তর (তখন সংযুক্ত) প্রদেশে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন কংগ্রেস ও লীগ একরকম সম্মিলিত ভাবে লড়ে। দুই দলের মধ্যে মোটামুটি এই বোঝাপড়া ছিল যে সম্মিলিত ভাবে উভয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে লীগকেও মন্ত্রিসভায় উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে। কিন্তু সময়কালে জওহরলালজীসহ উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী নেতৃবর্গ পূর্বপ্রতিশ্রুতি মানতে চাইলেন না। তাঁরা দাবি করলেন যে মন্ত্রিসভায় স্থান পেতে হলে বিধান সভার লীগ সদস্যদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্জন করতে হবে। তাই স্বভাবত:ই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মৌলানা আজাদ বলেছেন :

'উত্তর প্রদেশের লীগের সহযোগিতার প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হত, তাহলে কার্যতঃ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যেত। জওহরলালের কাজের ফলে উত্তর প্রদেশের লীগ যেন নবজীবন পেল। ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রত্যেক ছাত্রই জানেন যে উত্তর প্রদেশ থেকেই লীগ পুনঃসংগঠিত হয়। শ্রীযুক্ত জিন্না ঐ অবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিলেন এবং এমন এক আক্রমণ শুরু করলেন যার পরিণামে পাকিস্তানের জন্ম হল।'

মৌলানার গ্রন্থ তাঁর 'বন্ধু ও সাথী' জওহরলালকে উৎসর্গীকৃত এবং নেহরুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। তিনি কখনও মৌলানার এই গুরত্বপূর্ণ উক্তির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানা নেই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মকথা পড়ার সময়ও এই ঘটনার উল্লেখ পাই, যদিও ঐ আত্মকথারই এক অংশে সৌম্যভাষী রাজেন্দ্রবাবু জওহরলালজীর কাজের সপক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেও জওহরলাল ঐরকম আরেকটি মারাত্মক ভুল করেন যার ফলে জিন্না সীমাবদ্ধ ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবও আর মানতে অস্বীকার করেন।

জিন্না সম্বন্ধে নতুন করে মূল্যায়ন করার আগ্রহের সৃষ্টি হল গান্ধী শতবার্ষিকীতে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রবীণ সাংবাদিক বি. শিবরাও-এর জিন্না সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম, পরে যা তাঁর একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। শিবরাও-এর জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

বিশের দশকের জিন্নার সঙ্গে আলাপচারির উল্লেখ করে শিবরাও জানাচ্ছেন :

'শ্রীমতী বেসান্ত এবং অন্যান্য লিবারালরা যে কারণে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে বিপজ্জনক মনে করতেন জিন্নাও সেই কারণে তার বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর খিলাফৎ আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে তাঁর মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অজ্ঞ এবং ধর্মান্ধ মুসলমানদের আন্দোলনের সহকর্মী করাকে তিনি একান্তভাবে অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করতেন।'

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মোতিলাল নেহরুর গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের সমর্থনে শাসকদের উদ্দেশে তিনি বলেনঃ 'ভারত এক জাতি নয়, এখন একথা আমাদের বলা হচ্ছে। যখন মহাযুদ্ধ চলছিল এবং ভারতবাসীকে রক্ত ও অর্থ দেবার আবেদন জানানো হয়েছিল, তখন আমরা এক জাতি ছিলাম ...যখন আমরা দায়িত্বশীল সরকার, সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তির দিকে যথোচিত পরিমাণে অগ্রসর হবার দাবি জানাচ্ছি তখন শুনতে পাচ্ছি যে আমরা এক জাতি অথবা এক রাষ্ট্র নই।'

একথা সর্বজনবিদিত যে লিবারাল ও সংবিধানপন্থী জিন্না গান্ধীর অসহযোগ কর্মসূচির সঙ্গে সহমত হতে না পেরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসের পর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দেও মাহমুদাবাদের রাজা যিনি নিজেকে প্রথমে মুসলমান মনে করতেন, তাঁকে জিন্না কঠোরভাবে বলেছিলেন যে 'না, তিনি প্রথমে ভারতবাসী পরে নিজেকে মুসলমান' বিবেচনা করবেন। অন্ততঃ ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি যে জাতীয়তাবাদী ছিলেন একথা তাঁর সমালোচকের পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন অতি প্রবীণ গান্ধীপন্থী শিক্ষব্রতী এবং গঠনকর্মীর কাছে শুনেছি যে তাঁদের যৌবনে অর্থাৎ ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার বক্তৃতায়। সেসব সেকালে মদ্রাজের নটেশন কোম্পানী পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করে প্রচার করত।

দাদাভাই নৌরজী ও ফিরোজ শা মেটার শিষ্য জিন্না কেবল বিলাতফেরত বিখ্যাত ব্যারিস্টারই ছিলেন না, চলন-বলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার এবং মানসিকতার দিক থেকেও ছিলেন সেকালের প্রথা অনুযায়ী পাক্কা সাহেব। নিয়মিত নমাজ পড়া অথবা দাড়ি রাখা ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানদের বাহ্য অভিজ্ঞানের তিনি ধার ধারতেন না। পাঞ্জাবী মুসলমানদের সালোয়ার কুর্তা অথবা যাকে জিন্না টুপি বলা হয়, সেসব পরা (তাও কালেভদ্রে, কোট-প্যান্টেই তিনি বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। শুরু করেন তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। গোখলে জিন্না সম্বন্ধে বলতেন যে তিনি হলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। জিন্নাও গোখলে এবং তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এবং তিলকের বিরুদ্ধে সরকার যখন রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে তখন আদালতে জিন্না অত্যন্ত প্রবলভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকের কার্যকলাপ দেখে সরোজিনী নাইডুও অনুরূপ মন্তব্য করেন। এরকম মানুষ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার করবেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি ভারত বিভাজন করে স্থাপিত পাকিস্তানরূপী সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্রষ্টা হবেন ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়।

জিন্না সেকালের মুসলমান সমাজের গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করে পর্দাবিহীন নিজ পত্নীকে সভা-সমিতি এবং এমনকি লাট ভবনেও নিয়ে যেতেন। মানসিক বিষাদ রোগে আক্রান্ত বেগম জিন্নার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়ে গেলে এবং অকালে তিনি জিন্নৎবাসিনী না হলে হয়ত বা ভারতীয় মুসলমান নারীদের মধ্যে

আধুনিকতা প্রবর্তনের নেত্রীও হতে পারতেন। বি. শিবরাও শুনেছেন যে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একদিন জিন্না 'বোম্বে ক্রনিকাল' দৈনিক পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক হর্নিম্যানকে বলেছিলেন, 'মুসলমানদের যে সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম তাঁরা দশাবতারে বিশ্বাসী এবং উত্তরাধিকার আইন ও সামাজিক প্রথার দিক থেকেও হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের বহুল সামঞ্জস্য আছে।' আর এটা আদৌ অবিশ্বাস্য নয়। কারণ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত বলে হিন্দুসমাজের চালচলন ও প্রথার রেশ তাঁদের মধ্যে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। জিন্না এই পরিমাণ ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত ছিলেন যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একবার দিল্লীতে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুকে হালকা মেজাজে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় আমি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা সমাধান বাতলাতে পারি। আপনারা গোঁড়া পুরোহিতশ্রেণীকে উৎসাদন করুন এবং আমরাও আমাদের মোল্লাদের ধ্বংস করি–তাহলে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।'

সমসাময়িক লেখকরা জিন্নার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁকে চূড়ান্ত বাস্তবতানিষ্ঠ, অহমিকাপূর্ণ, রগচটা, উন্নাসিক ও গজদন্ত-গোপুরম-নিবাসী মনে হয়। অনেকে বলেন যে তাঁর ভিতর মানবীয় আবেগের ন্যূনতা ছিল। এমন কি তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চাগলারও অভিমত হলঃ 'জিন্নার মত এমন মানবীয় সংবেদনশীলতা বিবর্জিত আর কোন মানুষের সম্পর্কে আমাকে আসতে হয় নি। তাঁর আচরণ ছিল হিমশীতল ভাবাবেগহীন। আইন এবং রাজনীতি ছাড়া অপর কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর অভিরুচি ছিল না।' কিন্তু সত্যসত্যই কি তাই? এমন ঘটনার কি নজীর নেই যখন তিনি সাধারণ মানুষের মত আচরণ করছেন, যে মানুষ আবেগতাড়িত এবং ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে চায়? সম্প্রতি কতকগুলি ঘটনার কথা জানা গেছে যার কারণ জিন্নার হিমশীতল এবং মানুষের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবমূর্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জিন্নার স্ত্রীর শেষকৃত্যের সাক্ষী হবার বিরল সুযোগ চাগলা পেয়েছিলেন। জিন্নার সেই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ 'সেই একবার মাত্র আমি জিন্নার আচরণে মানবীয় দুর্বলতার ছায়া প্রত্যক্ষ করেছিলামঃ প্রত্যুত তাঁর চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হয়েছিল।' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার এক প্রবন্ধে এই ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে যে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান জিন্না তাঁর মোটরগাড়ির বিশ্বস্ত চালক মহম্মদ হানিফ আজাদকে নিজের কামরায় ডেকে একটি বিশেষ আলমারি খুলে তাঁর পরলোকগত পত্নীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় বার করে তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখতে আদেশ করতেন। 'দীর্ঘকাল নিঃশব্দে সেই বস্তুগুলির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় তাঁর চক্ষু সজল হয়ে উঠত।'

জিন্নার অন্যতম জীবনীকার হেক্টর বলিথো তাঁর তরুণদের সান্নিধ্যপ্রেমের কথা লিখেছেন, যা 'এক নিঃসঙ্গ বয়স্ক ব্যক্তির ব্যর্থ পিতৃমানসিকতার পরিচায়ক।' একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে কোন এক নিশীথে জিন্না, 'এই কারণে ঘুমোতে পারেন নি যে তাঁর বাড়িতে অতিথি তাঁর এক বন্ধুপুত্র এবং তার সঙ্গী 'তার পরদিবস চলে যাবে।' তাঁর জীবনীকার আরও লিখেছেন যে বিখ্যাত হবার বহুদিন পরও জিন্না একবার কোন এক বন্ধুর শিশুপুত্রের জন্য দোল খাওয়া কাঠের ঘোড়া কেনার উদ্দেশ্যে কেমন ভাবে কোন দিকে দৃকপাত না করে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খেলনার দোকানের দিকে ধাওয়া করেছিলেন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধে লেখক জানাচ্ছেন যে তদানীন্তন বিখ্যাত নেতা জিন্না কি ভাবে তাঁর ব্যস্ত কার্যক্রমের ভিতর থেকে সময় বার করে আগ্রায় গিয়ে এক নগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি হিন্দু যুবকের পক্ষ সমর্থন করে তাকে বিপন্মুক্ত করেছিলেন। বোম্বের বিখ্যাত ব্যারিস্টার এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পূর্বে আইনের পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও একটি যুবকের ভবিষ্যৎ এবং তার পিতার মনোভাবের কথা উপলব্ধি করে জিন্না আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ঐ কার্য করেছিলেন। জিন্নার ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য দিক বসন্ত কৃপালনীর আত্মস্মৃতিমলক ঐ রচনায় ফুটে উঠেছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষভাগে জিন্না যখন হিন্দুবিদ্বেষীরূপে তীব্রভাবে নিন্দিত তখন তাঁর জন্মস্থান করাচীর এক হিন্দু বন্ধুর পুত্র বসন্ত কৃপালনীর সনির্বন্ধ অনুরোধে আগ্রার জনৈক হিন্দু ব্যবসায়ীর প্রতি

করুণাপরবশ হয়ে আদালতে তাঁর পুত্রের পক্ষ সমর্থন করার জন্য তিনি রাজী হন। যুবকটির বিরুদ্ধে সেখানকার সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এইজন্য সাজানো মামলা দায়ের করেছিল যে সে তাদের উৎকোচ দিতে অস্বীকার করেছে। হিন্দু ভগবান ধোণ্ডে তখন জিন্নার ব্যক্তিগত পরিচারক এবং কৃপালনীর মতে কায়েদ-এ-আজম 'তার প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং সে ছিল তাঁর প্রায় সব সময়ের সহচর।' কৃপালনী আরও জানিয়েছেন যে কেবল তাঁকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করার জন্য জিন্না তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত সহায়কের পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কৃপালনী স্বেচ্ছায় সে কাজ ছেড়ে দেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জিন্নার মানবীয় দিক সম্বন্ধে এরকম আরও বহু ঘটনা খুঁজে বার করা যেতে পারে। জিন্নার মত মানসিকতা ও পৃষ্ঠভূমির একজন কুশাগ্র বুদ্ধির মানুষ ভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পাকিস্তান নামক এক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের জনক হবেন এ যেন ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়জনক রহস্য।'[১৬৮]

আঠারো

'...মরুক্রাইস্টপীর মতে অবকাশই যদি নাগরিকত্বের যথার্থ পরিচয় হয়ে থাকে, তা হলে সত্যিকার নাগরিকদের সন্ধান পাওয়া যাবে 'রাজপুতানা' জাহাজে। আমাদের আহার্য গ্রহণের অবসর রয়েছে; কিন্তু আমাদের রাজনীতিকদের শারীরিক গঠন দেখে মনে হয় যে, তাদের সেই আশীর্বাদপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের অবকাশ খুবই কম। সন্তরণরত, ডুবন্ত, ডেকের প্রাঙ্গণে টেনিস খেলায় ব্যতিব্যস্ত কিংবা ব্রিজ খেলায় নিমগ্ন ও পানাসক্ত মানুষকে দেখবার অবসর এবং সর্বোপরি অফুরন্ত কথা বলবার অবকাশও আমাদের রয়েছে; কারণ, আমাদের জাহাজেই আছেন ভারতের দু'জন শ্রেষ্ঠতম বক্তা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, কথা বলাই তাঁদের পেশা; কিন্তু এখানে তাদের দ্বিতীয় পেশার সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বাধাবন্ধকতা থেকে বহু দূরে এসে তারা মুক্তমনে ও মধুরতম সারল্যে কথা বলছেন।

এ-কথাটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, জাহাজটি দুটি আলাদা ভাগে বিভক্ত ছিলো এ্যাংলো ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়া। বিদেশ-যাত্রী সব জাহাজই এ-ধরনের দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। আমি ইচ্ছা করেই স্বদেশ-যাত্রী শব্দটি ব্যবহার করছি না। সময় সময় এ্যাংলো ইন্ডিয়া সদয় হয়ে ওঠে, কিন্তু সাধারণত তা হয়ে থাকে কোনো 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত' হয়ে কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে। এর ফলে ভারতবাসীদেরকে তাদের নিজেদের অবলম্বনের ওপরই নির্ভরশীল হতে হয়, এবং সাধারণত তারা সমবেত হয় ডেকে, লাউঞ্জে অথবা খাবার টেবিলে। হীনমন্যতাবোধের কথা যারা বলে থাকেন তাদের কাছে হয়তো এটি কিছুটা হতবুদ্ধিজনক বলেই মনে হবে। কিন্তু আমি জাহাজে এমন কোনো ভারতবাসী আছেন বলেই জানি না যিনি উচ্চমন্যতাবোধে আক্রান্ত নন। নিজের দেশের বাইরে গেলে ভারতবাসীরা পৃথিবীটা তাদের উপকারার্থই সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে করে। সে থিউডেকটেসের হেলেনের মতোই অনুভব করে :

গোলামের নামের সাথে জড়িয়ে কে আমাকে ভর্ৎসনা করতে সাহস পায় যখন অমর দেবতাদের থেকে দুই দিকেই খুঁজে পাই আমার বংশের পরিচয়? অবশ্য সে তার বংশের পরিচয় খুঁজে পায় এ-কথাটি বলাও একটা কায়দা বিশেষ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক সভ্যতা বস্তুতই একটা অত্যন্ত পরীক্ষামূলক ব্যাপার। উদাহরণ : শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার একে একটি হতবুদ্ধিজনক বিষয় হিসেবেই দেখেন। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে আজকে তিনি রাত্রিবাসের এক প্রস্থ সিল্কের স্যুট পরিধান করেছেন এবং সেই জন্যে লজ্জা অনুভব করছেন, পাছে অন্যেরা তাঁকে হঠাৎ এ ধরনের সিল্কের নেকটাই পরিধান করতে দেখে 'অপ্রয়োজনীয় উৎসাহ' প্রকাশ করে কিংবা অনাহূত অভিনন্দন জানায়, সেই ভয়ে তিনি সামনের দিকের

১৬৮. শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়/জিন্না, পাকিস্তান, নতুন ভাবনা। মিত্র ও ঘোষ (কলিকাতা)– ১৩৯৬ বাং। পৃ. ১-৯

খাটো অংশটুকু মাফলার দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তিনি তাঁর বাহুর নীচে কুক-সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী নিয়েই ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন এবং বিশেষত তাতে রাইবেরা ও এ মহাদেশ সংক্রান্ত অংশটুকু রয়েছে। তিনি এ আন্তমহাদেশীয় সব বিষয়ই অবগত আছেন।

অবশ্য মি. জিন্নাহ এ অবস্থা বিশেষের সর্বাঙ্গীন সুযোগই গ্রহণ করছিলেন। আজকে লোহিত সাগরের তাপ প্রায় দুই ডিগ্রী নিচে নেমে যাওয়ায় মি. জিন্নাহ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে তীক্ষ অথচ গুমোট বাতাসের জন্য একটি র‍্যাপার জড়িয়ে আমার ডেক চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখতে পেলেন। মি. জিন্নাহ তাঁর স্বাভাবিক রসিকতার সঙ্গে শ্রীণিবাস আয়েঙ্গারের কাছে একটি কম্বল ধার চাইলেন। মি. জিন্নাহর হাস্যরসের জন্যেই অনেকটা ইতস্ততার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো।

আমি এ প্রবন্ধের গোড়াতেই স্বীকার করেছি যে, জাহাজে আমাদের প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। এর অধিকাংশই ছিলো অনেকটা রাজনীতি বিষয়ক। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহই আইন-পরিষদের সাইমন কমিশন সংক্রান্ত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে এই-ই আশা করেছিলেন যে, চেম্বার থেকে যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্ম নিয়েছে তা সত্যিকার মিলনের মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত। সিন্ধুসংক্রান্ত বিষয়, রিজারভেশন মারফত প্রতিনিধি প্রেরণব্যবস্থা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ সংক্রান্ত ছোটখাটো মতানৈক্য এ মুহূর্তের জন্যে সব রকম ঐক্যের আশায় ভাঙ্গনের সৃষ্টি করেছে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, 'দিল্লীতে গৃহীত একটি সম্মিলিত কার্যসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমাকে তিনজন সহকর্মী নেতা দিন, তাহলে 'স্বরাজ' শুধু স্বপ্নের ব্যাপার হয়েই থাকবে না, রাজনীতির বাস্তব এলাকায়ও এসে যাবে।' আমি মি. জিন্নাহকে উল্লিখিত নেতাদের নাম জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : 'পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও লালা লাজপত রায়।' তিনি আরো বললেন, 'সর্বপ্রথম যে সমস্যার সমাধান প্রয়োজন তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমস্যা। এ শুধু একটি গালভরা বুলিই নয়, এটি একটি বাস্তব প্রস্তাব। আমি এ জাহাজে সব রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ভারতবাসীদের সাথে আলাপ করেছি এবং তারা প্রত্যেকেই উল্লেখিত বিষয়ের সমাধানে ভারতীয় নেতাদের অসামর্থ্যতার জন্য পরিতাপ প্রকাশ করেছে। এ তিনটি বিষয়ে কোনোরূপ আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, কি নতি স্বীকার করা হয়, তা হলে কি জাতি বিভক্ত কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে? মনে করা যাক যে, আমি সে-সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। আমি বলতে চাই যে, তখন জাতির সম্মিলিত আওয়াজ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।' আমি তাঁকে বললাম, বিশ্বস্তসূত্রে আমি এরূপ গুজব শুনতে পেয়েছি যে, কোনো কোনো নেতা বাস্তবক্ষেত্রে এ সমস্যার সমাধান কামনা করেন না। তিনি এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই কিছুটা ক্রিয়া করেছে। তিনি নিজেও বিশ্বস্তসূত্রে এসব খবরাখবর শুনতে পেয়েছেন কিন্তু তিনি বললেন, 'তুমি শুনে অবাক হবে যে, জাতীয় বিষয়ে জনসাধারণ আন্তরিকভাবেই আমাদের সঙ্গে রয়েছে; এবং এ-জন্যেই সাইমন কমিশনকে অভিনন্দিত করার জন্য বোম্বাই-এ যে হরতাল প্রতিপালিত হয় তা এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো। সত্যিই বলছি, আমি সেদিন যদি আমার সহকর্মীদের নিয়ে বোম্বাই যেতাম তাহলেও আমাদের জন্য কোনো দোকানই খোলা থাকতো না, কিন্তু আমরা না গেলেও সেই পরিস্থিতিতে হরতাল প্রতিপালন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। আমি বলেছিলাম যে, সম্ভবত সেই পরিস্থিতির অন্যতম দু:খজনক ব্যাপার এ ছিলো যে, আমাদের অনেক নেতাই সেদিন অতি পুরাতন পদ্ধতিতে একটি আধুনিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় ব্যাপৃত ছিলেন। শুধুমাত্র গরুর গাড়ি পরিচালনার বিদ্যা নিয়ে 'রোলস রয়েস' চালানো কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা মিসর সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। স্যার অস্টেন চেম্বারলেইন-এর মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে মিসরবাসীরা কেমন করে সাফল্য অর্জন করলো এবং আমরা কেন লর্ড বাইরকেন হেডে-র বেলায় তা করতে পারলাম না? যে-মুহূর্তে স্যার অস্টেন চেম্বারলেইন মিসরের প্রতি কোনো অশোভন উক্তি করবেন, তখনই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দল বেঁধে বেরিয়ে আসবে এবং প্রতিবাদে কালো পতাকা প্রদর্শন ও মিছিল পরিচালনা করবে। আমরা একমাত্র সজ্ঞেরই অভাব অনুভব করি এবং সে-সজ্ঞ উত্তেজনার নয় — অর্থনৈতিক ভিত্তির। আমি মনে করি তিনি সংহত শ্রমের সম্ভাবনাময় শক্তি সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছেন।

আমরা গান্ধী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তাকে জড়িত করার জন্যে মহাত্মা গান্ধী ও উমর সোবহানী যে প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন মি. জিন্নাহ কৌতুকের সঙ্গে তার আবেগী পরোক্ষে তা বিবৃত করছিলেন। তিনি বললেন যে, এ আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। আমি বললাম যে, তিনি ভুল বুঝেছিলেন। এ আন্দোলন প্রায় সাফল্য অর্জন করছিল এ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ এ যে, মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক ছিলেন না। মি. জিন্নাহ এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হন এবং বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যদি লেনিনের সামান্যতম অংশও থাকতো তা হলে গত কয় বছরের ইতিহাস অন্যরূপ দাঁড়াতো। তিনি বললেন, 'গান্ধী রাজনৈতিক নন, তবে আমি কামনা করেছিলাম যে, তিনি যদি তা হতেন।'

কোনো কোনো বিষণ্ন মুহূর্তে জিন্নাহর সারল্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করে। তিনি হচ্ছেন সেই দুর্লভ ব্যক্তিদের একজন যাঁদের কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই এবং যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করেন না। তাঁর সাধুতা প্রশ্নাতীত এবং তিনিই হচ্ছেন নির্জনতম ব্যক্তি। নিজেই একটা দলের মর্যাদা লাভ না করা পর্যন্ত তিনি কখনো কোনো দলে যোগ দেননি। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি অন্যের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে অস্বীকৃত ছিলেন (উদাহরণ : ১৯২৪ সালের জাতীয়তাবাদী পার্টির উল্লেখ করা যেতে পারে) বরং তিনি কখনো তাঁর সাধুতার প্রশ্নে কারো সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ-বিষয়ে তাঁর আইন-ব্যবসা সংক্রান্ত একটি সুপরিচিত গল্প আছে, যা মানুষ জিন্নাহকে চিনে নিতে সাহায্য করে। একদা জনৈক মক্কেল মি. জিন্নাহর কাছে আসেন এবং তার পরামর্শ প্রার্থনা করেন। মোকদ্দমার নথিপত্র ছিলো বিপুল, এবং জিন্নাহর দাবিকৃত ফি'র অঙ্কও ছিলো বেশ মোটা। মক্কেলটি তাকে জানায় যে, তার কাছে মাত্র দশ হাজার টাকা রয়েছে এবং এতে মি. জিন্নাহ তার মোকদ্দমা নিতে স্বীকৃত হন। অবশেষে এ মর্মে ব্যবস্থা হয় যে, দশ হাজার টাকা ফি গ্রহণের মতো সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে (দৈনিক হিসেবে ফি দেবার ব্যবস্থানুযায়ী) মি. জিন্নাহ থেমে পড়বেন এবং এ সময়ের মধ্যে নথিপত্রে যা দেখতে পাবেন সেই সম্পর্কেই মক্কেলকে পরামর্শ দেবেন। হিসেব করে যখন দেখা গেল যে, উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী মি. জিন্নাহর সর্বমোট তিন হাজার পাঁচশত টাকা প্রাপ্য হয়েছে এবং সেই সময়ের মধ্যেই সমস্ত নথিপত্র পড়া হয়ে গেছে, তখন তিনি অবশিষ্ট টাকা মক্কেলের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। লাহোরের যেসব আইন-ব্যবসায়ী তাদের মক্কেলদের প্রতি সাধারণত সহৃদয়তা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের কাছে এই গল্পটি অপরিচিত বলে মনে হবে না। এ প্রসঙ্গে পাঠকগণকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, মি. জিন্নাহ শুধু প্রমোদ-ভ্রমণের জন্যেই ইউরোপ যাচ্ছেন না। তাঁর লন্ডন অবস্থানকালে অবশ্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হবে। তাঁকে প্রভাবিত করারও প্রবল প্রচেষ্টা চলবে। ফরাসী প্রবাদে আছে, যা দেখবার তাই দেখবো। যাহোক, আমরা এখন সেই সিনাই পাহাড়ের সন্নিকটে এসে পৌঁছেছি, যার চূড়াতে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মুসার কথোপকথন চলছিল, এবং এ মুহূর্তে এখানেই মাউন্ট প্রেজেন্টের মহাপুরুষ জিন্নাহ-র প্রসঙ্গ শেষ হলো।'

(১৯২৮ সালে ৫ মে সাইমন কমিশনের প্রতি হয়তো কিছুটা আক্রোশ বশেই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এস. এস. রাজপুতানা জাহাজে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও দেওয়ান চমন লালের সহযাত্রীরূপে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। দেওয়ান চমন লাল তার স্বাভাবিক গতিশীল ভাষায় এ দুই নেতার দৈনন্দিন জাহাজজীবন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ, অর্থাৎ মুসলিম-নেতা সংক্রান্ত অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা হলো। মানুষ জিন্নাহ ও রাজনীতিক জিন্নাহর চমৎকার পরিচয় হিসেবেই এ-প্রবন্ধটি মূল্যবান। এ থেকে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অন্তর্নিহিত দেশপ্রেম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।)[১৬৯]

---

১৬৯. দেওয়ান চমন লাল/তরজমা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (মাহে নও- ডিসেম্বর '৫৬)

উনিশ

জিন্নাহর প্রতি নিবেদিত কয়েকটি কবিতা

[ক]

জিন্নার প্রতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

যুযুধান দেশ কে আজ নির্বিরোধ
কুচক্রান্ত ছড়ায় রাত্রিচারী
মিথ্যার মদে ভুলবে না নির্বোধ
দিনরাত্রি যে বিদ্যুৎ সঞ্চারী।
তপস্যা শেষ, ভাঙ্গো আজ মৌনতা,
দুর্গের দ্বার খোলো বিনিদ্র দ্বারী,
শত্রুরা মূঢ়: সম্ভাষে স্বাধীনতা,
আমরা জয়ের সাগরে জমাবো পাড়ি,
আজকে এ-দেশ শুনেছে যে ব্রত কথা
সোনার খাঁচার সঙ্গে তাইতো আড়ি।

[জিন্নার প্রতি সুকান্ত ভট্টাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদিত কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল '৪৭-এর স্বাধীনতা পূর্বকালে 'দৈনিক আজাদে'। কবিতাটি বহুকাল লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। অনেকটা আবিষ্কারের মতোই (ডক্টর) আনিসুজ্জামান পত্রিকার পাতা থেকে কবিতাটি উদ্ধার করেন। জনাব আনিসুজ্জামান প্রদত্ত কিছু তথ্য সহযোগে 'সুকান্তের একটি কবিতা' প্রকাশ পায় বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'-এর শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯১ (জুলাই/আগস্ট) সংখ্যায়। প্রসঙ্গত আনিসুজ্জামান বলেন : 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা চোখে পড়ল, যা তার কোনো কাব্যগ্রন্থে এ পর্যন্ত গ্রথিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কবিতাটির নাম 'জিন্নার প্রতি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালের দৈনিক আজাদের ৪৬ পৃষ্ঠায়।' জনাব আনিসুজ্জামান আরও বলেন—'সুকান্তের পক্ষ থেকে এ কবিতা লেখার আবশ্যকতা কি ছিল? এটুকু বোঝা যায় যে, কম্যুনিস্ট পার্টির তখনকার রাজনীতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল মুসলিম লীগের মিলন সাধনের, অন্তত বোঝাপড়ার পক্ষপাতি ছিল। মহাত্মাজীর প্রতি কবিতা রচনার তারিখ আমার জানা নেই। এমন অসম্ভব নয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টির ঐক্যনীতির প্রেরণার কাছাকাছি সময়ে সুকান্ত 'মহাত্মাজীর প্রতি' আর 'জিন্নার প্রতি' কবিতা দু'টি রচনা করেছিলেন।']

[খ]

হে সিপাহসালার

বেগম সুফিয়া কামাল

তোমার আঁখির দীপ্তিতে জ্বলা নিশীথের তারকারা
আজিও জানায় শ্বাশতী যে ইশারা
সেই সে সত্য পথের পথিক এখনও চলিছে পথে;

তথ্যসূত্র : কবি সাহিত্যিকদের মূল্যায়নে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ/সম্পা. মাহমুদুল হাসান নিজামী। [জ্ঞান বিতরণী- ফেব্রুয়ারী, ২০১৮। পৃ. ১২০-১২৪]

দেখিছ ত তুমি লোকাতীত লোক হতে।
তোমার তর্জনী তুলেছ যখন একতার ইঙ্গিতে
জমেছে জামাত শংকাবিহীন চিত্তে
ভরিয়াছে ময়দান,
ভরেছে 'জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনিতে আজাদ পাকিস্তান।
হে সিপাহসালার! রক্ত আখরে স্বাক্ষর করি নাম
এ জাতি দিয়েছে দাম,
পর-পদানত শৃঙ্খল-বাঁধা করে তুলি ঝংকার
সালাম তোমারে জানায় বারংবার।
কোটি কোটি প্রাণ স্পন্দিত হলো মন্দ্রিত হলো দিক
বজ্র কঠোর সত্য মানব নির্ভয় নির্ভীক
তোমারে লভিয়া জাগে হে নায়ক বীর!
স্বাধীন সূর্য উজ্জ্বলালোকে ভরিল সাগর-তীর।
কর্ম কঠোর দীপ্তিতে জ্বলে যে প্রাণবহ্নি শিখা
নশ্বর নহে, সে চির অমর, দিগন্তে রহে লিখা:
সূর্য-করের উজ্জ্বল আলো সে প্রাণ শিখায় জ্বলে.
নিতি নবরূপে বিকশি ওঠে সে প্রভাত পদ্মদলে।
সে প্রাণ শিখায় প্রোজ্জ্বল হয়ে লক্ষ মানব-প্রাণ
সন্ধানী আলো জ্বালায়ে দীপ্তিতে জ্বলে সম্মুখে পথরেখা:
সেই পথে দেখা যায়-
মুক্তি সেনারা দলে দলে চলে আসে.
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
আজাদী ঝান্ডা, সবুজ প্রাণের সাড়া
শ্বেত শান্তির প্রতীক! জানায় আধা চাঁদ পুরা তারা।
তব আত্মার আনন্দ লয়ে দোলে
নির্মল নীল আকাশের কোলে কোলে।
কায়েদে আজম! আমরা তোমার দান,
শির পাতি নিয়া বক্ষঃ রক্তে রাখিয়াছি সম্মান।
(মাহে নও / ডিসেম্বর '৫৩)

]গ.]

হে মহান নেতা

বেগম সুফিয়া কামাল

কায়েদে আজম! হে মহান নেতা সাড়া দাও,
দাও সাড়া,
তোমারে ভোলেনি, আজিও ডাকিছে বঞ্চিত সর্বহারা
তোমারে হেরেনি, শুনেছিল শুধু তোমার কণ্ঠবাণী:
জেনেছিল তারা, তুলেছে পতাকা তোমার বজ্রপাণি
অবিচল ন্যায়ে, সত্যের আলো ইসলামী ছায়াতল
বহু যুগান্ত আঁধার অন্তে আবার সমুজ্জ্বল।

হয়ে এল, নীল নভ তলে হাসে অর্ধচন্দ্র-তারা;
শ্যামা বসুমতী বিছায়ে আঁচল নিশীথ তন্দ্রাহার
হেরিল দিনের দীপ্ত রবির আলোক বিথারি পথ
ভরে জনতায় তব জয়গানে পুরাইয়া মনোরথ।
দৃপ্ত স্বাধীন বক্ষের বলে লাখো লাখো তাজা প্রাণ
কায়েদে আজম! তোমারে স্মরিয়া করেছে কোরবান।
এনেছে আযাদী শতাব্দী শেষে, তোমার মহান দান
অঞ্জলী পাতি' করেছে গ্রহণ, রাখিয়াছে সম্মান
সর্বহারার দল।
আর যারা লোভী, ক্রুর শয়তান, তাহারা করেছে ছল।
রবি ডুবে গেছে সন্ধ্যার ছায়ে, আঁধারে ডুবেছে ধরা;
ফিরে শিবাকুল পিছে ফেরুপাল, তবু ভয়ে বুক ভরা।
তুমি চলে গেছ, তোমার দানের ভরা তরণীর ভার
অর্পিয়া গেছ জনগণ-করে, হে যুগ-কর্ণধার!
তুমি জানো, আজ তোমার অমর আত্মায় জাগে সাড়া,
তাই তো এদিনে স্মরিছে তোমারে বঞ্চিত সর্বহারা।
কায়েদে আজম! তব আত্মার আশিস দানিয়া করো
ইমানে আমানে সেবা ও সাম্যে এ ওতান্ নবতর!
(মাহে নও / ডিসেম্বর '৫৪)

[ঘ]

হে মশালধারী

বেগম সুফিয়া কামাল

কালের প্রবাহে ভেসে গত হয়ে গেছে সেই দিন,
তিথি, মাস, বৎসরান্ত, যুগ যুগ হবে বিলীন
কিন্তু তব জয়
উজলি' কালের বক্ষ রহিবে অক্ষয়।
সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, দীপ্ত নক্ষত্রের সম
রহিবে তোমার দান। নাশ করি' তম
নির্জীব জাতির প্রাণ জীবন-চাঞ্চল্যে ওঠে জেগে
তড়িৎ-প্রবাহ সম বেগে
ব্যাপ্ত করি' উদয়-অচলে, অস্তাচলে।
উদ্দীপ্ত প্রাণের দলে দলে
আত্ম-উপলব্ধি জাগে। পথের দিশারী
তুমি সেই অন্ধ রাত্রে, হে মশালধারী!
পথের সন্ধান দানি বজ্র-কণ্ঠে দানিলে নির্দেশ :
আমরা আজাদ জাতি; আজাদ করব মোরা দেশ।
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে সাড়া,
ভেঙে যায় ভীতির পাহারা,

শঙ্কাহীন লক্ষ প্রাণ সাড়া দিল তোমার আহ্বানে,
মুক্তকণ্ঠ আজাদীর গানে।
সাহসে দুর্জয় বক্ষ, আজও তারা তোমার সে বাণী
শোনে যেন অন্তরীক্ষে। শানিত শিরে লয় মানি
জাতির পতাকাতলে একত্রিত সকলে তোমারে
বরণ করিছে বারে বারে,
তোমার আসন আজও সকলের হৃদয়ের মাঝে
তোমারে নিয়ে ভরে আছে।
যুগে যুগে তুমি তব দানের প্রভায়
চিরঞ্জীব হয়ে রবে আপনারি দিব্য মহিমায়।
কায়েদে আজম। তব দান
মহাকাল-বক্ষ ভরি' রহিবে অম্লান।
(মাহে নও / ডিসেম্বর '৫৫)

[ঙ]

হে অমর প্রাণ

বেগম সুফিয়া কামাল

তসলীম লহ, হে অমর প্রাণ! কায়েদে আজম! জাতির পিতা!
মুকুটবিহীন সম্রাট ওগো! সকল মানব-মনের মিতা।
অমা-নিশীথের দুর্গম পথে আলোকের দূত! অগ্রনায়ক!
সিপাহসালার! বন্দী জাতিরে আবার দেখালে মুক্তি-আলোক।
দিনের সূর্য, নিশীথ-তারকা, গিরি-নদী আর সিন্ধু-তীর
তব কণ্ঠের বজ্র নিনাদে সাড়া দিয়ে ওঠে, বিজয়ী বীর!
দূর দুর্গম গিরিপথ আর শ্যাম বাংলার তটিনীধারা
তব আহ্বানে উচ্ছসি' ওঠে, দলে দলে আসে আত্মহারা।
কারবালা-শেষে নতুন করে ইসলামের এ নবোত্থান
মূক মুখে শুনি আবার এখানে নবজীবনের মুক্তিগান।
তোমার মুখের কালাম শুনিল : আজাদ। আমরা আজাদ জাতি!
নিমিষে দাঁড়াল ঝাণ্ডা উড়ায়ে : সম্মুখে আঁধার গহীন রাতি।
(মাহে নও / ডিসেম্বর '৫৯)[১৭০]

১৭০. তথ্যসূত্র। কবি সাহিত্যিকদের মূল্যায়নে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ/মাহমুদুল হাসান নিজামী। জ্ঞান বিতরণী - ফেব্রু
২০১৮। পৃ: ১৫১-১৬০।

নবম পর্ব

বেহাত আজাদী — ভিন্ন বয়ান

এক

"...আমার অভিজ্ঞতা বলে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা বড্ড বেশি পাকিস্তানি ছিলাম। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমাদের শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন। সাহিত্যিকরা গল্প লিখেছেন। কবিরা কবিতা লিখেছেন। প্রতিদিন রচিত নতুন নতুন গান বেতারে পরিবেশিত হয়েছে। আমি নিজে অনুভব করেছি আমার অকৃত্রিম অনুগত ছাত্রটি পর্যন্ত ১৯৬৫ সালের ওইদিনগুলোতে আমাকেও বিশ্বাস করেনি। জাত-পাতের ভিত্তিতে আমাকে ভারতীয় চরই ভেবেছে। আমার সেই ছাত্ররা নির্বিঘ্নে আমাকে একথা বলেছে। আমি দুঃখ পাইনি। কারণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের এটাই উত্তরাধিকার। আমার একান্ত অনুগত ছাত্রটি হঠাৎ করে এ ধরণের চিন্তার অধিকারী হয়নি। সে তার পরিবারের সূত্রে এ চিন্তার অধিকারী হয়েছে। মানুষকে চিনেছে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে।

লক্ষণীয় যে, আজকে যারা ১৯৪৮ বা ১৯৫২ সালে স্বাধীন বাংলা গঠনের স্বপ্নের কথা বলেন, তাদের এ স্বপ্নের স্বাক্ষর কিন্তু সাহিত্যের পাতায় নেই। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আমাদের আজকের বাঘা বাঘা কবি সাহিত্যিক এবং গল্পকাররা ১৯৬৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়- এ লক্ষ্য নিয়ে কোনো সাহিত্য রচনা করেননি। আমাদের প্রথম সারির আজকের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের লেখকদের মধ্যে অনেকেই সেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ১৪ আগস্ট উপলক্ষে রচনা লিখেছেন। আদমজী ও দাউদ পুরুস্কার পাবার জন্যে আকাশ-পাতাল তদ্বির করেছেন। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেছেন। কেউ আবার আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় ভৃত্য'(!) বইয়ের অনুবাদ করে সরকারের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছেন।

অর্থাৎ খুব স্পষ্ট করে বলা যায়- আমাদের ষাটের দশকের সাহিত্যেও আমাদের স্বাধীনতার তেমন ছাপ নেই। এখানটায়ই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে '৭১-এর সংগ্রামের মৌলিক পার্থক্য। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একটি দীর্ঘ সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য প্রেরণা যুগিয়েছে। একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে। সাহিত্যের এ ইতিহাসটি কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেই। অনেকে হয়তো বলবে- ১৯৫২ সালের পর থেকে আমাদের সাহিত্যের একটি অংশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভূমিকা আছে। আমাদের সাহিত্যে বাঙালি আকাঙ্খা বাস্তবায়নের একটি জোরালো দাবি আছে। আর আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে- সে সাহিত্যে স্বাধীনতার প্রশ্নটি আদৌ সোচ্চার ছিল না। সোচ্চার থাকলে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নামে আমরা একটি আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সাহিত্য রচনা করতাম না।"[১৭১]

---

[১৭১]. নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ৪১৫-৪১৬।

দুই

"...পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল (পূর্ববাঙলা) ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতি, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই বৈষম্যের কারণে পূর্ববাঙলার জনগণের, পশ্চিমাদের ওপর বিক্ষুব্ধ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা যতই সত্য হোক, সেটি হ'ল ঘটনার এক দিক। এর বিপরীতে আরও যে অনেক সত্য ও বাস্তব ঘটনা আছে তা পাকিস্তানের প্রতি চরম বিদ্বেষের কারণে কখনও আমরা তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। পাঠকদের এখন আমরা সেই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাই।

ইতিহাসের অপর পিঠ হল : পশ্চিম পাকিস্তানীদের নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন এবং পূর্ব-পশ্চিমের অনেক বৈষম্যের পরও পূর্ববাঙলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১৯৪৭ সালের আগেকার বৃটিশ শাসনামলে যেরকম ভয়াবহ রকমের পশ্চাৎপদ ছিল- সে তুলনায় সাতচল্লিশ-উত্তর তেইশ বছরে বহুগুণ উন্নত হয়েছিল

আমরা জানি, '৪৭-এর পর মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে বৃটিশ আমলের পাণ্ডববর্জিত, পশ্চাৎপদ, হতদরিদ্র পূর্ববাঙলায় গড়ে উঠেছিল এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুটমিল, উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম টুলস ফ্যাক্টরি জয়দেবপুর মেশিন-টুলস ফ্যাক্টরী, চিটাগাং স্টীল মিল, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি, বাওয়ানী জুটমিল, করিম জুটমিল এবং পাকশী ও কর্ণফুলী পেপারমিল সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কারখানা। ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী (যেটি আজকের শেরেবাঙলা নগর এবং আমাদের গর্বের সংসদ ভবন)। এমনকি ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে ঢাকায় ডিআইটি ভবনে যে টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি ছিল সমগ্র পাকিস্তানের প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র (তখনও পশ্চিম পাকিস্তানে কোন টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি)।

যাদের বয়স আজ ষাটের কোঠায় তাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, তখন ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ববাঙলার রাস্তাঘাটে চলাচল করতো চট্টগ্রামের প্রগতি ইন্ডাস্ট্রির বাস ও ট্রাক। এমনকি আজ শুনলে অলীক স্বপ্নের মতই মনে হবে- ১৯৭২-৭৩ সালেও প্রগতি ইন্ডাস্টি' চালু ছিল এবং সে সময় শোনা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিকে দিয়ে একটি প্রাইভেট কার তৈরীরও নাকি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আর সেই অপার সম্ভাবনাময় প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি আজ এক ধ্বংসস্তূপ, কেবলই এক বিস্মৃত ইতিহাস। আদমজী জুটমিল, চিটাগাং স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, বাওয়ানী জুটমিল, মেশিন-টুলস ফ্যাক্টরি, পাকশী পেপার মিলসহ বড় বড় শিল্পকারখানাগুলো সব আজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

অথচ পাকিস্তান আমলেই এইসব শিল্পকারখানায় লক্ষ লক্ষ বেকার, হতদরিদ্র বাঙালীরা চাকুরী করে আধুনিক শিল্পশ্রমিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার বাঙালীর কর্মসংস্থান হয়েছিল। সেসব শিল্পকারখানার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল অনেক ব্যবসাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান- সেখানেও বিপুলসংখ্যক বাঙালীর কর্মসংস্থান হয়েছিল। এর ফলে ওই ২৩ বছরেই পূর্ববাঙলায় বিকাশ ঘটেছিল এবং মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

পূর্ববাঙলার শিক্ষা, শিল্প, চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস, কবিতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছিল সেই আমলেই। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, এস. এম. সুলতান, কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক, শামসুর রহমান, আল-মাহমুদ, আব্বাসউদ্দিন, মুনির চৌধুরী আলতাফ মাহমুদ সকলেই ওই আমলের। তাদের সকলেরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে পাকিস্তান আমলে ২৩ বছরে। স্বাধীন বাংলাদেশের তেতাল্লিশ বছরে যার বিকাশ আরও বহুগুণ ও বহুমাত্রিক হওয়া উচি ছিল- সেখানে তেতাল্লিশ বছরে একজন জয়নুল আবেদীন, এস. এম. সুলতান, কামরুল হাসান, সৈ ওয়ালীউল্লাহ, আলতাফ মাহমুদ, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ তৈরী হয়েছে কি? হ হয়েছে কি লালসালু, আব্দুল্লাহ, সূর্যদীঘল বাড়ী, চিলেকোঠার সেপাইয়ের মত কোন কালজয়ী উপন্

আমরা জানি, পাকিস্তানী আমলের ২৩ বছর পূর্ববাঙলার মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের মান প্রতিবেশী ভারতের অনেক রাজ্যের চেয়ে ওপরে ছিল। টাকার মান ভারতীয় রুপীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। অথচ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বিপুল স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আজ তেতাল্লিশ বছরে আপেক্ষিক মাত্রায় শুধু অসচ্ছল নয়, চরম দূর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বেড়েছে হয়তো পঞ্চাশ গুণ, কিন্তু ব্যয় বেড়েছে দেড়শ' গুণ। আজ ঢাকা শহরে যে দশ লক্ষ রিক্সা শ্রমিক রয়েছে তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিবার পাকিস্তান আমলে ছিল মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত।

ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে উত্তেজনাকর শ্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগ যে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামে পোস্টার প্রচার করেছিল, সেটি ছিল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য রাজনৈতিক শ্লোগান। প্রকৃতপক্ষে অতীতের (ছোলতানী-নবাবী আমলের) 'সোনার পূর্ববাঙলা' শ্মশানে পরিণত হয়েছিল বৃটিশ আমলের দু'শ' বছরে। বৃটিশ শাসনাধীন দু'শ বছরের সেই 'শ্মশান পূর্ববাঙলা' পাকিস্তান আমলের মাত্র তেইশ বছরে সোনার বাঙলা না হোক, অন্তত শ্মশান থেকে উঠে এসে সোনার বাঙলা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। শেখ মুজিব যে 'ছয় দফা'র মাধ্যমে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্য থেকেই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্বপাকিস্তান (পূর্ববাঙলা) চেয়েছিলেন এবং সেই বাঙলাকেই 'সোনার বাঙলা' বানাতে চেয়েছিলেন, তার মনস্তাত্ত্বিক মর্মার্থ বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সাতচল্লিশ-পূর্বকালের সেই পান্ডববর্জিত ভূখন্ডের ম্লেচ্ছ-যবনরা' সাতচল্লিশের পর কীভাবে উষার আলোর মত জেগে উঠেছিল তার একটি ক্ষুদ্র চিত্র ফুটে উঠেছে হাল আমলের বাংলাদেশের বিদগ্ধ লেখক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি বক্তব্যের মধ্যে। অতি সম্প্রতি জনাব মনজুরুল ইসলাম দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত তার এক নিবন্ধে সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ববাঙলা (পূর্ব পাকিস্তান) সম্পর্কে বলেছেন:

"...কী এক রসায়নে এর শিল্প-সাহিত্যে শুরু হল জোয়ার। এক দশকেই-পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতার বড় বড় সব ঢেউ আমাদের চিত্রকলা, গল্প, উপন্যাসে-শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সৈকতে আছড়ে পড়ল, যেন নতুন শক্তি নিয়ে জাগল। ...ষাটের দশকে এসে বুঝলাম, আমরা বিশ্বের সঙ্গে আছি, গন্ডগ্রামে পড়ে থাকার মানুষ নই আমরা। আমরা এখন একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের জাতি।"

কেউ আমরা স্বীকার করি না করি- সৈয়দ মনজুরুলের ভাষায় যে 'রসায়ন' আমাদের শিল্প-সাহিত্যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই 'রসায়নে'র নাম 'সাতচল্লিশ'।

পাঠক যেন ভুল না বুঝেন- অতীতের এসব ইতিহাস বয়ানের উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া নয়। তার কোন অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে নতুন প্রজন্মকে এসব ইতিহাস অবশ্যই পাঠ করতে হবে। প্রজন্মকে ইতিহাস পাঠ করাতে হবে তাদেরকে 'পাকিস্তানপ্রেমী' বানানোর জন্য নয়, বরং তাদেরকে ইতিহাস সচেতন করে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুসংহত করে তোলার জন্যই।"[১৭২]

তিন

"...মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-মেম্বার, নেতা-উপনেতা দেশসেবার বদৌলতে ঢাকায় স্ব-স্ব বাড়ী-ঘর নির্মাণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। ধানমন্ডি এলাকায় আওয়ামী লীগ সদস্যদের নির্মিত ঘরবাড়ীসমূহ 'আওয়ামী লীগ কলোনি' আখ্যা পায়। ইহা আওয়ামী লীগ সরকারের অকৃত্রিম জনসেবার অতুলনীয় স্বাক্ষর বটে।

---

[১৭২]. রইসউদ্দিন আরিফ (সাবেক সম্পাদক, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি)/অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ : বাঙালী ও বাংলাদেশ। [পাঠক সমাবেশ- ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। পৃ. ১২৬-১২৯]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ আচরণ সেক্রেটারিয়েটের মহাজন অবকর্তাদিগকে তাহাদের অর্থাঙ্কিত পদাংক অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করে এবং আমলাগোষ্ঠী সংখ্যাধিক্য বিধায় লুণ্ঠনের সিংহভাগ তাহারাই পায়। পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিসভুক্ত সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, কাস্টমস সার্ভিস ইত্যাদির অন্তর্গত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৯৫ জন ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাহারা চাকুরীর প্রথম জীবনে ছিলেন ৩ শত হইতে ৫ শত টাকার বেতনভুক্ত কর্মচারী। অথচ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার দ্বারা স্বীয় জীবন ভোগের উদগ্র বাসনায় চরম অসদুপায় অবলম্বনে তাহারা কোন সময়ই কুণ্ঠিত হন নাই এবং বিপুল অর্থোপার্জনের মাধ্যমে এই দেশে তাহারাই 'রামরাজত্ব' কায়েম করিয়াছিলেন।

৩, ৪ অথবা ৫ বৎসরের চাকুরী জীবনে রাজধানী ঢাকা অথবা বন্দর শহর চট্টগ্রাম বা খুলনার বুকে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ বা ক্রয়, শহরে, গ্রামে-গঞ্জে জোতজমি ক্রয়, স্বীয় ব্যবহারের জন্য গাড়ি ক্রয়, ঠাঁট বজায় রাখিবার অতিরিক্ত জিনিসপত্র যথা: রেফ্রিজারেটর, দামী কার্পেট, ডাইনিং সেট, সহধর্মিনীর শাড়ি-গহনা ক্রয়, দেশে-বিদেশে স্বনামে-বেনামে ব্যাংক ব্যালেন্সের মোহ তাহাদের পাইয়া বসিয়াছিল। ৩ শত, ৫ শত এমন কি হাজার দুই হাজার টাকা বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের জীবনে এইসব ছিল রূপকথার কাহিনীর ন্যায়। পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নগন্যসংখ্যক সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অধিকাংশের বেলায়ই ইহা ছিল অকাট্য সত্য। জীবন ও যৌবন ভোগের উন্মত্ত নেশায় তাহাদের সচেতন অপরাধ প্রবণতা জাতিকে দুর্নীতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে।

এতদবর্ণিত জাতিদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, নীতিদ্রোহী জীবশ্রেণীর বিরুদ্ধে যাহারা কণ্ঠকে সোচ্চার রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রশাসনিক ক্ষমতার দাপটের শিকার হইতে হইত ও পুন: পুন: কারাবরণ ছিল তাহাদের জন্য অবধারিত। মাওলানা ভাসানীর বিশাল ব্যক্তিত্বকেও বার বার কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। মাওলানা ভাসানী সেই যুগের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী শাসনদন্ডের নায়কবৃন্দ যথা- নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মীর্জা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ ইসলামী জীবনদর্শন নির্দেশিত জীবনবোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন পর্বতপ্রমাণ বাধা। তাহাদের বক্তৃতা-ভাষনে একদিকে ইসলামী জীবনাদর্শনের গভীর তাৎপর্য ও ব্যবহারিক জীবনে উহার রূপায়নের খই ফুটিত এবং অন্যদিকে তাহারাই আবার মাওলানাকে 'লুঙ্গীসর্বস্ব' 'ইসলামের শত্রু' 'পাকিস্তানের শত্রু' 'ভারতের চর' ইত্যাদি হীন আখ্যায়িত করিতে সামান্যতম ক্লেশ বোধ করেন নাই।

জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়কালে জনগণ আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে ও বহিঃশক্তির নিকট অবচেতন অবস্থায় আত্মসমর্পন করে। আত্মিক শক্তির পরাভব ও অবলুপ্তির এই সন্ধিক্ষণেই ইস্কান্দার মীর্জা আইউব খানের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানান এবং এইভাবেই জনগনের সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতির উপর জেনারেল আইউব খানের একনায়কত্বের ভিত রচিত হয়।"[১৭০]

চার

"...I would like to state that the Awami League is a party of the freedom fighters for Pakistan. Its founder, Huseyn Shaheed Suhrawardy is indeed one of the founders of Pakistan. I recall with some pride that under his leadership, my colleagues and I were in the vanguard of the struggle for Pakistan. Such proposals as I am presenting before the Conference are based on the conviction that they are absolutely essential in order to preserve and indeed to strengthen Pakistan.

১৭০. অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে '৭৫। বিসিবিএস- অক্টোবর, ২০১২ (পঞ্চম সংস্করণ) । পৃ. ২৪৩-২৪৪।

...Neither Almighty Allah nor history will forgive us if at this time of national crisis we fail to rise to the occasion and to adopt bold solutions in order to restore the formidable problems which have created a national crisis. This is a great opportunity, and one which may not present itself again, to face our national problems squarely.

We must, therefore, strain every nerve to agree upon and implement the required solutions. Let us strive together to lift our beloved Pakistan out of the tragic situation in which she is placed, and to lay the constitutional foundations for a real, living, federal parliamentary democracy, which will secure for the people of Pakistan full political, economic and social justice. Only that can a strong and united Pakistan face the future with hope and confidence. Pakistan Zinadabad!" [Extracts from Sh. Mujibur Rehman's Speech in the Round Table Conference on 10th March, 1969][১৭৮]

পাঁচ

"...কপালের লিখন। মাত্র কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হককে আখ্যায়িত করেছিলেন পাকিস্তানের দুশমন ও রাষ্ট্রদ্রোহী এবং রুশ-ভারতের দালালরূপে। আজ তার উপরেই ভরসা। আর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় দালাল ও কম্যুনিস্ট প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করা সত্ত্বেও গোলাম মোহাম্মদ গোষ্ঠী শেষ রক্ষার জন্যে নির্ভর করতে লাগলেন আওয়ামী লীগের সেই সব তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী নেতৃবৃন্দের উপর।

পূর্ব বাংলার ঐক্য হল দ্বিখণ্ডিত। ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে যুক্তফ্রন্টের ফজলুল হকের দাবি জনসাধারণের প্রতি প্রদত্ত একুশ দফার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ভিড়ে গেলেন মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে। এদিকে যুক্তফ্রন্টের অপর দল আওয়ামী লীগ ভিড়লেন গোলাম মোহাম্মদের তরীতে। পূর্ব বাংলার এই অনৈক্যের মধ্যখানে পড়ে রইলেন শত শত দেশপ্রেমিক কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। নেতৃত্ববিহীন জনতা পড়ে থাকলেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে যে অনিশ্চয়তায় তারা ইতিমধ্যেই কাটিয়েছেন গত সাতটি বছর।

অবস্থা চরমে উঠল গোলাম মোহাম্মদের পূর্ব বাংলা সফর নিয়ে।

যুক্তফ্রন্টের দুই দলে তীব্র প্রতিযোগিতা গোলাম মোহাম্মদের গলায় কে আগে মালা পরাবেন। গলা গোলাম মোহাম্মদের একটি কিন্তু মালা দুটি। গোলাপ-রজনীগন্ধার একটি মালা শোভা পাচ্ছে শেরে বাংলা ফজলুল হকের হাতে, আর আতাউর রহমানের হাতে রয়েছে বেল-করবী-বকুলের মালা।

দুই রাধা এক কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ পড়লেন মুশকিলে, কারে থুই কারে রাখি।

অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তিনি বললেন : দুই রাধা এক হও। দুই মালা এক কর। চার হাতের দুই মালা এক করে পরাও এক গলায়। পরিস্থিতিটি ন্যাক্কারজনক। পূর্ব বাংলার মাথা হেঁট হল বিশ্বের চোখে। বুদ্ধিবৃত্তিতে দেউলিয়াগ্রস্থ পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ আরেকবার প্রমাণ করলেন যে, মন্ত্রিত্বের হালুয়ার জন্যে তারা করতে পারেন না এমন কিছুই যেন নেই। দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাতেও আপত্তি নেই তাদের।

এমনি করে করাচির চক্রান্তজালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক মৎস্যারা ধরা দিল। চার ছড়ান হয়েছিল মন্ত্রিত্বের। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বললেন ফজলুল হকের দলকে : যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগকে ভাগিয়ে দাও, তোমাদের হাতে পূর্ব বাংলার মসনদ তুলে দিচ্ছি। তোমরা খাঁটি মুসলমান,

---

১৭৮. Source : Through The Crisis/S. M. Zafar (Minister for Law and Parliamentary Affairs)] [Book Centre (Lahore)- March, 1970] P. 223-229]

তোমাদের সঙ্গে আমাদের মুসলিম লীগের মুসলমানদের কোন ঝগড়া নেই। কিন্তু যতসব গোলমালের মূলে কম্যুনিস্ট ও হিন্দুস্তানের দালাল ঐ আওয়ামী লীগের মুসলমানেরা।

এদিকে গোলাম মোহাম্মদ আওয়ামী লীগের নেতা আতাউর রহমানকে ডেকে চুপি চুপি বললেন: মিয়া, তোমরা-আমরা তো এক এবং অভিন্ন। পাকিস্তানে আমরাই তো নির্ভেজাল মুসলমান। যতসব গন্ডগোল ঐ ফজলুল হককে নিয়ে। তিনিতো হিন্দুস্তানের পাকা দালাল এবং একজন ঘোর কম্যুনিস্ট। তাকে বাদ দিয়ে এস পূর্ব বাংলার মসনদ তুলে দিচ্ছি তোমাদের হাতে। আমাদের আমেরিকান বন্ধুদেরও মনে মনে তাই ইচ্ছে।

করাচির রাজনীতির ডাক্তারগণ পূর্ব বাংলার তথাকথিত নেতাদের রোগটি ঠিকই ধরে ফেলেন। এখানকার যারা সাচ্চা দেশপ্রেমিক, তাদের তারা ভাল করেই চেনেন এবং তাদের পক্ষে পূর্ব বাংলার ক্ষমতাসীন হবার সম্ভাবনা আপাতত: নেই। তাদের বাদ দিয়ে আর যারা দেশপ্রেমিকের দাবিদার তাদের অধিকাংশই মেকী। পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে তারা নাবালক। চাকরি বা মন্ত্রিত্বের মোয়া দিয়েই ভুলান যায়। কাজেই অষুধ তাদের লেগে গেল। ক্ষমতার গন্ধে দিশেহারা নেতৃবৃন্দের একদল ছুটলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পিছু পিছু। অপরদল গোলাম মোহাম্মদের।"[১৭৫]

ছয়

"... গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করিলেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, গণপরিষদ বিলুপ্তিকালে তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, যথাশীগগির পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা পুন:প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের আশায় যুক্তফ্রন্ট পার্টিও তাই গভর্ণর জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাইবার মনস্থ করিল যদিও ইহা অনেকের কাছে বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। এই ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট অফিসে সভা আহুত হইল। কিন্তু সামান্য একটা ব্যাপারে তর্ক কাটাকাটির পর সভা শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি হইয়া গেল। যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে আর অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইল না। আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি তখন পৃথক অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। বিমানবন্দরে এক কলঙ্কময় দৃশ্যের অবতারনা হইল।"[১৭৬]

সাত

"...Ayub talked of his tour of Sindh from which he had returned a couple of days earlier
He had made a number of speeches in support of One Unit, and was very happy that he had
not pulled any punches. He had warned the people of Sindh that he would not allow
anybody to dismember One Unit. He was confident that the West Pakistanis would pull
together but he was deeply worried about relations between East and West Pakistan.

What disturbed him most was that Bengali Muslims saw little benefit in living together
with West Pakistanis. The Information Secretary (writer) suggested that perhaps the
Bengalis had not had a fair deal, to which Ayub reacted quite angrily. 'You become quite
emotional when it comes to the Bengalis.' The Information Secretary was a little taken
aback but he did not give up. He argued that the Bengalis might be a highly emotional
people but they had genuine grievances. Even what had been promised to them under the
Constitution had not been delivered. For instance, the Constitution required that the federal

১৭৫. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস/ভাসানী যখন ইউরোপে (রচনাসংগ্রহ)। বাংলা একাডেমী, জুন, ২০১৩। পৃ. ১৭৯-১৮০।

১৭৬. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)/পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর। বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪। পৃ. ৬৩।

legislature and its secretariat should be located in Dhaka, which was to serve as the second capital of Pakistan. What they had been given was a ghost town. All legislative work continued to be done in Islamabad where the assembly staff was permanently lodged.

Ayub leaned back a little wearily: 'Listen, my dear fellow, I gave them the second capital because they are going to need it one day. They are not going to remain with us.'[১৭৭]

আট

"...১৯৪৮ সাল থেকে সব কমিউনিস্ট কর্মীদের মুসলিম লীগ সরকার গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। মুসলিম লীগ প্রশাসন জানত এই কমিউনিস্টরাই হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু। কারণ তখন পর্যন্ত (আজাদীর বছর না ঘুরতেই) পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তিটা মুসলিম কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়নি। সেটা আওয়ামী লীগের কথাই বলি বা মুসলিম লীগের কথাই বলি।

...তোমরা তো জানো না যে কাজী মোতাহার হোসেন, নাসিরুদ্দীন সাহেব, নুরজাহান বেগম বা রোকনুজ্জামানের মত লোকেরা সাহিত্য সংসদে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকলেও এরা মূলত ছিলেন কমিউনিস্টদের লোক। ...মুসলমান শিক্ষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলো এমন আরেকটা নাম শহীদুল্লাহ সাহেব অর্থাৎ ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

...আমাদের পলিসি ছিলো কাউকে hostile না করে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো দখল করে নেয়া। যেমন ধরো, মুসলিম লীগের নেতা আবুল হাশিম- বন্ধু, মান্যবর। আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। তাকেও আমরা ডিল করেছি কম্যুনিস্টের জায়গা থেকে। পার্টি আমাদেরকে হুকুম করেছে, তোমরা হাশিম সাহেবের কাছে কাছে থাকবা। যা সাহায্য লাগে করবা। এই রকম হুকুমই করা ছিলো। হুকুমের চোটে আবার ধরো দুই একজন নষ্টও হয়ে গেছে। যেমন ধরো শামসুদ্দীন। আবুল হাশিম সাহেবকে সামলানোর জন্য তাকেও পাঠানো হয়েছিলো। সে এমনি সামলায় যে নিজেই পাকিস্তানপন্থী হয়ে যায়। পরে পাকিস্তানেই চলে যায়। সেখানেই মারা যায়।

...এই যে পাকিস্তানিজমের চিন্তাটা, এটা যেহেতু মূল স্রোত একে hostile করে কি হবে? এটা হলো এক ধরণের চিন্তার কাঠামো। এখন এই চিন্তার যে ভ্রান্তি তাকে তো জোর করে কথার মাধ্যমে শেষ করে ফেলা যাবে না। আমাকে তার কাছে যেতে হবে, তাকে ম্যানেজ করে ফেলতে হবে।

...যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো কম্যুনিস্ট অথবা কম্যুনিস্ট মাইন্ডেড। যদিও মুসলমান পরিবার থেকে আসা কম্যুনিস্টরা নিজেদের কম্যুনিস্ট হিসেবে উল্লেখ করতো না। সমস্যা ছিলো কম্যুনিস্টদের প্রধান সংযোগ ছিলো আওয়ামী লীগের সাথে। ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের প্রধান ভিত্তি ছিলো কম্যুনিস্ট কর্মীরা। কেন যেন ১৯৫৪ পরবর্তী প্রজন্মের যে সব লোক কম্যুনিজম করে তারা এ কথাটা বলার উৎসাহ রাখে না। যদিও তৎকালে কম্যুনিস্টরা আওয়ামী লীগকে জয়ী করার জন্য শ্রম-মেধা ব্যয় করেছে তবুও অন্তত ত্রিশজন গোপন কম্যুনিস্টকে তুমি পাবে যারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। এরা কম্যুনিস্ট পরিচয় গোপন রাখতেন কিন্তু শেখ মুজিব এদেরকে জানতেন।

...মনে রাখতে হবে, আমরা যে স্বপ্ন দেখতাম সে স্বপ্নের মধ্যে এন্টি-হিউম্যান অর্থে এন্টি-পাকিস্তানী হওয়ার ব্যাপার ছিলো না। Pakistan was also a land of people. আমরা সেজন্য পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি করেছি। আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র চেয়েছি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রক্রিয়াটার মধ্যে ডেমোক্রেটিক ইলিমেন্টগুলোকে যুক্ত করতে চেয়েছি। এসব নিয়ে অনেক কথা আছে। যেমন ধরো, মুজিব মণি সিংহকে বলছে- 'দাদা, এবার লাগাইয়া দেই'? মণি সিংহ বলছেন- 'একটু ধৈর্য ধর। অস্থির হয়ো না'।

---

১৭৭. Altaf Gauhar (Information Secretary, 1963-9)/Ayub Khan : Pakistan's First Military Ruler. [UPL - 1996. p. 284-285]

আসলে কম্যুনিস্টরা লং টার্মে চিন্তা করে। তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার টার্মে চিন্তা করেনি। কেবল বই ভেবে আমি একটা সময়ে এসে এটাই ভাবছিলাম যে, যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। বিপ্লব শুরু হয়েছে। দেশ গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে যাচ্ছে। আসাদকে হত্যার ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন আমি সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম।"[১৭৮]

নয়

"... ষাটের দশকে নৌকা কিংবা হাঁটাপথ যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল, যে জন্য কৃষিজাত পণ্যের ভালো বাজার ধরা কঠিন ছিল। প্রতিমাসে থানা কাউন্সিলের সভা করার জন্য আমাকে অন্তত একবার প্রতি থানায় যেতে হতো। আমার মনে আছে, মোল্লাহাটে চার আনায় এক হালি ডিম পাওয়া যেত

এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল এবং বর্তমান সময়ের তুলনায় খুন-রাহাজানিসহ মারাত্মক ধরণের অপরাধ সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। রাজনৈতিক সন্ত্রাস তো দূরের কথা, দুর্বৃত্তদের মধ্যেও বর্তমান স্টাইলের সন্ত্রাস আমাদের কাছে অজানা ছিল। দেশে দারিদ্র্য অসহনীয় পর্যায়ে ছিল- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ মহকুমা আর থানা সদরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এত কষ্টের মধ্যেও মানুষের মনে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল না; ছিল না মাঠেঘাটে সর্বত্র পান্ডা দিয়ে দুর্বৃত্তায়ন আর অপশাসনের উর্ধ্বগতি।"[১৭৯]

দশ

"...পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত একটি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান করতেন মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। দেশে ফিরে আসার পর এই অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা শুনলাম প্রায় সকল বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে, সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন- এমন অনেকের কাছেও। কী যে প্রচারিত হয়েছিল সে অনুষ্ঠানে, তা ভালো করে বুঝে উঠতে পারলাম না, তবে ভারত-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার একটা অভিযোগ উঠেছিল। এদের কারো মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার রেশ ছিল না, সুতরাং এমন অভিযোগে আমার বিস্মিত হওয়ারই কথা। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরে সরকারি ব্যবস্থায় মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হক যান পশ্চিম পাকিস্তান সফরে। তাদের সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ বেরিয়েছিল একাধিক পত্রপত্রিকায়, তাতে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা বাহিনীর শৌর্যবীর্যের গাথা রচিত হয়েছিল, এবং সেইসঙ্গে- যুদ্ধ থেমে গেলেও- শত্রু-মিত্রভেদমূলক ও একধরণের জঙ্গি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। পরের বছর গোড়ার দিকেই এ লেখাগুলি রণাঙ্গন (ঢাকা, ১৯৬৬) নামে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা হয় যে, বইটি প্রকাশিত হয় সরকারী অর্থেই, তবে এর প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয় ইবরাহিম তাহার- ছাত্রজীবনে যিনি ছিলেন ইসলামিক ব্রাদারহুড নামে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধী। ইবরাহিম তাহ অবশ্য ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং তার মুসলিম লীগ বিরোধী ভূমিকার জন্যে একাধিকবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

যুদ্ধটা যে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটা আড়াল রচনা করেছিল, তা বোধহয় সত্যি। হাসান হাফিজুর রহমান দৈনিক পাকিস্তানে স্বনামে যে কলাম লিখতেন তাতেও সেই সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্রচারণাকেই ধ্রুব সত্য বলে গণ্য করা হয়েছিল। তা নিয়ে আমাদের অনেক বন্ধুই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের প্রগতিশীল শিবিরের উর্দু কবি ও সাংবাদিক সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ অনেক বেশি উগ্রতা প্রকাশ করলেও কেউ তাতে বিশেষ অবাক হননি, কিন্তু হাসান তো আর সালাহউদ্দীন নন,

---

১৭৮. সরদার ফজলুল করিম/আমি সরদার বলছি। [অন্বেষা- ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ৭১/২৫২-২২৮/২৮১-২৮৯]

১৭৯. এ টি এম শামসুল হুদা (সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার)/ফিরে দেখা জীবন। [প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী, ২০১৪। পৃ. ১১৬।

তাই কথা যা হওয়ার তার সম্পর্কেই হলো। পরে এ-নিয়ে হাসানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি ও তার মতাবলম্বীরা মনে করতেন, দেশ আক্রান্ত হয়েছে, তাই আমাদের কিছু করা কর্তব্য: সরকার যতোই গ্রহণযোগ্যতাহীন হোক না কেন, এই সংকটকালে তা গৌণ বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে আক্রমণটা প্রথমে কোন পক্ষ করেছিল, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা তখনো হয় নি, তাছাড়া তা গুরুত্বপূর্ণও মনে করা হয়নি।

দেশে ফেরার পর পরই মুনীর চৌধুরী ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সঙ্গে আমি একটা অনুষ্ঠান করি বেতারে। তাতে কিছু পুরোনো সাহিত্যকর্ম থেকে পাঠ করা হয়েছিল। নির্বাচিত রচনাংশে যুদ্ধের উন্মাদনা ছিল না, ছিল কিছুটা উদ্দীপনার ভাব, আর ছিল নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ। মুনীর চৌধুরী বোধহয় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রায়নন্দিনী থেকে পাঠ করেছিলেন, আমি পড়েছিলাম নজরুল ইসলামের যুগবাণী থেকে। মনিরুজ্জামান কী পড়েছিলেন, তা মনে পড়ে না। তবে ওই যুদ্ধের সময়ে তার লেখা গান "আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন" আবদুল আহাদের সুরে গীত হয়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দেশপ্রেমের গান হিসেবে এটি চিরত্ব লাভ করেছে।

আমি যখন দেশে ফিরলাম, তখন বেতারে-টেলিভিশনে-সংবাদপত্রে সর্বত্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর গৌরবগান , চলছে। যুদ্ধকালে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করতে এবং পাকিস্তানি ঐক্যবোধ জাগাতে বাঙালি যোদ্ধাদের বীরত্বকথা সাড়ম্বরে প্রচারিত হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে খুব বেশি করে শোনা গিয়েছিল স্কোয়াড্রন লিডার আলমের কথা।

তবে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পাকিস্তান যেহেতু শান্তি মেনে নিয়েছিল, সুতরাং সেনাদের শৌর্যবীর্যের কথা বলাই যথেষ্ট ছিল না, শান্তির পক্ষেও প্রচার চালানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এমনভাবে যুদ্ধের অবসান পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, কেননা প্রচার-মাধ্যমে পাকিস্তানের সাফল্যের কথা তারা প্রতিদিন জানতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও ছিল শান্তি-বিরোধী, তবে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শান্তিস্থাপনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এমন অবস্থায় বেতারে শান্তির পক্ষে প্রচারের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল যুদ্ধসংক্রান্ত প্রচারের সঙ্গে সংশ্রবহীন নতুন কণ্ঠের।

কর্তৃপক্ষ সৈয়দ আলী আহসান ও আমাকে বাছাই করেন কয়েকটি কথিকা পাঠ করতে। স্থির হয়, অনুষ্ঠানটি হবে আমাদের দুজনের মৌখিক আলোচনার মতো, কিন্তু যথারীতি তা লিখিত হতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হতে হবে। আলী আহসান সাহেবের ধরণ-ধারণ সবসময়েই অভিনব ছিল। তার আহ্বানে গেলাম তারা আগা মসি লেনের বাড়িতে। তিনি মুখে মুখে খানিক বললেন, আমি তা লিখে নিলাম। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার যা বলার তা তখনই লিখে তাকে শোনালাম। তিনি আবার তার কথা বললেন, আমি ফের নিজের কথা লিখলাম। এভাবে আমাদের কথিকা রচিত হয় এবং এমন অনুষ্ঠান বোধহয় আমরা গোটাতিনেক করি। একদিন কোনো এক বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই আমি সেখান থেকে বিদায় নিতে চাই বেতার কেন্দ্রে যাবো বলে। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে রাজনীতিবিদ মাহমুদ আলী একজন। আমার বৈঠক ত্যাগ করার কারণ জেনে তিনি একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কীসের যুদ্ধ, কীসের শান্তি? নিজেরা গোলমাল পাকিয়ে এখন শান্তি-শান্তি করছে। আপনারা যে কেন এসবের মধ্যে জড়ান নিজেদের, তা বুঝতে পারি না।' সরকার যে আমাদের ব্যবহার করছে, সেকথা যে আমি বুঝি নি, তা নয়। তবু ভেবেছিলাম, শান্তির কথা বলে তো ভালোই করছি। হয়তো যুদ্ধের সমর্থনে যারা প্রচার করেছিলেন, তাদের মধ্যেও এ-ধরণের একটা যুক্তি কাজ করেছিল।"[১৮০]

---

[১৮০]. ড. আনিসুজ্জামান (পদ্মভূষণ)/কাল নিরবধি। [সাহিত্য প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। পৃ. ৪২১-৪২৩]

এগারো

"...একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। আইয়ুব খান ঢাকায় এসেছেন। সৈয়দ জিল্লুর রহমান (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী- শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সাবেক সভাপতি) তখন রেডিওর আঞ্চলিক পরিচালক। আমি বাসাতেই ছিলাম। হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠানো হল। আমি গেলে তিনি বললেন, কাল সকালে প্রেসিডেন্ট রেডিও-তে আসবেন। তবে এ আসা তার প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল না। জিল্লুর রহমান কি করে যে ব্যবস্থা করলেন আইয়ুব খানকে রেডিও-তে নিয়ে আসার, তা বলতে পারব না। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রেডিও স্টেশনেই আইয়ুব খান তখন পর্যন্ত যান নি। আইয়ুব খানকে রেডিও-তে আনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিওর কর্মকর্তারা অনেকেই জিল্লুর রহমানের ওপর বেশ চটেছিল। আমাকে জিল্লুর রহমান বললেন, "আপনি যেভাবে সংগীত শিক্ষার ক্লাস নেন সেভাবে আপনি শেখাতে থাকবেন। আমি প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এসে দেখাব।" যাহোক পরেরদিন সকালে আমি প্রস্তুত হয়ে শিক্ষার্থীদের গান শেখাতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়ুব খান এলেন, এসে তিনি বসলেন এবং কিছুক্ষণ গান শেখানো শুনলেন। আমার স্বরলিপির বইটি তখন বেরিয়েছিল। এক কপি বই আইয়ুব খানকে দিলাম। এরপরে যতবারই আইয়ুব খানকে নিয়ে এসেছেন শাহবাগ রেডিও স্টেশনের ছয় নম্বর স্টুডিও-তে বেশ বড় আকারে গান ও নাচের অনুষ্ঠান করিয়েছেন।

...খবর শুরু হল। ঘোষণার পর জাতীয় সংগীত বেজে উঠল। তারপরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কণ্ঠ শোনা গেল- 'আমার প্রিয় দেশবাসী, দশকোটি পাকিস্তানির জন্য অগ্নি পরীক্ষার সময় এসেছে, আমরা এখন যুদ্ধের মধ্যে।' শেষ পর্যন্ত আমাদের আর কমনওয়েলথ ফেস্টিভালে যাওয়া হলো না। প্রকৃত যুদ্ধটা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সে সময় বাঙালি সৈনিকরা খুবই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। আর বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ হয়েছিল রেডিওর মাধ্যমে। এদেশের সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা একযোগে সাড়া দিয়েছিল- নিজেদের দেশ বিপন্ন একে রক্ষা করতে হবে। রেডিও-কে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল

সকাল থেকে শুরু হতো একের পর এক শিল্পীর আসা এবং তাদেরকে দিয়ে সমবেত কণ্ঠে উদ্দীপনার গান, দেশের গান রেকর্ড করানো। শিল্পীরা কেউই পারিশ্রমিক নিতেন না। ঠিক তেমনিভাবে আসতেন সাহিত্যিকরা কবিতা, নাটক ইত্যাদি রেকর্ড করাতে। যেভাবে সেদিন বাংলাদেশ সাড়া দিয়েছিল তেমনটি জীবনে আমি দেখিনি। পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ হয়েছিল কামান-বন্দুক দিয়ে আর এখানকার যুদ্ধ হয়েছিল কণ্ঠ দিয়ে। সমস্ত শিল্পীকে নি:স্বার্থভাবে সংঘবদ্ধ হতে এভাবে আর কখনও দেখিনি। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মকর্তারা বলেছিলেন, ঢাকা রেডিও আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছিল তা না হলে এত ভাল ভাল গান, কবিতা ও নাটক কিভাবে তারা প্রচার করল। সত্যিকথা বলতে সেদিন যেসব উদ্দীপনামূলক দেশের গান সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস লিখতে গেলে সেসব গান বা কবিতাকে কোনভাবেই বাদ দেয়া যায় না।

যুদ্ধবিরতির পর এখান থেকে তিনজন লেখক সরকারের আমন্ত্রণে পশ্চিম পাকিস্তানের রণাঙ্গন পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। মুনির চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক এবং রফিকুল ইসলাম। ফিরে এসে তারা একটি বই লিখেছিল 'রণাঙ্গন' নামে। বইটির প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শিল্পী রশিদ চৌধুরী। আমাকে দেয়া সৈয়দ শামসুল হকের নাম লেখা বইটির একটি কপি আজো আমার কাছে আছে।"[১৮১]

বারো

"...প্রবাসের সময় শুধু একবার কি দু'বার আমরা পূর্ব ও পশ্চিম নির্বিশেষে সব পাকিস্তানি দেশের সমস্যা ও আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে একমত হয়েছিলাম। প্রথমবার ছিল '৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সময়।

১৮১. আবদুল আহাদ (প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ)/আসা যাওয়া পথের ধারে। [অনুপম প্রকাশনী- জানুয়ারি, ২০০৬।] পৃ. ১২৬। ১৩৪-১৩৫।

যুদ্ধ কে শুরু করেছে, কেন করেছে, এসব প্রশ্নই ছিল তখন অবান্তর। দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, পাকিস্তান দুর্যোগের সম্মুখীন। এখন সব ভিন্নতা ভুলে দেশকে রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হতে হবে। এক ধরণের অভূতপূর্ব দেশপ্রেমে ভাসছিল (প্রবাসের) ছোট পাকিস্তানী গোষ্ঠী।

...দেড় বছর পর ঢাকায় ফিরে এসে (থাইল্যান্ড থেকে) শুনেছিলাম সেই সময় আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা, বিশেষ করে নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কথিকা, আবৃত্তি ও অন্যান্য প্রচার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশের লোককে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কেউ যুদ্ধের পর রণাঙ্গন পরিদর্শন করে ফিরে এসে পাকিস্তানি যোদ্ধাদের শৌর্যবীর্যের উচ্ছসিত বিবরণও দিয়েছিলেন। জন্মের দু'-এক বছরের পর পাকিস্তানের দুই অংশ এমনভাবে আর কখনো একাত্মবোধ করেনি।"[১৮২]

তেরো

[পাক-ভারত যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং পাকিস্তান কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় আমরা পশ্চিম পাকিস্তান ও কাশ্মীর রণাঙ্গন পরিদর্শন করি। রণাঙ্গনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা পরবর্তী সময়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেছি। আমাদের সে অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।- মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম]

"...এখনও রণাঙ্গনে সূর্যোদয় হয়। সকাল দুপুরে গড়ায়। আম্রকুঞ্জে স্তব্ধতা নামে- ঘুঘু ডাকে- ফিংগে ওড়ে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি নিমপাতার ঝালর থেকে খসে পড়ে ধান-শীষের ডগায় ডগায়। চাঁদের আলোয় অন্ধকার আড়াল হয়। তারপর অকর্মণ্য স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে শত্রুর কামান গর্জন করে ওঠে। বিস্ফোরিত গোলার রক্তিমাভ আলোয় তন্দ্রালোক কঠিন হয়। যুদ্ধ শেষ হয়েও হয় না। এই রণাঙ্গন- পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর পূর্ব সীমান্তে। শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরের সংলগ্ন ভূখন্ডে সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ বাঁধে। তারপর আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যুদ্ধ-বিরতি আরোপিত হয়। কেউ অস্ত্র সংবরণ করে- কেউ গোপনে গোপনে প্রস্তুতি চালায় চুক্তিভংগের। যে রণাঙ্গনে এখন একটা কৃত্রিম প্রশান্তি বিদ্যমান- সেখানে আমরা ক'জন, যারা যোদ্ধা নই, লেখক মাত্র পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ছম্ব থেকে শিয়ালকোট, শিয়ালকোট থেকে বাদিয়ান, বাদিয়ান থেকে চাবিন্দা, চাবিন্দা থেকে কাসুর- একটি একটি করে রণপূণ্যভূমি পরিদর্শন করেছি। দেখতে দেখতে মনের পটে ভেসে উঠেছে যুদ্ধের প্রতিটি দিনের রক্তাক্ত ইতিহাস, পাকিস্তানের বীর সেনানীর শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস।

...সারা শহরে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এই সংবাদ। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে জাতি। কী দু:সাহস এই পররাজ্য লোভী হিংস্র বর্বর ভারতের। একে একে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, মানভাদাড়, গোয়া দখল করে কাশ্মীরের জনসাধারণের প্রতি দেয়া ওয়াদা খেলাপ করে পায়ের নীচে তাদের পিষে মারবার ঘৃণ্য আয়োজন করেও ক্ষুধা মেটেনি ভারতের। সে এখন পাকিস্তানের পবিত্র ভূমিতে তার নখর বিদ্ধ করেছে।

দুপুর দেড়টার অনেক আগে থেকেই যেখানে যত রেডিও সেট ছিল, সবগুলো ঘিরে দাঁড়াল মানুষ। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে- ক্রোধ প্রশমিত করে- হাতের মুঠো শক্ত করে রেডিও সেটের চার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে পথচারী, কুলি, মজুর, ব্যবসায়ী, কেরাণী, অফিসার, ছাত্র, শিক্ষক। যে যে কাজে আছে, সব এই মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেছে। কান পেতে রয়েছে কখন প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন।

বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। জনতা দাঁড়ালো আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে। যারা তখনো এসে পৌঁছুতে পারেনি- তারা দ্রুতপায়ে বাড়িয়ে তুলল ভীড়। পথের মোড়ে মোড়ে পান-দোকানের সেটের চার পাশে- পঞ্চাশ একশ দু'শ করে লোক দাঁড়িয়ে আছে। অফিসে সেদিন অফিসারের কামরায় তিল ধারণের জায়গা নেই।

---

[১৮২]. আবুল হোসেন (কবি)/আর এক ভুবন। [অবসর- ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। পৃ. ১৫৮-১৫৯]

বাড়ীতে বাড়ীতে রান্না ফেলে মা-বোনেরা হলুদ-মাখা হাতে রেডিও সেটের সামনে এসেছেন। যে ছোট ছেলেটা খেলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না- সেও বড়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন উৎকর্ণ হয়ে। প্রেসিডেন্টের কণ্ঠ শোনা গেল- 'আমার প্রিয় দেশ-বাসী, আজ ১০ কোটি পাকিস্তানীর জন্য অগ্নি-পরীক্ষার সময় এসেছে।' জনতা শুনল পাকিস্তানের ওপরে ভারতের অতর্কিত আক্রমণের কথা। মুহূর্তে রচিত হয়ে গেল জ্বলন্ত ইতিহাস- যখন প্রেসিডেন্ট বললেন- 'লাহোরের নির্ভীক বীর জনসাধারণ সর্ব প্রথম শত্রুর মোকাবেলা করার সুযোগ পেয়েছে। শত্রুদের চরম আঘাত হানতে পেরেছে বলে ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম অমর হয়ে থাকবে।' আর তার পরমুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট উচ্চারণ করলেন- 'পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের হৃদয়ে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'- এই ধ্বনি স্পন্দিত। ভারতের কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত দশ কোটি পাকিস্তানী বিশ্রাম গ্রহণ করবেনা।' এই উচ্চারণের সাথে সাথে যেন একটা ইন্দ্রজাল ঘটে গেল। যেন এক মুহূর্তে পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের বাহু হয়ে উঠল বজ্র; প্রতিরোধে এক একটি মানুষ হয়ে গেল উদ্ধত বীর সৈনিক। সে প্রতিরোধ চূর্ণ করে- এমন শক্তি বুঝি আজো পৃথিবীতে জন্ম গ্রহন করেনি।

প্রেসিডেন্টের ভাষণ শেষে আবার বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। জনতা তখনো অনড় দাঁড়িয়ে আছে। আজ নতুন দৃপ্ত মহীয়ান মনে হচ্ছে এই সুর। তার প্রতিটি ধ্বনি যেন ডাক দিচ্ছে- 'জাগো, জাগো, জাগো' বলছে, 'এগিয়ে যাও, আমি তোমার স্বদেশ, আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, আমাকে রক্ষা করো, শত্রুকে আঘাত হানো।' জাতীয় সঙ্গীতের শেষ ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে জনতা চলতে লাগল। ফিরে গেল যে যার কাজে, যে যার গন্তব্যের দিকে। আকাশে প্রখর রৌদ্র, তাদের পদক্ষেপে প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। আমরা সেদিন বিশ্বের এক মহান দৃশ্য দেখেছি। আমরা দেখেছি যে জনতা রেডিওর চার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে তাদের এক আশ্চর্য রূপান্তর। এক কঠিন স্বজাত্য চেতনা, স্বদেশ প্রেরণা, আর দুর্জয় সাহস তাদের প্রত্যেককে উন্নততর একেকটি সজীব মানুষে পরিণত করে দিয়ে গেছে ৬ই সেপ্টেম্বর।

...বাদিয়ানের কোন একটি অগ্রবর্তী এলাকা। খেমকারানের পথে আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। এ অঞ্চলের সেনাপতি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন- এই এলাকার পূর্ব-পাকিস্তানী বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের। উচ্ছসিত প্রশংসা করছিলেন তিনি। বলছিলেন, 'এই বীরেরা এখানে না থাকলে, এই খণ্ড যুদ্ধের ফলাফলটাই হয়ত অন্য রকম হয়ে যেত।' পূর্ব-পাকিস্তানীদের এ সুনাম যে কতটা বিস্তৃত হয়েছে- এ ক'দিনে তার একটা প্রমাণ- আজ জওয়ান এবং অফিসারদের মধ্যে কথাবার্তায় শখ করে বাংলা শব্দ ব্যবহার একটা স্মার্টনেস হিসেবে গণ্য হচ্ছে। আর যারা ভাংগা ভাংগা উচ্চারণে বাংলা ভাষার পুরো একটা বাক্য আওড়াতে পারেন বা কোন গান কি কবিতার লাইন আওড়াতে পারেন- তাদের তো কথাই নেই, তারা রীতিমত ঈর্ষার পাত্র অন্যান্যদের কাছে। যেমন চাবিন্দার এক অফিসার চায়ের পরে আমাদের সবাইকে সিগারেট দিচ্ছিলেন। সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা তুলে নিতে যাচ্ছি- হঠাৎ শুনি, অনভ্যস্ত উচ্চারণে তিনি আবৃত্তি করে উঠলেন- 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।'

...গাছপালা ঢাকা একটা জায়গা, খেত-মাঠ পেরিয়ে এখানেই সৈনিকদের ছাউনি। জায়গাটা বাংলার যে কোন গাঁয়ের আম-জাম-সুপারী বাগানের মতো। আমগাছ রয়েছে, রয়েছে নিম আর তেঁতুলের গাছ। ঠিক সেই কুলের গাছ চোখে পড়ল, আর আলোকলতা। সোনালী লতা লতিয়ে উঠেছে। কুল গাছের তলা দিয়ে সেই পরিষ্কার ছোট বন, বন না বলে ছায়াকুঞ্জই বলা ভাল। সেই ছায়াকুঞ্জে ঢুকলাম। এক পাশে জওয়ানদের জন্যে রান্না হচ্ছে। তারই সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘুর ঘুর করছে বেড়াল। জটলা করছিল কয়েকজন জওয়ান। তারা আমাদের কেমন একটা মায়াভরা চোখে তাকিয়ে দেখল। তার অর্থটা বুঝলাম একটু পরেই। বুঝলাম, যখন তাদের ক'জন আমাদের কাছে এল। কাছে আসতেই আর সন্দেহ রইল না, সেই অতি চেনা- লজ্জিত হাসি, সংকোচ, সেই নাতিদীর্ঘ শরীর, পুরানো তামার পয়সার মতো গায়ের রং, চারদিকের শ্যামল-সবুজের সংগে একেবারে এক হয়ে যাওয়া চেহারা-চলন। জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ী কোথায়? উত্তর এলো কুমিল্লা। আরো এল অনেকে। তাদের কেউ যশোহরের, কেউ বরিশালের, নোয়াখালীর, ঢাকার, ময়মনসিংহের।

...পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্তান- বৌদ্ধ মেজরের সংগে আলাপ করে এটাই মনে হল যে, দেশের ডাকে পাকিস্তানের সব সম্প্রদায়- সব ভাষাভাষী মানুষ এক ভাবে সাড়া দিয়েছে। শত্রুকে তো তারা হটিয়ে দিয়েছেই, সেই সংগে সবাই উপলব্ধি করেছে, প্রমাণ করেছে শুধু কথায় নয়, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিরহংকার কর্ম-নীতির ভেতর দিয়ে যে, আমরা পাকিস্তানী- আমরা একজাতি, একপ্রাণ- একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিচিত্র ধর্ম, ভাষা, রক্তের দশ কোটি মানুষ।

...অনিবার্য পরিণতি আর শত্রু-শক্তির ধ্বংস কামনায় দৃঢ়সংকল্পে আমাদের বীর সেনানীর হৃদয়ের বহ্নি। কে একজন তার সংগ্রহ থেকে একটা ছেঁড়া বই তুলে দিল। খেমকারানের কোনো কিশোর হিন্দীভাষী শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক। পাতা উল্টাতেই দেখি- লেখা আছে হিন্দী ছড়া-

'গোপাল হায় বড়া আলবেলা
দো মোগল সে লড়ু একেলা।'

হায় গোপাল, হিন্দী শিক্ষার মিথ্যা বেসাতী, তোমাকে মুক্তি এনে দিতে পারল না; দুই মোগলকে একা কাবু করার কামনায় তোমার যে গুরুরা উন্নত হয়ে উঠেছিল- তারা সংকটের দিনে তোমাকে রক্ষা করতে পারল না।

...ঐ যে বাজারটা, তার কাছেই অপরদিকে খেমকারান থানা। থানা না বলে দূর্গ বলাই সঙ্গত। থানার দরজা-জানালা, দেয়াল এত মজবুত ও থানার চত্বর এত সুরক্ষিত যে, দূর্গ ছাড়া আর কোনো কিছু বলে তাকে ভাবা অসম্ভব। সেই দূর্গ শীর্ষে আন্দোলিত পাকিস্তানী পতাকা। সেই অপূর্ব আন্দোলন দেখে মন এক মুহূর্তে গৌরবে ভরে ওঠে। নিজের নিশানকে এত প্রিয়, সুউচ্চ, প্রতীকি বলে হয়ত আর কখনো মনে হয়নি।

...সাতদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। সাতটা দিন একটা যুদ্ধের- এমন একটা যুদ্ধের সম্পূর্ণ ছবি মনের মধ্যে তুলে নেয়ার জন্যে হয়ত যথেষ্ট নয়; কিন্তু চোখ ছিল সজাগ, মন ছিল তৃষ্ণার্ত- তাই এই সাতদিনে যতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি তা হয়ত একটা সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সমান। প্রতিটি যোদ্ধাকে নিয়ে বীরগাঁথা রচিত হতে পারে, প্রতিটি ঘটনা হতে পারে পূর্ণাঙ্গ একটি নাটক বা উপন্যাস, এর একেকটি মুহূর্ত হতে পারে কবিতা, যে কোনো রণাঙ্গন হতে পারে সৃষ্টির বিস্তৃত পটভূমি।

আমাদের ইচ্ছে আছে, একদিন এ নিয়ে বড় কিছু লিখব- কেউ নাটক, কেউ গল্প, কেউ উপন্যাস, কেউ কবিতা, কেউ আঁকবো ছবি। ইচ্ছে আছে, সেদিন হয়ত এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে একটা মানবিক দলিলে রূপান্তরিত করতে পারবো আমাদের সীমিত সাধ্য অনুযায়ী...

'যুগের চূড়ায় শুনি 'হুনায়েন-বদরের' আরাব আবার,
মনে হয় এরা সেই মোজাহিদ ইসলামের অগ্নি-জমানার,
ইহাদের শৌর্য-বীর্যে পাকভূমি রচিয়াছে নীড় আপনার;
ইহাদের বক্ষপুটে ধ্বনিতেছে রসুলের মহান পয়াম;-
জ্বলন্ত-স্ফুলিঙ্গ এই পূর্ব পাকিস্তানী জনে জানাই সালাম।'[১৮৩]

চোদ্দো

"...যে সদ্যনির্মিত বাড়িতে উঠলাম, সেগুলিকে বলা হত টুইন কোয়ার্টার্স (Twin quarters) পাশাপাশি দু'টি ডুপ্লেক্স, সামনে-পেছনে বেশ খানিকটা জমি নিয়ে প্রতিটি বাড়ির কম্পাউন্ড এবং প্রাচীরবেষ্টিত। আমার স্ত্রী মহাউৎসাহে কৃষিকর্ম — পেছনের জমিতে সবজিক্ষেত শুরু করলেন। অবশ্য সামনের চত্বরে পাশাপাশি মৌসুমী ফুলের চর্চাও ছিল। ক্যাম্পাসে এ-পর্যায়ে দু'ধরনের বাসগৃহ তৈরি হয়েছিল — সদা উল্লেখিত টুইন-ফ্ল্যাট, দোতলা ও ৬টি ফ্ল্যাট নিয়ে ৩ তলা বাড়ি। এই ফ্ল্যাটগুলিও ছিল সুপরিসর।

১৮৩. রণাঙ্গন/মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম। [নিউ লিফ- জুন, ১৯৬৬। পৃ. সংক্ষেপিত]

ষাটের দশকে এই ছিল রেওয়াজ। এরপর যত সময় গড়িয়েছে, সরকারি-আধাসরকারি ভবনের পরিসর সঙ্কুচিত হয়েছে। বিরাজমান অর্থনৈতিক বাস্তবতাই বাধা করেছে আমাদের আবাসন চিন্তা ও কল্পনার রশ টেনে ধরতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী যারা দখলদারমুক্ত রাজশাহী ক্যাম্পাসে এল, তারা ক্যাম্পাসের বাড়িঘরের চেহারা দেখে মন্তব্য করেছিল, এত ভালো ব্যবস্থা তোমাদের, তবুও তোমরা নাখোশ ছিলে পাকিস্তানিদের প্রতি? মন্তব্য করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদস্থরি কোন সদস্য। ওদের একটা রক্তের টান ছিল পরাজিত পাকিস্তানিদের প্রতি। তবে এটাও মিথ্যে নয় যে আমাদের সরকারি আধা-সরকারি ভবন নির্মাণে আমরা দেশের সীমিত সম্পদের কথা সব সময় বিবেচনা করিনি, দেশের অধিকাংশ দরিদ্র জনগণের কথা ভাবিনি এবং সকল ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের পরিচয় দিতে পারিনি। মতিহার ক্যাম্পাসে উপাচার্য ভবন ও প্রভোস্ট ভবন আমাদের এই বিলাসী কল্পনার নজির।

...দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল সেপ্টেম্বরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ক্যাম্পাসে রাতের বেলা নিষ্প্রদীপ, প্রত্যেক বাড়িতে বালুর স্তুপ দিয়ে দরোজার সামনে বাঁধ তৈরি, সারা দিনের উত্তেজনাময় আলাপ যুদ্ধের প্রতিদিনের পরিস্থিতি নিয়ে, রাতে জাগরণ ও ক্যাম্পাসবাসী আমাদের পালাক্রমে প্রহরীর কর্তব্য পালন। কী ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শুধু জানতাম, জেগে থাকতে হবে, ও ওপর থেকে কোন নির্দেশ এলে পালন করতে হবে। পাকিস্তানে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল, যুদ্ধের ধাক্কায় সব মিলিয়ে গেল। পূর্ববাংলায় আমরা এক প্রবল পাকিস্তানি ভাবের জোয়ারে ভেসে গেলাম।

রেডিওতে (তখনও টেলিভিশন আসেনি) দেশাত্মবোধের বন্যা বইয়ে দিলেন কর্তৃপক্ষ। রেডিও পাকিস্তানের রাজশাহী কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ প্রচারনায় খুব সফল অনুষ্ঠান করলেন আমাদের বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল। একাত্তরে তার এই সাফল্যই তার কাল হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্র থেকে এধরণের অনুষ্ঠান করে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি জনাব নূরুল মোমেন, নাট্যকার। যুদ্ধের সঙ্কট এভাবেই কোন কোন ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতার এক অজানা কক্ষ উন্মোচন করে দেয়। এভাবেই, একাত্তরে দিয়েছিল সাংবাদিকতার জগত থেকে আসা এম. আর. আখতার মুকুলকে।

কথায় আছে, যুদ্ধের প্রথম বলি হল সত্য। '৬৫-র সেপ্টেম্বরের ১৭ দিনের যুদ্ধে, '৭১-এর নয় মাসের যুদ্ধে, এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রেডিওতে আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রচারকর্মটির নাম ছিল 'শুভঙ্করের ফাঁকি'। আমার সঙ্গে ওর ছিল একটা দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমি শুধু এই জানি যে আবু হেনা তার বেতার-প্রচারে একটাই লক্ষ্য রেখেছিলেন,- কিছু তথ্য দিয়ে ভারতীয় প্রচারণার ত্রুটি খুঁজে করা। তার নিজস্ব অপরূপ বাকভঙ্গি দিয়ে তিনি এ-কাজটি করতেন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ-সব পাল্টাপাল্টি রেডিও-প্রচার যুদ্ধে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। আমি জানতাম, আবু হেনা যা করছে, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার দায়েই তা করছে। তার ভিতরে-ভিতরে চলছে সার্বক্ষণিক রক্তক্ষরণ। কিন্তু যুদ্ধশেষে মুজিবনগরের বিচারকেরা সেটা বিবেচনায় আনেনি। আবু হেনার নিজের শুভানুধ্যায়ী নিলীমা ইব্রাহীমও অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রতি। যুদ্ধের পর বেশ কিছুদিন, বাংলাদেশ বেতারে আবু হেনা ছিল নিষিদ্ধ শিল্পীর তালিকায়।

কিন্তু '৬৫-র যুদ্ধসময়ে তিনি যা করেছিলেন, তা সর্বান্তকরণেই করেছিলেন মনে করব। সেদিন আমরা সবাই মনে-প্রাণে পাকিস্তানী ছিলাম। আমাদের বাঙালিত্ববোধের সঙ্গে এর কোন বিরোধ সেদিন আমরা দেখিনি। পশ্চাদ্দৃষ্টিতে একটু অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে, কিন্তু সেদিনের বাস্তবতা বোধহয় এরকমই ছিল।[১৮৮]

---

১৮৮. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী/আমার চলার পথে। [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, জুন, ২০১২। পৃ. ১৩৬/১৩৫]

পনেরো

"...ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালা বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ) সে সময় (১৯৪৭) কি-কি ভাগে পেয়েছিল তার একটি মোটামুটি ধারণা অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর থাকা দরকার।

পূর্ববঙ্গ পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এলাকা। আর এ জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই ছিলেন আধা-সর্বহারা বা সর্বহারা।

এখানকার অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। ধনশালী আর সম্পদশালী ছিলেন তাঁরাই। পূর্ববঙ্গের বড় ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রায় সবই হিন্দু সম্প্রদায়েরই ছিলেন। তাঁদের বৃহৎ অংশই অর্থাৎ ধন-সম্পদশালীদের প্রায় সবাই যা কিছু গড়েছিলেন বা বিনিয়োগ করেছিলেন তার প্রায় সবই কলিকাতা ও হুগলী ভিত্তিক এবং বাঙ্গালা বিভক্তির পর তাঁরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে তাঁদের পুঁজি-সঞ্চিত অর্থসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সবই ভারতে চলে যায়। জ্ঞান চক্রবর্তী তাঁর 'ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ' বইয়ের ১৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে হিন্দু জনসাধারণ প্রথম হইতেই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ফলে দেশ বিভাগের পরেই হিন্দুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ শুরু করে। হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই অপশনের ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও, বিশেষ করিয়া আর, এস, পি, ও ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকেরা তাহাদের পরিবারসহ দেশত্যাগ করে।'

ঐ পর্যায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে মূলতঃ তেমন কোন মূলধন ছিল না। এমনকি এ অঞ্চলের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট ব্যবসায়টিও মূলতঃ হিন্দু মাড়ওয়ারীদের হাতেই ছিল। তারা আবার মুনাফার টাকাটা ভারতেই বিনিয়োগ বা স্থানান্তরিত করতেন।

পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা। তাই কয়েক হাজার সম্পদশালী হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার ফলে শুধু যে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল তাই নয়, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

সে বিপর্যস্ত অর্থনীতির পাশাপাশি ভারত থেকে আসতে থাকল লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাস্তুত্যাগী মানুষের ঢল যার সংখ্যা সরকারী হিসাবেই সাত লক্ষ বলে বলা হল।

পূর্ববঙ্গের ভাগে চাষযোগ্য জমি পড়েছিল সর্বমোট দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একরের মত, যার মধ্যে ঐ সময়কালে এক কোটি আশি লক্ষ একরের মত চাষ করা সম্ভব হত; আর এর মধ্যে আঠার লক্ষ একরের মত পাট চাষযোগ্য জমি ছিল। অর্থকরী ফসল বলতে ছিল একমাত্র পাট। কিন্তু বাঙ্গালার ৬৮,২৫৮টি তাঁত সম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে ছিল না। আর এখানে খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হত তা আবার এই প্রদেশের জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম; তাই ছিল খাদ্য ঘাটতি সমস্যা।

শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাই চাকুরীর ক্ষেত্রেও এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ই অগ্রগামী ছিলেন; তাদের মধ্যকার সক্ষম অংশও তখন ভারতে চলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র উল্লেখ থেকেই তখনকার পূর্ববঙ্গের বাকি অবস্থাটা বুঝতে পারা যাবে, তাহল এই যে, সে সময় সুপেরিয়র সিভিল সার্ভিসের মধ্যে মাত্র একজন এখানকার মুসলমান কর্মচারী ছিলেন।

এর ফলে যে প্রশাসন যন্ত্র পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর চেপে বসে তা গঠন করতে হয় পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের লোক ও বাস্তুত্যাগীদের মধ্য থেকেই।

খনিজ সম্পদ বলতে পূর্ববঙ্গ কিছুই পায়নি। তবে এখানে মৎস্য সম্পদ ছিল। আর ছিল দুই লক্ষ হস্তচালিত তাঁত।

বন সম্পদ যা পাওয়া গিয়েছিল তা রাজেন্দ্র প্রসাদ-এর 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' বইয়ের ১৯০ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতির তথ্যই যথেষ্ট। তিনি বলেছেনঃ 'ঐ সময়ের (বিভাগপূর্ব) সমস্ত বাঙ্গলার ৬,৫৮,০০০ টাকা সরকারী রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চলের মধ্যে যে অংশ পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে তার সরকারী রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,০০,০০০ টাকার কিছু উপরে। আর পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল ৪,৫০,০০০ টাকা রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চল।'

অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভাগে বনসম্পদ পড়েছিল রাজস্ব আদায়ের অনুপাতে সমগ্র বাঙ্গলার বন সম্পদের ১৩ ভাগের ৪ ভাগ মাত্র।

পূর্ববঙ্গের স্থলপথ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পাকা রাস্তা এখানে ছিল না, তবে রেলপথ উন্নত ছিল এবং রেলপথ পাওয়া গিয়েছিল ১,৬১৯ মাইল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেলপথগুলি খুব বেশী ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিন ও গাড়ী যা পাওয়া গিয়েছিল তার অবস্থা প্রায় ভগ্নদশায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

শিল্প বলতে যা বুঝায় তা পূর্ববঙ্গের ভাগে যা পড়ে ছিল তা অতি নগণ্য-তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প এখানে স্থাপিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর আর. কুপল্যান্ড-এর খতিয়ানটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'The future in India' (ভারতের ভবিষ্যৎ) বইয়ের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, 'বৃটিশ ভারতের শতকরা ২০ ভাগ লোকের বাস বাঙ্গালায় এবং শিল্পীয় শ্রমিকের সংখ্যার হিসাবের অনুপাতে বৃটিশ ভারতের ৩৩ শতাংশ শিল্প বাঙ্গালায় অবস্থিত। কলিকাতা বাদে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত বৃটিশ ভারতের শিল্প মাত্র ২.৭ শতাংশ।'

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের সমগ্র শিল্পের মধ্যে বাঙ্গালায় ছিল ৩৩ শতাংশ শিল্প। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গ পেল ঐ ৩৩ শতাংশের মধ্যে মাত্র ২.৭ শতাংশ, আর বাকি ৩০.৩ শতাংশ শিল্পের অধিকারী হল ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। তাছাড়া বৃটিশ ভারতের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পড়েছিল সমগ্র পাকিস্তানের ভাগে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' বইয়ের ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল : পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু (অর্থাৎ তদানিন্তন পাকিস্তান- লেখক) অংশে বৃটিশ ভারতের ২৬.৭ শতাংশ লোকের বাস ছিল; কিন্তু এসকল অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে শিল্পের অবস্থান ছিল বৃটিশ ভারতের মাত্র ১৩.৯ শতাংশ। আর বৃটিশ ভারতের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৭.৩৬ শতাংশ শ্রমিক এ সকল অঞ্চলের (অর্থাৎ তদানিন্তন সমগ্র পাকিস্তান- লেখক) শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

আসলে শিল্পের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ পরিপূর্ণভাবেই অবহেলিত ছিল। এমনকি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এ. কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমুদ্দীন এক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী হতে পারেননি।

পূর্ববঙ্গে কি-কি শিল্প তখন ছিল না বা পশ্চিমবঙ্গে কি-কি শিল্প পড়ল তা বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। শুধু পূর্ববঙ্গ তখন শিল্প বলে যা পেয়েছিল তাই এখানে উল্লেখ করছি আর তা হল :

১. ৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ছাতকে। ২. ৭টি কাপড়ের কল ২৬০০ লুম ও ১,১২,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত। ৩. ৫টি চিনির কল। ৪. ৩৫ থেকে ৪০টির মত জুট বেলিং প্রেস। ৫. ৬০/৬৫টি ধান ভাঙ্গান কল। ৬. ছোট ছোট কয়েকটি ছাপাখানা। ৭. ছোট-খাট কয়েকটি এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ও ডক। ৮. মাত্র ৭,৭০০ একরের চা বাগান। ৯. সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীতে শুধু মেরামতযোগ্য দুটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। ১০. ছোট ৪টি ম্যাচ (দিয়াশলাই) কারখানা।

এর বাইরে উল্লেখ করার মত আর কোন শিল্প পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়েনি। পূর্ববঙ্গ আর যা পেয়েছিল তা হল : (ক) মাত্র ৭২৮৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। (খ) নদী পথে চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী কিছু জাহাজ ও লঞ্চ ছিল। (গ) নদী পথে মাল চলাচলের জন্য বার্জ, ফ্লাট,

স্টিমার ও টাগ প্রভৃতি ছিল। (ঘ) সে সময়কালে বছরে মাত্র ৫ লক্ষ টনের মত মাল হ্যান্ডলিং করার ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম বন্দর। (ঙ) ঢাকায় একটি ছোট বিমান ঘাটি ছিল। এ প্রসঙ্গে আর উল্লেখ করার মত কিছু পূর্ববঙ্গ পায়নি।

পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তখন পূর্ববঙ্গে (সমগ্র পাকিস্তানে নয়) পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের বিশ্লেষণ করে এই সরকারকে উচ্ছেদের আহবান জানিয়ে হাজার হাজার গোপন ইস্তাহার বিলি করেছিলেন। তাঁদের সেই কৃষকসভা সর্বস্ব 'পার্টি'র 'সশস্ত্র বিপ্লবের' নামে হঠকারিতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল প্রধানত পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চল। এই বিপ্লবের পর্বে পূর্ববঙ্গের কৃষির যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হয়েছিল। এমনিতেই এখানে খাদ্য ঘাটতি থাকত, তার উপর ১৯৪৮-৪৯ সালের উৎপাদনের হিসাবের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সালে তিন লক্ষ টন চাউল কম উৎপাদন হল। এর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সালে পাটের উৎপাদন অর্ধেকেরও নীচে নেমে যায়। যেমন ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে পাট উৎপন্ন হয়েছিল ৬৮,৪২,০০০ বেল সেখানে ১৯৪৯-৫০ সালে পাট উৎপন্ন হল মাত্র ৩৩,৩৩,০০০ বেল। একদিকে চাউলের উৎপাদন ঘাটতি এবং অন্যদিকে বিনিময়পণ্য পাটের উৎপাদনের বিপর্যয়ের ফলে ১৯৪৯ সাল থেকে পূর্ববঙ্গে খাদ্য সংকট অত্যন্ত তীব্ররূপ ধারণ করেছিল।

এই সময়কালে বেশকিছু সু-শিক্ষিত ও প্রতিভাবান তরুণও মার্কসবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন এবং মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন, যদিও ঐ হঠকারী 'বিপ্লবে'র ফলে তারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

সে সময়কালের ঐ কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থান প্রসঙ্গে জ্ঞান চক্রবর্তী তার 'ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ' বইয়ে বলেছেন, 'পাটির অধিকাংশ কমরেডই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ...অপরদিকে মুসলিম লীগের প্রচার এবং মুসলিম জনসাধারণের পার্টি বিরোধী মনোভাবের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত পাটি কর্মীদের ভিতরে অনেকেই পার্টির সহিত খোলাখুলি যোগাযোগ রাখিতে ইতস্ততঃ করিতে থাকেন (পৃঃ ১৩৭) ...পার্টির সমস্ত কিছু গোপন ব্যবস্থা ছিল হিন্দু কমরেডদের ভিত্তি করিয়া এবং পাটির সক্রিয় কর্মীর বেশীর ভাগই হিন্দু সম্প্রদায় হইতে আগত (পৃঃ ১৪৯)।'

একদিকে প্রচলিত ঐ হঠকারী সশস্ত্র সংগ্রামের কার্যকলাপ, অন্যদিকে খাদ্য সংকটসহ পূর্ববঙ্গের জনগণের অন্যান্য দুঃখ-দুর্দশার কারণে সৃষ্ট অসন্তোষ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে আশংকায় মুসলিম লীগ সরকার আতংকিত হয়ে উঠেছিল। সে সময় ৯০ শতাংশেরও বেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ঐ কমিউনিস্ট পার্টির 'সভ্য' থাকার সুযোগে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে সে 'সশস্ত্র সংগ্রাম' ও গণ-অসন্তোষ দমনের কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার কিছু ভাড়াটে লোকজন তথা গুন্ডাপান্ডাদের উস্কানি দিয়ে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গে এক জঘন্য হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে তথাকথিত 'সশস্ত্র সংগ্রামে'র অবসান ঘটাতে প্রয়াশ পায়। কিন্তু ভারতেও শুরু হয়েছিল এক ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

এর ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও মহাজনসহ দক্ষ হস্তশিল্পী ও কারিগর এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ব্যাপক আকারে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে যান। অপরদিকে পূর্ববঙ্গে আসতে থাকে উদ্বাস্তুদের ঢল যাদের অধিকাংশই আসেন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি বলতে বাকী যা ছিল তা ঐ পর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল আর সে সঙ্গে ঐ হঠকারী রাজনীতির খেসারত দিতে হল লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ জনসাধারণকেই।

ভারতবর্ষ তথাকথিত ধর্মভিত্তিক বিভক্তির মধ্য দিয়ে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ফলে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পরে এখানে সার্বিকভাবেই একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানে রাজনৈতিক অঙ্গন তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থাটারও নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছিল

এবং অবশ্যই এই নূতন আঙ্গিকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যম্ভাবী হয়ে
পড়েছিল। তাছাড়া যেখানে বৃটিশ ভারতের ২৬.৭ শতাংশ মানুষের পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল বৃটিশ
ভারতের মাত্র ১৩.৯ শতাংশ শিল্প, আর ঐ শিল্পে নিযুক্ত ছিল বৃটিশ ভারতের মাত্র ৭.৬৬ শতাংশ শ্রমিক.
পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রশ্ন তুললে দেখা যাবে যে বৃটিশ ভারতের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষের
পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়েছিল মাত্র ২.৭ শতাংশ শিল্প, আর শিল্পীয় শ্রমিকের অনুপাতে শিল্পীয় শ্রমিকের সংখ্যা
পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়েছিল মাত্র ১.৪৩ শতাংশ।

উপরন্তু, ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাত্র এক বছর পর 'ধর্মভিত্তিক' দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি
স্বাভাবিকভাবেই উভয় দেশের সংখ্যালঘু জনসাধারণের মধ্যে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছিল; আর এ ভয়-
ভীতি নিরসনের দায়-দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই বর্তায় শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির উপর
(যদি তা থাকে) অথবা শ্রমিক শ্রেণীর উপর। কোন কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে ঐ অবস্থায় কোনরূপ
হঠকারিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে কমিউনিষ্ট নামধারী 'সংকীর্ণতাবাদী পার্টি'
বা 'সংকীর্ণচেতা কমিউনিষ্টদের পক্ষে হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে ঘোলাজলে মৎস্য শিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ
করা খুবই স্বাভাবিক।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরই ঐ সকল 'কমিউনিষ্ট'রা যে ভাবে আর যে পদ্ধতিতে কাজ করা শুরু করলেন
তাতে শুধু তারাই যে নির্যাতিত হয়েছিলেন তা নয় — অন্যান্য সামগ্রিক ক্ষতির পাশাপাশি সে সময়কারে
যে সকল সুশিক্ষিত, প্রতিভাশালী ও সাহসী তরুণ মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাদেরও এরা
সর্বনাশ করেছেন, আর সে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের নামে নিজস্ব মনগড়া 'সংকীর্ণ কমিউনিজমের
বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে' নবাগত প্রতিভাবান তরুণসহ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে এঁরা বাধার সৃষ্টি করেছেন
এবং তথাকথিত 'মাতৃপার্টি' আর 'পিতৃপার্টি'র ধোয়া তুলে বর্তমান পর্যায়েও শ্রমিক শ্রেণীর মজুটিকে
বিভিন্নভাবে ও কৌশলে দখল করে রেখেছেন। তাদের ঐ সময়কালের কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকেই
ঐক্যবদ্ধ হতে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করেছিল। সর্বোপরি ১৯৫৪ সালে
পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ঐ 'কমিউনিষ্ট পার্টি'র কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষণা করেছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরই ঐ সকল 'সংকীর্ণতাবাদী কমিউনিষ্ট'রা তাদের তথাকথিত রাজনৈতিক প্রশ্নে
পূর্ববঙ্গ প্রদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে ফেলেছিলেন। পাকিস্তানের তিনটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল,
সাতটি কেন্দ্র শাসিত রাজ্য ও চারটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ছিল একটি প্রদেশ। পূর্ব পাকিস্তান নামে
তখন (১৯৫৫ সাল পর্যন্ত) কোন প্রদেশের নামকরণ করা হয়নি, অথচ ঐ সকল 'সংকীর্ণতাবাদী
কমিউনিষ্ট' নেতৃত্ব ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী- মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র কলিকাতা
কংগ্রেসে বসে শুধু একটি তথাকথিত 'পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠন করে ক্ষান্ত হননি- সেখানে
বসেই তথাকথিত 'পূর্ব পাকিস্তান কমিটি' গঠন করলেন যা কাজ করল 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র বঙ্গীয়
প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বাধীনে এবং তার পরপরই এঁরা তথাকথিত 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট
পার্টি'ও গঠন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ঐ তথাকথিত 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি' 'পাকিস্তানের
কমিউনিষ্ট পার্টি'র সঙ্গে সরাসরি কাজ না করে, 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির
নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বাধীনে' কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঐ 'সংকীর্ণতাবাদী কমিউনিষ্ট' নেতৃত্ব।

ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হলঃ-

১. 'পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠিত হল ভারতের কলিকাতার মাটিতে বসে- পাকিস্তানের মাটিতে নয়।
২. পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশের নামকরণ করা হল 'পূর্ব পাকিস্তান' ঐ ভারতের মাটিতে বসেই।
৩. 'পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠন করার পরে ভারতের মাটিতে বসেই লোক দেখানো যে 'পূর্ব
পাকিস্তান কমিটি' গঠন করা হল তা আবার 'পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি'র সঙ্গে কাজ না করে কাজ
করল 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অভ্যন্তরে এবং

৪. 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠিত হল ভারতের মাটিতে বসেই এবং তা কাজ করল 'পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি'র নেতৃত্বে বা কর্তৃত্বাধীনে নয়- কাজ করল 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বাধীনে। আর এঁদের এই পর্বের 'কমিউনিষ্ট' কার্যকলাপের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী অংশ তো দূরের কথা, শ্রমিক শ্রেণীরই কারো কোন স্থান ছিল না। এঁরা সকলেই ছিলেন মধ্যশ্রেণীর সেই 'বাবু শ্রমিক' বা 'বাবু কৃষক' অর্থাৎ 'বাবু কমিউনিষ্ট'। সে সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনরূপ কাজ করা বা পদক্ষেপ গ্রহণেও এঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন- যদিও এদের কাছ থেকে তা আশা করাটাই অপরাধ।

কি অদ্ভুত এদের ঐ 'কমিউনিজম'! এরা কি একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কি জিনিস তাও বুঝতেন না? এরা কি সমগ্র পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি? এরা কি সমগ্র পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি? এঁরা কি এটাই বুঝাতে চাননি যে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচি প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণী আলাদা আলাদাভাবে শোষিত হয় এবং শোষণের নীতি আর ধারাও যেন আলাদা?

আর ঐ তথাকথিত 'পার্টি'কেই 'মাতৃপার্টি' আর 'পিতৃপার্টি' বলে তার ধারক ও বাহকরা বিভিন্ন দল আর উপ-দলে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের পুরো পর্বটায় যেমন শ্রমিক শ্রেণীকে তাঁদের লেজুড় বৃত্তি করিয়েছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর ত্রাণকর্তা বলে দাবীদার হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মঞ্চটাকে দখল করে রেখেছেন, ঠিক একইভাবে আজও পর্যন্ত তারাই বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের লেজুড় বৃত্তি করাচ্ছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মঞ্চটাকে নিজেদের দখল রাখতে প্রয়াস পাচ্ছেন।"[১৮৩]

ষোলো

"...আমাদের ভাষা-সমস্যার আরেক দিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের সুধী সমাজের একাংশের ধারণা আমরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছি। মাতৃভাষার মারফতে ছাত্রদেরে আমরা সকল শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সংকল্প নিয়াছি। তা করিতে গেলে ক্লাসে বাংলায় ঐ ঐ বিষয়ে লেকচার দিতে হইবে এবং বইপুস্তক লিখিতে হইবে। কাজেই প্রশ্ন উঠিয়াছে আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই তাদের অভিমত। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কিছু-কিছু পরিভাষা তাঁরা সৃষ্টিও করিয়াছেন।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, পরিভাষার প্রশ্ন আসলে একটা সমস্যাই নয়। আমাদের ভাষায় ইংরাজী বা বিদেশী যে-সব শব্দ চালু হইয়া গিয়াছে, ওগুলির বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার চেষ্টা নিছক পাগলামি। এমন শক্ত কথা বলার অপরাধ আমার মাফ করিবেন আপনারা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন শব্দও আমি খুঁজিয়া পাই না। 'কাগয' 'কলম' 'দেয়াত' ইত্যাদি শব্দ আরবী এই অজুহাতে এক সময়ে হিন্দু পণ্ডিতরা এ-সব শব্দ বাংলায় ব্যবহার করিবেন না বলিয়া যিদ করিয়াছিলেন এবং পরিভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় 'ভূর্জ-পত্র' 'লেখনী' ও 'মস্যাধার' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনারা কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চান? আপনারা কি ট্রেন, স্টিমার, টিকেট, রেল, ইউনিয়ন, বোর্ড, ইলেকশন, ভোট, প্রেসিডেন্ট, মেম্বর, জজ, কোর্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতে চান? নিশ্চয়ই চান না। তবে আবার পরিভাষা কি? যা আমাদের ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, যে-সব শব্দ অমরা দিনরাত নিজেদের কথাবার্তায় ব্যবহার করি, বুঝি এবং বুঝাই সে সবই বাংলা শব্দ। একটি দৃষ্টান্ত দেই।

'আগামী মার্চ মাসে আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের জেনারেল ইলেকশন হইবে। আমার বাবা প্রেসিডেন্টির ক্যানডিডেট হইয়াছেন। কাজেই ভোটারদেরে ক্যানভাস করিতে আমাকে কয়েকটা মিটিং করিতে হইবে। সেজন্য আমি স্কুলে কয়েক দিনের ছুটি চাহিয়া হেডমাস্টারের নিকট এপ্লাই করিয়াছি।'

১৮৩. এম. আর. চৌধুরী/ভারতবর্ষ-পাকিস্তান পর্বে ছিল না, বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নাই। [ডলফিন এন্টারপ্রাইজ- নভেম্বর, ১৯৮৯। পৃ. ১৮৪-১৯৩]

এটা কি বাংলা ভাষা না? পূর্ব-পাকিস্তানে এমন কোনো শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোক আছে কি যে এটা বুঝে না বুঝে, না?

চলতি শব্দই বাংলা শব্দ। স্কুল-কলেজের বাহিরে যেটা চলে ভিতরে তা চলিবে না কেন? কলেজের ভিতরের একটা দৃষ্টান্ত নেন।

'আমাদের কলেজের ইকনমিকসের প্রফেসার গতকাল ক্লাসে খুব ভাল লেকচার দিয়াছিলেন। লেকচারটা তিনি খুব স্টাডি করিয়াই দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ওটা এত ইন্টারেস্টিং হইয়াছিল যে, আমরা সবাই তার ডিটেলড নোট নিয়াছি। তাতে প্রিটেস্টে পাস করা আমাদের অনেকের পক্ষেই খুব ইযি হইবে।'

এটা কি বাংলা ভাষা নয়? এই ভাষায় যদি প্রফেসররা লেকচার দেন, তবে কার কি অসুবিধা হইবে? যেমন করিয়া কলেজ, ক্লাস, হসপিটাল, প্রেসক্রিপশন, অপারেশন, মেডিসিন, ট্রিটমেন্ট, ইন্স্ট্রুমেন্ট, এক্সরে, রেডিওলজি, কার্ডিওগ্রাফ, থার্মোমিটার স্টেথিসকোপ ইত্যাদি টার্ম আমাদের কথাবার্তায় ও লেখাপড়ায় ইস্তেমাল করি, তেমনি করিয়া আমরা যদি সমস্ত মেডিক্যাল, লজিক্যাল, বোটানিক্যাল, ফিলসফিক্যাল ও সাইকলজিক্যাল টার্ম লেখায় ও কথায় ব্যবহার করি, তবে তাতে দোষ কি? অসুবিধা কোথায়?

দেশী ভাষায় প্রতিশব্দের তালাসে মানুষ গোঁড়ামির কোন স্তরে যাইতে পারে, তা দেখিয়াছিলাম আমি কলিকাতায়। আপনাদের হয়ত অনেকেই জানেন যে, ইত্তেহাদ সম্পাদন উপলক্ষে পাকিস্তান হওয়ার পরেও প্রায় তিন বৎসর কাল আমার কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। সেই সময় পশ্চিম-বাংলা সরকার ডাক্তার সুনীতি চাটার্জীর নেতৃত্বে একটি পরিভাষা কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণের এক সভা হইয়াছিল। তাতে আমারেও ডাকা হইয়াছিল। কমিটি রিপোর্ট শুনিয়া আমাদের চক্ষু একদম চড়ক গাছ। তারা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, হাইকোর্ট, এডভোকেট, সেক্রেটারিয়েট, মিনিস্টার, সেক্রেটারি, মিলিটারি, ক্যাবিনেট, এসেম্বলি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, টুর্নামেন্ট, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি সুপ্রচলিত শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছিলেন। আমিই ঐ রিপোর্টের প্রতিবাদে বক্তৃতা করি প্রথম। সভায় সমবেত শিক্ষাবিদগণ ঐ রিপোর্টের বিরুদ্ধে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার মত পাকিস্তানী বাংগালীর সমর্থনে অধিকাংশ বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ রিপোর্ট সে সভায় গৃহীত হইতে পারে নাই।

কিন্তু দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ও কৃত্রিম জাতীয়তাবোধের গোঁড়ামি সেখানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, জনমতের রাজনৈতিক চাপে পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐ রিপোর্ট বা অনুরূপ অন্যান্য রিপোর্ট গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে আজ ভারতে ক্রমে-ক্রমে চীফ মিনিস্টারকে মুখ্যমন্ত্রী, আইন পরিষদকে বিধান সভা, কর্পোরেশনকে পৌরসভা, ভ্যানিটি ব্যাগকে 'কৃটানি কি ডিবিয়া', অল-ইন্ডিয়া রেডিওকে 'অখিল ভারত আকাশ বাণী', অল-ইন্ডিয়া টেনিস টুর্নামেন্টকে 'অখিল ভারত ঘেচুগেন্ডু ঝাপট' বলিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এসব অস্বাভাবিকতা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতের জনগণ তাদের কথায় এবং লেখায় কিছুতেই এসব কষ্ট-কল্পিত কৃত্রিমতা মানিয়া নিতে পারে নাই।

আমাদের ভাষায়ও যদি আমরা অমন কোন কৃত্রিমতার আমদানি করি, তবে কালের স্রোতে তা ধুইয়া-মুছিয়া এবং জনমতের চাপে তা পিষিয়া যাইবেই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য অতি সোজা। পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টায় সাহিত্যিকদের প্রতিভার অপচয় না করিয়া যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের কথাবার্তায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি অকাতরে বই-পুস্তকে ও গোটা সাহিত্যে চালু করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষকরা এবং অফিস-আদালতের অফিসাররা তাদের যাঁর তাঁর এলাকায় কথা বলিবার সময় যেসব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন, লিখিবার সময়ও বাংলা হরফে সেইসব শব্দ ব্যবহার করিবেন। এতে গৌরব হানি হইবে না। ভাষার বিন্দুমাত্র অবনতি ঘটিবে না। বরঞ্চ তাতে আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িয়া যাইবে। এই ইলাস্টিসিটি ভাষাকে দ্রুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিণত করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি উপসংহারে এই আরয করিব যে, আপনারা বিশাল ঐতিহ্যের অধিকারী এক নয়া জাতির কালচারেল রিনেসাঁর আর্কিটেক্ট ও ইনজিনিয়ার। আপনাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বুকের বল, প্রাণের সাহস, মনের উদারতা ও চিন্তার সবলতা আপনাদের দায়িত্বের উপযোগী হইতে হইবে। অতীতের ভুল শুধরাইবার সংকল্পে দৃঢ়তা, নয়া পথে পা বাড়াইবার বিপদকে বরণ করিয়া নিবার দুর্বার যিদ, ব্যক্তিগত সুখ-সম্পদ ও আরাম-আয়াস উপেক্ষা যদি আমরা আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে নয়া জাতি গড়িবার অধিকারী আমরা নই, মাথা হেঁট করিয়া সে সত্য আমাদের মানিয়া নেওয়া উচিত। নয়া কালচার ও নয়া ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

আপনারা দৃষ্টির সেই স্বচ্ছতা, চিন্তার সেই সবলতা এবং প্রাণের সেই সাহস নিয়া আগুয়ান হন, আপনাদের হাতে নয়া কৃষ্টি ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠুক, আমাদের রাষ্ট্র দুনিয়ার সভ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের মাতৃভাষা সম্পদশালী ইলাস্টিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া একদিকে আমাদের জনগণের মুখের কথা ও মনের ভাবের বাহক হউক, অপরদিকে সে ভাষা অধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ ও প্রসারের উপযোগী মিডিয়াম হউক, সে ভাষা আধুনিক ও উন্নত পাক-বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী করুক, আল্লার দরগায় এই মুনাজাত করিয়া আমি বক্তৃতার উপসংহার করিলাম।"

[১৯৫৮ সালের ৩রা মে চাটগাঁয় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণের (বর্ধিত ও সংশোধিত) অংশ][১৮৬]

সতেরো

"...মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা এই দ্ব্যানুক বা বাইনারি সম্পর্কের ভেতর বেঁধে ফেলে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্তর্গত জনগণের বিপুল অভিজ্ঞতা, যুদ্ধরত সমাজের সামাজিক শক্তিগুলির ভেতরকার সম্পর্কের টানাপোড়ন ও সর্বোপরি আধিপত্যকামী আদর্শগুলির ভেতরকার দ্বন্দ্বকে আড়াল করা হয়। এসব কিছুকেই যুদ্ধে পক্ষের আর বিপক্ষের শক্তি এই দুইভাবে বিভক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্গত নিজস্ব দ্বন্দ্বকে এ ধরণের বিভাজনের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেও যে আরো অনেক আকাঙ্খা তৈরি হয়েছিল, যে আকাঙ্খাগুলি আধিপত্যকামী শ্রেণীর সংগঠন ও চৈতন্যের মধ্যে বারবারই অশুভ ছায়া ফেলেছিল, বিরক্ত করছিল তার একমাত্রিক ইতিহাসের ধারণাকে, সেগুলি হারিয়ে যায় রাজাকার/মুক্তিযোদ্ধা এই দ্ব্যানুক সম্পর্কের ভেতর। তাই ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত স্থান পায়নি বা অনুসন্ধান করা হয়নি বিকল্প রাষ্ট্রের ধারণা, এমনকি রাষ্ট্র অবলুপ্তির ধারণার অনুশীলন। আলোচিত হয়নি সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তির আকাঙ্খার কাহিনী। স্থান পায়নি দেশকে মুক্ত করার জন্য জনগণের নিজস্ব উদ্যোগের বর্ণনা।

যে শ্রেণীটি স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে তাদের কাছে রাজাকার/মুক্তিযোদ্ধা বিভাজনটি সুবিধাজনক, শোষিতের নিজস্ব চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে জাতির নেতৃত্বকামী শ্রেণীটি তার অবস্থান শুধু দৃঢ়ই করে না, সেই সাথে বারবার স্মরণ করায় পুরো যুদ্ধে একটিই ফ্রন্ট ছিল এবং সেই ফ্রন্টে একদিকে রাজাকার আর একদিকে আধিপত্যকামী শ্রেণীর সংজ্ঞায়িত মুক্তির পক্ষের যোদ্ধা। ইতিহাস সকৌতুকে এই বিভাজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

...তাছাড়া, তাজউদ্দিনের ডায়েরিতে '৪৭-এর ১৪ আর ১৫ আগস্টের বর্ণনায় জনগণের উচ্ছ্বাসের মনোগ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। একটু লক্ষ্য করে পড়লেই বোঝা যায়, এই উচ্ছ্বাস একমাত্রিক ছিল না। আধিপত্যকামী শ্রেণীর প্রতিনিধি তাজউদ্দিনের মানস দারুণভাবে অপ্রতুল হয়ে যায়, গ্রাম থেকে ছুটে আসা হাজার হাজার মানুষের ঢাকা শহরে উদ্দীপ্ত অবস্থায় সারা রাত বিচরণের ব্যাখ্যা করতে।

---

[১৮৬]. আবুল মনসুর আহমদ/বাংলাদেশের কালচার। [আহমদ পাবলিশিং হাউস- জুলাই, ১৯৮৫। পৃ. ২২৮-২৩২]

তাজউদ্দিন বিরক্ত হন যখন দেখেন 'স্বাধীনতা দিবসের' জনসভায় জনগণ নতুন রাষ্ট্রের 'জনককর্তাদের' বক্তৃতা না শুনে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ঘোরাফেরা করছে। কংগ্রেস নেতা প্রভাস লাহিড়ী ও মুসলিম লীগের তরুণ তাজউদ্দিন একইভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন; যখন দেখেন হাজার হাজার গ্রামবাসী বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ঢাকা, রাজশাহীতে আসছে স্বাধীনতা দেখার জন্য। গণচৈতন্যের ওপর আধিপত্যকামী শ্রেণীর সীমানা ও চেহারা নির্ধারিত করে এসব কর্মকাণ্ড। জনগণের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পরিধি যত বড়, নেতৃত্বকামী শ্রেণীর গোটা সমাজের ওপর আধিপত্য ততখানি ছোট হয়। এ ব্যাখ্যা আমাদের ইতিহাসে অনুপস্থিত বলেই জনগণের স্বাধীনতা বোধের খবরও আমরা পাই না।"[১৮৭]

আঠারো

"...ধনতান্ত্রিক সমাজে টাকাই গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। টাকার স্বার্থ বিঘ্নিত হলে টাকার মালিক গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরে। তাই সেকালে বাঙালির অধিকার আদায়ের যে কোন আন্দোলনই পশ্চিম পাকিস্তানি ধনবানদের টাকার স্বার্থ ক্ষুন্ন করার আন্দোলন হিসেবেই জন্ম নিয়েছে। চিত্রিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান আন্দোলন হিসেবে। এই বঞ্চনা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবদান। এ বঞ্চনা শেষ হতে পারে ধনবাদী সমাজ পাল্টাবার মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে ১৯৭১ সালের সংগ্রামে সকলের আগ্রহ ছিল কি? এ সংগ্রামের যারা নেতৃত্ব দান করেছেন তারা কি সমাজ বদল চেয়েছেন আদৌ? না, ক্ষমতার বদল চেয়েছেন দেশ গঠনের নামে?

মা, আমাদের সমস্যা এখানেই। আমরা বাঙালিদের অধিকার চেয়েছি। সকলেই চেয়েছে '৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। কিন্তু তখন অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মুখের চাওয়া আর হৃদয়ের চাওয়া এক ছিল না। মার্চ-এপ্রিল মাসে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী চায়নি যে পাকিস্তান ভেঙে যাক। তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারেনি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ পাকিস্তান ভেঙে যাওয়া। আমার মনে হয় এখানে সংশয় ছিল। কারণ বৃটিশ তাড়িয়ে স্বাধীনতা আর পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। ছয়দফায় পাকিস্তান ভাঙ্গার বীজ ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে এ সত্যটি তখনও ব্যাখ্যার স্তরে ছিল। তাই অনেকেই আশা করেছিল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ হবেই। এমনকি পাকিস্তানি হামলা শুরু হবার পরে ২১ জুনের ইয়াহিয়ার ভাষণের জন্য অনেকে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু পাকিস্তানি হামলা তীব্র হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। পাকিস্তানি হানাদারেরা মা-বোনের গায়ে হাত দিতে শুরু করলে কট্টর পাকিস্তানপন্থিদেরও মনে হতে থাকে এভাবে থাকা যাবে না। অর্থাৎ পাকিস্তানে থাকা যাচ্ছে না। আমরা পাকিস্তানি থাকছি না, এ দাবি কিন্তু নয়। বাঁচতে হলে স্বাধীন হতে হবে। বাঁচার জন্য অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতের সাহায্য প্রয়োজন। এটা ছিল ১৯৭১ সালের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল।

সুতরাং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন করতে হলে একটি অপ্রিয় সত্য মেনে নিতে হবে। অপ্রিয় সত্যটি হচ্ছে ১৯৭১ সালে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার চেতনা এসেছিল একটি নেতিবাচক শ্লোগান দিয়ে। আওয়ামী লীগ ছ'দফা দিয়েছে। ছদফা না মানলে স্বাধীনতা, এ কথাও স্পষ্ট নয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর না হলে স্বাধীনতা, এ কথাও অনুক্ত। নেতৃত্বের কেউ কেউ ভিন্নভাবে ভেবে থাকলেও সাধারণ মানুষ জেনেছে পাকিস্তান থাকছে। তবে নেতৃত্ব যাচ্ছে বাঙালির হাতে।

বাঙালির হাতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। দেশ স্বাধীন করার জন্য নয়। এ সময় অনেকেই অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চাচ্ছে। এমনও বলা হয়েছে যে এর পেছনে আমেরিকা আছে।

১৮৭. আহমেদ কামাল (চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ- ঢা.বি)/কালের কল্লোল : ইতিহাস, উন্নয়ন ও রাজনীতি। সংহতি- ডিসেম্বর, ২০০৮। পৃ. ১৩৩- ১৩৫।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তানের ভাঙ্গন পাকিস্তানি সরকারই চাপিয়ে দিচ্ছে। আওয়ামী লীগ এক পাকিস্তান রাখতে চায়। বলা হতে পারে এটা ছিল কৌশল। তখন এ কৌশল অবলম্বন ভিন্ন পথ ছিল না। কিন্তু এ ধরণের কৌশল বুঝতে সাধারণ মানুষের সময় লাগে।"[১৮৮]

উনিশ

"...Liberation by secession. Oh! Such a glorious act. Freedom for 90 million people! 90 million people of East Pakistan seceding from Pakistan, immaterial and inconsequential are the facts that such secession was from the minority people of 60 million of the west wing of Pakistan. Not relevant is also the fact that the vast majority was fighting out and reaching towards the fabulous achievement of freedom, liberation to be exact, by paying the unavoidable and inevitable price : life. Life is of no consequences where the element known as liberty was firmly entrenched in the heart. What a golden achievement.

Not only had we liberated ourselves from the yoke of 'foreign' cliques and clutches of conspiracy, we had also driven the invaders out of the sacred soil of Bangladesh. Drove them where? Oh, to a place where they always had been. Those wretched, barbaric Pakistani bunch of minorities; barbarians, an irony, the Bangladesh happened to have helped to create.

We did it again! Another unprecedented, glorious piece of great history. Secession by majority cocooned within a ringlet, remaining where we had always been. We remained in the same spot; slight difference notwithstanding : we lost West Pakistan we gave birth to. We were majority, remember? The minority people of West Pakistan seized a bigger chunk of land which rightfully belonged to the majority. Minority Pakistanis got more land and the majority East Pakistanis got one forth the size. The Pakistanis were also happy to be able to shackle off the perennial stigma of majorityhood. But who cares? Nothing succeeds like success. We, too, were happy in our smugness. In the process of labyrinthine transformation, all parties were satisfied."[১৮৯]

বিশ

"...পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিগত ২৩ বৎসরে গোটা পাকিস্তানে সাড়ে ছয় হাজারের বেশী ছোট ও বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। আর এই গুলিতে ও প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ দশ হাজার কোটি টাকারও বেশী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পুঁজি আসলো কোথা থেকে অর্থাৎ এই পুঁজি কাদের? পাকিস্তানে এ পর্যন্ত গত তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়েই বেশির ভাগ শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন শিল্পে পুঁজি নিয়োজিত হয়েছে। এই পুঁজির বৃহদাংশ এসেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে, তথাকথিত 'সাহায্য বাবদ' লগ্নীকৃত পুঁজির মাধ্যমে। তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় চড়া সুদে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এসেছে ৪৫০০ কোটি টাকারও বেশী। এ ছাড়া পাকিস্তানে লগ্নীকৃত বিদেশী ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে ১৫০০ কোটী টাকা। বিভিন্ন শিল্পে স্বনামে ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বেনামে নিয়োজিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির পরিমাণ আরও ১০০০ কোটি টাকার বেশী। অর্থাৎ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানে নিয়োজিত ব্যবসা ও শিল্প পুঁজির ভিতর শতকরা ৭০ ভাগ এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। তাই মার্কিন লগ্নী পুঁজির শোষণই পাকিস্তানে প্রধান।

---

১৮৮. নির্মল সেন/মা জন্মভূমি। [তরফদার প্রকাশনী- ডিসেম্বর, ২০০৭। পৃ. ৮০-৮১]

১৮৯. Iqbal Ansari Khan/The Third Eye : Glimpses of the politicos| [UPL- September, 1991| P. 14-15]

এই বৎসর থেকেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন পর্যন্ত আগত সাহায্য বাবদ লগ্নীকৃত সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির সুদ বাবদ ২২০০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে শতকরা ১০ টাকা হারে। মার্কিনের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে 'সাহায্য' বাবদ লগ্নীকৃত ৪৫০০ কোটি টাকার ভিতর আসতে শতকরা ৮০ টাকা পৌঁছায় নাই। তথাকথিত 'সাহায্য' প্রাপ্তির শর্তসমূহের অধীনে, তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের খরচ বাবদ শতকরা ২০ ভাগ অগ্রিম কেটে রাখা, অসম চুক্তি অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ক্রীত পণ্যের জন্যে বাজার দর অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ মূল্য বেশী নেওয়া এবং শতকরা ৩৩ ভাগ বেশী জাহাজী ভাড়া আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেটে রেখেছে। অথচ জনগণের সুদ গুণতে হবে পুরো টাকার। ইহা মহাজনী প্রথার সুদকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

...পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে আমাদের দেশের সম্পদ প্রধানত: লুটে নিয়ে যাচ্ছে শতকরা ৩০ ভাগেরও কম নিয়োজিত পুঁজির অবাঙ্গালী মালিকেরা নয়, শতকরা ৭০ ভাগ নিয়োজিত লগ্নীকৃত পুঁজির মালিক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা। এই কথা গোটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সত্য এবং পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সম্পদ প্রধানত: অবাঙ্গালী পুঁজিপতিরা নিয়ে যাচ্ছে- পুঁজিবাদী স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার পুঁজিবাদী দলগুলি, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ মহল কর্তৃক বহুল প্রচারিত এই কথা মোটে সত্য নয়। দেশীয় পুঁজি, এবং তার ভিতর প্রধানত: অবাঙ্গালী পুঁজির শোষণ আছে, এই কথা সত্য, কিন্তু প্রধানত: বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীকৃত পুঁজি, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিই হচ্ছে পূর্ব-বাংলা ও পাকিস্তানের সম্পদের সবচেয়ে বড় শোষক।

...পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির দাবীকৃত পুঁজিবাদী স্বায়ত্তশাসনের দাবী পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী ইত্যাদি ধুয়া তুলে বিভক্ত করতে সাহায্য করছে। পুঁজিবাদী স্বায়ত্তশাসনের দাবী শ্রমিক কৃষকের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বদলে জাতিগত বিভেদ ও শোষণকেই বড় করে তুলে ধরছে এবং এইভাবে গোটা পাকিস্তানের শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনে ঐক্যের বদলে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টির সাহায্য করছে। বিশেষ করে যেখানে পূর্বেই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক কৃষকের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ছাড়া পুঁজিবাদী স্বায়ত্তশাসনের অর্থই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ (যা কিনা শ্রমিক কৃষকের উপর চেপে থাকা প্রধান শোষণ ও নিপীড়ন) ঠিক রেখে শুধু দেশীয় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী মালিকের রদ-বদল শ্রমিক কৃষকের গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত শাসনের দাবীদার পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির কিছু বামপন্থী পুঁজিবাদী দল মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথা বললেও পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে সবচেয়ে মুখর আওয়ামী লীগ পন্থী তথাকথিত 'বঙ্গবন্ধুদের নিকট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ তোলা তো হারাম স্বরূপ। এই সমস্ত 'বঙ্গবন্ধুরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ তুলতে এতো নারাজ কেন তা খুবই স্পষ্ট। ইহারা আসলে শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর থেকে কোনও প্রকার শোষণের উচ্ছেদ চান না। ইহারা আসলে যা চান, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সঙ্গে শ্রমিক কৃষক ও জনগণের উপর শোষণে ছোট জমিদার হতে।

এদের বাঙ্গালীর স্বায়ত্ত শাসনের আসল অর্থ হচ্ছে শ্রমিক কৃষকের উপর সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় পুঁজির শোষণকে বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দেশীয় সহযোগীদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা লাভ করা। অপর অর্থে এদের পুঁজিবাদী বাঙ্গালী স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনগণকে শোষণকারী দেশীয় শোষকদের বেলায় বাঙ্গালী পুঁজিপতি বা মালিকদেরই প্রধান অধিকার থাকবে শ্রমিক কৃষকদের শোষন করার। এই দাবীর সঙ্গে এই দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর থেকে প্রধান শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের, অবসানের কোনও সম্পর্ক নাই। শ্রমিক কৃষকদের নিকট এর অর্থ হচ্ছে শুধু মাত্র দেশীয় শোষক ও মালিক পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়।

পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির এই পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। কারন এদের দাবী ও কার্যকলাপ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের ভিতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যের বদলে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। ইহা গোটা পাকিস্তানের শ্রমিক ও কৃষকের- তাদের মূল শত্রু ও শোষক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে- ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা ও বিভেদ সৃষ্টি করছে। এ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনকে বিভেদ সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার সঙ্গে ভালোভাবেই খাপ খায়।

তাই এই কথা স্পষ্ট যে, এই ধরণের পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক ও মেহনতি জনগণের কোনও স্বার্থ নাই। এর ফলে তাদের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী বা দেশীয় কোন ধরণের শোষণের অবসান তো হবেই না, উপরন্তু আরও বেশী করে সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজির শোষণ চেপে বসবে। তাই সচেতন শ্রমিক ও কৃষক এই ধরণের ভুয়া ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত শাসনের দাবী সমর্থন করবে না এবং এর দ্বারা কিছুতেই প্রতারিত হবে না। শ্রমিকেরা নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ পন্থী ভুয়া 'বঙ্গবন্ধু'দের মুখোশ শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের নিকট খুলে ধরবে। এরা 'বঙ্গবন্ধু' বটে, তবে বাঙ্গালী শ্রমিক কৃষকের নয় বাঙ্গালী পুঁজিপতি শোষক ও মালিকদের বন্ধু হতে পারে। এই সমস্ত ভুয়া জনদরদীরা তাদের নিজেদের মালিক বা পুঁজিপতি শোষক হবার ব্যক্তিগত স্বার্থেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বার্থ, শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ বলে জাহির করবার প্রতারনামূলক কাজেই লিপ্ত রয়েছে।

...সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে বজায় রেখে পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত শাসনের সহজ অর্থ হচ্ছে শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর প্রধান শোষণকে বজায় রেখে শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দেশীয় পুঁজিপতি পাহারাদারদের নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা ভাগ করে নেওয়া। যেমন, পূর্ব-বাংলায় বাঙ্গালী পুঁজিপতি শ্রেণী ও মালিকেরা পূর্ব-বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী-পুঁজি ও পুঁজির শোষণের পাহারাদারী করবে এবং বাঙ্গালী শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ছোট অংশীদার হিসাবে প্রধানত: নিজেদের শোষণ প্রতিষ্ঠা করবে, অবাঙ্গালী মালিকেরা প্রধান অংশ নিতে পারবে না। তেমনি পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী মালিকরা, সিন্ধুতে সিন্ধী মালিকেরা এই ভাবে গোটা পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিপতি শোষকেরা ভাগ করে নেবে। অবশ্য সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সমানভাবে বজায় থাকবে।

আওয়ামী লীগ পন্থী তথাকথিত 'বঙ্গবন্ধুরা' শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর প্রধান শোষক সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি ও নিয়োজিত পুঁজির শোষণকে বজায় রেখে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার পাহারাদারী ও নায়েবীর জন্য পাকিস্তানে কালনেমির লঙ্কা ভাগ করতে ব্যস্ত। এরা বাঙ্গালীর স্বায়ত্ত শানের নামে পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পাহারাদার দেশীয় মালিক ও শোষক হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উচ্ছিষ্ঠের অংশ পাবার সুখ স্বপ্নে বিভোর রয়েছে। হ্যাঁ, এরা ঠিক এই স্বপ্নই দেখছে।" (৩০/০৪/১৯৭০)[১৯০]

একুশ

"...৪০ সাল থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত যে অসংখ্য তরুণ পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল, আমি তাদের অন্যতম। কৃতিত্বের জন্য একথা বলছি না, নিজের পরিচয় দেবার জন্য কথাটি উল্লেখ করছি। ৪১-৪২ সালে আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র, তখন আমাকে সভাপতি করে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয়। সৈয়দ আলী আহসান ছিল এ সংসদের সেক্রেটারী। আমাদের লক্ষ্য ছিল, বাংলা ভাষায় মুসলিম কালচারের পরিচয় থাকে এমন সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকদের উদ্বুদ্ধ করা।

---

১৯০. সইফ-উদ-দাহার/রাষ্ট্রভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তারপর। [নওরোজ কিতাবিস্তান- নভেম্বর, ১৯৮৬। পৃ. ১২-১৭]

১৯৪৪ সালে কলকাতা ইষ্ট পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি (এর সভাপতি ছিলেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন) যে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে তাতে ২৪ বছর বয়সে সাহিত্য শাখার সভাপতির দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলাম। এরপর সে বছর জুলাই মাসে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসাবে যোগ দেই।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের অনুরোধে, দৈনিক আজাদে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতাম। ১৯৪৬ সালে যখন মাওলানা আকরম খাঁ ইংরেজি সাপ্তাহিক কমরেডের স্বত্ব খরিদ করে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন, নেপথ্যে থেকে সেটা সম্পাদনার ভারও আমি গ্রহণ করেছিলাম। তখন দু-একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে সমগ্র মুসলিম সমাজ এই পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য দিনরাত খেটেছে। আমরা এ স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম যে, ভারতের পূর্বাঞ্চল যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে, তাহলে প্রায় দু'শ বছরের গ্লানি এবং অত্যাচার থেকে তারা রক্ষা পাবে।

আমি এ ইতিহাসের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, পাকিস্তানের প্রতি আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের যে অনুভূতি সেটা সন্তানের প্রতি জনকের অনুভূতির মতো। এ রাষ্ট্র আমরাই সৃষ্টি করেছিলাম, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না পেলে, এ অঞ্চল কখনও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না।

আমি পাকিস্তানের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত- কর্মী হিসেবে। আমি রাজনীতিক নই, কোনকালে মুসলিম লীগের সদস্যও ছিলাম না। কিন্তু যে আদর্শের ওপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রতি ছিল আমার অকুণ্ঠ সমর্থন। অথচ লক্ষ্য করলাম ৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট এ নতুন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এক বছর না যেতেই পূর্ব পাকিস্তানিদের বুঝানো হল যে, তাদের অর্থনীতি এবং তামুদ্দনিক দুর্গতির কারণ পাকিস্তান।

৪৮ সাল থেকে ৭১ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি ষড়যন্ত্রের এ অঙ্কুর কিভাবে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার মত ব্যক্তির ছিল না। কিন্তু তা করবার যথা সাধ্য চেষ্টা করতাম। কিন্তু নসিবের এমন পরিহাস যে, ১৯৫৯ থেকে আইয়ুব খানের আমলে আমরাই চিহ্নিত হলাম পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসাবে। ঐ সালে যখন রাইটার্স গিল্ড গঠনের আলোচনা হচ্ছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকারের কথা বলায় আইয়ুব খানের সেক্রেটারী কুদরত উল্লাহ শাহাব চিৎকার করে আমাকে শাসিয়েছিলেন প্যারিটি বা সমতার কথা যেন উচ্চারণ না করি।

আমি যেটা দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সে ঘটনা হলো এই যে, একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীর অদূরদর্শিতার কারণে পাকিস্তানের ভিত্তি ক্রমশঃ দুর্বল হতে আরম্ভ করে। একবার করাচীতে ডক্টর কোরায়শীর মত ব্যক্তিত্বকে আমি প্রকাশ্য সভায় এই বলে ভর্তসনা করি যে, তিনি অকারণে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন।

গোলাম মুহাম্মদ যেদিন খাজা নাজিম উদ্দীনকে বরখাস্ত করেন এবং তার কিছু কাল পর গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন তখন থেকেই অবক্ষয়ের স্রোত আরো দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। এরপর আসে মিলিটারী শাসন। তখন ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ এবং লক্ষ্য চাপা পড়ে যায়। পাকিস্তানের রাজনীতি পরিণত হয় নিছক একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। এদিকে বিরোধী দলের চাপের মুখে ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক, সরকার এমন কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার পরিণতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ আরো মজবুত হয়ে দাড়ায়। প্রতিবেশী ভারতের কোন অঙ্গ রাজ্যের যে সমস্ত ক্ষমতা ছির না, সে সমস্ত ক্ষমতাই পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদান করা হয়। রেলওয়ে, সিভিল সার্ভিস সব ব্যাপারেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু অর্বাচীন, নির্বোধ রাজনীতিকদের আচরণে বিরোধী দল পাকিস্তানের জনসাধারণকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তাদের কোন অধিকার নেই। তারা হিন্দু সমাজের অচ্ছুতদের চেয়েও এক নিকৃষ্ট জাতে পরিণত হয়েছে।

সমাজের বহুলোক সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, পাকিস্তানে আমরা স্বাধীন হতে পারিনি। ১৯৪৭ সালে নাকি শুধু শাসক বদলের ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশের পরিবর্তে আসে পাকিস্তানীরা। এই যে, শত সহস্র লোকজন রাজনীতিবিদ, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র যারা ৪৬ সালে ভোট দিয়ে মুসলিম লীগকে জয়ী করেছিল, বেঙ্গল এসেম্বলির যে মুসলিম সদস্যদের ভোটে মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান গৃহীত হয়, তারা রাতারাতি হয়ে গেলেন বিদেশীদের অনুচর। এখনও এসব কথা শুনি আর ইতিহাসের পরিহাস সম্পর্কে ভাবি।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে চিরকালই অত্যন্ত পীড়িতবোধ করি। আমাদের লোকজন অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। যে ফজলুল হক সাহেব ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন, ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে তিনি মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেন। যে ভাসানী সাহেব সিলেটের গণভোটের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি ১৯৫৪ সালে কাগমারীতে এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে প্রায় প্রকাশ্যেই পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৪৬ সালে ইলেকশনে মুসলিম লীগের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছিল, তিনি গোস্বা করে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত মুসলিম শিক্ষকের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় ৪০ এর দশকে আমরা ছাত্ররা, পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম, কয়েক বছরের মধ্যে তাদের দু'-একজনের মতামতের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানান ডঃ শহীদুল্লাহ। কার্জন হলের এক সভায় ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি ঘোষণা করেন, আমরা প্রথমে বাঙালী পরে মুসলমান। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এত ধার্মিক ছিলেন যে, একটা সময় ছিল যখন তিনি ছবি তোলাকেও নাজায়েজ মনে করতেন। আবুল মনসুর আহমদের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির লেখক, যিনি লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস জানতেন, তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, প্রথমাবধি ভারতের উত্তর-পূর্বে এবং উত্তর-পশ্চিম দু'টো আলাদা রাষ্ট্র হলেই ভাল হতো। ৭১ সালে বাংলাদেশ আবির্ভূত হওয়ার পর তিনি ইত্তেফাকে প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে জানান যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় আসলে লাহোর প্রস্তাবের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন। অথচ, তিনি অবশ্যই জানতেন যে, ৪৭ এর ১৪ই আগস্টের আগে আমাদের যে অবস্থা ছিল তাতে, স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার মতো কোন সামর্থ্য এ অঞ্চলের ছিল না।

এসব অসংগতির কথা যতই মনে হয় ততই এ বিশ্বাস জন্মে যে, চরিত্রগত কারণেই হয়তো আমরা কোন বিশ্বাসকে বেশীদিন অকড়ে ধরে রাখতে পারি না। চারিত্রিক দূর্বলতার কারণে ইতিহাসে বহুবার আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। ৭১ সালে শুরু হয়েছিল স্বাধীন রাষ্ট্রকে নতুন করে স্বাধীন করার এক অদ্ভুত নাটক। স্মৃতিকথায় আমি বলেছি, যে সমস্ত ঐতিহাসিক কারণে পাকিস্তান অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার কথা স্মরণ থাকলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা বন্টনের সমস্যা আমরা অনায়াসে সমাধান করতে পারতাম। আমি আরো দেখিয়েছি যে, ৭১ সালের ২৫শে মার্চ আর্মির যে ক্র্যাকডাউন শুরু হয়, তার পিছনে ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কানি। আর নির্বোধ আর্মি অপরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের ওপর হামলা করে ষড়যন্ত্রের এ ফাঁদে পা দেয়।

আমি জানি অনেকেই হয়তো আমার মতামত গ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমাদের দিক থেকে যেভাবে সমস্যাটা দেখেছি, তার একটা রেকর্ড ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাওয়া অত্যাবশ্যক। যে হারে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটছে তাতে আরো কত আজগুবি কাহিনী ৭১ সাল সম্পর্কে শুনতে হবে, তা কে বলবে?

আমার মনে আছে ১৯৭২ সালে আমরা যখন জেলে, তখন ইংরেজী অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক মরহুম আবদুস সালাম নতুন বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা (Legitimacy) সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যে উপায়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটা একটা বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লবকে

আইনের চোখে বৈধ করতে হলে আরও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সেদিনকার পত্রিকার সংখ্যা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সালাম সাহেবকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ বাংলাদেশ সরকার কোন সমালোচনাই বরদাশত করতে রাজী ছিল না। আজও সে অসহিষ্ণুতার ভাব পুরোপুরি কাটেনি। সে জন্য আমি আশা করি না যে, সব পাঠক সহিষ্ণুভাবে আমার বক্তব্যকে গ্রহণ করবে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সালাম সাহেব পরোক্ষভাবে যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এবং যে কথা আমরা আগাগোড়াই বলে এসেছি, তার যথার্থতা প্রমাণিত হয় তখন, যখন- প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই হবে এদেশের মূলনীতি। এ ঘোষণার মধ্যে এই স্বীকৃতিই ছিল যে, এ অঞ্চলে সংখ্যাগুরু সমাজের যে বিশ্বাস এবং জীবনধারা তার উপর নির্ভর করেই নতুন রাষ্ট্রকে এগুতে হবে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বললে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। একথা ভারতীয় সাংবাদিক বসন্ত চ্যাটার্জী পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন। বাংলাদেশেরই একশ্রেণীর লোক এই দিব্য সত্যকেও মানবে না। তারা মনেপ্রাণে, ভাবাদর্শে এবং জীবনধারায় নিজেদের এক কাল্পনিক প্রাণীতে রূপান্তরিত করার স্বপ্নে মেতে আছেন।

আরো আশ্চর্য লাগে এই ভেবে, যারা পূর্বাঞ্চলের অধিকার এবং বাংলা ভাষার দাবী নিয়ে এ অঞ্চলকে বিচ্ছিন্নতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন তাদেরই একদল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে নারাজ। এরা চাচ্ছে যত শীঘ্র এ অঞ্চলটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, ততই যেন মঙ্গল। এসব প্রস্তাব তারা যখন তোলে তখন বাংলা ভাষার দাবীর কথা তাদের মনে থাকে না, মনে থাকে না, এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিভাগপূর্ব দুর্দশার কথা।

৬০ এর দশক থেকে আমাদের অনবরত বলা হতো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের ঠেলায় এদেশের জনগণ নাকি মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল। অনেকে বই লিখে এ শোষণের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে অভিযোগ ৬০ এর দশকের শেষদিকে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানেও কেউ কেউ বলতে শুরু করেন যে, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা যদি পাকিস্তানে থাকতে না চায়, তাদের বেরিয়ে যেতে দিলেই পাকিস্তানের মঙ্গল হবে। ৭০ সালে আমি যে ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তেহরান গিয়েছিলাম তার একজন সদস্য ছিলেন লয়ালপুর এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির ভিসি। তিনি একদিন কথায় কথায় বললেন যে, ইষ্ট পাকিস্তান যদি সত্যিই বেরিয়ে যেতে চায় তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই যে, অনবরত অভিযোগের ফলে রাষ্ট্রের কাঠামো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। '৭১ সালে যুদ্ধ করে আমরা সত্যিই বেরিয়ে এসেছি। আজ পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা তৈরীর ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদের রুপীর মূল্য আমাদের প্রায় তিনগুণ। পাকিস্তান এক সমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু আমরা এই বিশ বছরে কী পেয়েছি? আমাদের ভোগান্তির শেষ নেই। কল-কারখানা দুর্নীতির চাপে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশে স্রোতের মত ইন্ডিয়ার পণ্য আসছে, তা নিয়ে কেউ কেউ চিৎকারও করে। দেশের জনগণের অবস্থা ১৯৭০ সালের তুলনায় অনেক নেমে গেছে। বার্মার মত সর্বধিকৃত রাষ্ট্রের সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তিও আমাদের নেই। ওরা যখনই ইচ্ছা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর জোরালো প্রতিবাদ করার সাধ্য আমাদের নেই।

ইন্ডিয়ার কথা তো আলাদা ইন্ডিয়ায় মুসলমানদের উপর শত অত্যাচার হলেও আমাদের প্রতিবাদ করার সাহস হয় না। কাশ্মীরের অধিবাসী যারা ইন্ডিয়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে তাদের বাংলাদেশী খবরের কাগজে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হচ্ছে না। কাশ্মীর নিয়ে '৪৭ সালেই বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং জাতিসংঘের সামনে প্রশ্নটা উপস্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরবাসীরা তাদের ভবিষ্যত নির্ধারিত করবে। কিন্তু আজ আমাদের সরকার এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস পান না। কারণটা স্পষ্ট।

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যখন বিজেপি'র লোকেরা চারশত বছরের পুরানো ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধূলিসাৎ করে দেয়, তখন এর বিরুদ্ধে সরকার প্রবল প্রতিবাদ করতে পারেনি। সামান্য একটু কথা বলা হয়েছিল তাতেই ইন্ডিয়া উষ্মা প্রকাশ করে। এই তো আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ।

...আমি জন্মগতভাবে পূর্ব বাংলার সন্তান। এ অঞ্চলের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার আমার নেই বলে শুনছি। অধিকার দখল করে বসছেন প্রধানতঃ এমন একদল যারা, '৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাতারাতি প্রমোশন এবং উন্নতি লাভের আশায় এ নতুন রাষ্ট্রে ছুটে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন উকিল, কেউ সাংবাদিক, কেউ লেখক, কেউ শিল্পী, কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার যারা কলকাতার জগতে প্রতিযোগিতায় বেশীদূর এগুতে পারতেন না, বিখ্যাত হওয়াতো দূরের কথা। অনেকে নিঃস্ব অবস্থায় এসে পাকিস্তানে বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। যারা পাকিস্তান না হলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পদগুলো দখল করতে পারলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এদের মুখেই শুনলাম শোষণ এবং বঞ্চনার কথা সবচেয়ে বেশী। এবং এদেরই একদল আজ বাংলাদেশকে আবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছেন।

এই দুঃস্বপ্নের রহস্য আমরা কি করে বুঝবো?

বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। এর স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব যদি রক্ষিত হয় তবে আমরা যে স্বকীয়তার কথা বলতাম সেটা কিছুটা রক্ষা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ এ অঞ্চলকে পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ যাই বলি না কেন এর মাটিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। সে আকাশ, সে বাতাস, সে গাছপালা, সে নদ-নদী সবই রয়ে গেছে। আমরা এর শুধু ভৌগোলিক নাম বদলিয়েছি। তবে বর্তমানে যে অপচেষ্টা চলছে তার লক্ষ্য হলো, আমাদের শত শত বছরের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে একেবারে মুছে ফেলা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ বিপদের আশঙ্কায় খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়তে হয়। আমার বক্তব্য তাই লিপিবদ্ধ করে গেলাম। কেনো পাকিস্তান চেয়েছিলাম, ৭১ সালে আমরা কেনো বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করতে পারিনি এবং বর্তমানে কেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের সম্বন্ধে আমাদের উৎকণ্ঠা সবচেয়ে বেশী তার কৈফিয়ত হিসাবে এই স্মৃতিচারণার মূল্য।

...৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট আমি কোলকাতায় ছিলাম। এ কারণে ব্যক্তিগতভাবে ঢাকায় যে উন্মাদনাময় পরিবেশের মধ্যে পাকিস্তান জন্ম লাভ করে তাতে আমি অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদির বিবরণ পড়ে কল্পনার নেত্রে সে দৃশ্য অবলোকন করতে অসুবিধা হয়নি। তার একটা বড় কারণ, আমি নিজেও এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমরা বিশ্বাস করতাম যে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সমাধান এই উপমহাদেশকে বিভক্ত করে হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। ভাষা বা ভৌগলিক বৈচিত্রের কোন গুরুত্ব নেই, এ কথা কখনো আমরা বলিনি। কিন্তু ভাষা এবং আঞ্চলিক কালচারের ভিত্তি মেনে নিলে ভারতবর্ষকে অন্ততঃ বিশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রয়োজন হবে, কারণ 'ভারতীয়তা' বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করতাম না। যদি বলা হয় যে পাঞ্জাবী মুসলিম বা পাঠান মুসলিমের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলিমের তফাত অনেক, এ কথা তো হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো সত্য। মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের রূপ বিভিন্ন। যে সমস্ত দেবতা দক্ষিণ ভারতে বা পশ্চিম ভারতে অর্চিত হন, বাংলা বা আসামে তাদের কেউ পূজা করে না। রাম উত্তর ভারতে দেবতা বলে স্বীকৃত, বাংলায় তিনি রামায়ণের নায়ক মাত্র। এ রকমের আরো ভিন্নতার কথা উল্লেখ করা যায়। সে জন্য জওহরলাল নেহেরুর মতো যাঁরা সেকুলার ভারতীয়তার কথা বলতেন তাঁরা প্রকারান্তরে বুঝাতে চাইতেন যে ভারতীয় কালচারের অর্থ হিন্দু ধর্মভিত্তিক কালচার। ১৯৬২ সালে- '৪৭ সালের ১৫ বছর পর নেহেরুর এক বক্তৃতায় যে কথা স্বকর্ণে শুনেছিলাম তাতে আমার ঐ উক্তির সমর্থনই ছিল। দিল্লীর এক সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সৌধ সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ কথাই ৪০-এর দশকে প্রকাশিত তাঁর

'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' বইটিতে তিনি আরো সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। ভারতবর্ষের যে রূপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবী করেন তার মধ্যে সাতশ' বছর ধরে ভারতের বুকেই মুসলমানেরা যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো তার কোন সন্ধান ছিলো না। এই সত্যের উপরই পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। তাই তখন যে যাই বলুক ধর্ম বিশ্বাসকে আমরা এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান পরিচয় রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলাম এবং এই কারণেই উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক মুসলমান যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলো তেমনি বিহার-উড়িষ্যা এবং আসাম থেকে বহু মুসলমান বিতাড়িত হয়ে পাকিস্তানে নীড় বাঁধবার চেষ্টা করে। ৭০-৭১ সালে আমরা শুনলাম যে এই শরণার্থীরা সবাই বিদেশী, তাদের না তাড়ালে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের পরিত্রাণ নেই।

আরো দুঃখ্য পেলাম এই ভেবে যে ১৯৪৭ সালে যারা এক রকম জোর করে আমাদের বাংলাকে বিখণ্ডিত করতে বাধ্য করে এবং যারা তাদের রাষ্ট্রের ঐক্য এবং সংহতির খাতিরে নির্দ্বিধায় হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে তারাই সেদিন আমাদের শিখিয়েছিলো যে পাকিস্তানকে ভেঙে ফেললেই আমরা সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে রক্ষা পাবো। অথচ দিল্লীর শাসন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দেয়ার কথা কেউ বলেননি।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা ছিলো না তা নয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে বৃটিশ যুগের দুঃশাসনের কারণে একটা অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও সৃষ্টি হয় যার জের পাকিস্তানকে টানতে হয়েছে। ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে এ অঞ্চলেই প্রথম বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তারপরের দেড়শ' বছরের কাহিনী শুধু বঞ্চনা, লুণ্ঠন এবং প্রতারণার কাহিনী- যে কাহিনীর সত্যতা কোনো বৃটিশ বা হিন্দু ঐতিহাসিকও অস্বীকার করেননি। পূর্ব বঙ্গের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কোলকাতা। সারা পূর্ব বঙ্গে শহর বলে কোন কিছু ছিলো না। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি শহরকে আধুনিক অর্থে কেউ শহর বলতো না। আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে, পঞ্চাশের দশকে যখন গুলিস্তানের রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং দু' একটা বড় দালান-কোঠা আজিমপুর এবং মতিঝিলে গড়ে উঠেছে তখন আমার এক আমেরিকান বন্ধুকে নারিন্দা অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, আজ রুরাল বেঙ্গল সম্পর্কে একটা আইডিয়া করতে পারলাম। আমি চমকে উঠেছিলাম সত্য কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিলো যে ইউরোপ বা আমেরিকাবাসীর কাছে নারিন্দা অঞ্চলের সঙ্গে তাদের পল্লীর তফাৎ থাকতে পারে না। বরঞ্চ অনেক ইউরোপীয় বা আমেরিকান গ্রাম আরো সুন্দর ও সুঠাম। এই ঢাকাই হলো আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা লাহোর এবং করাচীর মতো দু'টো বড় শহর পেলো। করাচী অপেক্ষাকৃতভাবে নতুন নগর কিন্তু লাহোরের বয়স পাঁচ হাজার বছরের। এ দু'টি শহরই ছিলো দু'টি প্রদেশের রাজধানী। কিন্তু হঠাৎ করে লাহোর এবং করাচীর সঙ্গে ঢাকার বৈষম্যের জন্য দায়ী করা হলো পাকিস্তানকে। আরো বলা হলো যে পাটের টাকা দিয়ে করাচী এবং লাহোর স্ফীত হয়ে উঠেছে। ঢাকার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। ১৯৫৬ সালে করাচীতে একদিন হঠাৎ করে একজন বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে ৪৪ সাল থেকেই চিনতাম। আমি যখন ইসলামিয়া কলেজের লেকচারার শেখ মুজিবুর রহমান তখন সেখানে ছাত্র এবং আমাদের মতো তিনিও এককালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনিই বললেন, স্যার দেখেছেন, এলফিন্টস্টোন রোডের সমস্ত চাকচিক্যের মূলে রয়েছে পূর্ব বঙ্গের পাট, আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম এ নতুন তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন কোথায়? এ রাস্তাটির বয়সও যেমন কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট বছর তেমনি দোকানগুলিও প্রাক-পাকিস্তান যুগের। কিন্তু তিনি তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের সবকিছুর মূলে রয়েছে বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত পূর্ববঙ্গের দান। কিন্তু এই যুক্তি আমরা কিভাবে স্বীকার করি? অথচ '৭১ সালে যে বিস্ফোরণ ঘটে তখন লাখ লাখ বাংগালী তরুণ এই বিশ্বাস নিয়েই সংগ্রামে নেমে ছিলো যে পাকিস্তানে থেকে তারা শোষণ ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে না।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি আইয়ুব খানের আমলে এক সেমিনারে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা আমি নিজেও তুলেছিলাম। বলেছিলাম যে এ বৈষম্যের ঐতিহাসিক কারণ যাই হোক, বৈষম্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে; জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এই বৈষম্যের হেতু। আমি আরো বলেছিলাম যে বাস্তব রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে সত্যের চাইতে অনুভূতি প্রধান হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ যেখানে সত্য সত্যই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে বৈষম্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী, সেখানে অবিলম্বে জাতীয় সংহতির খাতিরে কতকগুলি পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। সিনিয়রিটির দোহাই দিয়ে যদি প্রশাসনে এবং মিলিটারিতে কোনো পূর্ব পাকিস্তানীকে স্থান দেয়া না হয় তবে তার পেছনে যত যুক্তিই দেখানো হোক তার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে, পাকিস্তানের ভিত্তিমূল দূর্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানকে টুকরো করে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে হবে এই ধারণা বা অশঙ্কা আমার মাথায় কখনো আসেনি। আমার সে বক্তৃতা পরদিন বড় হরফে ইত্তেফাকে বেরিয়েছিল।

...শুধু অর্থনীতি নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, কলা সব ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছিলো যে ১৬ই ডিসেম্বর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। শুধু পাকিস্তানের ২৩ বছর নয়, মুসলিম আমলের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসকেও অগ্রাহ্য করা হলো। যেনো ও সময় এমন কিছুই হয়নি, যদ্দারা এ অঞ্চলের অধিবাসীরা উপকৃত হয়েছে বা যার কোনো প্রভাব এদের জীবনের উপর অনুভব করা যায়। কোলকাতা ফেরত এক ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন যে যুগে যুগে নাকি ইসলামের নামে পূর্ব বঙ্গের বাঙালীরা প্রবঞ্চিত হয়েছে। তুর্কি, মোগল, পাঠান যেমন প্রবঞ্চক ছিলো তেমনি ছিলো পাকিস্তানীরা। আশ্চর্যের কথা এই ভদ্রলোকটি '৪৮ সালের পর একদিন এই বলে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের অস্তিত্বের খাতিরে দরকার হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্জন করতে হবে; এই অতিশয়োক্তির প্রয়োজন কোনো কালেও ছিলো বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম যে '৪৮ সালের পর যারা এ রকম আস্ফালন করতেন তারাই এখন বলতে শুরু করেছিলেন যে মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা হবে আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এরা একবারও ভেবে দেখেননি যে যুগ যুগান্তের প্রবঞ্চনার যে করুণ চিত্র এরা তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যে সত্যের লেশ থাকলেও সেটা আমাদের জন্য হতো চরম অগৌরবের কথা। তাদের অভিযোগের সরলার্থ দাঁড়ায় এই যে পূর্ব বঙ্গে যে কয়েক কোটি মুসলমান বাস করে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে তারা এতো নিকৃষ্ট যে কোনো যুগেই তারা কিছু করতে পারেননি, শুধু বঞ্চিত, উপেক্ষিত, অবহেলিত, উৎপীড়িত হয়ে এসেছে। এ ছিলো এক অদ্ভুত যুক্তি। অথচ এই যুক্তি কে মুজিববাদী অসংখ্য যুবক নিরেট সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো। এই যে অসংখ্য মুসলমান যাঁরা মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ব যুগে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, স্থাপত্যে নিদর্শন রেখে গেছেন, জীবনের নানা ক্ষেত্রে যারা এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন যা সামগ্রিক ইসলামের ইতিহাসের একটা দিক মাত্র, তাঁদের অবদান মিথ্যা হয়ে গেলো। বাংলার মুসলমান সুলতানেরাই বাংলা ভাষাকে জাতে তুলে ছিলেন। তাঁরা নিজেরা তুর্কি বা ফার্সি ভাষী ছিলেন কিন্তু বর্তমানের বিচারে তাঁরা হয়ে গেলেন উৎপীড়ক। যাঁরা মগের অত্যাচার থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন, যাঁরা মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ থেকে এ দেশকে বাঁচিয়েছেন তাঁরাও ঐ সংজ্ঞায় পড়লেন।

১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্ব ইতিহাসের কথা যাদের মনে ছিলো তাঁরা নিশ্চয়ই জানতো যে এ অঞ্চলের উৎপাদিত শস্য দিয়ে কোলকাতার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পাট উৎপাদন করতাম আমরা; পাটের কল স্থাপিত হয় কোলকাতা এলাকায় অমুসলিম মালিকানায়। এমন কি নারায়ণগঞ্জের পাটের বাজারও ছিল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের দখলে। জমিদাররা ছিলেন সবই প্রায় হিন্দু। এরা বাস করতেন কোলকাতায়, রাজস্ব গ্রহণ করতেন পূর্ব বঙ্গের জমিদারী থেকে। তবে এসব অত্যাচার নয়, এগুলিকে কেউ এখন উৎপীড়ন ও বলছিল না। কারণ এরা তো ছিল বাংলাভাষী, আমাদের একান্ত আপন লোক। এ যেনো আপন ভাইয়ের হাতে চর থাপ্পর খাওয়ার মতো। তবে মাড়োয়ারীদের শোষণের ব্যাপারটা এরা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে জানি না। সে প্রসঙ্গ এখন আর কেউ তুলে না।

...আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যখন আঞ্চলিক বৈষম্যের ধুয়া তোলা হয় তখন সরকারী কর্মচারী একদিকে যেমন গোপনে শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়েছেন যে এ সমস্ত মিথ্যা চিৎকার নিয়ে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারও টের পাননি যে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অসন্তোষ কিভাবে ধূমায়িত হচ্ছে। আইয়ুব খান যখন তার ওয়ার্কস প্রোগ্রাম প্রবর্তন করেন তখন সরকারী কর্মচারী ও ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের মুখে এর প্রচুর প্রশংসা শুনেছি। আবার সত্তর সালে এরাই বলেছিলেন যে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের দ্বারা দেশে কতগুলো টাউট সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের উন্নতি কিছুই হয়নি। এ রকমের অভিযোগ পাকিস্তান আমলে সব কিছুর বিরুদ্ধেই করা হতো। অথচ তেইশ বছর আগে যে পূর্ব বাংলা আমরা পেয়ে ছিলাম তার সঙ্গে সত্তর সালের পূর্ব পাকিস্তানের চেহারার তুলনা করলে যে বিরাট ব্যবধান চোখে পড়ে সে কথাটি এখন অস্বীকার করা হচ্ছিলো। রাস্তাঘাটে, কল-কারখানা, বন্দর উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক-মজুর, শিক্ষক-উকিল, ব্যবসায়ী কেউ নাকি উপকৃত হয়নি। আশ্চর্য, তখন যে কটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো তারা সমস্বরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একই অভিযোগ উচ্চারণ করে গেছে।

একদিকে এরা অভিযোগ করতো কেন্দ্রীয় সরকারের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নাকি বিঘ্নিত হয়েছিলো। অন্যদিকে এরা কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলতো। কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এ অঞ্চল থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রস্তুত হয়েছে বলে আমি শুনিনি। একদিকে ছিলো কেন্দ্রের উপর এবং অবাঙ্গালী অফিসারদের উপর নির্ভরশীলতা, অন্যদিকে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হলেই বলা হতো যে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চাদপদ করে রাখার ওটা একটা চক্রান্ত।

...যখন '৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমার বয়স ২৭। এমন অর্বাচীন তরুণ ছিলাম না যে কি হচ্ছে তার তাৎপর্য একেবারেই বুঝবার ক্ষমতা ছিলো না। কিন্তু '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত তেইশ বছরের যে ইতিহাস তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ রাজনীতিবিদদের মুখে একথা একবারও শুনিনি যে নতুন রাষ্ট্রকে লালন করে টিকিয়ে রাখবার পর অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। একে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার প্রমুখ ব্যক্তি যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁরা সবাই বিভিন্ন সময়ে সরকারী ক্ষমতা ভোগ করেছেন, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়া মাত্রই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক উক্তি করতে এদের দ্বিধা হয়নি। হামিদুল হক চৌধুরীর কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। এদের সবার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির একটা সংকীর্ণতা ছিলো। কেউ যেনো বুঝতে চেষ্টা করতেন না যে, যে অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো তার পরিবর্তন ঘটাতে হলে নতুন রাষ্ট্রের কাঠামোকে মজবুত করাই হবে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছেন যে সামগ্রিক ভাবে পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের। আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, আছে শুধু অধিকার। একদিকে দাবী করেছি যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যদিকে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মত সাহায্য চেয়েছি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের কাছে দাবী দাওয়া পেশ করার এই নজীর অন্য দেশের ইতিহাসে বিরল। ১৯৪৭ সালের যে গণপরিষদ গঠিত হয় তার সদস্য সংখ্যার মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো। এ কথা সত্য যে উপযুক্ত লোকের অভাব এ অঞ্চলে ছিলো বলে নিয়াকত আলী খানের মত কয়েকজন মোহাজেরকে এই অঞ্চলের কোটা থেকে নির্বাচন করা হয়েছিলো। কিন্তু বাঙালীদের সংখ্যাই ছিলো বেশী; তবুও কেন্দ্রীয় পরিষদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ভূমিকা আমাদের পালন করার কথা, তা আমরা করতে পারিনি। যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে। বলা হয়ে থাকে যে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং মিলিটারীতে পূর্ব পাকিস্তানের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণে আমাদের রাজনীতিকরা অসহায়বোধ করতেন। এটা তাদের ব্যর্থতা এবং অকর্মণ্যতা ঢাকবার একটা অজুহাত মাত্র। কারণ গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হিসাবে গণপরিষদে হস্তক্ষেপ করার আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেশের কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে;

আমলারা এবং মিলিটারী অফিসাররা প্রাইম মিনিস্টার এবং মিনিস্টারদের হুকুম মেনে চলতেন। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর পূর্ব পাকিস্তানের খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। লিয়াকত আলী হত্যার পর তিনি আবার প্রাইম মিনিস্টারের পদ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ঐ পদ কিছুকালের জন্য অধিকার করেছিলেন। শুনেছি যে ব্যক্তিগতভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাঁদরেল লোক ছিলেন।

কোন আমলার কাছে ভীত হওয়ার কোনো কারণ তাঁর ছিল না। শিক্ষা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা কোন দিক থেকেই। কিন্তু পদচ্যুত হলে এরা যে সমস্ত আস্ফালন করতেন পদে অধিষ্ঠিত থেকে একথা কখনো বলেননি যে কেনো পূর্ব পাকিস্তান আরো বেশী সুবিধা পাচ্ছেনা। বরঞ্চ, আগেই উল্লেখ করেছি যে প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সলিমুল্লা মুসলিম হলে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসনের ৯৮ ভাগ ভোগ করছে। এ সমস্ত কথার অর্থ কি তা একাত্তর সালের বিষ্ফোরণের পর বুঝবার উপায় ছিলো না। হয় বলতে হয় যে শহীদ সাহেব আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলে গেছেন- যা বিশ্বাস করা শক্ত। অথবা বলতে হয় যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে খতম করার উদ্দেশ্যেই এ সমস্ত অভিযোগ তুলেছিলো।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমরা পাঞ্জাবের তুলনায় পশ্চাদপদ ছিলাম না তা নয়। এই পশ্চাদপদতার কারণ ১৭৫৭ সালের পরবর্তী ইতিহাস। বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিস্পেষণ এবং বঞ্চনার কারণেই পাকিস্তান আন্দোলনে আমরা সবচেয়ে বেশী সাড়া দিয়েছিলাম। আমাদের আশা ছিলো যে বর্ণ হিন্দুদের বেষ্টন থেকে মুক্ত হতে পারলে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারবো। এবং সেই প্রক্রিয়া যে তেইশ বছরে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলো সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয় ছিলো না।

...যাক, আমি বলছিলাম কেনো আমরা এ অঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলাম সে কথা। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরই একদল আমাদের বুঝাতে লাগলেন যে আমরা কিছুই পাচ্ছিলাম না। শুধু নতুন বঞ্চনার শিকার হয়েছিলাম মাত্র। এ সমস্ত কথা যদি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পর শুরু হতো তা হলে বুঝা যেতো যে ঐ ১৫ বছরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সমান হতে পারিনি বলেই ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু আমার তো স্পষ্ট মনে আছে ৪৮-৪৯ সাল থেকেই এ অভিযোগের সূত্রপাত। তখনি শুরু হয় ভাষা আন্দোলন, শুরু হয় অবাঙ্গালী অফিসারদের বিরুদ্ধে জেহাদ, নবাগত বিহারী মোহাজেরদের প্রতি শত্রুতা।

...কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে যারা এ সমস্ত অভিযোগ তুলে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করে, পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছা এবং আগ্রহ তাদের কি কখনোই ছিলো? ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের 'মাউন্টব্যাটন প্ল্যান' যখন ঘোষিত হয় তখন একজন বৃটিশ সিভিলিয়ান টাইসন পূর্ব বঙ্গকে পাড়াগাঁয়ের বস্তি (রুরাল স্লাম) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৃটিশ শাসনের থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে এটাই আমাদের প্রাপ্য হলো। এই শাসনের প্রারম্ভকালে বৃটিশরা যেমন এ দেশের সম্পদ লুটে, এ দেশের মুসলমান সমাজকে ধ্বংস করে তাদের সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে এক নতুন বিত্তবান সমাজের উত্থানের পথ সুগম করেন, তেমনি এ দেশ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ১৯৪৩ সালে তারা এক ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ ঘটায়। সরকারী হিসাবে এই মন্বন্তরে ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং সরকারী কমিশন বলেছিলো যে, এই দুর্ভিক্ষ ছিলো ম্যানমেড (কৃত্রিম)। এই বিধ্বস্ত অঞ্চলই '৪৭ সালের ১৪ই অগষ্ট রুপান্তরিত হয়েছিলো স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ ৪৮ সাল থেকেই আবার শুনতে আরম্ভ করি যে আমাদের সমস্ত দুর্দশার কারণ করাচীস্থিত তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা, উপেক্ষা এবং শোষণ। পাঞ্জাব বা সিন্ধু অঞ্চলে যেমন যুদ্ধের সময় কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি তেমনি ১৭৫৭ সাল থেকে উনিশ শতাব্দীর শেষ অবধি পর্যন্ত যে নির্যাতন বাংলার মুসলমানদেরকে সইতে হয়েছে

তার নজির পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাসে নেই। হান্টার সাহেবের সে বিখ্যাত বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করার হয়তো দরকার নেই। তিনি বলেছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পূর্বে যারা ছিলেন বাংলার সম্ভ্রান্ত সমাজ তারাই পরিণত হলেন কাঠুরিয়া আর ভিস্তির শ্রেণীতে। আগে যেমন কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের পক্ষে দারিদ্র্যের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ছিলো তেমনি ১৮৫৭-এর পর কারো পক্ষে স্বচ্ছলতা রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই তো হলো আমাদের ইতিহাস। উনিশ শতাব্দীতে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সমাজে যে পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁস-এর সূত্রপাত হয়, যার প্রধান প্রতিনিধি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ঠাকুর পরিবার সেই পুনর্জাগরণে মুসলমান সমাজের কোন ভূমিকা ছিল না এবং থাকবার কথাও নয়।

এই বিধ্বস্ত সমাজকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে আমাদের যাত্রা শুরু। ৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি তার ভয়াবহতার চিত্র আমার বয়সী কোনো লোকের মন থেকে মুছে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ৭১ সালে ছিল না। জাপানীরা তখন বার্মা দখল করেছে। আরাকান পর্যন্ত থাবা বাড়িয়েছে। কোলকাতায় বোমা পড়ছে এবং যে কোনো মুহূর্তে তারা আসাম ও বাংলার একটা অংশ দখল করে নিতে পারে এই আশংকায় বৃটিশ সরকার পোড়ামাটি বা SCORCHED EARTH নীতি অবলম্বন করে। জেলে এবং কৃষকদের নৌকা ধ্বংস করে ফেলা হয়, ধ্বংস করা হয় খেত খামারের ফসল: একেতো তখন বার্মা থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো অন্য দিকে এ অঞ্চলে উৎপাদিত চাল সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজনে ক্রয় করে উত্তর এবং মধ্য ভারতে চালান দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই প্রক্রিয়ায় কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমান রাজনীতিবিদও জড়িত ছিলেন। মাড়োয়ারীদের সাথে যোগসাজশে এরা চাল পাচার করতেন। এ নিয়ে একটা মামলাও হয়। এই মামলার তথ্য উদঘাটন করতে গেলে এমন সব নাম আবিষ্কৃত হবে যা শুনলে বর্তমান প্রজন্ম রীতিমত আঁৎকে উঠবে। কারণ এরা এদের পরম শ্রদ্ধেয় জাতীয় বীর হিসাবে চেনে।

...যাক, আসল কথায় ফিরে আসা যাক। যে মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে এ দেশের যুব সমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিলো সেটাই হলো পাকিস্তানের পতনের কারণ। শোষণ, অত্যাচার, গণতন্ত্রের অভাব এগুলি ছিলো নিছক ধুয়া। আমি আগেই বলেছি যে এই অভিযান শুরু হয় পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। সুতরাং পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে তার বিচার আমরা করেছি জন্ডিস রোগাক্রান্ত চোখ দিয়ে। উন্নয়ন যা হয়েছে প্রথম থেকেই বলা হতো যে প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিলো একান্তই অপর্যাপ্ত। যেনো দুতিন বছরের মধ্যেই আমরা আগেকার দুশ বছরের অনগ্রসরতা অতিক্রম করে পাঞ্জাবের সমান হতে পারি। দেশ গড়তে যে সময় লাগে বিশেষ করে একটা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে না উঠলে যে এ অঞ্চলের পক্ষে সমগ্রিকভাবে পাঞ্জাবের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না সে কথা ভুলেই বসেছিলাম বা সে কথা চাপা দেয়া হচ্ছিলো যেনো অল্প শিক্ষিত একজন কবিরাজকে মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপালের পদে বসিয়ে দিলে তিনি সুচারু রূপে তাঁর দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে পারবেন। কিন্তু এই নীতি ক্রমশঃ সিভিল সার্ভিসে, ইউনিভার্সিটিতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা পদ অনেকগুলি পেলেন কিন্তু যে অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা থাকলে তাঁরা পুরানো আইসিএস অফিসারদের সমকক্ষ হতে পারতেন, সেটা ছিলো কোথায়?

আইয়ুব খানের আমলে এক পর্যায়ে যখন এ অভিযোগ প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে অবাঙালী অফিসারদের দিয়ে এ অঞ্চল সুচারুভাবে শাসন করা যাবে না তখন স্থির করা হয় যে বাঙালী অফিসারদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং এখানে অবাঙালী যাঁরা ছিলেন তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হবে। এটা করা হয়েছিলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত জনমতের চাপে। কিন্তু এই নীতি গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতার বীজ আরো ভালো করে যেনো রোপণ করা হয়। ৬৯-৭০ সালের দিকে প্রশাসনিক দিক থেকেও চিফ সেক্রেটারী থেকে শুরু করে সব দপ্তরে প্রধান আমলা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানবাসী কোনো ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি এ অঞ্চলের চিফ সেক্রেটারী হন তিনি ছিলেন কাজী আনোয়ারুল হক।

কথা হলো যে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব অবাঙালী অফিসারদের উপর ন্যস্ত বলে আমাদের অনগ্রসরতা কাটছে না- এ অভিযোগ খন্ডন করার জন্যই আইয়ুব খান এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে অভিযোগ খন্ডানো যায়নি। কারণ অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিলো তো অন্যকিছু। '৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেরাই স্বীকার করলেন যে, পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্য তারা বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি যে '৪৭ সাল থেকেই যদি কেন্দ্রীয় সরকার এ অঞ্চলে কোনো হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তার ফলও অন্যরূপ হতো না। তখন হয়তো বলা হতো আমরা যে নৈতিক সাহায্য আশা করছিলাম তা পাচ্ছি না বলেই আমাদের কিছু হচ্ছে না। যদি ধরে নেয়া যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখানে মোতায়েন না করা হতো, অবাঙালী কোনো আইসিএস অফিসারকে এখানে কোনো দায়িত্বে নিয়োগ না করা হতো তবে এ অঞ্চল কি অতিদ্রুত কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সমকক্ষ হয়ে উঠতো? ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ৫০ সাল পর্যন্ত তিনবার পুলিশ এ্যাকশন করে পূর্ব পাকিস্তান দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন নিরদ চৌধুরী। এক পর্যায়ে জয় প্রকাশ নারায়ণের মতো ব্যক্তিও সৈন্য ঢুকিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের অংশ ছিলাম বলেই এসব দুর্ঘটনা ঘটেনি। আর যদি পাকিস্তান আর্মি এখানে না থাকতো ইন্ডিয়ান আক্রমণের বিরুদ্ধে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার মতো সামরিক শক্তি তো আমাদের ছিলো না। তবুও শুনলাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও ২৩ বছর এ অঞ্চলটাকে শুষে খেয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করতেন তাঁরা ছিলেন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ছিলেন মরহুম আবুল হাশেম এবং মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মতো। তাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন কিন্তু অত্যন্ত অবাস্তবভাবে এ বিশ্বাসও পোষণ করতেন যে প্রথম থেকেই এ অঞ্চলটাকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত ছিলো। এ অঞ্চলের জনসম্পদ সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক অবস্থান এ সবদিকে তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেননি। শুধু বলেছেন, লাহোর প্রস্তাবে STATES বা একাধিক রাষ্ট্রের কথা ছিলো। অথচ তাঁরা যেনো ইচ্ছাকৃতভাবে এ কথা চেপে যেতেন যে ১৯৪০-এর পর যে পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে তার মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রের কথা কেউ ভাবতো না। আমরাও ভাবিনি। আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান যে একমাসও টিকতে পারতো না তার উল্লেখ আবুল মনসুর আহমদ বা আবুল হাশেমের কোনো লেখা বা বিবৃতিতে পাইনি। ইন্ডিয়া যখন পাকিস্তানের প্রাপ্য ৯০ কোটি টাকা আটকে দেয় তখন পাকিস্তান টিকে থাকবে কিনা এই প্রশ্ন দেখা দেয়। হায়দরাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলীর চেষ্টায় নিজামের তহবিল থেকে এ টাকার ব্যবস্থা হলে সংকট কেটে যায়। এরপর অবশ্য অন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ইন্ডিয়া ঐ টাকা ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলো। প্রশ্ন হলো ৪৭-৪৮ সালে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান এ রকম একটা সংকটের মোকাবেলা করতো কিভাবে?

তারপর ঠিক স্বাধীনতার প্রাক্কালে মাউন্টব্যাটেন আর একটি চাল দিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনিই হবেন ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের যৌথ রাষ্ট্রপ্রধান। কায়েদে আজম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতো না এবং মাউন্টবেটেন এবং কংগ্রেস সম্ভবতঃ প্ল্যান করেছিলেন যে এই কৌশলেই ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের বিভক্তি অচিরেই বাতিল হয়ে যাবে। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যেও তাই ঘটতো। এই অঞ্চলের বহু প্রবীণ রাজনীতিবিদের মুখেও শুনেছি যে মাউন্টবেটেনকে যৌথ গভর্নর জেনারেল হিসাবে মেনে নিলে পাকিস্তান আরো অনেক কিছু পেতো। এই বালসুলভ যুক্তি যে একেবারেই অসার পরবর্তী ইতিহাসে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম।

তবুও শুনছি লাহোর প্রস্তাব সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলেই আমাদের যতো রাজনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিলো। এবং এ কারণেই নাকি শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে আরেক দল সমালোচক ছিলেন যারা কোনো কালেই দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেননি এবং গোড়া থেকে পাকিস্তানকে প্রথমে ঘায়েল এবং পরে একেবারে ধ্বংস করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলেন। কোন অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলেই এরা বলতেন ভারত বিভক্ত না হলে এসব ঘটতো না। শতসহস্র মুসলমান বাঙালী নতুন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পে এঁরা অগ্রসর হতে শুরু করলেন, মাড়োয়ারী আধিপত্যের অবসান ঘটলো, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে সংস্কার করার সুযোগ পেলাম- এ সমস্তই যেনো মিথ্যা কথা। অবশ্য আমি আগেই বলেছি শিক্ষা এবং শিল্প ক্ষেত্রে দেড়শত বছরের অনগ্রসরতার কারণে নতুন সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারিনি।

...আসল কথা হচ্ছে যে আমাদের আমলা, শিক্ষাবিদ প্রমুখ যাঁরা পাকিস্তানের কল্যাণে, বহুক্ষেত্রে কোটার জোরে, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, অভিজ্ঞতায় এবং কর্মক্ষমতায় তাঁদের অধিকাংশই অবাঙালী কর্মচারীদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁদের সামনে এঁরা কাবু হয়ে পড়তেন এবং নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার উদ্দেশ্যে বাইরে এসে অভিযোগ করতেন যে ওঁদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁরা কিছু করতে পারেননি। ষড়যন্ত্রের অজুহাত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চাদপদতা ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে ষাটের দশকে এসে শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মীরা যত্রতত্র ষড়যন্ত্রকারীদের সন্ধান পেতেন। অথচ সত্য কথা হচ্ছে পাকিস্তানে গণতন্ত্র এবং শাসনতান্ত্রিক বৈধতার বিরুদ্ধে যতগুলি ষড়যন্ত্র হয়েছে তার মূলে ছিলেন এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। এঁদের সমর্থন নিয়েই গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জা এবং জেনারেল আইয়ুব খানের ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী জড়িত ছিলেন। মোহাম্মদ আলী তো বটেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবও ইস্কান্দর মির্জার অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়ে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায্য করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো ব্যক্তি যাঁকে তাঁর স্তাবকেরা গণতন্ত্রের মানসপুত্র ও স্বতন্ত্র প্রহরী বলে চিহ্নিত করে রেখেছে তিনি কোন যুক্তিতে ইস্কান্দর মির্জার মতো গণতন্ত্রের শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে রহস্যময়। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভায় আবুল মনসুর আহমদের মতো ব্যক্তিও ছিলেন। এঁদের সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে মিলিটারি শাসন স্থায়ীভাবে কায়েম হতে পারতো না। যে ব্যক্তিটিকে গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করে প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সেই নাজিমুদ্দিন সাহেবকে আওয়ামী লীগ মহলে নানাভাবে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা হয়। অথচ তিনি একবারও ক্ষমতার লোভে কোনো মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেননি এবং সামরিক শাসনের সঙ্গে সহযোগিতাও করেননি। বরঞ্চ মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন। অদৃষ্টের এমন পরিহাস যে বাংলাদেশের ইতিহাসবেত্তারা তাঁকে বলছেন পশ্চিম পাকিস্তানের তাবেদার, গণতন্ত্রের দুশমন ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে যে ক্যুর মাধ্যমে শাসনতন্ত্র একেবারে বাতিল করে ইস্কান্দর মির্জা এবং আইয়ুব খান ক্ষমতা অধিকার করেন তার পিছনেও রয়েছে এক কলংকের ইতিহাস। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানে না যে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান যখন একক ক্ষমতার মালিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ইস্কান্দর মির্জাকেও সরিয়ে দেন তার পিছনে জনমতের একটা বিরাট অংশের সমর্থন ছিলো। দেশের দুই অংশেই চরম অরাজকতার ফলে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। সে বছরই পূর্ব পাকিস্তানে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্যের হাতে নিহত হন। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ সাহেবের দল প্ল্যান করেছিলো যে যেমন করেই হোক তারা ইলেকশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। দেশের সর্বত্র গুন্ডা বাহিনী নিয়োজিত করা হয় যাদের উপর ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালট বক্স ছিনতাই করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এ রকম গুজব সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্য সৈয়দ কামরুল আহসান-যাঁর নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি- তাঁর আত্মজীবনীমূলক Portraits From Memory নামক বইয়ে লিখেছেন যে আওয়ামী লীগের এই ষড়যন্ত্র না হলে আইয়ুব খান জনমতের সমর্থন লাভ করতে পারতেন না। আজ ৩৩-৩৪ বছর পর এ সমস্ত কথা অনেকেই ভুলে গেছেন। যাদের বয়স পঞ্চাশের নীচে তাদের এ সমস্ত কথা জানবারও কথা নয়।

কিন্তু কেনো এবং কি উপায়ে ষাটের দশকের শেষদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিলো সেটা বুঝতে হলে এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন।

১৯৬৫ সনের যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালী বিরোধী মনোভাব যখন তীব্রতর হতে শুরু করে তখন আগাখানী এবং বোহরা সম্প্রদায়ের অনেক ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি বাড়ীঘর এবং ধন-সম্পত্তি বিক্রয় করে এ অঞ্চল থেকে সরে পড়েন। তাঁরা এসেছিলেন স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন এ উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল আওয়ামী লীগের অবাঙালী বিরোধী অভিযান। এর ফলে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থার আরো দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

এমন কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ভাইস চান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হাসান ও ডক্টর মাহমুদ হোসেন যাঁরা উভয়েই ঢাকায় বাড়ীঘর তৈরী করেছিলেন, তাঁরা এসব বিক্রি করে ফেলেন। ডক্টর আহমদ হাসানদানীর মতো অধ্যাপক যিনি প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং যাঁর চেষ্টায় পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়, তিনিও চলে যান। এ রকম আরো অনেকে যাঁদের সুবিধা ছিলো, পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে যান। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এ অঞ্চলে একটা বিশেষ দল যে জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে যাচ্ছে তাতে একটা বিস্ফোরণ ঘটবার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছিলো। আগে সেখানে কাবুলী, পেশোয়ারী, বিহারী, উত্তর প্রদেশের আগ্রা-দিল্লীর লোকেরা ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে অবাধে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতো এবং তাদের কেউ বিদেশী মনে করতো না। কারণ তারা ছিলো মুসলমান। সেই পরিবেশে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটছিলো। আমি যে বাসায় শিক্ষা জীবন কাটিয়েছি সেখানে চাকর-বাকর সবই ছিলো বিহারের দার ভাঙ্গ এবং মুংগের জেলার। একজন হিন্দু উড়িয়া মালিও ছিলো। বাড়ীতে দারোয়ান বা নৈশ প্রহরী ছিলো একজন পাঞ্জাবী। কখনো মনে হয়নি এরা বিদেশী। কারণ ঐ উড়িয়াকে বাদ দিলে আর সবাই ছিলো মুসলমান। আমরা মনে করতাম ঐ উড়িয়া মালিই বিদেশী। আর অন্য সবাই এক জাতের।

৬০ দশকের ক্রমাগত প্রচারণার ফলে এবং ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে পাকিস্তানের ভিত্তিমূল ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। উর্দুভাষী একজন সাধারণ কুলিকে দেখলেও বলা হতো এরা শোষকের দলের লোক। বৃটিশ আমলে এবং পাকিস্তানের প্রথম দিকে রেলওয়ে স্টেশনে, স্টিমারঘাটে বহু উর্দুভাষী গরীব বিহারী কুলিগিরি করতো। বাস্তবিক পক্ষে কুলিদের সঙ্গে উর্দুতেই কথা বলতে হয়। এই অভ্যাস প্রায় সবারই হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৪৭ সালের পর আরো কয়েক লক্ষ মোহাজের বিহার-উড়িষ্যা এবং কোলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ৪০/৫০ বছর আগে থেকে যে সমস্ত উর্দুভাষী এ অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস করছিলো এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলো। তাদেরও এখন চিহ্নিত করা হলো চক্রান্তকারী দুশমন হিসাবে। অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের কথা জানতাম যারা ঢাকার চকবাজার, মৌলবীবাজার, উর্দু রোড, মোগলটুলি প্রভৃতি এলাকায় জর্দার দোকান, পান-বিড়ির দোকান, টুপির দোকান প্রভৃতি ছোট ছোট ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতো, তারাও হলো আমাদের দুশমন। এবং ৭১ সালে এরা অনেকে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর হাতে নির্মমতার শিকার হয়েছে।

এ কথা স্বীকার করবো যে ৪৭-এর আগে যে সমস্ত অবাঙালী অফিসার বা সাধারণ লোক কোনো কালে পূর্ব বাংলায় আসেনি তাদের একটা ধারণা ছিলো যে বাংলাভাষী মুসলমানরা সম্ভবত ভালো মুসলমান নয়। তারা কেউ কেউ ইসলাম এবং উর্দুকে সমান করে দেখতো। এরকম কথাবার্তায় অনেক বাংলাভাষী ক্ষুব্ধ হতো। ফিরোজ খান নুন, যখন এই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হোন তিনি এই ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে এ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে খতনা প্রথা নেই। তিনি আরো এক কান্ড করেন। বিনা মূল্যে গ্রামে গ্রামে কোরআন বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। যেনো এ অঞ্চলের মুসলমানরা ভালো করে কোরআন শরীফের সাথে পরিচিত নয়। অথচ পূর্ববঙ্গের এমন কোনো পাড়া-গাঁ নেই যেখানে মসজিদে এবং অধিকাংশ মুসলমান বাড়িতে কোরআন পাওয়া যেতো না। কোরআন বিতরণ করা কোনো দোষের কাজ নয়, কিন্তু যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কোরআন প্রচারের প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিলেন সেই ধারণার মূলে সত্য কিছুই ছিলো না। আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজ খান নুন-(যিনি ইংরেজীতে একটা উপন্যাস

এবং একটি আত্মজীবনী প্রকাশ করেন এবং পরে এক্সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন)- এটা বুঝতেন যে পূর্বাঞ্চলের ভাষা বাংলার সঙ্গে পরিচিত না হলে এখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা দুরূহ। আমার পরিচিত ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের এক অধ্যাপককে তাঁর জন্য বাংলা টিউটর নিযুক্ত করা হয়। ঢাকায় ভিকারুননেসা স্কুলটি তাঁর বৃটিশ স্ত্রীর প্রচেষ্টার ফল।

তাই বলছিলাম যে এ অঞ্চলের ভাষা এবং কালচার সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই কোনো কোনো অবাঙালী অফিসার বা প্রশাসক যে সমস্ত মন্তব্য করতেন বলে সেগুলি পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এঁদের সংখ্যা ছিলো মুষ্টিমেয়। কিন্তু তবুও তাঁরা যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাকে কোন রূপেই মার্জনীয় মনে করা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম এডুকেশন সেক্রেটারী এক অবাঙালী আইসিএস মিঃ ফজলে করীম প্রস্তাব করে বসেন যে বাংলা আরবী লিপিতে লেখা উচিত। একথা আমরা অনেকেই ভুলে গেছি যে হরুফুল কোরআন বলে একটা আন্দোলন অনেক দিন থেকে এ অঞ্চলে চালু ছিলো। এক মওলানা সাহেব আরবী লিপিতে চাটগাঁ থেকে একটা বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করতেন। এ কথা সত্য যে এ আন্দোলনের পিছনে বাংলাভাষী কিছু কিছু লোকের সমর্থন ছিলো। কিন্তু অবাঙালী আইসিএস অফিসার যখন এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তখন সবাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন তুললো যে বাংলা কিভাবে লিখিত হবে সে সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার তাঁর কোথায়? পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত পন্ডিত সুনীতি চ্যাটার্জী বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাগুলির জন্য একটা সাধারণ লিপি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং তিনি বলতেন রোমান লিপির কথা। সুভাষ চন্দ্র বসুও কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর অভিভাষণে ঐ প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর একথাও শুনেছি যে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় নাকি তাঁর উপন্যাসগুলি দেবনাগরী অক্ষরে ছাপাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এ সমস্ত প্রস্তাব যাঁদের কাছ থেকে এসেছিলো তাঁরা সবাই ছিলেন বাংলাভাষী। সুতরাং অবাঙালীরা কেউ বাংলা ভাষার চরিত্র বদলাবার চক্রান্তে নেমেছে তখন এ কথা বলা চলতো না। কিন্তু মিঃ ফজলে করীম ফজলীর প্রস্তাবে যারা আরবী লিপির সমর্থন করতো তারাও অস্বস্তিবোধ করেছে। তারপর ইতিমধ্যেই ৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে তমুদ্দুন মজলিস গঠিত হওয়ায় বাংলা ভাষা নিয়ে একটা পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিলো। সেই পরিস্থিতিতে যখন ফজলে সাহেবের প্রস্তাব শোনা গেলো সেটা চক্রান্তকারীদের জন্য হলো সোনায় সোহাগা।

এ সমস্ত ছোটোবড়ো নানা ঘটনার সমন্বয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিলো যে যখনই কোনো পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ বা কর্মচারী অবাঙালী কোনো অফিসারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অবাঙালী ব্যক্তিটিকে পূর্ব পাকিস্তানের চরম শত্রু বলতে দ্বিধা করেননি। ফলে অনেক অবাঙালী অফিসার হতাশ হয়ে এ অঞ্চল থেকে ট্রান্সফার নেয়ার চেষ্টা করতেন। নতুবা রাগের মাথায় ঝগড়া-বিবাদ করতে শুরু করতেন। এ ঘটনা পরম্পরাও হলো চক্রান্তকারীদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বাঙালী অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, আমলা, কারিগর যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নেই এ কথা যেনো পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক বছরের মধ্যেই চাপা পড়ে গেলো। তখন কোন কোন রাজনীতিকের মাথায় এই বুদ্ধি এলো যেকোন রকমে এই অবাঙালী ও কারিগরদের তাড়িয়ে দিলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির পথে সমস্ত অন্তরায় অপসারিত হবে। এ সমস্ত রাজনীতিক সবাই যে সজ্ঞানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেমেছিলেন, মোটেই নয়। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান এবং বাস্তবতাবোধ থাকলে- তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকারের ভবিষ্যৎ কোথায় তা বুঝতে পারতেন, সেটা তাঁদের ছিলো না। বাংলায় আমরা বলি ফলেন পরিচয়তে অর্থাৎ ফল দিয়ে বৃক্ষের পরিচয়। এদের দূরদৃষ্টি অভাবজনিত সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষিত হলো না। এই অনস্বীকার্য সত্যের আলোকে পূর্ববর্তী ২২ বছরের ইতিহাস বিচারের অপেক্ষা রাখে। এঁদের মধ্যে যাঁরা এখন সমস্ত দোষ পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে তাঁরা হলো একমাত্র দেশপ্রেমিক তাদের নিজেদের কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ করলেই এই যুক্তি আর ধোপে টেকেনা।"[১৯১]

---

১৯১. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (সাবেক ভিসি- ঢা.বি)/একাত্তরের স্মৃতি। নতুন সফর প্রকাশনী- নভেম্বর, ১৯৯২। পৃ ভূমিকা/২৯-৩১/১৮৪-১৯০/১৯৬-১৯৮/২০৩-২০৭।